শিক্ষকতা পেশা ব্যতিক্রমী নেশা

মুহাম্মদ ইয়াহ্ইয়া আখতার

শিক্ষকতা পেশা হলেও চাকুরি নয়। চাকুরিতে শ্রম থাকলেও বিশ্রাম আছে। শিক্ষকদের বিশ্রাম নেই। শিক্ষকতা একটি নেশা। এ নেশা জ্ঞান অর্জন, সৃষ্টি ও বিতরণের। এ নেশা স্বপ্ন দর্শন ও প্রদর্শনের। সে সঙ্গে মানুষ গড়ার মধ্য দিয়ে ওই স্বপ্ন বাস্তবায়নের। এ নেশা শিক্ষার্থীদের ভালোবাসা ও কল্যাণ কামনার। কৃষক আর শ্রমিকের মতো শিক্ষকও যুগপৎ চাষী ও শ্রমিক। তার মাঠ আর ফ্যাক্টরি হলো শ্রেণিকক্ষ। তিনি জ্ঞানের লাঙ্গল চষেন। স্বপ্নের বীজ বোনেন। উৎপাদন করেন স্বপ্নবাজ আলোকিত মানুষ। এরা দেশকে এগিয়ে নেন। বিশ্বের বুকে দাঁড়ান মাথা উঁচু করে। তবে সম্প্রতি বাংলাদেশে বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতার ওপর দলীয় রাজনীতি আর বণিকবৃত্তির প্রভাব পড়েছে। বেড়েছে রাজনীতির তীব্রতা। শিক্ষার্থীরা শিক্ষকদেরকে অনুকরণীয় আইকন, দার্শনিক ও একাডেমিক পিতার আসনে বসাতে পারছেন না। উন্নত দেশগুলোর শিক্ষাঙ্গনের মতো বিশ্ববিদ্যালয়ে সুশাসন ও পেশাদারিত্ব নেই। আইন থাকলেও তা মানা হয় না। ছড়িয়ে পড়েছে অন্যায় আর দুর্নীতি। ক্যাম্পাসের দখলদারিত্ব সংস্কৃতি আর বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর অন্দরমহলের স্বরূপ ও ভাবধারা সম্পর্কে সবাই অবগত নন। পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্ণপরিচয়হীন শিক্ষক হিসেবে লেখক তার একাডেমিক জীবন ও কাজকর্মের মধ্য দিয়ে এ গ্রন্থে শিক্ষাঙ্গনের অভ্যন্তরীণ বাস্তবতা তুলে ধরেছেন। যাঁরা শিক্ষক বা শিক্ষক হতে চান, তাঁদের পড়ার টেবিলে বইটি স্থান পাবে। সাধারণ পাঠকগণও গ্রন্থটি পড়ে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর ব্যবস্থাপনা, পেশাদারিত্ব ও সুশাসনের স্বরূপ সম্পর্কে জানতে, বুঝতে ও ভাবতে পারবেন।

শিক্ষকতা পেশা
ব্যতিক্রমী নেশা

330196

শিক্ষকতা পেশা ব্যতিক্রমী নেশা

[একটি একাডেমিক আত্মজীবনী]

মুহাম্মদ ইয়াহ্ইয়া আখতার

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার

জাতীয় সাহিত্য প্রকাশ

৩৭২.১০০৯২

	BY	DATE
ACCESSION		
CHECKED		
CATALOGUED		22.5.2022
TYPED		
COMPARED		

শিক্ষকতা পেশা ব্যতিক্রমী নেশা
[একটি একাডেমিক আত্মজীবনী]
মুহাম্মদ ইয়াহ্ইয়া আখতার

প্রকাশক: কমলকান্তি দাস, জাতীয় সাহিত্য প্রকাশ, বেজমেন্ট ৫৫, কনকর্ড এম্পোরিয়াম শপিং কমপ্লেক্স, ২৫৩-৫৪ ড. কুদরাত-ই-খুদা রোড, কাঁটাবন, ঢাকা-১২০৫। প্রচ্ছদ: মোস্তাফিজ কারিগর। বর্ণবিন্যাস: আবির কম্পিউটার। মুদ্রণ: জাতীয় সাহিত্য প্রকাশ মুদ্রণ বিভাগ। গ্রন্থস্বত্ব: লেখক। প্রথম প্রকাশ: ফেব্রুয়ারি ২০২২।

মূল্য: ৮০০.০০ টাকা মাত্র।

Shikhokota Pesha Baaticromi Nesha [An Academic Memoir], written by: Muhammad Yeahia Akhter. Published by: Kamolkanti Das, Jatiya Sahitya Prokash, Basement 55, Concord Emporium Shoping Complex, 253-54 Dr. Kudrat-E-Khuda Road, Kantabon, Dhaka-1205. Cover design: Mostafiz Karigar. Copyright: Author. Date of Publication: February 2022.

Price : Tk. 800.00, US $ 10.00

ISBN : 984-70000-0465-9

জ্ঞানচর্চা ও বিতরণে নেশাগ্রস্থ
দেশপ্রেমিক শিক্ষকদেরকে

সূচিপত্র

লেখকের কথা ১১

পরিভাষা পরিচিতি ১৫

এক

ছাত্র থেকে শিক্ষক ১৭

দুই

কানাডায় উচ্চশিক্ষা গ্রহণ ৪৮

তিন

কানাডা থেকে ফেরার পর ৬৩

চার

অস্ট্রেলিয়ায় উচ্চশিক্ষা গ্রহণ ৮১

পাঁচ

আমেরিকায় সফরের অভিজ্ঞতা ১৩০

ছয়

শিক্ষক হিসেবে দায়িত্বপালন ১৭৮

সাত

সভাপতির একাডেমিক দায়িত্ব পালন ২২১

আট

সভাপতির কো-কারিকুলার কার্যক্রম ২৬১

নয়

উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংস্কৃতি ৩০২

দশ

স্যাবাটিক্যাল ছুটির অভিজ্ঞতা ৩৩৩

এগারো

শিক্ষকতা পেশা ব্যতিক্রমী নেশা ৩৭১

পরিশিষ্ট ৩৮৩

তথ্যপঞ্জী ৪৭০

নির্ঘন্ট ৪৭৫

লেখকের কথা

শিক্ষা মানুষকে জীবকূলে শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করেছে। শিক্ষার মাধ্যমে শানিত জ্ঞান ও বুদ্ধি মানুষকে অন্যান্য প্রাণী থেকে পৃথক করে উচ্চ মর্যাদা দিয়েছে। প্রাথমিকভাবে এ জ্ঞান-বিজ্ঞান মানুষ প্রাতিষ্ঠানিকভাবে অর্জন করেন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে। আর এ প্রক্রিয়ায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষকগণ জ্ঞান চর্চা, সৃষ্টি ও বিতরণের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের যোগ্য করে গ'ড়ে তোলেন। এরা মানুষ গড়ার কারিগর। এদের অবদানে সমাজ এগিয়ে যায়। দেশ উন্নত হয়। সমাজে প্রতিষ্ঠিত হয় পারস্পরিক সহমর্মিতা, গণতান্ত্রিক সহনশীলতা, অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও মানবিক মূল্যবোধ। শিক্ষার্থীদের কাছে এ কারণে শিক্ষকগণ অনুকরণীয় আইকন। এরাই সামাজিক ও মানবিক আলোর উৎসমূল। স্বপ্ন উৎপাদন ও বিতরণকারী।

সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রার সঙ্গে শিক্ষকের জীবনযাত্রা তুলনীয় নয়। মানুষ লেখাপড়া শিখে বিদ্বান হতে পারেন। কিন্তু তাদের সবাই শিক্ষক হতে পারেন না। শিক্ষক হতে ভিন্ন যোগ্যতা লাগে। এ যোগ্যতা সবার মধ্যে থাকে না। বিদ্বান বা জ্ঞানী হলেই শিক্ষক হওয়া যায় না। পরীক্ষায় ভাল রেজাল্ট করলেই সব সময় ভাল শিক্ষক হওয়া যায় না। শিক্ষককে সৃষ্টিশীল হতে হয়। তাকে গবেষণা করে নতুন জ্ঞান সৃষ্টি করতে হয়। সে জ্ঞান যুগপৎ প্রকাশনা করে এবং শিক্ষার্থীদের মধ্যে বিতরণের মধ্য দিয়ে সমাজে ও বিশ্বে সঞ্চারিত করতে হয়। জ্ঞানী ও বিদ্বান ব্যক্তি গবেষক নাও হতে পারেন। কিন্তু শিক্ষককে গবেষক হতে হয়। অন্যান্য পেশাজীবীর পাঠক বা লেখক হওয়া বাধ্যতামূলক নয়। কিন্তু একজন শিক্ষককে যৌথভাবে পাঠক ও লেখক হতে হয়। তাকে নিয়মিত পড়তে হয়। জানতে হয়। ভাবতে হয়। নতুন জ্ঞান সৃষ্টি ও বিতরণ করতে হয়।

শিক্ষকতা পেশাটি অন্য পেশার চেয়ে আলাদা। অন্যসব পেশায় পরিশ্রম থাকলেও বিশ্রাম আছে। কিন্তু শিক্ষকের বিশ্রাম নেই। দশটা-পাঁচটার সরকারি অফিসের কর্মকর্তাগণ অফিস থেকে বের হয়ে চিন্তামুক্ত থাকতে পারেন। কিন্তু শিক্ষকগণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে বের হয়ে চিন্তামুক্ত হতে পারেন না। অন্য পেশায় ছুটি কম হলেও সে ছুটিতে বিশ্রাম নেয়া যায়। শিক্ষকতা পেশায় তুলনামূলকভাবে ছুটি বেশি হলেও বিশ্রাম নেই। অন্য পেশাজীবীগণ কাজের বাইরে চিন্তামুক্ত থাকতে পারেন। কিন্তু শিক্ষক তা পারেন না। শিক্ষককে কেবল চিন্তা করলে হয় না। তাকে লিখতে হয়। প্রকাশনা করতে হয়। ক্লাসে পড়াবার জন্য ভাবতে হয়।

কাজেই শিক্ষক কিভাবে চিন্তামুক্ত থাকবেন? শিক্ষকের মস্তিস্কে সব সময় নানা রকম চিন্তা থাকে। সমাজকল্যাণের চিন্তা। দেশের উন্নয়নের চিন্তা। মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার চিন্তা। দেশের সমস্যা সমাধানের চিন্তা। ক্লাসে শিক্ষার্থীদের পড়াবার চিন্তা। নতুন গবেষণা প্রকল্প তৈরির চিন্তা। নতুন স্বপ্ন দেখার ও দেখাবার চিন্তা। শিক্ষার্থীদের মাধ্যমে নিজের স্বপ্ন বাস্তবায়নের চিন্তা। আর কোনো পেশাজীবীকে এত বেশি চিন্তা করতে হয় না। এ কারণে শিক্ষকতা পেশাটা ব্যতিক্রমী।

শিক্ষক হতে চাইলে কেবল পরীক্ষায় ভাল রেজাল্ট করলে হয় না। বিখ্যাত বা বিদ্বান হলে হয় না। খ্যাতিমান গবেষক হলে হয় না। অনেক লেখালেখি ও প্রকাশনা করলে হয় না। শিক্ষকতাকে ফুলটাইম পেশা হিসেবে নিলে হয় না। ভাল শিক্ষক হতে হলে শিক্ষকতাকে নেশা হিসেবে নিতে হয়। নেশাগ্রস্থ না হয়ে কারো পক্ষে ভাল শিক্ষক হওয়া সম্ভব না। এ নেশা হলো শিক্ষার্থীদের মন জয়ের নেশা। তাদের কল্যাণ চিন্তার নেশা। নিজে শিখবার নেশা। শিক্ষার্থীদের শিখাবার নেশা। নতুন গবেষণা ও প্রকাশনা করার নেশা। শিক্ষার্থী ও সহকর্মীদের ওপর নিরপেক্ষ থেকে সুবিচার করার নেশা। অর্পিত একাডেমিক দায়িত্বপালনে নিষ্ঠাবান হওয়ার নেশা। ন্যায়নিষ্ঠ থেকে সকল শিক্ষার্থীকে নিরপেক্ষভাবে দেখা ও তাদেরকে একই মাত্রায় ভালোবাসার নেশা।

শিক্ষকতার জীবন কেবল বিশ্রামহীন নয়, চ্যালেঞ্জিংও বটে। এ চ্যালেঞ্জ হলো একাডেমিক দায়িত্বপালনে শৃংখলা প্রতিষ্ঠার চ্যালেঞ্জ। এমন চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় ভীত হলে এ পেশায় না আসা ভাল। ইউরোপ আমেরিকার খ্যাতিমান বিশ্ববিদ্যালয়গুলোয় অনেকে শিক্ষকতায় এলেও তাদের মধ্যে কমজনই এ পেশায় টিকে থাকতে পারেন। বাকিরা চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় ব্যর্থ হয়ে শিক্ষকতা ছেড়ে অন্য পেশায় চলে যান। এ কারণে শিক্ষকতা পেশার গুরুত্ব বেশি। শিক্ষক ভাল হলে ভাল ছাত্র তৈরি হয়। দেশ ভাল পেশাজীবী, নেতা ও প্রশাসক পায়। আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন তরান্বিত হয়। গণতন্ত্র সুস্থ ও নিরাপদ থাকে। এ কারণে যাঁরা এ পেশায় আসবেন, বা যাঁরা এ পেশায় আছেন, তাঁদের জন্য ভাল শিক্ষক হওয়ার কৌশলগুলো জানা জরুরি। বাংলাদেশে বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদানকারী শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ ছাড়াই শ্রেণিকক্ষে পাঠদানের জন্য পাঠানো হয়। ফলে শ্রেণিকক্ষের নতুন পরিবেশে অনেকে ভাল করে পাঠদান করতে পারেন না। এ সব নতুন শিক্ষকদের যদি ভাল শিক্ষক হবার কৌশলগুলো আগে থেকে জানা থাকে, তাহলে তারা এ পেশায় ভাল করতে পারবেন।

ভাল শিক্ষক হতে হলে শিক্ষাঙ্গণের সংস্কৃতি ও পরিবেশ জানা জরুরি। এছাড়া শিক্ষকের কর্মকাণ্ড ও শিক্ষকতার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য আগে থেকে জেনে রাখা ভাল। তাহলে শিক্ষকের পক্ষে এ পেশায় ভাল করা সহজ হয়। এসব দিক ভেবে শিক্ষকদের কর্মময় জীবন ও পেশাগত চ্যালেঞ্জ মোকাবিলার কলাকৌশল এবং সাফল্য-ব্যর্থতা এ গ্রন্থে উপস্থাপন করা হয়েছে। শিক্ষক হওয়ার স্বপ্ন, উচ্চতর

ডিগ্রি অর্জনের অভিজ্ঞতা, গবেষণা প্রকাশনা করা, লেকচার ও টিউটোরিয়াল আকর্ষণীয় করা এবং বিভাগীয় সভাপতি হিসেবে একাডেমিক ও কো-কারিকুলার দায়িত্ব পালনের কৌশলগুলো এ গ্রন্থে আলোচিত হয়েছে। তুলে ধরা হয়েছে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর ক্যাম্পাস সংস্কৃতির স্বরূপ, শিক্ষকদের ছুটিকালীন সময়ের কর্মভঙ্গিমা এবং করোনাকালীন ভার্চুয়াল ক্লাস নেবার অভিজ্ঞতা। ফলে শিক্ষকতা পেশায় আগ্রহীরা এ গ্রন্থটি পড়ে এ পেশায় আসলে উপকৃত হবেন। আর যারা এ পেশায় আছেন, তাঁরা গ্রন্থটি পড়লে অধিকতর সফল হবার কলাকৌশল শিখতে পারবেন। শিক্ষকতায় আসতে আগ্রহী অথবা শিক্ষকতা করছেন, এমন সবার জন্য বইটি উপকারী হবে। গ্রন্থটি শিক্ষকদেরকে অধিকতর দায়িত্বপরায়ন ও জনপ্রিয় হতে প্রণোদনা জোগাবে।

এ গ্রন্থটিকে আত্মজীবনী বললে বলা যায়। তবে সনাতনি আত্মজীবনী না বলে শিক্ষাবিষয়ক আত্মজীবনী বা 'একাডেমিক অটোবয়োগ্রাফি' বলা যুক্তিসঙ্গত। লেখক হিসেবে আমি একটি একাডেমিক আত্মজীবনী রচনার চেষ্টা করেছি। অবসর গ্রহণ করে শেষজীবনে আত্মজীবনী লেখার সনাতনি ধারণায় আমি অবিশ্বাসী। এ জন্য গ্রন্থটি লেখা শুরু করি ২০১৫ সালে। কাজের অবসর এবং ছুটিকালীন সময় ব্যবহার করে লিখতে থাকি। করোনা ভাইরাসের সংক্রমণকালীন গৃহবন্দি অবস্থায় নিরবচ্ছিন্ন সময় পাওয়ায় ২০২১ সালে লেখার কাজ শেষ হয়। অধিকাংশ আত্মজীবনীকারগণ তাদের রচনায় সারা জীবনের সাফল্য-ব্যর্থতার ঘটনা ধারাবাহিকভাবে তুলে ধরেন। আমার তেমন ইচ্ছে না থাকায় জীবনের সবকিছু এ গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত করিনি। পরিবর্তে, কেবলমাত্র শিক্ষকতা এবং শিক্ষার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কর্মকাণ্ড ও অভিজ্ঞতা তুলে ধরেছি। তবে সে কাজ করতে গিয়ে যতটুকু ব্যক্তিগত জীবন না আনলেই নয়, তা সংক্ষিপ্তাকারে কতিপয় অধ্যায়ে সন্নিবেশিত করেছি। সে ক্ষেত্রেও একাডেমিক বিষয়গুলোকে প্রাধান্য দিয়েছি।

গ্রন্থটিতে যে আমার জীবনের অনেকটাই বাদ পড়েছে এমন নয়। কারণ, আমার মত রাজনৈতিক বর্ণ-পরিচয়হীন পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকের জীবন ঘটনাবহুল ও বর্ণাঢ্য নয়। দলীয় পরিচয় না থাকায় অনেক শিক্ষকের মত আমি বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন পর্ষদে কাজ করে অভিজ্ঞতা অর্জনের সুযোগ পাইনি। ফলে গ্রন্থটি আমার সীমিত অভিজ্ঞতার ওপর ভিত্তি করে রচিত হয়েছে। অনেক আত্মজীবনীকার জীবনকাহিনীর পাশাপাশি তাদের রচনায় সমসাময়িক জাতীয় ও বৈশ্বিক ঘটনাবলী বিস্তারিতভাবে উপস্থাপন করেছেন। আমি সচেতনভাবে তা করিনি। তবে শিক্ষাজীবনকে ব্যাহতকারী বিষয়গুলো আমার আলোচনায় এসেছে। আমি গ্রন্থের পরিশিষ্টে অনেক ছবি ও তথ্যাদি ব্যবহার করে উপস্থাপিত বক্তব্যের গ্রহণযোগ্যতা প্রতিষ্ঠিত করেছি। ভারতীয় আত্মজীবনীকারগণের অনেকেই তাদের গ্রন্থের শরীরে ছবি ব্যবহার করেন। বাংলাদেশেও কেউ কেউ এ ধারায় আত্মজীবনী লিখেছেন। শেখ মুজিবুর রহমানের *অসমাপ্ত আত্মজীবনী* গ্রন্থের

শরীরে ছবি ব্যবহারে একই ধারা অনুসৃত হয়েছে। বহুলপঠিত এ গ্রন্থটির ১৩টি পৃষ্ঠায় বঙ্গবন্ধুর নিজ হাতে লেখা খাতার পাণ্ডুলিপি থেকে ১৪টি পৃষ্ঠার ছবি উপস্থাপিত হয়েছে।[১] আমার এ গ্রন্থে অনেক ছবি এবং তথ্য ব্যবহৃত হলেও সেগুলো গ্রন্থের শেষে পরিশিষ্টে সন্নিবেশিত করা হয়েছে।

এ গ্রন্থ লিখতে উৎসাহদাতাদের কৃতজ্ঞতা জানাই। বিভাগীয় শিক্ষক-শিক্ষার্থী ও কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ আমাকে তথ্য-উপাত্ত দিয়ে সহযোগিতা করেছেন। বাংলাদেশের চট্টগ্রাম, কানাডার ওয়াটারলু, অস্ট্রেলিয়ার সিডনি, আমেরিকার এমআইটি ও হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের কিছুসংখ্যক শিক্ষার্থী এবং কতিপয় শিক্ষক আমাকে বিভিন্ন একাডেমিক বিষয়ে জানতে ও বুঝতে সহায়তা করেছেন। তাঁদের কাছে ঋণী রইলাম। জাতীয় সাহিত্য প্রকাশ-এর স্বত্বাধিকারী জনাব কমলকান্তি দাস গ্রন্থটির আগ্রহী প্রকাশক হওয়ায় তার প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাই। সযত্ন পেজ মেকিং এবং প্রুফ রিডিং করার জন্য যথাক্রমে মো. মিজানুর রহমান সরকার এবং ফিরোজ আহসান ভাইদের প্রতিও আমি বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ। বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকগণ এ গ্রন্থ পাঠ করে তাঁদের পেশাগত দায়বদ্ধতার জায়গায় নিষ্ঠাবান হলে আমার এ লেখার উদ্দেশ্য সফল হবে।

মুহাম্মদ ইয়াহ্ইয়া আখতার, পিএইচডি
অধ্যাপক, রাজনীতিবিজ্ঞান বিভাগ
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়।
akhtermy@gmail.com

---

১. দেখুন, শেখ মুজিবুর রহমান, *অসমাপ্ত আত্মজীবনী* (ঢাকা: ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ২০১২) পৃষ্ঠা-xiv, ২, ৪, ৫৮, ৬২, ৮৪, ৯৪, ১২৪, ২০২, ২০৮, ২৫৪, ২৭৪, ২৮৪।

পরিভাষা পরিচিতি

আইকিউএসি	ইন্সিটিটিউশনাল কোয়ালিটি অ্যাসিওরেন্স সেল
আইজিপি	ইন্সপেক্টর জেনারেল অব পুলিশ
আইটি	ইনফরমেশন টেকনলজি
আইবিএ	ইন্সটিটিউট অব বিজনেস ম্যানেজমেন্ট
আইবিএস	ইন্সটিটিউট অব বাংলাদেশ স্টাডিজ
আইভিপি	ইন্টারন্যাশনাল ভিজিটরস প্রোগ্রাম
আইসিএসি	ইন্ডিপেন্ডেন্ট কমিশন এগেইনস্ট করাপশন
আইসিইডিসিআর	রোগতত্ত্ব, রোগ নিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা ইন্সটিটিউট
ইআরপিপি	ইমার্জেন্সি রেসপন্স অ্যান্ড প্যান্ডেমিক প্রিপেয়ার্ডনেস
ইউএসআইডি	ইউনাইটেড স্টেটস এজেন্সি ফর ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট
ইউএসএইড	দ্য ইউনাইটেড স্টেটস এজেন্সি ফর ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট
ইউজিসি	ইউনিভার্সিটি গ্রান্টস কমিশন
ইউটিএস	ইউনিভার্সিটি অব টেকনলজি
ইউপি	ইউনিয়ন পরিষদ
ইউল্যাব	ইউনিভার্সিটি অব লিব্যারাল আর্টস
ইডাব্লিউজি	ইলেকশন ওয়ার্কিং গ্রুপ
ইভিএম	ইলেকট্রনিক ভোটিং মেশিন
ইসি	ইলেকশন কমিশন
এ লেভেল	অ্যাডভান্সড লেভেল
এএইচডিপিএইচ	এ এইচ ডেভেলপমেন্ট পাবলিশিং হাউস
এনআইডি	ন্যাশনাল আইডেন্টিটি কার্ড
এনওসি	নো অবজেকশন সার্টিফিকেট
এনজিও	নন গভর্নমেন্ট অর্গানাইজেশন
এনডিআই	ন্যাশনাল ডেমোক্রেটিক ইন্সটিটিউট ফর ইন্টারন্যাশনাল অ্যাফেয়ার্স
এমআইটি	ম্যাসাচুসেটস ইন্সটিটিউট অব টেকনলজি
এমওইউ	মেমোরেন্ডাম অব আন্ডারস্ট্যান্ডিং
এমবিএ	মাস্টার অব বিজনেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন
এলপিআর	লিভ প্রিপারেটরি টু রিটায়ারমেন্ট
এসএ	সেলফ অ্যাসেসমেন্ট

এসএসি	সেলফ অ্যাসেসমেন্ট কমিটি
এসটিএস	সেকেন্ডারি ট্রান্সফার স্টেশন
ও লেভেল	অর্ডিনারি লেভেল
ওএমবি	অফিস অব ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড বাজেট
ওপিআরএস	ওভারসিজ পোস্টগ্রাজুয়েট রিসার্চ স্কলারশিপ
কেডিএ	খুলনা ডেভেলপমেন্ট অথরিটি
কেসিসি	খুলনা সিটি কর্পোরেশন
কোভিড	করোনা ভাইরাস ডিজিজ
জাসদ	জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল
জিকেজি	জোবেদা খাতুন হেলথ কেয়ার
টিআইবি	ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
টিএসসি	ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্র
ড্যাপ	ডিটেইল্ড এরিয়া প্ল্যান
ডানিডা	ডেনিশ ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট এজেন্সি
ডিইউএসএস	ঢাকা ইউনিভার্সিটি সিঙ্গেল সোসাইটি
ডিজিএফআই	ডাইরেক্টরেট জেনারেল অব ফোর্সেস ইন্টেলিজেন্স
ডিসিসি	ঢাকা সিটি কর্পোরেশন
দুদক	দুর্নীতি দমন কমিশন
পিআইবি	প্রেস ইন্সিটিটিউট অব বাংলাদেশ
পিএটিসি	পাবলিক অ্যাডমিনিস্ট্রেশন ট্রেনিং সেন্টার
পিডিবি	পাওয়ার ডেভেলপমেন্ট বোর্ড
পিপিই	পারসোনাল প্রোটেকটিভ ইকুইপমেন্ট
বিএমএ	বাংলাদেশ মিলিটারি একাডেমি
বিবিসি	ব্রিটিশ ব্রডকাস্টিং কর্পোরেশন
ভিআইপি	এ ভেরি ইমপর্টেন্ট পারসন
সিআইইউ	চট্টগ্রাম ইন্ডিপেন্ডেন্ট ইউনিভার্সিটি
সিইউডিএস	চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ডিবেটিং সোসাইটি
সিইসি	চিফ ইলেকশন কমিশনার
সিএসসিআর	সেন্টার ফর স্পেশালাইজড কেয়ার অ্যান্ড রিসার্চ
সিডিসি	সেন্টার ফর ডেভেলপমেন্ট কমিউনিকেশন
সিসিটিভি	ক্লোজড সার্কিট টেলিভিশন
সুজন	সুশাসনের জন্য নাগরিক
সুমসা	সিডনি ইউনিভার্সিটি মুসলিম স্টুডেন্টস অ্যাসোসিয়েশন

এক
ছাত্র থেকে শিক্ষক

শিক্ষা মানব জীবনকে আলোকিত করে। জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা ও সৃষ্টিশীলতার জগতে প্রবেশের নতুন জানালা খুলে দেয়। শিক্ষার বিস্তার সামাজিক অন্ধকার দূর করে। সমাজের শরীরে আলো ছড়িয়ে দেয়। দেশে শান্তি ও উন্নয়ন প্রতিষ্ঠায় ইতিবাচক ভূমিকা রাখে। শিক্ষার উন্নয়ন আন্তর্জাতিক সমাজে একটি দেশকে মাথা উচু করে দাঁড়াতে সহায়তা করে। এজন্য শিক্ষার গুরুত্ব এতো বেশি। শিক্ষা বিস্তারে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পালন করে অগ্রণী ভূমিকা। শিক্ষাঙ্গণের মূল প্রাণভোমরা হলেন শিক্ষক ও শিক্ষার্থী। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে এরাই প্রাণবন্ত করে রাখেন। শিক্ষকগণ হলেন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধান স্তম্ভ। তাঁরা হলেন মানুষ গড়ার কারিগর। শিক্ষকগণ দেশ পরিচালনার জন্য আদর্শ ও দেশপ্রেমিক শিক্ষিত নাগরিক তৈরি করেন। এ কারণে সকল দেশে শিক্ষকতাকে মহান পেশা হিসেবে গণ্য করা হয়। শিক্ষকতা পেশায় কাজ করার আনন্দ অন্য রকম। শিক্ষকগণ সারাজীবন তরুণ ও যুববয়সী শিক্ষার্থীদের সঙ্গে সময় কাটান। তাঁরা শিক্ষার্থীদেরকে কেবলমাত্র পাঠদান করেন না। তাঁরা তাদের স্বপ্ন দেখান। সততার সঙ্গে কাজ করার স্বপ্ন। উন্নয়ন অর্জনের স্বপ্ন। নিজের বেদনার জায়গাগুলো পার হয়ে সফলতায় পৌঁছে যাবার আনন্দময় স্বপ্ন। উন্নত বিশ্বের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করে এগিয়ে যাবার স্বপ্ন। প্রযুক্তি ও পরিবর্তনের সঙ্গে একাত্ম হওয়ার স্বপ্ন। জ্ঞান অর্জন ও বিতরণের স্বপ্ন। বিপন্ন মানবতার পাশে দাঁড়াবার স্বপ্নসহ আরো অনেক স্বপ্ন।

শিক্ষকগণ ভবিষ্যৎ নেতা ও দেশ পরিচালক তৈরি করেন। তাঁরা দেশের এবং বিশ্ব সমাজের জন্য শিক্ষার্থীদের যোগ্য করে গড়ে তোলেন। দায়িত্বপরায়ন ও নিষ্ঠাবান শিক্ষককে এ কারণে শিক্ষার্থীরা 'বন্ধু, দার্শনিক এবং পথ প্রদর্শক' হিসেবে গ্রহণ করেন। শিক্ষাগ্রহণ প্রক্রিয়ায় প্রাথমিক শিক্ষা যেমন জরুরি, উচ্চশিক্ষাও তেমনি প্রয়োজনীয়। উচ্চশিক্ষার মধ্য দিয়ে একটি দেশ সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঘটিয়ে বিশ্বসমাজের সঙ্গে তাল মিলিয়ে এগিয়ে যায়। এ কারণে সরকারের উচিত শিক্ষাক্ষেত্রকে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব প্রদান করা। শিক্ষার গুণগত মান বৃদ্ধির চেষ্টা অব্যাহত রাখা। শিক্ষাঙ্গণে বিরাজিত অব্যবস্থাপনা, অনিয়ম, দলীয় রাজনীতির লেজুড়বৃত্তি, সুশাসনের ঘাটতি ও দুর্নীতি দূর করা। শিক্ষাঙ্গণে জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার একাডেমিক পরিবেশ সৃষ্টি করা ও বজায় রাখা। এ ক্ষেত্রে

নিয়মতান্ত্রিকতা, উন্নয়ন, পেশাদারিত্ব, স্বচ্ছতা সুশাসন এবং একাডেমিক পরিবেশ প্রতিষ্ঠা করা।

শিক্ষকতা অন্য দশ-পাঁচটি চাকুরির মতো সাধারণ পেশা নয়। এ মহান পেশায় আগত ব্যক্তিগণের ধনকুবের হবার স্বপ্ন থাকে না। তাঁরা ব্যাপক বিত্ত-বৈভব অর্জন করে রাতারাতি গাড়ি বাড়ির মালিক হবার জন্য এ পেশা গ্রহণ করেন না। তাঁরা একটা স্বপ্ন নিয়ে এ পেশায় আসেন। একটি ব্রত নিয়ে আসেন। সমাজ ও দেশের উন্নয়নের স্বপ্ন নিয়ে সে সব স্বপ্ন বাস্তবায়নের জন্য এ পেশাকে বেছে নেন। এ কারণে নিষ্ঠার সঙ্গে দায়িত্ব পালনকারী শিক্ষকগণ সমাজে সমাদৃত হন। নাগরিক সমাজের সদস্যরা তাঁদের সম্মান করেন। শিক্ষার্থীরা তাঁদের মাথায় করে রাখেন। শিক্ষকতার দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে শিক্ষকগণ কেবল জ্ঞান বিতরণ করেন না। তাঁরা গবেষণার মধ্য দিয়ে নতুন জ্ঞান সৃষ্টি করেন। উল্লেখ্য, বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে শিক্ষকদের দু'টি কাজ বাধ্যতামূলকভাবে করতে হয়। কাজদু'টি হলো, শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার্থীদের পাঠদান এবং গবেষণা ও প্রকাশনার মাধ্যমে নতুন জ্ঞান সৃষ্টি করা। এ দু'টি কাজ ছাড়া শিক্ষক আরও অনেক কাজ করতে পারেন। তাতে কোনো বাধা নেই। তবে ওই কাজগুলো একজন বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকের মূখ্য কাজ নয়। যেমন, বর্ণের আবরণে জাতীয় দলীয় রাজনীতির লেজুড়বৃত্তি করা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকদের মূখ্য কাজ নয়। তবে বিষয়টি জেনেও সাম্প্রতিককালে বড় সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর কিছুসংখ্যক শিক্ষক একাডেমিক কাজের চেয়ে রাজনৈতিক কাজে অধিক সক্রিয়। এদের কেউ কেউ ভিসি ও প্রো-ভিসি থেকে শুরু করে বিভিন্ন পদ-পদবি পাবার জন্য জাতীয় দলীয় রাজনীতির লেজুড়বৃত্তিতে সক্রিয়। এর ফলে একাডেমিক চরিত্র ম্লান হয়ে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর রাজনৈতিক চরিত্র প্রকট হয়ে উঠেছে। বিষয়টি শিক্ষার অগ্রগতির জন্য অশুভ সংবাদ। বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকদের উচিত, বিশ্ববিদ্যালয়ের রাজনৈতিক চরিত্র ম্লান করে জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চা ও গবেষণার মাধ্যমে এর একাডেমিক ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করা।

উদ্দেশ্য ও উপকারিতা

এ গ্রন্থে একজন বর্ণহীন সরকারি বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকের নৈমিত্তিক একাডেমিক জীবনযাপনের চিত্র উপস্থাপন করা হয়েছে। তুলে ধরা হয়েছে তাঁর শিক্ষাগত জীবনের ঘটনাবলি ও অভিজ্ঞতা। ছাত্রাবস্থা থেকে একজন শিক্ষার্থী শিক্ষক হয়ে উঠে কিভাবে শিক্ষকতা জীবন নির্বাহ করেন, সে বিষয়গুলো এ গ্রন্থে উপস্থাপিত হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকতায় যোগদানের পর ক্লাস নেয়া, গবেষণা ও প্রকাশনা করা এবং উচ্চতর ডিগ্রি অর্জনের লক্ষ্যে উচ্চশিক্ষা গ্রহণের বিভিন্ন অভিজ্ঞতা এ গ্রন্থে সবিস্তারে আলোচনা করা হয়েছে। বিভিন্ন দেশে উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করতে গিয়ে একজন শিক্ষক অপরিচিত পরিবেশ, সমাজ এবং ভিন্ন সংস্কৃতির লোকজনের সঙ্গে কিভাবে কাজ করেন, সে সব অভিজ্ঞতাও এ গ্রন্থের আলোচনায়

উঠে এসেছে। তবে লেখাপড়া ছাড়াও এ গ্রন্থে শিক্ষকের বিদেশে থাকাকালীন ছাত্র হিসেবে খণ্ডকালীন কর্মজীবনের অভিজ্ঞতাও উপস্থাপিত হয়েছে। বিদেশীদের কাছে নিজের দেশকে ইতিবাচকভাবে উপস্থাপনের কৌশলী বর্ণনাও এ গ্রন্থে স্থান পেয়েছে। একজন শিক্ষক বিভাগীয় সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করাকালীন যে সব সুবিধা-অসুবিধার সম্মুখীন হন, উদ্ভূত পরিস্থিতি মোকাবিলায় যে সকল কলাকৌশল অবলম্বন করেন, সে বিষয়গুলোও আলোচনায় অন্তর্ভুক্ত হয়েছে এ গ্রন্থে। উপস্থাপিত হয়েছে বিভাগীয় সভাপতি হিসেবে কৃতকার্যতার সঙ্গে বিভাগ পরিচালনার কলাকৌশল। ফলে গ্রন্থটি পাঠের মধ্য দিয়ে আগামী দিনের বিভাগীয় সভাপতিগণ বিভাগ পরিচালনায় অধিকতর পেশাদারিত্ব অর্জন করতে পারবেন। যারা নতুন শিক্ষক হিসেবে বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দিবেন, গ্রন্থটি তাদেরকে একজন পেশাদার শিক্ষক হয়ে উঠতে প্রয়োজনীয় তথ্য সরবরাহ করবে। ভালো গবেষক হবার জন্য, একাডেমিক গবেষণা ও প্রকাশনা করার জন্য এবং বিভাগীয় সভাপতি হিসেবে পেশাদারিত্ব অর্জনের জন্য এ গ্রন্থটি শিক্ষকদেরকে কৃতকার্য হবার দিকনির্দেশনা প্রদান করবে। গ্রন্থটিতে লেখকের চার দশক সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতার অভিজ্ঞতার প্রাসঙ্গিক বিষয়াবলির চুম্বকাংশ উপস্থাপন করা হয়েছে। যদিও এ গ্রন্থের মূল উদ্দেশ্য হলো একজন সাধারণ জীবন যাপনকারী রাজনৈতিক বর্ণ-পরিচয়হীন বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকের একাডেমিক জীবনের ওপর আলোকপাত করা, তবুও গ্রন্থটির কতিপয় অধ্যায়ে অত্যন্ত সংক্ষিপ্তভাবে শিক্ষকের ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও পারিপার্শ্বিক জীবনের ওপর সংক্ষিপ্ত আলোকপাত করা হয়েছে। তবে সে আলোচনায়ও শিক্ষাসংক্রান্ত বিষয়কে প্রাধান্য দেয়া হয়েছে। কাজেই যাঁরা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকতাকে পেশা হিসেবে বেছে নিতে চান তাঁদের জন্য গ্রন্থটি উপকারী হবে। আবার যাঁরা শিক্ষাজগত এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবেশ, রাজনীতি ও এর অন্দরমহল সম্পর্কে জানতে বুঝতে চান তেমন পাঠকদের জন্যও গ্রন্থটি সহায়ক হবে।

ছাত্র থেকে শিক্ষক

শৈশবের কথা আমার খুব বেশি স্মরণে নেই। এটুকু জানি, বাবা রেলওয়ে স্টেশন মাস্টারের চাকুরি করার কারণে আমার জন্ম হয়েছিল নারায়নগঞ্জের ফতুল্লা রেল স্টেশনের সরকারি কোয়ার্টারে। সাল ও সঠিক তারিখ বলতে পারব না। অনুমান করে বললে ভুল হতে পারে। তবে এসএসসি সার্টিফিকেট অনুযায়ী আমার জন্ম তারিখ ১৯৫৭ সালের ২৮ অক্টোবর। আমার ধারণা, এ তারিখটি আমার প্রকৃত জন্ম তারিখ নাও হতে পারে। কারণ, ওই সময় স্কুলে এসএসসি পরীক্ষার ফরম পূরণের সময় অনেকক্ষেত্রে বয়স কমিয়ে বা বাড়িয়ে জন্ম তারিখ লেখা হতো। আর আমার জন্ম হাসপাতালের পরিবর্তে রেলওয়ে কোয়ার্টারে হওয়ায় আমার কোনো জন্ম সনদপত্র নেই। তবে আমার মনে হয়, আমার সার্টিফিকেটে উল্লেখিত তারিখে বা তার সামান্য আগে বা পরে কোনো একদিন আমি জন্মগ্রহণ

করেছিলাম। আমার আব্বার লেখাপড়া কলকাতার হুগলী মাদ্রাস থেকে এন্ট্রাস পাস পর্যন্ত। তখন মাদ্রাসায় লেখাপড়া ভালো হত। তিনি শুদ্ধ ইংরেজি বলতে ও লিখতে পারতেন। উর্দু ভাষায়ও তাঁর দখল ছিল। আমার দাদাবাড়ি ছিল তৎকালনী খুলনা জেলার মোল্লাহাট থানার অন্তর্গত চরকুলিয়া ইউনিয়নের নতুন ঘোষগাতী গ্রামে। দাদাজান কৃষক ছিলেন। আব্বারা ছিলেন ৯ ভাই এক বোন। এর মধ্যে দু'ভাই অবিবাহিত অবস্থায় মারা যান। বাকি সাত ভাই ও এক বোনের সব মিলিয়ে ছেলেমেয়ের সংখ্যা ৪১জন। এ সব চাচা, ফুফু এবং তাঁদের ছেলেমেয়েসহ পিতৃকুলের অন্যান্য আত্মীয়স্বজনদের সঙ্গে আমার দেখা-সাক্ষাৎ হত না। কারণ, আমার আব্বা মাঝেমধ্যে গ্রামে গেলেও আমাদেরকে সঙ্গে নিতেন না। এর একটি কারণ হলো, তখন দাদাবাড়ি যাওয়ার পথ দুর্গম ছিল। প্রথমে খুলনা থেকে লঞ্চযোগে গাংনী যেতে হত। সেখান থেকে মাটির রাস্তায় অনেক দুর পায়ে হেঁটে দাদাবাড়ি পৌঁছতে হত। যাত্রাটা ছিল কষ্টের। এ কারণে আমি কিশোর থাকাকালীন আমার পিতৃকুলের আত্মীয়স্বজনদের কম চিনতাম।

আমার আব্বা খুলনা শহরের বনেদি পরিবারে বিয়ে করেন। তাঁর বিয়ের সময় আমার আম্মার বয়স ছিল ১৩ বছর। আমার আম্মা স্কুলে নবম শ্রেণি পর্যন্ত লেখাপড়া করেছিলেন। আম্মার দাদা হাজী ইসমাইল জমিজমাসূত্রে সম্পদশালী ব্যক্তি ছিলেন। আমার নানা ছিলেন শেখ হাতেম আলী। তিনি খুলনায় থেকে কোলকাতার সঙ্গে নারকেলের ব্যবসা করতেন। খুলনা বড় বাজারে রেল লাইনের কাছে তাঁর নারকেলের আড়ৎ ছিল। কেলকাতার নারকেলডাঙ্গা রোডে ছিল একটি দোতলা বাড়ি। আমার নানি ছিলেন ফুলতলা উপজেলার মেয়ে। তিনি ছিলেন নানাজানের দ্বিতীয় স্ত্রী। আম্মারা ছিলেন পাঁচ ভাইবোন। এদের মধ্যে বড় মামা শেখ আবু আহমেদ রাজনীতি করতেন। মুসলীম লীগ থেকে একাধিকবার চেয়ারম্যান নির্বাচিত হয়েছিলেন। পাকিস্তান আমলে তিনি বিশিষ্ট মুসলীম লীগ নেতা খান এ সবুরের ঘনিষ্ঠভাজন ছিলেন। পাঁচ ভাইবোনের মধ্যে আমার আম্মা ছিলেন তৃতীয়। আমার ছোটো মামা শেখ আলী আহমেদ ছিলেন অসাধারণ গুণী ব্যক্তিত্ব। তিনি একদিকে ছিলেন নামকরা ফুটবল খেলোয়াড়, খ্যাতিমান নাট্যশিল্পী, খুলনা রেডিওর 'এ' গ্রেডের সংগীতশিল্পী এবং চিত্রশিল্পী। তিনি পাকিস্তান জাতীয় ফুটবল দলে খেলেছেন। তার পাঁচ ছেলে ও দুই মেয়ের মধ্যে প্রায় সব ছেলেরা ফুটবল খেললেও মেজ ছেলে শেখ মোহাম্মদ আসলাম ঢাকার আবাহনী ও মোহামেডান ক্লাবের খ্যাতিমান স্ট্রাইকার ছিলেন। আমার আম্মা ও দুই খালা ছিলেন গৃহিণী। বড় খালার খুলনা শহরের বয়রার বাড়িতে আমি খুলনা জংশন স্টেশনের কোয়ার্টারে থাকতে বাতাবি লেবু ও কদবেলের আকর্ষণে প্রায়ই যেতাম। তাঁদের বাঁশ ঝাড় থেকে কঞ্চি কেটে এনে মাছ ধরার ছিপ তৈরি করতাম। খালাতো ও মামাতো ভাইবোনদের ২৯ জনের সবাইকে খুলনায় থাকার কারণে আমি চিনতাম। খালাতো এবং মামাতো বোনদের অধিকাংশই ছিলেন নিজ নিজ সংসারে গৃহিনী। বড় মামার বড় ছেলে আনোয়ারুল কাদির খোকন বিএনপি রাজনীতির

সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তিনি এক সময় বিএনপি নেতা ও জাতীয় সংসদের স্পিকার শেখ রাজ্জাক আলীর ঘনিষ্ঠভাজন ছিলেন। মামার ছোটো ছেলে শেখ আফজালুর রহমান মুক্তিযোদ্ধা। সরকারি কলেজে শিক্ষকতা করে অবসর গ্রহণ করেন। বড় খালার বড়ছেলে শেখ দবিরুল ইসলাম বয়রা অঞ্চলের কমিশনার ছিলেন। আমার নানাবাড়ি খুলনার গোবরচাকা গ্রামে। শহরের পল্লীমঙ্গল হাই স্কুলের পেছনে অবস্থিত এ বাড়িটি হাজিবাড়ি নামে সমধিক পরিচিত। আমার নানার দুই বিয়ের প্রভাব মামাদের ওপর পড়েছিল। এরা দু'জনই গোপনে দ্বিতীয় বিয়ে করেছিলেন। কিন্তু প্রথম স্ত্রী ও বড় বড় ছেলেমেয়ের মধ্যে তাদের দ্বিতীয় স্ত্রী পারিবারিক বা সাংসারিকভাবে স্বীকৃতি না পেয়ে পৃথকভাবে বসবাস করেছেন। বড় মামার সনাতন ধর্মাবলম্বী দ্বিতীয় স্ত্রী ধর্মান্তরিত হন। অমায়িক ব্যবহারের এ মামি মাঝেমধ্যে আমাদের বাসায় আসতেন। আমাদেরকে নিজ সন্তানের মতো ভালোবাসতেন। একবার ঈদের সময় আমাদের দু'ভাইকে দামি কাপড়ের পাঞ্জাবি উপহার দিয়েছিলেন। তিনি হাসপাতালে সেবিকার চাকুরি করতেন এবং নিঃসন্তান ছিলেন। তবে ছোটো মামার দ্বিতীয় স্ত্রীর ২ সন্তান আছে। আমি নিজে বড় মামার দ্বিতীয় স্ত্রীকে বহুবার দেখেছি। তবে ছোটো মামার দ্বিতীয় স্ত্রী বা ওই ঘরের এক ছেলে ও এক মেয়েকে আমি কখনো দেখিনি। এ প্রসঙ্গ আর বিস্তারিত করব না।

হাজিবাড়ির আত্মীয়স্বজনদের সামাজিক নামডাক থাকলেও এদের মধ্যে একটি নেতিবাচক বৈশিষ্ট্য ছিল। এদের অনেকেই মেয়েদেরকে সম্পত্তির অধিকার থেকে বঞ্চিত করতেন। উদাহরণ হিসেবে আমার নানা মামাদের কথা বলা যায়। আমার নানার অনেক জমিজমা ছিল। তাঁরা প্রভাবশালী ছিলেন বলেই আম্মার দাদা হাজি ইসমাইল-এর নামে খুলনায় একটি দীর্ঘ সড়কের নামকরণ করা হয়েছে। আমার নানা বিত্তশালী হলেও তিনি তাঁর মৃত্যুর পূর্বে তিন মেয়েকে কোনো জমিজমা দেননি। তাঁর মৃত্যুর পর আমার মামারাও পৈত্রিক সম্পত্তি থেকে তাঁদের তিন বোনকে বঞ্চিত করেন। এ ব্যাপারে আমি আমার খালাদের সাথে কথা বলেছি। আমার আম্মা এবং তার দু'বোনের মনে এ নিয়ে অব্যক্ত ক্ষোভ ছিল। এ বিষয়ে আমার আম্মার ভেজা চোখে দুঃখভারী কণ্ঠে পরোয়ারদিগারের দরবারে পেশকৃত আবেগঘন ফরিয়াদি বক্তব্য শুনে কষ্ট পেয়েছি। মনে এ ক্ষোভ নিয়েই মা খালারা তিনবোন পৈত্রিক সম্পত্তির অধিকারবঞ্চিত থেকেই মৃত্যুবরণ করেছেন। এ জন্য আমরা খুবই সতর্ক ছিলাম। আমি এবং আমার বড়ভাই মোস্তফা কামাল আমার আব্বার মৃত্যুর পর আমাদের তিন বোনকে শরিয়তের বিধান অনুযায়ী আমাদের সামান্য পৈত্রিক সম্পত্তি থেকে তাদের প্রাপ্য বুঝিয়ে দিয়েছি।

আমার আব্বা খুলনা শহরের বানরগাতি এলাকায় জমি কিনে বাড়ি করেন। এ বাড়িতে আমরা বড় হয়েছি। শহরে হলেও বাড়িটি ছিল গ্রামের বাড়ির মতো। এর বাহ্যিক চেহারা ছিল অনেকটা গ্রামের প্রাইমারি স্কুলের মতো। লম্বা টিন শেডের সেমি পাকা বিল্ডিং। বাড়িতে পুকুর ছিল। এখনকার কসমোপলিটন শহরের কিশোর ও তরুণদের অনেকে হয়তো ধানের গোলা বা ঢেঁকি দেখেননি। আমাদের

বাড়িতে ধানের গোলা ও ঢেঁকি ছিল। গোয়ালে গরু আর উঠানে ছিল হাস মুরগি। এ বাড়িতে আমার শৈশব কেটেছে আনন্দে। শৈশবে আমি গুলতি দিয়ে পাখি মারতাম। মাছ ধরারও নেশা ছিল আমার। গুলতির নিশানা ভালো ছিল। বুলবুলি, শালিক, কবুতর, ঘুঘু, বকসহ অনেক পাখী মেরেছি। পাখি জবাই করে তার শরীরে নুন মরিচ মাখিয়ে খড়ের আগুনে পুড়িয়ে খেয়েছি। আর কত পাখিকে যে আহত করেছি তা ভেবে এখন কষ্ট পাই। এঁটেল মাটির মার্বেল বানিয়ে রৌদ্রে শুকাতাম। পকেট ভরে সে মার্বেল নিয়ে পাখী মারতে বের হতাম। পাখি মারার ঘনিষ্ঠ সঙ্গীও জুটেছিল কয়েকজন।

মাছ ধরতাম বিভিন্নভাবে। ছিপ দিয়ে মাছ ধরতাম। খ্যাপলা জাল ফেলে পুকুরে এবং নদীতে মাছ ধরতাম। আর বর্ষাকালে বিলে চাঁই পেতে মাছ ধরতাম। পোলো দিয়েও খালে বিলে মাছ ধরেছি। আবার লাটাইয়ে দু'তিনশ গজ প্লাস্টিকের মোটা সুতা জড়িয়ে বড় বড়শিতে বিশেষ টোপ গেথে নদীতে বোয়াল মাছ ধরতাম। চাঁই হলো এক ধরনের ফাঁদ। বাশের কাঠি বানিয়ে তৈরি করা। বর্ষাকালে পাটা (বেড়ার মত বাঁশের চটা দিয়ে তৈরি) দিয়ে বিলে ধানক্ষেতে পাটার দু'পাশে দুটো চাই পেতে দিয়ে আসতাম। এর মধ্যে মাছ ঢুকলে আর বের হতে পারে না। আমার চারটে চাঁই ছিল। সকালে গিয়ে অনেক মাছ পেতাম। চিংড়ি, বেলে, কই, ট্যাংরা, শিং, মাগুর, রয়না, খলসে এবং চেলা জাতীয় মাছই বেশি থাকতো। তবে মাছের সাথে প্রায়শই সাপ থাকতো। ঢোঁড়া সাপ। মেটে সাপ। এ সব সাপে ভয় নেই। এদের বিষ থাকে না। মাছ বের করার সময় সাপের একটুখানি লেজ বের হলেই সে লেজ ধরে একটানে বের করেই সা সা করে দু'তিনবার ঘুরিয়ে হাওয়ায় ছেড়ে দিতাম। অনেক উচুতে উঠে সাপ যেখানে গিয়ে পড়তো সেখান থেকে আর চলতে পারতো না। মেরুদন্ডের জোড়া নড়বড়ে হয়ে যাওয়ায় এক জায়গায় মোড়ামুড়ি করত। মাছ ধরার সঙ্গীদের কাছ থেকে এসব শিখেছিলাম। বোয়াল মাছ ধরার টোপ বানানো শিখেছিলাম প্রতিবেশি বন্ধু এরশাদ আলী লেনের শেখ আজিজুল ইসলাম সাচ্চুর কাছ থেকে। পুঁটিমাছ পচিয়ে সে মাছের কাঁটা খুলে ফেলে ওই পচা মাছের শরীর দিয়ে এ টোপ বানাতাম। বড়ো বড়শিতে সাত আটটি মাছের শরীর গাথা লাগতো। তারপর সে টোপ নদীতে ফেলে নদীর পাড়ে ধৈর্যসহকারে সুতা ধরে অপেক্ষা করতে হত। কখন মাছ টোপ গেলে। একবার গিললেই সে মাছকে লাটাইয়ের সুতা ঢিল দিয়ে খেলিয়ে ক্লান্ত করে কুলে তুলতে পাঁচ সাত মিনিট লাগত। এ ভাবে অনেক বোয়াল মাছ ধরেছি। বিশেষ করে আষাঢ়-শ্রাবণ মাসে আকাশে মেঘ গর্জন করার সময়টি বোয়াল মাছ ধরার জন্য ভালো। একবার গল্লামারি খাল থেকে এত বড় এক বোয়াল ধরেছিলাম যা কাঁধে করে বাড়ি আনতে হয়েছিল। সাচ্চু এখন সাতক্ষীরায় থাকে। বিডিআর-এ চাকুরি করে অবসর নিয়েছে অনেক আগে। একবার সে যখন সাতক্ষীরার সখীপুর বর্ডারে কর্মরত ছিল তখন আমি এবং আমার আরেক প্রতিবেশি বাবলু ভাই মিলে তাকে দেখতে গিয়েছিলাম। আমাদের পেয়ে সে খুব খুশি হয়েছিল।

বাবুর্চিকে বলে ভারতে পাচার করতে গিয়ে ধরা পড়া ট্যাংরা মাছ ডুবোতেলে ফ্রাই করে আমাদের খাইয়েছিল। তারপর আর তার সাথে দেখা হয়নি। এখন তার ফোন নম্বর জোগাড় করেছি। মাঝেমধ্যে ফোন করে কুশল বিনিময় করি।

শৈশবের আরও অনেক পারিবারিক ঘটনা আছে। লেখাপড়ার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট একটি বিষয় উল্লেখ করব। ছাত্র হিসেবে আমার বড় ভাই ছিলেন খুবই বই পড়ুয়া। অনেক রাত জেগে লেখাপড়া করতেন। তার সুবিধার জন্য আমাদের মূল ঘর থেকে খানিকটা দূরে একটা পড়ার ঘর তৈরি করা হয়েছিল। ছোট ঘর। মুলি বাঁশের বেড়া আর গোলপাতার ছাউনি। একটি দরজা আর একটি জানালা। ঘরের আসবাবের মধ্যে একটি চেয়ার ও টেবিল, বইয়ের তাক এবং একটি সিঙ্গেল খাট। বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হবার পূর্ব পর্যন্ত আমার ভাই এ ঘরে লেখাপড়া করতেন। আমি পড়তাম মূল বাড়ির বারান্দায় তৈরি একটি ছোট ঘরে। পরে এক সময় আমার ভাইয়ের অবর্তমানে আমিও বাইরের ওই ছোট ঘরে পড়তাম। ওখানেই ঘুমাতাম। শীতকালে সকালে ঘুম ভাঙ্গলে প্রস্রাব করতে উঠতে কষ্ট হত। ঘরে বিছানার পাশে একটি লম্বা স্টিলের পাইপ থাকতো। বিছানায় শুয়েই পাইপের এক মাথা বেড়ার ফাঁক দিয়ে বাইরে গলিয়ে দিয়ে অনেক দিন হালকা হবার কাজটি সেরে নিতাম। উল্লেখ্য, পারিবারিক বিষয়গুলোর চেয়ে আমি এ গ্রন্থে একাডেমিক বিষয়গুলো গুরুত্ব দিয়ে আলোচনা করব। তবে ক্ষেত্র বিশেষে লেখাপড়ার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কিছু পারিবারিক আলোচনা বাদ দেয়া সঙ্গত হবে না।

স্কুল ও কলেজজীবন

কৈশোর থেকে শিক্ষকতার প্রতি আমার ঝোঁক ছিল। শিক্ষক হতে হলে যে পরীক্ষায় ভালো ফল করতে হয় সেটুকু বুঝ আমার ছিল। কিন্তু পরীক্ষায় ভালো করার জন্য লেখাপড়ায় যতটা মনোযোগ দেবার কথা, স্কুলে থাকাকালীন আমি পড়ালেখায় ততটা মনোযোগী ছিলাম না। তবে লেখাপড়ায় কম মনোযোগী হলেও আমার পরীক্ষাভাগ্য ভালো ছিল। পরীক্ষায় আমার ফল বরাবরই ভালো হত। এ জন্য আমার ওপর পারিবারিক সদস্যদের আস্থা গড়ে উঠেছিল। তাঁরা ভাবতেন, আমিতো পরীক্ষায় ভালো ফল করবই। এ কারণে তাঁরা আমাকে কখনো বেশি লেখাপড়া করার জন্য চাপ দিতেন না। পরীক্ষার আগে বেশি করে লেখাপড়া করতে বলতেন না। আমি প্রতিটি পরীক্ষায় যেমন ফল আশা করতাম, আমার রেজাল্ট হত তার চেয়ে ভালো। স্কুলে থাকাকালীন দু'একবার যে এর ব্যত্যয় ঘটেনি এমন নয়। এর প্রধান কারণ হলো আমি পাটিগণিতে দুর্বল ছিলাম। এ কারণে চতুর্থ শ্রেণির বার্ষিক পরীক্ষায় আমি কেবল অঙ্কে ফেল করার কারণে ২৪তম হয়েছিলাম। অন্য বিষয়গুলোতে আমি এত ভালো করেছিলাম যে গণিতে পাস নম্বর পেলে মেধা তালিকায় আমার স্থান হত দ্বিতীয়।

আমার আব্বা ছিলেন শিক্ষানুরাগী। তিনি মাদ্রাসা লাইনে লেখাপড়া করলেও ছেলেমেয়েদেরকে লেখাপড়া শিখাবার ব্যাপারে তাঁর প্রবল আগ্রহ ছিল। আমার

বড় বোনকে তিনি ক্লাস থ্রি থেকে হোস্টেলে রেখে ভালো স্কুলে পড়িয়েছেন। আমাদের পাঁচ ভাইবোনের মধ্যে বড় তিনজন অনার্স মাস্টার্স পাস করেন। বাকি দু'বোনের একজন গ্রাজুয়েট এবং আরেকজন আই এ পাস করে পিটিআই ট্রেনিং নেন। এরা দু'জনই স্কুলে শিক্ষকতা করেছেন। আমার লেখাপড়ার ব্যাপারে আব্বার একটা পরিকল্পনা ছিল। সাধারণ লাইনে কিছুটা পড়িয়ে তিনি আমাকে মাদ্রাসায় পড়াতে চেয়েছিলেন। আমাকে উচ্চশিক্ষিত মাওলানা বানাবার স্বপ্ন ছিল তাঁর। সে জন্য তিনি চেষ্টাও করেছিলেন। আমাকে খুলনা আলিয়া মাদ্রাসায় ভর্তি করে দিয়েছিলেন। সেখানে প্রথমে আমি হাফেজিয়া পড়তাম। মাদ্রাসার লিল্লাহ বোর্ডিংয়ে খাবারের মান নিম্ন হওয়ায় তিনি আমাকে প্রতিদিন তরকারি সরবরাহ করার জন্য একটি হোটেল ঠিক করে দিয়েছিলেন। আমার সঙ্গে আমার মামাতো ভাই মাসুমও (ফুটবলার আসলামের বড় ভাই) একই মাদ্রাসায় পড়তো। আমরা তখন খুলনা জংশনের রেল কোয়ার্টারে থাকতাম। আমাদের বানরগাতির বাড়ি তখনো তৈরি হয়নি। ওই সময় মাদ্রাসায় ভর্তির পর আমি ছোট মামার বাড়ি বেশ কয়েক মাস ছিলাম। তবে ছুটির সময় জংশনের কোয়ার্টারে চলে যেতাম। আমার মামিআম্মা ছিলেন অসাধারণ এক মহিলা। তাঁর হৃদয়ে মায়ের মমতার ঘাটতি ছিল না। তিনি নিজের ছেলেমেয়েদের মতো আমাকে একই রকম ভালোবাসতেন। কিন্তু কিছুদিন কোরআন হেফজ করার পর আমি মাদ্রাসার লেখাপড়ায় মন বসাতে পারিনি। মাদ্রাসায় পড়বো না বলে নানান টালবাহানা শুরু করলে আব্বা আমার মানসিকতা বুঝতে পারেন। এক পর্যায়ে তিনি আর জোরাজুরি না করে কয়েক মাসের মাদ্রাসা পাঠান্তে আমাকে আবার পঞ্চম শ্রেণিতে স্কুলে ভর্তি করে দেন। আমি ষষ্ঠ শ্রেণি থেকে স্কুল বদলে খুলনার খালিশপুর হাই স্কুলে ভর্তি হই। এ স্কুলে ছেলে এবং মেয়েরা একসাথে লেখাপড়া করত। ভৈরব নদীর পাড়ে অবস্থিত ওই স্কুলে আমি ষষ্ঠ ও সপ্তম শ্রেণি পর্যন্ত লেখাপড়া করি।

আমার সঙ্গে খালিশপুর হাই স্কুলে যারা পড়ত তাদের সবার নাম মনে নেই। একমাত্র সিরাজুল ইসলাম ব্যতীত গত ৫০ বছরে তাদের কারো সঙ্গে আমার দেখা হয়নি। অধিকাংশ সহপাঠীদের নাম ভুলে গেছি। তবে কয়েকজনের নাম এখনও মনে আছে। ছেলেদের মধ্যে সিরাজ ছাড়া সিদ্দিক, নাজমুল, ফারুক এবং মেয়েদের মধ্যে পিয়ারি, সামছুন্নাহার এবং রওশন আরা-র নাম মনে আছে। জানি না তারা কে কোথায় কেমন আছে। তবে সিরাজ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরেজিতে অনার্স-মাস্টার্স করে খুলনা পাবলিক স্কুল অ্যান্ড কলেজে ইংরেজি বিষয়ে শিক্ষকতা করত। একবার হঠাৎ তার সাথে আমার খুলনায় দেখা হয়েছিল। খালিশপুর স্কুলে সপ্তম শ্রেণির বার্ষিক পরীক্ষায় ১২০ জন ছাত্রছাত্রীর মধ্যে সিরাজ প্রথম এবং আমি দ্বিতীয় স্থান লাভ করি। ফলে এই ভালো ফল দেখিয়ে আমি খুলনার ওই সময়ের খ্যাতিমান স্কুলগুলোর মধ্যে অন্যতম সেন্ট জোসেফস হাই স্কুলে ভর্তি হওয়ার কথা ভাবি। এ লক্ষ্যে জোসেফ স্কুলের ইতালিয়ান হেডমাস্টার রেভারেন্ড ফাদার অরল্যান্ডোর সঙ্গে দেখা করি। তিনি আমার রেজাল্ট দেখে

আমাকে ভর্তি করে নিতে সম্মত হন। ফলে ক্লাস এইট থেকে এসএসসি পর্যন্ত আমি এই স্কুলে অধ্যয়ন করি।

. এ স্কুলে অধ্যয়নকালীন সময় ১৯৭০-এর নির্বাচন এবং একাত্তরের স্বাধীনতা যুদ্ধ শুরু হয়। সে স্মৃতি কিছুটা হলেও স্মরণ আছে। আমার বড় বোন রাজনীতি করার কারণে তার বিপদ হতে পারে দেখে তাকে ওই সময়ের খুলনার ছাত্রলীগ নেতা নজরুল ইসলামের সঙ্গে মা বাবা এবং পাত্র পাত্রীর সম্মতিসাপেক্ষে গোপনে বিবাহ দেয়া হয়। পরে তারা পালিয়ে ভারতে গিয়ে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। আমরা খুলনায় খুব ভয়ে থাকতাম। কারণ, যে কোনো সময়ে পাকিস্তানি সৈন্য বা রাজাকারগণ যে কোনো এলাকায় আক্রমণ করতে পারত। এ রকম অবিরত ভয়ের কারণে আমাদেরকে প্রথমে চাঁদপুরে আমার ছোট মামার শ্বশুরবাড়িতে মামাত ভাইবোনদের সঙ্গে পাঠিয়ে দেয়া হয়। পরে আমরা কিছুদিন মোল্লাহাটে আমার দাদাবাড়িতে পালিয়ে থাকি। এভাবে অনেক মাস কাটাবার পর আমরা আবার সাহস করে খুলনায় ফিরে আসি। তখনও যুদ্ধ চলছিল। একদিকে পাকিস্তানি সৈন্য এবং অন্যদিকে রাজাকার বাহিনীর ভয়ে আমরা বাড়ি থেকে বের হতাম না। আমাদের বাড়িতে বাংকার খোড়া হয়েছিল। যুদ্ধের শেষ দিকে প্রায়ই বিমান আক্রমণ হত। আমরা বিমানের শব্দ শুনলেই দৌড়ে বাংকারে ঢুকে পড়তাম। এভাবে প্রায় এক বছর ভয়াবহ সময় কাটাবার পর দেশ স্বাধীন হলো। বড় বোন এবং দুলাভাই ভারত থেকে ফিরে এলেন। স্বাধীনতার সময় খুলনায় পাকিস্তানি সৈন্যদের হত্যাযজ্ঞ ও অত্যাচারের সাক্ষি হিসেবে স্বাধীনতার পর আমার বড় ভাই গল্লামারি বধ্যভূমি থেকে অত্যাচারিত ও নিহত শহীদদের পাঁচটি মাথার খুলি আমাদের বাড়িতে নিয়ে এসেছিলেন। কিন্তু আম্মার প্রবল আপত্তির কারণে এ খুলিগুলো বেশিদিন আমাদের বাসায় রাখা সম্ভব হয়নি। স্বাধীন দেশে নতুন উদ্যমে আবার স্কুলে যাওয়া ও পড়াশুনা শুরু হয়।

সেন্ট যোসেফস স্কুল থেকে আমি স্বাধীনতার পর ১৯৭২ সালে অনুষ্ঠিত দু'টি এসএসসি পরীক্ষার দ্বিতীয়টিতে অংশগ্রহণ করি। ষাট এবং সত্তর দশকে খুলনার সেন্ট জোসেফস হাই স্কুলটি খ্যাতিমান ছিল। ওই স্কুল থেকে প্রতি বছর যশোর বোর্ডে ছাত্ররা মেধা তালিকায় স্থান পেত। ফলে যারা ওই স্কুলের ভালো ছাত্র, তারা অনেকেই বোর্ডের রেজাল্টে ওপরের দিকে থাকত। আমি জোসেফ স্কুলে অষ্টম শ্রেণিতে ভর্তি হয়ে ষষ্ঠ স্থান পেয়ে শিক্ষকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করি। পরে নবম ও দশম শ্রেণিতে কলা বিভাগে আমি প্রথম স্থান অধিকার করি। কাজেই সেন্ট যোসেফস স্কুলের কলা বিভাগের ফার্স্ট বয় হিসাবে আমার কলা বিভাগে মেধাতালিকায় স্থান পাওয়া অস্বাভাবিক ছিল না। কিন্তু স্বাধীনতার পর ১০০০ নম্বরের পরিবর্তে ৩০০ নম্বরের মধ্যে পরীক্ষা হওয়ায় আমি পরীক্ষায় ভালো করতে পারিনি।

আমাদের স্কুল থেকে যে সব শিক্ষক পরীক্ষার ফলাফল তৈরির কাজে যশোর বোর্ডে গিয়েছিলেন, তাঁরা ফিরে এসে আভাষ দেন যে, আমার নাম হয়তো কলা

বিভাগে প্রথম দশজনের মধ্যে থাকবে। পরে ফলাফল বের হলে দেখা যায়, আমার নাম প্রথম দশজনের মধ্যে নেই। হয়তো ১২-১৩ নম্বরের দিকে চলে গেছে। যা হোক, অঙ্ক ও ইতিহাসে লেটার মার্কসসহ প্রথম বিভাগে আমি এসএসসি পাস করি। এ স্কুলে আমার সঙ্গে যারা পড়ত তাদের অনেকেই কর্মজীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে। যে ছেলেটা আমাদের ব্যাচের বিজ্ঞান বিভাগের ফার্স্ট বয় ছিল তার নাম মোল্লা সিরাজুল ইসলাম। সে ম্যাট্রিকে ভালো রেজাল্ট করতে পারেনি। সিরাজ পরে কি লেখাপড়া করেছে, বা কোথায় কর্মজীরন শুরু করেছে, বহু বছর সে সন্ধান পাইনি। অনেক পরে তার সন্ধান পাই এবং জানতে পারি যে সে এজি অফিসে চাকুরি করে অবসর গ্রহণ করেছে। তবে মোসাদ্দেক আলী বাচ্চু-র ক্লাসরোল প্রথম দিকে না থাকলেও সে এসএসসিতে বিজ্ঞান বিভাগের ফলাফলে প্রথম দশজনের মধ্যে স্থান পেয়েছিল। পরে বাচ্চু সামরিক বাহিনীতে যোগদান করে মেজর হওয়ার পর সে মৃত্যুবরণ করে। বিজ্ঞানের সেকেন্ড এবং থার্ড বয় যথাক্রমে মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ এবং আমিনুর রহমান। এরা দু'জন মেডিকেল লাইনে লেখাপড়া করে ক্যারিয়ার গড়েছে। শহীদুল্লাহ অস্ট্রেলিয়া থেকে নবজাত শিশুদের চিকিৎসার ওপর উচ্চ ডিগ্রি করে এখন নিও ন্যাটালজিস্ট। কয়েক বছর আগে সে বঙ্গবন্ধু মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ-উপাচার্য পদে ছিল। করোনা রোধে গঠিত টেকনিক্যাল কমিটি প্রধান হিসেবেও সে দায়িত্ব পালন করে। আমিনুর সেক্স এবং স্কিন স্পেশালিস্ট হয়ে আমেরিকায় প্রাকটিস করে। সে তাবলিগি মেহনতে সময় দেয় বলে তার বোন আফরোজা সুলতান রুবির কাছে জানতে পারি। রুবিও সপরিবারে আমেরিকায় থাকে। সে ২০২০ সালের প্রথম দিকে আমেরিকা থেকে দেশে এসে আমার সঙ্গে খুলনায় দেখা করতে এসেছিল। তার কাছ থেকেই আমি আমিনুরের তাবলিগি কাজে মনোযোগী হবার কথা শুনি। রুবির মেয়েরা লেখাপড়া শিখলেও তার সঙ্গে কম থাকে। আমেরিকায় জন্মগ্রহণ করে বড় হওয়ায় তারা প্রচলিত সংস্কৃতিতে অভ্যস্ত হয়েছে। একই ব্যাচের বন্ধু জাহাঙ্গীর বক্স এবং জাহিদুল হাসানও মেডিকেল লাইনে ভালো করে। জাহাঙ্গীর কানাডায় প্রাকটিস করে এবং জাহিদুল ঢাকার স্কয়্যার হাসপাতালের একজন বিশিষ্ট ডাক্তার। আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু এস এম মিজানুর রহমান, শামীম আহমেদ খান, মঞ্জুরুল আলম, আরিফ আহমেদ, শাহাদাত হোসেন ব্যাংকিং পেশায় যোগ দিয়ে ভালো করে। এরা সবাই এখন চাকুরিজীবন শেষ করেছে। তবে শামীম সিটি ব্যাংকের চাকুরিতে থাকাকালীন তাবলিগের প্রতি ঝুঁকে পড়ে। এক পর্যায়ে ব্যাংকের চাকরি ছেড়ে সে তাবলিগ জামায়াতের কার্যক্রমে অধিকতর মনোযাগী হয়। একই ব্যাচের বদরুল বাশার বব নরওয়েতে আবহাওয়া বিজ্ঞানী হিসেবে কর্মরত ছিল। বন্ধু এস এম বজলুর রশিদ সমীর বিসিকে এবং সিরাজুল ইসলাম পিডিবির ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে চাকুরিজীবন শেষ করে এখন ঢাকায় অবসর জীবন যাপন করছে। মির্জা সবুর কিরণ মেরিণ ইঞ্জিনিয়ার হয়ে দীর্ঘদিন থেকে সিঙ্গাপুরে আছে। নিজের ব্যবসার ফাঁকে ওখানে সে বাংলা স্কুল গড়ে তুলেছে। আমার

ব্যাচের কলা বিভাগের ক্লাস নাইন এবং টেনের সেকেন্ড বয় সৈয়দ জাকির হোসেন খুলনায় চাকুরি করে ভালো আছে। আরেক মিজানুর রহমান আওয়ামী লীগ থেকে এমপি নির্বাচিত হয়।[২]

এসএসসি পাস করার পর আমি খুলনার ঐতিহ্যবাহী সরকারি ব্রজলাল কলেজে ভর্তি হই। এ কলেজে ভর্তি হয়ে অনেক গুণী শিক্ষকের সংস্পর্শে আসি। ইন্টারমিডিয়েট ক্লাসে আমদেরকে ইংরেজি পড়াতেন প্রফেসর জিল্লুর রহমান ও প্রফেসর শামীম খান। অন্যান্য বিভাগেও সুযোগ্য শিক্ষকমণ্ডলী ছিলেন। বাংলায় প্রফেসর কায়কোবাদ, প্রফেসর গণি, অঙ্কে প্রফেসর হারুনুর রশিদ, প্রফেসর মুজিবুর রহমান স্যারের মত জনপ্রিয় ও খ্যাতিমান শিক্ষক ছিলেন। এ কলেজে ভালোই লেখাপড়া চলছিল। কিন্তু এইচএসসি পরীক্ষার বছরখানেক আগে আমাদের আব্বা রেল দুর্ঘটনায় ইন্তেকাল করেন। এটা ছিল আমাদের পরিবারের ওপর একটি বড় আঘাত। কারণ, এ সময় আমার বড় বোন এবং বড় ভাই রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত ছিলেন। তাঁদের পক্ষে খুলনায় এসে আমাকে এবং ছোট দু'বোনকে দেখাশোনা করা সম্ভব ছিল না। ফলে আমাকে পরিবারে সময় দিতে হয়। এর ফলে লেখাপড়ায় আমার মনোযোগ নষ্ট হয়। ঠিকমত ক্লাস করতে পারতাম না। সংসারের বাজার করা থেকে জমিজমা দেখাশোনা করা পর্যন্ত সব কাজ করতে হত। ফলে খুলনা থেকে দৌলতপুর যেয়ে ক্লাস করতে অসুবিধা হওয়ার কারণে অনেক চিন্তা-ভাবনা করে আমি বাসার কাছাকাছি খুলনা মজিদ মেমোরিয়াল সিটি কলেজে ক্লাস করা শুরু করি। এক পর্যায়ে এ কলেজ থেকেই ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষা দিয়ে সেকেন্ড ডিভিশনে এইচএসসি পাস করি।

এইচএসসি পাস করার পর আমার ঘনিষ্ঠ সহপাঠী বন্ধুদের প্রায় সবাই বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হবার তোড়জোড় শুরু করে। আমার পক্ষে পারিবারিক কারণে বিশ্ববিদ্যালয়ে যাওয়া সম্ভব ছিল না। এ জন্য আমার মন খারাপ হয়। বড় ভাইবোনরা আমাকে নিকটস্থ কলেজে একটি সহজ বিষয়ে অনার্স পড়ার পরামর্শ দেন। কাজেই আবারও আমি সরকারি ব্রজলাল কলেজে ১৯৭৪ সালে রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগে অনার্সে ভর্তি পরীক্ষা দিয়ে কৃতকার্য হয়ে ভর্তি হই। বিএল কলেজে তখন রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগে অনেক খ্যাতিমান শিক্ষক ছিলেন। আমাকে ওই সময় যাঁরা পড়ান তাঁদের মধ্যে ছিলেন, অধ্যাপক কে এম হাসান, অধ্যাপক জাফর ইমাম, অধ্যাপক ইনসান আলী গাজী, অধ্যাপক লুৎফুর রহমান, অধ্যাপক সাখাওয়াত হোসেন, অধ্যাপক ইজাহারুল ইসলামসহ আরো অনেকে। এ কলেজে পড়ার সময়

২. এরা ছাড়াও যোসেফ স্কুলে আমার আরও যেসব সহপাঠী ছিল তাদের মধ্যে মসি, রাজা, বুলু, ফয়সাল, মাসুদ, টিপু, অসীম, রুবেল, মুনীর, মাহবুব, হাফিজ, আশরাফ, অনুপম, ডলার, অশোক, মনা, রেজাউল, সিরাজ, প্রমূখ। আরো অনেকের নাম মনে করতে পারছি না।

ভালো ছাত্র হিসেবে আমি শিক্ষকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করি। আমি খেলাধুলা এবং সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডেও সুনাম অর্জন করি। কলেজে সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতায় আমি এক বছর চ্যাম্পিয়ন হই। প্রবন্ধ ও ছোটগল্প লেখা, পর্যায়ক্রমে গল্প বলা, কবিতা আবৃত্তি এবং বিতর্ক প্রতিযোগিতায় আমি পুরস্কৃত হই। কলেজের বাইরেও ওই সময় বিভিন্ন সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতায় আমি অংশগ্রহণ করে পুরস্কৃত হই। খুলনার শহীদ সোহরাওয়ার্দী কলেজ আয়োজিত আন্তঃকলেজ সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা, ইসলামিক ফাউন্ডেশন ও বাংলাদেশ পরিষদ আয়োজিত বিভিন্ন সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেও আমি পুরস্কৃত হই। এভাবে বিএল কলেজে থাকাকালীন ভালো ছাত্র হিসেবে আমি শিক্ষকদের দৃষ্টি আকর্ষণে সক্ষম হই। আমাদের ১৯৭৭ সালের অনার্স পরীক্ষা সেশন জটের কারণে অনুষ্ঠিত হয় ১৯৭৯ সালে। বিএল কলেজ থেকে এ পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে আমি সমগ্র রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে উচ্চতর দ্বিতীয় শ্রেণিতে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করি। ওই বছর রাষ্ট্রবিজ্ঞানে কেউ প্রথম শ্রেণি পায়নি। প্রথম স্থান অধিকার করে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের কফিল উদ্দিন আহমেদ। আমার এই ফলাফলে কলেজে আমার আরও সুনাম ছড়িয়ে পড়ে।

বিএল কলেজে সহপাঠীদের মধ্যে অনেকের সঙ্গেই বন্ধুত্ব হয়েছিল। এর মধ্যে যেসব সহপাঠীর নাম মনে আছে তার মধ্যে এস এম মিজানুর রহমান ও শামীম আহমেদ খান অন্যতম। এ ছাড়াও আবদুল্লাহ আল মাহমুদ, এস এম আতিয়ার রহমান, আকরাম হোসেন, এস এম ওয়ালিউল্লাহ, মাযাহারুল ইসলাম আবু, রেজাউল করিম, জালাল আহমেদ, জহুরুল ইসলাম, সৈয়দ হাবিবুর রহমান, আবুল হাসান, তমিজুল ইসলাম, শাহাদাত হোসেনসহ আরো অনেকে ছিল। মেয়েদের মধ্যে যাদের নাম মনে আছে তার মধ্যে শাহানারা বেগম মনি, শিরীতাজ বেগম রানী, সরস্বতী বিশ্বাস ও প্রতিভা নন্দি। সহপাঠীদের মধ্যে সম্পর্ক ভালো ছিল। প্রতিভার বন্ধুবান্ধবের সংখ্যা ছিল বেশি। রানী আর ওয়ালিউল্লাহ মধ্যে এক ধরনের সম্পর্কের মতো ভাব ছিল। এসব বন্ধুদের মধ্যে আতিয়ার ছিল সবচেয়ে দুষ্ট। ক্লাসের অবসরে সে আমাদেরকে নানা রকম গল্পে মাতিয়ে রাখতো, যার অধিকাংশই ছিল যৌণ রসাত্মক গল্প। সহপাঠী মেয়েদের সঙ্গে আমার সুসম্পর্ক ছিল।

বিভাগে ১৯৭৮ সালে প্রথম বর্ষ সম্মান শ্রেণির শিক্ষার্থীদের নবীন বরণ অনুষ্ঠানের মানপত্র লেখার ভার আমার ওপর পড়ে। আমি কবিতার ছন্দে একটি ব্যতিক্রমী মানপত্র লিখেছিলাম। এটি পড়ার জন্য দ্বিতীয় বর্ষের একটি মেয়েকে নির্বাচিত করা হলে আমি তাকে মানপত্রটি পড়ার ছন্দ শিখিয়ে দিয়েছিলাম। মেয়েটির সাথে আমার দেখা সাক্ষাত হলে কুশল বিনিময় হত। বন্ধুবান্ধবরা কানাঘুষা করত। একবার আমি অন্য বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে তাকেও ডাকযোগে ঈদকার্ড পাঠিয়েছিলাম। এ সম্পর্কে সে কোনো প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেনি। রক্ষণশীল ক্যাম্পাসের গাছতলার সবুজ ঘাসে তার সঙ্গে বসে কোনদিনই আমার গল্প করা

হয়নি। তবে বিভাগের করিডোরে বা রাস্তায় সামনাসামনি দেখা হলে কুশল বিনিময় হত। পরে আমি অনার্সে ভালো রেজাল্ট করে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে চলে গেলে বিএল কলেজের সঙ্গে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। আমি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র থাকাকালীন মেয়েটি সপরিবারে চট্টগ্রামে চলে যায়। আমি ১৯৮২ সালে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক হিসেবে যোগদান করার পর তার সঙ্গে আমার দু'বার দেখা হয়। একবার বিভাগের ছাত্রী হিসেবে, আরেকবার ২০১৬ সালে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের সুবর্ণ জয়ন্তী অনুষ্ঠানে বিভাগীয় চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্বরত অবস্থায়। ওই সময় সে একদল বন্ধুবান্ধব নিয়ে বিভাগ পরিদর্শনে এলে আমি তাদেরকে চা বিস্কুট দিয়ে আপ্যায়ন করি। পরবর্তীতে ২০২০ সাল পর্যন্ত পরস্পর কেউ কারো খোঁজখবর না নেয়ায় আমাদের দেখা সাক্ষাত হয়নি।

স্বল্পকালীন বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রজীবন

অনার্সে ভালো ফলাফলের জন্য আমি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে মাস্টার্স পড়ার জন্য এমএ ক্লাসে ভর্তি হবার সুযোগ লাভ করি। ১৯৭৯-১৯৮০ সালে মাস্টার্স পড়তে গিয়ে আমি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে আমার বেশ কিছুসংখ্যক পুরানো বন্ধুবান্ধব খুঁজে পাই। এদের মধ্যে ছিল রাষ্ট্রবিজ্ঞানেই এস এম মিজানুর রহমান, শামীম আহমেদ খান এবং এস এম বজলুর রশিদ। এদের সঙ্গে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে আমার এমএ পড়ার সময়কাল উপভোগ্য হয়ে ওঠে। এ সময় আমি প্রথমে শহীদ শামসুজ্জোহা হলের একটি ৪-আসনবিশিষ্ট কক্ষে সমাজকর্ম বিভাগের বন্ধু রেজাউল আলম, একাউন্টিং বিভাগের বন্ধু মাজাহার ইমাম-এর সঙ্গে সিট পাই। চার আসনবিশিষ্ট কক্ষে লেখাপড়ার চেয়ে গল্পগুজব বেশি হতে থাকে। আমি চিন্তায় পড়ে যাই। অনেক ভেবে হলের প্রভোস্ট স্যারের বাসভবনে গিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করি। স্যারকে বলি, স্যার আমি শুনেছি যারা ভালো রেজাল্ট করে হলের সুনাম বৃদ্ধি করে আপনি তাদেরকে বাড়তি সুযোগ সুবিধা দেন, কথাটা কি সত্য? স্যার বললেন হ্যাঁ, অবশ্যই সত্য। কিন্তু বাবা তুমি এ কথা জিজ্ঞেস করছ কেন? তুমি কি বলতে চাও? আমি বললাম, স্যার আমি চার-আসনবিশিষ্ট কক্ষে আছি। পড়াশুনায় অসুবিধা হচ্ছে। আপনি যদি আমাকে সিঙ্গেল বা টু-সিটেড রুমে একটি সিট দিতে পারেন, আমি আপনাকে অবশ্যই ভালো রেজাল্ট এনে দেব। স্যার হেসে আমার চোখের দিকে তাকালেন। বললেন, আচ্ছা বাবা, দেখি তোমার জন্য আমি কি করতে পারি। পরে তিনি আমাকে আমার ভালো রেজাল্টের কারণে ২-আসনবিশিষ্ট ১২০ নম্বর কক্ষে সিট বরাদ্দ করেন। এ রুমে থাকাকালীন আমার সময় ভালোভাবে কাটে। লেখাপড়াও ভালো হয়। কারণ, আমার রুমমেট পাবনার ছেলে আলী আকবর ছিল ছাত্রলীগের একজন একনিষ্ঠ কর্মী। আমি রাজনীতি না করলেও সে আমাকে বড় ভাইয়ের মতো সম্মান করত। রাজনীতির কারণে সে প্রায় সারাদিনই হলের বাইরে থাকত। এ জন্য আমার একা রুমে লেখাপড়া করতে সুবিধা হত। অবশ্য আলী আকবর রুমে থাকলেও ঝামেলা করত না। তার সঙ্গে

গল্প করতে আমার ভালো লাগতো। তা ছাড়া সময় পেলে আমি আমির আলী হলে চলে যেতাম। ওখানে আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধুরা থাকত। বিশেষ করে খুলনা ও বাগেরহাটের ছেলেদের অনেকেই আমির আলী হলে থাকত। বড়ভাই জাফরুল্লাহর রুম ছিল তাদের আড্ডার আখড়া। সেখানে ভালোই আড্ডা জমত। তবে জোহা হলে থাকার একটি বাড়তি মজা ছিল পুকুরে গোসল করার সুযোগ। হলের পাশেই শান বাঁধানো ঘাটে নেমে পুকুরে সাঁতার কেটে গোসল করার আনন্দই ছিল আলাদা। এ হলে থাকাকালীন আমি খুব কমই বাথরুমে গোসল করেছি।

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে সহপাঠীদের সঙ্গে নতুন ছাত্র হিসাবে কলেজ থেকে গিয়ে সখ্য গড়ে উঠতে সময় লাগে। যে সব মেয়েরা আমাদের সঙ্গে পড়ত তাদের মধ্যে মুন্নী, মেরি এবং মানার সঙ্গে আলাপ হত। ছেলেদের মধ্যে রবিউল, স্বপন, কফিল এবং আরো কয়েকজনের সঙ্গে গল্প করতাম। মাত্র এক বছরের বিশ্ববিদ্যালয় জীবন হওয়ায় ঘনিষ্ঠতা গড়ে ওঠার আগেই পরীক্ষা চলে আসে। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে আমাদের যে সব সম্মানিত শিক্ষক পড়াতেন তাঁদের মধ্যে বেশ কিছু জ্ঞানী গুণী শিক্ষক ছিলেন। ছিলেন প্রফেসর ড. আ ন ম শামসুল হক, প্রফেসর গোলাম মুরশীদ, প্রফেসর মুহাম্মদ আয়েশ উদ্দিন, প্রফেসর ড. আবুল ফজল হক, প্রমুখ। আইন বিভাগের প্রফেসর ড. বদরুদ্দীন আহমেদ আমাদের আন্তর্জাতিক আইন কোর্সটি পড়াতেন। এদের প্রত্যেকের দায়িত্বশীলতা একই রকম না হলেও এরা প্রত্যেকেই ভালো শিক্ষক ছিলেন।

দেখতে দেখতে ১৯৮০ সাল পার হলো। মাস্টার্স পরীক্ষায় নানা কারণে ভালো প্রস্তুতি নিতে পারিনি। এর মধ্যে একটি কারণ ছিল পেটের পীড়া। প্রায়ই আমি আমাশয়ে ভুগতাম। এ কারণে হোটেলে বা ডাইনিংয়ে না খেয়ে মাঝেমধ্যে আমাকে রুমের হিটারে কাঁচাকলা সিদ্ধ করে ভাত খেতে হত। সকালে পরাটার পরিবর্তে চিড়া ভিজিয়ে গুড় দিয়ে খেতাম। ফলে পরীক্ষা খুব ভালো দিতে পারব মনে করিনি। কিন্তু আগেই বলেছি যে পরীক্ষার ব্যাপারে আমার ভাগ্য সব সময় ভালো। তাই পরীক্ষা দিতে গিয়ে ভাগ্যক্রমে এমন সব প্রশ্ন পেলাম যে প্রশ্নগুলোর ওপর আমার বেশি দখল ছিল। সে কারণে পরীক্ষায় উতরে গেলাম। কিন্তু ফলাফল যে এতটা ভালো হবে ভাবিনি। একেবারে প্রথম শ্রেণিতে প্রথম। ওই সময় রাষ্ট্রবিজ্ঞানে এমএ ফাইনাল পরীক্ষায় শিক্ষার্থীরা খুব একটা প্রথম শ্রেণি পেত না। একবার একজন পেলে আবার কয়েক বছর কেউ প্রথম শ্রেণি পেত না। অনেক বছর পর প্রথম শ্রেণি পেয়ে ভাবলাম বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াবার সুযোগ পাবো কিনা। কিন্তু স্যারদের কাছ থেকে তেমন ইতিবাচক সাড়া না পেয়ে অন্য চাকুরির চেষ্টা শুরু করলাম।

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে চাকুরিলাভ

১৯৮২ সালে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রভাষক পদে দরখাস্ত করলাম। ইন্টারভিউ দিলাম। ইন্টারভিউ বোর্ডে ছিলেন ভাইস চ্যান্সেলর প্রফেসর জিল্লুর

রহমান সিদ্দিকী, বিভাগীয় সভাপতি অধ্যাপক ইশতিয়াক আহমেদ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের লোক প্রশাসন বিভাগের অধ্যাপক প্রফেসর ড. মোহাম্মদ আনিসুজ্জামান এবং আরো দু'একজন। ইন্টারভিউ খুব ভালো হয়নি। তবে পরীক্ষা দিয়ে আমি খুশি হই। আমার সঙ্গে সিলেকশন বোর্ডে সম্মানজনক আচরণ করা হয়েছিল। যে প্রার্থীর চাকুরি হয়, তার প্রভাষক পদে একটি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে চাকুরির অভিজ্ঞতা ছিল। কাজেই আমার চাকুরি না হওয়ার বিষয়টি আমি বড় করে দেখিনি। তবে ওই পরীক্ষার পর প্রফেসর ড. মোহাম্মদ আনিসুজ্জামান ব্যক্তিগত আলাপে আমাকে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁর বিভাগে নিতে আগ্রহ প্রকাশ করেন। আমি তাঁকে বলি, আমি চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে রাজনীতিবিজ্ঞান বিভাগে দরখাস্ত করেছি। তিনি জেনে খুশি হয়ে বলেন, 'তুমি ভালো করেছো।' জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে পরীক্ষা দিয়ে চাকুরি না পেলেও আমার মধ্যে আস্থা গড়ে ওঠে এবং আমি ভাবি, কোনো না কোনো জায়গায় ঠিকই চাকুরি পেয়ে যাব।

১৯৮২ সালের নভেম্বর মাসে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের রাজনীতিবিজ্ঞান বিভাগে অপ্রত্যাশিতভাবে আমার চাকুরি হয়। আমার ইন্টারভিউ ছিল ১৩ নভেম্বর সকাল দশটায়। ওই দিন আমি ঢাকা থেকে চট্টগ্রাম পৌছতে যানজটে পড়ি। চট্টগ্রাম শহরে পৌছি বেলা সাড়ে এগারোটায়। তখন ভাবি, বিশ্ববিদ্যালয়ে গিয়ে লাভ হবে না। মোবাইল ফোনের যুগ না হওয়ায় কারো সঙ্গে কোনো যোগাযোগও করতে পারিনি। ভাবছিলাম ক্লান্ত শরীরে আবার কিভাবে ঢাকায় ফিরব। কিন্তু কি মনে করে ভাবলাম, এসেছি যখন তখন চাকরি না হলেও একবার বিশ্ববিদ্যালয়টি দেখে যাই। অবশ্য এর আগে আমি ছাত্র থাকাকালীন একবার ১৯৭৭ সালে রোভার স্কাউট হিসাবে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত ন্যাশনাল স্টুডেন্টস জাম্বুরিতে যোগদান করতে এ বিশ্ববিদ্যালয়ে এসেছিলাম। বিশ্ববিদ্যালয় খেলার মাঠে সারা দেশ থেকে আগত ছাত্রদের সঙ্গে ২-৩ দিন তাঁবুতে বসবাস করেছিলাম। ওই সময় আমার প্রথম চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় দেখার সুযোগ হয়েছিল। ওই অনুষ্ঠানে আমি পর্যায়ক্রমে গল্প বলা প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে প্রথম স্থান অধিকার করেছিলাম। ওই প্রতিযোগিতার বিচারক ছিলেন বাংলা বিভাগের অধ্যাপক ড. আনিসুজ্জামানসহ আরো কতিপয় অধ্যাপক। পুরস্কার হিসেবে আমাকে সনদপত্রসহ আমেরিকার তৈরি দামি পার্কার কলম দেয়া হয়েছিল। যা হোক এ সব ভাবতে ভাবতে আমি একটি স্কুটারে করে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে যখন পৌছি তখন বাজে প্রায় পৌণে একটা।

ভিসি মহোদয়ের রুমের কাছে যাওয়ার আগেই দেখা হলো লোক প্রশাসনের অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ আনিসুজ্জামান স্যারের সঙ্গে। এই আনিস স্যারই জাহাঙ্গীরনগর বিশ্বিদ্যলয়ে আমার ইন্টারভিউ বোর্ডে ছিলেন। ইনিই আমাদের এমএ ফাইনাল পরীক্ষার ভাইভা বোর্ডে এক্সটার্নাল মেম্বার ছিলেন। কাজেই তিনি আমাকে চিনতেন। তিনি আমাকে দেখেই চমকে উঠে বললেন, আরে! তুমি এখানে কোত্থেকে এলে? কোথায় ছিলে তুমি? আমরা তো সিলেকশন বোর্ডে

তোমার কথা আলোচনা করেছিলাম। ছিলে কোথায়? আমি কাচুমাচু করে বললাম, স্যার আমার করার কিছু ছিল না। আমি পথে আটকা পড়েছিলাম। স্যার, ইন্টারভিউ কি হয়ে গেছে? স্যার বললেন, হ্যাঁ সে তো অনেক আগেই হয়ে গেছে। একাধিক পদে ইন্টারভিউ ছিল। তুমি এসোতো আমার সঙ্গে—বলে তিনি আমাকে নিয়ে সরাসরি ভাইস চ্যান্সেলরের রুমে ঢুকে গেলেন। সেখানেও আমাকে একই প্রশ্ন করা হলে আমি একই উত্তর দিলাম। মাননীয় ভাইস চ্যান্সেলর বললেন, আমরা তো আপনাকে নিতে মনস্থির করেছিলাম। কিন্তু আপনি না এলে কেমন করে হবে। আনিসুজ্জামান স্যার বললেন, দেখেন ওকে নেয়া যায় কিনা। তখন ভিসি সাহেব একাডেমিক প্রশ্ন না করে উপস্থিত রাজনীতিবিজ্ঞান বিভাগের চেয়ারম্যান বদিউল আলম স্যারকে আমাকে অ্যাডহক হিসাবে নিতে বললেন। উপস্থিত সবার সম্মতিতে সিদ্ধান্ত হলো। বিভাগীয় সভাপতি বদিউল আলম স্যার পরদিন আমাকে বিভাগে দেখা করতে বললেন। এভাবেই আমার শৈশবের শিক্ষক হওয়ার স্বপ্ন পূরণ হলো।

শিক্ষকতার নতুন জীবন

হঠাৎ চাকুরি পেয়ে কোথায় থাকব, কি করব বুঝতে পারছিলাম না। সহপাঠী ও বন্ধু লোক প্রশাসন বিভাগের প্রভাষক এবং ব্যাচমেট কফিল উদ্দিন আহমেদ এর সঙ্গে তার বাসায় উঠলাম। কফিল উদ্দিন অর্থনীতি বিভাগের বেলায়েত হোসেন এবং লোক প্রশাসন বিভাগের শায়রুল মাশরেককে নিয়ে চট্টগ্রাম শহরের বহদ্দারহাটে একটি ভাড়া বাসায় তিন রুমে তিনজন থাকতেন। আমি বন্ধু কফিলের রুমে ফ্লোরিং করলাম। পরদিন বদিউল আলম স্যারের সঙ্গে দেখা করলে তিনি আমাকে ওইদিনই অ্যাডহক হিসাবে নিয়োগের ব্যবস্থা করে কাজে যোগ দিতে বললেন। আমি ১৪ নভেম্বর ১৯৮২ তারিখে কাজে যোগ দেবার পর তিনি বিভাগের শিক্ষক সিদ্দিক আহমেদ চৌধুরীকে ডেকে তার সঙ্গে আমাকে নতুন সহকর্মী হিসেবে পরিচয় করিয়ে দিলেন এবং পরদিন থেকেই ক্লাস নিতে বললেন। সিদ্দিক আহমেদ সাহেব আমাকে অভিনন্দন জানালেন এবং কতিপয় বিভাগীয় শিক্ষার্থীদের সঙ্গে আমাকে নতুন স্যার হিসেবে পরিচয় করিয়ে দিলেন। পরে তিনি আমাকে রাজনীতিবিজ্ঞান শিক্ষার্থীদের মধ্যে অনুষ্ঠিত বিভাগীয় ইনডোর গেমস প্রতিযোগিতা দেখাতে নিয়ে গেলেন। এমন অপ্রত্যাশিতভাবে যে চাকরি পাব সে সম্পর্কে আমার ধারণা ছিল না। এক সেট জামা প্যান্ট নিয়ে ইন্টারভিউ দিতে এসে ক্লাস নেয়া শুরু করে বিপদে পড়লাম। সঙ্গে বেশি টাকাও ছিল না। পরে তিন-চারদিন ক্লাস নিয়ে চেয়ারম্যান স্যারকে আমার অবস্থা বলার পর উনি ছুটি নিয়ে কয়েকদিনের মধ্যে বাড়ি থেকে প্রস্তুত হয়ে আসতে বললেন। এ দিকে আমার জন্য চিন্তায় ব্যাকুল আম্মা আমার চাকুরি হয়েছে শুনে খুশি হয়ে শুকরিয়া জানালেন।

ব্যাচেলর শিক্ষকের মেসজীবন

খুলনা থেকে ঘুরে এসে আমি বন্ধু কফিলদের ওখানে ড্রয়িংরুমে স্থায়ী মেসমেট হয়ে গেলাম। ফলে আমাদের চারজন ব্যাচেলরের সংসার শুরু হলো। মেস সিস্টেমে একসাথে রান্নাবান্না হত। পর্যায়ক্রমে সবার বাজার করা লাগত এবং গনি মিয়া নামের হাটহাজারীর একটি ১৩-১৪ বছরের সুবোধ বালক আমাদের কাজকর্ম ও রান্নাবান্না করত। গনি আমাদের জন্য যা রাঁধতো তাকে রান্না না বলে সিদ্ধ বলাই উত্তম। তবে আমরাও মাঝেমধ্যে, বিশেষ করে শুক্রবারে রান্না চর্চা করতাম। অনেক দিনই সকালে গনিকে দিয়ে দোকানের নাস্তা আনিয়ে খেতাম। শুনেছি এই জোনাকী ভবনে বাসা ভাড়া নেবার সময় অন্যান্য তলায় বসবাসকারী পরিবারগুলো বাড়িওয়ালাকে আপত্তি জানিয়েছিল। বলেছিল, পরিবার নিয়ে আমরা সবাই এখানে থাকি, তার মধ্যে আপনি ব্যাচেলর ভাড়া দিচ্ছেন কেন? বাড়িওয়ালা বলেছিলেন, এরা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক। আপনাদের কোনো অসুবিধা করবেন না। পরে আমাদের থাকা, গতিবিধি, কর্মকাণ্ড, কথাবার্তা এবং চলাফেরা দেখে এসব পরিবারের লোকজন আমাদের ওপর এতটাই সন্তুষ্ট হয়েছিলেন যে আমরা যেন কখনই এ বাসা ছেড়ে না যাই সে মর্মে তারা বাড়িওয়ালাকে অনুরোধ করেছিলেন। অন্য তলার মহিলাগণ আমাদের সম্পর্কে কৌতূহলী ছিলেন। তাঁরা আমাদের গতিবিধি নজরদারি করতেন। আমাদের অবর্তমানে গণির কাছে আমাদের খোঁজখবর নিতেন। আমরা কি করি, কি খাই, সে কি রান্না করে, সেসব বিষয়ে জানতে চাইতেন। তাদের কেউ কেউ আবার গনিকে ভালোভাবে রান্না করার ফ্রি টিপসও দিতেন।

বহদ্দারহাটের এই মেসজীবন বেশ উপভোগ করেছি। মেসের হিসেব রাখার ব্যাপারে আমাদের চারজনের মধ্যে অর্থনীতির বেলায়েত হোসেন ছিলেন অভিজ্ঞ ও পেশাদার। মেসের বাজার খরচ থেকে বাড়িভাড়াসহ যাবতীয় খরচ খাতায় লিখে রাখা হত। মাস শেষে সে খরচ ভাগ করা হত নির্ভুলভাবে। বাড়িওয়ালা আমাদের ওপর খুশি ছিলেন। কারণ, আমরা প্রতিমাসের প্রথমেই ভাড়ার টাকা দিয়ে দিতাম। তবে পর্যায়ক্রমে বাজার করার কাজটি সবাই একই রকম পেশাদারিত্বের সঙ্গে করতে পারতাম না। বিশেষ করে শায়রুল মাশরেক ছিলেন একটু খেয়ালি প্রকৃতির। একবার বাজারে গিয়ে তিনি শুধুই ২২টি ডিম কিনে নিয়ে এসেছিলেন। এমন ক্রয়ের ব্যাখ্যায় তিনি বলেন, 'সুবিধাজনক দামে পেয়ে বেশি করে ডিম কিনে নিয়ে এসেছি।' এ সব কারণে আমরা তাকে বাজারে কম পাঠাবার চেষ্টা করতাম। তিনি শিক্ষিত পরিবারের সন্তান। বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদান করার আগে সরকারি কলেজে পড়িয়ে এসেছেন। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ইন্সিটিটিউট অব বাংলাদেশ স্টাডিজ (আইবিএস) থেকে আমেরিকান নৃবিজ্ঞানী ড. ক্লারেন্স মেলোনির অধীনে এমফিল ডিগ্রি করে এসেছিলেন। তার এক বোন আমেরিকার ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং আরেক ভাই বাংলাদেশের সরকারি কলেজে শিক্ষকতা করতেন। অন্য এক ভাই নাজমুল মাশরেক কাজ করতেন সিনেমা লাইনে। এই ভাইটি ফিল্ম টেকনলজি পড়তে জার্মানি গিয়ে এক বিদেশি জার্মান মেয়ে বিয়ে করেন।

কিভাবে এই প্রেম ও বিয়ে হলো সে গল্প মেসমেট মাশরেক ভাই আমাদের শুনিয়েছিলেন। জার্মান মেয়েটির ধারণা ছিল ভারতীয় উপমহাদেশ থেকে যারা ইউরোপের খোলামেলা সংস্কৃতিতে আসে তারা সুন্দরী স্বল্পবসনা মেয়ে দেখলে সে দিকে তাকিয়ে থাকেন। কিন্তু একদিন সুইমিং পুলে সুইমিং কসটিউম পরিহিত অবস্থায় তিনি যখন সাতার কাটছিলেন তখন সে পুলের সন্নিকটে নাজমুল উদাস নয়নে অন্যদিকে তাকিয়ে ছিলেন। বিষয়টি তার কাছে ব্যতিক্রমী মনে হলে তিনি কসরৎ করেও তার দৃষ্টি আকর্ষণে ব্যর্থ হন। ফলে নাজমুলের প্রতি তার আকর্ষণ বাড়ে। তিনি যেচে তাঁর সঙ্গে আলাপ করে জানতে পারেন যে তিনি বাংলাদেশের ছাত্র। এখানে ফিল্ম টেকনলজির ওপর লেখাপড়া করতে এসেছেন। এ আলাপ সাক্ষাত থেকে ক্রমান্বয়ে প্রেম এবং পরে বিয়েতে গড়ায় এবং তিনি বাংলাদেশে চলে আসেন। মেসের বৈকালিক আড্ডায় আমরা কেবল এ প্রেমের গল্পই শুনিনি, আমরা জনাব মাশরেকের এ বিদেশি ভাবিকে দেখেছি এবং তার সঙ্গে গল্পও করেছি। আমাদের মেসজীবনের সে আরেক ইতিহাস। হঠাৎ মাশরেক ভাই একদিন আমাদের জানান যে তার মা, ছোটোবোন এবং ভাবি চট্টগ্রামে বেড়াতে আসছেন এবং তারা কয়েকদিন আমাদের মেসে থাকবেন। আমরা তো আকাশ থেকে পড়লাম। গনির চাঞ্চল্য বেড়ে গেল এবং সে সঙ্গে আমাদেরও। রান্নাঘরের ডিমের খোসা, মাকড়সার ঝুলসহ সবকিছু পরিষ্কার করা হলো। আমরাও নিজ নিজ ঘর পরিপাটি করে সাজিয়ে নিলাম।

বিদেশি সাদা বর্ণের মেয়ে হলেই তাকে সুন্দরি বলা যায় না। কিন্তু এ মেয়েটি বর্ণ, আকৃতি, ফিগার, ফেস কাটিং সব মিলিয়ে ছিলেন প্রকৃত সুন্দরী। এক জার্মান শিল্পপতির মেয়ে। নাম এলিজাবেথ স্মিথ ইসী। পরে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করার পর নতুন নাম নেন ফাতেমা জোহরা। এরা আমাদের মেসে আসার পর অন্যান্য ফ্লোরের বাসিন্দারা কিছুটা অবাক হন। কারণ, এর আগে আমাদের কারও কোন আত্মীয়স্বজন মেসে এসে থাকেননি। আমরা অতিথিদেরকে একটি পুরো রুম ছেড়ে দেই। তিন-চারদিন অতিথিরা আমাদের মেসে ছিলেন। ইসী ভাবীর উচ্চতা ৬ ফুট। একহারা গড়ন। পরে জেনেছিলাম তিনি জনাব নাজমুলের নারী উদাসীনতার কারণে তাঁকে বিয়ে করেননি। তাঁর সঙ্গে সখ্য হবার পর তিনি ইসলাম ধর্ম সম্পর্কে জেনে, বিশেষ করে এ ধর্মের সুফি এবং মারফতি সাধনা সম্পর্কে জেনে, আউলিয়া পিরদের কারামতির কথা জেনে এ ধর্মের প্রতি আকর্ষিত হন এবং এ লাইনে কাজ করতে সংকল্পবদ্ধ হয়ে নাজমুল ভাইকে বিয়ে করে বাংলাদেশে আসেন। তিনি নামাজ পড়তেন এবং মারফতি সাধনায় তাঁর খুবই আগ্রহ ছিল। কিন্তু মাশরেক ভাইদের পরিবারে এসবের চর্চা ছিল না। আমার যেহেতু এ বিষয়ে যৎসামান্য ধারণা ছিল, সে কারণে এসব বিষয় নিয়ে একদিন সন্ধ্যায় ভাবির সঙ্গে আমার ঘন্টাখনেক আলাপ হয়। আমি অলৌকিকতা ও আধ্যাত্মিক সাধনার জগত সম্পর্কে তাঁর আগ্রহের তীব্রতা দেখে অবাক হই। কিন্তু মাশরেক ভাইয়ের আম্মা চাইতেন না যে আমি এসব বিষয় নিয়ে তাঁর সঙ্গে বেশি

কথা বলে তাঁর আগ্রহ আরও বাড়িয়ে দেই। খালাম্মা আমাকে সরাসরি কিছু না বললেও বিষয়টি আমি তাঁর আচার আচরণ ও ভাব-ভঙ্গিতে বুঝতে পারি।

মেস সঙ্গীদের মধ্যে অর্থনীতির বেলায়েত হোসেন ছিলেন সবচেয়ে গোছানো এবং পরিপাটি। সব কাজ সুশৃংখলভাবে করার যোগ্যতা ছিল তাঁর। মেস জীবন শেষ হবার অনেক পরে তিনি চাঁদগাও আবাসিক এলাকায় বাড়ি করে বসবাস করতেন। আরও পরে তিনি কানাডায় গিয়ে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন। ২০১৯ সালে খোঁজ নিয়ে জানি যে বেলায়েত ভাই কানাডার একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করেন। অন্য বন্ধু কফিল তো আমার সহপাঠী। সে সহজ সরল প্রকৃতির মানুষ। শিক্ষার্থীদের সে খুবই ভালোবাসতো এবং লোক প্রশাসন বিভাগের ছাত্রছাত্রীদের কাছে সে ছিল একজন জনপ্রিয় শিক্ষক। তার অনেক ছাত্র অনেক সময় তার সঙ্গে দেখা করতে আমাদের মেসে আসত। এসব ছাত্ররা আমাদেরকে তাদের স্যারের বন্ধু এবং মেসমেট হিসেবে সম্মান করত। প্রায় তিন যুগ পর চাকুরিজীবনের শেষ পর্যায়ে এসে এখনও চট্টগ্রামের পাবলিক বাসে উঠলে অনেক সময় কেউ সিট ছেড়ে আমাকে সম্মান করে বসতে দেয়। পরে দেখা যায় সে বন্ধু কফিলের ছাত্র। কফিল কয়েক বছর চট্টগ্রামে চাকুরি করে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগে যোগ দেয়। এখনও সে সেখানে শিক্ষকতা করে যাচ্ছে। তবে তার স্ত্রীর মৃত্যুর পর সে কিছুটা ভেঙ্গে পড়েছিল। আমরা পরীক্ষার কাজে তাকে চট্টগ্রামে আনার চেষ্টা করেও পারিনি। তবে তার মেয়েকে লেখাপড়া শেষ করিয়ে ডাক্তার পাত্রের সঙ্গে বিয়ে দিয়েছে। কফিল এখন অবসরে কবিতা লিখে সময় কাটায়। কতিপয় কাব্যগ্রন্থও প্রকাশ করেছে। আমাকে সে তার লেখা যথাক্রমে ২০১৭ ও ২০১৮ সালে প্রকাশিত *কবি নই*, তবুও *কবিতা* এবং *কবিতা এখন গল্প শুনছে* শীর্ষক দুটি কবিতার বই উপহার হিসেবে পাঠিয়েছে। সাহিত্যের মান বিচারে যে তার কবিতাগুলো খুব ভালো হয়েছে আমি এমনটি বলার যোগ্য নই। তবে ঘনিষ্ঠ বন্ধু ও সহপাঠী স্ত্রী বিয়োগের পর সঙ্গীহীন একাকী জীবনে কবিতা লিখে সময় কাটায়। সেজন্য সে আমাকে তার কবিতা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে আমি তাকে উৎসাহব্যঞ্জক প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করি।

মধ্যস্ততার ব্যর্থ চেষ্টা

আমি চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের রাজনীতিবিজ্ঞান বিভাগে যোগ দেবার বেশ কয়েক মাস আগে কফিল লোক প্রশাসন বিভাগে প্রভাষক হিসেবে যোগ দিয়েছিল। সবকিছু ঠিকঠাক মতই চলছিল। প্রায় বছরখানেক পর একদিন মেসে চায়ের আড্ডায় কফিল আমাকে এক অনুরোধ করে বসে। সে বলল, আমার এক ছাত্রীকে তার খুব ভালো লেগেছে। সে তাকে বিয়ে করতে চায়। আমি যেন এ ব্যাপারে তাকে সহায়তা করি। আমি তো আকাশ থেকে পড়লাম। প্রথমে আমি বিষয়টি গুরুত্ব দেইনি। ভেবেছি এটা হয়তো তার ক্ষণিকের খেয়াল। কিন্তু পর পর দুদিন আমাকে একই বিষয়ে বলার পর আমার ধারণা বদলায়। বন্ধু কফিলকে আমি

যতদূর জানি, সে চারিত্রিকভাবে অত্যন্ত সজ্জন এবং ছাত্র থাকাকালীন তার কোনো নারীঘটিত অ্যাফেয়ার ছিল না। তার হাবভাব দেখে আমি বুঝলাম সে বিষয়টি সিরিয়াসলি নিয়েছে। অগত্যা বললাম, ঠিক আছে বন্ধু বলো আমাকে কি করতে হবে। সে বলল, প্রথমে তুমি জানবে যে মেয়েটি বিবাহিত অথবা এনগেজড কিনা। যদি না হয়, তাহলে তুমি তাকে আমার আগ্রহের বিষয় জানাতে পারো। প্রয়োজনে তার বাবা মার ঠিকানা আমাকে দিলে আমি তাদের সঙ্গে কথা বলতে পারি। আমি বুঝতে পারি যে, তার কোনো অসৎ উদ্দেশ্য নেই। পরদিন সে আমাকে মেয়েটিকে চিনিয়ে দিলে আমি চমকে উঠি। কারণ, মেয়েটি উপজাতীয় এবং আমার সরাসরি তৃতীয় বর্ষের ছাত্রী। ওদেরকে আমি 'বাংলাদেশ লোক প্রশাসন' কোর্সটি পড়াই। আমি লজ্জায় পড়লাম। কারণ, আমি নিজেই বিয়ে করিনি। তার ওপর নিজের ছাত্রীকে এমন সব কথা জিজ্ঞেস করলে সে যদি মনে করে আমি তার প্রতি আগ্রহী তাহলে তো লজ্জায় মাথা কাটা যাবে। তা ছাড়া আমি শুনেছি উপজাতীয় মেয়েদের বিয়ে নিজেদের মধ্যে হয়ে থাকে। তারপরও বন্ধুর অনুরোধে আমি মেয়েটির সঙ্গে কথা বলতে সিদ্ধান্ত নিলাম। সঙ্কোচে আর লজ্জায় প্রথমদিন চেষ্টা করে আমি তাকে কিছুই বলতে পারিনি। পরদিন আমার তাদের সঙ্গে ক্লাস ছিল। ক্লাস শেষ করে বললাম, কারো কোনো প্রশ্ন থাকলে বলবে, না বুঝলে আমার দরজা তোমাদের জন্য খোলা আছে। এই বলে বের হবার সময় ওই মেয়েকে বললাম তোমার যখন ক্লাস থাকবেনা আমার রুমে একটু এসো। এটুকু বলতে যাতে চোখমুখ লাল হয়ে না যায় সে দিকে আমার খেয়াল ছিল। মেয়েটি মাত্র ১০ মিনিটের মধ্যে আমার রুমে এল। আমি তাকে বসালাম। প্রথমে বললাম,

: দেখো আমি ক্লাসে তোমাদের যেসব বিষয় পড়াই তোমরা কি তা বুঝতে পারো? কোনো অসুবিধা হয় নাতো?
: না স্যার, আপনার লেকচার আমরা ভালোভাবে বুঝতে পারছি।
: দেখো আমি কিন্তু তোমাকে এ কথা জিজ্ঞেস করার জন্য আসতে বলিনি। অন্য একটি বিষয় নিয়ে তোমার সঙ্গে আলাপ করার জন্য ডেকেছি। কিন্তু আমি তোমার শিক্ষক, কিভাবে বিষয়টি বলব তাই ভাবছি।
: স্যার আপনি এত সঙ্কোচ করছেন কেন? আপনি বলতে পারেন স্যার।
: আচ্ছা। দেখো, আমাদের অনুষদের একটি বিভাগের একজন শিক্ষক তোমাকে খুব পছন্দ করেন। আমরা একসঙ্গে থাকি। উনি আমার কাছে তোমার সম্পর্কে তথ্য জানতে চেয়েছেন। কিন্তু আমি তো তোমার সম্পর্কে কিছু জানি না। তুমি আমাকে সাহায্য করলে ভালো হত।
: স্যার উনি কি জানতে চেয়েছেন?
: এই ধরো তুমি কি বিবাহিত বা এনগেজড় কিনা। এ সব আর কি। তোমাকে তার এত ভালো লেগেছে যে তিনি তোমার সম্মতি পেলে তোমার বাবা মার সঙ্গে কথা বলতে আগ্রহী। বিয়ের প্রস্তাব দিতে চান। উনি বনেদি সম্ভ্রান্ত ও

স্বচ্ছল পরিবারের সন্তান। আজেবাজে কথা বলার লোক হলে আমি তার কথা আমলে নিতাম না। আর তোমাকেও বিব্রতকর প্রশ্ন করতাম না।
: স্যার আমি বিব্রত হব কেন? আমাকে তো কারো ভালো লাগতে পারে। স্যার, যদি কিছু মনে না করেন, আমি কি কালকে আপনার সাথে এক সময় এ ব্যাপারে কথা বলতে পারি?
: ঠিক আছে। তুমি সময় নাও। তবে আমার একটা অনুরোধ আছে।
: জি স্যার, বলুন।
: দেখো আমি তোমার সরাসরি শিক্ষক। আমি অনুরোধ করবো ব্যাপারটি যেন জানাজানি না হয়। ক্লাসে যদি তোমার সহপাঠীরা এসব নিয়ে হাসাহাসি করে তাহলে আমার মান-সম্মান থাকবে না।
: স্যার আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, বিষয়টি কেউ জানবে না।
: ঠিক আছে তুমি যেতে পারো।
: আমি কাল আসবো স্যার, আসসালামুআলাইকুম।

মেয়েটি চলে গেলে আমি রুমাল দিয়ে কপাল ও চোখমুখের ঘাম মুছে নিলাম। বাসায় ফিরে বন্ধুকে বললাম যে আগামী দিন কিছু তথ্য জানা যাবে। পরদিনও ওদের সঙ্গে আমার ক্লাস ছিল। আমি ভয়ে ভয়ে ক্লাসে গেলাম। না আমাকে দেখে কেউই মুখ টিপে হাসেনি। ক্লাস শেষ করে আমি রুমে চলে এলাম। একটি বিষয়ে আমি ভয় পাচ্ছিলাম যে মেয়েটি এমন তো ভাবছে না, স্যার নিজেই আমাকে পছন্দ করেন, কিন্তু নিজের কথা নিজে বলতে পারছেন না বলে এমন কৌশল করছেন। মেয়েটি অল্প একটু পরেই আমার রুমে এল। প্রথমে আমি কথা বললাম।

: আমার বিশ্বাস তুমি বিষয়টি নিয়ে কারও সাথে আলাপ করোনি, সে জন্য তোমাকে অনেক ধন্যবাদ।
: স্যার আপনি এ ব্যাপারে নিশ্চিন্ত থাকুন। আপনি কোনো অন্যায় করছেন না। আপনার সম্মান নষ্ট হবে না।
: যাক নিশ্চিন্ত হলাম।
: স্যার, আমার বিয়ে হয়নি। এনগেজড়ও নই। তবে আমাদের সমাজে ও পরিবারে এমনভাবে বিয়ে হয় না। কেউ মেনে নেন না। আমার বাবা মা শুনলে আহত হবেন। স্যার, আমাদের বিয়ে নিজেদের মধ্যে হয়। স্যার, আপনি বিষয়টি উনাকে বুঝিয়ে বললে ভালো হয়।
: নিশ্চয়ই। আমি তাকে বুঝিয়ে বলব। বন্ধু বারবার অনুরোধ করায় তোমাকে বিব্রত করেছি। কিছু মনে করনি তো?
: না স্যার, আমি বিষয়টি স্বাভাবিকভাবে নিয়েছি। তবে স্যার আপনার কাছে আমার একটি বিনীত অনুরোধ আছে।
: বলো আমি তোমার জন্য কি করতে পারি।
: স্যার ভদ্রলোকটি কে? আমি কি তাকে চিনি?

তার এ প্রশ্ন শুনে আমি দোটানায় পড়ে যাই। যদি নাম না বলি তাহলে সে আমাকে সন্দেহ করতে পারে। ভাবতে পারে, স্যার নিজে আমাকে পছন্দ করেন। অন্যের নামে কৌশলে এসব তথ্য জেনে নিচ্ছেন। আবার ভাবি, যদি বন্ধুর নাম বলি, আর সে সেটি বন্ধুমহলে রটিয়ে দেয়, তাহলে তার ক্ষতি হতে পারে। এই দোটানা থেকে বের হতে আমি আগে নিজেকে ছাত্রীর সন্দেহ থেকে বাঁচাতে সিদ্ধান্ত নেই। অনেক ভেবে বলি, দেখো, উনি খুব অমায়িক ব্যক্তিত্ব এবং একজন জনপ্রিয় শিক্ষক। তুমি যদি কথা দাও যে বিষয়টি ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে আলাচনা করবে না, কেবলমাত্র তখনই আমি তোমাকে তার নাম বলতে পারি।

: স্যার আমি আপনাকে নিশ্চয়তা দিচ্ছি এ কথা কেউ জানবে না। স্যারের সম্মান বজায় থাকবে। স্যার তো কোনো অন্যায় করেননি। আমাকে তাঁর ভালো লাগতেই পারে।

আমি মেয়েটির কথায় বিশ্বাস করে তাকে বন্ধুর নাম বললাম। সে তাকে চিনলো। ছাত্রীকে অসংখ্য ধন্যবাদ সে আমার বন্ধুর সম্মান রেখেছে। এ কথা কেউ জানতে পারেনি। এই ছাত্রী আজ থেকে তিন দশক আগে পাস করে চলে গেছে। সরকারি চাকুরি পেয়েছে। পরে ভালো পাত্রের সঙ্গে তার বিয়ে হয়েছে। তার ছেলেমেয়েরা লেখাপড়ায় ভালো করেছে। যতদূর জানি সে সুখ শান্তিতে আছে। দোয়া করি সে যেন স্বামী সন্তানসহ দুধে-ভাতে থাকে। অন্যদিকে আমার বন্ধুও বিয়ে করেছে। সেও ভালো আছে। স্ত্রী বিয়োগের পর ডাক্তার পাত্রের সঙ্গে একমাত্র মেয়ের বিয়ে দিয়েছে। মাঝেমধ্যে টেলিফোনে কথা হয়। দোয়া করি আল্লাহ পাক যেন আমার বন্ধুকে সহি সালামতে রাখেন।

শিক্ষকের জনপ্রিয়তা

আমাদের মেসে আমরা যে চারজন থাকতাম তারা প্রত্যেকেই নিজ নিজ বিভাগে জনপ্রিয় শিক্ষক ছিলাম। আর জনপ্রিয় হবই বা না কেন। শিক্ষক হিসেবে আমাদের যে প্রধান দুটি কাজ— শিক্ষকতা ও গবেষণা করা, সে কাজদুটি যদি কোনো শিক্ষক আন্তরিকতার সঙ্গে করেন, তাহলে তাকে শিক্ষার্থীরা পছন্দ না করে পারে না। আমি আমার সীমিত সাধ্যের মধ্যে যতটুকু পেরেছি শিক্ষার্থীদেরকে সহায়তা করার চেষ্টা করেছি। সব শিক্ষক যে ভালো পড়াতে পারবেন, এমনটা হয় না। কিন্তু শিক্ষার্থীদের ভালো করে পড়াবার জন্য যদি শিক্ষকের আন্তরিক চেষ্টা থাকে, সে বিষয়টি শিক্ষার্থীদের কাছে প্রশংসিত হয়। এই আন্তরিকতাটুকু থাকলে কোনো শিক্ষককে শিক্ষার্থীরা পছন্দ না করে পারে না। শিক্ষক যদি দায়িত্ব সচেতন হন, ন্যায়নীতির ওপর চলেন, সব ছাত্রছাত্রীকে একই রকম চোখে দেখেন, তাহলে ছাত্র যত বড় মাস্তান বা নেতাই হোক না কেন, সে শিক্ষককে সম্মান করে। এ বিষয়টি আমি আমার শিক্ষকতা জীবনের শুরুর দিকেই উপলব্ধি করতে পেরেছি। শিক্ষার্থীদের জন্য সব সময় দরজা খোলা রাখলেও তাদের কোনো অন্যায় আবদার কখনো শুনিনি। ন্যায়নীতির ওপর থাকলে শিক্ষককে যে শিক্ষার্থীরা সম্মান না করে

পারে না, তার অনেক উদাহরণ আমার শিক্ষকতা জীবনে রয়েছে। এখানে তেমন একটি বাস্তব উদাহরণের উল্লেখ করতে চাই।

আশির দশকের শেষ দিকের কথা। আমি তখন সহকারী অধ্যাপক। এমএসএস পরীক্ষায় ইনভেজিলেটর হিসেবে পরীক্ষার হলে দায়িত্ব পালন করছিলাম। আমার সঙ্গে অন্য সহকর্মীরাও ছিলেন। পরীক্ষার্থীরা মনোযোগ দিয়ে পরীক্ষা দিচ্ছে। প্রায় ঘন্টাখানেক পার হওয়ার পর এক পর্যায়ে পরীক্ষার্থীদের খাতা সই করা শুরু করি। একজন পরীক্ষার্থীর খাতা সই করতে গিয়ে আমার কেমন যেন সন্দেহ হলো। কারণ, পরীক্ষা শুরু হবার পর যতটা সময় পার হয়েছে তাতে তার দুটি অতিরিক্ত খাতা নিয়ে লিখে শেষ করে ফেলার কথা নয়। একজনও হয়তো এখনো কোনো অতিরিক্ত খাতা নিয়েছে কিনা সন্দেহ। তবে সে দুটি অতিরিক্ত খাতা এরই মধ্যে লিখে শেষ করে ফেললো কি করে! আমার মনে সন্দেহ কামড় দেয়। অথচ তার অতিরিক্ত খাতায় ওই দিনের তারিখসহ উপস্থিত ইনভেজিলেটরের সই রয়েছে। এখন কি করি। খাতা সই শেষ হয়ে গেলে তার ওপর অনেকক্ষণ দৃষ্টি রেখে সন্দেহজনক কিছুই দৃষ্টিগোচর হলো না। তার আশপাশ দিয়ে হাঁটাহাটি করলাম। না, সন্দেহ করার মতো তেমন কিছুই দৃষ্টিগোচর হলো না। হঠাৎ একটা ব্যাপার আমার চোখে পড়লো। ওইদিন আমরা যে অতিরিক্ত খাতা শিক্ষার্থীদের সরবরাহ করেছিলাম তার সঙ্গে ওই শিক্ষার্থীর অতিরিক্ত খাতাদুটোর বর্ণে কিছু পার্থক্য আছে। ওইদিনের অতিরিক্ত খাতাগুলো যতটা সাদা এবং ফ্রেশ দেখাচ্ছিল, ওই ছাত্রের অতিরিক্ত খাতাগুলোর বর্ণ ছিল তার চেয়ে কিছুটা মলিন এবং সামান্য হলদেটে। আমি অনেকটা মনে মনে নিশ্চিত হলাম যে অবশ্যই ওই অতিরিক্ত খাতাগুলো আজকে সরবরাহ করা হয়নি। সাহস করে মনে জোর নিয়ে আন্দাজে ঢিল মারলাম।

: এই দেখি তোমার খাতা। অতিরিক্ত খাতাগুলোও দাও।

: স্যার কি অসুবিধা?

: তুমি এই খাতা কোথা থেকে এনেছ?

: কেন স্যার আপনারাই তো দিয়েছেন।

: এ খাতা আমরা দেইনি। সত্য করে বলো তোমার কাছে আর কোনো লিখে আনা অতিরিক্ত খাতা আছে কিনা।

আমার চোখমুখের কাঠিন্য দেখে প্রায় ৬ ফুট লম্বা দশাসই চেহারার এ শিক্ষার্থী আত্মসমর্পণ করলো।

: স্যার ভুল করেছি। ক্ষমা করে দেন। আর এমন ভুল করব না।

: বাকি অতিরিক্ত খাতাগুলো কই? সেগুলি আগে দাও।

: স্যার বিশ্বাস করুন, আর কোনো খাতা নেই। আপনি আমাকে চেক করে দেখতে পারেন।

তার বাইরে থেকে লিখে আনা দুটি অতিরিক্ত খাতার প্রত্যেকটি শুরু হয়েছে একটি নতুন প্রশ্নের উত্তর লেখা শুরু দিয়ে এবং শেষ হয়েছে ওই উত্তরের পরিসমাপ্তি

ঘটিয়ে। যা বুঝা গেল, যে ভাবেই হোক এ পরীক্ষার্থী কিছু অতিরিক্ত খাতা জোগাড় করে পরীক্ষায় আসতে পারে এমন কয়েকটি সম্ভাব্য প্রশ্নের উত্তর কয়েকটি উত্তরপত্রে লিখে সঙ্গে এনেছে এবং যে প্রশ্নগুলি পরীক্ষায় এসেছে সে অতিরিক্ত খাতাগুলো আজকের খাতার সঙ্গে যুক্ত করে দিয়েছে। এ অপরাধ গুরুতর। এমন অপরাধ তো আর ছেড়ে দেয়া যায় না। তা ছাড়া পরীক্ষা কমিটির সভাপতি এবং বিভাগীয় সভাপতি ব্যাপারটি জেনে অবাক হয়ে বলেন, তুমি কিভাবে এই নকল ধরতে পারলে! এ তো সাংঘাতিক কাণ্ড। কাজেই আমি খাতা রিপোর্ট করলাম। আমি নিশ্চিত যে শৃঙ্খলা কমিটির বৈঠকে সে ক্ষমা পাবে না। তার শাস্তি হবেই। পরে জেনেছিলাম তার শাস্তি হয়েছে। তার পরীক্ষা বাতিল করা হয়েছে। ওই পরীক্ষার্থীও বুঝতে পেরেছিল যে, সে যে ধরনের অন্যায় করেছে তাতে শাস্তি এড়াতে পারবে না। কাজেই সে আর পরের পরীক্ষাগুলো দেয়নি।

আমি কিছুটা ভয়ে ছিলাম। দশাসই চেহারার এই ছেলেটি আবার আমাকে কোনো হুমকি ধমকি করে কিনা সে বিষয়ে মনে সন্দেহ ছিল। ছাত্রটি আর পরীক্ষা দেয়নি জেনে খারাপ লেগেছে। আবার এত বড় অন্যায় ধরার পর ছেড়ে দিলেও তো আমি শাস্তি পেতাম না। কাজেই আমার যা করা উচিত, আমি তাই করেছি। তবে সে ছেলেটিকে আর পরে দেখিনি। তবে এ ঘটনার প্রায় ছয় বছর পর একদিন চট্টগ্রাম শহরের রেয়াজউদ্দিন বাজারের কাছাকাছি রাস্তার ফুটপাথে আমার সাথে তার একেবারে সামনাসামনি দেখা হয়েছিল। তাকে একেবারে সামনে দেখে আমি কিছুটা চমকে গিয়েছিলাম। ভেবেছিলাম সে অশোভন কিছু করে কিনা; বা বলে কিনা, স্যার আমার জীবনটা নষ্ট করে দিলেন। কিন্তু সে কোনো কথা না বলে প্রথমে আমার পা ছুঁয়ে সালাম করল।

: স্যার কেমন আছেন?
: ভালো আছি। তুমি কেমন আছো?
: স্যার, আপনার দোয়ায় ভালো আছি।
: দেখো বাবা, তোমার জন্য আমার খুব খারাপ লেগেছে। তোমাকে আর দেখিনি বলে আমি তোমাকে বলতে পারিনি।
: স্যার পুরানো কথা ভুলে যান। স্যার আমার সঙ্গে একটু চা খাবেন?
: না বাবা। আমি চা খাব না। তুমি যে ভালো আছো, এটা জেনে আমার ভালো লাগছে। বিশ্বাস করবে কিনা জানি না, তোমাকে এক্সপেল্ড করার পর আমার খুব মন খারাপ ছিল। কয়েক দিন আমি ভালো করে ঘুমাতে পারিনি।
: স্যার আপনি আবারো পুরানো কথা বলছেন কেন?
: বলে শান্তি পাচ্ছি।
: স্যার, আপনি কোনো অন্যায় করেননি। আমি অপরাধ করেছি। ওই শাস্তি আমার প্রাপ্য ছিল। আপনি যদি সেদিন আমাকে শাস্তি না দিয়ে মাফ করে দিতেন, আপনার প্রতি আমার শ্রদ্ধা থাকত না।
: তুমি খুব ভালো ছেলে বাবা। দোয়া করি তোমার উন্নতি হোক।

: স্যার, আপনার দোয়ায় অনেক ভালো আছি। স্যার আপনি কি কাজে এসেছেন?
: আমি ট্রেনের টিকিট নিতে এসেছিলাম।
: স্যার কি কখনো রেয়াজউদ্দিন বাজারে আসেন?
: হ্যাঁ, মাঝেমধ্যে কেনাকাটা করতে আসি।
: স্যার, কিছু মনে করবেন না। আমি একজন ছোট ব্যবসায়ী। আমার কার্ডটি রাখুন। যদি কখনো কেনাকাটা করতে আসেন, আমাকে ফোন দিলে খুশি হব। আপনার যা দরকার আমি আপনাকে আমার দোকানে বসিয়ে রেখে করে দিতে পারব।
: আচ্ছা, আসলে আসবো।
: স্যার, আমার ব্যবসা ভালো যাচ্ছে। আমার জন্য একটু দোয়া করবেন। আর আমাকে অন্যায়ের জন্য মাফ করে দিবেন।
: দেখো বাবা, বুঝতে পারছি তুমি খুব ভালো ছেলে। মনে রেখ, ছাত্রের অপরাধ শিক্ষক মনে রাখেন না। তোমার উন্নতির জন্য আমি খাস দিলে দোয়া করবো।

এ বাস্তব উদাহরণ থেকে অনুধাবন করা যায়, শিক্ষক যদি ন্যায়নীতির ওপর থাকেন, ছাত্র যতো বড় নেতা বা মাস্তান হোক না কেন, সে তাকে সম্মান না করে পারে না।

লেখালেখি ও প্রকাশনা

মনোযোগ দিয়ে ক্লাস নিতে নিতে এক বছর পার করার পর বুঝলাম, বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক হিসাবে টিকে থাকতে হলে ক্লাস নেয়া ছাড়াও কিছু গবেষণামূলক লেখালেখি ও প্রকাশনা করা প্রয়োজন। কারণ, জ্ঞান অর্জন ও বিতরণের পাশাপাশি জ্ঞান সৃষ্টিও বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকের একটি অন্যতম প্রধান কাজ। তা ছাড়া পদোন্নতির জন্যও বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকদের গবেষণা প্রকাশনা দরকার। কাজেই এ কাজে পিছিয়ে থাকলে পদোন্নতি পিছিয়ে যাবে। ছাত্রজীবনে গল্প কবিতা ও প্রবন্ধ লিখে পুরস্কৃত হয়েছি। তবে গবেষণামূলক লেখালেখির চর্চা করা হয়নি। এ সম্পর্কে একেবারেই অনভিজ্ঞ ছিলাম। সে জন্য এ লক্ষ্যে প্রায়শ আমি মেসমেট শায়রুল মাশরেক ভাইয়ের সঙ্গে বিকেলের চায়ের আড্ডায় গবেষণামূলক লেখালেখি নিয়ে আলোচনা করতাম। মাশরেক ভাই বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদানের আগে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ইন্সিটিটিউট অব বাংলাদেশ স্টাডিজ (আইবিএস) থেকে এমফিল ডিগ্রি করায় গবেষামূলক লেখালেখি সম্পর্কে তার ধারণা ও চর্চা ছিল। মাশরেক ভাইয়ের সঙ্গে আলোচনা করে গবেষণামূলক লেখালেখির ব্যাপারে আমার একটি প্রাথমিক ধারণা হয়। তাছাড়া তার লেখা দুয়েকটি প্রবন্ধ এবং তার এমফিল থিসিস পড়েও আমি এ সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা পাই।

এর মধ্যে এক ছুটিতে ১৯৮৩-১৯৮৪ সালে অনুষ্ঠিত ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচন দেখতে আমি বাগেরহাটের মোল্লাহাট উপজেলার চরকুলিয়া ইউনিয়নে নতুন ঘোষগাতী গ্রামে বেশ কয়েকদিন ছিলাম। ওই নির্বাচনে আমার চাচাত ভাই

রফিকুল ইসলাম দুলাল ছিলেন চরকুলিয়া ইউনিয়ন পরিষদের একজন চেয়ারম্যান পদপ্রার্থী। কাজেই ইউপি নির্বাচনে প্রার্থীদের প্রচারণা ভঙ্গিমা, ভোটারদের সমর্থন আদায়ের কলাকৌশল, নির্বাচনী সাজসজ্জা প্রভৃতি মনোযোগ সহকারে দেখে এ বিষয়ে আগ্রহী হয়ে উঠি। ওই নির্বাচনে দুলালের অনুরোধক্রমে তার একটি নির্বাচনী প্রচারণা সভায় বিশেষ অতিথি হিসাবে আমাকে তার পক্ষে ভোট চেয়ে বক্তৃতাও করতে হয়েছিল। সে এক বিচিত্র অভিজ্ঞতা। চৈত্র মাসের প্রচণ্ড গরমে আমাকে তার অনুরোধে স্যুট কোর্ট পরে মাঠে গলদঘর্ম হয়ে বক্তৃতা করতে হয়েছিল। আমি পাজামা পাঞ্জাবী পরে যাব শুনে সে আমার ওপর বেজার হয়ে বলেছিল, আপনি কি আমাকে নির্বাচনে ডোবাতে চান? আমি মাইকে আপনার নাম ঘোষণা করিয়েছি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর হিসাবে (যদিও আমি ছিলাম প্রভাষক), আর এখন যদি আপনি স্যুট কোট না পরে বক্তৃতামঞ্চে যান তাহলে আমার ভোট কমে যাবে। যতই গরম লাগুক আপনাকে কোট স্যুট টাই পরে যেতে হবে। ফলে আমাকে শেষ পর্যন্ত তাই করতে হয়েছিল এবং গরমে ঘামতে ঘামতে আমি প্রায় অসুস্থ হয়ে পড়েছিলাম। তবে ওই নির্বাচনে সে জিতেছিল। এ ভাবে নির্বাচনটি ভালোভাবে পর্যবেক্ষণ করে চট্টগ্রামে এসে আমি ওই নির্বাচনের ওপর একটি প্রবন্ধ লেখার চেষ্টা করি। এ প্রবন্ধের খসড়া কপি আমি বিভাগীয় সিনিয়র প্রফেসর ড. বেনু প্রসাদ বড়ুয়াকে দেখে দিতে অনুরোধ করলে তিনি রাজি হন। মনোযোগের সঙ্গে প্রবন্ধটি পাঠ করে প্রফেসর বড়ুয়া এর শিরোনাম পরিবর্তন করতে এবং প্রবন্ধের শরীরের কতিপয় অংশে কিছু পুনঃলিখনের পরামর্শ দেন। আমি তার পরামর্শ অনুযায়ী কাজ করে 'বাংলাদেশে নিবাচনকালীন রাজনীতি: একটি গ্রামভিত্তিক নিরীক্ষণ' শিরোনামে প্রবন্ধটি প্রকাশনা বিবেচনার জন্য চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় সমাজ বিজ্ঞান অনুষদ থেকে প্রকাশিত ফ্যাকাল্টি জার্নালে জমা দেই। লেখাটি বিশেষজ্ঞদের ইতিবাচক মতামত পেয়ে ১৯৮৫ সালে ফ্যাকাল্টি জার্নালে প্রকাশিত হয়। এটিই আমার শিক্ষকতা জীবনের প্রথম গবেষণা প্রকাশনা।

প্রকাশনাটি হাতে পেয়ে আমি আনন্দিত হই। এর পর লেখালেখিতে আমার উৎসাহ বাড়ে। ফলে চট্টগ্রাম থেকে খুলনায় যাওয়া কমতে থাকে। আম্মা মাঝে-মধ্যে অসুস্থ থাকতন। সে জন্য আমার যেতে ইচ্ছে করত। এক পর্যায়ে ভাবলাম, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে চাকুরি করলে ঘন ঘন খুলনায় আসা যাওয়া করতে পারব। ফলে ১৯৮৪ সালে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ দু'জন প্রভাষক নিয়োগের বিজ্ঞাপন দিলে আমি দরখাস্ত করি। এক পর্যায়ে ইন্টারভিউ দিলাম। ইন্টারভিউ বোর্ডে যাঁরা ছিলেন তাঁদের মধ্যে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের সিনিয়র অধ্যাপক ড. আ ন ম শামসুল হক অন্যতম। বুঝতে পারলাম, উনি যা চাইবেন, তাই হবে। ইন্টারভিউতে লেখাপড়া বা একাডেমিক বিষয় খুব একটা জিজ্ঞেস করা হয়নি। কারণ, ভিসি প্রফেসর রকীব সাহেব ওই সময় বিশ্ববিদ্যালয়ে চলমান অস্বাভাবিক পরিস্থিতি স্বাভাবিক করার কাজে ব্যস্ত ছিলেন। তিনি ইন্টারভিউ বোর্ডে আমার কাছে জানতে চান, আমি কেন রাজশাহী

বিশ্ববিদ্যালয়ে আসতে চাই, চট্টগ্রামে কি অসুবিধা, ইত্যাদি। আমি এসব প্রশ্নের জবাব দেই। তেমন কোনো একাডেমিক প্রশ্ন করা হয়নি। এই ইন্টারভিউ দেবার সময় আমার প্রভাষক হিসাবে একটি বড় পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে বৎসরাধিককাল শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা এবং একটি প্রকাশিত গবেষণা প্রকাশনা ছিল। আবেদনকারীদের মধ্যে আমি ছিলাম একমাত্র রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাস করা ছাত্র, যাকে সকল শিক্ষকরা চিনতেন। অন্য যারা ইন্টারভিউ দিয়েছিলেন, তারা অন্য বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাস করা এবং তাদের শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা বা প্রকাশনা ছিল না। তারা সদ্য পাস করে বের হয়েছিলেন। আমি নিশ্চিত ছিলাম যে মেধা ও পারফরম্যান্স গুরুত্ব দিয়ে সঠিকভাবে নিয়োগ দেয়া হলে আমার চাকুরি না হওয়ার কোনো কারণ নেই। কাজেই চট্টগ্রামে এসে মনে মনে রাজশাহী যাবার প্রস্তুতি নিলেও পরে জানলাম আমাকে নেয়া হয়নি। ঢাকা থেকে পাস করা দু'জনকে নেয়া হয়েছে যাদের দুজনেরই বাড়ি বরিশাল জেলায়। প্রফেসর ড. শামসুল হক স্যারের বাড়িও বরিশাল। আঞ্চলিকতায় প্রভাবিত হয়ে যদি তিনি একজনকে নিয়ে সঙ্গে আমাকেও নিতেন তাহলেও হয়ত এ নিয়োগ নিয়ে প্রশ্ন উঠত না। এ সিদ্ধান্ত জেনে আমার মন খারাপ হয়। আমার শ্রদ্ধেয় শিক্ষক শামসুল হক স্যারকে অবশ্য আমি এ বিষয়ে পরে দেখা হলেও কোনোদিন কিছু বলিনি। আমি ভাবি, স্যার তো আমার শিক্ষক। তিনি যদি আমাকে বলতেন, তুমি তো চট্টগ্রামে ভালোই আছো। এখানে নতুনদের চাকুরির সুযোগ দেয়ার চেষ্টা করবো। তাহলে আমি সেটা স্বাভাবিকভাবেই নিতাম। আমার কষ্ট করে দরখাস্ত করা এবং ইন্টারভিউ দিতে রাজশাহী আসা যাওয়া করা লাগত না।

রাজশাহীতে চাকুরি না হওয়ায় চট্টগ্রামে যে খারাপ ছিলাম এমন না। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে চাকুরি হওয়ায় আমি অনেক খ্যাতিমান একাডেমিক ও গবেষক সহকর্মীর সংস্পর্শে আসতে পেরেছিলাম। বিভাগের সিনিয়র শিক্ষকগণ সবাই আমাকে স্নেহ করতেন। প্রফেসর ড. আর আই চৌধুরী, প্রফেসর ড. বেনু প্রসাদ বড়ুয়া থেকে শুরু করে সবাই একাডেমিক কাজে উৎসাহ দিতেন। তাছাড়া ড. আহমেদ শফিকুল হক, ড. মোহাম্মদ আবদুল হাকিম, ড. আফতাব আহমাদ, প্রভৃতি সহকর্মীগণ ছিলেন উঁচু মানের সমাজবিজ্ঞানী। একাডেমিক সহায়তার ক্ষেত্রে তাঁরা ছিলেন যথেষ্ট উদার। এদের সংস্পর্শে এসে আমি একাডেমিকভাবে লাভবান হয়েছিলাম। রাজনীতিবিজ্ঞানের প্রতিবেশি লোক প্রশাসন বিভাগের ড. মোহাম্মদ আনিসুজ্জামান, ড. নিজাম আহমেদও ছিলেন একাডেমিক ব্যাপারে খুবই সহায়ক ভূমিকা পালনকারী শিক্ষক। ড. আহমেদ শফিকুল হকের প্রতিবেশি হওয়ায় তার সঙ্গে আমার সখ্য গড়ে ওঠে। তিনি আমাকে সব সময় সৎ পরামর্শ দিতেন এবং নতুন নতুন এলাকায় একাডেমিক কাজ করতে উৎসাহ যোগাতেন। একবার রাজনৈতিক সামাজিকীরণের ওপর প্রচলিত চিন্তা ভাবনা এবং এ বিষয়ের লব্ধপ্রতিষ্ঠ সমাজবিজ্ঞানী প্রফেসর গ্যাবরিয়েল এ. আলমন্ডের বিশ্লেষণের সমালোচনা করে একটি প্রবন্ধ লিখলাম। তিনি ওই প্রবন্ধটিকে ইংরেজিতে লিখে

ওই সময়ে আমেরিকার স্ট্যানফোর্ড ইউনিভার্সিটির ইমেরিটাস প্রফেসর আলমন্ডকে তাঁর মতামতের জন্য পাঠাতে পরামর্শ দেন। আমি প্রথমে কিছুটা ভয় পেলেও তার পরামর্শ অনুযায়ী ওই নিবন্ধটিকে তাঁর সহায়তা নিয়ে ইংরেজি করে প্রফেসর আলমন্ডকে পাঠিয়েছিলাম। প্রফেসর আলমন্ড আমার প্রবন্ধটির প্রশংসা করেছিলেন। তিনি প্রবন্ধটি কিছুটা পরিবর্তন করতে পরামর্শ দিয়ে নিউইয়র্ক থেকে প্রকাশিত *কমপারেটিভ পলিটিক্স* জার্নালে রিসার্চ নোট হিসাবে প্রকাশের জন্য পাঠাতে পরামর্শ দিয়েছিলেন। এমন মতামত পেয়ে একাডেমিক কাজে আমার উৎসাহ বেড়ে যায়। আমি পরে ওই প্রবন্ধটি একটি স্বদেশি জার্নালে জমা দিলে প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয়।[৩]

প্রথম প্রকাশনাটি হাতে পাবার পর আমি গবেষণা কাজে আনন্দ পেতে শুরু করি। দেশি এবং বিদেশি জার্নালে বেশ কিছু প্রবন্ধ প্রকাশ করি। বিশেষ করে বর্তমানে কানাডার ম্যাকমাস্টার ইউনিভার্সিটির রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অধ্যাপক ড. আহমেদ শফিকুল হক এবং অস্ট্রেলিয়ার ইউনিভার্সিটি অব নিউ ইংল্যান্ডের ড. হাবীব জাফরুল্লাহর মত গবেষকদের সঙ্গে যৌথভাবে সমাজবিজ্ঞান বিষয়ক কতিপয় খ্যাতিমান জার্নালে আমাদের প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। পরবর্তীতে ১৯৮৫ সালে আমি বিবাহ করি এবং তার কিছুদিন পর সহকারী অধ্যাপক পদে পদোন্নতি পাই। সহকারী অধ্যাপক হবার পর আমি উচ্চতর ডিগ্রি করার বিষয়ে চিন্তা-ভাবনা শুরু করি। স্বাধীনতাত্তোরকালে সমাজবিজ্ঞান অনুষদের বিভিন্ন বিভাগের উল্লেখযোগ্যসংখ্যক শিক্ষক কানাডার ওয়াটারলু বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এমএ ডিগ্রি অর্জন করেন।[৪] আমিও কানাডার ওয়াটারলু বিশ্ববিদ্যালয়ে মাস্টার্স করার জন্য দরখাস্ত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি। আমার পর জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের সরকার ও রাজনীতি বিভাগের নইম সুলতান ওয়াটারলু বিশ্ববিদ্যালয়ে রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের মাস্টার্স প্রোগ্রামে যোগ দেন। ছাত্রজীবনে শৈশবে শিক্ষক হবার যে স্বপ্ন দেখেছিলাম, সে স্বপ্ন পূরণ হওয়ায় আমার পক্ষে একদিকে যেমন লেখালেখি করার সুযোগ সৃষ্টি হয়, অন্যদিকে উচ্চশিক্ষা অর্জনের জন্য দেশ বিদেশের বড় বড় বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সুযোগ হয়। আর সে সুযোগ ব্যবহার করে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের মানুষের সঙ্গে মিশবার ও তাদের চিন্তা-ভাবনা ও সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচিত হবার সুযোগ লাভ করি।

---

৩. Muhammad Yeahia Akhter, 'Reflections on Political Socialization: Rural Institutions in Bangladesh' *Chittagong University Studies* (Social Science), Vol. X, No. 1, 1987, pp. 194-208.

৪. এদের মধ্যে ছিলেন, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের রাজনীতি বিজ্ঞান বিভাগের শামসুদ্দীন আহমেদ, মোহাম্মদ আবদুল হাকিম, রাশিদা খানম, এম ইমদাদুল হক; লোকপ্রশাসন বিভাগের নুরুল ইসলাম, আবুল কাশেম মজুমদার, শাহনাজ বেগম, রুহুল আমিন, প্রমুখ।

শিক্ষক পরিবার

যেহেতু এ গ্রন্থে আমার জীবনের একাডেমিক বিষয়গুলো বেশি আলোচনা করার কথা, সে কারণে আমি নিজ পারিবারিক জীবন সম্পর্কে সংক্ষিপ্তভাবে ইঙ্গিত দিয়েছি। এখানে আমার নিজ পরিবারের কেবলমাত্র শিক্ষা সংক্রান্ত বিষয়ে দু'চার কথা বলব। বিস্তারিত পারিবারিক জীবন, বিয়েশাদির ঘটনা ইত্যাদি লিখে গ্রন্থের কলেবর বাড়াব না। আমরা পাঁচ ভাইবোনের সবাই লেখাপড়া শিখে শিক্ষকতা করেছি। এর মধ্যে আমি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক হয়ে এখনও শিক্ষকতা করছি। আমাদের বড় বোন হাসিনা বানু শিরিন খুলনা মজিদ মেমোরিয়াল সিটি কলেজে বাংলা বিভাগে অধ্যাপনা করেছেন। তিনি রাজনীতি করতেন। ছাত্রলীগ, আওয়ামী লীগ এবং আরও পরে জাতীয় পার্টি। পরে চাকুরি ছেড়ে সরাসরি এমপি নির্বাচনে খুলনা-৩ আসন থেকে এমপি হন। হুইপ হন। খুলনা সিটি কর্পোরেশনের ডেপুটি মেয়র ছিলেন। কিছুদিনের জন্য ছিলেন সাধারণ বীমা কর্পোরেশনের চেয়ারপার্সন। তিনি পরে দীর্ঘদিন অসুস্থ্য থেকে মৃত্যুবরণ করেন। বড় ভাই মোস্তফা কামালও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরেজি সাহিত্যে অনার্স ও মাস্টার্স ডিগ্রি নেবার পর চাকুরি জীবন শুরু করেন শিক্ষকতা দিয়ে। তিনি খুলনার দৌলতপুরের শাহপুর মধুগ্রাম কলেজে ইংরেজি পড়াতেন। পরে তিনি ফুড ইন্সপেক্টর হিসেবে কিছুদিন কাজ করে খুলনা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (কেডিএ)-এর এস্টেট অফিসার হিসেবে দীর্ঘদিন কাজ করে কর্মজীবন শেষ করেন।

আমার ছোটো দু'বোনও শিক্ষকতা করেছেন। এদের একজন গুলশান নাহার খুলনা শহরে সরকারি প্রাইমারি স্কুলে এবং অন্যজন মনিরা আখতার ফকিরহাটে একটি বেসরকারি স্কুলে শিক্ষকতা করেন। গুলশান নাহারের স্বামী আবু হান্নানও দুটি স্কুলে এখনও শিক্ষকতা করছেন। তিনি দু'বার প্রেসিডেন্ট স্বর্ণপদকপ্রাপ্ত একজন খ্যাতিমান স্কাউট প্রশিক্ষক ও সংগঠক। মনিরা আখতারের স্বামী ওমর ফারুক হাসানেরও কিছু শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা আছে, যদিও তিনি প্রাতিষ্ঠানিকভাবে শিক্ষকতা করেননি। কাজেই আমাদের পরিবার লেখাপড়ার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট একটি পরিবার। আমরা হাজার হাজার ছাত্র তৈরি করেছি, যারা সমাজে আজ প্রতিষ্ঠিত। তাদের অনেকেই আমাদের খোঁজ খবর নেয়। দেখা হলে সালাম দেয়। সম্মান করে। তবে আমাদের পাঁচ ভাইবোনের শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা থাকলেও লেখক হিসেবে কেবল আমিই পরিচিত। যেহেতু আমি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক, কাজেই পেশাগত উন্নতি ও উৎকর্ষতার জন্য হলেও আমাকে লিখতে হয়। গবেষণা করতে হয়। তাছাড়া এ পেশায় নেশা থাকায় আমি আমার আনন্দের জন্য সার্বক্ষণিকভাবে লেখালেখিতে জড়িত থাকি। এ জন্য লেখক-গবেষক হিসেবে, কলামিস্ট হিসেবে সারা দেশে আমার পরিচিতি প্রতিষ্ঠিত হয়।

পারিবারিক ভাইবোন ছাড়াও আমাদের ঘনিষ্ঠ আত্মীয়দের মধ্যেও অনেকে শিক্ষকতা করেছেন। আমার এক মামা শেখ আবুল কালাম আজাদ খুলনা কলেজে অধ্যক্ষ হিসেবে, আপন চাচাতো ভাই রফিকুল ইসলাম দুলাল মোল্লাহাট খলিলুর

সরকারি কলেজে অধ্যক্ষ হিসেবে শিক্ষকতা করেছেন। তার স্ত্রী মোল্লাহাট গার্লস স্কুলের হেড মিস্ট্রেস হিসেবে কাজ করছেন। চাচাতো ভগ্নিপতি এস এম জাহাঙ্গীর হোসেন ইসলামিয়া কলেজে অধ্যক্ষ হিসেবে দায়িত্বপালন করেন। আপন মামাতো ভাই মুক্তিযোদ্ধা শেখ আফজালুর রহমান খুলনা মজিদ মেমোরিয়াল সিটি কলেজে অধ্যাপনা করে কর্মজীবন শেষ করেন। তার স্ত্রী খুলনার পল্লীমঙ্গল হাই স্কুলে শিক্ষকতা করছেন। আরেক মামাতো ভাই খ্যাতিমান ফুটবলার শেখ মো. আসলামের স্ত্রী মোনা মারজান ঢাকার ভিকারুননিসা নুন স্কুলে শিক্ষকতা করেন। এ ভাবে নাম বলতে থাকলে এ তালিকার কলেবর বৃদ্ধি পাবে এবং ঘনিষ্ঠ আত্মীয়-স্বজনদের মধ্যে আরও অনেক শিক্ষক পাওয়া যাবে। তবে এ সব সম্মানিত আত্মীয়গণ শিক্ষকতা করলেও এদের সবার মন মানসিকতায় শিক্ষকতার গুণাবলি একই মাত্রায় দৃশ্যমান ছিল না। অনেক সময় আমার মনে হয়, আত্মীয়স্বজনদের একেকজনের আচরণ এতই জটিল ও বিচিত্র, তা তুলে ধরতে হলে আরেকটি পৃথক অধ্যায় রচনা করতে হবে। আর এ সব আচরণের মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ করাও জটিল কাজ। প্রাসঙ্গিক হওয়ায় এখানে একটি ছোট্ট নমুনা উপস্থাপন করছি।

মনস্তত্ত্বের শিক্ষকের রহস্যময় মনস্তত্ত্ব

আমার শ্রদ্ধেয় মামাতো ভাই মুক্তিযোদ্ধা শেখ আফজালুর রহমানের একটি ছোট্ট নমুনা পেশ করি। আফজাল ভাই আমার বয়সে বড় এবং শ্রদ্ধেয় মুরুব্বীজন। আমি তাঁকে অনেক সম্মান করি। চট্টগ্রাম থেকে খুলনায় গেলে তাঁর সঙ্গে দেখা করার চেষ্টা করি। ভাবির হাতের নাস্তা খাই। তাঁর এক ছেলে এবং এক মেয়ে। আমার এ ভাইয়ের ছেলে এবং মেয়েটি খুবই ভদ্র ও অমায়িক। আফজাল ভাইয়ের সুন্দর সংসার। কিন্তু একটি বিষয়ে এই সাইকলজির শিক্ষকের মনস্তত্ব আমার কাছে আজও রহস্য হয়ে আছে। বিষয়টি খুলে বলা দরকার। মনে করুন, আমার কোনো মামাত বা ফুফাত ছোট ভাই সিলেটে বসবাস করেন। সে ক্ষেত্রে যদি আমার ছেলে সিলেট বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়, তাহলে আমি কি আমার সে ভাইকে এ কথা বলব না? বলব না যে, ভাই আমার ছেলেটা সিলেট বিশ্ববিদ্যালয়ে লেখাপড়া করবে। আমি তো থাকব খুলনায়। তুমি তার দিকে লক্ষ্য রেখো। অবশ্যই বলব। অথচ, আমার শ্রদ্ধেয় আফজাল ভাইয়ের একমাত্র ছেলে সেনাবাহিনীতে চান্স পেল। দু'বছর চট্টগ্রামে বাংলাদেশ মিলিটারি একাডেমি (বিএমএ)-তে লং কোর্স-এর ট্রেনিং নিলো। কিন্তু আমি চট্টগ্রামে বসবাস করা সত্ত্বেও তিনি আমাকে কোনোদিন এ বিষয়ে কিছুই বলেননি। কোনোদিন ছেলেকে বলেননি যে তোমার চাচা চট্টগ্রামে থাকেন। কোনোদিন আমার ভাতিজা আমার সঙ্গে যোগাযোগ করেনি। একটা ফোনও করেনি। আমার বাসায়ও আসেনি। এই দু বছরে আফজাল ভাই অনেকবার তার ছেলেকে চট্টগ্রামে দেখতে এসেছেন। ভাতিজা হয়তো ভাবিকেও সাথে এনেছেন। আমার সঙ্গে যোগাযোগ করেননি। আমাকে একটি ফোন পর্যন্ত করেননি। আমাকে এ বিষয়ে বললে আমি যে কিছু ভাতিজার বিরাট উপকার করতে পারতাম, এমন না। ওই সময় আমি বাংলাদেশ মিলিটারি একাডেমি (বিএমএ)-তে প্রশ্ন মডারেশনের জন্য মাঝেমধ্যে ডাক পেতাম। তখন বিএমএতে গেলে হয়ত তার খোঁজ নিতাম। তার সঙ্গে সময় করে দেখা করতাম। হয়ত বলতাম, ভাতিজা ছুটি পেলে আমাদের বাসায় এসো। একবেলা আমাদের সাথে খাওয়া দাওয়া করো। অথবা, ঈদের সময় বা অন্য কোনো উৎসবে বাসায় দাওয়াত দিতাম। এর বেশি তো আর কিছুই করতে পারতাম না। কেবল তাই না, ২০১৯ সালে জানলাম আফজাল ভাইয়ের আপন শ্যালক জাহাজের ক্যাপ্টেন আমার বাসা থেকে সামান্য দূরে চট্টগ্রাম শহরের ও আর নিজাম রোডে ২৫ বছর ধরে বসবাস করেন। কিন্তু বিষয়টি আমি খুলনা থেকে আগত এক ভর্তি পরীক্ষার্থীর অভিভাবক ও কলেজ শিক্ষক জনাব আবুল বাশারের কাছে জানলাম। আফজাল ভাই আমাকে তার সম্পর্কেও কোনোদিন বলেননি। কেন শ্রদ্ধেয় আফজাল ভাই আমার প্রিয় ভাতিজাকে তার চাচার সেবা ও স্নেহ থেকে বঞ্চিত করলেন, বা তার চট্টগ্রামে বসবাসকারী শ্যালকের কথা আমাকে বলেননি, সে বিষয়ে মনস্তত্ত্বের এ শিক্ষকের মনস্তত্ব আমার কাছে আজও এক রহস্য। অথচ আমার কলেজ সহপাঠী এবং বন্ধু চন্দনার শরিফ তার কন্যার তার মেয়ে (বর্তমানে মেজর) সেনাবাহিনীতে চান্স পাবার পর সে আমার সাথে যোগাযোগ করেছিল। শরিফ আমার আত্মীয় নয়। সে আমাকে বলেছিল, বন্ধু, আমার মেয়ে চট্টগ্রামে থাকল। তুমি ওর দেখাশোনা কোরো। সেনাবাহিনীর কড়া শৃংখলা আছে। আমি তার তেমন দেখাশোনা করতে পারিনি। কিন্তু তাকে সময় বাসায় দাওয়াত করেছিলাম। আবার আমার বন্ধু তার স্ত্রীকে নিয়ে ২০১৯ সালে ক্যান্টনমেন্টে মেয়ে জামাইয়ের কাছে বেড়াতে এলে তাদের সবাইকে বাসায় দাওয়াত করে গল্পগুজব করে একসাথে ডালভাত খেয়েছিলাম। খাওয়াটা বড় কথা নয়। পরস্পরের সাথে দেখাশোনা হওয়া এবং আন্তরিকতাটাই ছিল বড়। এভাবে মানুষের বিচিত্র মন মানসিকতা নিয়ে আমার বিচিত্র অভিজ্ঞতা হয়েছে। প্রতিটি পরিচিত মানুষকে মনে হয়েছে একটি না পড়া উপন্যাস। আর এ সব উপন্যাসের বিভিন্ন অধ্যায়ের পাতায় পাতায় ছড়ানো রয়েছে অনেক অনুদ্ঘাটিত রহস্য। পরবর্তী অধ্যায়গুলোতে আমার শিক্ষাজীবনের ঘটনাবলীর মধ্য দিয়ে মানব চরিত্রের এ সব লুকায়িত রহস্যের ওপরে ক্রমান্বয়ে আলোকপাত করা হবে।

দুই
কানাডায় উচ্চশিক্ষা গ্রহণ

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের রাজনীতিবিজ্ঞান বিভাগে প্রভাষক হিসেবে যোগদানের দু'বছর পর বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকদের একাডেমিক কর্মকাণ্ড সম্পর্কে কিছুটা ধারণালাভ করি। ক্রমান্বয়ে বুঝতে পারি, বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক হিসেবে ভালো করতে হলে কেবল শিক্ষকতা ও গবেষণা প্রকাশনা করলেই হবে না; এ জন্য উচ্চতর ডিগ্রিও করতে হবে। ডিগ্রি না করলে পদোন্নতির প্রতিযোগিতায় পিছিয়ে পড়তে হবে। এ জন্য আমি উচ্চতর ডিগ্রি করতে মনস্থির করি। এ ব্যাপারে বিভাগীয় সিনিয়র শিক্ষকদের সঙ্গে পরামর্শ করি। তাঁরাও আমার এ সিদ্ধান্তে সায় দেন। উচ্চশিক্ষার জন্য আমি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে কি সুবিধা পাব সে সব জানার চেষ্টা করি। আগে যে সকল সহকর্মী বিদেশ থেকে ডিগ্রি করে এসেছেন, তাঁদের সঙ্গেও এ বিষয়ে আলোচনা করি।

ওয়াটারলু বিশ্ববিদ্যালয়

আমি ১৯৮৮ সালে কানাডার ওয়াটারলু ইউনিভার্সিটিতে এমএ প্রোগ্রামে ভর্তির জন্য দরখাস্ত করলে আমাকে অ্যাডমিশন দেয়া হয়। এর পর এক চিঠিতে আমাকে টোফেল স্কোর পাঠাতে বলা হয়। আমি ওই চিঠির জবাবে জানাই, আমি একাডেমিক কাজে খুবই ব্যস্ত। আমার পক্ষে টোফেল পরীক্ষা দেবার মত সময় বের করা কঠিন। তবে সম্প্রতি কানাডা থেকে প্রকাশিত একটি গবেষণা জার্নালে আমার সহকর্মীর সঙ্গে যৌথভাবে ইংরেজি ভাষায় লেখা আমাদের একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। প্রবন্ধটির রেফারেন্স দিয়ে বলি, এটি দেখার পর যদি আপনাদের মনে হয়, আমার টোফেল স্কোর পাঠাবার প্রয়োজন আছে, তাহলে আমি টোফেল পরীক্ষা দিয়ে তার স্কোর সময়মতো পাঠাতে পারবো কিনা সে বিষয়ে আপনাদের জানাবো। এ চিঠি পাবার পর আমাকে জানানো হয়, আমার কোনো টোফেল স্কোর পাঠানো লাগবে না। আমাকে যে রিসার্চ অ্যাসিস্টেন্টশিপ দেয়া হয়েছিল তার সঙ্গে আরো একটি বিভাগীয় বৃত্তি দেয়া হবে। চিঠিতে আশা করা হয়, যথাসময়ে আমি যেন সংশ্লিষ্ট এমএ প্রোগ্রামে যোগ দেই।

এ চিঠি পাবার পর আমি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে শিক্ষাছুটি নিয়ে ১৯৮৮ সালের আগস্ট মাসে স্ত্রীকে দেশে রেখে কানাডার উদ্দেশ্যে রওনা হই। এর আগে কোনোদিন বিদেশে না যাওয়ায় ভয়ে ভয়ে ঢাকা থেকে বিমানে উঠি। আমার

বিমান যাত্রার রুট ছিল ঢাকা লন্ডন টরেন্টো। লন্ডনের বিশাল হিথরো বিমানবন্দরের কার্যক্রম দেখে কিছুটা অবাক হয়েছিলাম। লন্ডন থেকে টরেন্টোগামী বিমানে আমার পাশের দুটি আসনে এক বয়স্ক কানাডিয়ান দম্পতি বসেছিলেন। তাঁদের বয়স আনুমানিক ৬৫ বছর হলেও তাঁরা ভালো স্বাস্থ্যের অধিকারী এবং হাসিখুশি ছিলেন। আমি স্ত্রীকে দেশে রেখে একাকী প্রথমবার বিদেশে যাচ্ছি বলে অনেকটা মনমরা হয়ে বসেছিলাম। বিমানবালারা ড্রিংস দিতে এলে জুস পান করলাম। তারও অনেক পর পাশের ভদ্রমহিলা আমার সঙ্গে কথা বললেন। তাঁর ইংরাজি উচ্চারণ অনুধাবন করা আমার জন্য বেশ কষ্টকর ছিল। কারণ, পরে জেনেছিলাম তাঁরা কানাডিয়ান হলেও বেশি শিক্ষিত নন। পেশায় কৃষক এ দম্পতি খুব কম লেখাপড়া জানেন। তবে তাঁদের ভদ্রতা ছিল অসাধারণ। ভদ্রমহিলা মায়াভরা দৃষ্টিতে আমাকে বলেছিলেন,

: হাই ডিয়ার, তুমি কোথায় যাবে? আমি অনেক কষ্ট করে তার প্রশ্নটি বুঝে বলেছিলাম—
: আমি ওয়াটারলু যাব।
: তোমার কে আছে সেখানে?
: কেউ নেই, আমি ওয়াটারলু বিশ্ববিদ্যালয়ে যাব। সেখানে লেখাপড়া করব।
: তুমি ছাত্র? কোন দেশ থেকে এসেছ তুমি?
: হ্যাঁ, আমি ছাত্র। আমি বাংলাদেশ থেকে এসেছি।
: বাংলাদেশ কোথায়?
: এটা এশিয়ায়। আপনি কি বাংলাদেশের নাম শোনেননি?
: না, দুঃখিত। আমি ইন্ডিয়ার নাম জানি।
: আচ্ছা। বাংলাদেশটা ইন্ডিয়ার পাশেই। এবার তার স্বামী মুখ খুললেন—
: তোমরা অনেক পরিশ্রমী। কতদূর থেকে কানাডায় যাচ্ছ লেখাপড়া করতে। কানাডায় কাউকে চেনো কি?
: না, তেমন কাউকে চিনি না।
: আশ্চর্য! কাউকে জানো না?
: না। তবে একজন অধ্যাপককে জানি। তার নাম বললাম।

এরা আমার সঙ্গে কথা বলে খুশি হচ্ছিলেন। দু'জন দৃষ্টি বিনিময় করে পরস্পরকে ফিসফিস করে কি যেন বলছিলেন। তাদের চোখেমুখে ছিল মায়াভরা সহযোগিতার দৃষ্টি। ভদ্রতা করে আমি তাঁদেরকে জিজ্ঞেস করলাম—

: যদি কিছু মনে না করেন, আপনারা কি করেন?
: আমরা? আমরা কৃষক। আমরা মাঠে কাজ করি।

এর মধ্যে খাবার দেয়া হলে আলাপে ছেদ পড়ল। ক্ষুধার্ত ছিলাম। নতুন ধরনের ডিশ। ভালোই লাগল। ভদ্রমহিলা মাঝেমধ্যে আড়চোখে আমাকে দেখছিলেন। পরে তাদের সঙ্গে আরও কিছু আলাপচারিতা হয়েছিল। আমার অনেক কিছু

জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছে হচ্ছিল। কিন্তু দুর্বল ইংরেজি ও ভিন্ন উচ্চারণের কারণে আমার কথা বুঝতে পারবেন কিনা ভেবে সংকোচে বেশি কথা বলিনি। টরেন্টো এয়ারপোর্ট থেকে ওয়াটারলু দুই ঘন্টার ড্রাইভ। ট্যাক্সি ড্রাইভারকে ঠিকানা বলে রওনা হলাম। আহমেদ সামিউল হাসান পরিবারের সঙ্গে ম্যারেড স্টুডেন্টস অ্যাপার্টমেন্টে আমার থাকার কথা। জনাব হাসানও চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক। পূর্ব পরিচয় ও ঘনিষ্ঠতা আছে। তবে তিনি বাসায় থাকবেন না। একদিন পর আসবেন। আগে থেকে প্রতিবেশি আরেক বাংলাদেশি ছাত্রের বাসায় একদিনের জন্য আমার থাকার ব্যবস্থা করেছেন। একদিন পর সামিউল ভাই আসলে আমি তার বাসায় একটি রুমে পেয়িং গেস্ট হিসাবে থাকা শুরু করব। নির্দিষ্ট বাসায় গিয়ে বাংলাদেশি খাবার খেয়ে ঘুমালাম। যাঁর বাসায় ছিলাম যতদূর মনে পড়ে তাঁর নাম শরীফ হোসেন। তিনি পিএইচডি ছাত্র। ভাবি বরিশালের মেয়ে। আমার খোঁজ খবর নিলেন। যত্ন করে আতিথেয়তা করলেন। সকালে উঠে নাস্তা করে বিভাগের উদ্দেশ্যে বের হলাম।

কানাডিয়ান ভদ্রতা

আমার থাকার ব্যবস্থা আগে থেকে করতে পেরেছিলাম বলে এ বিষয়ে আমার অসুবিধা হয়নি। কিন্তু কোনো ছাত্র যদি থাকার ব্যবস্থা না করেই চলে আসে, তার জন্য বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ অস্থায়ীভাবে থাকার ব্যবস্থা করে। এমন শিক্ষার্থী যদি সেন্ট্রাল ক্যাফেটারিয়ায় যোগাযোগ করে, তবে তারা স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে ছাত্রদের সাহায্য করতে চান এমন ব্যক্তিদের তালিকা থেকে কাউকে ফোন করে ডেকে সাময়িকভাবে তার থাকার ব্যবস্থা করে দেন। জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের সরকার ও রাজনীতি বিভাগের শিক্ষক নইম সুলতান থাকার ব্যবস্থা না করে চলে এসেছিলেন বলে তিনি এ ব্যবস্থার স্মরণাপন্ন হয়েছিলেন। এ বিষয়টি আমি তাঁর কাছ থেকে পরে জেনেছিলাম। নইম ক্যাফেটারিয়ায় এ বিষয়ে খোঁজ নিলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি তাঁকে প্রথমে কফি খাওয়ান। কফির দাম দিতে গেলে তিনি না নিয়ে ভদ্রতা করে বলেন, 'এটি নতুন বিদেশি শিক্ষার্থীর জন্য ওয়েলকাম কফি। এরপর যখন আপনি কফি খাবেন, তখন আপনাকে দাম দিতে হবে।' তিনি নইমকে বসতে বলে একজনকে ফোন করেন। ওই ব্যক্তি মিনিট দশেকের মধ্যে এসে নইমের সঙ্গে পরিচিত হন এবং তাঁকে আপাতত থাকার জন্য তাঁর বাসায় নিয়ে যান।

ভার্ন ফেয়ারওয়েল ওয়াটারলু বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিসংখ্যান বিভাগের সিনিয়র অধ্যাপক। তিনি যত্নের সঙ্গে নইমকে তাঁর বাসায় নিয়ে থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা করেন। ক্যাম্পাস চেনার ব্যাপারে সহায়তা করেন। যতদিন সে নিজে ভালো থাকার জায়গা জোগাড় করতে না পারে ততদিন তাঁর বাসায় রাখেন। দু'দিন পর অধ্যাপক নইমকে জিজ্ঞেস করেন, সে ক্যাম্পাসের রাস্তাগুলো ঠিকভাবে চিনেছে কিনা। নইম যখন বলেন সে চিনেছে, তখন তিনি তার পরীক্ষা নেন। তিনি তাঁকে নিজ গাড়িতে উঠিয়ে দু'তিন মিনিট গাড়ি চালিয়ে এক রাস্তায় নিয়ে নামিয়ে দেন।

তাঁর হাতে কয়েকটি কয়েন এবং এক টুকরো কাগজে বাসার ঠিকানা ও ফোন নম্বর লিখে দেন। বলেন, তুমি যদি রাস্তা সঠিকভাবে চিনতে পারো তাহলে এখান থেকে আমার বাসায় হেঁটে যেতে তোমার ৫-৬ মিনিট সময় লাগবে। আর যদি যেতে না পারো, যদি হারিয়ে যাও, তাহলে রাস্তার পাশের টেলিফোন বুথ থেকে এই নাম্বারে ফোন করলে আমি তোমাকে বাসায় পৌছতে সাহায্য করব। আসলে ওখানে সব রাস্তাগুলো ছিল প্রায় একই রকম। নইম রাস্তা হারিয়ে ফেলেন। মিনিট দশেক চেষ্টা করে বাসা খুঁজে বের করতে না পেরে বাধ্য হয়ে অধ্যাপক ভার্নকে ফোন করেন। অধ্যাপক তখন তাঁকে তাঁর আশেপাশের যে কোন একটি সাইনবোর্ড পড়তে বলেন এবং ওখানেই দাঁড়িয়ে থাকতে ব'লেন। তিনি মাত্র চার মিনিটের মধ্যে সেখানে গাড়ি নিয়ে হাজির হন। তারপর তাঁকে রাস্তা চিনিয়ে বাসায় নিয়ে আসেন।

এ বাসায় ওঠার ৪-৫ দিন পর নইম একটি বাসা ঠিক করেন। তিনি অধ্যাপক ভার্নকে অনেক ধন্যবাদ জানান এবং নতুন বাসায় উঠতে চান। অধ্যাপক জানতে চান, সে কোথায় বাসা ঠিক করেছে। নইম তাকে বাসার ঠিকানা বলার পর ভার্ন বলেন, তিনি বাসাটি একবার দেখতে চান। পরে নইম তাঁকে বাসাটি দেখালে তিনি তাকে ওই এলাকায় বাসা না নেবার জন্য পরামর্শ দেন। তিনি বলেন, নিরাপত্তার দিক থেকে এ এলাকাটি খুব একটা ভালো না। তুমি রিসার্স স্টুডেন্ট। অনেক সময় রাতে যাতায়াত করবে। সে জন্য তোমার জন্য এ এলাকায় থাকা আমি পছন্দ করব না। তুমি যতদিন নিরাপদ এলাকায় ভালো বাসা না পাও নিঃসংকোচে আমার এখানে থাকো। এর কয়েকদিন পর নইম আর একটি বাসা ঠিক করেন। আবার ভার্নকে বললে তিনি আবারও বাসাটি দেখতে চান। এবার তিনি বাসাটি পছন্দ করেন এবং নইমকে নতুন বাসায় মালামালসহ পৌঁছে দেন। এ রকম সহোযোগিতা নতুন ছাত্রদের জন্য খুবই উপকারী। তবে আমি যেহেতু আগেই ম্যারেড স্টুডেন্টস অ্যাপার্টমেন্টে বাংলাদেশি ছাত্রের বাসায় জায়গা ঠিক করতে পারি, সে কারণে আমার ক্ষেত্রে এমন সহায়তার প্রয়োজন পড়েনি। থাকার ব্যাপারে আমার অসুবিধা হয়নি।

যা হোক আমি যে ঠিকানায় উঠেছিলাম সে এপার্টমেন্ট থেকে আমার বিভাগ মাত্র ৪-৫ মিনিট হাঁটার পথ। কিন্তু আমি যেহেতু চিনি না, সে কারণে আমি বাসা থেকে বেরিয়ে ম্যাপ দেখে কোনদিকে যাব বুঝার চেষ্টা করছিলাম। কিছুদুর যাওয়ার পর মনে হলো আমি মনে হয় সঠিক পথে নেই। সবগুলো রাস্তাই প্রায় এক রকম মনে হচ্ছিল। রাস্তায় অনেক ছাত্রছাত্রী। তারা সবাই যে যার গন্তব্যে ছুটছে। আশেপাশে তাকিয়ে কারো সাহায্য নেয়ার কথা ভাবলাম। বড় সাইজের ভারী ব্যাকপ্যাক কাঁধে ঝাঁকড়া সোনালি চুলের একটি সাদা মেয়েকে এক্সকিউজ মি বলে দৃষ্টি আকর্ষণ করলাম। ম্যাপ দেখিয়ে বললাম, আমি এই বিল্ডিংয়ে রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগে যাব। আপনি কি আমাকে বলতে পারবেন এটা কোনদিকে? মেয়েটি ম্যাপের দিকে না তাকিয়ে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন, এটা খুবই কাছে। আপনি সঠিক পথে আছেন। এখান থেকে সোজা গিয়ে সামনে ডাইনে মোড়

নিবেন। এক মিনিট হেঁটে বা দিকে ৩০ সেকেন্ড হাঁটলেই পেয়ে যাবেন আপনার বিল্ডিং। আমি তাকে ধন্যবাদ দিয়ে হাঁটা শুরু করলাম। দশ বারো কদম হাঁটতেই শুনলাম পেছন থেকে কে যেন আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করছেন। পেছনে ফিরে দেখি সেই মেয়েটি দ্রুত গতিতে হেঁটে আমার কাছে এসে বললেন, কিছু মনে করবেন না, আপনি কি নতুন ছাত্র? আমি মাথা নেড়ে 'হ্যা' উত্তর দিলাম। মেয়েটি দুঃখ প্রকাশ করে বললেন, ক্ষমা করবেন, আমার আগেই বুঝা উচিত ছিল। আমার ওভাবে আপনাকে পথ বলে দেয়া ঠিক হয়নি। আপনি আমাকে অনুসরণ করুন। আমি আপনাকে আপনার গন্তব্যে পৌঁছে দেব। আমি বললাম, উল্টোপথে গেলে আপনার সময় নষ্ট হবে। আমি ঠিকই একা যেতে পারব। তিনি আমার কথা শোনার আগেই হাটা শুরু করায় তাকে অনুসরণ করা ছাড়া আমার উপায় ছিল না। ভারি ব্যাগ নিয়ে মেয়েটি এত দ্রুত গতিতে হাঁটছিলেন যে আমার তাঁকে অনুসরণ করতে ঘাম বের হবার অবস্থা। প্রায় এক মিনিট হেঁটে মেয়েটি পেছন ফিরে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, এখান থেকে আমরা ডাইনে মোড় নেবো। তারপর আরও ২০-২৫ সেকেন্ড হেঁটে বাঁ দিকে গিয়ে বললেন, আমরা ওই দিকে যাব। ওই যে বিল্ডিংটা দেখছেন ওটাই আপনার গন্তব্য। আমি তাঁকে ধন্যবাদ দিলে তিনি না শুনে সে দিকেই হাঁটতে থাকলেন। আমাকে একেবারে ওই বিল্ডিংয়ের দরজায় নিয়ে দরজাটা খুলে বললেন, এই বিল্ডিংয়ের তিন তলায় আপনার রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ। 'ওয়েলকাম টু দ্য ইউনিভার্সিটি অব ওয়াটারলু'— বলে আমাকে কোনো ধন্যবাদ দেবার সুযোগ না দিয়ে তিনি হন হন করে তাঁর গন্তব্যে ছুটলেন। আমি মেয়েটির ভদ্রতাজ্ঞান দেখে অবাক হয়ে তাঁর ঝাঁকড়া সোনালি চুলের দিকে তাকিয়ে মনে মনে তাঁকে ধন্যবাদ জানালাম।

পরিবেশ, লেখাপড়া ও আড্ডা

রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগে গিয়ে বিভাগীয় চেয়ারম্যানের মহিলা সেক্রেটারি জোয়ান ভয়সনের কাছে পরিচয় দিলাম। একটি আকর্ণ হাসি দিয়ে 'হাই মুহাম্মেদ ওয়েলকাম' বলে তিনি আমাকে যেভাবে উষ্ণ আলিঙ্গন করে সংবর্ধনা জানালেন, তাতে পাশ্চাত্যের সংস্কৃতিতে অনভ্যস্ত আমি লাল হয়ে উঠলাম। তার সঙ্গে প্রাথমিক আলাপে বিভাগীয় শিক্ষক, কোর্স, রুটিন ইত্যাদি বিষয় সম্পর্কে জানলাম। ওয়াটারলু বিশ্ববিদ্যালয়টি ছোট্ট ওয়াটারলু শহরের নিরিবিলি একাডেমিক পরিবেশে অবস্থিত। বিভাগে গ্রাজুয়েট ছাত্রদের বসার ঘরে কয়েকজন ছাত্রের সঙ্গে কথা হলো। তবে তাদের উচ্চারণ এবং বাচনভঙ্গি দেখে আমাকে বেশ ধীরে সুস্থে কথা বলতে হলো। বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসটি বেশ সুন্দর। বাইরে বেরিয়ে একটু ঘুরে দেখলাম। সেপ্টেম্বরে ডানা পর্টার লাইব্রেরির পাশে সবুজ ঘাসে খোলামেলা মেয়েরা কেউ বই খুলে পড়ছেন। কেউ ছেলে বন্ধুর কোলে মাথা রেখে রোদে শুয়ে আছেন। কোথাও একেলা, আবার কোথাও জুটিতে জুটিতে। সবাই হাসিখুশি। প্রাণবন্ত। ক্যাম্পাসে প্রচুর কাঠবিড়ালি ছেলেমেয়েদের আশেপাশে

নির্ভয়ে ঘুর ঘুর করছে। কেউ ওদের বিরক্ত করেন না। ওরাও ছাত্রদের একেবারে কাছে চলে আসে। ডাস্টবিনে উঠে শিক্ষার্থীদের ফেলে দেয়া ফ্রেঞ্চ ফ্রাই খায়। সব মিলিয়ে পরিবেশটি ছিল চমৎকার। প্রথম দেখাতেই লাইব্রেরিটা আমার খুব পছন্দ হলো। লাইব্রেরিতে ঢুকে দেখলাম অসংখ্য শিক্ষার্থী। শিক্ষকও আছেন। যে যার কাজ করছেন। কোনো শব্দ নেই। চুপচাপ যে যার লেখাপড়া নিয়ে ব্যস্ত। কর্মকর্তা কর্মচারীরা কথা বলছেন খুব নীচু স্বরে ফিসফিস করে। পরবর্তীতে এই লাইব্রেরিতে প্রচুর সময় কাটিয়েছি (ডানা পর্টার লাইব্রেরির ছবির জন্য দেখুন পরিশিষ্ট- ২:১)।

ওয়াটারলুতে প্রায় এক বছর ছিলাম। সময়টা মন্দ কাটেনি। একজন বাংলাদেশি এবং বেশ কয়েকজন ভারতীয় বন্ধুবান্ধব জুটে গিয়েছিল। তাদের সঙ্গে গভীর রাত পর্যন্ত আড্ডা চলত। বাংলাদেশি বন্ধু নইম সুলতান এবং ভারতের দেবাশীষ জানা, বিশ্বজিৎ নন্দী, শিবদাস ঘোষ, মিতালি সিনহাসহ আরো অনেকের সঙ্গে সখ্য জমে ওঠে। বিশেষ করে আমি নইম এবং মিতালি ছিলাম একই বিভাগের শিক্ষার্থী। ফলে আমরা প্রায়সময় একত্রেই থাকতাম। মিতালির একটি আমেরিকান ছেলের সঙ্গে সখ্য গড়ে ওঠে। অবশ্য তিন চার মাস পরই তার সে ঘোর কেটে যায়। সেমিস্টার চলাকালীন আমরা রাত জেগে লেখাপড়া করতাম। লেখাপড়া শেষ হলে গভীর রাতে বাসায় গিয়ে চাবি দিয়ে শব্দ না করে আমি চুপিচুপি তালা খুলে শুয়ে থাকতাম। যে পরিবারের সঙ্গে আমি থাকতাম তাদের যেন সামান্যতম অসুবিধা না হয়, সে জন্য আমি সব সময় সতর্ক থাকতাম। আবার সকালে উঠে নাস্তা খেয়েই ক্যাম্পাসে চলে আসতাম। নিজের অফিসে বা লাইব্রেরিতে সময় কাটাতাম।

ইউক্রেনিয়ান কানাডিয়ান শিক্ষক জন জেওয়াস্কীর সঙ্গে আমি 'বাংলাদেশের সমাজ ও রাজনীতির ওপর প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরণের প্রভাব' বিষয়ে মাস্টার্স থিসিস লিখি। বিষয়টি নিয়ে আমি সুপারভাইজারের সঙ্গে প্রথমে একদিন আলোচনা করি। আমি কি লিখতে চাই সে বিষয়ে তিনি প্রাথমিক ধারণা পান। আমাকে তিনি এ বিষয়ে কমপারেটিভ পাবলিক অ্যাডমিনিস্ট্রেশন কোর্সের ক্লাসে সেমিনার দিতে বলেন। আমি রাজি হই। ওই সেমিনারে আমি প্রশংসিত হই। সেমিনার দেবার পর প্রফেসর আমাকে ডেকে তাঁর রুমে নিয়ে যান। তিনি আমার বক্তব্য ও সেমিনার উপস্থাপনা ভঙ্গিমার প্রশংসা করেন। বলেন, সেমিনার শুনে তোমার বক্তব্য আমার কাছে আগের চেয়ে অনেক বেশি পরিষ্কার হয়েছে। তুমি তো বোর্ডে আঁকাআকি করে ভালোই প্রেজেন্টেশন দিয়েছো। আমার ধারণা তোমার সহপাঠীরা এটা ভালোই বুঝতে পেরেছে। আমি বললাম, দেখুন, আমি তো দেশে শিক্ষকতা করি। ছাত্রদের বুঝানোই তো আমার কাজ। আমি সে ভাবেই বিষয়টি উপস্থাপনার চেষ্টা করেছি। কোর্সগুলোতে ক্লাস শুরু হলে আমি প্রথমে কেবল শুনতাম। আলোচনায় অংশগ্রহণ করতাম না। ভাবতাম, আমি প্রশ্ন করলে যদি এরা বুঝতে না পারেন। পরে যখন জানলাম, ক্লাস পার্টিসিপেশনের ওপর

নম্বর রয়েছে। আমি যদি ক্লাসের আলোচনায় অংশগ্রহণ না করি তাহলে আমার গ্রেডের ওপর নেতিবাচক প্রভাব পড়বে। তখন পরের ক্লাস থেকে প্রশ্ন করা শুরু করি।

পরদিন কমপারেটিভ পাবলিক অ্যাডমিনিস্ট্রেশন কোর্সের ক্লাসে যে প্রশ্নটি করেছিলাম তা আমার এখনও মনে আছে। ওইদিন তামারা ফ্লেমিংটন নামের একজন কানাডিয়ান সহপাঠীর প্রেজেন্টেশন ছিল। সে ইরানিয়ান অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের ওপর প্রেজেন্টেশন দিয়েছিল। কয়েকজনের প্রশ্ন করার পর আমি হাত তুলে শিক্ষকের দৃষ্টি আকর্ষণ করার সঙ্গে সঙ্গে টিচার আমাকে ফ্লোর দেন। আমি প্রথমে তাঁর পেপারের কয়েকটি ইতিবাচক দিক তুলে ধরে তাঁকে প্রশংসা করি। পরে বলি, দুঃখিত, তোমার পেপারটিকে পক্ষপাতমুক্ত বলতে পারছি না। তুমি পেপার লিখেছো ইরানিয়ান অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের ওপর। অথচ তোমার রেফারেন্স তালিকায় কোনো ইরানিয়ান লেখকের বই বা প্রবন্ধের উল্লেখ নেই। তুমি কেবল উত্তর আমেরিকার লেখকদের বই এবং প্রবন্ধ ঘাঁটাঘাঁটি করে এ পেপার তৈরি করেছ বলে আমার কাছে প্রতীয়মান হয়েছে। অন্তত তোমার রেফারেন্স লিষ্ট সে সাক্ষ্য দিচ্ছে। তুমি যে দেশের প্রশাসনের সমালোচনা করলে, সে দেশের লেখকরা এ সম্পর্কে কি বলেন সে মতামত যদি তুলে না ধরো, তাহলে তোমার বিশ্লেষণ তো কিছুটা পক্ষপাত দোষে দুষ্ট হবে। বলো, হবে না? অধ্যাপক আমার পয়েন্টটি গ্রহণ করলেন এবং এ ব্যাপারে তামারার দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন।

এরপর থেকে আমি প্রায় প্রতি ক্লাসেই আলোচনায় অংশগ্রহণ করতে থাকি। তবে পরীক্ষার ফল বের হলে আমার গ্রেড 'বি প্লাস' দেখে আমি অবাক হই এবং ফলাফল চ্যালেঞ্জ করার জন্য টিচারের অ্যাপয়েন্টমেন্ট চাই। ওই দিন টিচারকে বলি,

: বলুন আপনি আমাকে কিভাবে 'বি প্লাস' দিয়েছেন।
: তুমি কি আরও ভালো গ্রেড আশা কর?
: নিশ্চয়ই।
: আমি কি তোমার প্রতি অবিচার করেছি?
: আমি তা বলব না। তবে আমার মনে হয় আপনার কোনো ভুল হতে পারে।
: কেমন ভুল?
: জানিনা। তবে আপনিই বলুন, ক্লাস পার্টিসিপেশনে আমাকে কত দিয়েছিলেন? আমার প্রেজেন্টেশনের পর আপনি আমাকে ডেকে নিয়ে প্রশংসা করেছিলেন এবং তখনই বলেছিলেন, আপনি আমাকে 'এ' দিচ্ছেন।
: হ্যাঁ, আমার তা মনে আছে।
: বেশ তাহলে আপনিই সব নম্বরগুলো যোগ করুন। দেখুন আমার গ্রেড কত হয়।

এবার টিচার আমার সামনেই যোগ করে দেখলেন আমার গ্রেড হয় 'এ' মাইনাস। তিনি বললেন, তোমার গ্রেড 'এ' মাইনাস হবে। এটা আমি পরিবর্তন করব। আমি

তাকে ধন্যবাদ দিলাম। পরে তিনি 'বি প্লাস' পরিবর্তন করে আমার গ্রেড 'এ মাইনাস' করেছিলেন। ওয়াটারলুতে থাকাকালীন লেখাপড়ার বেশি চাপ ছিল। খুব একটা ঘোরাঘুরি করতে পারিনি। একবার কেবল বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে দলবেঁধে নায়েগ্রা জলপ্রপাত দেখতে গিয়েছিলাম। আর প্রয়োজনে বারদুয়েক গিয়েছিলাম টরেন্টো শহরে। নায়েগ্রা জলপ্রপাত দেখে খুশি হই। সকালের নায়েগ্রা আর বিকাল বা সন্ধ্যার নায়েগ্রার দৃশ্য ভিন্ন রকম। এক ফাঁকে নইম এবং আমি খাবার দোকান থেকে কিছু কিনে খাই। পোষমানা পাখির মত সি গালগুলো চারিদিকে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। কেউ তাদের বিরক্ত করেন না। অনেকে পাখিদের খেতে দেন। আমি এবং নইম পাখীগুলোকে কিছু আলুর চিপস খাওয়াই (ছবির জন্য দেখুন পরিশিষ্ট-২:২)। পাখিগুলো ডাক দিলে কাছে চলে আসে। অনেক সময় না ডাকলেও কাছে এসে চোখের দিকে তাকায়। এর অর্থ হলো, সে ক্ষুধার্ত। তাকে খাবার দিতে হবে।

ওয়াটারলু সিটির শপিং মলগুলোতে বেশি ভিড় থাকে না। অবশ্য আমি খুব একটা কেনাকাটা করতাম না। প্রয়োজনীয় জামাকাপড় দেশ থেকে নিয়ে গিয়েছিলাম। গ্রোসারি শপ থেকে মাঝেমধ্যে জুস, চিপস, সিরিয়াল, দুধ বা হালকা খাবার কিনতাম। ওয়াটারলু পৌঁছার পর আবহাওয়া ভালো ছিল। প্রয়োজনীয় কাপড়চোপড় থাকলেও শীতে বরফ পড়া শুরু হলে একটি স্নো বুট কিনতে বাধ্য হই। কারণ, বরফের ওপর দিয়ে চামড়ার জুতা পরে হাঁটা যায় না। এ লক্ষ্যে আমি জুতার দোকানে যাই। আমার উদ্দেশ্য ছিল কমদামি স্নো বুট কেনা। কারণ, এক বছর পর যখন দেশে ফিরে যাব তখন তো আর এ জুতা কাজে লাগবে না। কাজেই বড় একটি জুতার দোকানে গিয়ে আমি স্নো বুট দেখতে লাগলাম। একজোড়া বুট দেখে আমার পছন্দ হলো। কারণ, এর দাম ছিল অন্য জুতাগুলোর চাইতে অনেকটা কম। একজন সেলসপার্সন এসে আমাকে সহায়তা করতে চাইলে আমি বললাম, দেখুন তো, আমি এই জুতাজোড়া কিনতে চাইছি। আপনার কি মনে হয় এটি একজন ছাত্রের এক বছর পায়ে দেবার জন্য ভালো হবে? ভদ্রলোক বললেন, এ জুতাজোড়া যদি আপনি ক্রয় করেন তাহলে একটা অসুবিধা আছে। এর সোলের পাশ থেকে বরফের পানি ঢুকে আপনার মোজা ভিজিয়ে দেবে। অবশ্য আপনি যদি তিন ডলার দিয়ে একটি সলুশন ক্রয় করেন, তাহলে এ জুতাটি আমি আপনাকে কিনতে বলব। সেক্ষেত্রে আপনাকে অন্তত প্রতি দু'সপ্তাহ পরপর একবার এ সলুশন সোলের পাশ দিয়ে লাগাতে হবে। তাহলে আর পানি ঢুকতে পারবে না। আমি বললাম, সে তো আরেক ঝামেলা। হ্যাঁ তা বটে, আপনি কি এটাই কিনবেন? আমি কি আপনাকে অন্য কোনো রকম বুট দেখাতে পারি? আমাদের স্টকে আরও নানা রকম বুট রয়েছে। আমি বললাম, আমি অন্যগুলো দেখেছি, কিন্তু এটি আমি পছন্দ করেছিলাম এর কম দামের কারণে। আচ্ছা আপনার কাছে কি এ রকম দামের মধ্যে অন্য স্নো বুট আছে? দুঃখিত, আপনি যদি আঠা কিনতে না চান, তাহলে আমি আপনাকে এ জুতাটি না কিনতে পরামর্শ

দেবো। তবে আমাদের স্টকে আর সব জুতার দাম একটু বেশি। আপনি এমন দামে জুতা কিনতে চাইলে আমি আপনাকে একটি দোকানের নাম বলে দিচ্ছি। ওই দোকানে আপনি এ রকম দামে জুতা পাবেন এবং আপনার আঠাও কেনা লাগবে না। সেটা আপনার জন্য ভালো হবে। তিনি আমাকে একটি দোকানের নাম বললেন। আমি তাঁর পেশাদারিত্ব, সততা ও ভদ্রতায় খুশি হলাম এবং তাকে ধন্যবাদ দিয়ে সেই দোকানে গিয়ে একই রকম দামের একটি স্নো বুট কিনে নিয়ে এলাম।

লিন্ডা ও কোরি

ওয়াটারলুতে অন্য যেসব শিক্ষার্থী আমার সঙ্গে বিভিন্ন কোর্সে পড়তেন তাদের অনেককে মনে নেই। চার্লস বোরাস, লিন্ডা ওয়াইলস এবং তামারা ফ্লেমিংটনকে মনে আছে। এরা তিনজনই ছিলেন কানাডিয়ান। চার্লস এবং তামারা ছিল ভালো ছাত্র। লিন্ডা ছিল তার বিপরীত। গ্রাজুয়েট ছাত্রদের রুমে সে আমার পাশের ডেস্কে বসত। তার ছেলে বন্ধুর সংখ্যা ছিল অনেক বেশি। সে যখনই আসত, যতক্ষণ থাকত, অনেকটা সময়জুড়ে ফোনে কথা বলত। আমার সাথে মাঝেমধ্যে হাই হ্যালো হত। আমি বিরক্ত হলেও কিছু বলতাম না। তবে একদিন আমি তাকে বলি।

: লিন্ডা, তোমাকে একটি প্রশ্ন করলে কিছু মনে করবে কি?
: না, কি প্রশ্ন করতে চাও? করতে পারো।
: তুমি কি আমাকে বলতে পারবে তোমার বয়ফ্রেন্ডের সংখ্যা কতজন? এমন প্রশ্ন করে আমি বুঝতে পারি যে, একটি ভিনদেশি মেয়েকে এ ধরনের প্রশ্ন করা আমার একেবারেই ঠিক হয়নি। সে এমন প্রশ্নে বিরক্ত হতে পারে। কিন্তু লিন্ডা রাগ হয়নি। স্বাভাবিকভাবেই জবাব দিলো—
: এত কঠিন প্রশ্ন করবে জানতাম না। স্যরি, তোমার এ প্রশ্নের উত্তর দিতে পারলাম না। তবে মুহামেদ, অন্য কোনো মেয়েকে যেন এমন প্রশ্ন কোরো না।
: না না, তা করব না। তুমি আর আমি পাশাপাশি ডেস্কে বসি, সে জন্য কৌতূহলবশে জানতে চেয়েছি। প্লিজ তুমি কিছু মনে কোরো না।

আমাদের অফিসে কোরি নামের আর একটি চঞ্চল চটপটে স্বভাবের মেয়ে ছিল যে আমার সাথে খুব একটা কথা বলত না। করিডোরে বা অফিসে একেবারে সামনাসামনি হলে হাই-হ্যালো বিনিময় হত। কোরি ছিল একটি ভালো মনের মেয়ে। বিষয়টি আমি পরে একবার বিপদে পড়ে বুঝতে পেরেছিলাম। কি বিপদে পড়েছিলাম সে সম্পর্কে বলা দরকার।

একবার হঠাৎ করে আমার ব্যাকপেইন এত বেশি বেড়ে যায় যে আমাকে ট্রিপল নাইন নাম্বারে ফোন করে অ্যামবুলেন্স ডেকে কিচেনার-ওয়াটারলু হাসপাতালে ভর্তি হতে হয়। আমি ফোন করার ৩-৪ মিনিটের মধ্যে অ্যামবুলেন্স চলে আসে এবং আমাকে স্ট্রেচারে শুইয়ে অ্যামবুলেন্সে তুলে শুইয়ে দেয়া হয়। নার্সরা ফোনে

হাসপাতালের ডাক্তারদের সঙ্গে আমার অবস্থা সম্পর্কে কথা বলছিলেন। হাসপাতালে নেবার পরও আমি ব্যথায় কাতরাচ্ছিলাম। একজন নার্সকে বললাম—

: আপনাদের ডাক্তার কই? আমার খুবই কষ্ট হচ্ছে।
: অন্তত আমাকে কিছু ওষুধ দিন। ব্যথাটা কমুক।
: একটু ধৈর্য্য ধরুন। ডাক্তার চলে আসবেন।
: আমাকে ব্যথা কমার ওষুধ দিন। না হলে ঘুমের ওষুধ দিন।
: আমরা ব্যথার রোগীকে কখনো ঘুমের ওষুধ দেই না। কেন দেই না জানেন? কারণ, আপনি চিৎকার করলে ডাক্তার বুঝবেন যে আপনার সমস্যা আছে। কিন্তু আপনি ঘুমিয়ে থাকলে তো ডাক্তার কিছুই বুঝতে পারবেন না। মিষ্টি হাসি দিয়ে বলা নার্সের যুক্তি শুনে আমি চুপ হয়ে গেলাম। হাসপাতালে আমি মাত্র দু'দিন ছিলাম। হাসপাতালের চিকিৎসা ব্যবস্থাপনা ও থাকা খাওয়ার বন্দোবস্ত আমার ভালো লেগেছিল। প্রাথমিক কিছু টেস্ট ও এক্সরে করার পর আমাকে যে রুমে থাকতে দেয়া হয়, সেটি ছিল একটি দুই শয্যাবিশিষ্ট কক্ষ। আমার সঙ্গে একই কক্ষে যে ভদ্রলোক ছিলেন তিনি একজন কানাডিয়ান অবসরপ্রাপ্ত সরকারি অফিসার। লোকটি ছিলেন খুবই অমায়িক। তাঁর সঙ্গে সময় কাটাতে আমার ভালো লাগছিল। আমি রুমে আসার ঘন্টাখানেক পর হাসপাতালের চিফ কুক লম্বা সাদা টুপি পরে আমার রুমে এসে আমার সঙ্গে পরিচিত হয়ে কথা বলেন। আমি মুসলমান হওয়ার জন্যই তিনি আমার সঙ্গে এসে দেখা করেন। তিনি আমাকে বলেন, আমার কোন খাবারে কখনই শুকরের মাংস থাকবে না। তারপর আমাকে বড় একটি খাবারের মেনু ধরিয়ে দিয়ে বলেন, আপনি যে রকম খাবার খেতে অর্ডার করবেন আমরা আপনাকে ঠিক সে রকম খাবার সরবরাহ করতে পারব। তার পরও যদি আপনার কোনো অসুবিধা হয়, অনুগ্রহ করে আমাকে জানাতে দ্বিধা করবেন না। আমরা এই হাসপাতালে আপনার অবস্থানকে আরামদায়ক করার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করব। এরপর আমাকে আমার নির্দেশনা অনুযায়ী যে খাবার সরবরাহ করা হয়েছিল সে খাবারের ট্রেতে একটি সাদা কাগজে বড় করে লেখা ছিল: 'নো পর্ক।' রুমমেট রোগীর সঙ্গে আমার বেশ জমে উঠেছিল। কিন্তু মাত্র দু'দিন পরেই আমাকে রিলিজ করে দেয়ায় আমার মন খারাপ হয়ে যায়। আমি বলি, আমার তো ব্যথা কমেনি। কিন্তু হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ আমাকে বলে স্যরি, আপনাকে রিলিজ করে দেয়া হয়েছে। আপনাকে চলে যেতে হবে। আশা করি আপনার অসুবিধা হবে না। অগত্যা একটি ট্যাক্সি নিয়ে আবার বাসায় চলে আসলাম।

বাসায় আসার পরও আমার ব্যথা খুব একটা কমেনি। আমি ডিপার্টমেন্টে যেতাম। তবে বেশ কষ্ট হত। ভালো করে স্বাভাবিকভাবে হাঁটতে পারতাম না। ক্লাসমেটদের সঙ্গে ভালো করে আড্ডা দিতে পারতাম না। হাসপাতালের পরামর্শ

অনুযায়ী আমি একজন অর্থোপেডিক বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের অ্যাপয়েন্টমেন্ট চাইলাম। ওখানে এ ধরণের ডাক্তারের অ্যাপয়েন্টমেন্ট চাইলেই সঙ্গে সঙ্গে পাওয়া যায় না। নাম লিখিয়ে অপেক্ষা করতে হয়। আমিও তাই করলাম। কিন্তু ৭-১০ দিন অপেক্ষা করেও ডাক না পেয়ে হতাশ হয়ে পড়লাম। সহপাঠীরা আমার ব্যথার খোঁজ নিলে বিরক্ত লাগত। অনেককে বলতাম, তোমাদের দেশের ডাক্তার ভালো, কিন্তু আমি যদি অ্যাপয়েন্টমেন্টই না পাই, তাহলে ভালো ডাক্তার দিয়ে আমি কি করব? এ রকমই এক সময়ে কোরি একদিন তার স্বভাবসুলভ ব্যস্ততা নিয়ে অফিসে এল। আমাকে বলল, তুমি খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটছ কেন? ব্যাপার কি? আমি আমার অসুস্থতার কথা তাকে বিস্তারিতভবে বললাম। যে কোরি কোন সময় ধীরস্থিরভাবে কিছু করে না, সেই চটপচে মেয়েটি খুব মনোযোগ দিয়ে আমার কথা শুনলো। আমার বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের অ্যাপয়েন্টমেন্ট পেতে অনেক দেরি হবার কথা শুনে তার মুখ কালো হয়ে গেল। কিন্তু আমার বিচলিত হবার সমালোচনা না করে সে খুব অমায়িকভাবে বলল, মুহামেদ, তুমি কি জানো যে কায়রোপ্রাক্টররা এ রকমের ব্যথার চিকিৎসা করতে পারেন। তুমি কি তাদেরকে দিয়ে তোমার ব্যথার চিকিৎসা করাতে চাও? একজন কায়রোপ্রাক্টরের অ্যাপয়েন্টমেন্ট চাও? আমি কোরির ব্যবহারে খুবই অবাক হয়েছিলাম। আমি আসলে কায়রোপ্রাক্টর কি সে বিষয়ে কিছুই জানতাম না। তবু কোরিকে বললাম, তাতে লাভ কি, কায়রোপ্রাক্টরের অ্যাপয়েন্টমেন্টের জন্য নাম লেখালে আবার কয় সপ্তাহ অপেক্ষা করতে হবে তার কি কোনো ঠিক আছে? কোরি বলল, তুমি আগে সিদ্ধান্ত নাও যে তুমি কায়রোপ্রাক্টর দিয়ে চিকিৎসা করাবে, নাকি করাবে না। যদি করাতে চাও, তাহলে আমি তোমার জন্য একটি দ্রুত অ্যাপয়েন্টমেন্টের চেষ্টা করে দেখতে পারি। সাত পাঁচ না ভেবেই আমি বললাম, সত্যিই পারো? পারলে করো না দেখি। কোরি পাশের ডেস্কে যেয়ে একটি ফোন করল। তার ফোনালাপ শুনে আমি বুঝলাম সে তার মায়ের সঙ্গে কথা বলছে।

: কেমন আছো মা? ওপার থেকে তার মা অনেকক্ষণ কথা বললেন, কি বললেন তা শুনতে বা বুঝতে পারলাম না। তবে কোরির চোখমুখ ছলছল করছিল, অশ্রুসিক্ত হয়ে উঠেছিল তার আঁখিদ্বয়। মিনিট দুই পর সে চোখে টিসু বুলিয়ে কথা বলেছিল।

: মা শোনো তোমাকে যে জন্য আমি ফোন করেছি। আমার এক বিদেশি সহপাঠী ব্যাকপেইনে কাতর। বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের অ্যাপয়েন্টেমেন্টের জন্য নাম লিখিয়েছে প্রায় দু'সপ্তাহ হলো। সে পড়াশুনা করতে পারছে না। তুমি কি তার জন্য একটি দ্রুত অ্যাপয়েন্টমেন্টের ব্যবস্থা করতে পারবে? তার মা কি বললেন শুনতে পেলাম না। কোরি ফোন রেখে দিল। আমাকে বলল দু'তিন মিনিটে জানা যাবে যে তুমি দ্রুত অ্যাপয়েন্টমেন্ট পাবে কিনা। আমি বললাম তোমার কি মনে হয় আমি দ্রুত অ্যাপয়েন্টমেন্ট পাব? কোরি বললো, নিশ্চয়তা দিতে পারি

না, তবে একটু অপেক্ষা করো। আমার মা একজন ভালো কায়রোপ্রাক্টরের সেক্রেটারি। আমি আশা করি মা চেষ্টা করলে হয়ত পারবেন। পরে জানলাম, মায়ের সঙ্গে ঝগড়া করে কোরি প্রায় তিন মাস হলো আলাদা থাকে। এই তিন মাসে তার মায়ের সঙ্গে কোন যোগাযোগ ছিল না। কেবল আমাকে সাহায্য করার জন্য সে তার মাকে ফোন করেছে। এতে তার মা খুবই উচ্ছসিত। মেয়ের সঙ্গে তিনমাস পর ফোনে কথা বলতে পেরে তিনি খুব আনন্দিত। মায়ের ওপর যতই রাগ থাকুক না কেন, কোরির চোখমুখ দেখে বুঝলাম অনেকদিন পর মায়ের সঙ্গে কথা বলে তার খুব ভালো লেগেছে। দু'মিনিট পরই ফোন বাজল। মায়ের সঙ্গে সামান্য কথা বলে একটি ফোন নম্বর এবং ঠিকানা লিখে সে মাকে ধন্যবাদ জানাল। মায়ের কথার জবাবে সে বলল, হ্যাঁ মা অবশ্যই মাঝেমধ্যে তোমাকে ফোন করব। আই লাভ ইউ মাম। ফোন রেখে কোরি টিস্যু দিয়ে চোখ মুছল। এই চটপটে মেয়েটিকে আবেগপ্রবণ হতে দেখে তাকে আর আমি কিছু বললাম না। কিন্তু মাত্র ১০ সেকেন্ডেই সে স্বাভাবিক হয়ে আমার সামনে একটি কাগজ এগিয়ে দিয়ে বলল, মুহামেদ ডান। পরশুদিন তোমার অ্যাপয়েন্টমেন্ট। এই হলো কায়রোপ্রাক্টরের নাম ঠিকানা এবং ফোন নম্বর। সে কাঁধে ব্যাকপ্যাক ঝুলিয়ে আমাকে 'সি ইউ লেটার' বলে ধন্যবাদ দেবার সুযোগ পর্যন্ত না দিয়ে হন হন করে অফিস থেকে বের হয়ে গেল।

পরে খোঁজ নিয়ে জানলাম কায়রোপ্রাক্টররা ম্যাসেজ করেন, নানা রকম সেক দেন এবং বিভিন্ন উপায়ে চিকিৎসা করেন। অনেকের ধারণা, ওদের মাধ্যমে চিকিৎসা করানো ঝুঁকিপূর্ণ। তবে এ চিকিৎসা পদ্ধতি সরকার স্বীকৃত। আমি কিছুটা ভয় পেলাম এবং আমার সুপারভাইজারের সঙ্গে এ বিষয়ে পরামর্শ করলাম। সুপারভাইজার আমাকে মেডিকেল লাইনের বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের অ্যাপয়েন্টমেন্টের জন্য আরও একটু ধৈর্য ধরতে পরামর্শ দিলেন। আমি অনেকটা বিপদে পড়লাম। এখন কোরিকে কেমন করে বলব যে আমি অ্যাপয়েন্টমেন্টটি বাতিল করতে চাই। আমার লজ্জা লাগছিল। পরদিন সকল লজ্জা ঝেড়ে ফেলে সুপারভাইজারের পরামর্শের কথা কোরিকে বললাম। তার কাছে দুঃখ প্রকাশ করলাম। কোরি কিছুই মনে করল না। সে বিষয়টিকে খুবই হালকাভাবে নিয়ে বলল, অনেকেই এ চিকিৎসা পদ্ধতির ওপর বিশ্বাস রাখেন না। আবার অনেকেই এ চিকিৎসা গ্রহণ করে দ্রুত সুস্থ হন। তুমি না দেখাতে চাইলে অসুবিধা নেই, আমি মাকে তোমার অ্যাপয়েন্টমেন্ট বাতিল করতে বলে দিচ্ছি। এতে তোমার দুঃখিত হওয়ার কিছু নেই। আমি কয়েকদিন পরে যে অর্থপেডিক বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের অ্যাপয়েন্টমেন্ট চেয়েছিলাম তার সেক্রেটারিকে আবার ফোন করে কবে নাগাদ আমি ডাক্তার দেখাতে পারব জানতে চাইলাম। আমার যে লেখাপড়ায় ক্ষতি হচ্ছে সে বিষয়েও তাকে বললাম। তিনি মিষ্টি কণ্ঠে আমাকে বললেন, মিস্টার আখতার আপনি আর একটু ধৈর্য ধরুন। এর প্রায় সাতদিন পর আমাকে ডা. জনসনের সঙ্গে একটি অ্যাপয়েন্টমেন্ট দেয়া হলো।

ডাক্তার জনসন

নির্দিষ্ট সময়ে একটি ট্যাক্সি নিয়ে আমি বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের অফিসে হাজির হলাম। ডাক্তারের সেক্রেটারি আমাকে বসতে বললেন। এসব বিশেষজ্ঞ ডাক্তাররা নাকি প্রতিদিন ২-৩ জনের বেশি রোগী দেখেন না। মাত্র দু'তিন মিনিট পরেই ডাক্তারের ঘরে নিয়ে আমাকে চেয়ারে বসিয়ে দিয়ে বেরিয়ে গেলেন। ডাক্তার তারপর ভেতর থেকে এসে হাসিমুখে আমাকে স্বাগত জানালেন। তার বয়স প্রায় ৬২ বছরের মতো হবে। তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন আমি কোন দেশের ছাত্র। আমি বললাম আমি বাংলাদেশি ছাত্র। ডাক্তার এক্সকিউজ মি বলে ভেতরে চলে গেলেন। আমি ভাবলাম, হয়ত পরীক্ষা করার জন্য কোনো যন্ত্রপাতি আনবেন। কিন্তু তিনি নিয়ে এলেন একটি পৃথিবীর মানচিত্র। দেয়ালে মানচিত্রটি টানিয়ে আমাকে বললেন, তোমার দেশ কোথায় দেখাও। আমি তাকে দেখালাম। আরও বললাম, ১৯৪৭ সালের পর আমরা পাকিস্তান ছিলাম। পরে ১৯৭১ সালে আমরা যুদ্ধ করে স্বাধীন হয়েছি। তিনি মনোযোগ দিয়ে শুনলেন। আমার চিকিৎসার কথা না বলে আরও খানিক গল্প করে আবারো এক্সকিউজ মি বলে ভেতরে গেলেন। এবার তিনি একটি ফাইল নিয়ে এলেন এবং আমাকে বললেন আমি তোমার ফাইলটি পড়েছি। তোমার রিপোর্টগুলো দেখেছি। তোমার বিচলিত হবার মত কিছু হয়নি। এরপর তিনি কানাডার লোকসংখ্যা কত এবং তাদের কতজনের ব্যাকপেইন আছে এসব পরিসংখ্যান দিয়ে বোঝাতে চাইলেন যে আমার গুরুতর কোনো অসুখ হয়নি। তিনি আবার এক্সকিউজ মি বলে ভেতরে গেলেন এবং এবার একটি কঙ্কাল নিয়ে এসে দেয়ালে হোয়াইট বোর্ডের পাশে ঝুলিয়ে দিলেন। এরপর টানা দশ মিনিট তিনি পেশাদার শিক্ষকের মত অনেকটা ক্লাস নেবার ভঙ্গিতে আমাকে বুঝালেন যে আমার শরীরের কোথায় কি ধরণের সমস্যা হয়েছে। তিনি কঙ্কালের মেরুদন্ডের হাড়ের নীচদিকে হাত দিয়ে প্রতিটি জয়েন্ট দেখালেন, জয়েন্টগুলোর মাঝে যে ফাঁক আছে সেখানে জেলির মত যে পদার্থ থাকে সে সম্পর্কে বললেন। সেগুলির মেডিকেল নামের সঙ্গে আমাকে পরিচিত করালেন। তারপর বললেন, মেরুদন্ডের হাড়ের সর্বনিম্নের জোড়ার মাঝে যতটা ফাঁক থাকা দরকার তা একপাশে কিছুটা কমে গিয়েছে। তিনি বললেন, এতে ভয় পাবার কিছু নেই। কোনো ওষুধ খাওয়া লাগবে না। আমি তোমাকে হাসপাতালের ফিজিওথেরাপি বিভাগে রেফার করে দিচ্ছি। তারা তোমাকে কিছু ব্যায়াম করালে এ ব্যথা কমে যাবে। এরপর তিনি আরো অনেকক্ষণ গল্প করে আমাকে বিদায় দিলেন। আমি জিজ্ঞেস করলাম, আমাকে কি হাসপাতালে যোগাযোগ করতে হবে, বা তাদেরকে ফোন করতে হবে? তিনি বললেন, না তোমাকে কিছুই করতে হবে না। তারাই তোমার সাথে যোগাযোগ করবে। আমি ডাক্তার জনসনকে ধন্যবাদ দিয়ে চলে এলাম। যেহেতু আমার দেশে ফেরার সময় হয়ে এসেছিল সে কারণে হাসপাতালের ওই চিকিৎসা

না নিয়েই দেশে ফিরে এসেছিলাম। পরে অবশ্য আমার এ ব্যথা এক পর্যায়ে দেশে এসে আবার বেড়েছিল যে সম্পর্কে পরবর্তী অধ্যায়ে আলোচনা করব।

প্রফেসর অশোক কাপুর

ওয়াটারলু বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগে কতিপয় খ্যাতিমান অধ্যাপক ছিলেন। তাদের সঙ্গে প্রায়ই আলাপ আলোচনা করতাম। আমি যে অধ্যাপকের রিসার্চ অ্যাসিস্ট্যান্ট হিসাবে কাজ করতাম, তিনি একজন স্বনামধন্য গবেষক ও আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ের খ্যাতিমান অধ্যাপক। ভারতের পাঞ্জাবের লোক। নাম অশোক কাপুর। প্রফেসর ড. অশোক কাপুর ছিলেন অমায়িক ব্যক্তিত্ব। তিনি মাঝেমধ্যে আমাদের তাঁর বাসায় নিয়ে যেতেন। গল্প করতেন। নানা রকম খাবার খাওয়াতেন। বড়দিনের সময় তিনি আমাকে এবং নইমকে তাঁর বাসায় দাওয়াত করে খাইয়েছিলেন। তিনি একটি বই লেখার কাজে মনোযোগী ছিলেন, যে কাজে আমি তাকে গবেষণা সহকারী হিসাবে সাহায্য করতাম। এ জন্য তিনি কি ধরনের গবেষণা তথ্য-উপাত্ত চান আমাকে বলতেন, আমি লাইব্রেরিতে গিয়ে তার জন্য সে সব খুঁজে আনতাম। অনেক গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধ, বই তাঁকে এনে দিতাম। তিনি বলতেন, দেখ আমার জন্য তোমার যে কয় ঘন্টা কাজ করার কথা, তুমি আবার সে সব হিসেব করতে যেও না। অল্প সময়ে আমার কাজ হয়ে গেলে তুমি তোমার কাজ করতে পারবে। এ কাজের জন্য তিনি তাঁর নিজের ফটোকপি করার কার্ড আমাকে দিয়ে রেখেছিলেন। ওই কার্ড ব্যবহার করে যত ইচ্ছা ফটোকপি করা যেত। আমরা আমাদের জন্য ফটোকপি করতে হলে কার্ড কিনে ফটোকপি করতে হত। আমি একবার তাঁর কার্ড ব্যবহার করে আমার জন্য একটি ১০ পৃষ্ঠার প্রবন্ধ ফটোকপি করেছিলাম। পরে ভেবেছি, এটা করা আমার অন্যায় হয়েছে। সে জন্য আমি একদিন একসঙ্গে চা পানের সময় প্রফেসর কাপুরকে কথাটা বলি এবং দুঃখ প্রকাশ করি। তিনি বিষয়টি হালকাভাবে নিয়ে বলেন, তোমার যদি কোন কিছু ফটোকপি করা লাগে তাহলে আমার কার্ড ব্যবহার করতে পারো, তবে বিষয়টি আমাকে না বলাই ভালো। কিন্তু আমি তারপর আর কোনোদিন তাঁর কার্ড ব্যবহার করে নিজের জন্য ফটোকপি করিনি। আমি এমএ করে দেশে চলে আসব শুনে প্রফেসর কাপুর কিছুটা অবাক হয়ে আমাকে বলেন, তুমি তো একবারেই পিএইচডি করে যেতে পারো। কোন্ কোন্ বিশ্ববিদ্যালয়ে চেষ্টা করলে আমি ফান্ড পেতে পারি সে সম্পর্কেও তিনি আমাকে ধারণা দেন। আমি তাঁকে কৃতজ্ঞতা জানিয়ে বললাম, দেখুন, আমি পিএইচডি করব, তবে এখন নয়। আমি এমএ করার জন্য এসেছিলাম, সে কাজ হয়েছে, এখন আমি ফিরে যাব। এভাবে দেখতে দেখতে কিভাবে স্বপ্নের মত প্রায় এক বছর চলে গেল বুঝতেই পারিনি। পরীক্ষা দিয়ে থিসিস লিখে সুন্দরভাবে ডিগ্রি করে আবারও চট্টগ্রামে ফিরে এলাম।

আবারও বিভাগে শিক্ষকতা এবং তার পাশাপাশি লেখালেখিতে মনোযোগী হলাম। কানাডা থেকে আসার সময় আমি দুর্নীতি বিষয়ে গবেষণার জন্য উল্লেখযোগ্যসংখ্যক বই ও প্রবন্ধ ফটোকপি করে নিয়ে এসেছিলাম। কাজেই দেশে ফিরে আমি সঙ্গে আনা বিভিন্ন গ্রন্থ ও প্রবন্ধ পড়া শুরু করি এবং গভীরভাবে একাডেমিক লেখাপড়া ও প্রকাশনায় মনোনিবেশ করি। নতুন নতুন গবেষণা কাজ করে প্রকাশ করি, যা আমাকে পরে অস্ট্রেলিয়ার সিডনি ইউনিভার্সিটিতে পিএইচডি অ্যাডমিশন পেতে সহায়তা করে। তবে উচ্চশিক্ষা গ্রহণে অস্ট্রেলিয়া যাবার আগে দেশে প্রায় চার বৎসরাধিক সময়টা আমি পরিকল্পনার সাথে গঠনমূলকভাবে ব্যবহার করি। এ সম্পর্কেই পরবর্তী অধ্যায়ে বিস্তারিত আলোচনা করব।

তিন
কানাডা থেকে ফেরার পর

কানাডার ওয়াটারলু বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এমএ ডিগ্রি শেষ করে আমি দেশে ফিরতে দেরি করিনি। দেশে এসেই বিশ্ববিদ্যালয়ে কাজে যোগদান করি এবং আবারো শিক্ষকতা ও গবেষণা প্রকাশনায় মনোযোগ দেই। প্রথমে আমার থিসিস থেকে তথ্য নিয়ে প্রবন্ধ লিখে বিদেশি জার্নালে প্রকাশ করি। আরো যে সব দুর্নীতিবিষয়ক বই ও প্রবন্ধ সংগ্রহ করেছিলাম সেগুলো পড়ে এ বিষয়ে বই লেখার কাজ শুরু করি। ফলে একাডেমিক ব্যস্ততার মধ্যে আমার সময় কাটতে থাকে। এভাবে আমি চার বৎসরাধিক সময় দেশে কাটাই। এ সময় আমি উল্লেখযোগ্যসংখ্যক প্রকাশনা করে নিজেকে পিএইচডি করার জন্য একাডেমিকভাবে যোগ্য করে তুলি।

শাজাহান

কানাডা থেকে ফিরে গবেষণা প্রকাশনায় মনোযোগী হলেও কেন জানি আমার বারবার শৈশবের দিনগুলো মনে পড়তো। বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক হতে পেরেছি বলে আমি সব সময় নিজেকে ভাগ্যবান মনে করতাম। আমার কিশোর বয়সের বন্ধুদের কথা মনে পড়তো। তাদের অনেকেই জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত হতে পারেনি। এ নিয়ে আমার স্ত্রীর সঙ্গে অনেক গল্প করেছি। তাকে বলেছি, তুমি কি জানো আমার প্রাইমারি স্কুল জীবনের মার্বেল খেলার সাথীদের মধ্যে অনেকে রিক্সা চালায়, অনেকে সিএনজি চালায় এবং অনেকে আরও অনেক কাজ করে যা বললে তুমি হয়ত বিশ্বাস করবে না। আবার যারা সফল ব্যবসায়ী এবং ভালো পেশায় চাকুরি করে, এমন বন্ধুও আছে। সে ভাবতো আমি হয়ত তামাশা করার জন্য এসব বলতাম। একবার খুলনা থেকে বাসে করে সস্ত্রীক ঢাকা আসছিলাম। বাসে ওঠার অনেক পরে লক্ষ্য করলাম যে, বাসচালক আমার শৈশবের বন্ধু। আমি আমার স্ত্রীকে এ সম্পর্কে কিছু বলিনি। কারণ, বললে সে হয়ত বিশ্বাস করত না। আমার হয়ত তখন বন্ধুকে ডেকে এনে প্রমাণ করতে হত। এতে আমার বন্ধুটিও হয়ত লজ্জা পেত। কারণ, অভিজ্ঞতা থেকে দেখেছি, যারা ছোট ছোট কাজ করে, ভালো পেশায় আছে এমন বন্ধুদের সঙ্গে দেখা হলে তাদের অনেকেই সঙ্কোচ বোধ করে। আমি যে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক এ কথা বন্ধুমহলে প্রায় সবাই জানে এবং আমাকে নিয়ে তারা গর্ব করে আমার সম্পর্কে আলোচনা করে। কিন্তু আমি ভেবেছিলাম ড্রাইভার বন্ধুটি যখন আমাকে ভালো করে দেখেনি এবং তার সঙ্গে

যেহেতু অনেক বছর দেখা-সাক্ষাৎ নেই, কাজেই বিষয়টি চেপে যাওয়াই ভালো। এ বন্ধুটির অবশ্য উন্নতি হয়েছে। কারণ, বছর পাঁচেক আগে সে খুলনায় সিএনজি ট্যাক্সি চালাত। কাজেই ট্যাক্সি চালক থেকে বাসের চালক হওয়া তো উন্নতির নমুনা। এসব ভাবতে ভাবতে তাকে এড়িয়ে যেতে চাইলেও তা পারলাম না।

কামারখালী ফেরিঘাটে বাস ফেরিতে উঠার পর ড্রাইভার কারো দিকে না তাকিয়ে বাস থেকে নেমে গেল। আমিও খানিক পরে বাস থেকে নেমে কিছু ফল কিনে আবারও বাসে এসে বসলাম। কিন্তু মিনিট দশেক পর বাসের হেলপার এসে আমাকে এবং আমার স্ত্রীকে একটি গোল টিনের থালার ওপর দুকাপ ধুমায়িত চা এবং কিছু বিস্কুট দিলে আমার স্ত্রী অবাক হয়ে তার দিকে তাকাতেই সে আমাকে বললো, 'স্যার ওস্তাদে পাঠাইছে'। আমি তাকে কোনো কথা না বলে চায়ের থালা গ্রহণ করলে শেফালি আমার দিকে কৌতূহলী দৃষ্টিতে তাকাল। আমি বললাম, চা খেতে পারো। আমার শৈশবের বন্ধু পাঠিয়েছে। এটা ফেরত দেয়া যাবে না। আরও বললাম, বাসে ওঠার পর আমি যদি তোমাকে বলতাম, ড্রাইভার সাহেব আমার শৈশবের বন্ধু, তুমি কি তা বিশ্বাস করতে? করতে না। হেসে উড়িয়ে দিতে। তখন ওকে ডেকে আনা লাগত। ও বেচারা লজ্জা পেত। সে জন্য আমি বিষয়টি তোমাকে বলিনি। আমার স্ত্রী সত্যিই অবাক হলো। সে বললো, দেখা যাবে যে ঢাকায় বাস থেকে নেমে রিক্সায় উঠলে সে রিক্সাচালকও হয়ত তোমার বন্ধু হতে পারে। আমি বললাম, ঢাকায় হবে কিনা জানিনা, তবে খুলনায় আমার সঙ্গে রিক্সায় উঠলে এমনটা হতে পারে। কারণ, আমার প্রাইমারি স্কুলজীবনের মার্বেল খেলার ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের একজন মোহাম্মদ ইদ্রিস। সে এখন খুলনায় রিক্সা চালায়। একদিন ঘটনাক্রমে আমি তার রিক্সায় উঠেছিলাম। কিন্তু তাকে ভাড়া দিতে চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়েছি।

একটু পরেই ড্রাইভার শাজাহান এল। এবারও আমার দিকে না তাকিয়ে সে সরাসরি ড্রাইভিং সিটের দিকে এগুতে চাইলে আমি তাকে নাম ধরে ডাকলাম। আমার সঙ্গে স্ত্রী থাকায় সে সঙ্কুচিত হয়ে কাছে এলে আমি তাকে শক্ত করে বুকে জড়িয়ে ধরলাম।

: দোস্ত তুই আমাকে দেখেও এভাবে এড়িয়ে গেলি কেন?

শাজাহান ছলছল চোখে জবাব দিলো—

: আমরা বাসের ড্রাইভারি করি, তোমাদের মতো বড় বড় বন্ধুদের কাছে ঘেঁষতে লজ্জা পাই।

আমি ধমকের সুরে বললাম—

: কাজের আবার ছোটো বড়ো আছে নাকি? তুই তো চালাতিস সিএনজি ট্যাক্সি, এখন চালাচ্ছিস বাস, তোর তো উন্নতি হয়েছে।

: তুমি যে কি বলো।

: বিয়েশাদি তো করিসনি। সব খবর রাখি আমি। শেফালি আমার স্ত্রী। ভাবিকে একটা সালাম দে।

: ভাবি আসসালামুআলাইকুম। ভাবি খুলনায় আবার গেলে গরিবের বাড়িতে একবার বেড়াতে গেলে খুশি হব।

শেফালি অনেকটা হতভম্ব হয়ে ওর লজ্জারাঙ্গা মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। কোনো কথা বলতে পারল না। শাজাহান ড্রাইভিং সিটে বসার পর সে মুখ খুলল—

: তোমার এ বন্ধুটিতো খুবই অমায়িক। পরের বার খুলনায় গেলে তুমি আমাকে ওদের বাড়ি বেড়াতে নিয়ে যাবে।

: নিশ্চয়ই নিয়ে যাব। তুমি গেলে যে ও কত খুশি হবে তুমি ভাবতেও পারবে না।

তবে এরপর অনেকবার কখনো সস্ত্রীক, আবার কখনো একাকী খুলনায় যাওয়া হলেও শাজাহানের বাড়ি আর যাওয়া হয়নি।

মন্টু দাস

ক্লাস ফাইভ থেকে ক্লাস টেন পর্যন্ত পড়ার সময়কার বয়সটা পরবর্তী জীবনে সবচেয়ে বেশি মনে থাকে। ওই সময়ের জায়গাগুলো, বন্ধুবান্ধব ও ঘটনাগুলো শৈশব স্মৃতি হিসেবে বেশি করে হৃদয়ে দোলা দেয়। আমার এমন সময়টা কেটেছিল খুলনা জংশন রেল স্টেশন এলাকায়। ওই সময় আমার বন্ধুদের মধ্যে সনাতন ধর্মাবলম্বী বন্ধুর সংখ্যা ছিল বেশি। কারণ, আমাদের রেল কোয়ার্টারের কাছেই ছিল হিন্দু অধ্যুষিত এলাকা। ওই সব এলাকায় বন্ধুদের সঙ্গে অনেক ঘুরেছি। খেলাধুলা করেছি। গুলতি দিয়ে পাখি মেরেছি। মাছ ধরেছি। দূর্গাপূজার সময় হাডুডু প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেছি। ফুটবল আর ক্রিকেট খেলেছি। আবার রেল কোয়ার্টারে যাঁরা থাকতেন, তাঁদের মধ্যে অনেক কর্মচারী ছিলেন বিহারি। তাঁরা ছিলেন উর্দুভাষী। তাদের সঙ্গেও আমার সখ্য ছিল। এ জন্য আমি যখন ক্লাস সেভেন-এইটে পড়তাম তখন উর্দুতে কথাবার্তা বলতে পারতাম। তাছাড়া ওই সময় স্কুলে আমার সাবজেক্ট হিসেবে উর্দু পাঠ্য ছিল। ওই সাবজেক্টে আমি বরাবরই ভালো নম্বর পেতাম। ক্লাস সেভেনে একশ'তে ৭৮ নম্বর পেয়েছিলাম।

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে চাকুরি করার সুবাদে খুলনায় কমই যেতে পারতাম। আর গেলেও ওইসব শৈশব স্মৃতিবিজড়িত এলাকায় যাওয়া হত না। পশ্চিম বানিয়াখামারের বানরগাতি এলাকায় আমাদের নিজ বাসভবন এবং এর আশপাশের এলাকায় সময় কাটাতাম। খুলনা থেকে আসার পর প্রতিবারই ভাবতাম, আহা এবারও ওইসব শৈশব স্মৃতিবিজড়িত এলাকায় যাওয়া হলো না। সামনের বার অবশ্যই যেতে হবে। এভাবে অনেক বছর পার করার পর একবার খুলনায় গিয়ে অনেকটা জিদ করে একদিন একাকী খুলনা জংশন এলাকায় যাবার সিদ্ধান্ত নিলাম। কোথায় যাব, কাকে খুঁজব, কোনো কিছু ঠিক না করে ভাবলাম, যে সব জায়গায় আমার শৈশব স্মৃতি রয়েছে অন্তত ওই এলাকাগুলো দিয়ে হেঁটে আসলেও কিছুটা শান্তি পাব। এমনটা ভেবে নির্দিষ্ট এলাকায় চলে গেলাম। কিন্তু আমার খুব একটা ভালো লাগছিল না। সব কিছু পাল্টে গেছে মনে হচ্ছিল। মাটির

রাস্তাগুলো এখন পিচের রাস্তা হয়েছে। যেখানে গোলপাতার ঘর ছিল, সেখানে উঠেছে দালান। অপরিচিত জায়গায় এসেছি বলে মনে হচ্ছিল। আমাদের কোয়ার্টারের কাছে যে বড় তেঁতুল গাছটি ছিল সেটি পর্যন্ত নেই। তবুও রাস্তায় হাঁটতে হাঁটতে অনেক শৈশব স্মৃতি মনে জেগে ওঠায় মনটা শান্ত হয়েছিল। হিন্দু পাড়ায় ঢুকে পরিচিত কাউকে পেলাম না। মিলন, পার্থ, গুভো, সন্তোষ এদের সম্পর্কে একজন অপরিচিত যুবককে জিজ্ঞেস করলাম। সে জানালো পার্থরা ভারতে চলে গেছে সপরিবারে। সন্তোষরা জমি বিক্রয় করে দিয়ে অন্য জেলায় বসতি স্থাপন করেছে। গুভো ব্যবসা করে। তবে সে খুব কমই এলাকায় থাকে। কোনো বন্ধুবান্ধবের ঠিকানা না পেয়ে মন খারাপ হয়ে গেল। তবে আরেকজনকে আমার সঙ্গে গুলতি দিয়ে পাখি মারার সাথী মন্টু দাসের কথা জিজ্ঞেস করলাম। প্রথমে চিনতে পারল না। পরে যখন তাদের বাড়ির অবস্থানটা বললাম, তখন সে বলল হ্যাঁ চিনেছি, মন্টুরা ওখানেই আছে। তবে মন্টু বিয়ে করার পর ওদের বাড়ির পাশে আরেকটি ঘরে স্ত্রী ও দুই সন্তান নিয়ে থাকে। আরও জানলাম, সে একটি রেশনের দোকানে স্লিপ লেখার কেরানির কাজ করে। আমি যেন আশার আলো পেলাম। বললাম কোথায় গেলে তাকে পাওয়া যাবে? তিনি বললেন, এখন তো দোকান খোলা থাকার কথা না। আপনি ওদের বাড়ির ওদিকটাতেই খুঁজে দেখুন।

অনুমান করে হাঁটতে লাগলাম। হালকা পাতলা ছিপছিপে চেহারার মন্টুর শৈশবের মুখটা আমার চোখের সামনে ভেসে উঠল। লোকজনের কাছে শুনতে শুনতে মন্টুর ঘরের কাছে চলে এলাম। কিন্তু জানলাম মন্টু ঘরে নেই। কোথায় গেছে তাও কেউ বলতে পারল না। তবে একজন বলল সে তাকে ১৫ মিনিট আগে দক্ষিণ দিকে কিছুদূরে অবস্থিত বাচ্চাদের বল খেলার মাঠের কাছে দেখেছিল। আমি চাইলে ওখানে গিয়ে একবার দেখতে পারি। গেলাম, কিন্তু সেখানে মন্টু ছিল না। কিন্তু ভাগ্য ভালো। তার অদূরে একটি মুদি দোকানের সামনের বেঞ্চে মন্টুকে পাওয়া গেল। আমি যখন তাকে ডাক দিলাম সে আমার দিকে তাকিয়ে রইল। আমাকে চিনতে পারেনি। প্রায় ৩ দশকেরও পর কি সহজে শৈশবের বন্ধুকে চেনা যায়? আমি নাম বলে তাকে বুকে জড়িয়ে ধরলাম। এবার মন্টু আমাকে চিনতে পারল। সে শক্ত করে আমাকে বুকে জড়িয়ে ধরে রাখলো কিছুক্ষণ। তারপর হঠাৎ আমাকে ছেড়ে দিলো এবং খানিকটা দূরে গিয়ে দাঁড়াল। আমি বললাম দূরে যাচ্ছিস কেনো মন্টু? সে বলল, আমি কয়েক বছর আগে শুনেছিলাম তুমি নাকি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক হয়েছ। আমরা কি এখন তোমার বন্ধু হবার যোগ্য? আমি হেসে দিলাম। বললাম গুলতি নিয়ে আয়। পাখি মারতে যাব। আরে গাধা বন্ধুত্ব কি পদ-পদবি আর অর্থ দিয়ে পরিমাপ করতে হয়, নাকি করা যায়। আবেগে মন্টুর দুচোখ ঝাপসা হয়ে গেল। তার কাছ থেকে অন্যান্য বন্ধুদের অনেকেরই খবর পেলাম। কে রিক্সা চালায়, কার কার পরিবার ভারতে চলে গেছে। কারা কষ্টে আছে। এসব অনেক কথা বলল মন্টু। সে বিশ্বাস করতে পারছিল না যে আমি সুদুর চট্টগ্রাম থেকে শৈশবের বন্ধু হিসেবে তাকে মনে রেখেছি এবং কেবলমাত্র

তার সঙ্গে দেখা করতে খুলনা থেকে এসে অনেক কষ্টে তাকে খুঁজে বের করেছি। এটা জেনে তার চোখ লালাভ বর্ণ ধারণ করল এবং তার দুচোখ দিয়ে অশ্রুসজল হয়ে উঠল। প্রায় মিনিট তিনেক পর সে স্বাভাবিকভাবে কথা বলল।

: তুমি কি আমাদের বাড়িতে যাবা? কয়েকদিন থাকবা? অবশ্য থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা খুব ভালো হবে না।

: আমি তোর বাসা দেখে এসেছি। এখন গেলে কিছু জুটবে না। বৌদিকে আমার নমস্কার জানাস। সামনের বার এসে তোর সাথে খাব। একবার যখন তোকে পেয়েছি। এবার হারাতে দেব না। খুলনায় এলে দেখা করে যাব। তুই বেড়াতে যাবি চট্টগ্রামে? আমার বাসায় থাকবি? তোর ভাবি অনেক খুশি হবে।

: তুমি যে আমার মত গরীব বন্ধুকে মনে রেখেছ এটাই আমার জন্য অনেক কিছু। আমি কোথাও যেতে পারি না। প্রতিদিন রেশনের দোকানে কাজ করতে হয়।

: ঠিক আছে। তবে আমি তো ছুটি পাই। আমি এলে তোকে একবার করে দেখে যাব।

: সে আমার সৌভাগ্য। তুমি কি চলে যাবে? আর কতক্ষণ থাকবে? মন্টুর চোখে আকুতি।

: থাকব, যতক্ষণ বলিস ততক্ষণ থাকব। তারপর যেতে তো হবে। এ কথা বলছিস কেন?

: আমার একটা অনুরোধ শুনবে?

: কেন শুনব না? বল না কি বলবি?

: চলো দুজনে মিলে রবীন ঘোষের দোকানে বসে একটু দই মিষ্টি খাই।

আমি না করতে পারলাম না। রাজি হলাম। আমার পকেটে অনেক টাকা থাকলেও ইচ্ছে করেই বিল দিলাম না। কারণ, আমি জানি ও আমাকে পেয়ে অনেক খুশি হয়েছে। আর যদি আমাকে একটু আপ্যায়ন করতে পারে তাহলে অনেকটা শান্তি পাবে। সে শান্তি থেকে নিজে বিল দিয়ে ওকে বঞ্চিত করতে চাইলাম না। দই মিস্টি খেয়ে মন্টুর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে এলাম। মনে খুবই শান্তি লাগছিল। অন্তত একজন হলেও শৈশবের খেলার সাথির সঙ্গে কিছুটা সময় কাটাতে পেরে মনটা প্রশান্তিতে ভরে গিয়েছিল।

ডা. এল. ডি. গোলেন

কানাডা থেকে আসার পর আমার লেখাপড়ায় মনোযোগ বৃদ্ধি পায়। ওয়াটারলু বিশ্ববিদ্যালয় থেকে নিয়ে আসা ব্যাক পেইন বছর দেড়েক পর আমাকে পীড়া দিতে থাকে। এক পর্যায়ে তা এত বেড়ে যায় যে, প্রায় দুই মাস আমি চট্টগ্রাম শহরের চট্টেশ্বরী রোডের জয়নগর প্রথম গলির বাসায় বিছানায় শুয়ে ছিলাম। ক্লাস নিতে পারতাম না। প্রথমে চট্টগ্রামে এবং পরে ঢাকায় পঙ্গু হাসপাতালের একজন অর্থপেডিক্সের সহযোগী অধ্যাপকের কাছে চিকিৎসা নিয়েও সুবিধা হলো না। পরে অ্যাডভ্যান্ট ট্রিপল্যান্ড নামের আমার এক খ্রিষ্টান ধর্মবলম্বি ছাত্রের পরামর্শে আমি

কক্সবাজারের দুলহাজরার মালুমঘাট খ্রিস্টান মেমোরিয়াল হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য যাই। এ হাসপাতালটি ১৯৬৬ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। মিশনারি হাসপাতালের নানা রকম উদ্দেশ্য থাকে। প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে তারা আমাকে জানায়, আমার অসুখের চিকিৎসা করার মত ডাক্তার ওই হাসপাতালে নেই। কিন্তু আমি যেহেতু খোঁজ নিয়ে গিয়েছিলাম যে ওই হাসপাতালে এল ডি গোলেন নামের একজন খুব ভালো আমেরিকান ফিজিওথেরাপিস্ট আছেন, যার কাছে আমার চিকিৎসা হতে পারে। গোলেন ১৯৬৬ সাল থেকে ওই হাসপাতালে কাজ করতেন। এ তথ্য আমার কাছে থাকায় আমি বললাম, আমি কি ডা. গোলেনের সঙ্গে একবার দেখা করতে পারি? আমাকে সে অনুমতি দেয়া হলো না। অগত্যা আমি অনোন্যপায় হয়ে বললাম দেখুন, আমি একজন বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক। ব্যথার কারণে ছাত্রদের পড়াতে পারছি না। আপনিই বলুন, আমি কিভাবে আপনাদের চিকিৎসা পেতে পারি। যে দেশি ডাক্তার সাহেবের সঙ্গে আমি কথা বলছিলাম, তার মনে হয় একটু মন নরম হলো। তিনি বললেন, আপনি গোলেনের সাহায্য চেয়ে তাকে চিঠি লিখতে পারেন। আমি তাকে বললাম, তাতে কি কাজ হবে? আমি তো ডা. বুলককে অ্যাপয়েন্টমেন্ট চেয়ে চিঠি লিখেছিলাম, তিনি তো ইতিবাচক সাড়া দেননি। দেখুন, কাজ হবে কি না আমি বলতে পারব না। আপনি আমার পরামর্শ চেয়েছেন, আমি পরামর্শ দিলাম। এখন শোনা না শোনা আপনার এখতিয়ার।

আমি মনমরা হয়ে চট্টগ্রামে ফিরে এসে কয়েকদিন পর ডা. গোলেনকে ইংরেজি ভাষায় অফিসিয়াল প্যাডে একটি চিঠি লিখে আমার চিকিৎসার ব্যাপারে তার সহায়তা চাইলাম। বেশ কয়েকদিন পর ডা. গোলেন বাংলা ভাষায় তার জবাব পাঠালেন। তিনি আমাকে দুটি তারিখ দিয়ে আমার সুবিধামত সময়ে খ্রিষ্টান মেমোরিয়াল হাসপাতালে যেতে বললেন। এ ভাবে আমি ডা. গোলেনের সহায়তায় ওই হাসপাতালে রোগী হিসেবে রেজিস্ট্রেশন করাতে পারলাম। প্রথম দিন সন্তোষ নামের একজন বাঙালি ডাক্তার আমাকে দেখলেন। তিনি কিছু ব্যায়াম করতে পরামর্শ দিলেন এবং আবার ১৫ দিন পর আমাকে যেতে বললেন। আমি ভাবলাম, যাক এখন তো আমি এদের রোগী। যে কোনো সময় প্রয়োজনে আসতে পারব। আমাকে আর 'চিকিৎসা হবে না' বলে ফিরিয়ে দিতে পারবে না। এ কথা ভেবে ফিরে আসছিলাম। কিন্তু গেট পর্যন্ত এসে হঠাৎ মনে হলো, যাঁর জন্য আমি এখানে রেজিস্ট্রেশন পেলাম, তাঁকে তো আমার একটি ধন্যবাদ জানানো উচিত। কাজেই আমি আবার হাসপাতালের ভেতরে ঢুকে ডা. গোলেনের অফিস খুঁজে বের করে তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করলাম। তাকে আমার চিঠির উত্তর দেবার জন্য এবং সে সঙ্গে হাসপাতালে চিকিৎসা পেতে তাঁর সহযোগিতার জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ জানালাম। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, আমাকে কেউ দেখেছেন কিনা। আমি বললাম, হ্যাঁ দেখেছেন এবং আবার ১৫ দিন পর আসতে বলেছেন। তিনি বললেন, ঠিক আছে। তবে প্রফেসর, আমি যদি তোমাকে একটু দেখি তাহলে কি তুমি কিছু মনে করবে? আমি তো অবাক হয়ে আকাশের চাঁদ হাতে পেলাম। কারণ, অভিজ্ঞ

ফিজিওথেরাপিস্ট হিসেবে গোলেনের সুনাম আমি আগেই শুনেছিলাম। আমি বললাম বলেন কি, আমি তো খুবই খুশি হব যদি আপনি আমাকে দেখেন।

ডা. গোলেন আমাকে বেডে শোয়ালেন এবং উপুড় করে শুইয়ে আমার কোমরের হাড়গুলোর অবস্থান আঙ্গুল দিয়ে টিপে টিপে পরীক্ষা করলেন। তারপর ছবি দেখিয়ে আমাকে কতগুলো ব্যায়াম করতে বললেন। তিনি নিজে ব্যায়ামগুলো করার সময় ভুল ধরে সঠিক পদ্ধতি দেখিয়ে দিলেন। বললেন, তুমি চিন্তা করো না, এ সব রোগ শতকরা একশ' ভাগ ভালো না হলেও তুমি ভালো থাকবে। আমি তার কথায় অনেক সাহস পেলাম। প্রায় তিন-চার মাসের চিকিৎসায় আমি ক্রমান্বয়ে সুস্থ হয়ে উঠলাম। ডা. গোলেন ছিলেন খুবই স্বল্পভাষী এবং অমায়িক ব্যবহারের একজন ভদ্র ডাক্তার। তিনি আমাকে খুব একটা ওষুধ দেননি। কোনোদিন ঠান্ডা, আবার কোনোদিন গরম সেক দিয়ে ব্যায়াম করাতেন। কিছু ব্যায়াম শিখিয়ে দিয়েছিলেন। সেগুলো সকাল বিকাল বাসায় আমি নিজেই করতাম। গোলেন চট্টগ্রাম শহরে থাকতেন। চট্টগ্রাম থেকে প্রতিদিন গাড়িতে করে দুলহাজরা হাসপাতালে যেতেন। একদিন আমি যখন চিকিৎসা নিয়ে ফিরে আসার জন্য বাসের অপেক্ষায় রাস্তায় দাঁড়িয়ে ছিলাম, তিনি তাঁর পাজেরো গাড়ি আমার পাশে থামিয়ে আমি কোথায় যাব জানতে চাইলেন। আমি চট্টগ্রাম যাব শুনে তিনি আমাকে লিফট দিতে চাইলে আমি তাকে ধন্যবাদ দিয়ে তার গাড়িতে উঠলাম।

ডা. গোলেন নিজেই গাড়ি চালাচ্ছিলেন। আমি তাঁর পাশের সিটে বসার পর তিনি ঈসা মসিহর গুণকীর্তণের ক্যাসেট অন করে দিলেন। মাঝে মাঝে তিনি হযরত ঈসা (আঃ)-এর প্রশংসা ও গুণকীর্তন করলেন। আমি কেবল শুনলাম। এক পর্যায়ে তিনি বললেন, দেখো রোগ ব্যধি, দুঃখ-কষ্ট এ সব খুবই তুচ্ছ ব্যাপার। ঈসা মসিহকে বিশ্বাস করলে এসব কিছুই থাকে না। নানা উদাহরণ দিয়ে তিনি এসব আমাকে বুঝাতে চেষ্টা করলেন। তার অনেক বক্তব্যের পর আমি মুখ খুললাম। বললাম দেখুন, আমরা মুসলমানগণ হযরত ঈসা আলাইহিস সালামকে অত্যন্ত সম্মান করি। তিনি আল্লাহ পাকের প্রিয় নবীদের অন্যতম। কিন্তু আপনি তো জানেন যে আমাদের নবি আখেরি জামানার পয়গম্বর। তিনি হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের অনেক পরে পৃথিবীতে শেষ নবি হিসেবে এসেছিলেন এবং তাঁর মাধ্যমে দ্বীন পরিপূর্ণতা লাভ করেছিল। তিনি মনোযোগ দিয়ে আমার কথা শুনলেন। হযরত ঈসার মাধ্যমেই দ্বীন পরিপূর্ণতা লাভ করার যুক্তি ভালোভাবে দাঁড় করাতে না পারলেও তিনি বেশি বাদানুবাদ করেননি। গোলেন মিশনারি হাসপাতালের ডাক্তার। তাদের কিছু উদ্দেশ্য তো থাকবে। সে জন্য তারা তা পালন করেন। নিজ ধর্মকে প্রচারের চেষ্টা করেন। এ জন্য তাদেরকে দোষ দেয়া যায় না। এটা তাদের কর্তব্য। সে কারণে গোলেনের ওপর আমি অসন্তুষ্ট নই। তবে তিনি যখন আমার চিকিৎসা করেছিলেন, তখন তাতে কোন ত্রুটি ছিল না। পূর্ণ আন্তরিকতা দিয়েই তিনি আমার চিকিৎসা করেছিলেন। এ জন্য আমি ডা. এল

ডি গোলেনের কাছে কৃতজ্ঞ। জানি না তিনি আজও বেঁচে আছেন কিনা। তবে তিনি যেখানেই থাকুন, দোয়া করি তিনি যেন ভালো থাকেন, সুস্থ থাকেন, আনন্দে থাকেন। তাঁর পরামর্শ মতো চলে প্রায় ৩০ বছর আমার ব্যাকপেইন নিয়ন্ত্রণে আছে। যখন একটু ব্যথা বাড়ে তখন আমি তাঁর নির্দেশিত ব্যায়ামগুলো করি। ডা. গোলেনের চিকিৎসার প্রায় ২৬-২৭ বছর পর ওই হাসপাতালের কতিপয় ডাক্তারের সঙ্গে আমার চট্টগ্রাম শহরে একবার আলাপ পরিচয় হয়। আমি তাঁদেরকে বলি, আমি তো আপনাদের হাসপাতালের একজন পুরানো রোগী। কিন্তু আমার কোনো কাগজপত্র নেই। রেজিস্ট্রেশন নম্বর পর্যন্ত মনে নেই। আমার ব্যাকপেইন আবার কখনো বাড়লে যদি আমি আপনাদের হাসপাতালে যাই তাহলে কি আমাকে সেবা দেয়া হবে? তারা আমাকে নিশ্চয়তা দিয়ে বলেন, যেহেতু আপনি আমাদের রোগী, অবশ্যই পুরানো আর্কাইভ থেকে নাম ব্যবহার করে আপনার রেজিস্ট্রেশন নম্বর বের করতে পারব এবং আপনি নিশ্চয়ই আমাদের চিকৎসা পাবেন। আমি এ কথা শুনে তাঁদের ধন্যবাদ জানাই।

ইবেন নাথান

ব্যাকপেইনের অসুস্থতার মধ্যে আমার সাবেক সহকর্মী বিশিষ্ট সমাজবিজ্ঞানী ড. আহমেদ শফিকুল হক বিদেশ থেকে আমাকে জানান যে ডেনমার্কের কোপেনহেগেনের অরহুস বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন শিক্ষক তাঁর গবেষণা কাজের তথ্য সংগ্রহে বাংলাদেশে যাবেন। তিনি তাঁর গবেষণা কাজে আমার সহায়তা চাইলে সম্ভব হলে আমি যেন তাঁকে সহায়তা করি। ড. হক আমার অত্যন্ত শ্রদ্ধেয়, সুহৃদ ও শুভাকাংখীদের অন্যতম এবং অনেকটা বড় ভাইয়ের মতো। একাডেমিক ব্যাপারে সব সময় তাঁর কাছ থেকে সুপরামর্শ, ইতিবাচক নির্দেশনা ও সহায়তা পেয়েছি। কাজেই তাঁর অনুরোধ ফেলা সম্ভব নয়। এর কিছুদিন পর যখন ইবেন নাথান নামের ওই শিক্ষক চিঠি লিখে আমার সহায়তা চান, আমি তখনও ব্যাকপেইন থেকে সুস্থ হয়ে উঠিনি। আমি তাঁকে জানাই, আমি শারীরিকভাবে সুস্থ নই। তা হলেও আপনি আসুন। আপনার কোন অসুবিধা হবে না। আমার কোনো ঘনিষ্ঠ সহকর্মীকে আপনাকে সহায়তা করার জন্য অনুরোধ করব। তিনি ওই চিঠির জবাবে জানান, অন্য কাউকে ঠিক করা লাগবে না। যেহেতু তিনি আরও দুই মাস পর আসবেন, তিনি আন্তরিকভাবে আশা করছেন যে তার মধ্যে আমি সুস্থ হয়ে যাব। পরবর্তীতে সে রকমই হয়েছিল।

মাস দুই পর ইবেন বাংলাদেশে এসে আমার সঙ্গে দেখা করতে আগ্রহ প্রকাশ করলেন। ঢাকায় বনানীতে আমাদের সাক্ষাৎ হলো। আমি যেমনটি ভেবেছিলাম তিনি তাঁর চেয়ে অনেক কম বয়সী ছিলেন। সালোয়ার কামিজ পরা একজন ফুটফুটে মহিলা যাকে দেখলে মনে হয়, হয়ত কেবল পাস করে শিক্ষকতায় যোগ দিয়েছেন। ইবেনও আমাকে একই রকম প্রতিক্রিয়া জানিয়েছিলেন। বলেছিলেন,

আমি ভেবেছিলাম তুমি একজন অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর। হয়ত বয়স্ক এবং রাশভারি হবে। এখন দেখছি আমি যেমনটি ধারণা করেছিলাম তুমি তার চেয়ে অনেক কম বয়সের। যা হোক আমাদের মধ্যে বোঝাপড়া হলো যে ইবেন নোয়াখালীর গ্রামে কাজ করবেন এবং আমি প্রতিমাসে একবার গিয়ে কয়েকদিন গ্রামে থেকে তাঁকে সহায়তা করব। তার জন্য তিনি আমাকে সম্মানীও দেবেন বলে জানালেন। এ কাজের জন্য আমি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে কোনো ছুটি নেব না। ইবেন ডেনিশ ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট এজেন্সি (ডানিডা)-র অর্থানুকূল্যে 'বাংলাদেশের রাজনৈতিক সংস্কৃতি, অংশগ্রহণ, স্থানীয় প্রশাসন এবং গ্রামীণ জনগণ' শীর্ষক গবেষণা কাজের জন্য তথ্য সংগ্রহ করবেন।

ইবেন নোয়াখালীর মাইজদি শহরে একটি বড় বাসা ভাড়া করে থাকতেন। আর আমি চট্টগ্রাম থেকে গিয়ে একটি হোটেলে থাকতাম। ওই সময় চট্টগ্রাম থেকে নোয়াখালী যেতে দুই বা সোয়া দুই ঘন্টা সময় লাগত। আমি বাসেই যেতাম। ইবেনের গাড়ি চড়ে গ্রামে যেতাম এবং তাঁর সঙ্গে থাকতাম। যে সকল বিষয় তিনি বুঝতেন না আমি তাঁকে সে সব বুঝিয়ে দিতাম। গ্রামে সাদা ফুটফুটে একজন বিদেশি মহিলার সঙ্গে ঘুরতে আমার ভালই লাগত। তিনি অনেক গ্রামীণ নেতাদেরকে ইন্টারভিউ করতেন। আমি তাঁকে তাদের জবাব বুঝিয়ে দিতাম। নোয়াখালীর সেনবাগ উপজেলায় আমরা বেশি ঘোরাঘুরি করায় ওই উপজেলার প্রায় সবাই আমাকে চিনতেন। আমি একা কখনো কোনো গ্রামে গেলে অনেকে বলতেন, স্যার মেমসাহেব কই? কাজ শুরু করার পর একটি মজার ঘটনা ঘটে। ইবেন কয়েকটি উপজেলার ম্যাপ জোগাড় করতে তাঁর এক সহকারীকে বলেছিলেন। পরে আমাকে কাউকে সঙ্গে নিয়ে সংশ্লিষ্ট অফিস থেকে ওই ম্যাপগুলো আনতে অনুরোধ করেন। আমি সে অফিসে গিয়ে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাকে প্রথমে আমার আসার উদ্দেশ্য বললে তিনি আমাকে বসতে বলেন। আমি শুনতে পেলাম, তিনি পাশের টেবিলে তাঁর সহকর্মীকে বলছেন, বিদেশি ম্যাডাম বলেছিলেন, তাঁর সঙ্গে এক অধ্যাপক কাজ করবেন, কিন্তু এখন তো দেখছি অধ্যাপক সাহেব না এসে তার ছাত্র পাঠিয়েছেন। হয়ত অধ্যাপক সাহেব পরে আসবেন। তিনি আমার জিনসের প্যান্ট, রঙ্গীন জামা, বয়স এবং ভাবভঙ্গি দেখে আমাকে ছাত্র ভেবেছিলেন। যা হোক, কিছুক্ষণ পরে আমাকে ম্যাপগুলো এনে দিলে আমি তাঁকে ধন্যবাদ জানাই এবং তিনি যাতে লজ্জা না পান সে জন্য তাঁর কানের কাছে মুখ নিয়ে মৃদু উচ্চারণে বলি, বিদেশি ম্যাডাম যে প্রফেসর সাহেব আসবেন বলেছিলেন, তিনি নিজেই এসেছেন। কোনো ছাত্র পাঠাননি। এ কথা শুনে চোখ বড় করে তিনি আমার দিকে যেভাবে তাকালেন তাতে মনে হলো তিনি লজ্জা না পেলেও বিস্মিত হয়েছেন।

ইবেনের সঙ্গে কাজ করার সময় ইউনিয়ন পরিষদের ১৯৯১-১৯৯২ সালের নির্বাচন এসে যায়। ওই গবেষণা কাজের অংশ হিসাবে আমরা ওই নির্বাচনও

পর্যবেক্ষণ করি। নোয়াখালী অঞ্চলের ওই ইউপি নির্বাচন জাঁকজমকভাবে অনুষ্ঠিত হয়। বিচ্ছিন্ন কিছু নেতিবাচক ঘটনা ছাড়া নির্বাচনটি ভালভাবেই সম্পন্ন হয়। আমরা প্রার্থীদের নির্বাচনী প্রচারণা পর্যবেক্ষণ করি। অনেক প্রার্থীই ওই এলাকার একটি মাযার জিয়ারত করে তাদের নির্বাচনী প্রচারণা শুরু করেন। প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের অনেকে মাযার জিয়ারত করার পর মনোনয়নপত্র জমা দেন। ইবেন এ নির্বাচনের উল্লেখযোগ্যসংখ্যক প্রার্থীদের সঙ্গে কথা বলেন। তাদের কাজকর্ম, পরিকল্পনা ও চিন্তা-ভাবনার সঙ্গে পরিচিত হন। নির্বাচনী প্রচারণা তুঙ্গে উঠলে একজন চেয়ারম্যান প্রার্থীর একটি প্রচারণা মিছিল ইবেনের অনুরোধে আমি পর্যবেক্ষণ করি। মিছিলটি যেখান থেকে শুরু হবে সেখানে এক মন সেমাই রান্নার প্রস্তুতি গ্রহণ করা হয়। এ কাজ অন্যত্র করা সম্ভব ছিল। কিন্তু মিছিলের উদ্যোক্তাগণ চেয়েছিলেন, মিছিলে অংশগ্রহণকারীগণ যেন রান্নার আয়োজন দেখার পর মিছিলে অংশগ্রহণ করেন। কারণ, তাদের বিশ্বাস ছিল, এ আয়োজন দেখে মিছিলে অংশগ্রহণ করলে আবার এখানে এসে মিছিল শেষ করা পর্যন্ত অংশগ্রহণকারীগণ মিছিলে থাকবেন। মাঝপথে মিছিল ছেড়ে চলে যাবেন না। তাদের এ কৌশল কাজে লেগেছিল।

মিছিলে প্রচুর লোকসমাগম হয় এবং দীর্ঘ মিছিল শুরু হলে মিছিলের শরীরের সাত-আট জায়গা থেকে স্লোগান দেয়া হতে থাকে। লক্ষণীয়, মিছিলটির গতিপথে বিভিন্ন এলাকায় মিছিলের স্লোগান পরিবর্তিত হতে থাকে। দেখা যায়, এককে এলাকায় মিছিল প্রবেশ করলে সংশ্লিষ্ট এলাকার ভোটারদের সন্তুষ্ট করতে ওই এলাকার সমস্যাকেন্দ্রিক স্লোগান দেয়া হয়। এ কাজটি ছিল সংশ্লিষ্ট এলাকার ভোটারদের মনোযোগ ও সমর্থন পাবার একটি কৌশল। এ মিছিলে অংশগ্রহণকারী অনেকে আমাকে চিনতেন। তাঁরা আমাকে 'মেমসাহেবের লোক' হিসেবে জানতেন। তাঁদের কেউ কেউ আমাকে মিছিলে শরিক হতে অনুরোধ জানালে আমি তাঁদেরকে সবিনয়ে বলি, দেখুন, আমি একজন পর্যবেক্ষক। সে কারণে আমি কোনো বিশেষ প্রার্থীর মিছিলে যোগ দিতে পারি না, বা তাদের সমর্থনও দিতে পারি না। আপনাদের প্রতিপক্ষ প্রার্থীর মিছিলেও আমি অংশগ্রহণ করব না। তবে আমি সেখানে উপস্থিত থেকে তাদের মিছিলও পর্যবেক্ষণ করব। আমি মিছিলের শেষে থেকে মিছিলটিকে অনুসরণ করি। মিছিলে যা যা হয় তার খুঁটিনাটি পর্যবেক্ষণ করে মিছিলটির ওপর একটি ৩-৪ পৃষ্ঠার বর্ণনামূলক রিপোর্ট ইবেনকে লিখে দেই। ইবেন রিপোর্টটি পড়ে খুশি হন এবং পরবর্তী সাক্ষাতে আমাকে বলেন, তোমার রিপোর্ট পড়ে আমার মনে হচ্ছিল যেন আমি নিজেই ওই মিছিলে শরিক রয়েছি।

এ ইউপি নির্বাচনের প্রচারণায় সনাতনী পোস্টার ও ব্যানার ব্যবহার করা হয়। এ ছাড়াও গ্রামীণ বিদ্যুতায়নের সুযোগ ব্যবহার করে চৌরাস্তার মোড়ে স্থাপিত বিভিন্ন প্রার্থীর অস্থায়ী প্রচারণা অফিসে তাদের পক্ষে নির্বাচনী প্রচারণার

অংশ হিসাবে সঙ্গীতের ব্যবহার ছিল লক্ষণীয়। এ রকম বিশেষ বিশেষ প্রার্থীর প্রচারণা অফিসে সমর্থনকারী ভোটারদেরকে ফ্রি চা-বিড়ি-সিগারেট দিয়ে আপ্যায়ন করা হয়। এখানে প্রার্থীর যোগ্যতা ও গুণগান সংবলিত গান ক্যাসেটে রেকর্ড করিয়ে সেই গান ক্যাসেট প্লেয়ারে অবিরতভাবে বাজানো হয়। এ নির্বাচনী গানগুলোও আমরা আমাদের পর্যবেক্ষণের আওতায় আনি। লক্ষ্য করি, সঙ্গীতগুলোতে স্থানীয় বাদ্যযন্ত্র ব্যবহার করা হয়েছে। বেশির ভাগ সঙ্গীতগুলোয় বাদ্যযন্ত্র হিসাবে ব্যবহার করা হয় মাটির হাঁড়ি এবং একতারা। গানগুলোর কথা রচনা এবং তাতে কণ্ঠদান করেন স্থানীয় বয়াতিগণ। প্রচারণা সঙ্গীতগুলোর শরীর অনেক দীর্ঘ। একেকটি গান একটি ফিতার ক্যাসেটের এক পার্শ্বব্যাপী বিস্তারিত। আর এর বিষয়বস্তু হলো সংশ্লিষ্ট প্রার্থীর গুণকীর্তন। তবে সবকিছু মিলিয়ে গানগুলো শুনতে ভালো লাগে। এ সব সঙ্গীতের রচয়িতা ও গায়ক বয়াতিরা খুব একটা লেখাপড়া জানেন না। ভাষা, ব্যাকরণ, ও বাক্যগঠনে ত্রুটি এবং স্থানীয় ভাষার প্রয়োগ থাকলেও শব্দ প্রয়োগে তাদের সতর্কতার প্রমাণ পাওয়া যায়। অধিকাংশ সঙ্গীতে তাঁরা পুরুষ ভোটারদেরকে 'ভাই' এবং নারী ভোটারদেরকে 'মা-বইন' বলে সম্বোধন করেন। গানের শরীরজুড়ে মাঝে-মধ্যে আবার 'ময়-মুরুব্বী', 'ছাত্র-যুবক', 'এলেকাবাসী', 'হিন্দু-মুসলিম' প্রভৃতি সম্বোধন করে সকল শ্রেণির ভোটারদের সন্তুষ্ট করার প্রয়াস লক্ষণীয়। এ ইউপি নির্বাচনটি সন্ত্রাসমুক্তভাবে অনুষ্ঠিত হয়। নির্বাচনের দিন আমরা কতিপয় ভোটকেন্দ্রে ঘুরে দেখেছি। ভোটকেন্দ্রগুলো ভোটারদের ভিড়ে জমজমাট ছিল। (নির্বাচনের দিন একটি ভোটকেন্দ্রের সামনের ছবির জন্য দেখুন, পরিশিষ্ট- ৩:১)।

ইবেনের স্বামী ডেনমার্কের পার্লামেন্ট বিষয়ে গবেষণা করেন। ইবেনের গবেষণা চলাকালে তিনি একবার বাংলাদেশে আসেন। ইবেন তাঁকে নিয়ে চট্টগ্রাম হয়ে কক্সবাজার সমুদ্র সৈকতে বেড়াতে যাবার পরিকল্পনা করলে আমরা তাঁদেরকে আমাদের চট্টগ্রামের বাসায় ডিনারে নিমন্ত্রণ করি। তাঁরা সানন্দে রাজি হন। ইবেন শাড়ি এবং তাঁর স্বামী পাজামা পাঞ্জাবি পরে আমাদের বাসায় আসেন। আমরা তখন চট্টগ্রামের জয়নগর প্রথম গলির একটি ছোট্ট বাসায় থাকতাম। দেশি খাবার খেয়ে তাঁরা বেশ প্রশংসা করেন। তাঁরা দুজনই আমার স্ত্রীর সঙ্গে কথাবার্তা বলেন। ইবেনের সঙ্গে কয়েক মাস কাজ করে তাঁর সঙ্গে আমার বেশ সখ্য হয় এবং এ সুযোগে আমি নোয়াখালী অঞ্চলের গ্রামীণ সংস্কৃতি সম্পর্কে আমার চিন্তা ভাবনাকে শানিত করতে সক্ষম হই। এ কাজটি করে আমি একাডেমিকভাবেও লাভবান হই। কারণ, আমি ইবেনের সঙ্গে কাজ করার সময় আমার ভবিষ্যৎ গবেষণার খোরাক হিসাবে কিছু নির্বাচনী প্রচারণা সঙ্গীত সংগ্রহ করি। ইবেনের সঙ্গে কাজ শেষ হবার পর ওই গানগুলো বিশ্লেষণ করে আমি চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় রাজনীতি বিজ্ঞান বিভাগ থেকে প্রকাশিত *বাংলাদেশ পলিটিক্যাল স্টাডিজ* জার্নালে 'রাজনীতি ও সঙ্গীত: প্রসঙ্গ বাংলাদেশের স্থানীয় সরকার নির্বাচন' শীর্ষক একটি গবেষণা নিবন্ধ

লিখে জমা দিলে প্রবন্ধটি ১৯৯৪ সালে প্রকাশিত হয়।[৫] পরে ২০২০ সালে ঢাকার নভেল পাবলিশিং হাউস আমার লেখা *রাজনৈতিক সংস্কৃতি ও সামাজিকীকরণ: প্রসঙ্গ বাংলাদেশ* বইটির পুনর্মাজিত ও বর্ধিত সংস্করণ প্রকাশ করলে প্রাসঙ্গিকতার কারণে ওই বইয়ের শেষ অধ্যায় হিসেবে এ লেখাটি অন্তর্ভুক্ত করি।[৬] আমার মত ইবেনেরও কাজের ফাঁকে অন্য কিছু করার শখ ছিল। তাঁর এমন শখের একটি ছিল বাংলাদেশের রিক্সার পেছনের পেইন্টিং সংগ্রহ করা। রিক্সার বডির পেছনের নীচদিকে টিনের টুকরায় শিল্পীরা পশু-পাখী, নদী, নায়ক-নায়িকা এবং প্রাকৃতিক দৃশ্যের যেসব ছবি আঁকেন, ইবেন তার নমুনা সংগ্রহ করেছিলেন (ইবেন সংগৃহীত রিক্সা পেইন্টিংয়ের নমুনার জন্য দেখুন পরিশিষ্ট- ৩:২)।

ইবেনের সঙ্গে কাজ শুরু করার পর সে আমাকে জিজ্ঞেস করেছিল আমি আমার কাজের জন্য কত সম্মানী চাই। আমি বলি, আমার অত্যন্ত শ্রদ্ধেয় সহকর্মী এবং সুহৃদ আমাকে আপনার গবেষণা কাজে সহায়তা করতে অনুরোধ করেছেন। সে জন্য আমি আপনাকে যতটুকু পারি সহায়তা করছি। আমি ঠিক সম্মানীর জন্য আপনকে সহায়তা করছি না। আমার কাজ আপনাকে আন্তরিকভাবে সহায়তা করা। আপনি যদি সম্মানী দিতে চান সেটা আপনার কাজ। সে ব্যাপারে আমার কোনো বক্তব্য নেই। তবে প্রতি মাসে তিনি আমাকে যে সম্মানী দিতেন তা আমার ধারণার চেয়ে বেশি ছিল। তিনি আমার ওপর সন্তুষ্ট ছিলেন বলেই আমার কাছে মনে হয়েছে। কারণ, আমি কখনো অ্যাপয়েন্টমেন্ট মিস করতাম না। আমার সময়জ্ঞান ও কাজের আন্তরিকতা তিনি হয়ত পছন্দ করতেন। ইবেন একা একটি বড় বাড়িতে একাধিক কাজের লোকসহ থাকতেন। প্রতিবার আসার আগের দিন তিনি আমাকে একটি খাম দিতেন। এই খামে একটি ব্যাংক চেক থাকতো। আমি নোয়াখালী থাকাকালীন তিনি পার্টির আয়োজন করলে অন্যান্যদের সঙ্গে আমাকেও দাওয়াত দিতেন। এমনটি একাধিকবার হয়েছে। কিন্তু একবার তিনি আমাকে আমার সম্মানীর খাম দিতে ভুলে যান। তবে রাতে তিনি আমাকে ফোন করে সে জন্য দুঃখ প্রকাশ করে বলেন, আমি চাইলে তখন গিয়ে খাম নিয়ে আসতে পারি। আমি তাকে ধন্যবাদ জানিয়ে বলি এ নিয়ে আপনি ভাববেন না। রাতে আর বের হব না। পরের বার আমাকে দুটি খাম দিতে পারবেন। ইবেন তাঁর ক্যারিয়ারে অনেক উন্নতি করেছেন। অনেক প্রকাশনা করেছেন। ১৯৯১-১৯৯২ সালে দশ মাস তিনি মাঠের তথ্য সংগ্রহে নোয়াখালীতে ছিলেন। আমি তাকে প্রথম চার-পাঁচ

---

৫. মুহাম্মদ ইয়াহ্ইয়া আখতার, 'রাজনীতি ও সঙ্গীত: প্রসঙ্গ বাংলাদেশের স্থানীয় সরকার নির্বাচন', *বাংলাদেশ পলিটিক্যাল স্টাডিজ*, খণ্ড ১৬, ১৯৯৪), পৃষ্ঠা-৭৯-৯৫।

৬. মুহাম্মদ ইয়াহ্ইয়া আখতার, *রাজনৈতিক সংস্কৃতি ও সামাজিকীকরণ: প্রসঙ্গ বাংলাদেশ* (ঢাকা: নভেল পাবলিশিং হাউস, ২০২০)।

মাস একবার করে গিয়ে কয়েকদিন থেকে সহায়তা করতাম। এ কাজটি ছিল তাঁর পিএইচডি গবেষণার অংশ। তিনি ১৯৯৮ সালে 'When Poor People Participate, A Case Study of a Local Government Election in a Locality of Rural Bangladesh' শীর্ষক অভিসন্দর্ভ লিখে অরহুস বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পিএইচডি ডিগ্রি লাভ করেন। পরবর্তীতে ২০১৯ সালে ইন্টারনেটে অনুসন্ধান করে জানলাম যে ইবেন এখন কোপেনহেগেন বিশ্ববিদ্যালয়ের ইন্সিটিউট অব ফুড অ্যান্ড রিসোর্স ইকনমিক্স এর সহযোগী অধ্যাপক। বর্তমানে তার কালো চুলের কিছু অংশের বর্ণ সাদা হয়েছে এবং সে সঙ্গে সমৃদ্ধ ও দীর্ঘ হয়েছে তার প্রকাশনার তালিকাও (ইবেন নাথানের ছবির জন্য দেখুন পরিশিষ্ট- ৩:৩)।

গণমাধ্যমে সক্রিয় ভূমিকা পালন

কানাডা থেকে এমএ ডিগ্রি করে ফিরে এসে একাডেমিকভাবে ব্যস্ত হয়ে পড়ি। একদিকে যেমন গবেষণামূলক প্রবন্ধ, বই, প্রভৃতি লিখি; তেমনি আবার সাধারণ মানুষের জন্য দৈনিক পত্রিকায় কলাম লেখা শুরু করি। *দৈনিক জনকণ্ঠ* পত্রিকা প্রকাশিত হবার পর আমার লেখা কলাম এ পত্রিকায় প্রকাশিত হবার মধ্য দিয়ে শুরু হয় আমার কলামিস্ট পরিচিতি। বেশ কিছুদিন কলাম লেখার পর আমি পিএইচডি করতে সিডনি বিশ্ববিদ্যালয়ে চলে গেলে কলাম লেখায় বিরতি পড়ে। তবে সিডনি থাকাকালীন আমি সিডনি থেকে বাংলা ভাষায় প্রকাশিত সাপ্তাহিক *স্বদেশ বার্তা* ও পাক্ষিক *দেশকণ্ঠ* পত্রিকায় কয়েকটি কলাম লিখেছিলাম। সিডনি থেকে ১৯৯৯ সালে দেশে ফেরার পর একাডেমিক লেখালেখির পাশাপাশি আবার কলাম লিখতে শুরু করি। আমার কলামগুলোর বিশেষত্ব হলো পত্রিকার পাঠকদের জন্য একেবারে সাদামাটাভাবে না লিখে একটু একাডেমিক ভঙ্গিমায় তথ্যসমৃদ্ধ ভঙ্গিমায় লেখা। এর ফলে শিক্ষিত পত্রিকা পাঠকদের মধ্যে আমার কিছুটা পরিচিতি ও গ্রহণযোগ্যতা তৈরি হয়। প্রধানত আমি সমসাময়িক রাজনৈতিক বিষয়বস্তুর ওপর কলাম লিখতে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করি। তবে এ ছাড়াও, সমাজ, শিক্ষা, সংস্কৃতি, নির্বাচন, গণতন্ত্র, ধর্ম প্রভৃতি আরও নানা বিষয়ে আমি কলাম লিখি। ফলে সিডনির পাঁচ বছর বাদ দিলেও আমার কলাম লেখার অভিজ্ঞতা ২৬ বছরেরও বেশি। এই ২৬ বছরে দেশের শীর্ষস্থানীয় দৈনিকগুলোয় আমার সাড়ে ৫ শতাধিক কলাম প্রকাশিত হয়েছে। কতিপয় শীর্ষস্থানীয় পত্রিকায় দীর্ঘদিন ধারাবাহিকভাবে কলাম লিখেছি। এর মধ্যে *প্রথম আলো* পত্রিকায় 'বিশ্লেষণী দৃষ্টিপাত' এবং যুগান্তর পত্রিকায় 'দেশপ্রেমের চশমা' লোগো নিয়ে কলাম লিখেছি। যুগান্তরের 'দেশপ্রেমের চশমা' প্রায় এক দশক ধরে লিখছি, যা উল্লেখযোগ্য পাঠকপ্রিয়তা পেয়েছে এবং এখনও চলমান আছে। কলাম লেখার কারণে লেখালেখির জগত এবং সাংবাদিক মহলেও আমার পরিচিতি গড়ে ওঠে। আরও নতুন নতুন পত্রিকা ও ম্যাগাজিন থেকে আমার সঙ্গে যোগাযোগ করে তাদের পত্রিকায় কলাম লিখতে অনুরোধ করা হয়। কিন্তু সময়ের জন্য সব

পত্রিকায় লেখা সম্ভব না হলেও বেশ কিছু দৈনিক, সাপ্তাহিক ও মাসিক পত্রিকায় আমার কলাম প্রকাশিত হয়েছে।[৭]

আমি যেসব কলাম লিখি তার মধ্যে রাজনীতিবিষয়ক কলামই বেশি। সে কারণে পাঠকদের কাছ থেকে বিভিন্ন রকম প্রতিক্রিয়া আসে। প্রতিটি কলামের শেষে যেহেতু আমার নাম, বিভাগীয় ও ইমেইল ঠিকানা দেয়া থাকে, সে কারণে অনেকে চিঠি লিখে, বা ই-মেইলে আমাকে বিভিন্ন কলাম সম্পর্কে তাদের প্রতিক্রিয়া জানান। যারা আমার কলামের সমালোচনা করেন, আমি তাদেরকে বেশি পছন্দ করি, যদি তাদের সমালোচনাগুলো যৌক্তিক হয়। কিন্তু দুঃখের বিষয়, অনেকে কেবল সমালোচনা করার জন্যই সমালোচনা করেন। তবে সমালোচনার চেয়ে প্রশংসাই আসে বেশি। আবার আমার কলাম প্রকাশিত হলে লেখক হিসেবে আমি চাই যে সবাই তা পাঠ করুন। সে জন্য আমি যে কোনো প্রকাশিত কলাম ফেসবুকে শেয়ার করে দেই। সেখানেও ফেসবুক বন্ধু ও পাঠকরা আমার কলামের প্রশংসা বা সমালোচনা করার সুযোগ পান। রাজনীতি লিখলে তো অনেক সময় সরকারের সমালোচনা করতে হয়। আমি সে সব ব্যাপারে পিছপা হই না। লেখার সময় যেটা দেশের জন্য, জনগণের জন্য মঙ্গলজনক বলে মনে করি, আমি তাই লিখি। সরকারের গুডবুকে থেকে কোনো প্রাপ্তিযোগের আশা নিয়ে কখনো লিখি না। অনেকে আমাকে জিজ্ঞেস করেন, আপনি এভাবে সরকারের সমালোচনা করলেন, কোনো হুমকি ধমকি পাননি? আমি সত্য কথাই বলি। দেখুন, গণতন্ত্রে সরকারের যৌক্তিক সমালোচনা করার অধিকার সবারই আছে। হুমকি দেবে কেন? আমাকে কোনো হুমকি দেয়া হয়নি। তবে সরকারিভাবে এমন কিছু না হলেও বেসরকারিভাবে অনেকে অনেক সময় উড়ো চিঠি লিখে যে অযৌক্তিভাবে অনাকাঙ্ক্ষিত কথা বলেননি, এমন নয়। অনেকে আবার পোস্ট অফিসের খাম ও পোস্ট কার্ড লিখেও আমার কলামের ওপর প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেন (পত্রিকার কলাম পড়ে লেখা পোস্টকার্ডের নমুনার জন্য দেখুন পরিশিষ্ট- ৩:৪)। ডাকযোগে প্রাপ্ত এসব মতামতের আমি উত্তর দেই না। তা ছাড়া পত্র লেখকরা তাদের বিস্তারিত ঠিকানাও দেন না। তবে নেতিবাচক চিঠি তেমন পাই না। ইতিবাচক চিঠি এবং ইমেইলই বেশি পাই। এগুলোতে থাকে প্রশংসা, দীর্ঘায়ু আর কল্যাণ কামনা। অধিকাংশক্ষেত্রে ইমেইলের জবাব দিতে পারি না। তবে মাঝেমধ্যে কিছু

৭. যে সব দৈনিক, সাপ্তাহিক ও মাসিক পত্রিকায় আমার কলাম প্রকাশিত হয়েছে তার মধ্যে রয়েছে *প্রথম আলো*, *যুগান্তর*, *ইত্তেফাক*, *আমার দেশ*, *জনকণ্ঠ*, *ইনকিলাব*, *নয়া দিগন্ত* , *মানবজমিন*, *কালের কণ্ঠ*, *ভোরের কাগজ*, *আজাদী*, *পূর্বকোন*, *সুপ্রভাত বাংলাদেশ*, *পূর্বদেশ*, *বীর চট্টগ্রাম মঞ্চ*, *শিক্ষা*, *সাম্প্রতিক দেশকাল*, *ঢাকা কুরিয়ার*, *রোববার*, *যায়যায়দিন*, *বার্তা-২৪*, *স্বদেশ বার্তা*, *দেশকণ্ঠ*, *ঠিকানা*, *একুশে পত্রিকা*, *ক্যাম্পাস বার্তা*, *ধুপছায়া*, *বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস*, *প্রকৃতি*, সিএন বাংলা, প্রমূখ।

ইমেইলের সংক্ষিপ্ত জবাব দেই। তবে খুব গণ্যমান্য কোনো নামকরা ব্যক্তিত্ব ইমেইল দিলে তাদের সম্মানার্থে উত্তর দেই। কলাম লেখার কারণে কোনো সময় কোনো অসুবিধায় যে পড়িনি এমন নয়। এখানে এমন একটি ঘটনার উল্লেখ করা অপ্রাসঙ্গিক হবে না।

আমি ২০০৩ সালের জুন মাসে ডাকযোগে একটি চিঠি পাই। চিঠিটির লেখক নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক পুলিশের একজন এএসআই। এ ভদ্রলোক সৎ পুলিশ অফিসার। কিন্তু পরিস্থিতির কারণে তিনি সৎ থাকতে পারছিলেন না। সে কারণে হৃদয়ে রক্তক্ষরণ নিয়ে তিনি আমাকে একটি আবেগঘন চিঠি লিখেন। চিঠিটি পড়ে আমি আবেগাপ্লুত হই। তিনি জানান, ঢাকা সিলেট হাইওয়ের পাশে কোনো এক জায়গায় তিনি একটি পুলিশ ফাঁড়ির দায়িত্বে আছেন। তাঁর বিভিন্ন কাজের মধ্যে একটি অন্যতম রুটিন কাজ হলো রাতে ঢাকা-সিলেটগামী নৈশ কোচগুলোর নিরাপত্তা বিধান করা। এ কাজ করার জন্য তাঁর একটি পিকআপ আছে। এ গাড়ি ব্যবহার করে তিনি রাতে নৈশ কোচগুলোর চলাচল শুরু হলে এলাকায় টহল দেন। এ কাজে তার দৈনিক ১২ লিটার ডিজেল লাগে। কিন্তু থানা থেকে তাকে এ জন্য ৮ লিটার ডিজেল সরবরাহ করা হয়। বাকি চার লিটার ডিজেল তিনি পাবেন কোথায়? এ ব্যাপারে তিনি এসপি সাহেবের দৃষ্টি আকর্ষণ করলে তিনি তাঁকে ম্যানেজ করে নিতে বলেন। এই ম্যানেজ করতে গিয়ে তিনি ভারত থেকে চোরাচালানের মাধ্যমে আগত দ্রব্যসামগ্রী অর্থের বিনিময়ে ছেড়ে দিয়ে ডিজেল ক্রয় করেন। এ জন্য তাঁর বুকে রক্তক্ষরণ হয়। এমন আরো কিছু দুঃখের কাহিনী লেখা তাঁর চিঠি পড়ে আমি 'পুলিশের মনে অনেক দুঃখ' শিরোনামে একটি কলাম লিখি। *প্রথম আলো* পত্রিকার উপসম্পাদকীয় পাতায় ২০০৩ সালের ২২ জুন তারিখে প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয়। প্রবন্ধটিতে কিছু উদ্বেগজনক তথ্য থাকায় মৌচাকে ঢিল মারার মতো অবস্থা হয়। ওই দিনই এ লেখাটি রাজারবাগ পুলিশ হেডকোয়ার্টারের রিসার্চ সেলের দৃষ্টিগোচর হয় এবং তারা একটি তদন্ত কমিটি গঠন করেন। আরেকটি তদন্ত কমিটি গঠন করেন হবিগঞ্জ জেলা পুলিশ প্রশাসন। একই দিন সন্ধ্যায় হবিগঞ্জের এসপি মহোদয় আমাকে ফোন করেন। তার কথা শুনে মনে হয়, তিনি মাননীয় মন্ত্রীর ফোন পেয়েছেন এবং মন্ত্রী এ ব্যাপারে বিরক্তি প্রকাশ করেছেন। তিনি আমাকে বলেন, প্রফেসর সাহেব আপনি এভাবে লিখেছেন কেন? আমি আপনার বিরুদ্ধে মানহানি মামলা করতে যাচ্ছি। আমি বলি, দেখুন এসপি সাহেব, আমি অনেক বছর ধরে কলাম লিখি। সে জন্য বলছি যদি আপনি মানহানি মামলা করেন, তাহলে দেরি করবেন না। কাল সকালে যত দ্রুত সম্ভব করবেন। কারণ, আমি আমার অভিজ্ঞতায় দেখেছি এসব ব্যাপারে দেরি করলে বিষয়টি থিতিয়ে গিয়ে স্তিমিত হয়ে যায়। আমি যে মানহানি মামলার কথা শুনে ভয় পাইনি সে বিষয়টি তাকে বুঝাতে সক্ষম হই। পরে মাগরিবের সময় থেকে রাত ১১টার মধ্যে তিনি আমাকে ৩-৪ বার ফোন করেন। আমি বুঝতে পারি, এখানে তাঁর কিছুই করার নেই। তিনি ঢাকা থেকে যেভাবে আদিষ্ট হচ্ছেন, সে ভাবেই কাজ করছেন। এক পর্যায়ে তিনি বলেন—

: প্রফেসর সাহেব আমি ঠিক করেছি আপনার বিরুদ্ধে মানহানি মামলা করব না।
: আমি তো আপনাকে আগেই বলেছিলাম, দেরি করলে এসব হয় না।
: তবে আমি আপনার এ লেখার বিরুদ্ধে একটি শক্ত প্রতিবাদ লিখব।
: নিশ্চয়ই লিখবেন। এটা তো আপনার অধিকার।
: তবে আমার প্রতিবাদটি আমি আপনাকে শোনাতে চাই।
: না না, তার কোনো দরকার হবে না। কারণ, আমার কোনো আপত্তি নেই। আপনি আমাকে তীব্র সমালোচনা করে লিখুন। আমি পারলে পরে তার জবাব লিখব।
: দেখুন, আমি নিজেও সরকারি কলেজের শিক্ষক ছিলাম। বিসিএস দিয়ে পুলিশে এসেছি। বুঝি, আপনার একটা সম্মান আছে।

আমার অনুরোধ না শুনে তিনি রাত ১১টায় আমাকে ফোন করে তাঁর প্রতিবাদ পড়ে শোনান। আমি বললাম, আমার কোনো আপত্তি নেই। আপনি চাইলে আরো শক্ত কথা লিখতে পারেন। এটা আপনার অধিকার। পরে *প্রথম আলো* তাঁর প্রতিবাদ ছাপে। কিন্তু আমি 'পুলিশ আমলাতন্ত্রে সংস্কার অত্যাবশ্যক' শিরোনামে ঐ প্রতিবাদের উত্তর লিখলে পত্রিকাটি সেটিও প্রকাশ করে।

এদিকে হবিগঞ্জ জেলা পুলিশ প্রশাসন যে তদন্ত কমিটি গঠন করেছিলেন তাদের একজন এএসপি পদমর্যাদার এবং দ্বিতীয়জন বানিয়চং থানার ওসি। এরা দু'জন ঐদিন রাতেই ট্রেনে করে চট্টগ্রামে পৌছান এবং ভোরে আমার নাসিরাবাদের ৫ নম্বর রাস্তার ভাড়া বাসার সামনে সকালে হাজির হন। বাসায় কোলাপসিবল গেট থাকার কারণে অত সকালে তাঁরা আমাকে ফোন করেননি। কিছু পরে আমি তাদের দেখে পরিচয় জিজ্ঞেস করে ঘরে নিয়ে আসি এবং চা নাস্তা খাওয়াই। কুশলাদি বিনিময়ের পর তাঁরা আমার কাছে ঐ চিঠিটি চান, যে চিঠিতে প্রদত্ত তথ্যের ওপর ভিত্তি করে আমি প্রবন্ধটি লিখেছিলাম। আমি বলি দেখুন, এটি একটি ব্যক্তিগত চিঠি। একজন আমাকে বিশ্বাস করে লিখেছেন। আমি যদি চিঠিটি আপনাদেরকে দেই, তাহলে তো আপনারা তাকে খুঁজে বের করে শাস্তি দিবেন। এ কাজে আমি সহায়তা করতে পারি না। কিন্তু তাঁরা অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে বললেন, স্যার আপনি যা মনে করছেন ব্যাপারটি সে রকম নয়। আমাদের এসপি সাহেবের বয়স কম। তিনি গবেষক ধরনের লোক। বিভিন্ন সময় তিনি সেমিনারে যোগ দেন। পুলিশ বিভাগের উন্নতির জন্য তিনি পরামর্শ দেন। তিনি সবকিছু জানতে বুঝতে চান। তাঁর কোনো অসৎ উদ্দেশ্য নেই। পরে আমি তাদের অনুরোধে নাম ঠিকানাবিহীন ঔ চিঠিটি ফটোকপি করে দিয়েছিলাম। কাজেই কলাম লিখে কখনোই যে কোনো বিরূপ পরিস্থিতির শিকার হইনি এমন নয়। তবে এ রকম কিছু ব্যতিক্রম বাদ দিলে সম্মান ও পরিচিতি পেয়েছি অনেক বেশি। অনেকের সাথে নতুন পরিচয়ে নাম বললেই জিজ্ঞেস করেছেন, আপনি তো পত্রিকায় কলাম লিখেন। আমি আপনার অমুক কলামটি পড়েছিলাম। ভালো লিখেছিলেন। ২০২১

সালের জানুয়ারি মাসে বিশ্ববিদ্যালয় গেটে আমার এক ছাত্র ও সহকর্মী ও আমি একত্রে ছিলাম। ছাত্র বলল, স্যার আমি একটু ফ্লেক্সিলোড করব। পাশেই একটি দোকানে গেলে চাদর জড়ানো গায়ে মুখে মাস্ক পরা আমি পাশে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছিলাম। জানি না ছাত্র দোকানিকে কি বলেছে। মধ্যবয়সী দোকানি আমাকে দেখার জন্য ব্যস্ত হয়ে ওঠেন। আমাকে মাস্ক খুলে তার সঙ্গে কুশল বিনিময় করতে হয়। পরে ছাত্রকে বললাম ব্যাপার কি? সে বললো, স্যার উনি দেশপ্রেমিক দোকানদার। দেশ নিয়ে ভাবেন। অনেকগুলি পত্রিকা পড়েন। উনি আপনার লেখার একজন ভক্ত পাঠক। মুখে কিছু না বললেও অন্তরে খুশি হলাম। ভাবলাম, এমন লোকজনও আমার কলাম পড়েন? আমাকে পছন্দ করেন?[৮] তা ছাড়া সব প্রকাশিত লেখা ফেসবুকে শেয়ার করার কারণে আমার ছাত্রছাত্রীরা সেখান থেকে অনেক উপাদান ও তথ্য সংগ্রহ করতে পারে, যা তাদের লেখাপড়ায় কাজে লাগে। এ কারণে নিজ বিভাগের শিক্ষার্থী ছাড়া অন্য অনেক বিভাগের শিক্ষক-শিক্ষার্থীরাও আমার সম্পর্কে জানেন।

শিক্ষক হিসেবে আমি বরাবর লেখালেখিতে সক্রিয় ছিলাম। এ সক্রিয়তার মধ্য দিয়ে আমি আমার সামাজিক দায়বদ্ধতা পালন করেছি। এ দায়বদ্ধতা বেশির ভাগ ক্ষেত্রে পালন করেছি লেখালেখির মাধ্যমে, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহার করে এবং প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় যথাক্রমে লেখালেখি করে ও টিভি প্রোগামে অংশগ্রহণ করে। প্রিন্ট মিডিয়ায় আমি বই লিখে ও প্রকাশ করে এবং পত্রিকায় প্রবন্ধ লিখে আমার দায়িত্ব পালন করেছি। আর ইলক্ট্রনিক গণমাধ্যমে আমি বিভিন্ন আলোচনা অনুষ্ঠান ও টকশো'তে অংশগ্রহণ করে স্বাধীনভাবে আমার মতামত ব্যক্ত করেছি। এ কথা স্বীকার্য যে, ঢাকায় থাকলে এ ক্ষেত্রে অনেক কাজ করার সুযোগ থাকে। তবে সম্প্রতি চট্টগ্রামে অনেকগুলি টিভি চ্যানেলের স্টুডিও হওয়ায় এখন এখানে বসেই ঢাকার টকশো'তে সরাসরি অংশগ্রহণ করা যায়। তাছাড়া অনেক সময় টিভির লোকজন ক্যামেরা নিয়ে বাসায় এসে ঢাকার অনুষ্ঠানে আমাদেরকে সংযুক্ত করে অংশগ্রহণ করান। আবার বিভিন্ন কারণে আমি ঢাকায় গেলে টিভি চ্যানেলের লোকজন জানতে পারলে তাদের স্টুডিওতে আমাকে বিভিন্ন টকশো'তে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। এ ভাবে আমি বিভিন্ন সময় চ্যানেল আই, বাংলাভিশন, আরটিভি, চ্যানেল টুয়েন্টিফোর, একুশে টিভি, বিটিভি, মাছরাঙ্গা টিভি, ইন্ডিপেন্ডেন্ট টেলিভিশন, যমুনা টিভিসহ বিভিন্ন টিভি চ্যানেলে আলোচনা ও টকশো'তে অংশগ্রহণ করেছি (আমার অংশগ্রহণ করা কতিপয় টিভি টকশোর স্থিরচিত্রের জন্য দেখুন পরিশিষ্ট- ৩:৫)। এ সব টকশো ও আলোচনা অনুষ্ঠানে অনেক বিজ্ঞজন ও গণ্যমান্য ব্যক্তিত্বের সঙ্গে আমার

---

৮. প্রাসঙ্গিক তথ্যের জন্য দেখুন, মুহাম্মদ ইয়াহ্ইয়া আখতার, 'যুগান্তরে লিখে সম্মানিত হয়েছি', *যুগান্তর*, ১ ফেব্রুয়ারি, ২০২১।

আলোচনায় অংশগ্রহণের সুযোগ হয়।[৯] ফলে ইলেকট্রনিক মিডিয়ার আলোচনাও আমার পরিচিতি বাড়িয়ে দেয়। কানাডা থেকে ডিগ্রি করে ফিরে উল্লেখযোগ্যসংখ্যক প্রকাশনা করে সহযোগী অধ্যাপক পদে উন্নীত হয়ে পিএইচডি করার জন্য মনস্থির করতে অনেক দেরি হয়ে যায়। অবশ্য এ সময়ে আমি একজন পিএইচডি ডিগ্রির জন্য আবেদনকারী হিসেবে নিজের অবস্থান পরিপক্ব ও গ্রহণযোগ্য করতে সমর্থ হই। এ সম্পর্কে পরের অধ্যায়ে আলোচনা করব।

[illegible]

চার

অস্ট্রেলিয়ায় উচ্চশিক্ষা গ্রহণ

কানাডা থেকে ফিরে চার বৎসরাধিককাল দেশে অবস্থান করি। এ সময় লেখাপড়ায় মনোযোগী হয়ে উল্লেখযোগ্যসংখ্যক গবেষণা প্রকাশনা করে সহযোগী অধ্যাপক পদে পদোন্নতি পাই। একাডেমিকভাবে অনেকটা পরিণত হওয়ার পর আমি পিএইচডি করার জন্য অস্ট্রেলিয়ার সিডনি বিশ্ববিদ্যালয়ে স্কলারশিপসহ ডিগ্রি করার সুযোগ পাই। এ অধ্যায়ে সিডনিতে আমার পাঁচ বৎসরাধিককালের অবস্থান, লেখাপড়া, গবেষণা এবং খণ্ডকালীন চাকুরি করার অভিজ্ঞতা ও অন্যান্য বিষয় বিস্তারিতভাবে আলোচনা করব।

সিডনি বিশ্ববিদ্যালয়

কানাডা থেকে ফেরার পর ১৯৮৯ থেকে ১৯৯২ সালের মধ্যে গবেষণামূলক জার্নালে আমার ৯টি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। এর মধ্যে ৫টি বিদেশি এবং ৪টি স্বদেশি জার্নালে। দুর্নীতি বিষয়ে *দুর্নীতির স্বরূপ অন্বেষণ: বাংলাদেশ* শীর্ষক একটি গ্রন্থও প্রকাশিত হয় ঢাকার নিবেদন পাবলিকেশন্স থেকে। আমার অনুরোধে এই বইটির প্রচ্ছদ করে দিয়েছিলেন খ্যাতিমান শিল্পী মর্তুজা বশীর। আমি ১৯৯২ সালে সহযোগী অধ্যাপক পদে পদোন্নতি পাওয়ার পর পিএইচডি ডিগ্রি করার কথা ভাবি। ইতিমধ্যে কিছু খ্যাতিমান গবেষণা জার্নালে প্রকাশনা হওয়ায় মনে করি, ওইসব প্রকাশনাসহ পিএইচডি অ্যাডমিশন এবং স্কলারশিপের জন্য আবেদন করলে সে আবেদনপত্র শক্তিশালী হবে। কোন্ বিশ্ববিদ্যালয়ে পিএইচডির জন্য দরখাস্ত করলে ফান্ড পাওয়া যাবে সেসব ভাবার আগে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি, যে শহরে সমুদ্র আছে এবং আবহাওয়া ভালো তেমন শহরে অবস্থিত বিশ্ববিদ্যালয়ে পিএইচডি করতে যাব। এ জন্য আমি প্রাথমিকভাবে কানাডার ভ্যাঙ্কুভারের ইউনিভার্সিটি অব ব্রিটিশ কলাম্বিয়া, আমেরিকার ক্যালিফোর্নিয়া এবং অস্ট্রেলিয়ার সিডনি বিশ্ববিদ্যালয়কে প্রাথমিকভাবে বাছাই করি।

প্রথমে সিডনি বিশ্ববিদ্যালয়ে দরখাস্ত করে আমি অ্যাডমিশন পাই। স্কলারশিপের ব্যাপারে আমাকে জন ক্রাফোর্ড স্কলারশিপ অথবা ওভারসিস পোস্ট গ্রাজুয়েট রিসার্চ স্কলারশিপ (ওপিআরএস)-এর জন্য চেষ্টা করতে পরামর্শ দেয়া হয়। প্রথম স্কলারশিপটির জন্য নিজ দেশের দূতাবাস থেকে ফরম সংগ্রহ করে দরখাস্ত করতে বলা হয়। আর ওপিআরএসের জন্য বিশ্বব্যাপী তীব্র প্রতিযোগিতার

ভিত্তিতে বাছাইকৃতদের এ বৃত্তি দেয়া হয় বলে আমাকে জানানো হয়। আমি প্রথমে ঢাকাস্থ অস্ট্রেলিয়ান অ্যাম্বাসির ফার্স্ট সেক্রেটারির কাছে প্রথম স্কলারশিপটির জন্য দরখাস্ত করার জন্য ফরম চেয়ে চিঠি লিখি। কিন্তু তিনি আমাকে এভাবে ফরম দিতে অস্বীকৃতি জানিয়ে বলেন, বছরের একটি বিশেষ সময়ে তারা এ ব্যাপারে পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দেন। তখন আমি ওই স্কলারশিপের জন্য দরখাস্ত করতে পারব। ফলে কিছুটা নিরুৎসাহিত হয়ে আমি সিডনি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ওপিআরএস এর আবেদনের ফরম সংগ্রহ করে ওই প্রতিযোগিতামূলক স্কলারশিপটির জন্য আবেদন করি। আবেদনের এক জায়গায় এমন মতামত স্পষ্ট করে লিখি, আমাকে স্কলারশিপ দেবার জন্য বিবেচনা করলে যেন পূর্ণ আর্থিক সহায়তা দেয়া হয়। আংশিক আর্থিক সহায়তা দিলে আমার পক্ষে পিএইচডি প্রোগ্রামে যোগদান করা সম্ভব হবে না। পরে আমি ওপিআরএস স্কলারশিপ পাই।

আমার স্ত্রী সন্তানসম্ভবা থাকায় তাকে দেশে রেখে একা চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় থেকে শিক্ষা ছুটি নিয়ে ১৯৯৪ সালের জুলাই মাসের প্রথম সপ্তাহে আমি সিডনির উদ্দেশ্যে ঢাকা ত্যাগ করি। তবে যাবার আগে আমার স্ত্রী এবং মেয়ের ভিসা করিয়ে দিয়ে যাই। পরবর্তীতে গর্ভজাত সন্তান ভুমিষ্ঠ হবার পর নবজাতকের নাম রেখে তার জন্য ভিসার আবেদন করতে হবে। সেই ভিসা পাবার পর আমার স্ত্রীর কয়েক মাস পরে সিডনি যাবার ব্যবস্থা করে আমি রওনা হই। এ জন্য অস্ট্রেলিয়ান অ্যাম্বাসির কর্মকর্তাগণ ভিসা দেবার সময় আমার সঙ্গে রসিকতা করেন। সংশ্লিষ্ট ভিসা অফিসার আমাকে বলেছিলেন, কি ব্যাপার, সবাই সন্তানসম্ভবা স্ত্রীকে অস্ট্রেলিয়ার ভালো হাসপাতালে ডেলিভারির জন্য নিয়ে যান, আর আপনি সে সুযোগ থাকা সত্ত্বেও নিজের স্ত্রীকে দেশে রেখে যাচ্ছেন যে? ওখানে সুন্দরি মেয়ে বিয়ে করবেন নাকি? আমি হেসে বলি, অস্টেলিয়ায় আমার স্ত্রীর চেয়েও সুন্দরি মেয়ে আছে নাকি? কেবল বর্ণ সাদা হলে তো আর সুন্দরি বলা যায় না। আর আপনি যা ভাবছেন তেমন ইচ্ছে থাকলে আর বৌ বাচ্চার ভিসা বানিয়ে দিয়ে যেতাম না। অফিসারও আমার উত্তর শুনে হাসেন।

সিডনি বিশ্ববিদ্যালয়ে আসার আগে ইন্টারন্যাশনাল স্টুডেন্টস হোস্টেলে ১৯৯৪ সালের ৫ থেকে ৭ জুলাই তিন দিনের জন্য অগ্রিম রুম বুক করি। এখানে থাকা ব্যয়বহুল। পরিকল্পনা ছিল তিন দিনের মধ্যে বাইরে থাকার ব্যবস্থা করে নিতে পারব। সিডনি এয়ারপোর্টটি বেশ বড়। ট্যাক্সি নিয়ে হোস্টেলে আসতে ৩৫ মিনিট সময় লাগল। সকাল আটটার দিকে আমি হোস্টেলে পৌঁছলাম। সংশ্লিষ্টদের কাছ থেকে চাবি নিয়ে রুমে গিয়ে গোসল করে ফ্রেশ হলাম। এত বেশি ক্লান্ত লাগছিল যে মনে হচ্ছিল ঘুমিয়ে যাই। কিন্তু পেটে কিছু নেই। হঠাৎ মনে পড়ল সকালের নাশতা তো আমার এখানে খাবার কথা। ডাইনিংয়ে গিয়ে জানলাম দেরি হয়ে গেছে। এখানে সবকিছু ঘড়ি ধরে রুটিন অনুযায়ী হয়। সকালের নাস্তা খাবার সময় পার হয়ে গেছে আধঘন্টা আগে। ডাইনিং রুম ফাঁকা। একজন কিচেন স্টাফ পেয়ে নতুন ছাত্র পরিচয় দিয়ে আমি কুকের সঙ্গে দেখা করতে চাইলাম। তিনি

আমাকে বসতে বললেন। কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে মাথায় সাদা টুপি পরিহিত চিফ কুককে ডেকে নিয়ে এলেন। আমি নিজের পরিচয় দিয়ে বললাম, দেখুন আমি তো আজই এসেছি। আপনাদের খাবার সময় এবং নিয়ম-কানুন এখনো জানি না। আমি ক্ষুধার্ত। আমাকে বলে দিন আশেপাশে কোথায় গেলে আমি ব্রেকফাস্ট করতে পারব। কুক নিজের পরিচয় দিয়ে প্রথমে আমাকে হোস্টলে স্বাগত জানালেন। তারপর বললেন, আপনাকে কোথাও যেতে হবে না। আমরা আপনাকে ব্রেকফার্স্ট করার জন্য প্রচুর খাবার দিতে পারব। তবে তার আগে লাঞ্চ এবং ডিনারের নিয়ম-কানুন আপনাকে জানাতে চাই। তিনি আমাকে লাঞ্চ এবং ডিনারের সময় এবং নিয়মকানুন বলে দিলেন। তারা কি ধরনের খাবার পরিবেশন করেন সে সম্পর্কে আমাকে একটি ধারণা দিলেন। তারপর আমাকে একটু অপেক্ষা করতে বলে ভেতরে গিয়ে ১০-১৫ সেকেন্ডের মধ্যে একটি ট্রেতে অনেকগুলো রুটি মাখন, চীজ, জ্যাম, জেলি, এবং আরও পাঁচ-সাত রকম খাবার ও ধুমায়িত কফি নিয়ে এসে বললেন, এগুলো সব আপনার। আমিতো অবাক। বললাম, আমার কেবল একটি বন রুটি এবং এক কাপ কফি হলেই চলবে। তিনি তাতে নারাজ হয়ে বললেন, আপনি ক্ষুধার্ত। আপনার যত খুশি খান এবং সব খেতে না পারলে রুমে নিয়ে যান। তার পরামর্শ মত আমি সত্যি পেটপুরে নাস্তা করলাম এবং কয়েকটি রুটি ও ছোটো একটি মাখন সঙ্গে করে রুমে নিয়ে এলাম। তার পরও ট্রেতে অনেক খাবার রয়ে গেল। তবে আসার আগে কুককে তার সহোযোগিতার জন্য ধন্যবাদ জানাতে ভুললাম না।

সিডনি বড় শহর। শহরটির পরিবেশ মনোরম। এর সংস্কৃতি মিশ্র প্রকৃতির। শহরটিতে বিভিন্ন দেশের লোক বসবাস করেন। সিডনি বিশ্ববিদ্যালয়টি একটি মিনি পৃথিবী। এমন কোনো দেশ নেই যে দেশের শিক্ষার্থী এখানে লেখাপড়া করেন না। বিশ্ববিদ্যালয়টি অনেক ঐতিহ্যবাহী এবং আকৃতি ও ছাত্রসংখ্যায়ও যথেষ্ট বড়। এর ক্যাম্পাসের সংখ্যাও অনেক। একেকটি ক্যাম্পাস একেক স্থানে। প্রধান ক্যাম্পাসটি সিডনি শহরের প্রাণকেন্দ্রে। লাইব্রেরির সংখ্যা ওই সময় ছিল ৪২টি। প্রধান লাইব্রেরি (ফিশার লাইব্রেরি) মূল ক্যাম্পাসে অবস্থিত এবং হাসপাতালের মত দিনরাত ২৪ ঘন্টা খোলা থাকে (ফিশার লাইব্রেরির ছবির জন্য দেখুন পরিশিষ্ট– ৪:১)। সকাল ৮টা থেকে রাত একটা পর্যন্ত কাউন্টারে সেবা পাওয়া যায়। তবে রাত একটার পর থেকে সকাল ৭ টা পর্যন্ত যে কেউ সেলফ সার্ভিস ব্যবস্থার মাধ্যমে বই সংগ্রহ করতে পারেন। এদের সেবাদান ব্যবস্থা উন্নত। পোস্ট গ্রাজুয়েট শিক্ষার্থীরা কোনো বই, বা জার্নালে প্রকাশিত কোনো প্রবন্ধ চাইলে তা যদি এ লাইব্রেরিতে না থাকে তাহলে স্বল্পতম সময়ে তারা পৃথিবীর যে কোনো বড় লাইব্রেরি থেকে তা বিনামূল্যে ইন্টার লাইব্রেরি লোন সিস্টেমের মাধ্যমে শিক্ষার্থীকে এনে দেন। আমি ১৯৯৪ থেকে ১৯৯৯ সাল পর্যন্ত প্রায় সাড়ে ৫ বছরের সিডনির সব স্মৃতি বলে শেষ করতে পারব না। আবার সব কিছু মনেও নেই। স্মৃতি থেকে কিছু কিছু বিষয়ে তুলে ধরব।

লিবার্টি স্ট্রিট

সিডনিতে আসার পর প্রথমে আমার প্রয়োজন ছিল একটা বাসা জোগাড় করা। একা থাকায় সুবিধা ছিল। বড় বাসা ভাড়া করলে অনেক টাকা ভাড়া গুনতে হত। মাস্টার্স এর ছাত্র পিএটিসির জনাব মঞ্জুরুল হকের সঙ্গে পরিচয় হলো। পরে দেখা হলো জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের শিক্ষক আমিরুল ইসলামের সঙ্গে। আমি বাসা খুঁজছি শুনে আমির ভাই মঞ্জুরুলকে বললেন, উনি যেহেতু আপাতত একা, কাজেই তার জন্য ছোটো বাসা নেয়া ভালো হবে। তুমি পারলে ওনাকে নিউটাউনে লিবার্টি স্ট্রিটের এপার্টমেন্টগুলোর খবর বলে দাও। তবে আমি ঠিক জানি না যে ওখানে এখন কোনো রুম খালি আছে কিনা। মঞ্জুরুল ব্যস্ত থাকায় বললেন, বাসা পেতে আপনার অসুবিধা হবে না। তিনি আমাকে লিবার্টি স্ট্রিটের বাসাগুলোর রিয়াল এস্টেটের নাম ঠিকানা বলে তখনই যেতে বললেন। আরও বললেন, একা থাকার জন্য রুমগুলো ভালো এবং বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পায়ে হাঁটা দূরত্বের মধ্যে। এখান থেকে আপনি নিউটাউনে যেতে বাসে ওঠার দরকার নেই। হেঁটে গেলে মাত্র ৩-৪ মিনিট লাগবে। আমি তাঁকে ধন্যবাদ দিয়ে রিয়্যাল এস্টেটের অফিসের উদ্দেশ্যে হাঁটা শুরু করলাম।

নিউটাউনের ওই রিয়াল এস্টেটের নাম রিচার্ডসন অ্যান্ড রিচার্ডসন। ঠিকানা অনুযায়ী এর অফিস বের করতে অসুবিধা হয়নি। যে কর্মকর্তার সঙ্গে আমি কথা বললাম তাঁর নাম মাইকেল। আমার বক্তব্য শুনে তিনি বললেন, হ্যাঁ ছাত্রদের থাকার জন্য আমাদের লিবার্টি স্ট্রিটের এপার্টমেন্টগুলো সস্তা হলেও বেশ ভালো। কিন্তু মিস্টার আখতার ঠিক এ মুহূর্তে আমাদের ওখানে তো এপার্টমেন্ট খালি নেই। তবে আপনি যদি আপনার নাম ও ফোন নম্বর রেখে যান তাহলে আমি কোনো রুম খালি হলে আপনাকে জানাব। আমি বললাম, কবে খালি হবে সে সম্পর্কে কোনো ধারণা দিতে পারবেন কি? মাইকেল বললেন, না তা বলা সম্ভব না। এমন সময় একজন বৃদ্ধ লোক ওই অফিসে হন্তদন্ত হয়ে প্রবেশ করে বললেন যে তিনি আজই তার এপার্টমেন্ট ছাড়তে চান। মাইকেল আমার দিকে তাকিয়ে হেসে বললেন দেখুন, আপনার ভাগ্য কত সুপ্রসন্ন। মিস্টার নেলসন হলেন আমাদের লিবার্টি স্ট্রিটের ভাড়াটিয়া। আপনি যদি পছন্দ করেন তাহলে আমি আপনাকে তাঁর এপার্টমেন্টটি দিতে পারি। আমি আকাশের চাঁদ হাতে পেলেও সে মনোভাব গোপন করে বললাম, কেমন ব্যবস্থা আমাকে কি একটু দেখার সুযোগ দেয়া যাবে? মাইকেল কথা বলার আগেই মিস্টার নেলসন হড়বড়িয়ে কথা বলে উঠলেন।

: দেখ বাবা, তুমি যদি ছাত্র হও তাহলে তোমাকে আমি অনেক সুবিধা দেব। তুমি আমার এপার্টমেন্টটি নাও। তুমি বরং আমার সঙ্গে চলো আমি তোমাকে সবকিছু দেখাব। আর তুমি যদি ওখানে থাকতে রাজি হও তাহলে আমি তোমাকে কিছু বাড়তি সুবিধাও দেব।

: দেখুন, আমি বাড়ি ভাড়া নেব রিয়েল এস্টেটের কাছ থেকে, কোনো সুবিধা দিলে তারা আমাকে দিবেন। আপনি তো ভাড়াটিয়া, আমি আপনার কাছ থেকে সুবিধা নেব কেন?

: না, না, বিষয়টি তেমন নয়। তুমি কি আমার সঙ্গে এখন বাড়িটি দেখতে যাবে? তাহলে আমি তোমাকে যেতে যেতে সব খুলে বলব। মাইকেল সম্মতি দেয়ায় আমি তার সঙ্গে যেতে রাজি হলাম।

নেলসন ফিলিপাইন থেকে আড়াই দশক আগে নাগরিকত্ব নিয়ে অস্ট্রেলিয়ায় এসেছেন। বয়স ৬৫ হলেও স্বাস্থ্য ভালো। নিজস্ব গাড়ি চালিয়ে এসেছিলেন। আমাকে সামনের সিটে খাতির করে বসালেন। আমি ভাবলাম উনি আমাকে এত খাতির করবেন কেন? কোনো মতলব আছে নাকি? আর তা ছাড়া তিনি বাড়িটি ছাড়ছেনই বা কেন। কোন অসুবিধা আছে কিনা জানা দরকার। কিন্তু যা ভেবেছিলাম ঘটনা তার বিপরীত। গাড়ি স্টার্ট দেবার পর আমি মুখ খুললাম।

: আপনি কতদিন হলো এ এপার্টমেন্টে আছেন?

: পাঁচ সপ্তাহ।

: এখন ছেড়ে দিচ্ছেন কেন? অসুবিধা কি?

: আর বলোনা বাবা, স্ত্রীর সঙ্গে ঝগড়া করে বাড়ি ছেড়ে এখানে উঠেছিলাম। এখন আবার ওর সঙ্গে মিলমিশ হওয়াতে নিজ ঘরে ফিরে যাব। এমন ঘটনা গত পাঁচ বছরে তিনবার হয়েছে।

: এ এপার্টমেন্টের কোনো অসুবিধা থাকলে আমাকে বলতে পারেন।

: না না কোনো অসুবিধা নেই। একা থাকার জন্য ভালো জায়গা। তোমার অসুবিধা হবে না। তুমি এতদিন কোথায় থাকতে?

: কোথাও না। আমি নতুন ছাত্র। সবে বাংলাদেশ থেকে এসেছি। ইন্টারন্যাশনাল হোস্টেলে আছি।

: আর বলতে হবে না। তোমার জন্য এটি ভালো জায়গা হবে। তোমার কি থাকার মত জিনিসপত্র আছে?

: না তেমন কিছুই নেই। তবে আমি সব কিনে নেব।

: দেখ বাবা, তুমি এখনই সব কিনতে যেও না। একজনের থাকার মত প্রয়োজনীয় জিনিষপত্র আমার সঙ্গে আছে। তুমি যদি এপার্টমেন্টটি নাও তাহলে আমার জিনিষপত্র তোমার জন্য রেখে যাব। তুমি ধীরে সুস্থে তোমার জিনিষপত্র কেনার পর আমি কয়েক সপ্তাহ পরে এগুলো নিয়ে যাব। অবশ্য আমার জিনিষপত্র ব্যবহার করতে যদি তোমার কোনো আপত্তি না থাকে।

: না দেখুন, সেটা মনে হয় ঠিক হবে না। আপনাকে অসুবিধায় ফেলতে চাই না।

: হাসালে বাবা। আমার আবার অসুবিধা কি? আমার তো নিজের বাড়ি আছে। টাকা পয়সা আছে। সব কিছু আছে।

: আচ্ছা, আগে বাসাটা দেখি। তারপর এসব হবে।

: হ্যাঁ, চলো এই তো আমরা প্রায় এসে গেছি।

সস্তা ভাড়ার একটা দোতলা বাড়ি। মোট এপার্টমেন্টের সংখ্যা ১৩টি। একটি মধ্যম সাইজের রুম। রান্নার ব্যবস্থা আছে। আর খাট, আলমারি, একটি ছোট্ট ফ্রিজ, এবং টেবিল চেয়ারও আছে। আমার মত ছাত্রের জন্য আর কি দরকার। আমি বাসাটি নিয়ে ওখানে থাকা শুরু করলাম। ফিলিপিনো নেলসনের জিনিসপত্র ব্যবহার করছিলাম। দু'তিন মাস পর একদিন তিনি আমাকে ফোন করে আমার খোঁজখবর নিলেন। জানতে চাইলেন—

: আমি আগামী সপ্তাহে এসে আমার জিনিষপত্রগুলো নিয়ে গেলে তোমার অসুবিধা হবে কি?

: আগামী সপ্তাহে কেন? আপনার জিনিষ আপনি আজই নিয়ে যেতে পারেন।

: না না, আজ আমার ব্যস্ততা আছে। সামনের রবিবার সকালে আসব যদি তোমার অসুবিধা না হয়।

: আমার কোনো অসুবিধা নেই।

তিনি যথাসময়ে এলেন এবং তাঁর জিনিষপত্র পরিচ্ছন্ন করে গুছিয়ে রেখেছি দেখে আমাকে ধন্যবাদ জানালেন।

: আপনি একা এসেছেন কেন? আপনার স্ত্রীর সঙ্গে তো মিলমিশ হয়ে গেছে। তাকে সঙ্গে আনেননি কেন?

: বলেছিলাম, সে আসতে চায়নি।

: আপনি তাঁকে সঙ্গে আনলে জিজ্ঞেস করতাম যে আপনার মত একজন ভালো মানুষের সঙ্গে তিনি ঝগড়া করেন কেন।

নেলসন আমার চোখের দিকে তাকিয়ে অপরাধীর মত বললেন—

: শোনো বাবা, দোষ কিন্তু তার একার না। আমারও দোষ আছে।

: হ্যাঁ, বুঝেছি। এক হাতে তো আর তালি বাজে না। তবে এই বয়সে আপনাদের ঝগড়া করা মানায় না।

: আচ্ছা করব না। তবে নিশ্চয়তা দেয়া যায় না।

: আমি খুশি হব যদি আপনি আর ঝগড়া না করেন। তবে আমার একটা অনুরোধ আছে।

: কি? টাকা পয়সা লাগবে বাবাজি? আমার কাছ থেকে ধার নিতে পারো।

: না, সে রকম কিছু নয়। আমি বলত চাই, যদি ভবিষ্যতে আপনি কখনো স্ত্রীর সঙ্গে ঝগড়া করে বাড়ি ছাড়েন, তাহলে আমার এখানে এসে আমার সঙ্গে থাকবেন।

: হা হা হা। বেঁচে থাকো বাবা। তোমার এই অফার আমি মনে রাখব। আমার ফোন নম্বর রেখে দাও। যতদিন সিডনিতে থাকবে কোন প্রয়োজন হলে বুড়োকে স্মরণ করতে ভুলবে না।

আমি জিনিষপত্রগুলো নিজে তাঁর গাড়িতে তুলে দিলাম। আমার মনে হয় না আমার সিডনি থাকাকালীন সাড়ে পাঁচ বছরে উনি আর তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে ঝগড়া করে

বাড়ি ছেড়েছিলেন। তাঁর ফোন নম্বর আমার ডায়েরিতে ছিল। আমি কোনদিন ফোন না করলেও তাঁকে মনে রেখেছিলাম। ভদ্রতা করে স্থায়ীভাবে সিডনি ছেড়ে আসার আগে ফোন করে বিদায় নিয়েছিলাম।

সিডনিতে অবস্থানকালে সাড়ে পাঁচ বছরে আমার বিচিত্র অভিজ্ঞতা হয়। অনেক রকম বাংলাদেশি মানুষের সঙ্গে পরিচয় হয়। পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলের মানুষের সঙ্গে মেশার সুযোগ হয়। সব অভিজ্ঞতা হয়তো বর্ণনা করা যাবে না। লিবার্টি স্ট্রিটের যে সিঙ্গেল এপার্টমেন্টে আমি বাংলাদেশ থেকে আমার স্ত্রী ও মেয়েরা না আসা পর্যন্ত ছিলাম, সেখানে বেশ কয়েকজনের সঙ্গে আমার সখ্য গড়ে ওঠে। এর মধ্যে দুজন বাংলাদেশি ছিলেন। এদের একজন মুন্সিগঞ্জের মোহাম্মদ সেলিম। আমার এক রুম পরেই ছিল তার এপার্টমেন্ট। তিনি পাঁচদিন কাজ করে বাকি দু'দিন তাবলিগ জামায়াতের কাজ করতেন। তাঁর বৌ-বাচ্চা থাকত বাংলাদেশে। আরেকজন নারায়নগঞ্জের জালাল আহমেদ থাকতেন দোতলার একটি ফ্লাটে। ছোটখাটো কাজকর্ম করতেন। আর সখ্য হয় দুইজন আবদুল্লাহর সঙ্গে। একজন আফগান আবদুল্লাহ এবং আরেকজন লেবানিজ আবদুল্লাহ। আফগান আবদুল্লাহর জন্ম অস্ট্রেলিয়ায়। তিনি এ দেশে লেখাপড়া করেছেন। মুসলিম হলেও তার গার্লফ্রেন্ড ছিল। কিন্তু নিজ দেশ আফগানিস্তানের প্রতি তাঁর ছিল অসম্ভব ভালোবাসা। নিজের দেশের সব খবর রাখতে তিনি ব্যস্ত থাকতেন। আর লেবানিজ আবদুল্লাহ অষ্ট্রেলিয়ার সমাজ ও সংস্কৃতিতে গা ভাসিয়ে দিয়েছিলেন। তাঁর এক কানে সোনার দুল। তিনি গভীর রাতে ডিসকো থেকে ফিরতেন। আফগান আবদুল্লার গার্লফ্রেন্ড থাকলেও তাঁর মুসলিম ভাবধারা একেবারে বিনষ্ট হয়নি। অস্ট্রেলীয় সংস্কৃতি অনুধাবন করার জন্য আমরা মাঝেমধ্যে তাঁর সঙ্গে তামাশা করতাম। একবার তাকে বলি,

: আচ্ছা আবদুল্লাহ, আপনি তো এখানে স্কুলে পড়েছেন, আপনাদের কোন ক্লাস থেকে যৌন বিজ্ঞান পড়ানো হয়েছিল?

: সপ্তম শ্রেণি থেকে। কিন্তু বাচ্চারা তার অনেক আগে থেকেই মেলামেশা শুরু করে।

: তাই নাকি?

: সপ্তম শ্রেণিতে যে শিক্ষক আমাদেরকে যৌন বিষয় পাঠদান করেছিলেন তিনি প্রথম ক্লাসে যখন বলেন, আজ আমরা এমন একটি বিষয় সম্পর্কে পাঠদান শুরু করব যেটা তোমাদের সকলের জানা জরুরি। এ কথা শুনে ক্লাসের শিক্ষার্থীরা নাকি হো হো করে হেসে বলেছিল, তাই নাকি? আপনি কি মনে করেন আমরা এসব জানি না।

মোহাম্মদ সেলিম

সেলিম ভাইয়ের সঙ্গে আমার খুব কম দেখা হত। কারণ, তিনি সকালে কাজে চলে যেতেন এবং ফিরতেন সন্ধ্যায়। এসে ক্লান্ত অবস্থায় খাওয়াদাওয়া করে শুয়ে পড়তেন। সাপ্তাহিক ছুটির দিনে তিনি তাবলিগের কাজে বাইরে থাকতেন। কাজেই

তাঁর সঙ্গে আড্ডা দেয়ার সুযোগ হত না। আমাকে তিনি তাবলিগের কাজে উদ্বুদ্ধ করতে চেয়েছিলেন। তাবলিগি চিল্লায় যেতেও উদ্বুদ্ধ করতে চেষ্টা করেছিলেন। আমি তাঁকে বলি দেখুন, আমি এখানে লেখাপড়া করে ডিগ্রি নিতে এসেছি। সে জন্য বাংলাদেশের একটি বিশ্ববিদ্যালয় আমাকে সবেতন শিক্ষা ছুটি দিয়েছে। এ কাজের জন্য অস্ট্রেলীয় সরকার স্কলারশিপ দিয়েছে। কাজেই আমি যদি এ কাজে ফাঁকি দিয়ে তাবলিগের কাজে সময় ব্যয় করি, তাহলে সেটা ইসলামপছন্দ কাজ হবে না। তা ছাড়া যে লেখাপড়া আমি করছি, আমি তাকে ইবাদত মনে করি। সঠিকভাবে আমি এ কাজ করলে আমি অবশ্যই প্রকৃত ইবাদতের সওয়াব পাব। বলুন, পাব না? আমার কথা শুনে সেলিম ভাই খুশি না হলেও চুপ করে ছিলেন।

আমি ধর্মবিশ্বাসী লোক। আমার সময় সুবিধামত নামাজ পড়তাম। কিন্তু কিছুদিন পর সেলিম ভাই আমাকে এ বিষয়ে বিরক্ত করা শুরু করেন। 'আসুন ফজরের নামাজ পড়ি' বলে ভোরে আমার দরজায় ধাক্কা দিয়ে আমাকে ঘুম থেকে ডেকে তুলতেন। প্রথম দিন আমি কিছু বলিনি। পরে আমি একদিন তাকে বললাম, দেখুন সেলিম ভাই, আমি রাত ২টা পর্যন্ত লেখাপড়া করে ঘুমিয়েছি। আপনি যদি আমাকে মাত্র ২ ঘন্টা পর কাঁচা ঘুম থেকে ডেকে ওঠান তাহলে আমার শরীর টিকবে না। আপনি দয়া করে এমন কাজ করবেন না। এতে আমার অসুবিধা হয়। কিন্তু তিনি আবারও এমন করেন। বেশ কয়েকদিন করার পর আমি খুবই বিরক্ত হই। পরে বিষয়টি জালাল ভাইকে বলি। তিনি খুবই কড়াভাবে তাকে নিষেধ করতে বলেন এবং আমাকে কিছু পরামর্শ দেন। এও বলেন, তিনি যাতে আর আমাকে ঘুম থেকে না ডাকেন, সে জন্য তিনি তাকে বলে দিবেন।

পরে আরেক দিন আমাকে এমনভাবে ডাকলে আমি তাকে বিরক্ত হয়ে বলি, আপনার নিউ সাউথ ওয়েলস তাবলিগের আমির সাহেবের ফোন নম্বর আমি জোগাড় করেছি। আপনাকে কয়েকদিন অনুরোধ করা সত্ত্বেও আপনি আমার কথা শোনেননি। আপনি যদি এরপর আর কোনোদিন আমাকে এভাবে গভীর রাতে আমার ঘুম ভাঙ্গান, তাহলে আমি তার পরদিনই আমির সাহেবকে ফোন করে আপনার নামে অভিযোগ করব। আমি তার কাছে জানতে চাইব, তাবলিগে কি একজন কাঁচা ঘুমের মানুষকে নিষেধ করা সত্ত্বেও ঘুম থেকে দরজায় ধাক্কা দিয়ে জাগাবার শিক্ষা দেওয়া হয় কিনা। এ পরামর্শ অবশ্য আমাকে জালাল ভাই শিখিয়ে দিয়েছিলেন। এতে বেশ কাজ হয়। পরবর্তীতে সেলিম ভাই আমাকে আর গভীর রাতে ঘুম থেকে ডাকতেন না। তবে এমনিতে তিনি বন্ধুবৎসল ছিলেন। দেখা হলেই আমার লেখাপড়ার খোঁজখবর নিতেন। বাংলাদেশে আমার স্ত্রী-কন্যারা কেমন আছে এসব জিজ্ঞেস করতেন।

ফারুক

সিডনিতে তাবলিগ জামায়াতের কাজ জোরালো ছিল। সিডনি শহরের লাকেম্বা মারকাজে বেশ কিছু নিবেদিতপ্রাণ বাংলাদেশি তাবলিগকারী ছিলেন। তাঁদের কয়েকজনের সঙ্গে পরিচয় থাকলেও ফারুক নামের একজন টার্কিশ

তাবলিককারীকে আমার বিশেষভাবে মনে আছে। তিনি পেশায় ছিলেন ট্রাক ড্রাইভার। লেখাপড়া ক্লাস নাইন পর্যন্ত হলেও আচার আচরণে ছিলেন ভদ্র ও অমায়িক। ফারুক ভাই আমাদেরকে প্রায়শই নামাজ পড়তে মসজিদে নিয়ে যেতেন। তবে তাঁর আচরণে কখনই বিরক্ত হতাম না। তাঁর প্রস্তাবও ছিল খুবই বিনয়ী ও ভদ্রতাপূর্ণ। তিনি ফোন দিয়ে বলতেন, আখতার ভাই আপনি ফ্রি আছেন কি? আমি তো জানতাম তিনি কেন ফোন করেছেন। ব্যস্ত থাকলে বলতাম, ফারুক ভাই, লেখাপড়ার ব্যস্ততা আছে। তিনি বলতেন, ঠিক আছে আরেক দিন ইনশাআল্লাহ দেখা হবে। আর যদি বলতাম ফ্রি আছি, তাহলে বলতেন, আপনি রেডি হন আমি ৭ মিনিট পর আপনাকে গাড়িতে তুলে নেব। আমি ওজু করে তৈরি থাকতাম। তিনি ঠিক সাত মিনিট পর আমার বাসার সামনে এসে আমাকে ডেকে গাড়িতে তুলতেন। এভাবে আরও দু'তিনজনকে গাড়িতে তুলে তিনি সবাইকে নিকটস্থ মসজিদে নিয়ে যেতেন। আবার জামায়াতে নামাজ পড়া শেষ হলে গাড়ি চালিয়ে প্রত্যেককে বাড়ির দরজায় নামিয়ে দিতেন।

ফর্সা সুশ্রী চেহারার শ্মশ্রুমণ্ডিত ফারুক ভাই ছিলেন অমায়িক ব্যক্তিত্ব। অনেক দিন তাঁর সঙ্গে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে গল্প করেছি। একদিন আমাকে অবাক করে তিনি বললেন, আখতার ভাই, আপনি কি জানেন আমি বাংলাদেশে গিয়েছি। আমি তো অবাক। বললাম সত্যি, কবে গিয়েছিলেন? কতদিন ছিলেন? তিনি বললেন, কয়েক বছর আগে তিনি বাংলাদেশে তাবলিগি চিল্লা দিতে গিয়েছিলেন এবং চার মাস বাংলাদেশে ছিলেন। আমি জানতে চাইলাম,

: আপনি বাংলাদেশের কোথায় কোথায় গিয়েছিলেন?
: আমি অনেক জায়গায় গিয়েছিলাম। আমার সব জায়গার নাম মনে নেই। তবে যেহেতু আমি প্রায় চার মাস ছিলাম সে কারণে আমাদের বিভিন্ন জেলায় যেতে হয়েছিল।

ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করলাম—

: কেমন লেগেছিল বাংলাদেশ?
: ভালো, অনেক ভালো। মানুষগুলো অতিথিপরায়ন। তারা আমাদের অনেক যত্ন-খাতির করেছেন।
: গ্রামের দিকে গিয়েছিলেন?
: হ্যাঁ, আমরা গ্রাম এবং শহর সব এলাকায় সফর করেছি।
: আচ্ছা ফারুক ভাই, বাংলাদেশের এমন কিছু আপনার মনে আছে কি, যা আপনার ভালো লেগেছিল?
: হ্যাঁ এমন অনেক কিছুই আছে। তবে দুইটি বিষয় আমার মনে দাগ কেটে আছে।
: সেগুলো কি আমাকে বলা যাবে? জানতে পারলে খুশি হতাম।
: কেন বলা যাবে না। এর একটি হলো, আমি যখনই গ্রামের দিকে কোন মসজিদে থেকেছি, সেখানে দেখেছি মসজিদের সামনে বাঁ পাশে একটি করে

পুকুর। মুসুল্লিরা সেখানে ওজু করছেন ও গোসল করছেন। অন্য যে সব দেশে আমি তাবলিগে গিয়েছি সেখানে এমনটি দেখিনি।

: বুঝলাম, আরেকটি?

: আরেকটি বিষয় খুবই মজার। দেখুন আখতার ভাই, আমি নিজে একজন ট্রাক ড্রাইভার। আপনাদের দেশে অনেকবার বাসে চড়েছি। তখন দেখেছি যে বাসের গায়ে চড় থাপ্পড় না মারলে বাস চলা শুরু করে না। এমনটি আর কোন দেশে আমার চোখে পড়েনি।

ফারুক ভাই ছিলেন এমনই এক মজার মানুষ। তিনি পরোপকারীও ছিলেন। আমার স্ত্রী এলে আমি যখন নতুন বাসা নিলাম তিনি কয়েকবার আমাকে বলেছেন, বাসা বদলের সময় কোনো সহায়তা লাগবে কিনা। এ বিষয়ে তিনি আমাকে যেচে সহায়তা করতে চেয়েছেন। যদিও আমি তাঁকে ওই কাজ করতে অনুরোধ করিনি এবং তাঁর সহায়তাও নেইনি। জানিনা ফারুক ভাই এখন কোথায় আছেন, কেমন আছেন। পথেঘাটে চলতে গিয়ে কোনো বিদেশি তাবলিগি টিম দেখলে আজও প্রথমে আমার মানসপটে যার মায়াবী শ্মশ্রুমণ্ডিত মিষ্টি মুখচ্ছবিটি ভেসে ওঠে, তিন হলেন ফারুক ভাই।

গ্রীক প্রতিবেশি

লিবার্টি স্ট্রিটের এপার্টমেন্টের সামনে একটি এপ্রিকট ফলের গাছ ছিল। ওই গাছে এপ্রিকট পেকে থাকত। অস্ট্রেলীয় পথচারীগণ সে দিকে তাকাতেন না। আমরা গাছে উঠে এই মজাদার ফল পেড়ে খেতাম। সত্তর বছর বয়সের এক গ্রীক বৃদ্ধ ছিল আমাদের নিকট প্রতিবেশি। তাকেও মাঝেমধ্যে দিতাম। তিনি আমাদের সঙ্গে প্রায়ই যৌন রসাত্মক গল্প করতেন। নিজের জীবনে কবে কোন সুন্দরী নারীর সঙ্গে সম্পর্ক করেছিলেন সে সব রগরগে গল্প আমাদের শোনাতেন। এই অবসরপ্রাপ্ত বৃদ্ধ আমাদের ওই সব ক্লাবের সদস্য হতে বলতেন, যে ক্লাবগুলোতে যৌন আবেদনময়ী নাচ-গান হত। তিনি আমাকে একদিন ওই রকম একটি ক্লাবে তাঁর সঙ্গে যেতে অনুরোধ করেছিলেন। আমি লেখাপড়ার চাপ আছে বলে এড়িয়ে যাই। অবশ্য পরে আমি একবার একাকী এমন একটি অবসরপ্রাপ্তদের ক্লাবের সাপ্তাহিক ছুটির দিনের অনুষ্ঠানে কৌতূহলবশত গিয়েছিলাম। এক বন্ধু আমাকে এমন ক্লাবে যাওয়ার নামমাত্র মূল্যে একটি কার্ড করে দিয়েছিলেন। সেখানে যে রকমের অনুষ্ঠান হয় তার মধ্যে কমেডি এবং যৌন আবেদনময়ী নাচের প্রাধান্য লক্ষ্য করি। ওই একদিনই আমি ওই ক্লাবে গিয়েছি। পরে আর কখনো যাইনি।

সুমসা

সিডনি বিশ্ববিদ্যালয়ের গভর্নমেন্ট অ্যান্ড পাবলিক অ্যাডমিনিস্ট্রেশন বিভাগ আমাকে রিসার্চ স্টুডেন্ট হিসাবে গণ্য করায় আমার ওপর বাধ্যতামূলকভাবে বেশি কোর্স ওয়ার্ক করার চাপ ছিল না। রিসার্চ সেমিনারে যোগদান, নিজে সেমিনার

প্রদান এবং সুপারভাইজারের সঙ্গে আলোচনা করে নির্দিষ্ট পড়াশোনা চালিয়ে যাওয়ার কাজ করতাম। এ সঙ্গে সুনির্দিষ্ট বিষয়ে লাইব্রেরি ওয়ার্ক করে তথ্য সংগ্রহ করছিলাম। সব সময় লেখাপড়া করতে ভালো লাগত না। বিশেষ করে ছুটির দিনগুলোতে বোরিং লাগত। সময় কাটতে চাইত না। দর্শনীয় স্থানগুলোতে কিছুদিন ঘোরাঘুরির পর সেসব জায়গায়ও একা একা ঘুরতে ভালো লাগত না। এমন সময় সিডনি ইউনিভার্সিটি মুসলিম স্টুডেন্টস অ্যাসোসিয়েশন (সুমসা) কর্তৃক আয়োজিত জুম্মার নামাজ এবং পাঁচ ওয়াক্তের নামাজে মাঝেমধ্যে শরিক হওয়ায় কিছু মুসলিম ছাত্রের সঙ্গে সখ্য হয়। এদের মধ্যে ছিল ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া, পাপুয়া নিউগিনি, সিঙ্গাপুর, পাকিস্তান, সৌদি আরব, তুরস্ক প্রভৃতি দেশের মুসলিম শিক্ষার্থী। এঁরা ছিলেন খুবই বন্ধুবৎসল এবং ভ্রাতৃপ্রতিম। এদের কাছে কোনো সহায়তা চাইলে এরা মনপ্রাণ দিয়ে সাহায্য করতেন। একবার সাইদ নামের এক টার্কিশ ছাত্রকে আমার কম্পিউটারের সামান্য সমস্যার কথা বলতেই তিনি তাঁর নিজের কাজ ফেলে আমার অফিসে এসে আমার সমস্যা ঠিক করে দিয়েছিলেন। বলেছিলেন, ভবিষ্যতে কোন রকম সমস্যা হলে আমি যেন তাঁকে ফোন করি।

সুমসা যে সাপ্তাহিক জুম্মার নামাজ আয়োজন করত, তা সব মুসলিম ছাত্ররা সম্মিলিতভাবে পরিচালনা করতেন। এ নামাজ পরিচালনার জন্য কোনো নির্ধারিত ইমাম রাখা হত না। একেক দিন একেকজন ছাত্র জুম্মার নামাজে ইমামতির দায়িত্ব পালন করতেন। এর উদ্দেশ্য ছিল সকল ছাত্রকে ক্রমান্বয়ে নামাজে ইমামতি করার প্রশিক্ষণ দেয়া। এক জুম্মায় ইন্দোনেশীয় ইমাম হলে দেখা যেত পরের জুম্মায় হয়ত নামাজ পড়াতেন পাকিস্তান বা সৌদি আরবের ইমাম। একবার ছুটির মধ্যে যখন নামাজে মুসুল্লির সংখ্যা ছিল বেশ কম, এমন সময় আমাকে এক জুম্মায় নামাজে ইমামতি করতে বলা হয়। কোনোদিন এ কাজ করিনি এবং নিয়ম-কানুন জানি না বলে অপারগতা প্রকাশ করলেও আমার অনুরোধ শোনা হয়নি। বলা হয়েছে, এ জন্যই আমরা সুনির্দিষ্ট ইমাম রাখি না। আমরা চাই ছাত্ররা নামাজে ইমামতি করা শিখুন। আমার যাতে কোনো অসুবিধা না হয় সে জন্য আমাকে সব নিয়ম কানুন বলে দেয়া হয়। কিভাবে নিয়ত করতে হবে, কখন খুতবা দেয়া লাগবে। কত মিনিট বলতে হবে সবকিছু লিখিত আকারে আমাকে সরবরাহ করা হয়। ফলে বিষয়টি আর তখন আমার কাছে কঠিন মনে হয়নি। যে বিষয়ে খুতবা দেব সে সম্পর্কে কিছুটা প্রস্তুতি ও হোমওয়ার্ক করে জীবনে প্রথম জুম্মার নামাজে ইমামতি করেছি।

এমি মিয়াহারা

সিডনিতে ক্রিসমাসসহ বিভিন্ন বন্ধের সময় নিজেকে একাকী এবং অসহায় মনে হত। সময় কাটত না। ভাবতাম, বৌ-বাচ্চারা আসলে সময়টা ভালো কাটবে। যাদের সঙ্গে বন্ধুত্ব হয়েছে তারা সবাই নিজ নিজ কাজে ব্যস্ত। এমন সময় ভাবলাম কিছু নতুন বন্ধুত্ব করে তাদের সঙ্গে তো আড্ডা দিতে পারি। টিভি দেখতে আর

কতক্ষণ ভালো লাগে। এমন সময় একদিন আমার চোখে বিশ্ববিদ্যালয়ের নোটিশ বোর্ডে কিছু বন্ধুত্বের বিজ্ঞাপন চোখে পড়ে। পাশাপাশি পাঁচ-ছয়টি বিজ্ঞাপন। বিজ্ঞাপনগুলোর বক্তব্য একই রকম। বিজ্ঞাপনগুলোতে বলা হয়, বন্ধুত্ব করতে চাই। আমাদের ইংরেজিকে আরও উন্নত করতে চাই। অন্য দেশের সংস্কৃতি জানতে চাই এবং বিনিময়ে জাপানি ভাষা শেখাতে চাই এবং জাপানি সংস্কৃতি সম্পর্কে বলতে চাই। পরে জেনেছিলাম, এরা সবাই জাপান থেকে আগত ওয়ার্কিং ভিসাধারী। জাপানে এক বছর ইংরেজি কোর্স করার পর ওই সব শিক্ষার্থীদের ইংরেজি মাতৃভাষার দেশে ওয়ার্কিং ভিসা দিয়ে পাঠানো হয়, যাতে তারা তাদের ইংরেজি জ্ঞান আরও উন্নত করতে পারে। আমি ওখান থেকে দুটি ফোন নম্বর টুকে আনলাম। দেখি না কি হয় ভেবে ঘরে এসে প্রথমে একটি নম্বরে ফোন দিলাম।

: হ্যালো, কে বলছেন?

: হ্যালো গুড মর্নিং। এমি মিয়াহারা বলছি, আমি জানতে পারি কি আপনি কে বলছেন?

: নিশ্চয়ই। আমার নাম মুহাম্মদ ইয়াহ্ইয়া আখতার। আমি সিডনি বিশ্ববিদালয়ের ছাত্র।

: আপনি কি বিষয়ে লেখাপড়া করেন? আপনি কোন দেশের?

: আমি সিডনি বিশ্ববিদ্যালয়ে গভর্নমেন্ট অ্যান্ড পাবলিক অ্যাডমিনিস্ট্রেশন বিভাগের পিএইচডি ছাত্র। বাংলাদেশ থেকে স্টুডেন্ট ভিসা এবং অস্ট্রেলিয়া সরকারের স্কলারশিপ নিয়ে পড়তে এসেছি। আপনি কি করেন?

: আমি জাপানের ফুকুওয়াকা শহরের একজন স্কুল শিক্ষক। এক বছর জাপানে ইংরেজি কোর্স করেছি। এখন এক বছর এখানে ওয়ার্কিং ভিসায় থাকব। আমার উদ্দেশ্য হলো আমার শেখা ইংরেজি আরও উন্নত করা। আপনি নিশ্চয়ই আমার বিজ্ঞাপন দেখে ফোন করেছেন?

: ঠিকই ধরেছেন। বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ থাকায় বোরিং লাগছিল।

: পিএইচডি করছেন মানে হলো আপনি অনেক উচ্চশিক্ষিত। আমাদের মত নগণ্য ছাত্রকে কি আপনি ইংরেজি শেখাতে রাজি হবেন?

: দেখুন, আমি শেখাতে চাইলেও আপনি রাজি হবেন কিনা সেটা মুখ্য বিষয়। কারণ, আমার নিজের মাতৃভাষা ইংরেজি নয়। আমার নিজের ইংরেজিও ভালো না।

: আপনার আলাপনে মোটেও তেমন মনে হচ্ছে না। আপনার ইংরেজি যথেষ্ট ভালো। আপনার সাথে কথা বলতে পারলে হয়তো আমার ইংরেজি অনেক ভালো হবে। আচ্ছা, আমরা কিছুদিনের মধ্যে সাক্ষাতে এ সব আলোচনা করতে পারি না?

: হ্যাঁ পারি। কিন্তু আপনার কাজকর্মের ক্ষতি হবে না?

: আমি ভাবছি আপনার লেখাপড়ার ক্ষতির কথা।

: আগামীকাল অবশ্য আমার একটু ব্যস্ততা আছে। আপনার সুবিধামত একটি তারিখ নির্ধারণ করুন। এ মুহূর্তে আমার লেখাপড়ার খুব একটা ব্যস্ততা নেই।

: দেখুন, রবিবারে আমার ছুটি। অন্য কোনো কাজ নেই। আপনি কি রবিবারে ব্যস্ত থাকবেন?

: না না। রবিবারে আমার বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ। তেমন কোনো অসুবিধা হবে না।

: তাহলে রবিবার সকালে আমরা কি পরিচিত হয়ে সাক্ষাতে কথা বলতে পারি? কোথায় হলে ভালো হয়?

: বিশ্ববিদ্যালয়ে আসবেন?

: বিশ্ববিদ্যালয়ে যাবার আমার ইচ্ছে আছে। তবে রবিবারে তো বিশ্ববিদ্যালয় ফাঁকা থাকবে। আমরা যদি কিংস বিল্ডিং এর বডিশপ নামের দোকানটির সামনে সকাল এগারটায় সাক্ষাত করি তাহলে কেমন হয়?

: মন্দ নয়। ঠিক আছে। আশা করি তখন দেখা হবে। ভালো থাকবেন।

: আপনিও ভালো থাকবেন। ফোন দেবার জন্য অনেক অনেক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

মেয়েটির কথাবার্তার ধরন শুনে মনে হলো সেও হয়তো হোমসিক ফিল করছে। এ আলাপনের পর অন্য যে ফোন নম্বরটি এনেছিলাম সেটায় আর ফোন করিনি। এ মেয়েটির সঙ্গে ফোনে কথা বলে তাকে যথেষ্ট ভদ্র মনে হলো। দেখা যাক। নির্দিষ্ট দিনে সিডনি শহরের কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত কিংস বিল্ডিংয়ে যাবার আগে ভাবছিলাম জাপানের স্কুল শিক্ষক কেমন হবে কি জানি। তবে শিক্ষক যখন, তখন টাউট বাটপাড় নিশ্চয়ই হবেন না। বয়স কত হবে? আমার মত নিশ্চয়ই আটত্রিশ বছরের মত হবে, না কি আরও বয়স্ক হবে এমনটি ভাবতে ভাবতে যথাসময়ের কয়েক সেকেন্ড পরে নির্দিষ্ট দোকানে কাছে গিয়ে দেখি দোকানের সামনের বেঞ্চে একটি সুন্দরী ফুটফুটে মেয়ে বসে আছে। তার বয়স হবে হয়ত মাত্র ২৩ থেকে ২৫ বছরের মধ্যে। সাদা একটি জামার সঙ্গে নীল জিনস পরা মেয়েটিকে দেখে মনে হয় যেন বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্ডারগ্রাড ছাত্রী। আমি ভাবলাম, যার সঙ্গে ফোনে কথা বলেছি সে হয়তো এ মেয়ে নয়। হয়তো সে এখনও আসেনি। কাছে গিয়ে দৃষ্টিতে প্রশ্নবোধক চিহ্ন ফুটিয়ে তাকাতেই মেয়েটি কথা বললো:

: কিছু মনে করবেন না আপনি কি মিস্টার আখতার?

: হ্যাঁ, আর আপনি নিশ্চয়ই এমি?

: অবশ্যই। আপনাকে সময় মত আসার জন্য অনেক ধন্যবাদ।

: আপনারও ধন্যবাদ প্রাপ্য। কারণ, আপনি আমারও আগে এসেছেন। আমার তো কয়েক সেকেন্ড দেরি হয়েছে। আমরা কি এখানেই বসব?

: আপনি কি বলেন?

: শপিং মলে একটু না হয় হাঁটাহাঁটি করি। তারপর কোথাও বসে কফি খেলে কেমন হয়?

: খুব ভালো। চলুন, এদিকটায় যাই।

আমরা প্রায় ১০-১৫ মিনিট গল্প করতে করতে হাঁটলাম। এমির পরিবার সম্পর্কে জানলাম। তাঁর মা বাবা, নার্স বোন এবং ছাত্র ভাই সম্পর্কে তথ্য জানলাম। আরও

জানলাম তার বছর খানেক পর ফিরে যাবার কথা। সেও আমার সম্পর্কে অনেক কিছু জানল। আমার কে কে আছে আমি কোথায় কাজ করি। আমার স্ত্রী এবং মেয়েদের সম্পর্কে খোঁজখবর নিলো। আলাপ আলোচনায় বুঝতে পারলাম যে এমির ইংরেজি এখনও বেশ কাঁচা। তাঁর উচ্চারণে ত্রুটি ছিল। ত্রুটি ছিল বাক্য গঠন এবং শব্দ চয়নেও। তবে প্রথম দিন আমি তাকে এ সব কিছু বলিনি। প্রায় ১৫-২০ মিনিট পর আমরা একটি কফিশপে বসে স্যান্ডউইচ ও কাপাচিনো খেলাম। কাপাচিনো অস্ট্রেলিয়ায় চা কফির মতই জনপ্রিয়। ঘন দুধ এবং কফি ব্লেন্ড করে এ ড্রিংক বানানো হয়। এক কাপের দাম ওই সময় ছিল দুই ডলার। আমাদের সংস্কৃতি অনুযায়ী আমি বিল দিতে চাইলে এমি আপত্তি জানাল এবং সে বিল দিতে চাইলো। তাতে আমি বাধ সাধলে পরে আমরা পাশ্চাত্য ভঙ্গিমায় যার যার নিজের বিল দিলাম। প্রায় এক ঘন্টার মতো সময় কাটিয়ে আমরা আবারও দুয়েক সপ্তাহ পর উভয়ের সুবিধামতো কোনো একদিন দেখা করার কথা ভেবে পরস্পরের কাছ থেকে বিদায় নিলাম। তবে বিদায়ের আগে এমি আমার ফোন নম্বর নিতে ভুলল না। আমার বিশ্ববিদ্যালয়ের ঠিকানা ও অফিস ফোন নম্বরও চেয়ে নিলো।

আমি যেমন ওর সঙ্গে কথা বলে বিশেষ করে ওর সরলতা ও ভদ্রতা দেখে খুশি হয়েছি, তেমনি ঠিক এমিও যে আমার সঙ্গে পরিচিত হয়ে খুশি হয়েছে তা ওর বিদায়কালের শারীরিক ভাষায় প্রতিফলিত হয়। আমি ওকে উৎসাহিত করার জন্য বলি, আমরা কিন্তু ভাষা শেখার ব্যাপারে আজ তেমন কিছু করতে পারিনি, যদিও শুদ্ধ ইংরেজিতে কথা বলার চর্চাও ইংরেজি উন্নত করার একটি উপায়। তবে তোমার ইংরেজি বেশ ভালো। এর পরবর্তী দু'মাসে আমরা প্রায় তিনবার দেখা করেছি এবং প্রতিবার প্রায় ৪৫ মিনিট থেকে একঘন্টা করে একত্রে একত্রে সময় কাটিয়েছি। প্রতিবারই সে আমার স্ত্রী কেমন আছেন, মেয়েরা কেমন আছে, জানতে চেয়েছে। তাদের ছবি দেখতে চেয়েছে। আমি যখন পারিবারিক গল্প করেছি সে খুব মনেযোগ দিয়ে শুনেছে। অনেকবার বলেছে, আখতার তুমি খুব ভালো স্বামী। তোমর স্ত্রী খুবই ভাগ্যবান যে তোমার মত একজন স্বামী পেয়েছেন। তুমি খুব ভালো পিতা। তুমি তোমার মেয়েদের লেখাপড়া নিয়ে অনেক ভাবো।

দ্বিতীয় সাক্ষাতে আমরা বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনার এক পর্যায়ে ধর্ম নিয়ে আলোচনা করি। জানতে পারি, এমি খুব একটা ধার্মিক না। তারা পারিবারিকভাবেও ধর্ম কর্ম করে না। আমি ধার্মিক এবং নামাজ-রোজা করি শুনে সে কিছুটা অবাক হয়। আমি কোনো বিদেশীর সঙ্গে কথা বলার সময় কখনো ভুলে যাইনি যে, আমি বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্ব করছি। আমার একটি ত্রুটি-বিচ্যুতি বা খারাপ ব্যবহারের কারণে আমার দেশ যেন অসম্মানিত না হয় সে বিষয়ে সব সময় সতর্ক থেকেছি। ধর্মের আলোচনাকালে আমি জানতে পারি, মুসলমানদের সম্পর্কে এমির ধারণা ভালো না। এমি আমাকে বলে, মুসলমানরা বেশি সন্ত্রাস করে। তারা কথায় কথায় রক্তপাত ঘটায়। তাদের ব্যবহার আকর্ষণীয় নয়। অবশ্য আমি নাকি এ ব্যাপারে

ব্যতিক্রম। বিশেষ করে ইরানিদের সম্পর্কে তাঁর ধারণা খুবই খারাপ। তাদেরকে এড়িয়ে চলাই উত্তম। আমি তাঁর কথার সঙ্গে একমত না হলেও তাঁকে কিছু বলিনি। ভেবেছি অন্য প্রক্রিয়ায় তাঁর ভুল ভাঙ্গাবার কথা। আমার সঙ্গে পিএইচডি করে ইরানের হাবিবোল্লাহ সিরাজিকে একদিন গল্প করতে করতে বললাম—

: বন্ধু, তুমি আমার সঙ্গে একটি জাপানি মেয়েকে গল্প করতে দেখেছিলে মনে আছে?
: হ্যাঁ মনে আছে, মেয়েটি কে?
: মেয়েটি জাপানের একজন স্কুল শিক্ষক। ওর নাম এমি মিয়াহারা।
: আচ্ছা।
: একটি বিশেষ কারণে আমি তাঁর প্রসঙ্গ তুলেছি।
: হাবিব কৌতূহলের দৃষ্টিতে তাকালো। তাই নাকি? কারণটি বল।
: বললাম, এমির ধারণা ইরানের লোকজন খুব খারাপ। তাদের মধ্যে অনেকেই সন্ত্রাসী। তাদের থেকে দূরে থাকা নিরাপদ।
: সত্যি বলছ? হাবীব হা হা করে উচ্চস্বরে হাসলো।
: হ্যাঁ বন্ধু, আমি ভাবছি সে বিশ্ববিদ্যালয়ে এলে কোনো সময় আমি তাকে তোমার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেব। অবশ্য যদি তোমার আপত্তি না থাকে।
: আপত্তি থাকবে কেন? ইরানিদের সম্পর্কে এমন ধারণা পোষণকারী কোনো বিদেশি মেয়ের সঙ্গে পরিচিত হতে পারলে আমি খুশি হব। তার এমন ধারণা পোষণের কারণগুলো বুঝতে চেষ্টা করব।

ঐ মাসের শেষ সপ্তাহে এমি ফোন করে দুপুর ১২টার দিকে আমার অফিসে আসতে চাইলে আমি সম্মতি দিলাম। বন্ধু হাবিবকে ফোন করে জানলাম সে ওই সময় অফিসে থাকবে। তবে জোহরের নামাজের পর অফিস থেকে বের হবে। আমি আর তাকে কিছু বললাম না। এমি যথাসময়ে এল। কুশল বিনিময় এবং মিনিট দশেক কথা বলার পর আমি আগে থেকে গুছিয়ে রাখা কয়েকটি বই হাতে নিয়ে বললাম—

: এমি, আমাকে কিছুক্ষণের জন্য ক্ষমা করতে হবে। এ বইগুলো আজই লাইব্রেরিতে জমা দেয়ার শেষ দিন। তোমাকে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতে হবে। আমি দ্রুত লাইব্রেরিতে গিয়ে বইগুলো ড্রপবক্সে ফেলে ফিরে আসব। আশা করি তুমি কিছু মনে করবে না।
: আমি কি তোমার সাথে আসব?
: না না এমি, এই রোদে তোমার কষ্ট হবে। তুমি বরং এখানেই থাকো। পেপার দেখতে পারো। কফি পটে কফি আছে। পান করতে পারো। একা বোধ করবে না। অফিসে বন্ধু হাবিব আছে। তার সঙ্গে গল্প করলে তোমার মন্দ লাগবে না। ওহ! হাবিবের সঙ্গে তো তোমার পরিচয় নেই। এসো তার সঙ্গে তোমাকে পরিচয় করিয়ে দেই। এ বলে আমি তাকে রুমের আরেক কোনায় হাবিবের ডেস্কে নিয়ে গেলাম।

: আসসালামালেকুম হাবিব কেমন আছো? লেখাপড়ায় খুব ব্যস্ত মনে হচ্ছে?

: ওয়ালেকুম আসসালাম। আলহামদুলিল্লাহ। ভালো আছি। একটা প্রেজেন্টেশন আছে। তবে গুছিয়ে এনেছি। এখন আর তেমন ব্যস্ততা নেই। হাতে এত বই কেন? লাইব্রেরি যাচ্ছো নাকি?

: ঠিকই ধরেছো। গতকালও বই জমা দিতে ভুলে গেছি। আজ লাস্ট ডেট। জরিমানা দিতে চাই না। এক্ষুনি ফিরে আসব।

: ভালো হলো, ধরো আমার এ বইটিও দয়া করে জমা দিয়ে দিও। তা না হলে কাল আমাকে আবার লাইব্রেরি যেতে হবে।

: নিশ্চয়ই জমা দেব। ওহ, বাই দ্য ওয়ে, আচ্ছা হাবিব, এই মেয়েটিকে কি তুমি চেনো?

: হ্যাঁ একে তো তোমার সঙ্গে আগে দেখেছি। কেন বলো তো?

: ওর নাম এমি মিয়াহারা। ও জাপানের ফুকুওয়াকা শহরে স্কুলে শিক্ষকতা করে। আমার বন্ধু, অনেকটা ছোট বোনের মতও বলতে পারো। হাবিব, তুমি কি কিছু মনে করবে আমি লাইব্রেরি থেকে না আসা পর্যন্ত এমি যদি তোমার এখানে বসে?

: ইটস এ প্লেজার। ওয়েলকাম এমি। হাবিব চার কদম দূর থেকে একটি আরামদায়ক চেয়ার এনে তার কাছাকাছি রেখে এমিকে বসতে আহ্বান জানাল।

: এমি, ইনজয় ইওর স্টে উইথ হাবিব। আই উইল বি ব্যাক সুন।

: অলরাইট আখতার। ডোন্ট অরি, আই স্যাল বি ফাইন হেয়ার।

লাইব্রেরিতে বই জমা দিয়ে আসতে আমার মিনিট দশেক সময় লাগত। কিন্তু ইচ্ছে করে আমি একটি প্রবন্ধ ফটোকপি করে প্রায় আধঘন্টা পরে এলাম। অফিসে ঢুকেই হাবিবের ডেস্কে তাকিয়ে হাবিব আর এমিকে গল্পে মশগুল দেখলাম। এমির হাস্যোজ্জ্বল মুখ আমাকে আকৃষ্ট করল। তাঁর সামনে টেবিলে দেখলাম হাবিবের স্ত্রীর ঘরে তৈরি সুস্বাদু স্যান্ডউইচ, যা আমি অনেকদিন খেয়েছি। আর মগে ধূমায়িত ড্রিঙ্ক। পাশে একটি দামি চকলেটের প্যাকেট।

: হাবিব তোমার বই জমা দেয়া হয়েছে। স্যরি এমি, আমার আসতে একটু দেরি হয়েছে। তোমার কোনো অসুবিধা হয়নি তো? চলো আমার টেবিলে যাই।

: থ্যাংক ইউ হাবিব ফর গিভিং টাইম টু এমি।

: ইট ওয়াজ এ প্লেজার টু টক টু হার আখতার। আমরা আমার ডেস্কে এসে বসলাম।

: আখতার, তোমার বন্ধুগুলো সব দারুণ! হাবিব তো অসাধারণ!

: এতো অল্প সময় এমন ইতিবাচক মূল্যায়ন! ব্যাপার কি এমি?

: আখতার লুক, আই অ্যাম নট ইভালুয়েটিং। জাস্ট টেলিং হি ইজ এ ভেরি গুড ম্যান।

: বলো কি! ও কোন দেশের নাগরিক তুমি কি জানো?

: জানি। আমাকে লজ্জা দিও না। তোমার সঙ্গে পরিচিত হবার পর আমার অনেক ধারণা বদলে যাচ্ছে।

: সত্যি বলছ!

: হ্যাঁ! এখন আমি বিশ্বাস করি ইরানে কিছু ভালো মানুষ আছেন, যারা হাবিবের মতো। সব ইরানিরাই সন্ত্রাসী নন।

: তোমার ধারণা একেবারেই যথার্থ। সব দেশেই ভালোমন্দ আছে।

: আখতার জানো, হাবিব তার মেয়ের জন্য কেনা এই চকলেটের প্যাকেটটি আমাকে উপহার দিয়েছেন। আমি ফুটবল খেলা দেখতে ভালোবাসি জেনে হাবিব আমাকে যে কোনো এক রবিবারে তার পরিচালিত ফুটবল খেলা দেখাতে নিয়ে যাবেন। কি যে মজা হবে। তুমি কি জানো যে তিনি একজন সকার রেফারি।

: হ্যাঁ, আমি জানি। সে ইরানে সেকেন্ড ডিভিশনে রেফারিং করত। ফিফা ব্যাজধারী রেফারি হওয়ার চেষ্টায় আছে। সে এখানে ফুটবল রেফারিং করে বেশ অর্থ উপার্জন করে তাও জানি। সে কারণে আমরা ওর ওপর মাঝেমধ্যে কর আরোপ করে কাপাচিনো খাই। ও কিছু মনে করে না। প্রায় তিনদিন পর হাবিবের সঙ্গে দেখা।

: আসসালামুআলাইকুম হাবিব।

: ওয়ালাইকুম আসসালাম। কেমন চলছে সবকিছু?

: ভালো। বন্ধু, আধ ঘন্টায় কি যাদু করলে যে এমি মুগ্ধ হয়ে গেল!

: সত্যি বলছ! আমাকে সন্ত্রাসী বলেনি তো?

: না না, সে তোমার ব্যবহারে খুব খুশি হয়েছে। কি যাদু করেছ আমায় বলা যাবে?

: কোনো যাদু করিনি আখতার। দেশে মা-বাপ ভাই-বোন রেখে বিদেশে এসে একটি কম বয়সের মেয়ে একাকী ভাষা শিখছে। এ বিষয়টি মনে রেখে সহানুভূতির সঙ্গে আন্তরিকভাবে ওর সঙ্গে গল্প-গুজব করেছি।

: তবে দারুন কাজ হয়েছে। ইরানিদের সম্পর্কে এমির নেতিবাচক ধারণা অনেকটা বদলে গেছে।

: একদিনেই! আচ্ছা, আমার উপস্থিতিতে আবার এলে আমার এখানে বসিয়ে দিও।

: আমার আর বসানো লাগবে মনে করছো কেন। সে এতটাই তোমার গুণমুগ্ধ হয়েছে যে আমি নিশ্চিত সে নিজেই এসে তোমার সঙ্গে আলাপ করবে। তা ছাড়া তুমি তো আবার তাকে ফুটবল খেলা দেখাতে নিয়ে যাবে বলেছ। বলনি?

: হ্যাঁ বলেছি। যে কোনো এক রবিবারে নিয়ে যাব। আখতার তুমিও চলো না, কেমন রেফারিং করি দেখে আসবে।

: আচ্ছা সময় পেলে যাব বৈকি। তবে আমি সময় না পেলেও এমিকে নিতে ভুলো না যেন।

: না, কথা যখন দিয়েছি, ওয়াদা খেলাপকারী হব না। তবেই আমার ছেলে বা মেয়েকেও সঙ্গে নিয়ে যাব।

আমার সঙ্গে পরিচিত হবার পর এমির মুসলমানদের সম্পর্কিত পূর্ব-ধারণা ক্রমান্বয়ে পরিবর্তিত হতে থাকে। আগে তার ধারণা ছিল মুসলমানরা ভালো না। তারা বন্ধুবৎসল নয়। অনেক ক্ষেত্রে সন্ত্রাস করে। কিন্তু আমার সঙ্গে পরিচিত হবার পর সে বলতো তোমার সঙ্গে পরিচিত না হলে আমার মুসলমানদের সম্পর্কে একটা ভ্রান্ত ধারণা থাকত। আবার ইরানিদের সম্পর্কে সে যে ধারণা পোষণ করত সে ধারণাও হাবিবের সঙ্গে পরিচিত হবার পর অনেকটা পাল্টে যায়। ফলে ১৯৯৪ সালে যে এমি জাপানের ফুকুওয়াকা থেকে এসেছিল, আর ১৯৯৫ সালে যে এমি সিডনি থেকে জাপান ফিরে গিয়েছিল, সে দুই এমির মধ্যে ছিল অনেক পার্থক্য। এমি আমাকে অনেক বিশ্বাস করত। আমার স্ত্রী ও মেয়েরা সিডনি আসার আগে সে কয়েকবার আমার বাসায় এসেছিল। আমার সঙ্গে বাঙালি খাবার খেয়ে প্রশংসা করেছিল। তবে আমার স্ত্রী ও মেয়েরা আসার পর তার আমাদের বাসায় আসা-যাওয়া বেড়ে যায়। আমার বড় মেয়ের সঙ্গে তার সখ্য হয়। সে সুর করে তাকে জাপানি ও ইংরেজি ছড়া শেখাত। এমির সঙ্গে আমার সম্পর্কটি ছিল খুবই মধুর এবং অনেকটা বন্ধুর বা ভাইবোনের পবিত্র সম্পর্কের মতো, যা আমার বিশ্ববিদ্যালয়ের হাবিবসহ সহপাঠীদের কয়েকজন জানত। তবে কতিপয় পরিচিত বাংলাদেশি শ্রমিক এমির সাথে আমাকে ঘুরতে দেখে যে অন্য রকম ভাবতেন না এমন নয়। এমনই এক পরিচিত বাংলাদেশি ভাই আমাকে একবার বলেন, আখতার ভাই, দেখলাম জাপানি মেয়ের সঙ্গে ঘোরাঘুরি করছেন। বেশ ভালোই আছেন মনে হয়। আমিও তাকে হতাশ না করে বললাম, হ্যাঁ মাঝে মধ্যে কাজ কম থাকলে কিছুটা আড্ডা দিয়ে সময় কাটাই।

ধীরে ধীরে এমির দেশে ফিরে যাবার সময় এগিয়ে আসতে থাকে। আমারও থিসিসের কাজে তথ্য সংগ্রহের উদ্দেশ্যে ছয় মাসের জন্য দেশে যাবার সময় হয়। আমি এমির কাছ থেকে অনেক কিছু শিখেছি। মেয়েটি আমার পরিবারের সদস্যদের সঙ্গেও নিজেকে বেশ মানিয়ে নিয়েছিল।

: এমি তোমাকে তো ভাষা শেখাতে খুব বেশি সময় দিতে পারিনি। আমার আরও সময় দেয়া উচিত ছিল।
: এমন বোল না আখতার। তোমার কাছে আমি অনেক কিছু শিখেছি এবং প্রতিদিনই শিখছি। আমার ব্যাকরণ, শব্দচয়ন, বাক্য গঠন প্রভৃতি বিষয়ে তুমি আমাকে গল্প-গুজবের মধ্য দিয়ে পেশাদার শিক্ষকের মতো অনেক কিছু শিখিয়েছ। এ জন্য আমি তোমার কাছে কৃতজ্ঞ।
: আমিও তোমার কাছে অনেক কিছু শিখেছি এমি। সে জন্য তোমাকে ধন্যবাদ।
: আমার কাছে! আমি আবার তোমাকে কি শিখালাম?
: হ্যাঁ, বলে কয়ে কিছু শেখাওনি। তবে আমি তোমার কাছে জাপানি ভদ্রতা ও জাপানি সংস্কৃতি সম্পর্কে শিখেছি।
: আখতার তুমি বাড়িয়ে বলছ।
: মোটেও না। আচ্ছা এমি, তুমি কি আমার একটা অনুরোধ রাখবে?

: নিশ্চয়ই রাখব। বল আমি তোমার জন্য কি করতে পারি?
: আমাকে একটি জাপানি গান শিখাবে?
: সত্যি ব'লছ! সত্যি তুমি শিখতে চাও? এতদিন বলনি কেন?
: লজ্জায় বলিনি। যদি তুমি রাজি না হও।
: এতে রাজি না হওয়ার কি আছে। একজন ভিন দেশের বন্ধু আমার মাতৃভাষার একটি গান শিখতে চাইলে আমি কেন তাকে শিখাব না? এটা তো আমার জন্য আনন্দের। আখতার প্লিজ, বল কি ধরণের গান তোমার পছন্দ?
: আমাকে এমন একটি গান শিখাবে, যে গান সব জাপানিরা পছন্দ করেন। কিছুটা দেশপ্রেমমূলক হলে ভালো হয়।
: তোমার পছন্দের প্রশংসা করছি। ঠিক আছে, আগে আমি চিন্তা ভাবনা করে একটি গান নির্বাচন করি। কয়েকদিন পর তোমাকে শিখাব। তবে একদিনে কিন্তু হবে না। কারণ, সুর, তাল, লয় এবং উচ্চারণের ব্যাপার আছে।
: ঠিক বলেছ। যে কদিন লাগে লাগুক। আমি হাল ছাড়ব না। তোমাকে এ নিশ্চয়তা দিতে পারি, সঙ্গীতের ছাত্র হিসাবে আমি খুব খারাপ হব না।

পরবর্তী সাক্ষাতে এমি বলল যে সে একটি গান নির্বাচন করেছে। গানটি শ্রুতিমধুর একটি দেশপ্রেমমূলক গান। সে গানটি গাইবার আগে প্রথমে পেশাদার সঙ্গীত শিক্ষকের মত আমাকে গানটির ভাবার্থ ব্যাখ্যা করল। কেউ তার নিজ গ্রামের বাড়ির কথা ভাবছে। তার চোখের সামনে দেশের স্বপ্ন ও ছবি ভেসে উঠছে। কুল কুল রবে নদী বয়ে যাচ্ছে। সবুজ ঘাস। খরগোশরা দৌড়াদৌড়ি করছে। কি সুন্দর দৃশ্য! আহা, আমার হোমটাউনকে মনে পড়ছে। এত সুন্দর আমার দেশ। এ রকম অর্থবোধক একটি দেশপ্রেমমূলক গান আমাকে শিখাবার জন্য এমি নির্বাচন করেছে। গানটির রচয়িতা তেইচি ওকানো এবং তাসুযুকি তাকানো। এটি জাপানি স্কুলের মিউজিক টেক্সট বইয়ে অন্তর্ভুক্ত একটি গান। জাপানে স্কুলের ছেলেমেয়েদের এ গানটি শেখানো হয়। কাজেই এ গানটি সব জাপানির কাছে পরিচিত। গানের সুরটিও পছন্দ হলো। এমি আমাকে দু'সাক্ষাতে গানটি সম্পর্কে তালিম দিল। সে নিজে ভালো শিল্পী না হলেও মন্দ গাইল না। আমাকে গাওয়ালো এবং বার বার গাওয়ালো। আমার উচ্চারণের ভুল ধরল এবং নিজে উচ্চারণ করে শোনাল। এতদিন পর গানটির সব কথা আমার মনে নেই। তবে প্রথম চার লাইন আমার আজো মনে আছে। আমি এখনো গানটি গাইতে পারি। তবে সুরগুলো হয়তো ঠিকমত হয় না। কিভাবে জানলাম? পরীক্ষা করে জেনেছি। কারণ, আমি বাংলাদেশে আসার অনেক পরে ঢাকা বিশ্ববিদালয়ের সিনেট ভবনে একটি সেমিনার দিতে গিয়ে এক মধ্যবয়সী জাপানি ভদ্রমহিলার সঙ্গে পরিচিত হবার পর তাকে এ গানটি গেয়ে শোনাই। তিনি খুব মনোযোগ দিয়ে এটি শুনে মাথা চুলকে চিন্তা-ভাবনা করে বুঝতে পারেন যে আমি কোন গানটি গেয়েছি। অবশ্য মুখে তিনি বলেন, আমার গানটি তার খুবই ভালো লেগেছে। গানটির প্রথম চারলাইন ছিল এ রকম:

330196
চট্টগ্রাম

উসাগী ও ইসি কা নো ইয়ামা
কো-বুনা তুরিশি কা নো কাওয়া
ইউমে ওয়া ইমা মো মেজুরিতে
ওয়াসুরে গাতাকি ফুরুসাতো।

এক বছর পার করে ১৯৯৫ সালে এমি জাপান চলে যায়। আমিও ১৯৯৬ সালে দেশে এসে গবেষণা কাজের তথ্য সংগ্রহে ব্যস্ত হয়ে পড়ি। ছয় মাস পর আবার সিডনিতে গিয়ে আর এমিকে পাইনি। পিএইচডির লেখাপড়া এবং পার্টটাইম জব নিয়ে এত বেশি ব্যস্ত হয়ে পড়ি যে এমিকে আর মনে করতে পারিনি। পরে আমি ১৯৯৯ সালে পিএইচডি শেষ করে দেশে ফিরে এসে আবার কর্মক্ষেত্রে যোগদান করি। কিন্তু এমি হারিয়ে গেছে। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে খোঁজাখুজি করেও তার খবর বা ঠিকানা জোগাড় করতে পারিনি। ফেসবুকে দশ-বিশজন এমি মিয়াহারাকে পেলেও ওই এমিকে আর খুঁজে পাইনি। এখনও আমি বছরে দু'একবার সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে তাকে খুঁজি। কিন্তু তার সন্ধান পাই না। জানি না সে কোথায় আছে, কেমন আছে। দোয়া করি মেয়েটি যেখানেই থাকুক, ভালো থাকুক। সুখ-শান্তিতে থাকুক। হাসি-খুশি থাকুক (পারিবারিক পরিবেশে এমি মিয়াহারার ছবির জন্য দেখুন পরিশিষ্ট- ৪:২)।

মেডিকেল সেন্টারের চিকিৎসা

আমি সিডনি থাকাকালীন আমার শরীর স্বাস্থ্য ভালো ছিল। অস্ট্রেলিয় সরকারের বৃত্তিধারী ছাত্র হিসেবে আমার স্বাস্থ্য বীমা ছিল। সিডনি বিশ্ববিদ্যালয়ের চিকিৎসাব্যবস্থা ভালো। অসুস্থ হলে ফ্রি চিকিৎসা নিতে পারতাম। আমার তেমন কোনো অসুখ হয়নি। তবে একবার আমার ঘাড়ে ও পিঠের চামড়ায় ব্রণের মত বিচি হয়েছিল। কোনো ব্যথা ছিল না। আমি বিষয়টি আমলে নেইনি। তবে বেশ কিছুদিন পর ভাবলাম একবার ডাক্তারের কাছে যাই। যদি কোনো ওষুধ দেন তাহলে হয়তো ভালো হয়ে যাবে। আমি ক্যাম্পাসে মেডিকেল সেন্টারে একটি অ্যাপয়েন্টমেন্ট নিলাম। সময়মত একজন ডাক্তার দেখালাম। তিনি ভালো করে দেখলেন। কিন্তু কোনো ওষুধ দিলেন না। আমাকে বললেন, তুমি কি জানো যে আমাদের এখানে সপ্তাহে দু'দিন একজন স্কিন স্পেশালিস্ট সেবা দেন। তুমি তাকে দেখাতে পারো। এ জন্য তোমাকে তার অ্যাপয়েন্টমেন্ট নিতে হবে। তবে তোমার স্বাস্থ্য বীমা থাকায় তোমাকে কোনো অর্থ দিতে হবে না। আমি তাঁর পরামর্শ অনুযায়ী কাউন্টারে এসে স্কিন স্পেশালিস্ট এর সঙ্গে একটি অ্যাপয়েন্টমেন্ট চাইলাম। প্রায় ১০ দিন পর আমাকে সময় দেয়া হলো। যতদূর মনে আছে ডাক্তারের নাম ছিল সোফিয়া। পূর্ণনাম মনে নেই। আমি তাকে দেখাতে এলে তিনি আমার জামা খুলিয়ে ঘাড় ও পিঠের ব্রণগুলো দেখলেন। কতদিন থেকে এটা হয়েছে জানতে চাইলেন। আমি ভাবছিলাম হয়ত কোনো ওষুধ বা মলম দিতে

পারেন। কিন্তু তিনি কোনো প্রেসক্রিপশন না লিখে তার রুমের পার্টিশনের পেছনে চলে গেলেন। এরপর মুখে মাস্ক, হাতে গ্লাভস এবং শরীরে অ্যাপ্রন পরে একটি স্টিলের ট্রেতে করে সিরিঞ্জ এবং ছুরি কাচি জাতীয় জিনিসপত্র নিয়ে এলেন। আমি বললাম কি ব্যাপার আপনি আমাকে ওষুধ দিবেন না। ডাক্তার বললেন, এখনই ওষুধ দেব না। আগে বুঝতে হবে তোমার কি হয়েছে এবং এসব ব্রণের মধ্যে কি আছে। তিনি আমার পিঠের একটি জায়গায় ইনজেকশন দিয়ে অবশ করে একটি ব্রণ কেটে উঠিয়ে কাচের শিশিতে রাখলেন। ক্ষতস্থানটা ওষুধ দিয়ে পট্টি লাগিয়ে বললেন, এখানে একদিন পানি লাগিও না। আমি তোমার ব্রণ ল্যাবরেটরিতে পরীক্ষার জন্য পাঠাব। রিপোর্ট পাবার পর দেখব তোমাকে কি চিকিৎসা দেয়া যায়। তুমি ১৫ দিন পর আবার এসো বলে আমাকে একটি অ্যাপয়েন্টমেন্ট দিলেন। আমি আবার গেলে তিনি বললেন, তোমার ওখানে কিছুই পাওয়া যায়নি। তোমাকে কোনো ওষুধ দেব না। তুমি এটাকে আমলে নিও না। তবে যদি কখনো বেড়ে যায় তাহলে আবার এসো। মাসদুই পর ব্রণের সংখ্যা বেড়ে যাওয়ায় আমি আবার গেলাম। ভাবলাম, এবার হয়ত ওষুধ দিতে পারেন। কিন্তু তিনি গতবারের মতো একই কাজ করলেন। আবারো একটি ব্রণ কেটে ল্যাবরেটরিতে পরীক্ষার জন্য পাঠালেন এবং আমাকে আবার ১৫ দিন পরে যেতে বললেন। কিন্তু এবারও একই কথা বললেন এবং কোনো ওষুধ না দিয়ে আমাকে বিষয়টি অগ্রাহ্য করতে বললেন। প্রায় বছরখানেক পর ওই ব্রণ এমনিতেই ক্রমান্বয়ে কমে গিয়েছিল। এই হলো সিডনি বিশ্ববিদ্যালয়ে আমার চিকিৎসার অভিজ্ঞতা। এর পর আর কখনো আমার ডাক্তারের কাছে যাওয়া লাগেনি।

থিসিস ও সুপারভাইজার

আমার পিএইচডি সুপারভাইজার ড. রস কারনাউ ছিলেন একজন অস্ট্রেলিয়ান শিক্ষক ও বিশিষ্ট ভদ্রলোক। প্রচণ্ড গরমেও তিনি কোট টাই স্যুট পরতেন। কালি ভরা কলম ব্যবহার করে লিখতেন। লেখা দেখতে দিলে সম্পাদনা করতেন কাঠ পেন্সিল দিয়ে। নিজেই গাড়ি চালাতেন। বয়স প্রায় পঁয়ষট্টি। কিন্তু স্বাস্থ্য ভালো ছিল। ক্লাস নেবার দিকে খুব মনোযোগী ছিলেন না। এক সেমিস্টার পড়ালে দুই সেমিস্টার অফ নিতেন। তবে বেশ কিছু পিএইচডি ছাত্র সুপারভাইজ করতেন। প্রতি বছর বেশ কয়েকবার বিভিন্ন দেশে সেমিনারে যোগ দিয়ে গবেষণামূলক প্রবন্ধ উপস্থাপন করতেন। আমার সঙ্গে যেদিন তাঁর প্রথম পরিচয় হয় সে দিন তিনি আমাকে একটি রেস্টুরেন্টে নিয়ে খাওয়ান। এর পর মাঝেমধ্যে তিনি আমাকে রেস্টুরেন্টে আপ্যায়ন করতেন। লেখাপড়ার ব্যাপারে তিনি ছিলেন বেশ ঢিলা। প্রথমে আমি লেখাপড়ার প্রসঙ্গ তুললে তিনি বলেছিলেন, কেবল তো এলে। আরাম করো। আবহাওয়ার সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে নাও। দেখো, যেন ঠান্ডা না লাগে। বেশি করে জুস খাও। এ সব করতে করতে প্রায় এক দেড় মাস কাটিয়ে দিয়ে তার পর আমরা লেখাপড়ার বিষয় নিয়ে আলোচনা শুরু করি।

সিডনি বিশ্ববিদ্যালয়ে আবেদনপত্রের সঙ্গে প্রথম যখন রিসার্চ প্রপোজাল পাঠাই তখন আমি 'রাজনৈতিক দুর্নীতি' বিষয়ে একটি প্রপোজাল জমা দিয়েছিলাম। সুপারভাইজারের সঙ্গে প্রথম বৈঠকেই তিনি বুঝতে পারেন যে এ বিষয়ে আমি বেশ কিছু লিটারেচার ঘাঁটাঘাঁটি করেছি। এতে তিনি খুশি হন এবং জানতে চান যে, আমি রাজনৈতিক দুর্নীতির কোন্ বিশেষ এলাকায় কাজ করবো সে বিষয়ে মনস্থির করেছি কিনা। আমি বললাম, ভাবছিলাম হংকং এবং অস্ট্রেলিয়া— এ দু'দেশের দুনীতি দমনকারী প্রতিষ্ঠান ইন্ডিপেন্ডেন্ট কমিশন এগেইনস্ট করাপশন (আইসিএসি) এর ওপর একটি তুলনামূলক কাজ করলে কেমন হয়। ড. রস বললেন, ভালো। তবে তোমার হয়তো জানা থাকার কথা না যে, এ একই বিষয়বস্তুর ওপর গত বছর আমাদের বিভাগেই একটি মাস্টার্স থিসিস হয়েছে। তার পরও তুমি চাইলে করতে পারো। তবে আমি বলব যেহেতু দুর্নীতি সাহিত্য তোমার মোটামুটি জানা আছে, কাজেই তুমি এ বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবার আগে আরো একটু চিন্তা-ভাবনা করো। দেখ আর কোনো গবেষণা এলাকায় কাজ করতে তোমার আগ্রহ আছে কিনা। আমি তার কথায় সম্মত হলাম।

পরবর্তী এক সপ্তাহ আমি লাইব্রেরিতে দুর্নীতি সম্পর্কিত প্রকাশিত কাজকর্মগুলো ব্যাপকভাবে ঘাঁটাঘাঁটি করলাম। দেখলাম, রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক দুর্নীতির ওপর যে ভাবে কাজ হয়েছে, নির্বাচনী দুর্নীতির ওপর তত বেশি কাজ হয়নি, যদিও নির্বাচনি দুর্নীতি আমাদের দেশসহ দক্ষিণ এশীয় দেশগুলোর অন্যতম প্রধান সমস্যা। তবে নির্বাচনের দুর্নীতির ওপর প্রবন্ধাকারে কিছু কাজ হয়েছে। আবার দুর্নীতির ওপর সম্পাদিত কতিপয় গ্রন্থে অধ্যায় হিসাবে কিছু কাজ করা হলেও নির্বাচনী দুর্নীতিকে মূল বিষয় করে পৃথকভাবে গ্রন্থাকারে কাজ করা হয়নি। এ বিষয়টি আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করলে আমি এ ব্যাপারে আরও অনুসন্ধান করি। পরবর্তী বৈঠকে সুপারভাইজারকে আমার এ চিন্তাটি বলার সঙ্গে সঙ্গে তিনি বিষয়টি লুফে নেন। তিনি বলেন, নিবাচনী দুর্নীতির ওপর একটি বড় কাজ করতে পারলে তা দুর্নীতি গবেষণায় একটি নতুন অবদানমূলক কাজ হবে। তিনি এ ব্যাপারে আমাকে উৎসাহিত করেন। প্রথমে আমি দক্ষিণ এশীয় দেশগুলোর নির্বাচনী দুর্নীতি বিষয়ে লিখব ভেবে কাজ শুরু করলেও পরবর্তীতে এক পর্যায়ে সুপারভাইজার আমাকে কেবলমাত্র বাংলাদেশের ওপর লিখলে সুনির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বিষয়টি আরো গভীর, নির্ভুল এবং প্রায়োগিক তথ্যসমৃদ্ধ হবে বলে পরামর্শ দেন। আমি তার পরামর্শ গ্রহণ করি এবং এ বিষয়ে পুরোদমে কাজে লেগে যাই। প্রায় বছর দেড়েক কাজ করে আমি এ সম্পর্কিত প্রচুর গবেষণা উপাদান সংগ্রহ করি এবং দু'বছরের মাথায় আমার থিসিসের প্রথম অধ্যায়ের প্রাথমিক খসড়া দাঁড় করাতে সক্ষম হই।

দু'বছরের মাথায় আমি মনে কিছুটা আস্থা পাই। তখন আমার মনে হয়, পুরো থিসিসটা আমি সময়মত লিখে শেষ করতে পারব। এ দু'বছরে আমি খুবই ব্যস্ত

সময় কাটিয়েছি। পরিবারে সময় দিতে হয়েছে। বাচ্চাদের লেখাপড়ার দিকে মনোযোগ দিতে হয়েছে। সে সঙ্গে খণ্ডকালীন কাজ করতে হয়েছে। তবে সুপারভাইজারকে থিসিসের দু'একটি অধ্যায় দেখতে দেবার পর আমার দৌড় বুঝতে পারি। তিনি আমার লেখায় সঙ্গতভাবেই অনেক কাটাকাটি করেন। অনেক পরামর্শ দিয়ে কিছু কিছু অংশ আবারও লিখতে বলেন। পরবর্তীতে বাংলাদেশের ওপর লেখা অধ্যায়গুলোতে বেশি দখল না থাকাতে সুপারভাইজারের পরামর্শে ইউনিভার্সিটি অব নিউ ইংল্যান্ডের ড. হাবিব জাফরুল্লাহকে আমার অ্যাসোসিয়েট সুপারভাইজার নিয়োগ করা হয়। এর ফলে আমার সুবিধা হয়। কারণ, ড. জাফরুল্লাহ বাংলাদেশের বিষয়গুলো অধিকাংশক্ষেত্রে আমার চেয়ে ভালো জানেন। ফলে দুজনের তত্ত্বাবধান ও পরামর্শে আমার থিসিসটি ক্রমান্বয়ে একাডেমিক কাজের আকৃতি নিতে থাকে (সুপারভাইজার এবং অ্যাসোসিয়েট সুপারভাইজারের ছবির জন্য দেখুন পরিশিষ্ট- ৪:৩)। আমার সুপারভাইজার কেবল লেখাপড়ায় ভাল ছিলেন না। তিনি মানুষ হিসাবেও ভালো ছিলেন। প্রায়ই আমার পরিবারের এবং সন্তানদের খোঁজখবর নিতেন এবং দুয়েক সপ্তাহ পর আমাকে রেস্টুরেন্টে নিয়ে খাওয়াতেন। তাঁর সঙ্গে অ্যাপয়েন্টমেন্ট চাইলে সহজে পাওয়া যেত। এ ছাড়া বিভাগের অন্য শিক্ষকগণও বেশ সহযোগী ছিলেন। বিশেষ করে পোস্ট গ্রাজুয়েট অ্যাডভাইজার রডনি টিফেন ছিলেন অমায়িক ব্যক্তিত্ব। সকল ছাত্রছাত্রীই তাঁকে পছন্দ করত। তিনি ছিলেন গণমাধ্যমের ওপর একজন খ্যাতিমান বিশেষজ্ঞ। আমার সঙ্গে দেখা হলেই তিনি আমার লেখাপড়ার খোঁজখবর নিতেন। তিনি আমাকে জি ডব্লিউ চৌধুরীর লেখা *দ্য লাস্ট ডেজ অব ইউনাইটেড পাকিস্তান* বইটি উপহার দিয়েছিলেন।

এ প্রসঙ্গে আমার অ্যাসোসিয়েট সুপারভাইজার হাবিব জাফরুল্লাহ সম্পর্কেও বলা প্রয়োজন। উনি একজন খ্যাতিমান একাডেমিক এবং লোক প্রশাসন বিশেষজ্ঞ। তিনি দীর্ঘদিন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে লোক প্রশাসন বিভাগে শিক্ষকতা করেন। পরে সিডনি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ড. রস কারনাউ এর তত্ত্বাবধানে পিএইচডি করেন। কাজেই আমার সুপারভাইজার এবং আসোসিয়েট সুপারভাইজারের মধ্যে পূর্ব-পরিচয় থাকায় আমার সুবিধা হয়। ডিগ্রি করার পর তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ফিরে যান এবং পরে আবার অস্ট্রেলিয়ার ইউনিভার্সিটি অব নিউ ইংল্যান্ডের ডিপার্টমেন্ট অব পলিটিক্স-এ শিক্ষক হিসাবে যোগ দেন। ড. জাফরুল্লাহ কেবল একজন ভালো শিক্ষক, গবেষক বা একাডেমিক নন, তিনি একজন মানবিক গুণাবলিসমৃদ্ধ পরোপকারী ও অত্যন্ত সৎ মানুষ। সিডনি ইউনিভার্সিটিতে পিএইচডি ডিগ্রি করাকালীন তাঁর সততার একটি ঘটনা শুনেছিলাম, যা রস কারনাউয়ের কাছ থেকেও আমি পরে জেনিছি। বিষয়টি বাংলাদেশি শিক্ষার্থীদের বিদেশে সম্মান বাড়িয়ে দিয়েছিল বলে উল্লেখ করতে চাই।

হাবিব জাফরুল্লাহ অস্ট্রেলিয়ার প্রশাসনিক ইতিহাস বিষয়ে থিসিস করাকালীন তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করার জন্য তাঁর অস্ট্রেলিয়ার বিভিন্ন এলাকায় যাবার প্রয়োজন

ছিল। এ জন্য তিনি একটি সংগঠনের কাছে প্রয়োজনীয় ফান্ডের জন্য আবেদন করেন এবং ফান্ড পান। তিনি ওই ফান্ড ব্যবহার করে অস্ট্রেলিয়ার বিভিন্ন অঞ্চল সফর করেন। এক পর্যায়ে তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ শেষ হলে তিনি অর্থায়নকারী প্রতিষ্ঠানকে সহোযোগিতার জন্য ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন, তাকে যে অর্থ দেয়া হয়েছিল তার কিছুটা বেঁচে গিয়েছে, যা তিনি ফেরত দিতে চান। এ বেঁচে যাওয়া অর্থের পরিমাণ কম ছিল না। অর্থায়নকারীরা তাঁর বক্তব্য শুনে বিস্মিত হয়ে বলেন, এ অর্থ তো আপনাকে গবেষণার কাজে ব্যয় করার জন্য দেয়া হয়েছে। এটা আপনার ফেরত না দিলেও হবে। আপনি এ অর্থ ফেরৎ না দিয়ে আপনার গবেষণার কাজে ব্যবহার করতে পারেন। কিন্তু জাফরুল্লাহ বলেন, তার অন্য খরচ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে দেয়া হবে। যে অর্থ তাকে তারা দিয়েছিলেন তা ছিল তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহের জন্য, যে কাজ তিনি শেষ করে ফেলেছেন। এ অর্থ তো তিনি ব্যক্তিগত বা অন্য কাজে ব্যবহার করতে পারেন না। কাজেই তিনি এ অর্থ ফেরত দিতে চান। কিন্তু তারাও এ অর্থ ফেরত নিতে চান না। বিষয়টি সুপারভাইজার পর্যন্ত গড়ায়। পরে অনেক অনুরোধ করেও যখন অর্থায়নকারী কর্তৃপক্ষ এ অর্থ জাফরুল্লাহকে নিতে রাজি করাতে পারেননি, তখন তাদের অনিচ্ছা সত্ত্বেও ওই অর্থ ফেরৎ নিতে হয়েছিল। অস্ট্রেলিয়ায় থাকাকালীন আমি নিজে একবার ১৯৯৭ সালের নভেম্বর মাসে ইউনিভার্সিটি অব নিউ ইংল্যান্ড-এ ড. হাবিব জাফরুল্লাহর বাড়ি গিয়েছিলাম। তিনি এবং তাঁর স্ত্রী আমাকে ছোট ভাইয়ের মতো আদর যত্ন করেছিলেন। একাডেমিক ব্যাপারে যে কোনো রকম সাহায্য সহযোগিতা চাইলে ড. জাফরুল্লাহ কখনো কাউকে না বলতেন না। আসার সময় তিনি আমাকে দিল্লীর সাউথ এশিয়া পাবলিশার্স থেকে ১৯৯৬ সালে প্রকাশিত তাঁর সম্পাদিত *দি জিয়া এপিসোড ইন বাংলাদেশ পলিটিক্স* শীর্ষক একটি বই উপহার দিয়েছিলেন। কাজেই এমন দু'জন ভালো গুণাবলিসমৃদ্ধ মানুষের সহায়তা থাকায় আমার পক্ষে সুনির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে থিসিস লিখে শেষ করা সম্ভব হয়। আমার থিসিসটি পরে ১৯৯১ সালে যুক্তরাজ্যের অ্যাশগেট পাবলিশিং লিমিটেড থেকে *ইলেকটরাল করাপশন ইন বাংলাদেশ* শিরোনামে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। পরবর্তীতে লন্ডনের খ্যাতিমান প্রকাশনা সংস্থা রুটলেজ ২০১৮ সালে রুটলেজ রিভাইভালস সিরিজে বইটি পুনঃপ্রকাশ করে।

খুশনুল মারিয়াহ

সিডনিতে অধ্যয়নকালীন যে সব পোস্ট গ্রাজুয়েট ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে আমার সখ্য হয়, তার মধ্যে দুজন ছিলেন ইন্দোনেশিয়ান। এর একজন ইমাম এবং অন্যজন খুশনুল মারিয়াহ। হাসিখুশি খুশনুল ছিল জাকার্তা বিশ্ববিদ্যালয়ে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের প্রভাষক। বন্ধুবান্ধবের আড্ডা সে বেশ জমিয়ে রাখত। উরুন বলে এক ডাচ বন্ধুর সঙ্গে তাঁর এক সময় বন্ধুত্ব ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠলেও পরে তা গভীরতা পায়নি। খুশনুল বারবারা লেই নামের এক অস্ট্রেলিয়ান মহিলার বাড়িতে থেকে সিডনি

বিশ্ববিদ্যালয়ে লেখাপড়া করত। বারবারা ছিলেন ইউনিভার্সিটি অব টেকনোলজি (ইউটিএস)-র শিক্ষক। অত্যন্ত সদালাপী এবং পরোপকারী মহিলা। বারবারার বাড়িতে কোনো পার্টি হলে আমরা খুশনুলের বন্ধু ও সহপাঠী হিসেবে দাওয়াত পেতাম। এ রকম দাওয়াতে আমি একাধিকবার গিয়েছি। বারবারার বড়সড় বাড়ির পেছনে ছিল লন টেনিসের কোর্ট। সেখানে আমি জীবনে প্রথম টেনিস খেলি। খুশনুলের সঙ্গে আমার বোঝাপড়া বেশ ভালো ছিল। অনেক সময় সে কোনো সেমিনারে গেলে আমাকেও সঙ্গে নিতে চাইত। দু'একবার যে আমি যাইনি এমন নয়। লেখাপড়ার ফাঁকে ফাঁকে আমরা একসঙ্গে আড্ডা দিতাম। কফি খেতাম। ইউনিভার্সিটি অব ইন্দোনেশিয়ার রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগে শিক্ষার্থীবান্ধব শিক্ষক হিসেবে তার পরিচিতি ছিল। তার কাছে সহযোগিতা চেয়ে কোনো শিক্ষার্থী খালি হাতে ফিরত না। বিশেষ করে ছাত্রীদেরকে লেখাপড়ায় উদ্বুদ্ধ করতে তার জুড়ি ছিল না। শিক্ষার্থীদের প্রতি তার ভালোবাসা তার নির্মল হাসিতেই প্রতিভাত হত। আমাদের পরিবারে জন্মদিন পালনের রেওয়াজ নেই। আমার পরিবারে কোনো ভাইবোনের কখনো জন্মদিন পালন করা হয়নি। ফলে এই হ্যাপি বার্থডে কালচারের সঙ্গে আমি পরিচিত নই। তবে ইন্দোনেশিয়ান খুশনুল মারিয়াহ, চাইনিজ স্যুয়ে ওয়াং, ইরানিয়ান হাবিব এবং ডাচ উরুন মিলে সাদামাটাভাবে হলেও আমাদের পোস্টগ্রাজুয়েট স্টুডেন্টস অফিসে আমার জন্মদিন পালনের আয়োজন করে আমাকে সারপ্রাইজ দিয়েছিল। তারাই কেক, জুস ও সামান্য কিছু খাবার কিনে এনে এ অনুষ্ঠান করে আমাকে ঋণী করে (এই অনাড়ম্বর জন্মদিন পালনের ছবির জন্য দেখুন পরিশিষ্ট- ৪:৪)।

আমি যখন ১৯৯৬ সালে থিসিসের তথ্য সংগ্রহের কাজে বাংলাদেশে আসার পরিকল্পনায় ব্যস্ত, এমন একদিন খুশনুল আমাকে বলল, আখতার তুমি বাংলাদেশ থেকে আমার জন্য কি গিফ্ট আনবে? আমি বললাম তাই তো, আমি তো এ বিষয়ে কিছু ভাবিনি। আচ্ছা বলো, তুমি কি চাও? সে বলে, আমাকে দামি জামদানি শাড়ি দিও। আমি তোমার যাবার আগে তোমাকে কিছু ডলার দেব। পরে বলল, আখতার আমি দুষ্টুমি করেছি। আসলে কিছুই আনতে হবে না। তুমি ভালোয় ভালোয় ফিরে আসো আমি এটাই চাই। তোমাকে আমরা সবাই অনেক মিস করব। তাড়াতাড়ি চলে এসো। আমি বাংলাদেশে এসে ফিরে যাবার সময় দেখলাম ভালো জামদানি শাড়ি কিনতে হলে আমার প্রায় ৫-৭ হাজার টাকা লাগবে। স্ত্রীর সঙ্গে পরামর্শ করে ঠিক করলাম, মুখ ফুটে বলেছে যখন খুশনুলকে একটা শাড়ি দিতে হবে। অনেক চিন্তা-ভাবনা করে আমরা তার জন্য একটা সাধারণ সুতির ৬-৭ শ' টাকা মূল্যের তাঁতের টাঙ্গাইল শাড়ি কিনলাম। সিডনি যাবার পর তাকে একদিন বাসায় দাওয়াত করে ওই শাড়িটি উপহার দিলে সে খুব খুশি হয়। খুশনুল শাড়িটির দাম পরিশোধ করার জন্য কয়েক বার এর মূল্য জিজ্ঞেস করে। আমরা বলি, উপহারের মূল্য বলা যায় না। শাড়ি পেয়ে খুশি হলেও শাড়ি পরতে না জানার কারণে সে আমার স্ত্রীর স্মরণাপন্ন হয়। আমার স্ত্রীও

শিক্ষকতার সুযোগ পেয়ে খুব খুশি। সে খুশনুলকে নিয়ে বেডরুমে দরজা বন্ধ করে তাকে ১৫ মিনিট ধরে শাড়ি পরার সংক্ষিপ্ত প্রশিক্ষণ দেয়। নতুন শাড়িটি পরিয়ে তার সঙ্গে আমরা ছবি তুলি (শাড়ি পরিহিত খুশনুল মারিয়ার ছবির জন্য দেখুন, পরিশিষ্ট- ৪:৫)।

আমি ডিগ্রি করে আসার অনেক পরে খুশনুল তার ডিগ্রি শেষ করে জাকার্তায় গিয়ে কাজে যোগ দেয়। তার সঙ্গে কয়েকবার আমার যোগাযোগ হয়েছে। ফেসবুকে এখনও সে আমার বন্ধু তালিকায় আছে। সে কয়েকবার আমাকে কনফারেন্সে দাওয়াত করলেও আমার যাওয়া হয়ে ওঠেনি। ২০১৪ সালে আমি সর্বশেষ তার সঙ্গে যোগাযোগ করি। আমি তৃতীয় বর্ষ সম্মান শ্রেণিতে তখন বাংলাদেশ পাবলিক অ্যাডমিনিস্ট্রেশন কোর্সটি পড়াবার সময় প্রশাসনিক সংস্কৃতির ওপর লেকচার দিতাম। এ লেকাচরের শুরুতে প্রথমে সংস্কৃতির ওপর একটি ক্লাস নিতাম। ওই লেকচার দেবার সময় ধর্ম, ফ্যাশন, প্রভৃতির সঙ্গে সংস্কৃতির যোগসূত্র সম্পর্কেও কিছু আলোচনা করতাম। মেয়েদের ফ্যাশন সম্পর্কে জানতে গিয়ে আমি ইন্দোনেশিয়ার জিলবুব কালচার সম্পর্কে জানতে পারি। এই ফ্যাশনকারী মুসলিম মেয়েরা মাথায় এমনভাবে স্কার্ফ পরেন যাতে তাদের একটি চুলও দেখা না যায়। কিন্তু শরীরে এমন টাইট পোশাক বা গেঞ্জি পরেন যা তাদের শারীরিক আকৃতিকে স্পষ্ট করে রাখে। প্যান্টও পরেন বেশি টাইট (জিলবুব ফ্যাশনকারী যুবতীর ছবির জন্য দেখুন পরিশিষ্ট- ৪:৬)। কিছু নারীবাদী লেখিকা এ রকম পোশাককে আধুনিক ফ্যাশন হিসেবে স্বীকৃতি দেন। এদের একজন জুলিয়া সুরিয়াকুসুমা এ রকম পোশাককে ধর্মীয় বিশ্বাসের সঙ্গে বিশ্বায়িত চেতনার সংমিশ্রণ হিসেবে ব্যাখ্যা করে একে আধুনিক ফ্যাশনের এক নতুন ধারা হিসেবে প্রচার করেন। নারীবাদীরা এহেন পোশাককে উৎসাহিত করে নারীদের মাঝে, বিশেষ করে তরুনী ও যুবতীদের মাঝে ছড়িয়ে দিতে চান। অন্যদিকে ইন্দোনেশিয়ার উলেমা সম্প্রদায় ও ধর্মীয় নেতাগণ এ রকম পোশাককে হারাম হিসেবে উল্লেখ করেন। আমি খুশনুলকে ইমেইল বার্তা দিয়ে জানতে চাই, তার বিশ্ববিদ্যালয়ে এ পোশাকের প্রচলন ছড়িয়ে পড়েছে কি না এবং এ সম্পর্কে তার নিজস্ব মতামতই বা কেমন। খুশনুল আমাকে জানায়, তার বিশ্ববিদ্যালয়ে জিলবুব পরিধানকারী মেয়ে শিক্ষার্থী আছে, তবে তাদের সংখ্যা এতই নগণ্য যে উল্লেখ করার মতো নয়। এখানে অধিকাংশ মেয়েরাই সাধারণ নারীদের মত ঢিলেঢালা পোশাক পরিধান করে। সে আরও বলে, ইন্দোনেশিয়াকে হিজাব ইন্ডাস্ট্রির মক্কা বলা হয়। সমগ্র মুসলিম বিশ্বে হিজাব সামগ্রী রফতানি করে ইন্দোনেশিয়া অনেক আয় করে। সে নারীবাদীদের সমালোচনা করে বলে, জুলিয়া সুরিয়াকুসুমা নিজেই পাশ্চাত্য নারীদের ভঙ্গিমায় ছোট পোশাক পরিধান করেন। এ ব্যাপারে তার মতামত গ্রহণ না করাই উত্তম। কারণ, তিনি তো ইসলাম ধর্মের বিশেষজ্ঞ নন। খুশনুল মাঝেমধ্যে আমার বাংলা ভাষায় দেয়া ফেসবুক স্ট্যাটাসে লাইক দেয়। আমি একদিন তাকে মেসেঞ্জারে জিজ্ঞেস করি, তুমি কিছু না বুঝে আমার স্ট্যাটাসে লাইক দাও কেন? আমাকে খুশি করতে চাও? সে জানায়, দেখ,

আমি ভাষা বুঝিনা ঠিকই, তবে তুমি যে সব ছবি দাও সেগুলো থেকে তোমার স্ট্যাটাসের থিম অনুধাবন করতে পারি। তা ছাড়া তোমার ছবি দেখলে আমার সিডনির দিনগুলোর কথা মনে পড়ে। সে জন্য লাইক না দিয়ে পারি না।

উরুন

নেদারল্যান্ডস এর উরুন ভদ্র ছেলে। আমাদের সঙ্গে সে পিএইচডি করত সুবাদে আমরা একই সঙ্গে পোস্ট গ্রাজুয়েট রিসার্চ স্টুডেন্টদের অফিস শেয়ার করতাম। আমরা সিডনি থাকাকালে একবার উরুনের মা সিডনি এসেছিলেন। আমরা তাঁর সঙ্গে দেখা করেছিলাম। তিনি ছিলেন অমায়িক ব্যবহারের একজন ভদ্রমহিলা। তিনি আমাদেরকে নেদারল্যান্ডে তাঁর ওখানে বেড়াতে যেতে দাওয়াত দিয়েছিলেন। আমাদের যাওয়া হয়নি। আমি ভেবেছিলাম বিদেশিরা কি আমাদের মতো দাওয়াত দেয়? বেড়াতে গেলে আমাদের মত মেহমানদারি করেন? কিন্তু আমার ধারণা ছিল ভুল। কারণ, বন্ধু হাবিব একবার তাঁর গবেষণার কাজে নেদারল্যান্ডসে গিয়ে উরুনকে ফোন করেছিল। তারপর সে যে সাড়া এবং খাতির-যত্ন পায় তা ছিল অপ্রত্যাশিত ও অসাধারণ। এ সব আমি হাবিবের কাছেই শুনেছি। উরুন ছিল পাখিপ্রেমিক। সে পাখি খুবই ভালোবাসতো। আমাদের অফিসের কাছে একবার একটি খয়েরি শালিখ পাখি আহত অবস্থায় রাস্তায় পড়ে ছিল। উরুন ওই শালিখ পাখি নিয়ে হৈ চৈ কাণ্ড ঘটিয়েছিল। নিজে শুশ্রূষা করার পর সে পাখিটিকে পশু হাসপাতালে নিয়ে যায়। সেখানে আহত পাখিটির চিকিৎসা চলে। অবস্থার অবনতি হওয়ার পর ওই শালিখ পাখিটির জন্য এক জরুরি মেডিকেল বোর্ড বসে। পরে তার অস্ত্রোপচার হয়। এক পর্যায়ে পাখিটি সুস্থ হলে তাকে ছেড়ে দেয়া হয়। এ পাখিটি যতদিন বেঁচে থাকবে ততদিন উরুনকে নিশ্চয়ই মনে রাখবে।

পিএইচডি করার পর আমার দীর্ঘদিন উরুনের সঙ্গে যোগাযোগ ছিল না। সিডনি থেকে আসার বছর পাঁচেক পর একবার তার ই-মেইল ঠিকানা যোগাড় করে তাকে ই-মেইল করি। কেমন আছ, কোথায় আছ, কি করছ, এসব জানতে চাই। ই-মেইল পাওয়ার পর উরুন সংক্ষিপ্ত জবাবে দেয়। আখতার, আমি খুব ব্যস্ত। কারণ এখন পাখিদের ব্রিডিং সিজন। আর মাস দেড়েক পর তারা শান্ত হয়ে আসবে। তখন আমিও কিছুটা সময় পাব এবং তোমার সঙ্গে যোগাযোগ করব। আমি তার জবাব পেয়ে হাসব না কাঁদব বুঝতে পারিনি। তবে উরুন কিন্তু তার কথা রেখেছিল। মাস দেড়েক পর সে ঠিকই আমাকে ই-মেইল দিয়েছিল। জানিয়েছিল, সে ভালো আছে। তার মাও ভালো আছেন। সে পাখিদের নিয়ে কাজ করছে। তার কাজ গ্রামের কৃষকদের সঙ্গে। এ জন্য তাকে বেশির ভাগ সময় গ্রামে থাকতে হয়। জমিতে চাষাবাদ করার সময় কি ধরণের কীটনাশক ব্যবহার করলে পাখিদের কোনো ক্ষতি হবে না সে ব্যাপারে কৃষকদের উদ্বুদ্ধ করাই তার মূল কাজ। আমি নিশ্চিত যে উরুণ এ কাজ করে আনন্দ পাচ্ছে। অনেক দিন হলো তার সঙ্গে আর যোগাযোগ নেই। তার ঠিকানাও হারিয়ে ফেলেছি। জানি না সে এখনও পাখিদের নিয়েই কর্মব্যস্ত আছে কিনা।

আসাদ ও নওশাদ

সিডনিতে থাকার সময় অনেক বাংলাদেশি পরিবারের সঙ্গে আমার সখ্য গড়ে ওঠে। সিডনি বড় শহর। সেখানে অনেক বাংলাদেশি পরিবার স্থায়ীভাবে বসবাস করেন। তাঁদের মধ্যে যেমন উচ্চশিক্ষিত পেশাজীবী রয়েছেন, তেমনি আবার রয়েছেন সাধারণ শ্রমিক। সিডনিতে প্রায় ১০০ জনের মত এগ্রিকালচারিস্ট ছিলেন। এরা সবাই বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাস করা। জিওলজিস্ট ছিলেন অনেকে। তবে এরা কেউই নিজ নিজ লাইনে কাজ পাননি। কেউ বেকার ভাতার ওপর চলেন, কেউবা অন্য ডিগ্রি করে ভিন্ন কাজ করেন। এদের একজন ছিলেন আমাদের প্রিয় বন্ধু সুজিত দাস। তিনি আমার স্ত্রীর স্কুলবান্ধবী রত্নার স্বামী। সুজিত দাদা নিজ লাইনে চাকুরি না পেয়ে পরিবেশ বিজ্ঞানে মাস্টার্স করেন। সে লাইনেও কাজ না পেয়ে পরে কম্পিউটারের কিছু কোর্স করে পিসি সার্পোট ওয়ার্কার হিসেবে কাজ করতেন। অনেকে আবার ট্যাক্সি চালাতেন। এদের বিচিত্র জীবনকাহিনি। অনেক অভিজ্ঞতা। এদের সঙ্গে গল্প করলেও অনেক কিছু জানা যায়। সিডনিতেই পরিচয় হয় পাবনার আবদুল মালেকের সঙ্গে। এক বিদেশীকে বিয়ে করেছিলেন। পাঁচ বছর সংসার করার পর বনিবনা না হওয়ায় স্ত্রীর সঙ্গে ছাড়াছাড়ি হয়ে যায়। মালেক ভাই অর্থনীতিতে মাস্টার্স। অস্ট্রেলিয়ায় ভালো ভালো চাকুরি করেছেন। অভিজ্ঞতাও অনেক। পরে আর বিয়ে করার মত বয়স্ক মেয়ে না পেয়ে দেশে এসে আমাদের সহায়তায় বিয়ে করেন। এখন ভালো আছেন। ঢাকা ও খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের যথাক্রমে আসাদুজ্জামান খান এবং নওশাদুল হকের সঙ্গে আলাপ হত বেশি। আসাদুজ্জামান ও নওশাদ বয়সে আমার ছোট হলেও জ্ঞান গরিমায় বড় ছিল। আমরা বন্ধুর মত ক্যাম্পাসে ঘোরাঘুরি করতাম। একসাথে কফি খেতাম। মাঝেমধ্যে তাদেরকে বাসায় দাওয়াত দিয়ে খাওয়াতাম। আমি চলে আসার সময় এরা আমাকে সিডনি ইউনির্ভাসিটির সুভেনির শপ থেকে কেনা যে সিডনি বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্রেস্ট উপহার দিয়েছিল তা এখনও আমার বসার ঘরে শোভা পাচ্ছে। দু'জনই এখন অস্ট্রেলিয়ায় ভালোভাবে ক্যারিয়ার গড়েছেন। ফেসবুকে তাদের সঙ্গে যোগাযোগ আছে। আসাদুজ্জামান সিডনি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাবলিক হেলথ-এ মাস্টার্স করে পরে ইউনিভার্সিটি অব নিউ ইংল্যান্ডে পিএইচডি করতে যান। পিএইচডি শেষ করে কিছুদিন দেশে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে কাটাবার পর কুইন্সল্যান্ড ইউনিভার্সিটিতে শিক্ষকতার চাকুরি নিয়ে অস্ট্রেলিয়ায় যান। নওশাদও তাঁর ক্যারিয়ার গড়েছেন আকর্ষণীয়ভাবে। নিউজিল্যান্ড ফরেস্ট রিসার্চ ইন্সটিটিউটে মেটেরিয়াল সায়েন্টিস্ট হিসেবে কাজ করার পর বেশ কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতা ও গবেষণা করে বর্তমানে দ্য কমনওয়েলথ সায়েন্টিফিক অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিয়াল রিসার্চ অরগানাইজেশন এর সঙ্গে সম্পৃক্ত অস্ট্রেলিয়ান গভর্নমেন্টস সায়েন্স এজেন্সির সিনিয়র সায়েন্টিস্ট হিসেবে কাজ করছেন। এরা দুজনই পরিশ্রম করে এদের একাডেমিক রিজিউমিকে যথেষ্ট উন্নত করেছেন। এদের কথা ভাবলেও আমার মনটা ভালোলাগায় ভরে যায়।

জেবা ও বাহার

সিডনি বিশ্ববিদ্যালয়ে পিএইচডি করতেন আরেক বাংলাদেশি। নাম মোহাম্মদ বাহার উদ্দিন। বাড়ি সিলেট। পরে জানা গেল বাহার ভাইয়ের স্ত্রী জেবা আমার সরাসরি ছাত্রী। ওকে আমার মনে ছিল। কারণ, জেবা অনেক লম্বা মহিলা। দুই মেয়ের মা। সে সিলেটের বাবা শাহজালাল আওলিয়ার বংশধর। স্যারকে সিডনিতে পেয়ে জেবা আনন্দিত। পারিবারিকভাবে আমাদের আসা যাওয়া ছিল। বাহার ভাইয়ের সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে দেখা সাক্ষাৎ হত। যেহেতু উনি কৃষিবিদ সে কারণে লেখাপড়া নিয়ে খুব একটা কথা হত না। তবে একবার যখন জানলাম যে উনি পোকামাকড়ের লাইনে কাজ করেন, তখন আমি তাঁর স্মরণাপন্ন হয়েছিলাম।

: বাহার ভাই আপনি নাকি পোকামাকড়ের লাইনে কাজ করেন? কথাটা কি সত্য?
: হ্যাঁ। কেন ভাই আপনার কোনো সন্দেহ আছে নাকি?
: না না, সন্দেহ থাকবে কেন?
: তাহলে এ ভাবে জিজ্ঞেস করছেন কেন?
: না বাহার ভাই, আমি একটা সমস্যায় পড়েছি। আপনি যদি আমাকে সাহায্য করতেন।
: বলেন কি? আপনার আবার কি সমস্যা? খুলে বলুন।
: দেখুন, বাহার ভাই আমার বাসার রান্নাঘরে ছোট জাতের তেলাপোকা খুবই বিরক্ত করছে। বাজারের তেলাপোকা মারার ওষুধ ব্যবহার করে কোনো ফল পাইনি। ভাবছিলাম আপনারা তো এসব ভালো জানবেন। যদি কোন পরামর্শ থাকে তাহলে যদি বলতেন।
: ব্যাস এটাই আপনার সমস্যা, নাকি আরও কোনো সমস্যা আছে?
: না না, আর কোনো সমস্যা নেই।
: তাহলে বলবো, আপনি সঠিক লোকের কাছে সমস্যার সমাধান চেয়েছেন। আপনার সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে।
: সত্যি! বাঁচালেন। বলুন কি করতে হবে?

বাহার ভাই বললেন, তেমন কিছু করতে হবে না। আমি আপনাকে একটি গ্রোসারি স্টোরের ঠিকানা দিচ্ছি। এটি আপনার বাসা থেকে খুব দূরে নয়। একটি ওষুধের নাম লিখে দিচ্ছি। এটি একটি চাইনিজ হারবাল ওষুধ। পাউডারের মত গুড়ো। দামও বেশি না। আপনি এটি বাসায় যাওয়ার সময় কিনে নিয়ে যাবেন। তারপর কাগজের টুকরোতে কিচেনে কয়েক জায়গায় রাতে ঘুমাবার আগে দিয়ে রাখবেন।

: তারপর কি করব?
: তারপর সকালে উঠে তেলাপোকা মরতে না দেখে মন খারাপ করবেন না। পরদিন আবারও আপনি রাতে ঘুমাবার আগে একইভাবে ওষুধ দেবেন এবং সকালে উঠে একইভাবে দেখবেন যে তেলাপোকা মরেনি। এভাবে তিনদিন আপনি পরপর ওষুধ দেবেন। তারপর ১৫ দিন পর আমাকে এসে বলবেন যে

আপনার কিচেনে তেলাপোকা আছে কিনা।
: ঠিক আছে। আমি আপনার পরামর্শ মত কাজ করব।

আমি যথারীতি বাহার ভাইয়ের কথামতো ওষুধ কিনে পরপর তিনদিন রাতে ঘুমাবার আগে কিচেনে দিয়ে রাখলাম। প্রতিদিন সকালে উঠে দেখলাম যে কোনো তেলাপোকা মরেনি। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, ১৫ দিন পরে আমার কিচেনে আর তেলাপোকা খুঁজে পেলাম না। সব তেলাপোকা একেবারে হাওয়া। বাহার ভাইকে সানন্দে খবরটা দিলাম। উনি হেসে বললেন, যাক প্রথম ডোজেই আপনার সমস্যার সমাধান হয়ে গেল। আমি বললাম, মানে আপনি কি বলতে চাইছেন, আপনার কাছে আরও ডোজ ছিল নাকি। বাহার ভাই হেসে বললেন, অবশ্যই আরও ডোজ আছে। এই দেখুন, বলে তিনি আমাকে তার টেবিলের তাকের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন। সেখানে অনেক বোয়েম সাজানো। প্রতিটি বোয়েমে বিভিন্ন প্রজাতির তাজা এবং মরা পোকামাকড় রয়েছে। তেলাপোকাও রয়েছে বিভিন্ন প্রজাতির। বাহার ভাই বললেন, এগুলো নিয়েই তো আমার কাজ। আমি তাকে ধন্যবাদ দিয়ে বললাম এটা কিভাবে সম্ভব হলো? কোনো তেলাপোকা তো মরতে দেখলাম না। তাহলে তেলাপোকা নেই কেন? বাহার ভাই বললেন, এটা অনেকটা স্লো পয়জনিং এর মতো। এ চাইনিজ গুড়ো ওষুধ খেলে তেলাপোকার অন্তর্জালা হয়। তখন তারা যন্ত্রণায় কাতর হয়ে গর্তে লুকায় এবং ক্রমান্বয়ে নিস্তেজ হয়ে সেখানেই মরে থাকে। আমি বললাম, বাহার ভাই যেখানেই মরুক আমার তাতে আপত্তি নেই। আমার সমস্যার যে সমাধান করতে পেরেছেন সে জন্য আপনাকে অনেক ধন্যবাদ।

বাহার ভাইয়ের স্ত্রী আমার ছাত্রী জেবা ভালো মেয়ে। সে তার স্যারকে পেয়ে অনেক আদর যত্ন করত। বেশ কয়েকবার আমাদেরকে সপরিবারে বাসায় দাওয়াত দিয়ে খাইয়েছে। আমরা আসার সময় আমাদেরকে গিফট দিয়েছে। যেদিন চলে আসব সে দিন মানা করা সত্ত্বেও আমাদেরকে সি অফ করতে বিমান বন্দরে এসেছিল। বিদায়ের দিনও জেবা আমাদের সহায়তা করেছে। শেষ বারের মত সিডনি ছেড়ে চলে আসার কারণে আমাদের লাগেজ একটু বেশি হয়েছিল। অনেক সময় দু'চার কেজি বেশি হলে এয়ারলাইনের লোকজন ছেড়ে দেন। কিন্তু আমার লাগেজ ওজন করার পর দেখা গেলো প্রায় ১০ কেজির মত ওজন বেশি। প্রথমে অনুরোধ করলাম। কাজ হলো না। এয়ারলাইনের লোকজন বললেন আপনাকে এর জন্য অতিরিক্ত চার্জ দিতে হবে। আমাদের হাতের লাগেজও বেশি। কোন উপায় না দেখে আমি অতিরিক্ত ভাড়া দিতে অন্য কাউন্টারের উদ্দেশ্যে রওনা দিলাম। নির্দিষ্ট কাউন্টারে যেয়ে টাকা দেব এমন সময় বাহার ভাই আর জেবা হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এসে আমাকে অতিরিক্ত ভাড়া দেওয়া থেকে নিবৃত্ত করলেন। জেবা বলল, স্যার আপনার টাকা দেয়া লাগবে না। ব্যবস্থা হয়ে গেছে। তারা কোথা থেকে এক সিলেটি ভাইকে পেয়েছে, যে অন্য কয়েকজনের সঙ্গে দূর পাল্লার সাঁতার কাটতে অস্ট্রেলিয়া গিয়েছিল। তাদেরকে পরিচয় দিয়ে তাদের সঙ্গে ভাবসাব

করে ফেলেছে এবং আমার পরিচয় দিয়ে যেহেতু তাদের ব্যাকপ্যাক ছাড়া আর কোনো লাগেজ নেই, তাদের একজনকে আমার একটা লাগেজ গছিয়ে দিয়েছে। ভালোই হলো। ওই দুটি ছেলের সঙ্গেও পথে অনেক গল্প হলো। যাত্রা বিরতিতে আমি তাদের ভদ্রতা করে কফি খেতে অনুরোধ করলে তারা রাজি হননি। আমরা ১৯৯৯ সালে দেশে চলে আসার পর বাহার ভাই বেশ কয়েকবার বাংলাদেশে এসেছেন। একবার আমাদেরকে ফোন করেছিলেন। কিন্তু দেখা হয়নি। কিন্তু ২০১১ বা ১০১২ সালে তাঁরা দেশে এসে আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করলে তাদেরকে আমরা চট্টগ্রামে বেড়াতে আসতে বলি। জেবা ও বাহার ভাই সপরিবারে আমাদের বাসায় এসে বেড়িয়ে যান। তাঁদের দেখে অনেক ভালো লাগে।

জামান ভাই

সিডনি শহরে অনেক বাংলাদেশি ট্যাক্সি চালাতেন। এতে উপার্জন মন্দ হয় না। আবার অনেক বাংলাদেশি ছাত্রও এখানে ছুটির সময় বা অবসরে ট্যাক্সি চালিয়ে উপার্জন করেন। এ রকম বেশ কিছু ট্যাক্সি চালকের সঙ্গে আমার পরিচয় ছিল। তাদের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ হলে গল্প করতাম। আমার নিকটতম প্রতিবেশি ইসমাইল ভাই ট্যাক্সি চালাতেন। তিনি আমাকে খুবই সম্মান করতেন। আরেক প্রতিবেশি নিজাম ভাই বাংলাদেশে জেলা নির্বাচন কমিশনার ছিলেন। নিজের স্ত্রীর সঙ্গে তার সম্পর্ক ভালো ছিল না বলে জেনেছিলাম। নিজাম ভাই কিশোরদের জেলখানায় কাজ করতেন। তার কাছ থেকে কিশোর অপরাধ সম্পর্কে অনেক কাহিনী শুনতাম। একবার তিনি দুইজন টিনএজ কিশোর অপরাধী সম্পর্কে জানতে চাইলে বলেছিলেন, এরা খুবই দুষ্ট এবং সন্ত্রাসী। এদের ওপর প্রায় এক সপ্তাহ কাজ করেও এদেরকে পথে আনতে পারছি না। বেশ কিছুদিন পর তার সঙ্গে আবার দেখা হলে জিজ্ঞেস করেছিলাম,

: নিজাম ভাই আপনার ওই দুইজন টিনএজ কিশোর অপরাধীকে কি বাগে আনতে পেরেছেন?
: আর বলবেন না। কোনো কিছুতেই কাজ হচ্ছিলো না। পরে কালচালার থেরাপি প্রয়োগ করে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি।
: তাতে কাজ হচ্ছে?
: ওষুধ যখন ধরেছে তখন ধীরে ধীরে কাজ হবে। এক পর্যায়ে হয়ত তাদের মধ্যে পরিবর্তন আনতে পারব।
: কেমন কাজ করছেন একটু খুলে বললে বুঝতে পারতাম।
: তারা কোনো ভালো কথা শুনতে চায় না। কোনো বই পড়তে চায় না। কম্পিউটার ব্যবহার করতে চায় না।
: আরো একটু খোলোসা করে বলুন।
: দেখুন, প্রথমে আমি ভেবেছিলাম তাদেরকে কম্পিউটার ব্যবহার ও গেম খেলিয়ে ওদিকে আকৃষ্ট করব। কিন্তু পারিনি।

: পরে কি করলেন?
: পরে তাদের স্বভাব স্টাডি করে কম্পিউটারে মানুষ মারামারির গেমে আকৃষ্ট করতে পেরেছি।
: এতে তাদের মধ্যে সন্ত্রাসী তৎপরতা আরো বাড়বে না?
: শোনেন, আগে কয়েকদিন চলুক। তারপর আস্তে আস্তে সন্ত্রাসের ডোজ কমিয়ে দেব। কেবল কম্পিউটারে আকর্ষণ থাকলে ক্রমান্বয়ে আমরা তাদের ওপর কাজ করতে পারব।

যাক নিজাম ভাইয়ের কথা। যে জামান ভাইকে নিয়ে শুরু করেছিলাম তার কথা বলি। সিডনিতে আমি যে ক'জন বাংলাদেশি ট্যাক্সি ড্রাইভার চিনতাম তার মধ্যে জামান ভাই ছিলেন সবচেয়ে স্মার্ট। একজন সাধারণ বাংলাদেশি গ্রাজুয়েট হলেও তার স্পোকেন ইংলিশও ছিল প্রায় অজিদের মতো। তাঁর জীবন অভিজ্ঞতায় ভরা। তাঁর সঙ্গে দেখা হলে আমার সময় ভালো কাটতো। অনেক দিন পর জামান ভাইয়ের সঙ্গে দেখা।

: জামান ভাই আপনার মতো স্মার্ট ট্যাক্সি ড্রাইভার আমি সিডনিতে কমই দেখেছি।
: আখতার ভাই ব্যাপার কি? কাপাচিনো খাবার প্লান করছেন নাকি?
: সে তো আপনি বহুবার খাইয়েছেন।
: চলুন আরেকবার খাওয়া যাক।
: ধন্যবাদ জামান ভাই। কাপাচিনোর চেয়ে আপনার সঙ্গ আমি বেশি পছন্দ করি।
: আপনি যে আমাকে পছন্দ করেন তা আমি জানি।
: আচ্ছা জামান ভাই আপনার ড্রাইভারি জীবনের নতুন কোনো অভিজ্ঞতা থাকলে বলুন না। এসব বাস্তব গল্প শুনতে আমার অনেক ভালো লাগে।
: গত সপ্তাহে একটা ঘটনা ঘটেছে। পড়েছিলাম এক বদমায়েশের পাল্লায়।
: জামান ভাই খুলে বলুন।
: দেখুন আখতার ভাই, আমরা যখন গভীর রাতে ট্যাক্সি চালাই তখন কাস্টমার নেবার ব্যাপারে সতর্ক থাকি। কেউ ডাকলে বা হাত দেখালেই তাকে নেই না।
: কেন কেন?
: কারণ, গভীর রাতে বিভিন্ন হোটেল, পাব, এবং জুয়ার আসর থেকে বের হয়ে অনেকে ট্যাক্সিতে ওঠেন। এদেরকে নিয়ে অনেক ভোগান্তি হয়। সে জন্য আমরা এ সময় বুঝেশুনে বুদ্ধি খাটিয়ে কাস্টমার ওঠাই।
: বেশতো। তা গত সপ্তাহে সে বুদ্ধি কাজ করেনি?
: না আখতার ভাই। একেবারেই কাজ করেনি। কারণ, দামি ধোপদুরস্ত পোশাকে অত্যন্ত ভদ্র চেহারার এক ব্যক্তি হাত দেখালে আমি তাকে ভদ্রলোক মনে করে গাড়িতে তুলি। সে এমন দুরত্বে যেতে চায় যার ভাড়া হবে অন্তত ৭০-৮০ ডলারের কম না। আমি তাকে জায়গামত নামালে দেখা যায় বিল উঠেছে ৮৫ ডলার। তিনি এক সেকেন্ড দাঁড়ান আপনার ভাড়া এনে দিচ্ছি বলে দরজা খুলে ঘরে ঢুকে যান। আর খবর নেই।

: আর খবর নেই মানে? আপনার টাকা দেননি?
: টাকা দেয়াতো দূরের কথা, তিনি আর ঘর থেকে বেরই হননি।
: আশ্চর্য! আপনি কি করলেন?
: কি করবো? দুতিন মিনিট অপেক্ষা করে দরাজায় ধাক্কা দিলাম। অনেক ধাক্কা দিলাম। কোনো খবর নেই।
: অন্য দরজা দিয়ে পালিয়ে গিয়েছিলেন নাকি? পরে কি হলো?
: আমি নিয়মকানুন জানি। সে জন্য স্থানীয় থানায় ফোন করে সহায়তা চাইলাম। কিন্তু, পুলিশ বললো তাদের লোকবল কম। এ মুহূর্তে কাউকে পাঠাতে পারবে না।
: তারপর? চেষ্ট বৃথা গেল? অন্য কিছু করতে পেরেছিলেন?
: আমি সোজা ট্যাক্সি নিয়ে থানায় হাজির হলাম। ডিউটি অফিসারকে বললাম, আপনারা যে আমাকে সহায়তা করতে পারছেন না সে বিষয়টি আমাকে লিখিতভাবে দিতে হবে। এরপর তিনি আমার সঙ্গে একজন পুলিশ পাঠালেন।
: তারপর? ওই পুলিশ এসে কি করলেন?
: যা তারা করেন। প্রথমে দরজা ধাক্কালেন। পরে হ্যান্ড মাইক দিয়ে ঘোষণা করে বললেন যদি ভেতরে কেউ থাকো এক মিনিটের মধ্যে দরজা না খুললে পুলিশ দরজা ভেঙ্গে ফেলবে।
: তাতে কাজ হলো?
: হ্যাঁ। আধ মিনিটের মধ্যে দরজা খুলে তিনি বেরিয়ে এসে বললেন যে তিনি আমার গাড়িতে আসেননি।
: বলেন কি? তারপর?
: পুলিশ তাকে থানায় নিয়ে গেল এবং ৮৫ ডলার ভাড়া এবং ৫০ ডলার জরিমানাসহ মোট ১৩৫ ডলার আমার ব্যাংক একাউন্টে তিনদিনের মধ্যে জমা দিয়ে থানায় সে রশিদ জমা দেবার মুচলেকা নিয়ে তাকে ছেড়ে দিলো।
: জামান ভাই, আপনার একাউন্টে ওই টাকা জমা হয়েছিল?
: অবশ্যই, দুদিন পরেই টাকা পেয়েছিলাম।

সিডনির পাবলিক স্কুল

বাংলাদেশ থেকে পরিবার আসার পর আমি সিডনি শহরের ম্যারিকভিলে একটি দুই বেডরুমের বাসা নিয়ে থাকতাম। ফলে যে টাকা স্কলারশিপ থেকে পেতাম তা দিয়ে চলা কঠিন হত। এ কারণে আমাকে পার্টটাইম কাজ করতে হত। আমার মেয়েকে জানুয়ারি মাসে স্কুলে দিতে হবে। তার ইংরেজি জ্ঞান দুর্বল। স্কুলে সে সহপাঠীদের সঙ্গে অ্যাডজাস্ট করতে পারে কিনা সে চিন্তায় ছিলাম। সে জন্য এ ব্যাপারে স্কুলে দেবার আগে আমার স্ত্রীর সঙ্গে পরামর্শ করে অনেকের মতো আমি তাকে কিছুদিনের জন্য চাইল্ড কেয়ার সেন্টারে দিতে মনস্থ করি। কারণ, এমনটি করতে পারলে হয়ত সে স্কুলে অন্য বাচ্চাদের সঙ্গে থাকার অভ্যাস রপ্ত করতে

পারবে। চাইল্ড কেয়ার সেন্টারে দিলে আমাকে তার জন্য বেতন দিতে হবে। এ লক্ষ্যে বাসার কাছাকাছি চাইল্ড কেয়ার সেন্টারগুলোতে খোঁজ নিয়ে হতাশ হই। কোনো সেন্টারেই সিট খালি নেই। তবে ডেবোরা লিটল চাইল্ড কেয়ার সেন্টার আমাকে ফরম পূরণ করে রেখে যেতে বলে। সিট খালি হলে তারা আমাকে জানাবে বলে কথা দেয়। অগত্যা আমি তাই করি। ভাগ্য ভালো, দিন বিশেক পর আমি ওই চাইল্ড কেয়ার সেন্টার থেকে ফোন পাই। তারা আমাকে জানায় সপ্তাহে মাত্র দু'দিনের জন্য একটি সিট খালি হয়েছে। আমি আগ্রহী হলে এ ব্যাপারে যেন তাদের সঙ্গে কথা বলি। আমি সঙ্গে সঙ্গে রাজি হই।

প্রথম যে দিন মেয়েকে চাইল্ড কেয়ার সেন্টারে দিয়ে আসি খুবই মন খারাপ লাগে। ভাবি, ইংরেজিতে কথা বলতে পারে না, অন্যের কথা বুঝতে পারবে না। না জানি কি হয়। দুপুরে মেয়ের এক টিচার ফোন করে আমাদের দু'জনের যে কোনো একজনকে যেতে বলেন। ভয়ে ভয়ে সেখানে গেলে টিচার আমাকে যা বললেন তাতে ভয় কেটে গেল। কনি নামের এক আফ্রিকান অস্ট্রেলিয়ান টিচার আমাকে বললেন, আপনাদের মেয়েটি খুবই ভালো। প্রথম দিন হিসাবে সে ভালো করেছে। খেলাধুলা করে বেশ মজা করেছে। কিন্তু বাচ্চাদের খেলার সময় শেষ হবার পর আমরা স্বল্প সময়ের জন্য বিশ্রামের সময় দেই। ওই সময় প্রত্যেকের জন্য পৃথক ছোট ছোট খাটে ঘরের মধ্যে তারা বিশ্রাম নেয়। কিন্তু আপনাদের মেয়ে খেলায় এত মজা পায় যে সে আর রেস্ট নিতে চায়নি। সব বাচ্চারা গেলেও তাকে বোঝাতে গেলে সে আমাকে লাথি মেরেছে। আমি মেয়ের ব্যবহারে দুঃখ প্রকাশ করলে কনি তা হেসে উড়িয়ে দিয়ে বলেন, আমরা বাচ্চাদের সঙ্গে কাজ করি। আমরা এ সব কিছু মনে করি না। আপনি কোনো দুঃশ্চিন্তা করবেন না। অন্য অনেক বাচ্চা প্রথম দিন এর চাইতেও অনেক আপত্তিকর কিছু করে। আমি আপনাকে এ নিশ্চয়তা দিতে পারি, আপনাদের মেয়ে খুবই ভালো করবে। সে কয়েকদিন পর এখানে আসার জন্য কান্নাকাটি করবে। বাসায় থাকতে চাইবে না। কনি টিচারের এ বক্তব্য পরে সত্য প্রমাণিত হয়েছিল। কয়েকদিনের মধ্যেই আমাদের মেয়ে সব বাচ্চাদের সঙ্গে মিলেমিশে বন্ধু হয়ে গিয়েছিল। চাইল্ড কেয়ার থেকে সে বাসায় আসতে চাইত না। পরে এ কারণে সে স্কুলে সহজেই সবার সঙ্গে মিশতে পেরেছিল এবং স্কুলেও ভালো করেছিল।

সিডনিতে শত ব্যস্ততার মধ্যেও সকালে যখন মেয়েকে স্কুলে দিয়ে আসতাম সে সময়টুকু আমি খুবই উপভোগ করতাম। বাসা থেকে দশ মিনিটের হাঁটার পথ। মেয়ের স্কুলব্যাগ, টিফিন পট, পানির বোতল, সবকিছু ব্যাগে ভরে যখন তাকে নিয়ে বের হতাম, সে সময়টুকু আমার খুবই ভালো লাগত। ওই সময়টুকু আমি মেয়ের সঙ্গে গল্প করতাম। কোন্ টিচার কেমন পড়ান সে সব জিজ্ঞেস করতাম। কোন্ কোন্ সহপাঠীর সঙ্গে তার সখ্য হচ্ছে সে সব খোঁজ নিতাম। আরও কত কি! মেয়ে হাঁটতে না পারলে আমি মাঝে মাঝে তাকে কাঁধে তুলে নিতাম। আমার ঘাড়ের দুপাশে দুটি পা ঝুলিয়ে দিয়ে সে আমার চুল ধরে বসে থাকত। এতে সে

খুবই মজা পেত। মেয়েও আমাকে ওই সময়ে নানা প্রশ্নে ব্যতিব্যস্ত করে রাখত। প্রায়শই নানা রকম দার্শনিক প্রশ্ন করত। আকাশ নীল কেন? পানিতে হাত দিলে হাত ভিজে যায় কেন? এমন আরো নানান প্রশ্ন। তার প্রশ্নের উত্তর দিতে না পারলেও আমি কখনই বিরক্ত হতাম না। একদিন রোদে একটি কুকুরকে জিভ বের করে হাঁপাতে দেখে সে আমাকে জিজ্ঞেস করেছিল, আব্বু কুকুর আমাকে দেখে হাসছে কেন? আমি তাকে বুঝালাম, কুকর ক্লান্ত হলে জিভ বের করে ক্লান্তি দুর করে। সে হাঁপাচ্ছে, হাসছে না। কিন্তু সে আমার ব্যাখ্যা মানেনি। তার ধারণা কুকুরটি তাকে দেখে জিভ বের করে হাসছে। কারণ, এর কয়েকদিন পর সে ক্লান্ত কুকুর দেখে আমাকে একই প্রশ্ন করেছিল।

অস্ট্রেলিয়ার পাবলিক স্কুলগুলো বেশ উন্নত। আমার মেয়েকে যে স্কুলে ভর্তি করিয়েছিলাম সে স্কুলটির নাম ডালউইচ হিল পাবলিক স্কুল। এ স্কুলটি মাল্টিকালচারাল স্কুল হিসাবে অধিক পরিচিত। কারণ এ স্কুলে বিভিন্ন দেশের ছেলেমেয়ে লেখাপড়া করত। আমরা এ স্কুলে মেয়েকে বাংলা শিখাতে পারতাম। স্কুলের নিয়মানুযায়ী কোনো বিশেষ ভাষাভাষী শিক্ষার্থীর সংখ্যা যদি উল্লেখযোগ্যসংখ্যক হয় এবং অভিভাবকরা যদি তাদের সন্তানদের মাতৃভাষা শিখাতে চান, তাহলে স্কুল সে ব্যবস্থা করে। এ স্কুলে প্রায় ৫-৬ জন বাংলাদেশি শিক্ষার্থী থাকায় আমাদের অনুরোধে স্কুল কর্তৃপক্ষ বাংলা শেখাবার জন্য একজন শিক্ষক নিয়োগ দেন, যার কাছে বাংলাদেশি শিক্ষার্থীরা বাংলা শিখত। স্কুল থেকে এক-দুমাস পরপরই পেরেন্টস মিটিংয়ের ব্যবস্থা ছিল। ওই মিটিংয়ে ক্লাস টিচার অভিভাবকদেরকে শিক্ষার্থীর সুবিধা অসুবিধা ও পারফরম্যান্স অবহিত করতেন। অভিভাবকদের কথাও শুনতেন। অধিকাংশ অস্ট্রেলিয়ান অভিভাবকগণ এ সব মিটিং আমলে নিতেন না। তাঁরা আসতে হয় তাই আসতেন এবং শিক্ষকের সঙ্গে দেখা সাক্ষাত করে শিক্ষককে ধন্যবাদ জানিয়ে চলে যেতেন। কিন্তু আমি যেহেতু নিজে একজন ভিনদেশি শিক্ষক, কাজেই আমি শিক্ষককে নানান বিষয়ে খুঁটিয়ে জিজ্ঞেস করতাম। এতে শিক্ষকরা উৎসাহিত হতেন। এক শিক্ষককে আমি এক মিটিংয়ে তাঁর ডিগ্রি এবং শিক্ষকতার ব্যাকগ্রাউন্ড সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেছিলেন, তিনি মাস্টার অব টিচিং পাস করেছেন। যুক্তরাজ্যে দশ বছর এবং ডেনমার্কে ২ বছর স্কুলে পড়িয়েছেন এবং শিশু মনস্তত্ত্বে তাঁর বিশেষ লেখাপড়া ও ডিগ্রি আছে। আমি শুনে খুশি হয়ে তাকে বলেছিলাম 'ইমপ্রেসিভ'!

শিক্ষকরা স্কুলে প্রতিটি বাচ্চার প্রতিদিনের পারফম্যান্সের রেকর্ড রাখতেন। কোনো অভিভাবক যদি জিজ্ঞেস করেন যে, গত মাসের ২৫ তারিখে আমার বাচ্চা স্কুলে কি করেছিল, তার পারফরম্যান্স কেমন ছিল? শিক্ষকরা তা রেকর্ড দেখে বলতে পারেন। আমি ১৯৯৬ সালের জুন মাসে ৬ মাসের জন্য সপরিবারে দেশে আসার পরিকল্পনা করার পর মেয়ের ক্লাস টিচারকে বলি দেখুন, আমি তো আমার মেয়েকে ৬ মাসের জন্য বাংলাদেশে নিয়ে যাব। আমার ইচ্ছা ওই ৬ মাস সে বাংলদেশের কোনো স্কুলে ভর্তি হয়ে পড়বে। কিন্তু আপনি হয়ত জানেন না যে,

বাংলাদেশে ভালো স্কুলে ভর্তি হওয়া বেশ কঠিন। কাজেই আপনি যদি আমার মেয়ের লেখাপড়া এবং পারফরম্যান্স উল্লেখ করে একটি চিঠি দেন তাহলে আমার পক্ষে তাকে ভালো স্কুলে ভর্তি করানো সহজ হবে। তিনি বিষয়টি বুঝতে একটু সময় নিয়ে আমাকে বললেন, ঠিক আছে আপনি পরশুদিন আসবেন। আমি পরশুদিন গেলে তিনি আমার হাতে একটি বড় ঢাউস সাইজের খাম ধরিয়ে দিয়ে বললেন, গুড লাক। আশা করি এতে আপনার কাজ হবে। আমি তাকে ধন্যবাদ দিয়ে পরে খাম খুলে তো অবাক। সেখানে স্কুলের প্যাড ব্যবহার করে ক্লাস টিচার এবং প্রিন্সিপাল স্বাক্ষরিত রেকমেন্ডেশন লেটার এবং বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষার্থীর কাজের নমুনা, ছবি এবং ওই সব কাজের ওপর শিক্ষকদের মূল্যায়নসহ প্রায় ৪০-৫০ পৃষ্ঠার বড় একটি স্পাইর‍্যাল বাইন্ডিং করা মোটা ফোল্ডার দেখে আমি তাদের পেশাদারিত্ব সম্পর্কে বুঝতে পারি (ক্লাস টিচার ও প্রিন্সিপ্যাল কর্তৃক স্বাক্ষরিত চিঠির জন্য দেখুন পরিশিষ্ট- ৪:৭)। আমি ১৯৯৯ সালে পিএইচডি করে দেশে আসা পর্যন্ত আমার মেয়ে এ স্কুলে ছিল এবং থার্ড গ্রেড শেষ করতে পেরেছিল। এ সময় সে শুদ্ধ ইংরেজি বলতে ও লিখতে পারত এবং ওই বয়সে একজন শিক্ষার্থীর অন্যান্য বিষয় সম্পর্কে যেমন লেখাপড়া জানা দরকার তা সে ভালোভাবেই আয়ত্ত করতে পেরেছিল। আমি স্থায়ীভাবে সিডনি থেকে বাংলাদেশে চলে আসার সময়ও আমার দুই মেয়ের জন্য স্কুলের কাছ থেকে তাদের পারফরম্যান্স উল্লেখ করে চিঠি সংগ্রহ করে এনেছিলাম। সে ক্ষেত্রে ছোট মেয়ে কারিশমা ফাতিহা খুব কম সময় স্কুলে যাওয়ায় তার চিঠি কিন্ডারগার্টেন সেকশন টিচার এবং বড় মেয়ে দ্বীনি ফাতিহা বছর তিনেক ওই স্কুলে পড়তে পারায় তার চিঠি দিয়েছিলেন স্কুল প্রিন্সিপ্যাল (দ্বীনি ফাতিহাকে ১৯৯৯ সালে দেয়া প্রিন্সিপ্যালের চিঠির জন্য দেখুন পরিশিষ্ট- ৪:৮)। তা ছাড়া আমরা আসার সময় ১৯৯৯ সালের যে স্কুল ফটো মেয়েদের পাবার কথা তা দেবার সময় না হওয়ায় আমরা তাদেরকে বাংলাদেশের ঠিকানা দিয়ে আসি এবং স্কুল কর্তৃপক্ষ সে ফটো যথাসময়ে আমাদের কাছে ডাকযোগে পাঠিয়ে দেয় (দ্বীনি ফাতিহার ১৯৯৮ সালের এবং কারিশমা ফাতিহার ১৯৯৯ সালের স্কুল ফটোর জন্য দেখুন পরিশিষ্ট- ৪:৯)। উল্লেখ্য, স্কুল ফটোতে ক্লাস টিচার এবং সব সহপাঠীদের নিয়ে একটি গ্রুপ ছবি থাকে এবং সংশ্লিষ্ট শিক্ষার্থীর ৬টি ছোট সাইজের ফটো থাকে। এসব ফটো পেশাদার ফটোগ্রাফারদের দিয়ে উঠানো হয়।

সিডনির কর্মক্ষেত্র

পরিবার আসার পর আমার স্কলারশিপের টাকায় সংসার চালাতে কষ্ট হত। এ কারণে লেখাপড়ার ফাঁকে আমি খণ্ডকালীন কাজ খুঁজতে থাকি। ফুলটাইম পোস্ট গ্রাজুয়েট স্টুডেন্ট হিসাবে আমার সপ্তাহে ২০ ঘন্টা কাজ করার অনুমতি ছিল। কিন্তু আমাদের মত ইংরেজি মাতৃভাষা না হওয়া দেশের লোকদের জন্য কাজ পাওয়া কঠিন ছিল। দূরে কাজ করতে গেলে আবার সময় নষ্ট হয়। তাতে লেখাপড়া

ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে ভেবে আমি ক্যাম্পাসে কাজ খুঁজছিলাম। সিডনি ইউনিভার্সিটি সেন্ট্রাল রেকর্ডস অফিসে অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ অ্যাসিস্ট্যান্ট পদে লোক নেয়ার বিজ্ঞাপন দেখে আমি দরখাস্ত করি। ইন্টারভিউয়ের পর আমাকে এবং একজন অস্ট্রিয়ান ছাত্রীকে এ পদে নেয়া হয়। একটি ফুলটাইম সাপ্তাহিক ৩৫ ঘন্টার কাজকে দু'ভাগে ভাগ করে আমাকে ১৮ ঘন্টা এবং অস্ট্রিয়ান ছাত্রী সিলভিয়া সিরিঙ্গারকে ১৭ ঘন্টার কাজ দেয়া হয়। এ কাজটি পেয়ে আমি খুশি হই। কারণ, এ অফিসে কাজ করতে পারলে আমার সময় নষ্ট হবে না। তা ছাড়া অফিস ক্যাম্পাসে হওয়ায় সব রকম বাড়তি সুবিধা পাওয়া যাবে। কাজটি আমি ৪ মাস করতে পারব। এ অফিসের বস জিওফ সমারভিল আমাদেরকে কাজের নিয়ম-কানুন বুঝিয়ে কি কাজ করতে হবে তা বলে দেন।

সিডনি ইউনিভার্সিটি সেন্ট্রাল রেকর্ডস অফিস এ বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল শিক্ষার্থী, ফ্যাকাল্টি এবং অফিস স্টাফদের ফাইল সংরক্ষণ করে। চাকুরি প্রার্থীদের মধ্যে যারা চাকুরি না পান, তাদের অ্যাপলিকেশন প্যাকেজও এ অফিস বছরখানেক সংরক্ষণ ক'রে তারপরে তা নষ্ট করে। প্রথমে আমাদেরকে একটি নির্দিষ্ট সময়ের আগের ফাইলগুলোকে বেছে সেগুলো আলাদা করে ধ্বংস করার জন্য বলা হয়। ফলে আমাদের কাজ ছিল বেছে বেছে ওই পুরানো ফাইলগুলো বের করে স্তূপ করা এবং সেগুলো ধ্বংস করা। আমরা কেবল ফাইলগুলোকে বেছে বের করতাম। সেগুলো পুড়িয়ে ধ্বংস করার কাজ আমাদের করতে হত না। এ ছাড়া এ অফিসের অন্যান্য খুঁটিনাটি কাজও আমরা শিখতে এবং প্রয়োজনে করতে থাকি। অফিসে ফাইল সংরক্ষণ ব্যবস্থা ছিল অত্যন্ত আধুনিক। সবকিছু কম্পিউটারাইজড। তার ওপর আবার ফাইলের পাঁচ-ছয়তলা তাকগুলো সুন্দর। ৮০ হাজার বা এক লাখ ফাইলের মধ্য থেকে একটি সুনির্দিষ্ট ফাইল খুঁজে বের করতে মাত্র কয়েক সেকেন্ড সময় লাগে। কোনো অফিস বা বিভাগ থেকে ৫ জন ছাত্রের ফাইল চেয়ে পাঠানো হলে বর্ণানুক্রমিকভাবে সাজানো ফাইলগুলো থেকে ওই পাঁচটি ফাইল বের করে কোন অফিসে তা পাঠানো হচ্ছে সে রেকর্ড রেখে অভ্যন্তরীন মেইলে তা দ্রুত প্রেরণ করা হয়। ফাইলগুলো সংশ্লিষ্টরা ফেরত পাঠালে রেকর্ড সংশোধন করে আবার ফাইলগুলো যথাস্থানে রাখা হয়। এ ছাড়া ইউনিভার্সিটির মেইল বাছাই করে বিভিন্ন অফিসে পাঠানোও এ অফিসের একটি কাজ। আমি এবং সিলভি আড়াই দিনে যথাক্রমে ১৮ এবং ১৭ ঘন্টা কাজ করতাম। এ কারণে যেদিন আমি কাজ করতাম সে দিন সিলভি করত না। ফলে আমাদের দু'জনের দেখা সাক্ষাত কম হত।

বিভিন্ন রকম ফাইল ধ্বংস করতে যেয়ে অনেক আকর্ষণীয় সুন্দর সুন্দর ফাইল আমরা ফেলে দিতাম। খারাপ লাগত। একদিন আমি এবং সিলভি জেফকে জিজ্ঞেস করি, জেফ ফেলে দেয়া ফাইলগুলো থেকে আমরা নিজের ব্যবহারের জন্য কি কিছু ফাইল নিতে পারি? জেফ বলল যত খুশি নিতে পারো, তবে কোন লিখিত তথ্য যেন এখান থেকে বের না হয়। এ গুলো কিন্তু গোপণীয় বিষয়। এরপর

সিলভি এবং আমি আকর্ষণীয় ফাইল দেখলে তার কাগজ খুলে ফাইলগুলো নিয়ে নিতাম। আমি এভাবে প্রায় ৩০টি সুদৃশ্য ফাইল জোগাড় করে বিভাগীয় ছাত্রছাত্রীদের ব্যবহারের জন্য আমার অফিসে রেখে একটি নোট লিখে দেই: যে কেউ ব্যবহারের জন্য নিতে পারো। তিন-চারদিনেই সেগুলো শেষ হয়ে যায়।

রেকর্ডস অফিসে যাদের সঙ্গে কাজ করতাম তারা জানতো যে আমি একজন পিএইচডি স্টুডেন্ট এবং বাংলাদেশে আমি একজন সহযোগী অধ্যাপক। আমি এ বিষয়ে তাদেরকে কখনো বলিনি। কিন্তু ওই অফিসে তো আমার ফাইলও ছিল। কাজেই তারা এ বিষয়ে জানত। এ কারণে তারা আমাকে একটু ভিন্ন চোখে দেখত। সহকর্মীদের মধ্যে নুয়েলা, মেরি, পিটার, জন, জ্যাক, এবং স্বয়ং অফিসপ্রধান জেফ আমার সঙ্গে সব সময় ভালো আচরণ করতেন এবং টিফিনের সময় হাসি-মশকরাও করতেন (অফিস স্টাফদের সঙ্গে ছবির জন্য দেখুন পরিশিষ্ট-৪:১০)। আমিও খুব সতর্ক থাকতাম যাতে সহকর্মীরা আমার সম্পর্কে কোনো খারাপ ধারণা পোষণ করতে না পারেন। বিশেষ করে আমি একাই এ অফিসে ছিলাম মুসলিম। কাজেই আমার আচরণে যেন তারা কোনো রকম বিরূপ মন্তব্য করতে না পারেন সে সম্পর্কে আমি সচেতন থাকতাম। আমি যে নামাজ রোজা করি তারা তা জানতেন এবং এ জন্য আমাকে কখনও বিরূপ কিছু বলতেন না। রোজার সময় আমি আমার কাজের প্রতি মনোযোগ বাড়িয়ে দিতাম যাতে তারা কিছুতেই মনে করতে না পারেন যে, আমি না খেয়ে থাকায় আমার কাজের পরিমাণ কমে গেছে। অবশ্য অনেক সময় সহকর্মীরা আমার সঙ্গে হালকা দুষ্টুমি করতেন এবং আমিও তাদের সঙ্গে পাল্টা দুষ্টুমি করতাম। যেমন, সমবয়সী স্টাফরা রোজায় টিফিন ব্রেক থেকে ফিরে এলে আমি যে রোজা থাকি তা না জানার ভান করে জিজ্ঞেস করতেন:

: লাঞ্চ কেমন ছিল?
: শুষ্ক। খুবই শুষ্ক।
: কিছু খেয়েছ?
: হ্যাঁ।
: কি খেলে?
: অল্প রোদ্দুর এবং পর্যাপ্ত বাতাস।

ওদের যেমন প্রশ্ন, আমিও তেমন জবাব দিতাম। তবে ওরা ধর্মীয় ব্যাপারে আমাকে কখনো সমালোচনা করার জন্য কিছু বলত না। অফিস কলিগরা ভালো ছিলেন। আইরিশ নুয়েলা, অস্ট্রেলিয়ান জুলি, মার্ক, পিটার, ফিজিয়ান মেরি মাঝে মধ্যে আমার পারিবারিক গল্প শুনতে চাইতেন। নুয়েলার বয়স প্রায় ৫৪ বছর। তিনি মাঝেমধ্যে আমার মেয়েদের লেখাপড়ার খোঁজ নিতেন। একবার সে আমাকে অনেকগুলো বাচ্চাদের মজার বই এবং শব্দের ডিকশনারি এনে দিয়ে বলেছিলেন, মুহামেদ, আমার ছেলেমেয়েরা অনেক বড়। তারা অনেক দূরে থাকে। আমার ঘরে কোন বাচ্চা নেই। এ নতুন বইগুলোতে ধুলো পড়ে যাচ্ছে। আমি এগুলো তোমার

মেয়ের জন্য নিয়ে এসেছি। আমি নিশ্চিত, তোমার মেয়ে এগুলো পেলে খুশি হবে। আমি নুয়েলাকে হতাশ করিনি। বইগুলো নিয়েছি এবং সত্যিই আমার মেয়েকে দিয়েছি। পরে তাঁকে ধন্যবাদ দিয়ে বলেছি, আমার মেয়ে তোমাকে ধন্যবাদ জানিয়েছে। সে বইগুলো খুবই পছন্দ করেছে।

সেন্ট্রাল রেকর্ডস অফিসে কাজ করার সুবাদে সিডনি ইউনিভার্সিটির অন্য অনেক অফিস কর্মকর্তাদের সঙ্গে আমার পরিচয় ঘটে। অনেকের সঙ্গে টেলিফোনে কথা হয়। ফলে অনেক অফিসের অনেক কর্মকর্তা আমাকে নামে চিনতেন। এ অফিসে কাজ করার সময় যখন কাজের চাপ কম থাকত তখন সময়টাকে গঠনমূলক কাজে লাগানোর কথা ভাবি। প্রথমে কিছুদিন মেইল সর্টিং এলাকা থেকে ফেলে দেয়া খাম থেকে স্ট্যাম্প সংগ্রহ করেছিলাম। পরে তা বাদ দেই। তখন আমার মনে একটি নতুন আইডিয়া আসে। আমি বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্রেস্ট বা মনোগ্রাম সংগ্রহ করা শুরু করি। বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোগ্রাম সংগ্রহ করার জন্য রেকর্ডস অফিস ছিল ভালো জায়গা। কারণ, পৃথিবীর এমন কোন দেশ নেই যেখান থেকে শিক্ষার্থীরা এখানে ভর্তি হবার জন্য দরখাস্ত করেন না। কাজেই পৃথিবীর সব অঞ্চলের সব দেশের বিভিন্ন রকম বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এখানে দরখাস্ত আসে। আমার উদ্দেশ্য ছিল বিশ্ববিদ্যালয় মনোগ্রামের ওপর একটি গবেষণাধর্মী নিবন্ধ লেখা। এ লক্ষ্যে আমি প্রথমে অস্ট্রেলিয়ার সব বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোগ্রাম সংগ্রহ করি এবং পরে পৃথিবীর অন্যান্য দেশের মনোগ্রাম সংগ্রহ করতে থাকি। নতুন কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোগ্রাম দেখলেই আমি তা ফটোকপি করে নিতাম এবং এবং একটি ফাইলে সংগ্রহ করতাম। অফিসপ্রধান জেফ ব্যাপারটি লক্ষ্য করেন। একদিন টিফিন ব্রেকে তিনি আমাকে একাকী পেয়ে এ বিষয়ে জিজ্ঞেস করেন।

: আচ্ছা মুহামেদ, তোমাকে দেখি মাঝেমধ্যে কিছু ফটোকপি করো। কি ফটোকপি কর?
: বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোগ্রাম ফটোকপি করি।
: মনোগ্রাম? আই মিন ক্রেস্ট? মনোগ্রাম দিয়ে তুমি কি করবে?
: করব কিছু একটা। শিক্ষক হিসাবে আর কি করতে পারি। লিখব কিছু ভাবছি।
: লিখবে? তাও আবার মনোগ্রামের ওপর?
: হ্যাঁ, আমার তেমন পরিকল্পনা আছে।
: সত্যি মনোগ্রামের ওপর লিখবে! কি লিখবে, আমাকে বলা যাবে?
: জেফ! সত্যিই কি তুমি শুনতে চাও?
: হ্যাঁ শুনতে চাই। কারণ, আমার মাথায় আসছে না মনোগ্রামের মত বিষয়ের ওপর তুমি কি লিখতে পারো।
: আচ্ছা, তুমি যখন নিতান্তই শুনতে চাচ্ছো তাহলে তো বলতে হয়। দেখ, পুরো লেখার পরিকল্পনাটা এখনো ঠিক করিনি। তবে তোমাকে একটা প্রাথমিক ধারণা দিচ্ছি। তুমি নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছো একেক দেশের বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোগ্রাম একেক রকম। এই ভিন্নতা কেন আমি তা পরীক্ষা করে দেখাব। একটি দেশের

বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোগ্রামে কি থাকা উচিত, কি আছে, সে সব দেখাব। একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোগ্রামে সে দেশের রাজনীতি, সংস্কৃতি ও সে দেশের মানুষের চিন্তা-ভাবনা কিভাবে স্থান করে নেয় সে সব তুলে ধরব। দেখ, আমাদের দেশের প্রধান সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। ওই বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোগ্রামে তিনবার পরিবর্তন আনা হয়েছে। এ পরিবর্তনের কারণ বিশ্লেষণ করব। তুমি একটু সতর্ক হয়ে লক্ষ্য করলে দেখবে, ব্রিটিশ কলোনি ছিল এমন দেশগুলোর বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোগ্রামে কিভাবে অক্সফোর্ড এবং ক্যামব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোগ্রামের প্রভাব পড়েছে। অনেক দেশ ঔপনিবেশিক শাসন থেকে সংগ্রাম করে ভৌগলিক স্বাধীনতা পেলেও চিন্তা-চেতনায় যে পূর্ণ স্বাধীন হতে পারেনি তা ওই সব দেশের বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোগ্রাম দিয়ে প্রমাণ করা যাবে। গণতান্ত্রিক দেশগুলোর বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর মনোগ্রামের সঙ্গে সমাজতান্ত্রিক, বা ধর্ম প্রভাবিত দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর মনোগ্রামের পার্থক্য সহজে দেখানো যাবে। জেফ, তুমি নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছ, মধ্যপ্রাচ্যীয় দেশগুলোর বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোগ্রামে কোন পশু-পাখী বা প্রাণীর ছবি নেই। পাকিস্তান, ইরান, সৌদি আরব প্রভৃতি ধর্ম প্রভাবিত দেশগুলোর অনেক বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোগ্রামে দেখবে কোরানের আয়াত স্থান করে নিয়েছে। এ ভাবে আমি যখন বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম বলে এবং দেশের নাম বলে সেগুলোর মনোগ্রামের বিষয়বস্তু বিশ্লেষণ করব তখন পাঠকদের পক্ষে বুঝতে আরো সহজ হবে। তবে কলোনী থেকে পরে স্বাধীন হওয়া দেশগুলোর বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে যে ভাবে ওই দেশগুলো আগে যে দেশের কলোনি ছিল সে দেশের প্রধান বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর মনোগ্রামের প্রভাব পড়েছে, ওই সব দেশের পরবর্তী প্রজন্মের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর মনোগ্রামে কিন্তু সে প্রভাব ক্রমান্বয়ে কমে এসেছে। এ বিষয়গুলো নতুন বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর নির্মাণকাল এবং তাদের মনোগ্রামের বিষয়বস্তু বিশ্লেষণ করে দেখানো কঠিন হবে না। তারপর সরকারিভাবে স্থাপিত বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোগ্রামের বিষয়বস্তুতে রাজনীতি যতটা স্থান পায়, বেসরকারিভাবে স্থাপিত বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোগ্রামগুলোর বিষয়বস্তুতে রাজনীতির প্রভাব যে তার চেয়ে কম তা দেখাতেও আমার অসুবিধা হবে না। তারপর--

: মুহাম্মেদ, প্লিজ তুমি থামো। আর বলতে হবে না।

: না না, আরও অনেক কিছু বলার আছে, অবশ্য তুমি যদি শুনতে চাও।

: আমি তোমার ব্যাখ্যায় চমৎকৃত হয়েছি। দেখ, আমরা দশটা-পাঁচটা অফিস করা লোক। আমাদের মাথায় এত চিন্তা আসে না। আমি নিশ্চিত যে যেভাবে তুমি বললে সে ভাবে যদি একটি লেখা দাঁড় করাতে পারো তাহলে সে লেখাটি আকর্ষণীয় হবে। এখন বুঝতে পারছি কেন তুমি এত আগ্রহ নিয়ে মনোগ্রাম ফটোকপি কর। আমি বলছি, তুমি যত খুশি আমার অফিস থেকে মনোগ্রাম সংগ্রহ করতে পার। তবে যদি তোমার লেখাটি প্রকাশিত হয় আমাকে পড়ার জন্য অবশ্যই দিও।

: নিশ্চয়ই দেব। লেখাটিতে আমি সেন্ট্রাল রেকর্ডস অফিস এবং অফিসপ্রধান হিসাবে তোমার কাছে মনোগ্রাম সংগ্রহ করতে দেয়ার জন্য কৃতজ্ঞতাও স্বীকার করব।

জেফ আমাকে ব্যক্তিগতভাবে পছন্দ করতেন। আমার অনুপস্থিতিতে তিনি অন্যদের কাছে আমার প্রশংসা করতেন বলেও আমি অন্যদের কাছে শুনেছি। এ কারণে প্রথমবার কাজ শেষ হয়ে গেলে পরে আবার বিভিন্ন মেয়াদে আমাকে তিনি রেকর্ডস অফিসে একাধিকবার কাজ দিয়েছিলেন।

মনোগ্রাম সংগ্রহ করার পাশাপাশি সেন্ট্রাল রেকর্ডস অফিসে কাজ করার সময় হাজার হাজার ছাত্রদের ফাইল হাতের নাগালে থাকায় আর একটি বিষয় শিখেছিলাম। সে বিষয়টি হলো খ্যাতিমান অধ্যাপকদের রেফারেন্স লেটার লেখার কলাকৌশল। ছাত্র ভর্তির বা শিক্ষকের চাকুরি দেবার ব্যাপারে রেফারেন্স লেটারকে পাশ্চাত্যের বিশ্ববিদ্যালয়গুলো খুবই গুরুত্ব দেয়। সতর্কভাবে না পড়লে প্রায় প্রতিটি রেফারেন্স লেটারকে ইতিবাচক মনে হয়। কিন্তু সেখানে অধ্যাপকদের লেখার ভঙ্গিতে থাকে নানা রকম কলাকৌশল ও মুনশিয়ানা। সামান্য শব্দের মারপ্যাঁচে প্রার্থীর যোগ্যতা বা অযোগ্যতা সম্পর্কে রেফারেন্স লেটার লেখকগণ ইঙ্গিত দেন। এ সব লেখকদের লিখনভঙ্গিমা থেকে অনেক শেখার আছে। যদি একজন প্রার্থীর রেফারেন্স লেটারে লেখক তার গবেষণা যোগ্যতা সম্পর্কে বলতে গিয়ে লিখেন, প্রার্থী দুটি নিবন্ধ প্রকাশ করেছেন যার একটি আমি পাঠ করেছি। পঠিত প্রবন্ধটিতে প্রকাশিত তার চিন্তা-ভাবনায় মৌলিকত্ব ও নতুনত্বের ছাপ পাওয়া যায়। আমার বিশ্বাস, পরবর্তীতে সে সুযোগ পেলে তার নতুন চিন্তা-ভাবনাগুলো নিয়ে আরও গবেষণা করতে পারবে। কিন্তু যদি তিনি লেখেন, জেনেছি প্রার্থী গত কয়েক বছরে ৫-৬টি প্রকাশনা করেছেন। আমার ধারণা তার লেখাগুলো অবদানমূলক হতে পারে। এ ক্ষেত্রে দুটি রেফারেন্সেই প্রার্থীর প্রকাশনা সম্পর্কে স্বীকৃতি দেয়া হলেও প্রথম ক্ষেত্রে নির্বাচকগণ প্রার্থী সম্পর্কে যতটা ইতিবাচক ধারণা গ্রহণ করবেন, দ্বিতীয় রেফারেন্সটি দেখে তারা প্রার্থী সম্পর্কে ততটা আগ্রহী হবেন না। কারণ, দ্বিতীয় রেফারেন্সটিতে প্রার্থীর প্রকাশনার স্বীকৃতি দেয়া হলেও ওই প্রকাশনাগুলোর মানের নিশ্চয়তা দেয়া হয়নি। এ ভাবে উত্তর আমেরিকার খ্যাতিমান বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর আইকন অধ্যাপকদের লেখা রেফারেন্স লেটারগুলো পড়ে তাদের লেখার মারপ্যাঁচ এবং মুনশিয়ানা থেকে অনেক কিছু শিখেছি।

সেন্ট্রাল রেকর্ডস অফিসে কাজ করার পর ওই অভিজ্ঞতা দিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যান্য অফিসে কাজ পেতে আমার অসুবিধা হয়নি। ফলে পরবর্তীতে আমি স্টুডেন্টস রেকর্ডস, প্রসপেক্টিভ স্টুডেন্টস ইউনিট, স্টুডেন্ট সেন্টার, প্রভৃতি অফিসে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন মেয়াদে খণ্ডকালীন কাজ করেছি। সেমিস্টারের শুরুতে এনরোলমেন্ট অফিসার হিসাবে কাজ করেছি বেশ কয়েকবার। এ ছাড়া অস্ট্রেলিয়ার রিটেইল বিজনেসে খ্যাতিমান প্রতিষ্ঠান ডেভিড

জোনস-এ ক্রিসমাস ক্যাজুয়াল হিসাবে কয়েক সপ্তাহ কাজ করার অভিজ্ঞতা অর্জন করেছি। এ সব কাজ করে আমার নানারকম অভিজ্ঞতা হয়েছে। ক্রিসমাস এর সময় আমি যখন ডেভিড জোনস এর সেলসপার্সন পদের জন্য দরখাস্ত করি, তখন পরিচিত বাঙালি বন্ধুরা এ নিয়ে হাসাহাসি করেছিল। বলেছিল, ওখানে সুন্দরী অস্ট্রেলিয়ান মেয়েদের চাকুরি হবে। আপনার সম্ভাবনা নেই। কারণ, ভাষা এবং উচ্চারণের ব্যাপার আছে। ওই অভিজাত দোকানে আমরা সচরাচর কোন বাংলাদেশিকে কাজ করতে দেখিনি। আমি তর্কে না জড়িয়ে বলেছিলাম, ধরুন আমার হবে না। তবে চেষ্টা করে দেখলে দোষ কি। পরে ইন্টারভিউয়ে ডাক পাই এবং ইন্টারভিউ দিয়ে আমার চাকুরি হলে তারা কিছুটা অবাক হন। ওই ইন্টারভিউটা ছিল ব্যতিক্রমী ধরনের। আমি নির্দিষ্ট অফিসে ইন্টারভিউয়ের জন্য অপেক্ষমান ছিলাম। একজন বয়স্ক মহিলা ইন্টারভিউ নিচ্ছিলেন যিনি নিজে এসে নাম ধরে একেকজনকে ডেকে নিয়ে যাচ্ছিলেন। এক পর্যায়ে আমাকে ডেকে নিয়ে গেলেন এবং বসতে বলে নিজে তাঁর চেয়ারে বসে আমাকে বললেন,

: বলো।

: কি বলব?

: যা খুশি তাই বলো।

: সত্যি!

: হ্যাঁ, বলতে থাকো।

: আমি বলা শুরু করলাম।

আমি কে, আমার নাম কি, কোথা থেকে কবে এসেছি, কি করছি, কোথায় থাকি, কতদিন অস্ট্রেলিয়ায় থাকব, আমার সুপারভাইজারের নাম কি, তিনি কেমন লোক, ডিপার্টমেন্টে আমার সঙ্গে আর কোন্ কোন্ দেশের শিক্ষার্থীরা পিএইচডি করছে। তাদের সঙ্গে আমার সম্পর্ক কেমন। আমি কোথায় থাকি, আমার সঙ্গে কে কে থাকে, এ সব বলতে থাকলাম। মহিলা চোখ বুঁজে বসে রইলেন। কোন কিছু বলেন না। অগত্যা আমাকে আরও কথা বাড়াতে হলো। এবার বললাম, আমার মেয়েরা কোন স্কুলে লেখাপড়া করছে। তারা কেমন করছে। আমি কোথায় কোথায় চাকুরি করেছি। কতদিন সেসব পদে ছিলাম। ওখানে কে কে আমার বস ছিলেন। সহকর্মীরা কে কে ছিলেন এসবও বলা শুরু করলাম। এভাবে বলতে বলতে কথা প্রায় শেষ হয়ে আসছিল। প্রায় মিনিট সাতেক পর মহিলা চোখ খুলে কথা বললেন।

: তোমার কি কোন কেনাবেচা করার অভিজ্ঞতা (রিটেইল এক্সপেরিয়েন্স) আছে?

: না।

: তুমি কি মনে করো যে তুমি এ কাজ করতে পারবে।

: আমি মনে করি আমি পারব। সে জন্যই আমি দরখাস্ত করেছি।

: আচ্ছা তুমি আসতে পারো। তোমার কি কিছু জানার আছে?

: আমার একটা বিষয় জানার আছে।

: বল কি জানতে চাও?

: আমার চাকুরি হলো কিনা কবে জানতে পারব?

: তোমাকে ৪৮ ঘন্টার মধ্যে জানানো হবে।

: ধন্যবাদ।

: আপনাকেও ধন্যবাদ।

পরে ৪৮ ঘন্টার আগেই আমাকে জানানো হয়েছিল যে আমার চাকুরি হয়েছে এবং আমি ক্রিসমাসের সময় কয়েক সপ্তাহ এ দোকানে কাজ করেছিলাম। এ সময় আমার চমৎকার অভিজ্ঞতা হয়েছিল। বিশেষ করে যখন আমাদেরকে তিনদিনের প্রশিক্ষণ দেয়া হয় তখন অনেক কিছু শিখেছিলাম। তার মধ্যে কিভাবে কাস্টমারদের সঙ্গে ব্যবহার করতে হবে। রাগান্বিত খদ্দেরদের সঙ্গে কিভাবে আচরণ করতে হবে। মদ্যপ কাস্টমারদেরকে কিভাবে নিয়ন্ত্রণে রাখতে হবে। কিভাবে এ সব দোকানে চোর ধরা হয়। কাউকে চুরি করতে দেখলে কি করতে হবে। এ সব বিষয়সহ আরো অনেক বিষয়ে আমাদের পেশাদার প্রশিক্ষকগণ প্রশিক্ষণ দিয়েছিলেন। তবে যত পার্টটাইম কাজ করেছিলাম তার মধ্যে সবচেয়ে বেশি মজা পেয়েছিলাম সিডনি ইউনিভার্সিটির স্টুডেন্ট সেন্টারে কাস্টমার সার্ভিসের কাজ করে।

সেমিস্টার চলাকালীন স্টুডেন্ট সেন্টারের কাউন্টারে সব সময় কমপক্ষে দুজন স্টাফ কাস্টমারদের সেবা দেন। কাস্টমারদের প্রায় ৯০ ভাগই শিক্ষার্থী। তারা নানা রকম বিষয় জানতে আসেন। এ কাজ সাধারণত অস্ট্রেলিয়ানরাই করেন এবং এ ক্ষেত্রে আকর্ষণীয় সুন্দরী ছাত্রী বা মহিলারাই প্রাধান্য পান। তবে পুরুষরাও যে এ কাজ করেন না এমন নয়। আমার মত ইংরেজি মাতৃভাষা নয় এমন লোক খুব কমই এ পদে কাজ করেছেন। আমাকে যে কেন এ কাজ দেয়া হয় তা বুঝতে আমার বেশ সময় লাগে। এখানে কাজ করতে হলে বিশ্বস্ত ও সততারও প্রয়োজন আছে। কারণ, কাউন্টারে সেবা প্রদানের সঙ্গে কিছু অল্প-স্বল্প ক্যাশ লেনদেনের ব্যাপার আছে। পরে জানতে পারি, সেন্ট্রাল রেকর্ডস অফিসের কাজের সুনাম শুনে স্টুডেন্ট সেন্টার আমাকে নিতে আগ্রহী হয়। যেহেতু এলিজাবেথ কনর নামের একজন সিনিয়র কর্মকর্তা, যিনি এক সময় সেন্ট্রাল রেকর্ডস অফিসে কাজ করতেন, তিনি পরে স্টুডেন্ট রেকর্ডস অফিসে যোগ দেন। এই ভদ্রমহিলা আমাকে ভালো জানতেন। তিনি আমাকে এ কাজে যোগ দিতে অনুরোধ করলে আমি কিছুটা অবাক হই। কারণ, যেখানে কাউন্টারের সামনে সেমিস্টার চলাকালীন সব সময় শিক্ষার্থীদের লম্বা লাইন থাকে, একজনের পর একজনকে সেবা দেয়া লাগে, সেখানে আমার পক্ষে কি এ কাজ করা সম্ভব হবে কিনা আমি নিজেও সে বিষয়ে সন্দিহান ছিলাম। কাজেই এলিজাবেথের অফার পেয়ে আমি তাকে জিজ্ঞেস করি,

: আপনি কি মনে করেন আমি এ কাজ করতে পারব?

: কেন পারবে না? তোমার ওপর আমার আস্থা আছে। আমি মনে করি তুমি পারবে।

: কিন্তু এলিজাবেথ, অনেক কিছুই তো আমি জানি না।
: সে জন্য তো আমরা আছি। তুমি কি মনে কর এখানকার অন্য স্টাফরা সব কিছু জানে?
: কিন্তু আমার অভিজ্ঞতা তো অনেক কম।
: আমরা তোমাকে সাহায্য করব। দু'তিন সপ্তাহ কাজ করলে দেখবে সব সহজ হয়ে যাবে।
: যদি তেমন না হয়?
: তুমি আগে জয়েন করো। যদি দেখ তোমার বেশি অসুবিধা হচ্ছে, তাহলে ছেড়ে দিও।
: এলিজাবেথকে ধন্যবাদ দিয়ে আমি এ কাজে যোগ দিতে মনস্থির করলাম।

এখানেও সপ্তাহে ১৮ ঘন্টা কাজ করব। অর্থাৎ দুই দিন পূর্ণদিবস এবং একদিন লাঞ্চ পর্যন্ত। এখানে কাজ পেয়ে আমার আরও বেশি সুবিধা হয়। কারণ, এ অফিসটি 'কারস্‌ল' বিল্ডিংয়ে। ক্যাম্পাসের একেবারে প্রাণকেন্দ্রে। কেন্দ্রিয় লাইব্রেরি থেকে ২০-২৫ সেকেন্ড এবং আমার অফিস থেকে এক দেড় মিনিট হাঁটার দূরত্বে। ফলে এখানে কাজ করলে টিফিন ব্রেকে অফিসে যেয়ে একাডেমিক কাজ করাও সম্ভব ছিল। তা ছাড়া পড়ালেখার কাজে বা সুপারভাইজারের সঙ্গে কাজ থাকার কারণে কোনোদিন অফিসের কাজ না করে ছুটি নিতে চাইলে এ অফিসের কর্মকর্তাগণ বিশ্ববিদ্যালয়েরই কর্মকর্তা হওয়ায় উদারতার সঙ্গে সহযোগিতা করতেন।

স্টুডেন্ট সেন্টারে কাউন্টার সার্ভিস করে অনেক কিছু শিখেছি। কিভাবে ঠোঁটের কোনে সর্বক্ষণ হাসি ধরে রাখতে হবে। কিভাবে সম্ভাষণ করতে হবে। কিভাবে কাস্টমারকে সন্তুষ্ট করতে হবে। কিভাবে ক্রিটিক্যাল কাস্টমারদের সঙ্গে আচরণ করতে হবে। কিভাবে প্রচণ্ড ভিড় ও চাপের মধ্যে ঠান্ডা মাথায় কাজ করতে হবে। এ সব কিছু শিখেছিলাম এখানে কাজ করে। নানান বর্ণের নানান দেশের মানুষের সঙ্গে কথা বলার এক চমৎকার সুযোগ ছিল এ কাজে। এ কাজে যোগ দিয়ে প্রথম দুতিন দিন আমার অসুবিধা হয়েছিল। কারণ, কাস্টমারদের সব জিজ্ঞাসার জবাব আমি জানতাম না। কিন্তু পরে ধীরে ধীরে সব জেনে নিতে পেরেছি। আর কোনো জিজ্ঞাসার উত্তর না জানলে অসুবিধা নেই। কাউন্টারে একাধিক ফোন রয়েছে। ভেতরে বিভিন্ন ইউনিটে বিভিন্ন কর্মকর্তা কাজ করছেন। তাদের ফোন নম্বর রয়েছে কাউন্টারে। কোনো প্রশ্নের উত্তর না জানলে সংশ্লিষ্ট ডেস্ক অফিসারকে ফোন করে সেটা জেনে নেয়া সম্ভব। অথবা কাস্টমারকে সংশ্লিষ্ট অফিসারকে টেলিফোন ধরিয়ে দিয়েও তাকে সন্তুষ্ট করা যায়। ফলে কয়েক সপ্তাহ পরে আমি প্রাথমিক অসুবিধা কাটিয়ে উঠি এবং বিভিন্ন দেশের কাস্টমারদের সঙ্গে কথা বলে তাদের সমস্যার সমাধান করার কাজটি উপভোগ করতে থাকি। কাজ করা এবং কথা বলার ফাঁকে ফাঁকে বিভিন্ন দেশের মানুষের আচরণ ও সংস্কৃতি সম্পর্কেও ধারণা লাভ করি। এখানে কাজ করার জন্য সব সময় বিশ্বাসী

কর্মকর্তাদেরকে বেছে নেয়া হয়। কারণ, এখানে সামান্য কিছু বেচাকেনার কাজও আছে। কারণ, কতিপয় ব্রোসার এবং অফিসিয়াল ট্রান্সক্রিপ্ট নেবার জন্য কাস্টমারদের সঙ্গে সামান্য ক্যাশ লেনদেনের কাজ করতে হয়। সে ক্ষেত্রে অনেকের বিরুদ্ধে তাদের কাজ করাকালীন সময় এ রকম বেচাকেনার হিসাব না মেলার অভিযোগ উঠলেও আমার কাজ করাকলীন দিনে কখনও তা হয়নি।

বিদেশি বিশববিদ্যালয়ে লেখাপড়া বা কাজ করার সময় অত্যন্ত সতর্ক হয়ে কাজ করেছি। আমি সব সময় ভাবতাম যে এখানে আমি আমার দেশকে প্রতিনিধিত্ব করছি। সামান্য ত্রুটি-বিচ্যুতি হলে আমার দেশের বদনাম হবে। এ কথা মনে রেখে আমি সব সময় কাজ করতাম। এর ফলে যে সব অফিসে আমি পার্টটাইম কাজ করি, সে অফিসগুলোতে আমার একটা সুনাম গড়ে ওঠে। আমার মত অন্য আরো অনেক বাংলাদেশি ছাত্রও এখানে সুনাম তৈরি করে। আমার আগে আমার অ্যাসোসিয়েট সুপারভাইজার ইউনিভার্সিটি অব নিউ ইংল্যান্ড-এর শিক্ষক ড. হাবীব জাফরুল্লাহসহ অন্য যে সব বাংলাদেশি শিক্ষার্থী এখানে লেখাপড়া করেছেন তাঁরাও এখানে দায়িত্বশীলতার সঙ্গে সততা ও কর্মনিষ্ঠার পরিচয় দিয়ে দেশের সুনাম বৃদ্ধি করেছেন। তাছাড়া সিডনি শহরে যে সব বাংলাদেশি পেশাজীবী ও শ্রমিক বাস করেন, তাদেরও দায়িত্বশীল হিসেবে নিজ নিজ কর্মক্ষেত্রে সুনাম আছে।

বিদেশে থাকা না থাকার দ্বন্দ্ব

আমি যখন ১৯৯৪ সালে অস্ট্রেলিয়া যাই তখন অনেক বাংলাদেশি অস্ট্রেলিয়ান বন্ধু আমাকে অস্ট্রেলিয়ায় স্থায়ীভাবে থাকার জন্য রেসিডেন্টশিপের জন্য দরখাস্ত করতে পরামর্শ দেন। ওই সময় দরখাস্ত করলে আমি কোয়ালিফাই করতাম না। যে সব বাংলাদেশি সিডনিতে ছিলেন, বিরল ব্যতিক্রম ছাড়া তাদের প্রায় সবারই জব স্যাটিসফেকশন ছিল না। অনেকেই অড জব করতেন এবং এ নিয়ে তাদের মনোবেদনা ছিল। ওই সময় সিডনিতে বসবাসকারী জিওলজিস্ট এবং এগরিকালচারিস্টদের প্রায় কেউই নিজ লাইনে কাজ পাননি। তাদের কেউ দোকানে সেলস্‌পার্সন, বা কেউ ভিন্ন কোনো কাজ করতেন। ট্যাক্সিও চালাতেন কেউ কেউ। মনমতো কাজ পাওয়া বেশ কঠিন ছিল। তবে আমি চলে আসার সময় অস্ট্রেলিয়ান ইমিগ্রেশন আইনে পরিবর্তন আনা হয়। তখন ইমিগ্রেশনের জন্য আবেদনকারীদের অস্ট্রেলিয়ান ইউনিভার্সিটির পিএইচডি থাকলে অতিরিক্ত ১০ পয়েন্ট দেবার নীতি গৃহীত হয়। ফলে তখন যদি আমি ইমিগ্রেশনের জন্য দরখাস্ত করতাম তাহলে সহজেই ইমিগ্রেশন পেতাম। কিন্তু ভালো কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতার কাজ হয়তো পেতাম না। সে জন্য মনোকষ্ট নিয়ে বিদেশের মাটিতে স্থায়ী হবার চেয়ে হাজারো সমস্যার দেশ জেনেও নিজ দেশে আসার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি। যে সব অস্ট্রেলিয়ান বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে লেখাপড়া এবং কাজ করেছি, তাদের অনেকেই আমাকে অবমূল্যায়ন করতো। ভাবত, আমরা

বাংলাদেশ থেকে এসেছি বিধায় হয়ত অস্ট্রেলিয়ায় থাকতে প্রলুব্ধ। অনেকেই আমাকে প্রশ্ন করত, আমি ইমিগ্রেশনের জন্য দরখাস্ত করেছি কি না। ডিগ্রি শেষ হলে এ দেশে থাকব কি না, ইত্যাদি। আমি এদেরকে কৌশলী জবাব দিতাম। বলতাম, দেখ, তোমার সরকার আমাকে বৃত্তি দিয়ে পিএইচডি ডিগ্রি করার সুযোগ দিয়েছে। আবার, আমার বিশ্ববিদ্যালয় আমাকে সবেতন শিক্ষা ছুটি দিয়ে এ দেশে উচ্চতর ডিগ্রি করতে পাঠিয়েছে। এদের এমন করার পেছনে নিশ্চয়ই কারণ আছে। আর সে কারণটি হলো, এরা চান যে, আমি সর্বোচ্চ ডিগ্রি অর্জন করে সে জ্ঞান আমার বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের মধ্যে বিতরণ করি। আমি এদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারব না। কাজেই আমি যদি আমার নিজের জীবনের বৈষয়িক সুখ সমৃদ্ধির কথা ভেবে দেশে ফিরে না যাই, তাহলে যুগপৎ অস্ট্রেলিয়া ও বাংলাদেশ সরকারের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করা হবে। তোমাদের কি মনে হয় আমার এমনটা করা উচিত? তাদের অনেকেই তখন বাধ্য হয়ে বলত, 'না তোমার সিদ্ধান্ত ঠিক আছে। আমি তোমার দেশপ্রেমকে শ্রদ্ধা করি।'

সবাই যদি বিদেশে ডিগ্রি করতে যেয়ে ডিগ্রি করার পর ফিরে না আসেন, তাহলে দেশের কি হবে? ডিগ্রি হবার পর আমি এবং আমার দেশপ্রেমিক স্ত্রীর দেশে ফিরে আসার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিতে মোটেও দেরি হয়নি। যাঁরা দেশে ফিরেন না, তাঁরা দেশের প্রতি দায়বদ্ধতার কথা চিন্তা না করে নিজের সুখ সমৃদ্ধির কথা চিন্তা করে বিদেশে থেকে যান। তবে মুখে তারা সে কথাটি স্বীকার করেন না। মুখে বলেন, ছেলেমেয়েদের লেখাপড়ার কথা। দেশের সন্ত্রাস-সহিংসতার কথা। ছেলেমেয়েদের ভবিষ্যতের কথা। এ যুক্তি মেনে নেয়ার মতো নয়। বাংলাদেশে যারা লেখাপড়া করছে, তারা কি অনেকেই ভালো করছে না? অবশ্যই করছে। আমি দেশে ফিরে আসার পর আমার মেয়েরা যে খুব খারাপ করেছে আমি এমনটি স্বীকার করব না। তবে আমি এ কথা স্বীকার করি যে, দেশের শিক্ষার মান ক্রমে নীচে নামছে। ব্যক্তিগত উদ্যোগে অনেকে ভালো করলেও সরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে ক্রমান্বয়ে শিক্ষার মানের অবনমন ঘটছে। বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের শিক্ষায় ২০২০ সালে এশিয়ার র‍্যাংকিংয়ে প্রথম ৪০০ বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে বাংলাদেশের কোনো সরকারি বা বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম নেই।[১০]

অস্ট্রেলিয়া থেকে ১৯৯৯ সালে দেশে ফেরার পর আমি আমার মেয়েদেরকে প্রথমে বাংলা মিডিয়াম স্কুলে ভর্তি করাতে চেষ্টা করে ব্যর্থ হই। পরে ন্যাশনাল কারিকুলাম ইংরেজি মিডিয়াম স্কুলে ভর্তি করাই। তাতেও তারা সুবিধা করতে পারেনি। তারপরে ও-লেভেল এ-লেভেল ব্রিটিশ কারিকুলামে ভর্তি করাই। যেহেতু তারা অস্ট্রেলিয়ায় ইংরেজি স্কুলে দু-তিন বছর পড়ে এসেছিল, সে কারণে হয়তো

---

১০. 'এশীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের র‍্যাংকিং, বাংলাদেশের অবস্থান লজ্জাজনক', *যুগান্তর*, ৬ জুন, ২০২০।

তারা ও-লেভেল এ-লেভেল কারিকুলামে ভালো করে। আমার বড় মেয়ে সবগুলো 'এ' পেয়ে ও-লেভেল এবং এ-লেভেল পাশ করে। ও-লেভেলে সে ইংরেজিতে বাংলাভাষী ছাত্র হয়েও ইংরেজি ভাষাভাষীদের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করে সর্বোচ্চ নম্বর পায়। এরপর আমার মেয়ে আমার কাছে জানতে চায়, সে যদি বিদেশে উচ্চশিক্ষার জন্য যায় তাহলে আমার আপত্তি আছে কিনা। আমি বলি, বিদেশে আন্ডারগ্রাড করার খরচ তো আমি যোগাড় করতে পারব বলে মনে হয় না। আর আন্ডারগ্রাডে স্কলারশিপ পাওয়া তো কঠিন ব্যাপার। মেয়ে বলে, আব্বু তুমি ঠিকই বলেছো। তবে আমি যদি স্কলারশিপ পাই তাহলে কি তুমি আমাকে যেতে দেবে? আমি বলি, হ্যাঁ মা, তাতে আমি আপত্তি করব কেন? দেখ তুমি চেষ্টা করে। এরপর মেয়ে স্যাট পরীক্ষায় ভালো স্কোর করে। শিকাগো, প্রিন্সটন এবং এমআইটিতে দরখাস্ত করে এবং এ-লেভেল পরীক্ষার রেজাল্ট বের হওয়ার আগেই সে ম্যাসাচুসেটস ইন্সিটিটিউট অব টেকনলজি (এমআইটি)-তে আন্ডারগ্রাডে অ্যাডমিশন এবং স্কলারশিপ পেয়ে যায়। এতে সে খুবই খুশি হয় এবং আমরাও উৎফুল্ল হই। তার অফার লেটারে লিখে দেয়া হয়, এ ছাত্রীর কোনো ইংরেজি পরীক্ষা নেবার প্রয়োজন নেই। অথচ, আমার যে সব বন্ধু অস্ট্রেলিয়ায় ছেলেমেয়ের লেখাপড়ার অজুহাত দেখিয়ে থেকে গেছেন, তাদের ছেলেমেয়েরাও অনেকক্ষেত্রে এত ভালো বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হতে পারেনি। এ কথা ঠিক যে, দেশের সার্বিক লেখাপড়ার মানে ক্রমাবনতি ঘটছে। আবার এ কথাও সত্য যে, এ দেশে থেকেও চেষ্টা ও আগ্রহ থাকলে লেখাপড়ায় ভালো করা সম্ভব। আমার দুই মেয়েই তার প্রমাণ।

ওই সময় (২০০৮-২০০৯) আমেরিকা যাওয়ার ব্যাপারে এবং লেখাপড়া করতে যাওয়ার ব্যাপারেও বেশ কড়াকড়ি ছিল। বিশেষ করে টুইন টাওয়ার ট্রাজেডির পর থেকে যে কড়াকড়ি আরোপ করা হয়, তা তখনও শিথিল হয়নি। আমার কতিপয় পরিচিত জন আমাকে পরামর্শ দেন যে স্যাট থাকলেও আমার মেয়েকে টোফেল পরীক্ষা দেয়াবার জন্য। আমেরিকান অ্যামব্যাসী নাকি অনেককে টোফেল দিতে পরামর্শ দিয়েছে। এ পরামর্শটি সঠিক ছিল না। কিন্তু যেহেতু মেয়ে এ লেভেল পরীক্ষা দিয়ে বসে ছিল কাজেই আমি তাকে টোফেল পরীক্ষা দিতে উদ্বুদ্ধ করি। এক পর্যায়ে সে রাজি হয়। অনলাইনে ফর্ম পূরণ করতে পেমেন্টের জন্য আমার কোন ডুয়াল কারেন্সি ক্রেডিট কার্ড ছিল না। মেয়ের মেজো মামা তার কার্ড ব্যবহার করে মেয়ের টোফেলের ফর্ম পূরণ করে দেন। এক সময় টোফেল পরীক্ষার তারিখ পড়ে। কিন্তু পরীক্ষার আগেই সে অফার পেয়ে যায়। কাজেই সে আর পরীক্ষা দিতে চায় না। তার যুক্তি আছে। সে বলে আমার অফার লেটারে লেখা রয়েছে যে আমার কোন ল্যাঙ্গুয়েজ টেস্টের দরকার নেই। এখন খালি খালি আমি সময় নষ্ট করে পরীক্ষা দেব কেন? কিন্তু আমি তাকে বলি, মামনি তুমি পরীক্ষাটা দাও। দিলে অসুবিধা তো নেই। তোমার মামা টাকা দিলেন, এখন যদি তুমি পরীক্ষা না দাও তাহলে কেমন হয়। তা ছাড়া পরীক্ষাটা দিলে তো তোমার

একটা অভিজ্ঞতাও হবে। অনেক বলার পর সে এক শর্তে রাজী হয়। তা হলো, ঢাকায় পরীক্ষা দিতে গেলে তাকে জামা জুতাসহ আরও অনেক কিছু কিনে দিতে হবে। আমি এ প্রস্তাবে সানন্দে রাজি হই। এ পরীক্ষার জন্য সে মোটেও প্রস্তুতি নেয়নি। তাকে নির্দিষ্ট দিনে ঢাকার পান্থপথের পরীক্ষা কেন্দ্রে বসিয়ে দিয়ে আমি এক ছাত্রকে পেয়ে তাকে নিয়ে বসুন্ধরা শপিং মলে সময় কাটাই। পরীক্ষার পর তাকে জিজ্ঞেস করি, তোমার পরীক্ষা কেমন হয়েছে? সে বলে অনলাইনের পরীক্ষা অনেকটা ভিডিও গেম খেলার মতো, হয়েছে এক রকম। বললাম কত নম্বর পেতে পারো। সে বলল, পাশের আপুকে জিজ্ঞেস করেছিলাম যে কত পেলে মোটামুটি ভালো স্কোর ধরা হয়। তিনি বললেন, ১০০-এর ওপরে পেতে হবে। তখন (২০০৮ সাল) ১২০ নম্বরের মধ্যে পরীক্ষা হত। আমি বললাম তুমি কত পাবে। সে বলল, সময়ের ব্যাপার আছে, প্রাকটিস না করায় আমার একটু ভুল হয়েছে। দেখা যাক। পরে দেখা গেল সে ১২০ নম্বরের মধ্যে ১১৭ নম্বর পেয়েছে।

এবার আমার স্ত্রী বস্টনে নতুন জায়গায় মেয়েকে সঙ্গে করে নিয়ে গিয়ে পৌঁছে দিতে অনুরোধ করেন। মায়ের মন। যে মেয়ে কোনদিন একাকী বিদেশে যায়নি, তাকে সে আমেরিকায় একা যেতে দিতে চায়নি। আমিও ভাবি, আমার সঙ্গে যাওয়া হয়ত ঠিক হবে। কিন্তু আমাদের মেয়ে বাদ সাধে। বলে আব্বু, তুমি গেলে অকারণে ২-৩ লাখ টাকা খরচ হবে। বস্টনের লোগান এয়ারপোর্ট থেকে আমার ক্যাম্পাস মাত্র ২০ মিনিটের ড্রাইভ। আমাকে রিসিভ করার জন্য এয়ারপোর্টে লোক থাকবে। আর না থাকলেও আমি একটি ট্যাক্সি নিয়ে চলে যেতে পারব। তুমি বরং আমাকে ঢাকা পর্যন্ত গিয়ে বিমান তুলে দিও। আমরা মন খারাপ করলেও ওর যুক্তি মেনে নিলাম। ওর কাপড়চোপড় থেকে শুরু করে সব কিছু কেনাকাটা করে বিমানবন্দরে গিয়ে আমরা আল্লাহর ওপর ভরসা করে ওকে বিমানে তুলে দিলাম। ইতিমধ্যে ও আমাদেরকে ওর হোস্টেলের রুমের ফোন নম্বর এবং সম্ভাব্য কোন সময়ে সে পৌঁছতে পারে সে সব লিখে দিল। ওর বস্টনে পৌঁছার অনেক আগেই আমরা ল্যান্ডলাইনে ওর ফোন পেয়ে অবাক হলাম। ও আমাদেরকে জানাল যে, সে সঠিক সময়ে নিউইয়র্কে পৌঁছেছে। কিন্তু নিউইয়র্ক থেকে আবহাওয়াজনিত কারণে বিমান ছাড়তে কয়েক ঘন্টা দেরি হচ্ছে। আমরা সময়মত ফোন করে যদি ওকে না পেয়ে যাতে দুশ্চিন্তা না করি সে জন্য ও ফোন করেছে। আমি একটু অবাক হয়ে বললাম তোমার কাছে তো কয়েন নেই, ফোন করলে কিভাবে? সে বলল, এয়ালাইনের কর্মবকর্তাদের সঙ্গে কথা বলেছি যে আমার অভিভাবকরা দুশ্চিন্তা করবে আমাকে ফোন করতে দাও তাদেরকে জানিয়ে দেই যে তোমাদের বিমান লেট করছে। তারা আমাকে ফোন করতে দিয়েছে। আমি আমার স্ত্রীকে বললাম, তুমি ওর ব্যাপারে নিশ্চিন্ত থাকতে পারো। যে মেয়ে নিজের বুদ্ধিতে এ বয়সে এতটুকু করতে পেরেছে, তার আর বিদেশের মাটিতে চলাফেরায় অসুবিধা হবে না। পরে সে হোস্টেলে পৌঁছে আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করলে আমরা নিশ্চিন্ত হই।

কাজেই বাংলাদেশে থেকে যে ছেলেমেয়েরা লেখাপড়ায় উন্নতি করতে পারবে না এমন ধারণা ভুল। বাংলাদেশে থেকে লেখাপড়া করে অনেক ছেলেমেয়ে যথেষ্ট ভালো করছে। অবশ্য এ কথা ঠিক যে তাদের সংখ্যা বেশি নয়। এখানে কষ্ট অনেক বেশি করতে হয় এবং সুযোগ সুবিধা অনেক কম পাওয়া যায়। বিশেষ করে যে সব ছেলেমেয়েরা মফস্বল শহরে থাকে, তাদের অনেক অসুবিধা হয়। তবে ইচ্ছা থাকলে যে এ দেশ থেকেও ভালো করা যায় তার উদাহরণও রয়েছে। আমাদের বড় মেয়ে দ্বীনি ফাতিহা এমআইটি থেকে ইঞ্জিনিয়ারিং করে বছর দুয়েক একটি বড় কোম্পানীতে রিসার্চ ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে কাজ করার পর হার্ভার্ড ইউনিভার্সিটি থেকে এমবিএ করে। পরে একটি বড় কোম্পানিতে সলিউশন আর্কিটেক্ট, প্রোডাক্ট ম্যানেজার, প্রভৃতিসহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে সান্ফ্রানসিসকোতে কাজ করে। এই অভিজ্ঞতা দিয়ে সে পরে আবারও চাকুরি পরিবর্তন করে গুগলের ডিপমাইন্ডে প্রোডাক্ট ম্যানেজার হিসেবে কাজে যোগ দেয়। ছোটজন কারিশমা ফাতিহা বাংলাদেশের নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মার্কেটিং এ বিবিএ করে একটি সোলার এনার্জি প্রডিউসিং কোম্পানীতে ম্যানেজার হিসেবে কাজ করে। পরে সে ওই কাজ ছেড়ে দিয়ে বাংলাদেশ লিগ্যাল এইড অ্যান্ড সার্ভিসেস ট্রাস্ট (ব্লাস্ট)-এর একটি ইউএন ফান্ডেড প্রজেক্টে প্রজেক্ট কোঅর্ডিনেটর হিসেবে চাকুরি করছে এবং বিদেশি বিশ্ববিদ্যালয়ে এমবিএ করার পরিকল্পনায় আছে। সেজন্য অস্ট্রেলিয়ায় না থেকে যে তারা লেখাপড়ায় পিছিয়ে পড়েছে এমনটি বলা যাবে না। কাজেই যারা কেবল ছেলেমেয়ের ভবিষ্যৎ চিন্তা করে বিদেশে থেকে যেতে চান, তাঁদের যুক্তি কতটা গ্রহণযোগ্য তা নিয়ে ভাবার আছে। কেবল ছেলেমেয়ের ভবিষ্যৎ নিয়ে বেশি ভাবলে আবার সমাজের প্রতি ও দেশের প্রতি দায়বদ্ধতার জায়গাটি দুর্বল হয়ে পড়ে। পরবর্তী অধ্যায়ে আমেরিকার খ্যাতিমান বিশ্ববিদ্যালয়ের লেখাপড়াসহ আমার একাধিকবার আমেরিকা সফরের অভিজ্ঞতা উপস্থাপন করব।

পাঁচ
আমেরিকা সফরের অভিজ্ঞতা

এ অধ্যায়ে তিনবার আমেরিকা সফরের অভিজ্ঞতা উপস্থাপন করা হবে। এ তিনটি ছোট ছোট সফরের মধ্য দিয়ে আমেরিকার মত বড় দেশের সমাজ ও রাজনীতিকে বুঝে ফেলা সম্ভব এমনটা দাবি করব না। তবে একটি দেশ সফরের অবশ্যই গুরুত্ব আছে। নতুন একটি দেশে গেলে এবং সে দেশের মানুষের সঙ্গে মেলামেশার সুযোগ পেলে যে নতুন অভিজ্ঞতা অর্জন করা সম্ভব হয় সে কথা অস্বীকার করা যায় না। উল্লেখ্য, আলোচ্য সবকটি সফরের আলোচনায় একাডেমিক বিষয় প্রাধান্য পাবে।

প্রথম আমেরিকা সফর

বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক হিসেবে এ পর্যন্ত যে তিনবার আমেরিকা যাবার সুযোগ হয়েছে তার মধ্যে প্রথমবার ওয়াশিংটন ডিসির স্টেট ডিপার্টমেন্টের আমন্ত্রণে অতিথি হিসেবে এবং পরের দু'বার ব্যক্তিগত উদ্যোগে আমেরিকা সফর করেছি। প্রতিটি সফরে প্রায় তিন সপ্তাহ করে আমেরিকায় অবস্থান করি। এ তিনবার আমেরিকা গমন এবং সেখানে কয়েক সপ্তাহ করে থাকার সুযোগ পেয়ে ওই সমাজ ও শিক্ষা কার্যক্রমের কিছু কিছু দিক পর্যবেক্ষণের সুযোগ পাই। প্রথমবার আমেরিকা যাই ২০০২ সালের সেপেটম্বর মাসে। আর দ্বিতীয় ও তৃতীয়বার যাই যথাক্রমে ২০১৭ সালের আগস্ট এবং ২০১৮ সালের মে মাসে। এ তিন সফরের অভিজ্ঞতার সবকিছু মনে রাখতে পারিনি। যতটা মনে আছে তার কিছু অংশ এখানে তুলে ধরব। ২০০২ সালের ঘটনা এত বছর পরে লিখতে গিয়ে অনেক কিছু স্মরণ করা কঠিন। তবু কিছু কিছু ঘটনা যা স্পষ্টভাবে মনে আছে সেগুলো অন্যদের জন্য বলা যায়।

আইভিপি প্রোগ্রামে অংশগ্রহণ

আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের স্টেট ডিপার্টমেন্টের ব্যুরো অব এডুকেশনাল অ্যান্ড কালচারাল অ্যাফেয়ার্স এর ইনটারন্যাশনাল ভিজিটরস প্রোগ্রাম (আইভিপি)-এ যোগদানের সুযোগ পাওয়া আমার জন্য ছিল অপ্রত্যাশিত ঘটনা। এজন্য আমাকে কিছু করতে হয়নি। ঢাকাস্থ আমেরিকান সেন্টারের একজন অফিসার ফোন করে আইভিপি প্রোগ্রামে অংশগ্রহণের জন্য আমার নাম প্রাথমিকভাবে বিবেচনার প্রস্তাব

করলে আমার কোনো আপত্তি থাকবে কিনা জানতে চান। আমি রাজি হলে তাঁরা আমার নাম প্রস্তাব করলে নানা রকম পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেয়া হবে বলে আমাকে জানানো হয়। সেক্ষেত্রে আমাকে তিন সপ্তাহের জন্য আমেরিকায় যেতে হবে। এভাবে এ প্রোগ্রাম সম্পর্কিত প্রাথমিক ধারণা দিয়ে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা এ বিষয়ে আমার কোনো আপত্তি বা জিজ্ঞাসা আছে কিনা জানতে চান। আমি তাকে মাত্র একটি জিজ্ঞাসা করি। তা হলো, এ প্রোগ্রামের যাবতীয় খরচ বহন করবে কে? তিনি জানান, আপনি যাবেন স্টেট ডিপার্টমেন্টের আমন্ত্রিত অতিথি হিসেবে এবং আপনার উদ্দেশ্য হবে গণতন্ত্র এবং আমেরিকার রাজনৈতিক প্রক্রিয়া সম্পর্কে ধারণালাভ করা। কাজেই এর যাবতীয় খরচ স্টেট ডিপার্টমেন্ট বহন করবে। এ কথা শুনে বলি, তাহলে আমার কোনো আপত্তি নেই। অফিসার আমাকে জানান, প্রায় দুই সপ্তাহ পর আমাকে এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত জানানো হবে। সিদ্ধান্ত ইতিবাচক হলে ২০০২ সালের সেপ্টেম্বর মাসে আমাকে এ প্রোগ্রামে অংশগ্রহণ করতে হবে। পরবর্তীতে আমাকে ইতিবাচক উত্তর দেয়া হয় এবং আমার সঙ্গে অচিরেই আবারও যোগাযোগ করার কথা বলা হয়। আগস্ট মাসে আমাকে জানানো হয়, আমেরিকান সেন্টারের ডিরেক্টর মহোদয় আমরা যারা আলোচ্য প্রোগ্রামের জন্য নির্বাচিত হয়েছি, তাদেরকে একদিন লাঞ্চে নিমন্ত্রণ করতে চান। এ লক্ষে আমাদেরকে সুনির্দিষ্ট সময়ে ঢাকার বনানীস্থ আমেরিকান সেন্টারে উপস্থিত হতে অনুরোধ করা হয়। যথাসময়ে হাজির হলে আমাদেরকে গুলশানের একটি রেস্টুরেন্টে নিয়ে যাওয়া হয়। এ লাঞ্চের আসল উদ্দেশ্য ছিল এ প্রোগ্রাম সম্বন্ধে আমাদেরকে অবহিত করা। ডিরেক্টর মহোদয় পেশাদারিত্বের সঙ্গে সে কাজ করেন। আমেরিকা যাবার পর আমরা কোন কোন শহরে যাব এবং কি ধরনের প্রোগ্রামে অংশগ্রহণ করব সে সম্পর্কে তিনি আমাদেরকে বিস্তারিতভাবে জানান। পরে এ বিষয়ে আমাদের মতামত চাওয়া হয়।

আমি তাকে জিজ্ঞেস করি, আমরা যদি এ প্রোগ্রামে কিছু রদবদলের পরামর্শ দেই, বা নতুন কিছু যোগ করতে অনুরোধ করি, তাহলে আপনি কি তা করতে পারবেন? তিনি বলেন, না তিনি এ প্রোগ্রাম পরিবর্তন করতে পারবেন না। কারণ, এটি ওয়াশিংটন ডিসি থেকে ডিজাইন করা হয়েছে। তবে তিনি নিঃসঙ্কোচে আমাদেরকে মতামত দিতে অনুরোধ করে এ নিশ্চয়তা দেন, আমাদের মতামত তিনি সযত্নে ওয়াশিংটন ডিসির সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে অবহিত করবেন। এ নিশ্চয়তা পেয়ে আমি দুটি পরামর্শ দেই। প্রথমে বলি, আমরা আমেরিকার মাননীয় প্রেসিডেন্টের সঙ্গে একটি সাক্ষাত চাই। এ কথা বলার পর সবাই একটু নড়েচড়ে বসেন। ডিরেক্টর মহোদয় বলেন, আমেরিকার প্রেসিডেন্টের অত্যন্ত ব্যস্ত সিডিউল থাকে। তার সঙ্গে আপনি কেন দেখা করতে চান? আমি বলি দেখুন, আমেরিকার প্রেসিডেন্ট অত্যন্ত ক্ষমতাধর ব্যক্তিত্ব। আমরা আমেরিকার সরকার ও রাজনীতি সম্পর্কে ছাত্রদের পাঠদান করি। কাজেই আমরা যদি তাঁর সঙ্গে দেখা করতে পারি সেটা আমাদের জন্য হবে সম্মানের ব্যাপার। আমরা তাঁকে সরাসরি প্রশ্ন করতে

পারব। তাঁর কাছে আমরা মধ্যপ্রাচ্য সঙ্কট, সন্ত্রাস মোকাবেলা প্রভৃতি বিষয়ে আমেরিকার পলিসি ও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা সম্পর্কে জানতে চাইতে পারব। তার মতামত পরে আমরা ক্লাসরুমে ছাত্রছাত্রীদের জানাতে পারব। আমার দ্বিতীয় পরামর্শ ছিল, নির্ধারিত ওয়াশিংটন প্রোগ্রামের সঙ্গে নতুনভাবে ন্যাশনাল ডেমোক্রাটিক ইনস্টিটিউট ফর ইন্টারন্যাশনাল অ্যাফেয়ার্স (এনডিআই) এর সঙ্গে একটি অ্যাপয়েন্টমেন্ট যোগ করা। ডিরেক্টর মহোদয় এনডিআই-এর সঙ্গে অ্যাপয়েন্টমেন্ট চাইবার কারণ জানতে চাইলেন। আমি একটি সুনির্দিষ্ট তারিখ উল্লেখ করে বলি, ওইদিন আমাদের সম্মানিত বিরোধীদলীয় নেত্রী বঙ্গবন্ধুকন্যা শেখ হাসিনার সঙ্গে এনডিআই হেডকোয়ার্টারে একটি বৈঠক হয়েছিল। এ গুরুত্বপূর্ণ সংবাদটি কোনো মিডিয়া প্রচার করেনি। আমি এনডিআই কর্মকর্তাদের কাছে জানতে চাইবো যে ওই বৈঠকে তারা কি বিষয়ে আলোচনা করেছিলেন। তাছাড়া এনডিআই বাংলাদেশে ভবিষ্যতে কি রকম কাজকর্ম করবে সে সম্পর্কেও জানতে চাইবো। ডিরেক্টর মহোদয় আমার বক্তব্যের নোট নেন।

ওয়াশিংটন যাত্রা

আমাদের ভিসা করিয়ে দেবার জন্য পাসপোর্ট জমা দিতে বলা হয় এবং যাবার কয়েকদিন আগে পাসপোর্ট সংগ্রহ করার সময় হাতখরচ হিসেবে কিছু ক্যাশ ডলার দেয়া হয়। আমরা পাঁচজন শিক্ষক ঢাকা থেকে ২০০২ সালের ৭ সেপ্টেম্বর ওয়াশিংটনের উদ্দেশ্যে তিন সপ্তাহের জন্য রওনা হই।[১১] আমাদের বিমান যাত্রার রুট ছিল ঢাকা-হিথরো-ওয়াশিংটন। ৭ সেপ্টেম্বর সন্ধ্যায় আমরা ওয়াশিংটন পৌঁছি। হোমউড সুইটস হোটেলে আমাদের থাকার ব্যবস্থা করা ছিল। রাতে খাওয়াদাওয়া করে আমরা বিশ্রাম করি। পরদিন ৮ সেপ্টেম্বর আমেরিকার সমাজ, রাজনীতি ও সংস্কৃতি অনুধাবন করাবার লক্ষ্যে আমাদের জন্য নির্ধারিত ছিল ওয়াশিংটন ট্যুর। ট্যামি ম্যারিনাক ছিলেন আমাদের ট্যুর ডিরেক্টর। তিনি আমাদেরকে ওয়াশিংটনের বিভিন্ন প্রণিধানযোগ্য স্থাপনা ঘুরিয়ে দেখান। এ সময় তিনি আমেরিকার সাংবিধানিক গণতন্ত্র, যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা, ক্ষমতার পৃথকীকরণ, রাজনৈতিক প্রক্রিয়া, প্রভৃতি বিষয়ে আমাদেরকে প্রাথমিক ধারণা দেন। ওয়াশিংটন মিউজিয়াম, হোয়াইট হাউস, লাইব্রেরি অব কংগ্রেস, ওয়াশিংটন মনুমেন্ট, ভিয়েতনাম মেমোরিয়াল, আমেরিকান সুপ্রিম কোর্টসহ বড় বড় স্থাপনা ঘুরিয়ে দেখান। এতদিন যে সব বিষয় আমরা বই পুস্তকে পড়েছিলাম, এখন সে সব

১১. বাকি ৪ জন শিক্ষক ছিলেন জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের অধ্যাপক ড. তারেক শামসুর রেহমান, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের সহকারী অধ্যাপক ও প্রভাষক যথাক্রমে জনাব আমরান হোসাইন এবং জনাব শরীফুল ইসলাম এবং রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের সহকারী অধ্যাপক জনাব তারেক নূর।

জায়গা ও স্থাপনা দেখে আমরা বাস্তব জ্ঞান লাভ করি (হোয়াইট হাউসের কাছে আইভিপি টিম সদস্যদের ছবির জন্য দেখুন পরিশিষ্ট- ৫:১)।

আমেরিকা এক যুগেরও বেশি সময় যুদ্ধ করেও ভিয়েতনামকে পরাজিত করতে পারেনি। এ দীর্ঘমেয়াদি যুদ্ধে আমেরিকার অসংখ্য সেনাসদস্য নিহত হন। যুদ্ধের অবসান হলে আমেরিকা সরকার ওয়াশিংটনে স্যান্ড স্টোন দিয়ে ভিয়েতনাম স্কয়্যার নাম দিয়ে একটি সুদৃশ্য মেমোরিয়াল তৈরি করে। এটি দীর্ঘ একটি দেয়াল যেখানে ভিয়েতনাম যুদ্ধে নিহত প্রতিটি সৈনিকের নাম খোদাই করে লেখা রয়েছে। নিহত সৈনিকদের নিকটাত্মীয়রা এ মেমোরিয়ালে এসে তাদের নিকটজনের স্মৃতি স্মরণ করেন। অনেকে সেখানে ফুল দেন। আমরা যখন এ মনুমেন্ট পরিদর্শন করি তখনও কয়েকজন আমেরিকান মনুমেন্টের পাদদেশে ফুল দিয়ে তাদের নিহত আত্মীয়স্বজনদের জন্য প্রার্থনা করছিলেন। ভিয়েতনাম মেমোরিয়াল দেখে আমার নিজ দেশের বিশৃঙ্খলার কথা মনে পড়ে। আমরা যদি এ ভাবে আমাদের দেশের মহান মুক্তিযুদ্ধের শহীদদের নাম ধরে রাখতে পারতাম তাহলে কতই না ভালো হত। আমরা মুক্তিযুদ্ধে শহীদদের একটি গ্রহণযোগ্য তালিকা তৈরি করতে পারিনি। পাঁচবার মুক্তিযোদ্ধাদের তালিকা করা হয়েছে, যা নিয়ে বিতর্ক রয়েছে। ষষ্ঠ তালিকা প্রণয়নের কাজ ২০২০ সালেও শেষ হয়নি। এককে সরকারের সময় এ তালিকা থেকে কিছু নাম বাদ পড়ে, আবার অনেক নতুন নাম অন্তর্ভুক্ত হয়। আমরা আমেরিকানদের মত এ ক্ষেত্রে শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করতে পারিনি। ৯ সেপ্টেম্বর, ডিপার্টমেন্ট অব স্টেট এবং ইন্সটিটিউট অব ইন্টারন্যাশনাল এডুকেশন যৌথভাবে আমাদেরকে স্বাগত জানায়। আমাদের টিম লিডার ছিলেন একজন জাপানি আমেরিকান, মার্শা ওসিমা। স্টেট ডিপার্টমেন্টের সিনিয়র প্রোগ্রাম অফিসার অ্যালিস শিফলেট এ অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য দেন। এ পেশাদার কর্মকর্তার বক্তব্য শুনে আমি বুঝতে পারি যে এরা কত আন্তরিকতার সঙ্গে কাজ করেন এবং এরা আমাদের প্রতি কতটা দায়িত্বপরায়ন।

স্মর্তব্য, ঢাকায় আমেরিকান সেন্টারের ডিরেক্টরের সঙ্গে লাঞ্চ করাকালীন আমার দেয়া দুটি পরামর্শের কথা আমি ভুলে গিয়েছিলাম। কিন্তু স্বাগত বক্তব্যে ঠিকই অ্যালিস সে প্রসঙ্গ উত্থাপন করেন। বলেন, 'আমরা খুবই দুঃখিত যে আপনাদের অনুরোধ অনুযায়ী আমরা চেষ্টা করেও আমেরিকার প্রেসিডেন্টের সঙ্গে অ্যাপয়েন্টমেন্ট পাইনি। আপনারা নিশ্চয়ই জানেন যে আমেরিকার প্রেসিডেন্টের ব্যস্ততা কত বেশি। তবে আপনাদের জন্য একটি সুখবর আছে। প্রেসিডেন্টকে হোয়াইট হাউসে আইন প্রণয়নের বিষয়ে সহায়তাকারী একজন উচ্চপদস্থ এবং অভিজ্ঞ কর্মকর্তার সঙ্গে আমরা আপনাদের জন্য একটি অ্যাপয়েন্টমেন্টের ব্যবস্থা করতে পেরেছি। প্রেসিডেন্টকে আপনারা যে সব প্রশ্ন করতে চেয়েছিলেন, ইনি সে সব প্রশ্নের উত্তর দিতে পারবেন। তবে তিনি কিন্তু সম্মানিত প্রেসিডেন্টকে প্রতিনিধিত্ব করবেন না। তবে আপনারা এ অ্যাপয়েন্টমেন্ট চাননি। কাজেই চাইলে আপনারা এটি বাতিল করতে পারেন, অথবা গ্রহণও করতে পারেন। আমরা

অ্যালিসকে আমাদের অনুরোধ গুরুত্ব দেয়ায় ধন্যবাদ জানাই এবং ওই অ্যাপয়েন্টমেন্ট বহাল রাখতে অনুরোধ করি। অ্যালিস আরও জানান, আপনাদের অনুরোধ অনুযায়ী আমরা এনডিআই এর সঙ্গে একটা অ্যাপয়েন্টমেন্টের জন্য চেষ্টা অব্যাহত রেখেছি। আগামী ২৪ ঘন্টার মধ্যে আমরা জানতে পারব যে তারা আমাদেরকে সময় দিতে পারবে কিনা।

ইন্টারন্যাশনাল ভিজিটরস প্রোগ্রামটি যে কত গুরুত্বপূর্ণ এবং সম্মানজনক প্রোগ্রাম তা আমরা অ্যালিসের বক্তব্য থেকে অনুধাবন করতে পারি। বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন ক্ষেত্রের গুরুত্বপূর্ণ নেতা ও ব্যক্তিত্বকে এই প্রোগ্রামে বিভিন্ন সময় আমন্ত্রণ জানানো হয়। ওই সময় পর্যন্ত (সেপ্টেম্বর, ২০০২) ১৮৬ জন বর্তমান ও সাবেক রাষ্ট্রপ্রধান, ১,৫০০ জন বিভিন্ন দেশের মন্ত্রী এবং আরো অনেক গুরুত্বপূর্ণ সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ের বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব এ প্রোগ্রামে যোগদান করেন। ওয়াশিংটনে ১০ তারিখে আমরা আমেরিকান ইউনিভার্সিটির স্কুল অব পাবলিক অ্যাফেয়ার্স পরিদর্শন করি। সহযোগী অধ্যাপক ড. ডেভিড লুবিনের সঙ্গে আমাদের পূর্ব-নির্ধারিত অ্যাপয়েন্টমেন্ট ছিল। ড. লুবিন আমেরিকার নির্বাচনী বিষয় সম্পর্কে অভিজ্ঞ। তা ছাড়া আমরা যেসব রাজ্যে যাব ওই সব রাজ্য সম্পর্কে ড. লুবিন ভালো ধারণা রাখেন। লুবিনের একাডেমিক প্রকাশনা তালিকা দেখে আমি অবাক হই। তার সঙ্গে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনার এক ফাঁকে বলি, আপনি কি রাতে ঘুমান না? তিনি প্রথমে প্রশ্নটি বুঝতে না পেরে আমার দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকান। বললাম, আপনার প্রকাশনা তালিকায় যত সংখ্যক বই এবং গবেষণামূলক লেখালেখি দেখছি তাতে আমি আশ্চর্য না হয়ে পারছি না। এতসংখ্যক লেখালেখি ও প্রকাশনা করলে তো আপনার রাতে ঘুমাবার সময় পাবার কথা নয়। এবার তিনি বুঝতে পেরে মুচকি হেসে বললেন, আমেরিকায় শিক্ষকতায় টিকে থাকতে এবং উন্নতি করতে হলে গবেষণা ও প্রকাশনা করার কোনো বিকল্প নেই। তার কথা শুনে আমি বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকদের লেখালেখি ও গবেষণার হাল চিন্তা করে ব্যথিত হলাম। একই দিন আমরা ইলিনয় থেকে নির্বাচিত ডেমোক্রাট দলীয় কংগ্রেসম্যান লেন ইভান্সের অফিস এবং বিকালে রিপাবলিকান ন্যাশনাল কমিটির কার্যালয় পরিদর্শন করি। ১১ তারিখে আমাদের সঙ্গে স্টেট ডিপার্টমেন্টের বাংলাদেশ ডেস্ক অফিসার টড হোলস্ট্রমের একটি বৈঠক হয়। বাংলাদেশের প্রতি আমেরিকান পলিসি সম্পর্কে টড আমাদের ধারণা দেন এবং সাম্প্রতিক নীতি নির্ধারণী পর্যায়ে যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার কোন্ কোন্ বিষয়ে অগ্রাধিকার দিচ্ছে সে বিষয়েও আমাদের সাথে আলোচনা করেন। পরে আরেক বৈঠকে নর্দার্ন ভার্জিনিয়া রিপাবলিকান পলিটিক্যাল অ্যাকশন কমিটি ও এ কমিটির কার্যক্রম সম্পর্কে আমাদেরকে এর চেয়ারম্যান জেমস পারমেলে ধারণা দেন। এ ছাড়া পার্টি অ্যাকশন কমিটির লোকাল-ন্যাশনাল সম্পর্ক, তহবিল সংগ্রহ, প্রভৃতি বিষয়ে আমাদের সঙ্গে তাঁর খোলামেলা আলোচনা হয়।

পরদিন ১২ সেপ্টেম্বর আমরা ওয়াশিংটনের গুরুত্বপূর্ণ তিনটি প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন করি। সকালে আমরা অফিস অব ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড বাজেট (ওএমবি)

পরিদর্শনে গিয়ে লেজিসলেটিভ এটর্নি জেফরি ওয়েনবার্গের সাথে বৈঠক করি। মি. ওয়েনবার্গ জর্জ ওয়াশিংটন ইউনিভার্সিটিতে শিক্ষকতাও করেন। তিনি নির্বাহী বিভাগের সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়া এবং কংগ্রেস ও প্রেসিডেন্টের মধ্যে সংঘটিত এ সম্পর্কিত কর্মভঙ্গিমা সম্পর্কে আমাদেরকে ধারণা দিতে চেষ্টা করেন। ওএমবি অফিস প্রেসিডেন্টের বাৎসরিক বাজেট তৈরি করে। এ ছাড়া ওএমবি বাজেট প্রশাসন এবং এ সম্পর্কিত সরকারি নীতিমালা পর্যালোচনা করে। বিষয়গুলো বেশ টেকনিক্যাল হওয়ায় মি. ওয়েনবার্গকে আমরা খুব বেশি প্রশ্ন করিনি। এরপর আমরা আমেরিকার সুপ্রিম কোর্ট ট্যুরে অংশগ্রহণ করি। সুপ্রিম কোর্টের নিরাপত্তা ব্যবস্থা খুবই জোরালো। আমাদেরকে পাসপোর্ট নিয়ে যেতে বলা হয়। সুপ্রিম কোর্টের ফেলো লরি ফেনার সুপ্রীমকোর্টের বিচার বিভাগীয় পর্যালোচনা ক্ষমতা এবং এর চর্চা সম্পর্কে আমাদেরকে অবহিত করেন। সরকারের তৃতীয় শাখা হিসেবে সুপ্রিম কোর্টের ভূমিকা এবং কেন্দ্রীয় সরকার এবং রাষ্ট্রীয় সরকারগুলোর মধ্যে সৃষ্ট বিরোধ নিরসনে সুপ্রিম কোর্টের ভূমিকা আমাদেরকে বুঝিয়ে দেন। বিকেলে আমরা ন্যাশনাল একাডেমি অব পাবলিক অ্যাডমিনিস্ট্রেশন পরিদর্শনে যাই। জনাব ক্রিস্টোফার ওয়াই সেখানে আমাদেরকে সরকারের সক্ষমতা বাড়াতে এ সংগঠনটির কর্মতৎপরতা ও ভূমিকার ওপর ধারণা দেন। পরদিন ১৩ তারিখে আমরা প্রথমে পরিদর্শন করি হেরিটেজ ফাউন্ডেশন। এ সংগঠনটি থিংক ট্যাংক হিসেবে আমেরিকার কেন্দ্রীয়, রাষ্ট্রীয় এবং স্থানীয় পর্যায়ে নীতি নির্ধারণে ভূমিকা পালন করে। টমাস হিনটন এবং মাইকেল ফ্রাঙ্ক এ সংগঠনের কার্যক্রম সম্পর্কে আমাদেরকে বিস্তারিত ধারণা দেন। এ সংগঠনটি আমাদের নাম ঠিকানা রেখে দেয় এবং আমরা দেশে আসার পরও এরা এদের বিভিন্ন কর্মকাণ্ড সম্পর্কে আমাদের ধারণা দেবার জন্য দীর্ঘদিন ডাকযোগে বিভিন্ন কাগজপত্র প্রেরণ করেন।

একই দিন বিকেলে আমরা অরাজনৈতিক ও অলাভজনক গবেষণা প্রতিষ্ঠান সেন্টার ফর রেসপন্সিভ পলিটিক্স পরিদর্শন করি। এ সংগঠনটি প্রধানত আমেরিকান আইনসভার ওপর, বিশেষ করে নির্বাচন এবং নির্বাচনে টাকার প্রভাব, নির্বাচনে গণমাধ্যমের প্রভাব ও কার্যক্রম প্রভৃতি বিষয় নিয়ে কাজ করে। এ সংগঠনের কার্যক্রম আমাদের কাছে তুলে ধরেন অনুসন্ধানী প্রতিবেদক ভিক্কি ক্রাটজ। এ ছাড়া ওয়াশিংটনে আমরা আর যেসব প্রতিষ্ঠানে যাই তার মধ্যে ছিল ন্যাশনাল সিকিউরিটি কাউন্সিলের অফিস অব লেজিসলেটিভ অ্যাফেয়ার্স, সিনেটের কমিটি অন গভর্নমেন্টাল অ্যাফেয়ার্স, ন্যাশনাল গভর্নরস অ্যাসোসিয়েশন এবং ন্যাশনাল ডেমোক্রাটিক ইন্সটিটিউট ফর ইন্টারন্যাশনাল অ্যাফেয়ার্স (এনডিআই)। এনডিআই-এর সাথে আমাদের কোনো পূর্ব-নির্ধারিত বৈঠক ছিল না। এটা আমাদের অনুরোধে করা হয়। এনডিআই বিভিন্ন দেশে গণতন্ত্রের শক্তিবৃদ্ধির জন্য কাজ করে। বাংলাদেশে ঢাকায় এর অফিস রয়েছে। আমরা যে কারণে এ আপয়েন্টমেন্ট চাই তা আগেই উল্লেখিত হয়েছে। সেজন্য আমরা এনডিআই পরিদর্শন করাকালীন তাদের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের কাছে জানতে চাই যে

বাংলাদেশের সম্মানিত বিরোধীদলীয় নেত্রীর সঙ্গে উল্লিখিত বৈঠকটি আদৌ হয়েছিল কিনা এবং হয়ে থাকলে সেখানে কি বিষয়ে আলোচনা করা হয়। এনডিআই থেকে স্বীকার করা হয় যে বৈঠকটি যথাসময়ে অনুষ্ঠিত হয়েছিল। এনডিআই প্রতিনিধিরা বলেন, এ প্রতিষ্ঠানটি বিশ্বের বিভিন্ন দেশে গণতান্ত্রিক উন্নয়নের জন্য কাজ করে। সেজন্য গণতান্ত্রিক বিশ্বের বিভিন্ন দেশের অনেক নেতা এনডিআইয়ের সঙ্গে আলোচনা করেন। কিভাবে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া শক্তিশালী করা যায় সে সম্পর্কে এনডিআই তাদের সঙ্গে আলোচনা করে। তাদেরকে অনেক সময় পরামর্শ দেয়। বাংলাদেশের সম্মানিত বিরোধীদলীয় নেত্রী এখানে আসলে আমরা তার সঙ্গেও এসব বিষয় নিয়ে আলোচনা করি। এক সপ্তাহের ওয়াশিংটন সফরে আমরা অনেক অভিজ্ঞতা অর্জন করি। বইপত্রে পড়া অনেক প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে জানা বিষয়গুলো আমরা সরাসরি চোখে দেখে বাস্তব ধারণা পাই।

সাউথ ক্যারোলিনা

সেপ্টেম্বরের ১৪ তারিখে আমরা ডেল্টা ডোমেস্টিক ফ্লাইটে ওয়াশিংটন থেকে আটলান্টা হয়ে সাউথ ক্যারোলিনার কলাম্বিয়া পৌঁছি। আমাদের থাকার ব্যবস্থা হয় গভর্নর্স হাউস বেস্ট ওয়েস্টার্ন হোটেলে। কলাম্বিয়ার প্রোগ্রামগুলো এমনভাবে সাজানো হয় যাতে আমরা স্টেট গভর্নমেন্ট কিভাবে কাজ করে সে ব্যাপারগুলো সহজে বুঝতে পারি। আমদেরকে স্থানীয় ডেমোক্রাট ও রিপাবলিকান দলের অফিস পরিদর্শন করানো হয়। আমেরিকার নির্বাচনী প্রতিযোগিতা ও নির্বাচনী প্রচারণা সম্পর্কেও আমরা ধারণা পাই। ১৪ থেকে ১৭ তারিখের মধ্যে আমরা অনেকগুলো কর্মসূচিতে যোগদান করি। এর মধ্যে আমরা ইউনিভার্সিটি অব সাউথ ক্যারোলিনার রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষকদের সঙ্গে মত বিনিময় করি। আমরা সাউথ ক্যারোলিনা স্টেট ইলেকশন কমিশন অফিস পরিদর্শন করি। এখানে আমাদেরকে স্টেট ও স্থানীয় পর্যায়ে কিভাবে নির্বাচন হয় তা জানানো হয়। যে মেশিনে ভোটগ্রহণ করা হয় ওই মেশিন এবং ভোটের দিন ব্যবহৃত কিছু দ্রব্যসামগ্রী দেখানো হয়। আমাদেরকে স্থানীয় বাসিন্দাদের বাড়িতে নিমন্ত্রণ করে ডিনারে আপ্যায়ন করা হয়। আমরা একটি প্রেসবাইটারিয়ান গীর্জা পরিদর্শন করে সানডে প্রেয়ার দেখি। গীর্জায় ফাদার নিমন্ত্রিত অতিথি হিসেবে আমাদেরকে পরিচয় করিয়ে দেন। প্রার্থনা শেষে অনেকে আমাদের সঙ্গে কুশল বিনিময় করেন। আমরাও তাদের সঙ্গে আলাপচারিতা করি। ফাদার আমাদেরকে গীর্জার সার্বিক কর্মকাণ্ড সম্পর্কে ধারণা দেন। আমাদের মসজিদের মত গীর্জায় কেবল উপাসনা হয় না। মানুষকে ধর্মীয় উপাসনায় আকৃষ্ট করতে তাদের রয়েছে বিভিন্ন রকম কর্মকাণ্ড। গীর্জা কর্তৃপক্ষ বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা দিয়ে মানুষকে গীর্জায় আনতে সচেষ্ট। এর মধ্যে রয়েছে ফ্রি বাইবেল ক্লাস। ফ্রি খাওয়া দাওয়া। ফ্রি ব্যায়াম করার সুযোগ এবং আরো অনেক কর্মকাণ্ড। এ সব কারণে গীর্জার বার্ষিক খরচও অনেক বেশি।

কলাম্বিয়ায় থাকাকালীন সাউথ ক্যারোলিনা বিশ্ববিদ্যালয়ের ওয়াকার ইন্সিটিটিউট অব ইন্টারন্যাশনাল স্টাডিজের আমন্ত্রণে আমরা 'বাংলাদেশে গণতন্ত্র, রাজনৈতিক সংস্কৃতি ও রাজনৈতিক অংশগ্রহণ' বিষয়ে একটি সেমিনার উপস্থাপনের সুযোগ পাই। এ সেমিনারে ইনস্টিটিউটের ফ্যাকাল্টি এবং স্থানীয় বাংলাদেশীদেরকে দাওয়াত দেয়া হয়। আমরা দু'তিনজন মিলে এ সেমিনার উপস্থাপন করি। অংশগ্রহণকারীগণ বাংলাদেশের সাংঘর্ষিক রাজনৈতিক সংস্কৃতি সম্পর্কে আমাদেরকে প্রশ্ন করেন। আমরা যখন এ সেমিনার সম্পর্কে জানতে পারি তখন আমি ভাবি, আমার লেখা *ইলেকটরাল করাপশন ইন বাংলাদেশ* বইটি সঙ্গে থাকলে এ সেমিনার দিতে আমার বেশ সহায়তা হত। বিশেষ করে নির্বাচন, ও নির্বাচনী সংস্কৃতি সম্পর্কে ওই বইয়ে আমি বিস্তারিতভাবে লিখেছিলাম। আমি যুক্তরাজ্য থেকে প্রকাশিত আমার এ বইয়ের প্রকাশককে হোটেল থেকে একটি ইমেইল দিয়ে আমার ঠিকানা উল্লেখ করে বলি যে সেমিনার উপস্থাপনার জন্য আমার এক কপি বই দরকার। সম্ভব হলে যেন সত্বর আমাকে বিনামূল্যে এককপি বই সরবরাহ করা হয়। প্রকাশনা সংস্থার (অ্যাশগেট পাবলিশিং লিমিটেড) পরিচালককে প্রেরিত ইমেইলটি প্রাপক স্টেশনে না থাকায় ফেরত আসে। তবে পরদিন আমি পূর্ব-নির্ধারিত প্রোগ্রাম সেরে বিকেলে হোটেলে ফিরে এসে রুমে ঢুকে দেখি আমার টেবিলের ওপর একটি প্যাকেট। বই চলে এসেছে। মাত্র কয়েক ঘন্টার মধ্যে এত দ্রুত কিভাবে বই পেলাম জানতে চাইলে আমাদের তত্ত্বাবধানকারী মিস্টার হার্বার্ট স্মিথ জানান, প্রকাশকের আমেরিকায় ওয়্যারহাউস আছে। তোমার প্রকাশক ওই ওয়্যারহাউসকে তাদের একজন লেখকের ঠিকানা বলে দিয়ে দ্রুত এককপি বই পাঠাতে বলায় তারা জরুরি কুরিয়ার সার্ভিসে পাঠিয়ে দেয়ায় তুমি এত দ্রুত বই পেয়েছ।

নিউ মেক্সিকো

কলাম্বিয়া থেকে ১৮ সেপ্টেম্বর আমরা ডেলটা ডমেস্টিক ফ্লাইটযোগে আটলান্টা ও ডেনভার হয়ে নিউ মেক্সিকোর সান্টা ফে পৌঁছি। সেখানে হিলটন অব সানটা ফে হোটেলে আমরা ১৮ থেকে ২২ তারিখ পর্যন্ত ছিলাম। এই হোটেলের সাজসজ্জা ও আসবাবপত্রে ছিল ভিন্ন রকম বৈচিত্রপূর্ণ শিল্পের ছোঁয়া। এটি এমন একটি শহর, যার উচ্চতা সমুদ্রবক্ষ থেকে ৭ হাজার ১৯৯ ফুট উচ্চ। শহরটির হোটেল থেকে শুরু করে সর্বত্রই শিল্পের ছোঁয়া। সারা শহরের রাস্তায় রাস্তায় চিত্রকর্মের গ্যালারি। এখানে আবারো আমরা আমাদের প্রোগ্রামগুলোর মধ্য দিয়ে স্টেট ও লোকাল গভর্নমেন্টের মধ্যকার সম্পর্ক ও কর্মভঙ্গিমা, ওয়াচডগ হিসেবে গণমাধ্যমের ভূমিকা, এনজিও কার্যক্রম এবং উপজাতীয় স্বাধীন সরকার সম্পর্কে ধারণা লাভ করি। আমরা নিউ মেক্সিকো স্টেট হাউস অব রিপ্রেজেন্টেটিভ কর্মকর্তা, থাউজেন্ট ফ্রেন্ডস অব নিউ মেক্সিকো নামের একটি এনজিও, একটি স্বাধীন ট্রাইবাল সরকারের গভর্নর পল সুয়াজো, দৈনিক পত্রিকা *দ্য নিউ মেক্সিকান*-এর ব্যবস্থাপনা

সম্পাদকসহ আরো অনেকের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করি। উপজাতীয় সরকার দেখতে গেলে আমাদেরকে তাদের নিজেদের তৈরি কাপড়ের হ্যাট উপহার দেয়া হয়। এই স্বাধীন ট্রাইবাল সরকারটির মূল আয় হয় একটি ক্যাসিনো থেকে। তাছাড়া এদের কিছু লোকজন বাইরে চাকরি করে কিছু উপার্জন করেন। আমরা বুঝতে পারি যে অজ গ্রামীণ এলাকায় বিদ্যুৎ থাকার কারণে কিভাবে হলিউড সংস্কৃতি স্থানীয় গ্রামবাসীর নিজস্ব ভাষা ও সংস্কৃতিকে বিকৃত করছে এবং ক্রমান্বয়ে স্থানীয় আদি বাসিন্দারা নিজেদের ভাষা ও সংস্কৃতি হারিয়ে ফেলছে। আমরা এ বিষয় নিয়ে সংশ্লিষ্টদের সঙ্গে কথা বলি। বুঝতে পারি যে তাদের মধ্যেও এ বিষয়ে উদ্বেগ রয়েছে।

ইলিনয়

সানটা ফে থেকে ১২ সেপ্টেম্বর আমরা গ্রেট লেকস এভিয়েশন ডমেস্টিক বিমানে চড়ে ডেনভার এবং ডেনভার থেকে ইউনাইটেড এয়ারলাইনস ডমেস্টিক ফ্লাইটযোগে দুপুর একটায় ইলিনয়ের শিকাগো বিমান বন্দরে অবতরণ করি। সেখান থেকে আমাদের স্টার্লিং শহরে যাবার কথা। শিকাগো বিমান বন্দর থেকে স্টার্লিং দুই ঘন্টার কার ড্রাইভ দূরত্বের পথ। এখানে হোটেলের পরিবর্তে আমেরিকার পারিবারিক জীবন সম্পর্কে ধারণালাভ করার জন্য আমাদের পাঁচজনের জন্য পাঁচটি আমেরিকান পরিবারের সঙ্গে থাকার ব্যবস্থা করা হয়। হলিডে ইন রক ফলস হোটেলে কেবলমাত্র আমাদের কেয়ারটেকার মিস্টার স্মিথের জন্য থাকার ব্যবস্থা ছিল। মিস্টার স্মিথ আমাদেরকে জানিয়ে দেন, আমরা যারা যে পরিবারের সঙ্গে থাকব, সে পরিবারের কেউ এসে আমাদেরকে বিমানবন্দরে রিসিভ করে তাদের বাসায় নিয়ে যাবেন। কি আর করা। এয়ারপের্টি থেকে বের হতেই দেখলাম একজন বয়স্ক মহিলা আমার নাম লেখা প্লাকার্ড ও একটি ছোট বাংলাদেশি পতাকা নিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছেন। আমি নাম পরিচয় দিতেই তিনি আমাকে বাংলাদেশি পতাকা নেড়ে স্বাগত জানালেন। এ ভদ্রমহিলার নাম অ্যান ওয়েনেন এডমন্ডস (অ্যানের ছবির জন্য দেখুন পরিশিষ্ট- ৫:২)। অ্যান আমার সঙ্গে কথা বলতে বলতে আমাকে তাঁর গাড়িতে উঠালেন। তারপর প্রশ্ন করতে করতে আর বাংলাদেশের কথা শুনতে শুনতে গাড়ি চালাতে থাকেন। কিছুদুর গেলে ঘরবাড়ি আর লোকজন কমে যায়। চারিপাশে ফাঁকা এবং মাইলের পর মাইল শস্যক্ষেত। প্রায় দু'ঘন্টা পর আমরা সটার্লিং শহরে পৌঁছলাম। শহরটি ছোট। লোকজন কম। রাস্তাঘাট ঝকঝকে। চারিদিকে সবুজের সমারোহ। একটি ছোট দোতলা বাড়ির সামনে অ্যান গাড়ি পার্ক করলেন। এ বাড়িতেই আমাকে চারদিন থাকতে হয়।

বাড়িটিতে সর্বমোট মানুষ থাকেন দু'জন। অ্যান এবং তাঁর স্বামী এলডর এডমন্ডস। এলডর একজন অবসরপ্রাপ্ত প্রকৌশলী। আর অ্যান একজন উচ্চশিক্ষিত মহিলা ও প্রতিষ্ঠিত কবি। তাঁর প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ রয়েছে। কাজেই দু'জনই উচ্চশিক্ষিত। এদের তিন সন্তানের সবাই বাইরে থাকেন। একজন থাকেন লন্ডন, আরেকজন তুরস্কে। তারা মাঝে-মধ্যে মা-বাবার খোঁজ নেন। বড়দিন এলে উপহার পাঠান। এই পর্যন্ত। সেজন্য এরা বড় একা। অ্যান কবিতা চর্চা করেন। তিনি পাক্ষিক সাহিত্য আসরে যান। আর এলডরের সময় কাটে বাড়ির পেছনে বাগান করে। ওই বাগানে তিনি টমেটো, কাঁচামরিচ ও সবজির চাষ করে সময় কাটান। আমাকে পেয়ে তাঁদের গল্প আর শেষ হয় না। অ্যান আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, আমি কয়েক ঘন্টার বিমান ভ্রমণ আর মোটরযাত্রার পর বেশি ক্লান্ত কিনা। আমি বললাম এ কথা জিজ্ঞেস করছেন কেন? তিনি বললেন, আগামী তিনদিনের তোমার যে সিডিউল দেখলাম তাতে আমরা বুঝতে পারছি যে তুমি খুবই ব্যস্ত থাকবে। আমরা তোমাকে পাব কেবল রাতে যখন তুমি থাকবে ক্লান্ত। কাজেই এখন যদি তুমি ক্লান্ত না হও, তাহলে আমি ভাবছি তোমাকে নিয়ে আবার বাইরে যাব এবং আমাদের ছোট শহর এবং বাড়ির আশপাশটা একটু ঘুরিয়ে দেখাব। আমি বললাম সেটা ভালো হবে। আমি ক্লান্ত নই। এ কথা শুনে তিনি আমাকে দোতলায় আমার ঘর দেখিয়ে দিলেন এবং ফ্রেশ হতে অনুরোধ করলেন। আমাকে দোতলায় নিয়ে একটি ঘর দেখিয়ে তিনি বললেন, আমরা তোমার জন্য এ ঘরটি ঠিক করেছি। তবে বাকি দুটো ঘরও তোমার। তুমি চাইলে সবগুলো ঘর ব্যবহার করতে পারো। কারণ, আমরা নীচের ঘরে ঘুমাই। আমি তাদেরকে ধন্যবাদ দিয়ে ঘরে ঢুকে আমার স্যুটকেস রাখলাম।

ঘরটি সুন্দর করে সাজানো। ধবধবে বিছানা। ছিমছাম ফার্নিচার। অতিথি রাজনীতিবিষয়ক শিক্ষক জেনে টেবিলে রাজনীতিবিষয়ক কিছু বই সাজিয়ে রাখা হয়েছে। আমি হাতমুখ ধুয়ে নীচে নামলাম এবং সামান্য জুস পান করে অ্যানের সঙ্গে আবার বাইরে বের হলাম। এবার তিনি ধীরে ধীরে গাড়ি চালালেন এবং আশেপাশের জায়গা এবং ইমারতগুলোর পরিচয় দিতে থাকলেন। মাঝে মাঝে তিনি গাড়ি থামিয়ে নামলেন এবং আমাকেও নামালেন। এভাবে একটি পার্কের কাছে এসে তিনি আবারো গাড়ি থামিয়ে নামলেন। আমাকে নিয়ে কিছুক্ষণ হাঁটলেন। পার্কে মাত্র কয়েকজন হাঁটাহাঁটি করছিলেন। তাদের দু'একজনকে ডেকে আমার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন। এভাবে ঘন্টাখনেক সময় কাটিয়ে আবার আমরা বাসায় ফিরে এলাম। এবার খাবার পালা। এরা ডিনার খান সন্ধার সময়। আমাকে নিয়ে তাঁরা ডাইনিং টেবিলে বসলেন। আমি বেশ কিছু আইটেম দেখলাম, কিন্তু কিছু ভাত এবং সবজি দেখে চমকৃত হয়ে জিজ্ঞেস করলাম, কি ব্যাপার আপনারা কি রাতে ভাত খান? তাঁরা বললেন, না তারা ভাত খান না। বাংলাদেশের খাদ্য অভ্যাস জানার পর তারা আমার জন্য ভাত এবং সবজির আয়োজন করেছেন। তবে তাঁরা সবজি রাঁধতে জানেন না। এক ভারতীয় প্রতিবেশিকে অনুরোধ করিয়ে এ সবজি রান্না করিয়েছেন। আমি বললাম, এর দরকার ছিল না। আমি তো অনেক বছর বিদেশে কাটিয়েছি। আপনাদের খাবার আমি স্বচ্ছন্দে খেতে পারতাম। আর আমার জন্য আরেকজন ভদ্রমহিলাকে কষ্ট

দেয়া ঠিক হয়নি। আমি খেতে খেতে বললাম, দয়া করে রাঁধুনি মহিলাকে বলবেন, তাঁর সবজিটা খুবই সুস্বাদু হয়েছে। আমার পক্ষ থেকে তাঁকে ধন্যবাদ জানিয়ে দিবেন। অ্যান বললেন, আমরা তাঁকে অকারণে খাটাইনি। প্রতিবছর সে আমাদের বাগানের মরিচ নেয়। আমরাও তাকে দেই। কারণ, আমরা কাঁচা মরিচ খাই না। এবার তুমি আসাতে সে সবজি রান্না করে প্রতিদান দেবার সুযোগ পেয়েছে। আমরা তাকে ধন্যবাদ দেব না। তবে তোমার সঙ্গে তার দেখা হবে। তখন তুমিই তাকে যা বলার বলতে পারবে। তবে খাবার টেবিলে একটাই সমস্যা ছিল। যে পরিমাণে ভাত টেবিলে রাখা ছিল তার সবটুকু আমি একা খেলেও আমার এক তৃতীয়াংশ ক্ষুধা মিটতো না। ভদ্রতা করে আমি সেখান থেকে পরিমাণ মতো ভাত নিয়ে বেশি করে সবজি খেলাম।

পরদিন সকাল থেকে ছকে বাঁধা প্রোগ্রাম। সকালে গাড়ি এসে আমাকে তুলে নিয়ে গেল। অন্য চারজন যে সব পরিবারে ছিলেন তাঁদের কাছ থেকেও ইতিবাচক আতিথেয়তার খবর জানলাম। এখানে থাকাকালীন আমরা স্টার্লিংসহ প্রতিবেশি রকফলস এবং ডিকসন শহর দেখলাম। এ ছাড়া আমরা স্টার্লিং শহরের মেয়র টেড এগেন, সিটি ম্যানেজার জে ওয়েল্যান্ড এবং রকফলসের সিটি ম্যানেজারের সঙ্গে বৈঠক করি। স্টার্লিং হাই স্কুলের দশম শ্রেণির সোস্যাল স্টাডিজ ক্লাসে উপস্থিত থেকে ওই ক্লাসের কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ করি। এ ছাড়া স্থানীয় পর্যায়ে রাজনৈতিক দলীয় তৎপরতা সম্পর্কে ধারণালাভ করি। সবগুলো প্রোগ্রামের আলোচনার বিষয়বস্তু মনে না থাকলেও প্রথম দিন মেয়রের সঙ্গে আমাদের আলোচনাটা ছিল উপভোগ্য। মেয়র আমাদেরকে কিছু হালকা উপহার দেন এবং স্বাগত জানিয়ে সূচনা বক্তব্য দেন। পরে আমরাও সে আলোচনায় অংশগ্রহণ করি। আমি তাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, তিনি কিভাবে মেয়র হয়েছেন। তিনি জানান, তিনি এলাকাবাসীর ভোটে নির্বাচিত মেয়র। তখন আমি প্রশ্ন করি, যে নির্বাচন জিতে তিনি মেয়র হয়েছেন ওই নির্বাচনে শতকরা কত ভাগ ভোট পড়েছিল? তিনি বলেন, মোট ভোটারের শতকরা ২৫ ভাগের মতো। আর তিনি পেয়েছেন প্রদত্ত ভোটের ৩৮ বা ৪০ ভাগ। আমি বলি, ভোটই পড়েছে মাত্র ২৫ ভাগ আর আপনি পেয়েছেন তার মধ্যে এক তৃতিয়াংশের কিছু বেশি। সেক্ষেত্রে বলা যায়, আপনি তো মাত্র ১০-১২% লোকের সমর্থন নিয়ে মেয়রের চেয়ারে বসেছেন। কাজেই আপনাকে গণতান্ত্রিক মেয়র বলা যাবে কিনা তা নিয়ে ভাবতে হবে। মেয়র হাস্যজ্জল মুখ নিষ্প্রভ করে বলেন, দেখুন আমাদের এলাকার মানুষ ভোট দিতে চান না। এ জন্য কম ভোট পড়ে। জানতে চাইলাম, নির্বাচনে অংশগ্রহণ বাড়াবার জন্য আপনারা কি করেছেন? তিনি বললেন, আমরা যে কিছু করি নাই তা নয়। আমরা ভোটারদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে দরজার বেল টিপে ভোট দিতে তাদের অনুরোধ করি। লিফলেট বিতরণ করি। আরও নানাভাবে ভোটারদেরকে ভোটকেন্দ্রে যেতে উৎসাহ দেই। তারপরও মানুষ ভোটকেন্দ্রে আসতে চান না। আমি তখন আমাদের দেশের স্থানীয় সরকার নির্বাচন সম্পর্কে তাদেরকে সংক্ষিপ্ত ধারণা দেই।

বাংলাদেশে মানুষ ভোটকে কিভাবে উৎসবের মত উপভোগ করেন এবং নির্বাচন এলে মিছিল মিটিংয়ে কিভাবে ঝাঁপিয়ে পড়েন সে সম্পর্কে তাঁদেরকে বলি। মেয়র খুবই আগ্রহ নিয়ে আমাদের কথা শোনেন।

পরপর দু'দিন ব্যস্ত সময় কাটাবার কারণে অ্যান এবং এলডরকে খুব একটা সময় দিতে পারিনি। দ্বিতীয় দিন বিকেলে প্রোগ্রাম থেকে ফিরে এলে অ্যান আমাকে বললেন—

: তুমি তো ব্যস্ত সময় কাটাচ্ছ। আমরা তোমাকে বেশি পাচ্ছি না।

: ঠিকই বলেছেন। পূর্ব-নির্ধারিত অনুষ্ঠানগুলোতে তো না যেয়েও পারছি না।

: না না, তা তো যাবে। কিন্তু আর একদিন পরে তো তুমি চলে যাবে।

: হ্যাঁ,তাতো যেতেই হবে।

: সে জন্য আমরা ভেবেছি তুমি যদি আপত্তি না করো তাহলে আগামীকাল সন্ধ্যায় তোমার সম্মানে একটি ছোট পার্টির আয়োজন করব। আমাদের নিকট প্রতিবেশি ৫-৬ জনকে বলব। কি বলো, তোমার অসুবিধা হবে?

: কিসের অসুবিধা? এটা তো আনন্দের বিষয়। আমি সানন্দে সম্মতি দিলাম।

পরদিন প্রোগ্রাম থেকে ফিরে এসে দেখি ছোট একটি আয়োজন। মাত্র পাঁচ থেকে ছয়জন প্রতিবেশি অতিথি। হাত মুখ ধুয়ে এসে আমি তাঁদের সঙ্গে যোগ দিলাম। অ্যানদের একজন মোটাসোটা নিকট প্রতিবেশির সঙ্গে পরিচয় হলো। জিজ্ঞেস করলাম,

: আপনি কি করেন?

: আমি একজন ক্ষুদ্র কৃষক।

: আপনার জমির পরিমাণ কত?

: সাড়ে সাত হাজার একর।

আমি তো অবাক। ছোট কৃষকের এত জমি। তাহলে না জানি বড় কৃষকদের জমির পরিমাণ কত বেশি। কথা বলতে বলতে জানতে চাইলাম—

: আপনার জমিতে কি ফসল ফলে? তিনি বললেন—

: যব এবং গম। এখন আমার জমিতে কাজ চলছে। আমি খাবার পৌঁছে দিতে আর একটু পরেই জমিতে যাব।

: বলেন কি! রাতের বেলায় জমিতে কাজ চলছে?

: হ্যা, আমরা পুর্ণিমার সময় রাতে মাঠে কাজ করি। আমার সাথে চলো দেখে আসবে। আমি অ্যানকে জিজ্ঞেস করছি।

সে সত্যিই অ্যানকে বলল

: তোমার অতিথিকে মাঠে নিয়ে যাই, যদি তোমার আপত্তি না থাকে?

: সে তো ক্লান্ত। যেতে চাইলে নাও। তবে অল্প সময়ের জন্য। আবার বাসায় নমিয়ে দিও।

খাওয়া শেষ করেই কৃষক মহোদয় আমাকে বললেন, মাঠে কাজ করা লোকের জন্য কিছু খাবার নিয়ে আসছি। পাঁচ মিনিট পর তোমাকে নিয়ে যাচ্ছি। সত্যিই সে

মিনিট পাঁচেক পরে এসে আমাকে তার পিকআপে তুলে নিল। প্রায় ২০-২৫ মিনিট ড্রাইভ করার পর ফাঁকা মাঠের পাশে ছোট কৃষক তার গাড়ি দাঁড় করালেন। উনি কয়েকবার গাড়ির লাইটের ফোকাস বাড়ালেন। দূরে একটি আলো দেখা যাচ্ছে। একজন শ্রমিক একটি মেশিন চালাচ্ছেন। তিনি বুঝতে পেরে ধীরে ধীরে এগিয়ে এলেন। মিনিট তিনেক পর তিনি কাছে এসে নামলে কৃষক মহোদয় তাকে খাবার দিয়ে আমার দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে বললেন, ইনি বাংলাদেশ থেকে এসেছেন। আমাদের দেশের বিশেষ অতিথি। একে এই মেশিনে চড়িয়ে তোমার পাশে বসাও এবং দেখাও তুমি কিভাবে কাজ করছ। তিনি সত্যিই তাই করলেন। আমাকে তাঁর পাশে বসালেন। দেখলাম ৩০ ফুট চওড়া একটি মেশিন। সম্পূর্ণ কম্পিউটারাইজড। চালালে ফসল কাটা হয়ে যাচ্ছে। মেশিনের ভেতরে মাড়াই হয়ে একপাশে শষ্যের দানা এবং অন্যপাশে খড় জমা হচ্ছে। এভাবে কিছুক্ষণ চালাবার পর মাঠের কিনারে এসে ডাডেক্স শেড দিয়ে তৈরি ছোট গুদাম ঘরে শষ্য ঢেলে রাখছেন। শস্য এখানেই থাকবে। পরে পাইকার ব্যবসায়ীদের সঙ্গে দরদামে বনলে তারা এসে এখান থেকে নিয়ে যাবেন। কৃষক মহোদয় আমাকে বললেন—

: তোমাদের দেশে কি এমন মেশিন আছে?

: না এমন মেশিন নেই। আমাদের চাষবাস অনুন্নত। আর এমন মেশিন থাকলেও আমরা ব্যবহার করতে পারব না।

: কেন, অসুবিধা কোথায়?

: দেখো, আমাদের জমি ছোট ছোট খণ্ডে বিভক্ত। এমন মেশিনের যদি কোন মিনি ভার্সন থাকে, যদি ৩০ ফুটের বদলে মাত্র ৩ ফুট চওড়া হয়, তাহলে আমরা তা ব্যবহার করতে পারব।

তিনি আমাকে আবার পিকআপে চড়িয়ে গল্প করতে করতে বাড়ির দরজায় নামিয়ে দিলে আমি তাঁকে ধন্যবাদ জানালাম। আমরা বাংলাদেশে ফিরে আসার পরও আমার অ্যানের সঙ্গে যোগাযোগ আছে। মাঝেমধ্যে হাই-হ্যালো করি। ক্রিসমাসে উইশ করি। কিন্তু বছর তিনেক আগে তাঁর স্বামী মারা গেছেন। অ্যান এখন একা। হয়ত বয়সগত কারণে তিনি কবিতাও বেশি চর্চা করতে পারেন না। এক সময় তিনি আমাকে তাঁর লেখা কয়েকটি ইংরেজি কবিতা পাঠিয়েছিলেন। কবিতাগুলোর মান ভালো ছিল। একবার একটি ই-মেইলে অ্যান আমাকে লিখেছিলেন, আমার সঙ্গে পরিচয় হবার পর তাঁর বাংলাদেশি মুসলমানদের সম্পর্কে ধারণায় কিছুটা পরিবর্তন এসেছে।

পেনসলভেনিয়া

সেপ্টেম্বরের ২৫ তারিখে আমরা স্টার্লিং থেকে শিকাগো বিমান বন্দর দিয়ে ইউনাইটেড এয়ারলাইন্সের বিমানে পেনসেলভেনিয়ার ফিলাডেলফিয়ায় পৌছলাম। সেখানে আমরা উঠলাম দ্য র‍্যাডিসন প্লাজা-ওয়ারউইক হোটেলে। এখানে আমরা মাত্র দু'দিন অবস্থান করি এবং এখানেই আমাদের একাডেমিক প্রোগ্রামের সমাপ্তি ঘটে।

এখানে আমরা স্থানীয় সরকার ও এনজিওদের কর্মতৎপরতা সম্পর্কে অবগত হই। কমিটি অব সেভেনটি নামের একটি ওয়াচডগ গ্রুপের সঙ্গে আমাদের আলোচনা হয়। এ ছাড়া আমরা ইউনিভার্সিটি অব পেনসেলভেনিয়ার রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ পরিদর্শনে যাই এবং সেখানে ওই বিভাগের ফ্যাকাল্টিদের সঙ্গে বিভিন্ন একাডেমিক বিষয়ে মতামত বিনিময় করি। তারা আমাদের সবাইকে ইউনিভার্সিটি মনোগ্রামখচিত কফি মগ উপহার দেন এবং আলাপচারিতায় আমাদের দেশের রাজনীতি ও সংস্কৃতি সম্পর্কেও জানতে চান। ফিলাডেলফিয়া এমন একটি শহর যার সঙ্গে অন্য আমেরিকান শহরের উল্লেখযোগ্য পার্থক্য আছে। এখানে দরিদ্র নাগরিকের সংখ্যা বেশি। রাস্তায় বের হলে ভিক্ষুক চোখে পড়ে। তাদের অনেকেই রাস্তার ফুটপাথে ভিক্ষা করেন। কেউ হ্যাট পেতে বসে থাকেন। আবার কেউ গান গেয়ে ভিক্ষা করেন।

নিউইয়র্ক

২৭ তারিখে আমরা চার্টারড বাসে নিউইয়র্কে আসি। এখানে আমাদের কোনো পূর্ব-নির্ধারিত প্রোগ্রাম ছিল না। আমাদের বুকিং ছিল রেডিসন ইস্ট হোটেলে। কিন্তু আমি আগেই চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ম্যানেজমেন্ট বিভাগের সাবেক শিক্ষক বন্ধু কামাল উদ্দিন-কে জানিয়েছিলাম যে আমি নিউইয়র্ক আসছি। কামাল চট্টগ্রামের ছেলে। যথেষ্ট অতিথিপরায়ন। সে আমি বলার আগেই আমেরিকা থেকে প্রকাশিত বাংলা পত্রিকায় আমাদের আগমন সংবাদ জানলেও আমার সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারছিল না। আমি যোগাযোগ করায় কামাল আমাকে হোটেলে থাকতে দেয়নি। হোটেলের বুকিং ক্যানসেল করিয়ে সে আমাকে তার বাসায় নিয়ে যায় যেখানে তার আরেক বন্ধুসহ তিনজন মিলে অনেক রাত পর্যন্ত আমরা গল্পগুজব ও খাওয়া দাওয়া করি। পরদিন আমার ফ্লাইট। কামাল আমাকে যথাসময়ে এয়ারপোর্টে পৌছে দেয়। এভাবে তিন সপ্তাহের একাডেমিক সফর শেষ করে নিরাপদে বাংলাদেশে ফিরে আসি। একাডেমিক দিক দিয়ে এ সফরটি ছিল যথেষ্ট মূল্যবান। এ সফরের মধ্য দিয়ে আমরা আমেরিকার সরকার পদ্ধতি, গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া, রাজনীতি, সংসদ, স্থানীয় সরকার, এনজিও তৎপরতা, পারিবারিক জীবন প্রভৃতি সম্পর্কে আমাদের যে তাত্ত্বিক জ্ঞান ছিল তা চলমান বাস্তবতার সঙ্গে মিলিয়ে দেখতে সক্ষম হই। সবকিছু মিলিয়ে এ সফর ছিল আনন্দদায়ক, শিক্ষামূলক এবং একাডেমিক দিকে দিয়ে সফল। এ রকম একটি একাডেমিক সফরে সার্বক্ষণিকভাবে আমাদের গাইড হিসেবে দায়িত্ব পালনকারী মিস্টার হার্বার্ট স্মিথকে ধন্যবাদ জানাই। আরও ধন্যবাদ জানাই আমার বাকি চার সফরসঙ্গী শিক্ষককে। দেশে ফেরার বেশ কিছুদিন পর এ সফরের ওপর ভিত্তি করে প্রবন্ধ লিখে আমি জাতীয় দৈনিকে প্রকাশ করি।[১২]

---

১২. দেখুন, মুহাম্মদ ইয়াহ্ইয়া আখতার, 'যুক্তরাষ্ট্র ভ্রমণের অভিজ্ঞতা', *দৈনিক ইত্তেফাক*, ০৫ ও ০৬ নভেম্বর, ২০০২।

দ্বিতীয় আমেরিকা সফর: ২০১৭

পটভূমি: বর্ণমালা শিক্ষা

আমরা ২০১৭ সালে আমাদের বড় মেয়ে দ্বীনি ফাতিহা এবং জামাই নাজমুস সাকিবের অনুরোধ ও আমন্ত্রণে আমেরিকা সফর করি। এ সফর সম্পর্কে বিস্তারিত বলার আগে মেয়ে-জামাইয়ের বিয়ে এবং মেয়ের লেখাপড়া সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত বয়ান প্রাসঙ্গিক। আমাদের মেয়ে দ্বীনি ফাতিহা ছোট অবস্থা থেকে লেখাপড়ায় ভালো ছিল। তার লেখাপড়ার হাতেখড়ি হয় বাংলাদেশে। মায়ের কাছেই শুরু হয় তার বাংলা বর্ণমালা শেখা। তখন আমরা চট্টগ্রাম শহরের চট্টেশ্বরি রোডে জয়নগর প্রথম গলিতে ভাড়া বাসায় থাকতাম। তার বর্ণমালা শেখার একটা ছোট্ট ইতিহাস আছে। তার মা যখন তাকে বর্ণমালা শেখানো শুরু করার জন্য ১৯৯৩ সালে আমাকে কিছু বর্ণমালা শেখার বই কিনে আনতে বলেন, আমি তখন চট্টগ্রামে চকবাজারের শাহেনশাহ মার্কেটের একটি বইয়ের দোকানে যাই। দোকানি আমাকে অনেকগুলো প্লাস্টিকে মোড়ানো চকচকে ছাপা ও ছবি সংবলিত বর্ণমালা শেখার বই দেন। আমি বইগুলো মনোযোগ দিয়ে পড়ি। প্রায় ২৫ মিনিট ব্যয় করে আমি তাকে বইগুলো ফেরত দেই। পরিচিত দোকানি। তিনি জানতেন যে আমি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক। কারণ, তার দোকানের কাছ থেকেই আমরা বিশ্ববিদ্যালয়গামী শিক্ষক বাসে উঠতাম।

: স্যার, বই নিলেন না।
: না।
: এতগুলো বই দিলাম, আপনার পছন্দ হলো না?
: সত্যিই পছন্দ হয়নি। এগুলো আমি আমার বাচ্চাকে পড়াব না।
: কেন স্যার, অসুবিধা কোথায়? সবাই তো এগুলো কিনছে।
: সবাই না বুঝে কিনছে। এ বইগুলো আমাদের সংস্কৃতির সঙ্গে মানানসই নয়।
: স্যার, ঠিক বুঝতে পারলাম না।
: আপনি বুঝতে পারবেন না।
: স্যার এক কাপ রং চা খাবেন? দিতে বলি?
: না, চা খাব না। ধন্যবাদ।
: স্যার কিছু মনে করবেন না, এত সুন্দর বইগুলো অপছন্দ করার কারণটা বললে খুশি হতাম।
: আপনি কি সত্যিই শুনতে চান?
: হ্যাঁ স্যার।
: আচ্ছা দিন, বইগুলো আবার আমাকে দিন। আমি প্রায় গোটা বিশেক বইয়ের পাজা হাতে নিয়ে পাতা উল্টালাম। দোকানির সামনে একটি বইয়ের পাতা উল্টে বললাম,
: দেখুন তো এটা কি বর্ণ?

: স্যার এটা তো 'ঋ' বর্ণ।
: বলুন কি বাক্য দিয়ে বর্ণটিকে পরিচয় করানো হয়েছে?
: স্যার, 'ঋষি মশায় বসে পূজায়' বাক্য দিয়ে বর্ণটিকে পরিচয় করানো হয়েছে। তাতে অসুবিধা কি?
: কোনো অসুবিধা নেই। ঋষিরা কারো ক্ষতি করেন না। তাদের সঙ্গে বাচ্চাদের পরিচিত করানো ভালো।
: তাহলে অসুবিধা কোথায়?
: অসুবিধা আছে। এই দেখুন, বলুন তো এই বর্ণটার নাম কি?
: স্যার, এটা তো 'ই'।
: ঠিক বলেছেন। দেখুন তো এ বর্ণটিকে কি বাক্য দিয়ে পরিচিত করানো হয়েছে।
: স্যার, 'ইট দিয়ে যায় দালান গড়া, ইদুর কাটে ধানের গোড়া' বাক্য দিয়ে পরিচিত করানো হয়েছে।
: ঠিক। এবার বলুন আপনার দেশের জনসংখ্যার কতভাগ মুসলিম?
: স্যার, প্রায় শতকরা ৮৫ ভাগ তো হবে।
: বেশ, যদি ৮৫ ভাগ হয়, তাহলে দেখুন তো এ বইয়ে কোনো বর্ণে মসজিদ বা ইমামকে পরিচয় করিয়ে দেয়া হয়েছে কিনা।
: না, তা দেয়া হয়নি। স্যার, এভাবে তো আমি ভাবিনি।
: কেন ভাবেননি? এবার বলুন কেন 'ই' বর্ণকে 'ইমাম সাহেব মসজিদে যান' বাক্য দিয়ে পরিচিত করানো হয়নি। বা কেন বর্ণকেই সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগোষ্ঠীর ধর্মীয় ভাবধারা দিয়ে পরিচিত না করিয়ে কেবলমাত্র সংখ্যালঘিষ্ঠ জনগোষ্ঠীর ধর্মীয় ঋষির সঙ্গে পরিচিত করানো হয়েছে?
: স্যার, আমি কি করে বলব।
: আপনার কি মনে হয় লেখকরা ভুল করেছেন?
: তাতো জানি না। স্যার, আপনিই বলুন।
: লেখকরা মোটেও ভুল করেননি।
: স্যার তাহলে ভুলটা কার?
: ভুলটা আমাদের।
: বলেন কি? কিভাবে?
: আরে বাবা, এরা তো সব ভারতীয় লেখক। তারা তাদের লেখা বইয়ে তাদের দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের ধর্মের কথা লিখেছেন। আর এ ভারতের বই চোরাচালানের মাধ্যমে আমরা এ দেশে এনে বোকার মতো তা আমাদের বাচ্চাদের পড়িয়ে যাচ্ছি। লঞ্চে, গাড়িতে, বাসে, ফেরি করে বিক্রি করছি।
: এবার বুঝেছি স্যার। সমস্যাটা তো গুরুতর। এখন সমাধানের উপায় কি?
: উপায় আছে একটাই। এ দেশের লেখকদের এ বিষয়ে সচেতন হয়ে সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের সংস্কৃতির প্রতিফলন ঘটিয়ে শিশুদের জন্য বর্ণমালা শেখার বই লিখতে হবে।

: স্যার কবে এমন বই বের হবে?
: হবে। অপেক্ষা করুন। ধৈর্য ধরুন। নিশ্চয়ই বের হবে।

বর্ণমালা শেখার এ অসঙ্গতিসহ শিক্ষা ব্যবস্থার আরও অনেক ত্রুটি উল্লেখ করে সে ক্ষেত্রে কি সংস্কার করা দরকার সে বিষয়ে আমি ১৯৯৩ সালে দৈনিক *জনকণ্ঠ* পত্রিকায় 'শিক্ষা ব্যবস্থা সংস্কারে পরামর্শ' শীর্ষক একটি প্রবন্ধ লিখি, যা শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও শিক্ষা গবেষকদের মনোযোগ আকর্ষণ করে।[১৩] আমার প্রদত্ত ব্যাখ্যা ওই বই দোকানির পছন্দ হয়। এর পর থেকে তিনি আমাকে খুবই খাতির করতেন। আমাকে দেখলেই দোকানে ডেকে বসাতেন। চা খাওয়াতেন। অন্যদের কাছে আমার সম্পর্কে বলতেন, আমি নাকি একজন বড় গবেষক। আমি বই কিনতে গিয়ে খালি হাতে ফিরে আসায় স্ত্রী কিছুটা হতাশ হন। আমি তাঁকে বিষয়টির গুরুত্ব বুঝিয়ে বললাম—

: আমি তোমাকে কয়েকদিনের মধ্যে বর্ণমালা শেখাবার বই বানিয়ে দেব।
: কিভাবে দেবে? কোথায় পাবে?
: একটু ধৈর্য ধরো। বই লিখে দেব।
: তুমি লিখবে?
: হ্যাঁ আমিই লিখব। তবে তোমারও সহায়তা লাগবে।

আমি আন্দরকিল্লা গিয়ে সুন্দর দামি কাগজ কিনে প্রায় শতাধিক পৃষ্ঠার একটি বই সাইজের খাতা বাঁধাই করালাম। নানা রংয়ের স্কেচ পেন, কলম, রং ও তুলি ইত্যাদি কিনে আনলাম এবং তারপর ছড়া লেখার কাজ শুরু করলাম। ছড়াগুলো স্বদেশি সংস্কৃতি ও সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগোষ্ঠীর সংস্কৃতির সঙ্গে সঙ্গতি রেখে রচনা করলাম। তবে আমি ছবি আকায় পারদর্শী নই। এ বইয়ের ছড়ার সঙ্গে সম্পর্ক রেখে চারজন মিলে ছবি আঁকলাম। এর মধ্যে আমি, শেফালি, আমার ছোটবোন মনি এবং আমার বন্ধু হার্ডওয়্যার ব্যবসায়ী নিয়াজ আহমেদ খান। তবে সবচেয়ে বেশি ছবি আকিয়েছিলাম বন্ধু নিয়াজকে দিয়ে। এ বইয়ের মধ্যে বাংলা, ইংরেজি ও আরবি অক্ষরজ্ঞান, সংখ্যা, বর্ণ ও আকৃতিবিষয়ক শিশুদের উপযোগী জ্ঞান উপস্থাপন করি। বইটির নাম দেই *সোনামনিদের লেখাপড়া*। স্কুলে যাবার আগে বাজারের কেনা বইয়ের পরিবর্তে আমার দুই মেয়ে আমার লেখা এ বই পড়ে বর্ণমালা শেখে। তারা এ বই পড়ার সময় যতবার ছিঁড়ে ফেলেছে আমি ততবার আবার ছেঁড়া পাতাগুলো স্কচ টেপ দিয়ে জোড়া লাগিয়েছি। এ বইটি বাংলাবাজারের বার্ড কম্প্রিন্ট অ্যান্ড পাবলিকেশন্স এর স্বত্বাধিকারী মোহাম্মদ শিহাব উদ্দিন ২০০৪ সালের দিকে প্রকাশনার জন্য আমার কাছ থেকে নেন। বইটি তিনি কম্পোজ ও পেজমেকিং করান। সম্ভবত ২০০৭ বা ২০০৮ সালের দিকে একুশের

১৩. দেখুন, মুহাম্মদ ইয়াহ্ইয়া আখতার, 'শিক্ষা ব্যবস্থা সংস্কারে পরামর্শ', *দৈনিক জনকণ্ঠ*, ১৮ অক্টোবর, ১৯৯৩।

বইমেলায় এ প্রকাশকের বইয়ের তালিকায় লেখকের নাম হিসেবে আমার নাম উল্লেখ করে এ বইয়ের নামও দেখি এবং ভাবি বইটি হয়ত তিনি প্রকাশ করেছেন। কিন্তু পরে খোঁজ নিয়ে জানি যে বইটি তিনি প্রকাশ করেননি। জানি না আমার লেখা বইটি তাঁর কাছে গেলে ফেরত আনতে পারব কিনা। সংক্ষেপে এই হলো মেয়েদের বর্ণমালা শেখার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস। তবে এখন বর্ণমালা শেখার বইগুলো আগের চেয়ে উন্নত হয়েছে। বর্তমান বইগুলোতে স্বদেশি সংস্কৃতির প্রতিফলন ঘটেছে। তবে এ সমস্যা এখনো শেষ হয়ে যায়নি। মাত্র কয়েক বছর আগে ২০১৬ সালেও স্কুলের পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তু নিয়ে সরকার ও হেফাজতে ইসলাম-এর মধ্যে অনেক দেন দরবার হয়েছে এবং এক পর্যায়ে সরকার হেফাজতের দাবি মেনে নিতে বাধ্য হয়েছে।[১৪]

আমি সিডনিতে পিএইচডি করতে গেলে মেয়ে দ্বীনি সিডনি শহরের ডালউইচহিল পাবলিক স্কুলে তিন বছর লেখাপড়া করে। পরে আমার ডিগ্রি শেষ হলে আমরা বাংলাদেশে চলে আসি। বাংলাদেশে তার লেখাপড়া নিয়ে আগে বলেছি। এ দেশে লেখাপড়া করে সে এমআইটিতে ভর্তি হয়ে ম্যাটেরিয়ালস সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং-এ গ্রাজুয়েশন করে। মধ্য-২০১৩ সালে তার কনভোকেশন সেরিমনি হবে। কনভোকেশনে তার অনেক সহপাঠীদের বাবা-মা আসবেন। মেয়ে তার কনভোকেশনে যাওয়ার জন্য আমার ওপর চাপ সৃষ্টি করে। মেয়ের মন খারাপ হবে ভেবে এক পর্যায়ে আমি রাজি হই এবং আমেরিকা দূতাবাসে ভিসার আবেদন করি। ভিসার ইন্টারভিউয়ে আমাকে জিজ্ঞেস করা হয়, আমি কোথায় যেতে চাই এবং কেন যেতে চাই। আমি বলি, আমি বস্টনে এমআইটিতে আমার মেয়ের কনভোকেশনে যাব। কবে কনভোকেশন জিজ্ঞেস করা হলে আমি সুনির্দিষ্টভাবে ২০১৩ সালের ৭ জুন তারিখের কথা বললে অফিসার তারিখটি নোট বুকে টুকে নেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, ওই তারিখের প্রায় পাঁচ মাস পরে আমাকে পাঁচ বছরের মালিটপল ভিসা দেয়া হয়। ফলে আমার আর মেয়ের কনভোকেশনে যাওয়া হয়নি।

আমাকে ছাড়াই দ্বীনি তার বান্ধবীদের সঙ্গে নিয়ে এমআইটির কনভোকেশনে যোগ দেয় (এমআইটির কনভোকেশনের ছবির জন্য দেখুন পরিশিষ্ট- ৫:৩)। যথাসময়ে কনভোকেশন হয়ে গেলেও পাঁচ বছরের ভিসা রয়ে যায়। ইতোমধ্যে একটি বড় কোম্পানিতে রিসার্চ ইঞ্জিনিয়ার পদে মেয়ের চাকরি হয়। পরে বাংলাদেশে তার বিয়ে হয়। প্রায় দুই বছর চাকুরি করার পর সে হার্ভার্ড ইউনিভার্সিটিতে এমবিএ পড়ার সুযোগ পায়। যে মেয়ের হাতেখড়ি হয় আমার নিজের লেখা বই পড়ে তার মায়ের হাতে, সে পরে বিশ্বের নামকরা দুটি বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রি অর্জন করতে সক্ষম হয়। হার্ভার্ড ইউনিভার্সিটির ছাত্রী হিসেবে আবার সে মাঝেমধ্যে আমাকে

১৪ প্রাসঙ্গিক আলোচনার জন্য দেখুন, মুহাম্মদ ইয়াহ্ইয়া আখতার, 'নতুন পাঠ্যবই এবং ওড়না সমাচার', *যুগান্তর*, ৯ জানুয়ারি, ২০১৭।

বেড়াতে যেতে তাগাদা দিতে থাকে। আমার স্ত্রীসহ কেউ কেউ বললেন, আমাকে যে ৫ বছরের মাল্টিপল ভিসা দেয়া হয়েছে তা যদি আমি একবারও ব্যবহার না করি, তাহলে পরে আবার কখনো ভিসার জন্য আবেদন করলে আমাকে ভিসা নাও দেয়া হতে পারে। যা হোক মেয়ে আমাকে আগস্টে তাদের সেমিস্টার ব্রেকের সময় বেড়াতে যেতে জোরালো অনুরোধ করলে আমি রাজি হই। এবার আমার স্ত্রীকে নিয়ে দুজন মিলে ১৮ই আগস্ট টার্কিশ এয়ারলাইনে বুকিং দেই এবং যথাসময়ে ইস্তাম্বুল হয়ে বস্টনের লোগান বিমান বন্দরে পৌঁছাই।

মেয়ের বিয়ে

বস্টনের অভিজ্ঞতা বলার আগে মেয়ের বিয়ে নিয়ে সংক্ষেপে দু'চার কথা বলা প্রাসঙ্গিক মনে করছি। গ্রাম বাংলাদেশে একটি প্রবাদ প্রচলিত আছে যে লক্ষ কথা খরচ না হলে বিয়ে হয় না। কিন্তু, দ্বীনির বিয়ের বেলায় তেমনটি হয়নি। আমরা যখন দ্বীনির জন্য উচ্চশিক্ষিত পাত্রের সন্ধানে ছিলাম, এ রকম সময়ে এই ছেলে নাজমুস সাকিব দ্বীনির গ্রাজুয়েশনের পর এমআইটির মিডিয়া ল্যাবে পিএইচডি করতে আসে এবং তাদের মধ্যে আলাপ পরিচয় হয়। সাকিবের বাড়ি ফেণী সদরে হলেও তার জন্ম এবং বেড়ে ওঠা ঢাকার মোহাম্মদপুরে। বাবা মা দুজনই ইসলামিক ফাউন্ডেশনের উচ্চপদে চাকুরি করেন। বাবা অবসরে গেলেও মায়ের তখনও চাকুরি ছিল। সাকিবের বাবা জনাব মাওলানা আবু হোরায়রা বাংলাদেশ ইমাম সমিতির সভাপতি। এক ভাই দু'বোনের সুখি পরিবার। এক বোন সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার। সে বিবাহিত এবং নরওয়েপ্রবাসী। অন্য বোনও বিবাহিত এবং সরকারি ডাক্তার। ছেলের একাডেমিক ব্যাকগ্রাউন্ড খুবই ভালো। সে প্রথমে মাদ্রাসায় লেখাপড়া শুরু করে পরে ধানমন্ডির ম্যাপল লিফ স্কুল থেকে 'ও' এবং 'এ'-লেভেলে আকর্ষণীয় রেজাল্ট করে আমেরিকার নিউইয়র্কের বার্ড কলেজ থেকে আন্ডারগ্রাজুয়েট করে। পরে ইউনিভার্সিটি অব ইউটাহ থেকে মাস্টার্স ডিগ্রি করার পর এমআইটি মিডিয়া ল্যাবে পিএইচডি করার সুযোগ পায়। এমন পাত্রের আগ্রহের প্রসঙ্গ জানতে পেরে আমরা ছেলের সম্পর্কে যতদূর সম্ভব খোঁজখবর করে সবার কাছ থেকে ইতিবাচক তথ্য পাই। ২০১৬ সালে ছেলের বাবা সপরিবারে চট্টগ্রামে আমাদের বাসায় প্রস্তাব নিয়ে আসলে উভয় পক্ষের সম্মতিতে ১৫ জুলাই চট্টগ্রামে আকদ এবং ২৫ ডিসেম্বর ঢাকায় বিবাহোত্তর অনুষ্ঠানের তারিখ নির্ধারণ করি। এই বিয়ের কথাবার্তায় কোনো মতবিরোধ হয়নি এবং চট্টগ্রামের সনাতনি বিয়ের সামান্যতম প্রভাবও পড়েনি। বিয়েতে দেনা পাওনা বিষয়ক কোনো আলোচনা হয়নি।

আমার সহকর্মীরা ঢাকার বিবাহোত্তর অনুষ্ঠানে যাবেন না মনে করে আমি আমার বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভাগীয় সহকর্মীদেরকে দাওয়াত দিয়ে আগ্রাবাদের হোটেল অ্যামব্রোসিয়াতে ২০১৬ সালের ১৫ জুলাই জাঁকজমকভাবে আকদের আয়োজন করি। বিয়ে পড়াবার জন্য একজন কাজি ঠিক করে নিয়ে গেলেও বেয়াই সাহেব নিজেই মাওলানা বিধায় তিনিই বিয়ে পড়ান এবং মোনাজাত করেন। তিনি

ইমাম সমিতির সভাপতি হওয়ায় তার সঙ্গে দেখা করতে চট্টগ্রামের কয়েকটি বড় মসজিদের ইমাম সাহেবগণ আসেন। সবকিছু সুসম্পন্ন হয়। তবে এ বিয়েতে দেনমহোর নিয়ে আমাকে জটিলতায় পড়তে হয়েছিল। আমাদের মেয়ে উচ্চ শিক্ষিত। তার ইসলামি জ্ঞান আমাদের চেয়ে কম না। সে বলে বিয়ে আমার, দেনমোহর হলো আমার অধিকার। কাজেই আমার বিয়ের দেনমহোর ঠিক করার ব্যাপারে আমার মতামত প্রাধান্য পাওয়া উচিত। সে আমাদেরকে এক টাকা দেনমোহর ধার্য করতে বলে। আমরা অবাক হয়ে বলি, সেটি কেমন দেখায়। আমাদের পরিবারে আরও যে সব বিয়েশাদি হয়েছে তার সাথে সঙ্গতি রেখে মোহরানা ঠিক করলে ভালো হত। দ্বীনির যুক্তি হলো, যার সঙ্গে আমার বিয়ে হচ্ছে সে একজন বেকার ছাত্র। তার ওপরে লাখ লাখ টাকার চাপ সৃষ্টি করতে আমি রাজি নই। কথা সত্য এবং রাসুল (সঃ)-এর সুন্নত হলো সাদামাটাভাবে বিয়ে করা। ফলে আমি বিপদে পড়ে এ বিষয়ে আমার বেয়াই সাহেবের স্মরণাপন্ন হলে তিনিও এক টাকা দেনমোহরে সম্মতি দেননি। পরে তিনি বলেন, এ বিষয়টি আপনি আমার ওপর ছেড়ে দিন। আমরা মেয়েকে বুঝাতে সমর্থ হই যে তোমার মতামত আমরা গুরুত্ব দিয়েছি। তোমার শ্বশুরকে তোমার মতামত জানানো হয়েছে। তিনি এক টাকা দেনমোহরে বিবাহ পড়ালে আমাদের পক্ষ থেকে আপত্তি নেই। পরে বিয়ে পড়াবার আগে বেয়াই সাহেব আমাকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করলে আমি বলি, এটা আপনার এখতিয়ার। আপনি এ সব ব্যাপারে আমার চেয়ে অভিজ্ঞ। আমি এই প্রথম বিয়েশাদির অনুষ্ঠান করছি। আর আপনি তো আল্লাহ পাকের রহমতে দুটি মেয়ে বিয়ে দিয়েছেন। কাজেই আপনি যা ভালো মনে করেন সে রকম দেনমোহর ধার্য করে দিন। তবে দেনমোহর এক টাকা ধার্য করলে আমাদের পক্ষ থেকে সামান্যতম আপত্তি নেই। পরে তিনি অনেক চিন্তাভাবনা করে ১০ লাখ টাকা দেনমোহর ধার্য করে বিয়ে পড়ান (আকদ অনুষ্ঠানের ছবির জন্য দেখুন পরিশিষ্ট- ৫:৪)। বিয়ের কিছুদিনের মধ্যেই ছেলে এবং মেয়ে আমেরিকা ফিরে যায়। পরে ডিসেম্বর মাসে তারা ফিরে এলে ঢাকার মোহাম্মদপুরে তাদের গায়ে হলুদ এবং মিরপুর পুলিশ স্টাফ কলেজ কনভেনশন সেন্টারে তাদের বিবাহোত্তর অনুষ্ঠান সুসম্পন্ন হয়। তবে এই বিয়ের কার্ডটি জামাই নাজমুস সাকিব ডিজাইন করেন। আট পৃষ্ঠার কার্ডটি এত ব্যতিক্রমী, ডিজিটাল বৈশিষ্টমণ্ডিত এবং দৃষ্টি আকর্ষণকারী ছিল যে, *প্রথম আলো* পত্রিকা 'একটি অনন্যসাধারণ বিয়ের কার্ড' শিরোনামে এর ওপর প্রতিবেদন প্রকাশ করে।

বস্টনের অভিজ্ঞতা ও নিউইয়র্ক ভ্রমণ

বস্টনের লোগান এয়ারপোর্টে মেয়ে এবং জামাই দু'জন আমাদের রিসিভ করে। জামাই নাজমুস সাকিব একজন উচু মানের গবেষক। সে এমআইটি মিডিয়া ল্যাবের পিএইচডি ছাত্র। শহরের প্রাণকেন্দ্রে হার্ভার্ড এবং এমআইটির মাঝামাঝি জায়গায় সেন্ট্রাল স্কয়্যারে তারা একটি ছোট এপার্টমেন্ট ভাড়া করে থাকে। মেয়ে

জামাইয়ের সঙ্গে থেকে কিভাবে যে তিন সপ্তাহ কেটে গেল টেরই পেলাম না। মেয়ে এবং জামাই দুজনেই যেহেতু শিক্ষার্থী সে কারণে আমরা প্রথমেই তাদেরকে বলি, দেখ বাবা, যে ক'দিন আমরা থাকব, আমরা বাজার এবং রান্না করব। ঘরদোর পরিস্কারও করব আমরা। তোমরা এ সব নিয়ে মাথা ঘামাবে না। তোমরা তোমাদের কাজ করো। তোমরা লেখাপড়ার মধ্যে আছো, লেখাপড়া নিয়েই থাকো। মনোযোগ দিয়ে লেখাপড়া করো। কিন্তু তারা তা শোনেনি। কারণ, আমরা যাবার আগেই তারা প্রোগ্রাম ঠিক করে রেখেছিল যে আমাদের কি খাওয়াবে। কোথায় নিয়ে যাবে। আমাদের সম্মানে কবে পার্টির আয়োজন করবে। তারা লেখাপড়ার ফাঁকে ফাঁকে সেগুলোই একের পর এক বাস্তবায়ন করতে থাকল। আমাদেরকে ভিন্ন অভিজ্ঞতার জন্য বিমানের পরিবর্তে দোতলা বাসে করে নিউইয়র্কে নিয়ে একরাত হোটেলে রাখল। আমি আগে দু'বার নিউইয়র্ক আসলেও আমার স্ত্রীর জন্য ছিল এটি প্রথমবার। তারা আমাদেরকে নিউইয়র্ক শহর ঘুরিয়ে দেখাল। রাতের টাইম স্কয়্যারে ঘুরলাম এবং সবাই মিলে ছবি তুললাম (জ্যাকসন হাইটসে তোলা ছবির জন্য দেখুন পরিশিষ্ট- ৫:৫)। হাতে কিছু সময় থাকায় সাকিব আমাদেরকে নিউইয়র্কে বাংলাদেশি রেস্টুরেন্টে লাঞ্চ খাওয়াবার পরিকল্পনা করল। সে আমাদেরকে এমন এক রেস্টুরেন্টে নিয়ে গেল যেখানে না গেলে কখনোই বুঝতে পারতাম না যে একজন রেস্টুরেন্ট মালিকের রুচি কেমন হলে সে তার রেস্টুরেন্টকে চড়া রংয়ের মরিচ বাতি দিয়ে এভাবে সাজাতে পারেন। রেস্টুরেন্টের ভেতরে ঢুকে আমরা খাব, না এর বিচিত্র লাইটিং ও ডেকোরেশন দেখব ভেবে পাচ্ছিলাম না (বাঙালী রেস্টুরেন্টের বিচিত্র ডেকোরেশনের জন্য দেখুন পরিশিষ্ট- ৫:৬)। তারা আমাদের নিউইয়র্কে নদীতেও ভ্রমণ করালো (নদীভ্রমণের ছবির জন্য দেখুন পরিশিষ্ট- ৫:৭)। নদী থেকে নিউইয়র্ক শহরের দৃশ্য অন্যররকম মনে হলো।

বস্টনে থাকাকালীন আমাদেরকে ওই শহরটিও তারা ঘুরিয়ে দেখিয়েছিল। বস্টনের চার্লস নদী এবং একাডেমিক জগতের খ্যাতিমান দুটি বিশ্ববিদ্যালয়— ম্যাসাচুসেটস ইন্সটিটিউট অব টেকনলজি (এমআইটি) এবং হার্ভার্ড ইউনিভার্সিটি দেখে আমরা প্রীত হই (এমআইটি ও হার্ভার্ড ক্যাম্পাসের দু'টি ছবির জন্য দেখুন পরিশিষ্ট- ৫:৮)। আসলে এত বড় বিশ্ববিদ্যালয়ের সবকিছু দেখতে হলে যে সময়ের প্রয়োজন ততটা সময় আমাদের ছিল না। সে জন্য আমরা এর কিছু কিছু বিষয় গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করি। আমি নিজে যেহেতু একজন বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক এবং এসব ব্যাপারে যথেষ্ট কৌতূহলী, সে কারণে আমি কয়েকটি বিষয় বেশ মনোযোগ দিয়ে পর্যবেক্ষণ করি। এখানে এমন গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করা তিনটি বিষয় তুলে ধরব। এর দুটি বিষয় এমআইটির এবং একটি বিষয় হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। এ বিষয়গুলো অনুধাবন করলে পাঠকগণ বুঝতে পারবেন, এ বিশ্ববিদ্যালয়দুটি জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চা ও গবেষণায় দক্ষিণ এশীয় দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর চেয়ে কত বেশি এগিয়ে রয়েছে এবং কেন এবং কিভাবে এসব

খ্যাতিমান উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমগ্র বিশ্বের বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের ওপর তৈরিকৃত সূচকে উচ্চতর অবস্থানে নিজেদেরকে আসীন করেতে পেরেছে।

মিডিয়া ল্যাবের শিশুশিক্ষা বিষয়ক গবেষণা

পিএইচডি গবেষক নাজমুস সাকিবের সৌজন্যে এমআইটির মিডিয়া ল্যাব দেখলাম। এমআইটি হলো ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে বিশ্বের এক নম্বর ইউনিভার্সিটি। কাজেই এমন বিশ্ববিদ্যালয়ের মিডিয়া ল্যাব যে আধুনিক ও উন্নত হবে তা আগেই ভেবেছিলাম। আমি নিজে সমাজ বিজ্ঞানের ছাত্র হওয়ায় মিডিয়া ল্যাব সম্পর্কে ভাবতাম, এখানে হয়ত গণমাধ্যম ও কম্পিউটার সম্পর্কিত আধুনিক লেখাপড়া হয়। কিন্তু ২০১৭ সালের ২০ আগস্ট এমআইটি ভিজিট করাকালীন সরেজমিনে মিডিয়া ল্যাবের কার্যক্রম দেখে আমার ধারণা বদলে যায়। দুটি বড় অত্যাধুনিক বিল্ডিংয়ের বিভিন্ন ফ্লোর জুড়ে অবস্থিত মিডিয়া ল্যাবে ত্রিশটি রিসার্চ গ্রুপ গবেষণারত রয়েছে। কি নেই সেসব গবেষণায়? রয়েছে আর্টিফিসিয়েল ইন্টেলিজেন্স থেকে উন্নত ক্যামেরা তৈরি; কৃত্রিম অঙ্গ তৈরির (বাইয়োমেকট্রনিক্স) গবেষণা থেকে সোস্যাল কম্পিউটিং। শিক্ষকদের অত্যাধুনিক রুম, অত্যাধুনিক আসবাবপত্র ও যন্ত্রপাতি, যার অনেক কিছুই আমার কাছে অপরিচিত (একজন অধ্যাপকের কক্ষের চিত্রের জন্য দেখুন পরিশিষ্ট- ৫:৯)। অত্যাধুনিক এই ল্যাবের সোস্যাল মেশিন গ্রুপে চলছে শিশু শিক্ষাকে আনন্দময় ও ফলদায়ক করার জন্য নতুন পরীক্ষা-নিরীক্ষা। সনাতনি মন্টেসরি স্কুলের (এ রকম স্কুলে শ্রেণিকক্ষ থাকে না, এবং শিক্ষার্থীর স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করা হয় না) ধারণার সঙ্গে উন্নত সেনসর প্রযুক্তির সমন্বয় ঘটিয়ে এরা এ নয়া শিশুশিক্ষা ব্যবস্থার উদ্ভাবন করেছেন। এ নতুন শিশুশিক্ষা পদ্ধতি সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে জানার আগে বলে রাখা ভালো, পাশ্চাত্যের উন্নত দেশগুলোতে প্রি-স্কুল, নার্সারি বা নীচের ক্লাসগুলোয় শিশুদের ওপর লেখাপড়ার চাপ দেয়া হয় না। তাদেরকে ক্লাসরুমের বাইরে খোলা মাঠে অনেক কিছু করানো হয়। পুথিগত বিদ্যার চাপ কমিয়ে নাচ, গান, হাসি, আনন্দ, ছবি আঁকা ও খেলাধুলার মধ্য দিয়ে অনেক কিছু শিখিয়ে তাদের মানসিক বিকাশের সুব্যবস্থা করা হয়। অস্ট্রেলিয়ায় সরকারি প্রাইমারি স্কুলের শিক্ষক হতে চাইলে মাস্টার অব টিচিং ডিগ্রি করে শিশু মনস্তত্ত্ব পড়ে আসতে হয়। শিশুর মনের জগতটি না বুঝলে শিক্ষক শিশু শিক্ষার্থীকে কিভাবে পড়াবেন? কিভাবে বুঝবেন, শিক্ষার্থী লেখাপড়ায় আনন্দ পাচ্ছে কিনা? পাশ্চাত্যে শিশুকে হোমওয়ার্কের চাপ আর বকাঝকার ওপর রেখে তার শেখার আনন্দে ব্যাঘাত ঘটানো হয় না।

মিডিয়া ল্যাবের সোস্যাল মেশিন রিসার্চ গ্রুপ বস্টনের অলাভজনক সংগঠন ওয়াইল্ডফ্লাওয়ার ফাউন্ডেশনের সহায়তায় শিশু শিক্ষায় 'সেনসেই' প্রজেক্টের অধীনে সফলভাবে শিশু শিক্ষা বিষয়ক এ নতুন পরীক্ষা-নিরীক্ষা করছে। জাপানি ভাষায় 'সেনসেই' শব্দের অর্থ শিক্ষক। কিন্তু এরা এর পূর্ণ নাম করেছেন 'সেন্সিং এডুকেশনাল ইন্টার‍্যাকশন।' এ শিশুশিক্ষা পদ্ধতিতে মনটেসরি স্কুলের মতো

শ্রেণিকক্ষ ধারণা ভেঙ্গে ফেলা হয়েছে। এখানে সেনসর প্রযুক্তির ব্যবহার ঘটিয়ে শিশুদের আগ্রহের এলাকা ও বিষয়বস্তু জানার চেষ্টা করা হয়। আর একবার কোনো শিশুর আগ্রহ ও আনন্দের জায়গাটি চিহ্নিত করতে পারলে তাকে ওই এলাকায় কাজ করিয়ে এগিয়ে নেবার কাজটি সহজ হয়। শিশুর একাডেমিক উন্নয়নের লক্ষ্যে শিক্ষক-পর্যবেক্ষণ ও সামাজিক ইঞ্জিনিয়ারিং পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়। যেমন, একটি শিশু যদি অঙ্ক না করতে চায়, তার ওপর অঙ্ক করার জন্য চাপ সৃষ্টি করা হয় না। সুকৌশলে অঙ্কে আগ্রহী অন্য সহপাঠীর সঙ্গে তার বন্ধুত্ব করিয়ে দেয়া হয়। এ ব্যবস্থায় নিজের আনন্দের এবং আগ্রহের জায়গায় কাজ করে শিশুরা তাদের স্কুলের সময় ও লেখাপড়া উপভোগ করতে পারে।

এমআইটির মিডিয়া ল্যাব উদ্ভাবিত এ নতুন শিক্ষা পদ্ধতিতে কিভাবে শিশুর আগ্রহ জানা হয়— জানতে চাইলে মিডিয়া ল্যাবের সোস্যাল মেশিন রিসার্চ গ্রুপের গবেষক ও ওয়াইল্ডফ্লাওয়ার ফাউন্ডেশনের উপদেষ্টা নাজমুস সাকিব বলেন, আমাদের শিশুশিক্ষা পদ্ধতিতে শ্রেণিকক্ষের ব্যাপারটি নেই। একটি বড় ঘরে কতিপয় শিক্ষক শিশুদের শিক্ষা দেন। তাদের শিক্ষাদানকারী ভূমিকার চেয়ে শিশুদের কার্যক্রম পর্যবেক্ষণের ভূমিকা বেশি। এ শিক্ষা পদ্ধতিতে শিশু স্কুলে এলে তার জুতা পরিবর্তন করে তাকে বিশেষভাবে তৈরি করা মাইক্রোচিপসযুক্ত সেনসর লাগানো জুতা পরিয়ে শিক্ষাকক্ষে ছেড়ে দেয়া হয় (এমন জুতার ছবির জন্য দেখুন পরিশিষ্ট- ৫:১০)। এ রকম সেনসর শিক্ষাক্ষেত্রের অন্যত্র এবং শিক্ষা উপকরণের ট্রেতেও ব্যবহার করা হয়। শিক্ষাকক্ষে শিশু সম্পূর্ণ স্বাধীন। তাকে কোনো বিশেষ সময় বিশেষ বিষয় পড়তে বা শিখতে বলা হয় না। শিশু নিজের ইচ্ছা অনুযায়ী যে কোনো শিক্ষক বা সহপাঠীর কাছে তার ইচ্ছামতো সময় কাটায়। সংশ্লিষ্ট পর্যবেক্ষকরা পরে কোন্ শিশুর কোন্ বিষয়ে কতটা আগ্রহ তা বিভিন্ন শিক্ষকের কাছে তার অবস্থানের সময় নির্ণয় করে বুঝতে পারেন। ওয়াইল্ডফ্লাওয়ার ফাউন্ডেশনের সহায়তায় ম্যাসাচুসেটস এর বস্টন শহরে ৬টি স্কুলে পরীক্ষামূলকভাবে এ নতুন পদ্ধতি ব্যবহার করে শিশু শিক্ষাদান কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

এ নতুন শিশুশিক্ষা ব্যবস্থায় স্কুল পরিচালকগণ ব্যাপক সাড়া পাচ্ছেন। প্রযুক্তিনির্ভর এ পদ্ধতিতে শিক্ষা দিতে শিক্ষকগণও আনন্দ পাচ্ছেন। এতে করে শিক্ষকরাও এ নতুন শিক্ষা পদ্ধতি থেকে শিখতে পারছেন। কোন কোন শিশু তার কাছে বেশি সময় না দিয়ে অন্য শিক্ষকের কাছে অধিক সময় দেন সে বিষয়ে তারা ভাবিত হন এবং এতে নিজ শিক্ষাদান পদ্ধতি অধিকতর উন্নত করতে নতুনভাবে চিন্তা করতে উদ্বুদ্ধ হন। তবে এ পদ্ধতিতে শিক্ষাদান কার্যক্রম পরিচালনা করা ব্যয়বহুল। কিন্তু পদ্ধতিটি ফলদায়ক হওয়ায় ইতিমধ্যে অভিভাবক এবং শিক্ষা গবেষকদের মধ্যে সাড়া জাগিয়েছে। এ কারণে 'সেনসেই' প্রকল্পে অর্থায়নের জন্য ওয়াইল্ডফ্লাওয়ার ফাউন্ডেশনের কোনো সমস্যা হচ্ছে না। প্রযুক্তিনির্ভর এ নতুন শিক্ষা ব্যবস্থাটি পাশ্চাত্য সমাজের জন্যও নতুন শিশুশিক্ষা পদ্ধতি। তবে যেহেতু

পদ্ধতিটি ইতিমধ্যে পরীক্ষা-নিরীক্ষায় ফলদায়ক প্রমাণিত হয়েছে, সে কারণে আশা করা যায়, আগামী দিনের শিশুশিক্ষায় এ নতুন শিক্ষা পদ্ধতিটি ব্যয়বহুল হলেও একটি সমাদৃত শিশুশিক্ষা পদ্ধতি হিসেবে প্রথমে পাশ্চাত্যে এবং পরে ক্রমান্বয়ে উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশগুলোতে প্রসারিত হতে পারে।

এমআইটির মিডিয়া ল্যাব উদ্ভাবিত এ নতুন শিশুশিক্ষা কার্যক্রম দেখে আমি উল্লসিত হই। আমাদের দেশের শিশুশিক্ষার পশ্চৎপদতা নিয়ে ভাবি। আমাদের বহুরূপী শিক্ষা পদ্ধতি[১৫] শিশুদের মনস্তত্ত্বে কতই না নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে। অভিভাবকরা শিশুদেরকে ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, পাইলট বানাবার জন্য তাদের ওপর কত বেশি নির্যাতন করছেন। শিশুরা কি পড়তে চায়, তাদের কি ভালো লাগে, সে বিষয়ে বাংলাদেশি অভিভাবকদের মনোযোগ নেই। তারা তাদের ছেলেমেয়েদের সব সময় পরীক্ষায় ফার্স্ট হতে দেখতে চান। সে প্রয়োজনে তারা সন্তানের আনন্দ কোরবানি করতে দ্বিধা করেন না। এ জন্য টাকা খরচে তাদের কার্পণ্য নেই। কিন্তু শিশুরা লেখাপড়ায় আনন্দ পাচ্ছে কিনা, সে বিষয়ে তারা মোটেও মনোযোগী নন। ওই মনোযোগের পরিবর্তে অভিভাবকগণ তাদের সন্তানদের প্রয়োজনে কোচিংয়ের পর কোচিং করান। তাদের জন্য একাধিক টিউটর রাখেন। উল্লেখ্য, অল্প বয়সে শিশুর কাঁধে এত বেশি বই-খাতার ভার চাপিয়ে দেন যে, শিশু শিক্ষার্থী তার স্কুলব্যাগ বইতে পারে না। মা, বা অন্য কাউকে শিশুর স্কুলব্যাগ বইতে হয়। এর ফলে মারা যায় শিশুর আনন্দ। শিশুকে জিজ্ঞেস করা হয় না, সে কি করতে চায়। শিশু অঙ্ক পছন্দ না করলেও তাকে অঙ্কের ক্লাস করতে হয়। শিশু যদি বলে অঙ্ক ভালো লাগছে না, আমি এ ক্লাসে বসব না। তাহলে সর্বনাশ। তার স্কুলে পড়া কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। অর্থাৎ বাংলাদেশি শিক্ষা ব্যবস্থায় শিশুর ভালো লাগা, বা না লাগার মূল্যায়ন করা হয় না। এখানে পাঠ্যক্রমের জেলখানায় বন্দি করে শিশুর আনন্দ হত্যা করা হয়। তার ওপর চলে নিষ্ঠুর নির্যাতন। অভিভাবকগণ নীরব। তাদের এ সব ভাবার সময় নেই। শিশুর আনন্দ মারা গেলে তাদের কিছু এসে যায় না। শিশুর ওপর লেখাপড়ার চাপ সৃষ্টি করে স্কুল বাচ্চার আনন্দ কেড়ে নিলে অভিভাবকগণ খুশি হন। যে স্কুলটি শিশু শিক্ষার্থীকে যত চাপে রাখে, সে স্কুলের

---

১৫ এ দেশে চলমান বিভিন্ন রকম শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্যে রয়েছে সরকারি ও বেসরকারি মালিকানার স্কুল। সেনাবাহিনী পরিচালিত ক্যাডেট স্কুল ও কলেজ, চার্চ পরিচালিত স্কুল, এনজিও পরিচালিত স্কুল। আবার রয়েছে ধর্মপ্রভাবিত বিভিন্ন প্রকার মাদ্রাসা। আলীয়া মাদ্রাসা, কওমি মাদ্রাসা, ফোরকানিয়া, হাফিজিয়া, মহিলা, ক্যাডেট মাদ্রাসা, ইত্যাদি। ইংরেজি মাধ্যম স্কুলের মধ্যে রয়েছে ন্যাশনাল কারিকুলাম পড়ানো ইংরেজি মিডিয়াম স্কুল; যুক্তরাজ্যের এডেক্সেল ও ক্যামব্রিজ কারিকুলাম পড়ানো ইংরেজি মাধ্যম স্কুল এবং বিভিন্ন কুটনৈতিক মিশন পরিচালিত ইংরেজি মাধ্যম স্কুল। ফলে তিন রকম ভাষায় (বাংলা, ইংরেজি, আরবি) অনেক রকম কারিকুলাম পড়ে শিশুরা বিভিন্ন মানসিকতা নিয়ে বেড়ে উঠছে।

ওপর অভিভাবকগণ তত বেশি খুশি হন। স্কুলগুলোর মধ্যে চলে অদৃশ্য নিঃষ্ঠুরতার প্রতিযোগিতা।[১৬]

এমআইটির মিডিয়া ল্যাব পরিচালিত নতুন শিশুশিক্ষা পদ্ধতি দেখে যেমন আনন্দ পেয়েছি, তেমনি নিজ দেশের শিশুশিক্ষা পদ্ধতির পশ্চাৎপদতার কথা ভেবে কষ্ট পেয়েছি। অথচ একটু পরিকল্পনা করে আমরা শিশুশিক্ষাকে আনন্দময় করতে পারি। শিশুদের আগ্রহের এলাকায় কাজ করিয়ে তাদের সময়টাকে আনন্দময় করা যায়। মাথার ওপর পরীক্ষার বোঝা না চাপিয়ে— খেলাধূলা, নাচ, গান ও বিভিন্ন রকম সৃষ্টিশীল কর্মকাণ্ডের মধ্য দিয়ে শিশুদের গড়ে তোলা যায়। ফার্স্ট, সেকেন্ড, অথবা, নম্বর বা গ্রেডের প্রতিযোগিতা থেকে সরিয়ে এনে শিশুদেরকে তাদের নিজ নিজ আগ্রহের এলাকায় সৃষ্টিশীল কাজে উদ্বুদ্ধ করা যায়। এমনটি করাতে পারলে শিশুর লেখাপড়া ও বেড়ে ওঠা আনন্দদায়ক হয়ে ওঠে। এসব বিষয়ে আমাদের শিক্ষা মন্ত্রণালয় বা সংশ্লিষ্টদের কোনো মনোযোগ আছে কি? কেবলমাত্র ঢাকাস্থ কতিপয় কূটনৈতিক মিশন পরিচালিত ইংরেজি মাধ্যম স্কুল বাদ দিলে, মূল ধারার স্কুলগুলোর তেমন চিন্তা-ভাবনা নেই। মূল ধারার শিশুশিক্ষায় কেবল লেখাপড়ার চাপ আর চাপ। সে জায়গায় শিশুর মানসিকতার বিকাশ ও আনন্দের বিষয়টি অনুপস্থিত। এ বিষয়ে সরকার ও শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অনেক ভাবার আছে।

ডিসওবিডিয়েন্স অ্যাওয়ার্ড

বিশ্বের প্রযুক্তিসেরা বিশ্ববিদ্যালয় এমআইটির মিডিয়া ল্যাব ২০১৬ সাল থেকে প্রতিযোগিতার ভিত্তিতে একটি অভিনব পুরস্কার দেয়া শুরু করে। পুরস্কারটির নাম ডিসওবিডিয়েন্স অ্যাওয়ার্ড। সাদামাটা বাংলায় বলা যায় 'অবাধ্যতার পুরস্কার' বা 'বেয়াদবির পুরস্কার'। প্রথমে আমি এ বিষয়টি জেনে বিস্মিত হই। কিন্তু পরে মিডিয়া ল্যাবের পিএইচডি ছাত্র নাজমুস সাকিব আমাকে এ ব্যাপারে প্রাথমিক ধারণা দিলে আমি বিষয়টি নিয়ে আগ্রহী হই। এ পুরস্কার সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে জানার চেষ্টা করি। আমার মনে হয়, প্রথাবিরোধী সৃষ্টিশীল লেখক-গবেষকদের সমাজের চোখ রাঙানি ও পরনিন্দা থেকে বাঁচিয়ে তাদের সৃষ্টিশীল কাজে উৎসাহিত করার জন্য প্রদত্ত এ পুরস্কারটি সম্পর্কে সবার জানা দরকার।

পাশ্চাত্য সমাজে শিশু কিশোর ও ছাত্রছাত্রীদের কথা মনোযোগ দিয়ে শোনা হয়। মানুষ স্বাধীনভাবে কথা বলতে ও চিন্তা করতে পারে। তারপরও ভিন্ন চিন্তাধারার গবেষকগণ অনেক সময় স্বীকৃতি পান না। নিজের বিশ্বাস বা ধারণা প্রতিষ্ঠায় উন্নত সমাজেও প্রথাবিরোধী মেধাবীদের নানাবিধ বাধার মুখোমুখি হতে হয়। নিজস্ব আবিষ্কার, বা মৌলিক সৃষ্টির স্বীকৃতির পরিবর্তে তাদেরকে

১৬ প্রাসঙ্গিক তথ্যের জন্য দেখুন, মুহাম্মদ ইয়াহ্‌ইয়া আখতার, 'নতুন পদ্ধতি শিক্ষার প্রতি শিশুর আগ্রহ বাড়াবে', *যুগান্তর*, ৩১ আগস্ট, ২০১৭।

অনেকক্ষেত্রে পেতে হয় অবহেলা, তিরস্কার, সমালোচনা ও নিন্দা। এ দুরবস্থা থেকে বাঁচিয়ে কিভাবে সৃষ্টিশীল ও জনকল্যাণকামী মেধাবীদের মূল্যায়ন করা যায় সে সম্পর্কে পাশ্চাত্যে চিন্তাভাবনা চলছে। সম্প্রতি যুক্তরাষ্ট্রের প্রযুক্তিসেরা বিশ্ববিদ্যালয় এমআইটি-র মিডিয়া ল্যাবের প্রথাবিরোধী সৃষ্টিশীল গবেষকদের কল্যাণকামী গবেষণাকে স্বীকৃতি দেবার লক্ষে প্রতিযোগিতার মাধ্যমে তাদের অবদানমূলক কাজকে স্বীকৃতি প্রদান ও পুরস্কৃত করা এমনই একটি উদ্যোগ। ডিফায়েন্স অ্যাওয়ার্ড নামে ২০১৬ সাল থেকে প্রদত্ত এ পুরস্কারকে ২০১৭ সাল থেকে দেয়া হচ্ছে ডিসওবিডিএন্স অ্যাওয়ার্ড, বা 'অবাধ্যতার পুরস্কার' নাম দিয়ে। পুরস্কারের অর্থ ২ লাখ ৫০ হাজার মার্কিন ডলার। বাংলাদেশি টাকায় এর পরিমান ২ কোটি ১২ লাখ ৫০ হাজার টাকা (প্রতি ডলার ৮৫ টাকা হিসেবে)। ডিসওবিডিয়েন্স অ্যাওয়ার্ড প্রদানের জন্য অর্থের অভাব নেই। মিডিয়া ল্যাব পরিচালনার সঙ্গে যুক্ত ও লিঙ্কডইন-এর কো-ফাউন্ডার রেইড হফম্যান এ ব্যাপারে প্রয়োজনের চেয়ে বেশি অর্থ বরাদ্দ দিচ্ছেন।

কোন্ ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান আলোচ্য পুরস্কার পাবেন/পাবে সে বিষয়টি একটি নিরপেক্ষ মূল্যায়ন পদ্ধতির মধ্য দিয়ে নির্ধারিত হয়। মিডিয়া ল্যাব এ ব্যাপারে পেশাদারিত্বের সঙ্গে কাজ করে। ২০১৭ সালে উল্লিখিত পুরস্কার দেয়ার জন্য মার্চ মাসে নমিনেশন আহ্বান করা হয়। অগ্রাধিকার দেয়া হয় ইতিবাচক সামাজিক পরিবর্তনে ভূমিকা পালনকারী সৃষ্টিশীল গবেষণা ও উদ্যোগকে। এর মধ্যে বৈজ্ঞানিক গবেষণা, নাগরিক অধিকার, বাক স্বাধীনতা ও মানবাধিকার, প্রভৃতি ক্ষেত্রে সমাজের জন্য ইতিবাচক পরিবর্তন সৃষ্টিকারী গবেষকদের পক্ষে নমিনেশন জমা পড়ে। এই এ্যাওয়ার্ড প্রদানের উদ্দেশ্য হলো সৃষ্টিশীল ও সমাজের জন্য উপকারী গবেষণা করেও মনোযোগ না পাওয়া মেধাবীদের পুরস্কার দিয়ে তাদের কাজের স্বীকৃতি প্রদান করা। তাদেরকে নতুন প্রজন্মের রোল মডেল হতে সহায়তা করা। বিশ্বের যে কোনো প্রান্তেই হোক না কেন, সমাজ ও মানুষের জন্য উপকারী উদ্ভাবন ও গবেষণা করলে যে তার স্বীকৃতি পাওয়া যায়— সে সত্য প্রতিষ্ঠিত করে মানবকল্যাণে কাজ করতে গবেষকদের উৎসাহিত করা। মিডিয়া ল্যাব এ অ্যাওয়ার্ডের উদ্দেশ্য বর্ণনা করেছে এভাবে:

> Disobedience Award objectives are to build awareness and support of disobedience-robust work being done around the world, and to promote role models for younger people. With this award, we honor work that impacts society in positive ways, and is consistent with a set of key principles, including nonviolence, creativity, courage, and responsibility for one's actions.

কাজেই ডিসওবিডিএন্স অ্যাওয়ার্ড প্রদানের উদ্যোগটি বিশ্বব্যাপী ওই সব মেধাবী বিজ্ঞানী ও গবেষকদের উৎসাহিত করে, যারা প্রথাবিরোধী ভঙ্গিমায় সমাজ ও

মানবতার কল্যাণে কাজ করে সামাজিক চোখ রাঙানি ও নাগরিক সমাজের সমালোচনায় কোনঠাসা হয়ে আছেন।

২০১৭ সালের এ পুরস্কার দেয়ার জন্য ওই বছর মার্চ মাসে নমিনেশন আহ্বান করা হলে বেশ সাড়া পড়ে। ১ মে, ছিল নমিনেশন জমা দেবার শেষ দিন। যেহেতু প্রতিযোগিতাটি হয় বিশ্বব্যাপী এবং এ ব্যাপারে উন্নয়নশীল বিশ্বের অনেক দেশ ভালোভাবে জানে না, সে কারণে মিডিয়া ল্যাবের শিক্ষক ও গবেষকদের এ বিষয়টি সবাইকে জানিয়ে দিতে অনুরোধ করা হয়। যারা কোনো বিশেষ ব্যক্তি/গোষ্ঠীর প্রথাবিরোধী ও প্রচার না পাওয়া ইতিবাচক গবেষণা সম্পর্কে অবহিত, তারা যাতে ওই ব্যক্তি বা গোষ্ঠীকে এই এ্যাওয়ার্ডের জন্য মনোনীত করেন সে জন্য আয়োজকরা ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। যাদের মনোনীত গবেষক পুরস্কৃত হন, মিডিয়া ল্যাব তাদেরকে আসা যাওয়ার বিমান ভাড়া দিয়ে পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠানে আনার ঘোষণা দিয়ে সবাইকে মনোনয়ন দিতে উৎসাহিত করে। বিভিন্ন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমেও (ফেসবুক, টুইটার, প্রভৃতি) এ সম্পর্কে জানান দেয়া হয়। এ সব ইতিবাচক পদক্ষেপ গ্রহণ করায় ২০১৭ সালের পুরস্কারের জন্য নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ৭ হাজার ৮ শত নমিনেশন জমা পড়ে।

নমিনেশনগুলো মূল্যায়ন করার জন্য মিডিয়া ল্যাবের ১০ জন বিভিন্ন বিষয়ের বিশেষজ্ঞকে দিয়ে একটি মূল্যায়ন কমিটি গঠন করে। এ সব অধ্যাপক ও গবেষকগণ প্রত্যেকেই অত্যন্ত কর্মব্যস্ত। সে কারণে এরা জমা পড়া সবগুলো নমিনেশনকে মূল্যায়নের আওতায় না এনে বাছাই প্রক্রিয়া অনুসরণ করে শক্তিশালী মনোনয়নগুলোকে মূল্যায়ন করেন। এ লক্ষ্যে এরা প্রথম বৈঠকে ৭ হাজার ৮ শত নমিনেশনের মধ্য থেকে ২০০ নমিনেশন বাছাই করেন। পরে সেগুলোকে নিবিড়ভাবে মূল্যায়ন করে ২০১৭ সালের ডিসওবিডিয়েন্স এ্যাওয়ার্ড প্রদানের জন্য মার্কিন বিজ্ঞানী ড. মোনা হান্না-অতীসা ও প্রফেসর মার্ক এডওয়ার্ডস-কে নির্বাচন করেন। ২০১৭ সালের ২১ জুলাই এ দুই বিজ্ঞানীর হাতে অনুষ্ঠানিকভাবে এ পুরস্কার তুলে দেয়া হয় (পুরস্কার বিজয়ী দুই মার্কিন বিজ্ঞানীর ছবির জন্য দেখুন পরিশিষ্ট- ৫:১১)। এ দুই বিজ্ঞানী মিশিগানের ফ্লিন্ট-এর নাগরিকদের পানিসংকট সমস্যা গভীর বিজ্ঞান গবেষণার সাহায্যে সমাধান করেন। ঝুঁকি নিয়ে এ কাজ করতে গিয়ে তাদেরকে সমালোচিত হতে হয়। তবে এরা এ কাজে সফল হন। প্রমাণ করেন, আন্দোলন বা সহিংসতার পথ পরিহার করে জ্ঞান-বিজ্ঞান গবেষণার শক্তি দিয়ে মানবিক সমস্যার সমাধান করা যায়। নিশ্চিত করা যায় নাগরিক কল্যাণ। এদের গবেষণার ফলে মিশিগানের সংশ্লিষ্ট এলাকার জনগণ পানিসংকট সৃষ্ট সম্ভাব্য স্বাস্থ্যক্ষতি থেকে রক্ষা পান।

এশীয় দেশগুলো কি তাদের মধ্যে পৃথকভাবে এমন এ্যাওয়ার্ড প্রদান চালু করতে পারে? অথবা, বাংলাদেশ কি পারে জাতীয়ভাবে এমন এ্যাওয়ার্ড প্রদানের প্রচলন করতে? এ সব বিষয় নিয়ে ভাবার আছে। উল্লেখ্য, মেধাবীদের উৎসাহিত

করতে, বা বিশেষ ক্ষেত্রে অবদানের স্বীকৃতি দিতে বাংলাদেশে কতিপয় জাতীয় পুরস্কার প্রদান করা হয়। এর মধ্যে বাংলা একাডেমি পুরস্কার, একুশে পদক এবং স্বাধীনতা পদকের কথা বলা যায়। এ পদকগুলো নিয়মিতভাবে দেয়া হলেও পদকপ্রাপ্তদের বাছাই প্রক্রিয়ায় রাজনৈতিক প্রভাব ও পেশাদারিত্বের অভাব প্রতীয়মান হয়। এ পর্যন্ত অনেক যোগ্য কবি-সাহিত্যিক এ পুরস্কার না পেলেও অনেক অযোগ্য ব্যক্তিকে এ পুরস্কার দেয়া হয়েছে। ঘটেছে পুরস্কার দিয়ে আবার সে পুরস্কার প্রত্যাহার করে নেবার মত নজিরবিহীন লজ্জাজনক ঘটনা।[১৭] এ সম্পর্কে এ গ্রন্থের দশম অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে। ব্যক্তি যত যোগ্যই হন না কেন, তিনি যদি সরকারি গুডবুকে না থাকেন তাহলে তার পক্ষে পুরস্কার পাওয়া সম্ভব হয় না। এ দেশের গ্রামেগঞ্জে অনেক অপরিচিত প্রতিভা আছেন যারা সুযোগের অভাবে তাদের স্বপ্ন ও মানব কল্যাণকারী পরিকল্পনা কার্যকরী করতে পারছেন না। বাংলাদেশে তো সমস্যার অন্ত নেই। বড় শহরগুলোয় জলাবদ্ধতা, আবাসন, যানজটসহ অনেক সমস্যা রয়েছে। দেশে সুশাসন, গণতন্ত্র, দুর্নীতি, নির্বাচন, সহিংসতা, ধর্ষণ ও নিরাপত্তা সমস্যাসহ রয়েছে আরও অনেক সমস্যা। সরকার চেষ্টা করেও সনাতনি প্রক্রিয়ায় এ সব সমস্যার সমাধান করতে না পারায় অনেক ক্ষেত্রে সৃষ্টি হয় নাগরিক বিক্ষোভ ও রাজনৈতিক আন্দোলন। রাজপথের সহিংস আন্দোলনের পরিবর্তে বিজ্ঞান গবেষণা ও প্রযুক্তি ব্যবহার করে এ সব সমস্যা সমাধানের উপায় নিয়ে নাগরিক সমাজের ভাবা দরকার। জাতীয়ভাবে এ রকম একটি এ্যাওয়ার্ড প্রদান করে অপরিচিত প্রথাবিরোধী মেধাবীদেরকে জনকল্যাণকামী কাজে উৎসাহিত করলে তারা তাদের সৃষ্টিশীল পরিকল্পনার মাধ্যমে হয়ত অনেক সমস্যার সমাধান করতে পারবেন। এ ব্যাপারে সরকার অথবা

---

১৭. উল্লেখ্য, ২০২০ সালে অন্যান্যদের সঙ্গে সাহিত্যে এস এম রইজ উদ্দিন আহম্মদ এবং সংস্কৃতিতে কালিপদ দাসকে স্বাধীনতা পুরস্কার এবং ভাষা ও সাহিত্যে নাজমুন নেসা পিয়ারিকে একুশে পদক দেয়া হলে সুশীল সমাজে ব্যাপক সমালোচনা হয়। সরকারি দলের প্রেসিডিয়াম সদস্য ড. নূহ আলম লেনিন স্বাধীনতা পদকের জন্য মনোনীতদের মধ্যে দু'জনকে কেন স্বাধীনতা পুরস্কারে ভূষিত করা হচ্ছে তার জন্য মন্ত্রীপরিষদ বিভাগকে ব্যাখ্যা দিতে বলেন। বাংলা একাডেমির সাবেক মহাপরিচালক অধ্যাপক শামসুজ্জামান খান মন্তব্য করেন: 'এবার সাহিত্যে স্বাধীনতা পুরস্কার পেলেন রইজউদ্দীন, ইনি কে? চিনি না তো। কালিপদ দাসই বা কে! হায়! স্বাধীনতা পুরস্কার!'; ভাষা ও সাহিত্যে নাজমুন নেসা পিয়ারির অবদান নিয়েও প্রশ্ন ওঠে পত্র-পত্রিকা ও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে। দেখুন, *কালের কণ্ঠ*, ২৫ ফেব্রুয়ারি ও ১২ মার্চ, ২০২০; *যুগান্তর*, ২৬ ফেব্রুয়ারি, ২০২০। রইজ উদ্দিন-কে সাহিত্যে স্বাধীনতা পুরস্কার দিয়ে আবার তা প্রত্যাহার করে নেয়াকে একজন কলামিস্ট 'নজিরবিহীন লজ্জাজনক ঘটনা' হিসেবে উল্লেখ করেন। দেখুন, মুহাম্মদ ইয়াহ্ইয়া আখতার, 'আয়নায় বিকৃত চেহারা', *যুগান্তর*, ২১ মার্চ, ২০২০।

দেশপ্রেমিক ব্যবসায়ী আইকনরা উদ্যোগ নেয়ার কথা ভাবতে পারে/পারেন।[১৮] তবে এ ক্ষেত্রে অবশ্যই রাজনৈতিক প্রভাবমুক্ত থেকে প্রকৃত যোগ্যদেরকে তাদের অবদানমূলক কাজের স্বীকৃতি হিসেবে এ পুরস্কার দিতে হবে।

সবকিছু মূল্যায়ন করার পর ভাবি, মিডিয়া ল্যাবের ডিসওবিডিয়েন্স এ্যাওয়ার্ড প্রদান নতুন এবং অভিনব হলেও ফলদায়ক। এ কার্যক্রম প্রথাবিরোধী নতুন গবেষকদেরকে মানুষ ও সমাজের কল্যাণে কাজ করতে প্রেরণা যোগায়। তবে, প্রতিযোগিতাটি যেহেতু সারা বিশ্বের জন্য আয়োজিত, সে ক্ষেত্রে কেবল সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে প্রচার করে এ প্রতিযোগিতা সম্পর্কিত প্রচারণা সম্পন্ন হয়েছে মনে করা যথার্থ নয় বলে আমার কাছে মনে হয়। এ প্রতিযোগিতার আয়োজকদের উন্নয়নশীল দেশগুলোকে এ প্রতিযোগিতায় প্রত্যাশিত মাত্রায় অংশগ্রহণে উদ্বুদ্ধ করাতে ওই দেশগুলোতে এ সম্পর্কিত প্রচারণার ধরন সম্পর্কে ভিন্নভাবে চিন্তা করা ভালো। শিক্ষা ও প্রযুক্তির উন্নয়নে পশ্চাৎপদ আফ্রিকা ও এশিয়ার দেশগুলোর নাগরিকরাও যেন এ এ্যাওয়ার্ড প্রদান সম্পর্কে সময়মত জানতে-বুঝতে ও অংশগ্রহণ করতে পারেন সে সম্পর্কে এমআইটি মিডিয়া ল্যাবের ভাবা প্রয়োজন। আগামীতে এ পুরস্কারের জন্য নমিনেশন আহ্বানের সময় মিডিয়া ল্যাবের সারা বিশ্বের জন্য একই ভঙ্গিমায় এ সম্পর্কিত প্রচারণা করা যথার্থ হবে না। শিক্ষা-দীক্ষা ও জ্ঞান-বিজ্ঞানে পিছিয়ে থাকা উন্নয়নশীল দেশগুলোতে এ এ্যাওয়ার্ড প্রদান সম্পর্কিত প্রচারণা ওই সমাজের উপযোগী করে ভিন্নভাবে করা উত্তম। তাহলে ওইসব স্বল্পোন্নত দেশগুলো থেকেও এ এ্যাওয়ার্ডের জন্য নমিনেশন জমা পড়বে। সবকিছু মূল্যায়ন করে বলা যায়, স্বীকৃতি না পাওয়া, প্রথাবিরোধী, মেধাবী লেখক-গবেষকদেরকে সমাজ ও মানুষের কল্যাণে কাজ করতে এমআইটি মিডিয়া ল্যাবের ডিসওবিডিএন্স এ্যাওয়ার্ড নতুনভাবে উৎসাহিত করছে। উন্নয়নশীল বিশ্বের মেধাবী গবেষকরা এ উদ্যোগ সম্পর্কে জানতে পারলে সৃষ্টিশীল কাজে উৎসাহিত হবেন।[১৯]

হার্ভার্ড বিজনেস স্কুল

পৃথিবীর বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর মধ্যে আমেরিকার হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়কে অন্যতম সেরা বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে গণ্য করা হয়। প্রথম আমেরিকা সফরে আমি যে ছয়টি অঙ্গরাজ্য ভ্রমণের সুযোগ পেয়েছিলাম তার মধ্যে ম্যাসাচুসেটস ছিল না। ওই সফরে আমরা ওয়াশিংটন, সাউথ ক্যারোলিনা ও ফিলাডেলফিয়ায় একটি করে

১৮. প্রাসঙ্গিক তথ্যের জন্য দেখুন, মুহাম্মদ ইয়াহ্ইয়া আখতার, 'অনুকরণযোগ্য এক মহৎ উদ্যোগ', *যুগান্তর*, ২৫ সেপ্টেম্বর, ২০১৭।

১৯. এমআইটি-র মিডিয়া ল্যাব পরিদর্শনকালে ডিসওবিডিএন্স অ্যাওয়ার্ড সম্পর্কে লেখককে তথ্য-উপাত্ত দিয়ে সহায়তা করেছেন মিডিয়া ল্যাবের সোস্যাল মেশিন রিসার্চ গ্রুপের পিএইচডি গবেষক জনাব নাজমুস সাকিব।

বিশ্ববিদ্যালয় পরিদর্শন করতে পারলেও সেগুলোর কার্যক্রম নিবিড়ভাবে বিশ্লেষণ করতে পারিনি। কিন্তু ২০১৭ সালে দ্বিতীয় আমেরিকা সফরে আমার মেয়ে ও জামাইয়ের সুবাদে হার্ভার্ড ও এমআইটির মত বিশ্বসেরা বিশ্ববিদ্যালয় পরিদর্শন করতে পারি। তাদের সহযোগিতার ফলে এ দুটি বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যক্রম অনুধাবন করতে পারি। বিশেষ করে মেয়ের সহযোগিতার ফলে আমি হার্ভার্ড বিজনেস স্কুলের কার্যক্রম ও ক্লাস পদ্ধতি সরেজমিনে পর্যবেক্ষণের সুযোগ পাই। এ কথা নিশ্চিতভাবে বলতে পারি যে, বাণিজ্য শিক্ষায় হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের পেশাদারিত্ব ঈর্ষণীয়।

বাংলাদেশের মত আমেরিকার শিক্ষার্থীরা বিবিএ করার পরই এমবিএ ডিগ্রি করেন না। হার্ভার্ড বিজনেস স্কুল এমবিএ প্রোগ্রামে ভর্তির ক্ষেত্রে বিভিন্ন ডিসিপ্লিনের গ্রাজুয়েটদের কয়েক বছর চাকুরির অভিজ্ঞতা অর্জনের পর এ প্রোগ্রামে আবেদন করতে উৎসাহিত করে। তবে অতিরিক্ত যোগ্যদের ক্ষেত্রে এ ব্যাপারে কিছু ছাড় দেয়া হয়। এর ফলে শিক্ষার্থীরা চাকুরি করাকালীন সরেজমিনে যেসব সমস্যার সম্মুখীন হন, শ্রেণিকক্ষে তারা ওই সমস্যাগুলোর সমাধান খুঁজে পেতে প্রয়াস পান। শিক্ষক নিয়োগ ও শিক্ষার্থী ভর্তির জায়গাটিতে হার্ভার্ড বিজনেস স্কুল অত্যন্ত পেশাদার। এ জায়গায় যোগ্যতা ও মেধা যাচাইয়ের ব্যাপারে কোনো রকম আপোষ করা হয় না। শিক্ষার্থীদের আবেদনপত্র এবং একাডেমিক যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা পেশাদারিত্বের সঙ্গে খুঁটিয়ে পরীক্ষা করা হয়। তারপর নেয়া হয় তাদের মৌখিক পরীক্ষা। ২০১৮ সালে এমবিএ ডিগ্রি সম্পন্নকারী একজন শিক্ষার্থীর কাছে তার হার্ভার্ড বিজনেস স্কুলের ভর্তি হওয়া সম্পর্কে জানতে চাইলে তিনি বলেন, এখানে ভর্তি প্রক্রিয়া খুবই প্রতিযোগিতামূলক। কারণ, হার্ভার্ড বিজনেস স্কুলের এমবিএ প্রোগ্রামে যারা আবেদন করেন, তাদের সবাই ভালো এবং যোগ্য। কাজেই কর্তৃপক্ষের কাজ হলো আবেদনকারীদের মধ্য থেকে সবচেয়ে সম্ভাবনাময় ও যোগ্যদের বেছে বের করা। এ কাজটি এরা পেশাদারিত্বের সঙ্গে করেন।[২০]

আপনি কিভাবে সুযোগ পেলেন? আপনার যোগ্যতা কি? এমন প্রশ্নের জবাবে এ শিক্ষার্থী বলেন, আমি এমআইটি থেকে ম্যাটেরিয়ালস সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং বিষয়ে গ্রাজুয়েশন করেছি। তারপর একটি বড় কোম্পানীতে রিসার্চ ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে প্রায় আড়াই বছর চাকুরি করেছি। চাকুরিক্ষেত্রে আমার পারফরম্যান্স ভালো ছিল। এরপরও আমার আবেদনপত্র খুঁটিয়ে পরীক্ষা করা হয়, যা আমি আমার ৪০ মিনিটের মৌখিক পরীক্ষা গ্রহণের সময় বুঝতে পারি। আমার একাডেমিক প্রোফাইল, চাকুরি অভিজ্ঞতা এবং মৌখিক পরীক্ষার পারফরম্যান্স পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে আমাকে যোগ্য মনে হওয়ায় এরা আমাকে এ বিশ্বসেরা

২০. প্রাসঙ্গিক তথ্যের জন্য দেখুন, মুহাম্মদ ইয়াহ্ইয়া আখতার, 'দুই বাণিজ্য শিক্ষার পার্থক্যটা স্পষ্ট', *যুগান্তর*, ১১ সেপ্টেম্বর, ২০১৭।

বিশ্ববিদ্যালয়ে এমবিএ পড়ার সুযোগ দিয়েছে। আমি আরেকটি স্বনামখ্যাত আমেরিকান বিশ্ববিদ্যালয়ে (এমআইটি) পড়ার অভিজ্ঞতা নিয়ে বলতে পারি, হার্ভার্ডে পড়ার সুযোগ না পেলে বুঝতে পারতাম না যে এরা কত বেশি পেশাদার। শিক্ষার্থী বাছাইয়ে হার্ভার্ড বিজনেস স্কুল কত বেশি পেশাদার তা এ শিক্ষার্থীর কাছে থেকে একটি বিষয় শুনে অনুধাবন করতে পেরেছিলাম। তিনি বলেন, আমি এমবিএ প্রোগ্রামে অফার লেটার পাওয়ার পরও চাকুরি করছিলাম এবং ক্লাস শুরু হবার কিছুদিন আগে চাকুরি ছাড়ার পরিকলপনা করি। কিন্তু অফার লেটার পাওয়ার পর মাঝেমধ্যে আমাকে নতুন শিক্ষার্থীদের জন্য গেট টুগেদার, ফ্রি লাঞ্চ, ইত্যাদি ধরনের অনুষ্ঠানে দাওয়াত করা হত। কিন্তু যেহেতু আমি তখনও চাকুরি করতাম, সে কারণে আমি সে সব প্রোগ্রামে যেতাম না। তবে একবার এমন একটি প্রোগ্রাম সাপ্তাহিক ছুটির দিনে হওয়ায় আমি ওই প্রোগ্রামটিতে যোগ দেই।

এ রকম প্রোগ্রামে শিক্ষার্থীদের সঙ্গে অনেক শিক্ষকও যোগ দেন। বিরাট সবুজ ঘাসের লনে অনেক গোল টেবিলে খাবার সাজানো ছিল। আমার পরিচিত মাত্র তিন-চারজন এমআইটির শিক্ষার্থী পেয়েছিলাম। বেশ কয়েকজনের সঙ্গে হাই হ্যালো করে কিছু খাবার খেয়ে ভাবছিলাম বাসায় চলে আসব। এমন সময় দেখি সেই প্রফেসর, যিনি একজন মনস্তাত্ত্বিকসহ আমার ৪০ মিনিটের মৌখিক পরীক্ষা নিয়েছিলেন। নিশ্চয়ই তাঁরা আমাকে পছন্দ করেছিলেন এবং ভালো রিপোর্ট দিয়েছিলেন। তা না হলে তো আর আমি ভর্তির সুযোগ পেতাম না। ভাবলাম, যাই প্রফেসরকে একটি ধন্যবাদ দিয়ে আসি। আমি তাঁর কাছে গিয়ে বললাম, হ্যালো প্রফেসর, আপনি কি আমায় চিনতে পেরেছেন? আপনি আমাকে ইন্টারভিউ করেছিলেন। আমি তো হার্ভার্ডে ভর্তি হতে পেরে খুব খুশি। আপনাকে অনেক ধন্যবাদ। তিনি আমাকে নাম ধরে ডেকে বাচ্চাদের ছড়া মুখস্ত বলার মতো করে আমি কোন দেশ থেকে এসেছি, কোথায় পড়েছি, কেমন ফল ছিল, কোথায় চাকুরি করতাম, এমনকি আমার বাবা কি করেন ইত্যাদি সবকিছু গড়গড় করে বলা শুরু করলেন। হাতের ইশারায় তাকে থামিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, আপনি কি কেবলমাত্র আমাকেই ইন্টারভিউ করেছিলেন? প্রফেসর বললেন, না না আরও কয়েকজনকে ইন্টারভিউ করেছিলাম। কিন্তু দেখ, আমরা যাকে ভর্তি করি তার সবকিছু আমরা খুব ভালোভাবে পরখ করি। কেবল ইন্টারভিউ নয়, শিক্ষার্থীর অ্যাপলিকেশন প্যাকেজের প্রতিটি শব্দ আমরা বিশ্লেষণ করি। আমাদের মনস্তাত্ত্বিকরা এসব নিয়ে কাজ করেন। এত গভীরভাবে কাজ করায় তাদের সবকিছু আমাদের মনে গেঁথে যায়। এ কারণে তা অনেকদিন মনে থাকে। তবে সামনের বছর আবার ইন্টারভিউ নেয়া শুরু করলে হয়ত তোমাদের তথ্যগুলো ঝাপসা হয়ে যাবে। এ থেকে অনুধাবন করা যায় যে হার্ভার্ড শিক্ষার্থী ভর্তি করার ব্যাপারে কতটা পেশাদার।

শিক্ষক নিয়োগে হার্ভার্ড বিজনেস স্কুল খুবই পেশাদার। শিক্ষক পদে আবেদনকারীর যোগ্যতা ও মেধা এরা বিভিন্নভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেন। আবেদনকারীকে শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের উপস্থিতিতে কোনো বিশেষ বিষয়ে 'টক'

(জব টক) দিতে বলা হয়; যেখানে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা তাঁর একাডেমিক যোগ্যতা বাজিয়ে দেখেন। আবেদনকারীকে বিভাগীয় ফ্যাকাল্টিদের সঙ্গে কথাবার্তা বলতে হয়। এরা আবেদনকারীর একাডেমিক যোগ্যতা এবং কাজের অবদান ও গভীরতা যাচাই করেন। এর আগে আবেদনকারীর একাডেমিক প্রোফাইল খুঁটিয়ে পরীক্ষা করা হয়। ফলে কম যোগ্যতা নিয়ে এ বিশ্ববিদ্যালয়ে কারো পক্ষে শিক্ষক হওয়া একেবারেই অসম্ভব। আবার শিক্ষক হলেই তার পক্ষে শিক্ষকতায় টিকে থাকার নিশ্চয়তা থাকে না। ছাত্রদের ইতিবাচক মূল্যায়ন এবং অবদানমূলক প্রকাশনায় ঘাটতি হলে শিক্ষকতায় টিকে থাকা যায় না। অনেকে আবার দু'চার বছর টিকে থাকলেও পরবর্তীতে পারফরম্যান্সে ঘাটতি থাকায় টেনিওরশিপ না পেয়ে শিক্ষকতা থেকে ছিটকে পড়েন।

হার্ভার্ড এমবিএ প্রোগ্রামের শ্রেণিকক্ষের শিক্ষাটা হয় অসাধারণ। এক বছরে যে ৯০০ শিক্ষার্থী এমবিএ প্রোগ্রামে ভর্তি হন তাদেরকে ৯০ জনের একেকটি সেকশনে ভাগ করা হয়। শিক্ষার্থীদের সাধারণত দুই বছরে ২২টি কোর্সে ৬৬ ক্রেডিট করতে হয়। অধিকাংশ ক্লাস হয় দেড় ঘন্টা করে। শ্রেণিকক্ষে প্রতি শিক্ষার্থীর জন্য সুনির্দিষ্ট নেমপ্লেটযুক্ত আসনে বসার ব্যবস্থা থাকে। ছোট গ্যালারি সাইজের অত্যাধুনিক প্রযুক্তিসমৃদ্ধ ক্লাসরুমগুলো দেখার মতো। প্রতিটি শ্রেণিকক্ষে রয়েছে একেক রো'তে তিনটি করে মোট নয়টি ব্ল্যাকবোর্ড, প্রজেক্টর, তিনটি ডিসপ্লে স্ক্রিন ও একটি টিভি স্ক্রিন। ক্লাসে কোনো বিষয়ে শিক্ষার্থীদের মতামত গ্রহণের প্রয়োজন হলে প্রতি আসনের টেবিলে ডিজিটাল ভোটিংয়ের ব্যবস্থা রয়েছে। এখানে শিক্ষক এবং শিক্ষার্থী প্রত্যেকেই সুনির্দিষ্ট বিষয়ের ওপর পূর্ণ প্রস্তুতি নিয়ে ক্লাসে আসায় শ্রেণিকক্ষের আলোচনা হয় সমৃদ্ধ। ক্লাসের আলোচনায় শিক্ষার্থীরাই অংশগ্রহণ করেন বেশি। তবে শিক্ষক আলোচনা শুরু করেন এবং মাঝে মধ্যে হাল ধ'রে এবং প্রশ্ন ক'রে আলোচনাকে সুনির্দিষ্ট গতিধারায় প্রবাহিত করতে সহায়তা করেন।

শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার্থীরা কে কি আলোচনা করেন তার সবই শিক্ষকের সহযোগী (স্ক্রাইব) ক্লাসে বসে নোট নেন। ক্লাসের পর তিনি শিক্ষককে সে তথ্য সরবরাহ করেন। কোনো কারণে স্ক্রাইব অনুপস্থিত থাকলে পুরো ক্লাসের আলোচনা ভিডিও করা হয় এবং শিক্ষক ক্লাস শেষে ওই ভিডিও দেখে শিক্ষার্থীদের মূল্যায়ন করেন। শিক্ষার্থীদের হাতে-কলমে শিক্ষা দিতে অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে ওয়ার্কশপ করা হয়। একজন কর্মকর্তা বা ম্যানেজার কিভাবে ফিডব্যাক দিবেন, অথবা একজন ব্যবসায়ী কিভাবে অন্যের সঙ্গে সমঝোতা (নেগোসিয়েশন) করবেন, শিক্ষার্থীদের ছোট ছোট গ্রুপ করে ওই সব বিষয়ে ওয়ার্কশপ করা হয়। এ সব ওয়ার্কশপ ভিডিও করে শিক্ষার্থীদের বক্তব্য, শারীরিক ভাষা ও বাচন ভঙ্গিমাসহ সার্বিক পারফরম্যান্স অবলোকন করে মূল্যায়ন করা হয়। শিক্ষক হিসেবে কেবল পেশাদার একাডেমিক নন, কর্পোরেট বিশ্বের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন অবসরপ্রাপ্ত সিইও, বা সুশিক্ষিত সফল কোম্পানি মালিকদেরও প্রফেসর অব ম্যানেজমেন্ট হিসেবে

বিজনেস স্কুল শিক্ষকতার সুযোগ দেয়। সেমিস্টারের শুরুতে শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন শিক্ষকের ক্লাসে বসে তাদের পারফরম্যান্স পছন্দ হলে ওই কোর্স নিবেন কিনা তা নির্ধারণ করেন। নিয়মিত ক্লাস শুরু হলে শিক্ষার্থীর ক্লাস পার্টিসিপেশন এবং তার মান বিষয়ে শিক্ষক লক্ষ্য রাখেন এবং কম অংশগ্রহণকারী শিক্ষার্থীদের ক্লাসের আলোচনায় অংশগ্রহণে সুকৌশলে উদ্বুদ্ধ করেন। ক্লাসের আলোচনাকে এত বেশি গুরুত্ব দেয়া হয় যে শিক্ষার্থীর ক্লাস অংশগ্রহণের ওপরই থাকে ৫০% নম্বর এবং বাকি নম্বর থাকে পরীক্ষার পারফরম্যান্সের ওপর।

বিজনেস স্কুলের ক্লাসগুলো হয় কেস স্টাডিভিত্তিক। এই কেসগুলো শিক্ষকরা তৈরি করেন এবং সেগুলো ক্লাসে উপস্থাপন করে ওই সব কেস-এ উপস্থাপিত সমস্যার বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করিয়ে শিক্ষার্থীদরকে দিয়ে সমস্যার সমাধান করান। এমন কেস স্টাডিভিত্তিক ক্লাস সম্পর্কে ধারণা না থাকায় আমি বিষয়টি সরেজমিনে প্রত্যক্ষ করি। কোনো অভিভাবক হার্ভার্ডে ক্লাস করতে চাইলে তাদেরকে অনুমতি দেয়া হয়। আমি বিজনেস স্কুলের দু'জন অধ্যাপককে তাদের ক্লাস করার জন্য ই-মেইল দিয়ে অনুমতি চাই। দু'জনই আমাকে তাদের ক্লাসে স্বাগত জানান।[২১] এদের নিয়মানুযায়ী কোনো অভিভাবক ক্লাস করলে তাকে অধ্যাপক ক্লাসের শুরুতে উপস্থিত শিক্ষার্থীদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেন এবং শিক্ষার্থীরা করতালি দিয়ে তাকে স্বাগত জানান। তবে অভিভাবক ক্লাসে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত থেকে সবকিছু দেখতে ও শুনতে পারলেও তিনি কোনো প্রশ্ন করতে পারেন না। এ দুটি ক্লাস করে আমার কেস স্টাডি মেথড সম্পর্কে একটি ইতিবাচক ধারণা হয়। হার্ভার্ড বিজনেস স্কুলের শিক্ষকদের তৈরি করা অনেক কেস গুণগত শ্রেষ্ঠত্বের কারণে অন্য বিশ্ববিদ্যালয় পড়াবার জন্য অনেক সময় ক্রয় করে। আবার কখনো কোনো বড় কোম্পানির কোনো সমস্যা নিয়ে আলোচনাকালে ওই কোম্পানির সিইওকে ক্লাসে আনা হয়। শিক্ষার্থীদের আলোচনার পর তিনি বাস্তবে কিভাবে উপস্থাপিত ও আলোচিত সমস্যার সমাধান করেছেন তা শিক্ষার্থীদের সামনে তুলে ধরেন। এর ফলে শিক্ষার্থীরা সংশ্লিষ্ট সমস্যা সম্পর্কে বাস্তব ধারণা পান। বিজনেস স্কুলের পরীক্ষাগুলো হয় অন্য রকম। এখানে পরীক্ষার হলে ইনভেজিলেটর থাকেন না। শিক্ষার্থীরা বই-খাতা এমনকি ল্যাপটপও সঙ্গে রাখতে পারেন। পরীক্ষার্থীদের ওপর কেবল ইন্টারনেট ব্যবহার না করার নির্দেশনা থাকে। পরীক্ষার ফলাফলে কেবলমাত্র দুটি গ্রেড থাকে। পাস এবং ফেল। পরীক্ষায় কোনো রকম অনিয়ম হয় না। চাকুরি বাজারে হার্ভার্ড এমবিএদের চাহিদা ব্যাপক। শিক্ষার্থীরা প্রথম বর্ষের লেখাপড়া শেষ করে তাদের এক পৃষ্ঠার বায়োডাটা অফিসে

---

২১. যে দু'জন সম্মানিত অধ্যাপক আমাকে হার্ভার্ড এমবিএ প্রোগ্রামের ক্লাস কার্যক্রমে অংশগ্রহণ ও কেস স্টাডি মেথডের শিক্ষা পদ্ধতি সরেজমিনে পর্যবেক্ষণের সুযোগ দিয়েছিলেন তাঁরা হলেন প্রফেসরস জেফরি জোনস ও ডেভিড বি. ইওফী।

জমা দেন। কর্তৃপক্ষ এই ৯০০ জনের তথ্য কর্পোরেট বিশ্বের তালিকাভুক্ত কোম্পানিগুলোয় প্রেরণ করে। সেখান থেকে বড় বড় কোম্পানি তাদের চাহিদামত প্রার্থীদেরকে চাকুরির অফার দিয়ে থাকে। এ ছাড়া শিক্ষার্থীরা নিজেরা আবেদন করলেও হার্ভার্ড ডিগ্রিধারী হিসেবে চাকুরি বাজারে অগ্রাধিকার পান।

হার্ভার্ড বিজনেস স্কুলের শ্রেষ্ঠত্ব ধরা পড়ে এদের উন্নত ব্যবস্থাপনায়। এদের যাবতীয় কর্মকাণ্ডের পেশাদারিত্বে ভুল ধরা যায় না। ক্লাসরুম ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে দেখা যায়, একেকটি ক্লাস শেষ হবার ৫-১০ মিনিট আগে একজন স্টাফ দরজার বাইরে দাড়িয়ে থাকেন এবং ক্লাস শেষ হবার সাথে সাথে ক্লাসরুমে ঢুকে ব্লাকবোর্ড পরিষ্কার করে দিয়ে যান। ক্লাস শুরুর পূর্বমুহূর্তে আরেক জন স্টাফ এসে প্রফেসরের কাছে খোঁজ নেন যে ক্লাসে প্রযুক্তিগত বা অন্য কোনো সমস্যা আছে কিনা। এরা একাডেমিক লেখাপড়ার অংশ হিসেবে শিক্ষার্থীদেরকে বিদেশে পাঠাবার কাজ যেমন সুচারুভাবে সম্পন্ন করতে পারেন, তেমনি অনিবার্য কারণে কোনো ক্লাস সিডিউলের পরিবর্তন হলে সে সব বিষয়ও পেশাদারিত্বের সঙ্গে ম্যানেজ করতে পারেন। সশরীরে হার্ভার্ড বিজনেস স্কুলে গেলে লোকজন চোখে পড়ে না। কারণ, এরা সবাই সেমিস্টার চলাকালীন ক্লাসে ব্যস্ত থাকেন। কিন্তু ক্লাস ব্রেকের সময় দল বেঁধে শিক্ষার্থীদের অনেকেই বের হন। বিশেষ করে শীতের সময় ঘাসের ওপর বসে এবং শুয়ে এরা বই পড়েন। অনেকে বেঞ্চে বসে পড়েন, বা গল্প করেন। এ এক অন্য জগত। আসলে এখানে শিক্ষার্থী হিসেবে না পড়লে এ স্কুলের পেশাদারিত্ব ও মুনশিয়ানা অনুধাবন করা কঠিন। বাংলাদেশি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে যে ভাবে বাণিজ্য শিক্ষাদান কার্যক্রম চলছে তাতে পেশাদারিত্বের যথেষ্ট ঘাটতি আছে। এ সব বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক নিয়োগ, ছাত্র ভর্তি, পরীক্ষা পদ্ধতি, পাঠ্যক্রম, ক্লাস পরিচালনা, প্রভৃতি ক্ষেত্রে হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যলয়ের বিজনেস স্কুলের কার্যক্রম থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে উন্নতি করার সুযোগ রয়েছে। কেবল সুযোগ্য শিক্ষকগণ আন্তরিকতা নিয়ে চেষ্টা করলে রাতারাতি না হলেও ক্রমান্বয়ে এমন উন্নতি করা সম্ভব বলে আমি মনে করি।

এসপ্লানেড পরিদর্শন

'এসপ্লানেড' এর শব্দগত অর্থ হলো বিস্তারিত সমতল জায়গা, যা সাধারণত সমুদ্র কূলবর্তী স্থানে বা বিশাল জলরাশির কিনারে অবস্থিত। সে জন্য বিভিন্ন বড় শহরে মানুষ এসপ্লানেড দেখতে যান এবং সেখানকার সৌন্দর্য উপভোগ করেন। পর্যটকদের অনেকে সেখানে নিরিবিলি সময় কাটান। কোলকাতা, সিঙ্গাপুর, পেনাংসহ অনেক শহরে রয়েছে এসপ্লানেড। বস্টনের এসপ্লানেড হলো শহরের চার্লস নদীতীরের বিশাল এলাকাজুড়ে। বস্টনে আসার আগে আমার এ সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা ছিল না। যা হোক বস্টন এসপ্লানেড দেখতে এসে হাঁটলাম অনেক। যে দিকে যাই কেবল হাঁটতে ইচ্ছে করে। চারিদিকে অপার সৌন্দর্য। সুন্দর গাছপালা দিয়ে এমনভাবে সাজানো যে দেখলে চোখ জুড়িয়ে যায়। অনেক দূর হাঁটলে দুয়েকটি ছোট্ট দোকান রয়েছে যেখান থেকে ভ্রমণকারীগণ ড্রিংকস কিনতে পারেন।

মাঝে রয়েছে আবার জলাধার। সেখানে অনেক মাছ। জলাধারের কাছে গেলে স্বচ্ছ পানির নীচে মাছের দৌড়াদৌড়ি দেখা যায়। রয়েছে নানা রকম হাঁস। তাদের অনেকে জলাধারের পাশে বিশ্রাম নিচ্ছে। আবার অনেকে জলাধারে সাঁতার কাটছে।

সমতল ভূমির সবুজ ঘাস ঝকঝকে পরিচ্ছন্ন। কোনো ময়লা আবর্জনা নেই। অনেকটা সবুজ কার্পেটের মতো। দেখলে মনে হয় শুয়ে থাকি। সেখানে কিছু দুরে দুরে টিউলিপসহ নানা জাতের ফুল ফুটে রয়েছে। একেক রকম ফুলের একেক রকম সৌন্দর্য। কেউ ফুল ছিঁড়েন না। এমনকি ছোট শিশুরাও না। পর্যটকদের বিশ্রাম নেবার জন্য মাঝে মাঝে গাছের নীচে কাঠের বেঞ্চ করে দেয়া আছে। এখানে আসলে আর যেতে ইচ্ছে করে না। আমার কাছে সবচয়ে ভালো লেগেছে ফুল আর বিভিন্ন প্রজাতির বড় বড় গাছ। কিছু গাছ বড় হলেও তাতে এতফুল ফুটেছে যে ফুলের ভারে মনে হচ্ছে যেন গাছটি নুয়ে পড়েছে। কত রকম ফুল আর গাছ যে রয়েছে তার সংখ্যা বলা সম্ভব না। আর এসব গাছের বা ফুলের নামও জানিনা। তবে এ দৃশ্য এখনো বুকে ধারণ করে রেখেছি। যদিও এর কিছু ছবিও আমি তুলে এনেছি (বস্টন এসপ্লানেডের ফুলগাছের ছবির জন্য দেখুন পরিশিষ্ট- ৫:১২)।

পার্টির আয়োজন

আমাদের দুই মেয়ে সব সময় তাদের বন্ধুমহলে জনপ্রিয়। এ সব বিষয় জানলে আমাদের ভালো লাগে। এ বিষয়টি আমরা তাদের শৈশব থেকে দেখে আসছি। বস্টনেও দেখলাম বাংলাদেশি শিক্ষার্থীমহলে দ্বীনি সবার কাছে সমাদৃত। একইভাবে জনপ্রিয় ও সমাদৃত জামাই সাকিবও। কাজেই আমাদেরকে কেন্দ্র করে তারা এক উইকএন্ডে একটি ছোট পার্টির আয়োজন করলে আমরা বিষয়টি ভালোভাবে নেইনি। আমরা বলি, তোমাদের লেখাপড়া চলছে, তার মধ্যে এ সব আয়োজন না করাই ভালো হত। কিন্তু মেয়ে জামাই শুনলে তো!

: আব্বু তোমাকে তো কিছু করতে হচ্ছে না। তুমি আপত্তি করছ কেন?

: তোমাদের লেখাপড়ার ক্ষতি হবে। রান্নাবান্না করতে সময় নষ্ট হবে।

: আব্বু এটা বাংলাদেশ না। আমরা কিছুই করব না। বাসায় কিছু হবে না। আমাদেরও কষ্ট হবে না।

: তাহলে কোথায় করবে? কতজনকে দাওয়াত করবে?

: এ নিয়ে তোমার চিন্তা করতে হবে না। আমরা সুমাইয়া আপুর হলের বেসমেন্টে বুকিং দিয়ে রেখেছি। খাবার বাংলাদেশি রেস্টুরেন্টে অর্ডার করব। কেবল সময়মত সাকিব যেয়ে খাবারগুলো গাড়িতে করে নিয়ে আসবে। অবশ্য তুমি সহায়তা করতে চাইলে তার সঙ্গে যেতে পারো।

যে রকম বলা সে রকমই সব কিছু হলো। ওরা জন বিশেক বাংলাদেশি শিক্ষার্থী, যারা সব হার্ভার্ড, এমআইটির শিক্ষার্থী, সে সঙ্গে ওদের দু'একজন চাকুরিজীবী বন্ধুদেরকে দাওয়াত করল। ওয়ানটাইম প্লাসিটকের থালা, প্লেট, গ্লাস ইত্যাদি আগেই কিনে রেখেছিল। সেগুলো নেয়া হলো। আর বাড়তি আনন্দের জন্য নেয়া

হলো সাকিবের গিটার ও সাউন্ড সিস্টেম। খাবার আনতে বাংলাদেশি রেস্টুরেন্টে যাবার সময় সাকিব আমাকে সঙ্গে নিলো। যথাসময়ে আমরা রেস্টুরেন্টে গিয়ে দেখি ২৫-৩০ জনের জন্য অর্ডার দেয়া চিকেন বিরিয়ানি, মিক্সড ভেজিটেবল, মুগ ডালসহ অন্য যে সব আইটেম অর্ডার দেয়া হয়েছিল তার সব কিছু তারা তৈরি করে রেখেছেন। এই রেস্টুরেন্টের কমকর্তা-কর্মচারীদের কাছে সাকিব যে জনপ্রিয় তা দোকানিদের সঙ্গে সাকিবের আলাপনে বুঝতে পারলাম।

: কি ব্যাপার সাকিব ভাইয়া অনেকদিন পর। আমাদেরকে ভুলে গেছেন।

: আরে না, লেখাপড়ার চাপে আছি। গেট টুগেদার হলেই তো আপনাদের স্মরণ করি।

: মাঝেমধ্যে কি আমাদের এমনিতেও দেখতে আসতে পারেন না— বলে আরেকজন তার দাড়িতে হাত বুলিয়ে দিল।

আমি বললাম, খাবার নিতে নিতে ঠান্ডা হয়ে যাবে না? দোকানিরা আমাকে জানালেন, আঙ্কেল এলুমিনিয়াম ফয়েল ডবল করে দিয়ে প্যাক করেছি। অন্ততপক্ষে তিন ঘন্টা পর খুললেও ধোয়া উড়বে। সাকিবকে উদ্দেশ্য করে বলল,

: ভাইয়া যেভাবে যে পরিমাণে করেছি আরও দু'চারজন বেশি খেতে পারবেন।

: ভালো। সে জন্যই তো আপনাদের কাছে সব সময় আসি। এখন গাড়িতে তুলে দেন।

পার্টি ভালোই জমল। সাকিব ও সাকিবের বন্ধু গান গাইল। বিলিয়ার্ড খেলার ব্যবস্থা থাকায় আমরা অনেকটা সময় সে চেষ্টাও করলাম। সবচেয়ে ভালো লাগল ছেলেমেয়েদের সঙ্গে গল্প করে। সবাই বিশ্বের নামকরা ইউনিভার্সিটিতে পড়ে, অথচ তাদের মধ্যে কোনো অহমিকা নেই। প্রত্যেকে অমায়িক। অনেকের সঙ্গেই গল্প করলাম। তাদের কাজকর্মের ও লেখাপড়ার খোঁজ নিলাম। বুঝতে অসুবিধা হলো না যে এরা প্রত্যেকে একেকজন জিনিয়াস। তা না হলে কি বাংলাদেশ থেকে এসব বড় বড় বিশ্ববিখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সুযোগ পেত। পার্টিতে ফ্রেশার থেকে শুরু করে পিএইচডি ছাত্র পর্যন্ত বিভিন্ন বয়সের শিক্ষার্থী থাকলেও সবাই বন্ধুর মত একসাথে মিলেমিশে গল্পে মেতে উঠল। এদের মধ্যে কয়েকজন আবার আসার সময় হাতে করে ড্রিংকস, কেক ও মিস্টি জাতীয় খাবার নিয়ে এসেছিল। সব মিলিয়ে চমৎকার খাওয়াদাওয়া হলো। বাংলাদেশি রেস্টুরেন্টের রান্না ছিল সুস্বাদু। খাবার এত সুস্বাদু হওয়ায় তা প্রায় সব শেষ হয়ে যায়। কিন্তু ড্রিংকস এবং ডেজার্ট বেঁচে যাওয়ায় সেগুলো আমরা আসার সময় বাসায় নিয়ে আসি। তার আগে নিয়মানুযায়ী আমরা হলরুম পরিষ্কার করি। যার হলের বেসমেন্টে আয়োজন ছিল সে সুমাইয়া একটি চমৎকার মেয়ে। তার সঙ্গে কথা বলে আমার খুবই ভালো লেগেছিল। দু'তিন ঘন্টার মধ্যেই পার্টি শেষ। এর চেয়ে বেশি দেরি করা সম্ভব নয়। কারণ, আগে থেকে সময় নির্ধারণ করা আছে। আর তাছাড়া প্রত্যেকেরই লেখাপড়া ও কাজের চাপ আছে। কাজেই আনন্দিত মনে সবার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে পার্টি শেষ করা হলো।

তৃতীয় আমেরিকা সফর

পটভূমি

মাত্র এক বছরের মাথায় আবারো আমেরিকা যাবার অনুরোধ আসলো মেয়ের কাছ থেকে। মেয়ের আবদার, আব্বু তুমি তো এমআইটির গ্রাজুয়েশনে আসতে পারলে না। এবার হার্ভার্ডের গ্রাজুয়েশনে আসো। এত খ্যাতিমান বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তোমার মেয়ে ডিগ্রি করছে, আর তুমি যদি না আসো তাহলে কেমন দেখায়। আমার সহপাঠীদের অনেকের বাবা মা আসছেন। তুমিও মাকে নিয়ে চলে আসো। কখন আসতে হবে আমি তোমাকে জানাব। তবে তুমি টিকিটটা আগে বুকিং দিয়ে রাখতে পারো। তা না হলে খরচ বেশি পড়ে যাবে। গত বছর দুই লক্ষাধিক টাকা খরচ করে ঘুরে এসেছি। এখন যদি আবার টিকিট কাটি অনেক টাকা চলে যাবে। কিন্তু মেয়ের দাবিটাও গুরুত্ব না দিয়ে পারা যায় না। না গেলে ওর মনটা ছোট হয়ে যাবে। আবার জামাই ভাবতে পারে যে শ্বশুর সাহেব টাকা খরচ হবে দেখে আসেননি। সবকিছু চিন্তা-ভাবনা করে যাবার সিদ্ধান্ত নিলাম। স্ত্রীকে বললাম, রেডি হও তিন সপ্তাহের জন্য ছুটি নিয়ে যাব। এবার তো আর ভিসার ঝামেলা নেই। দুজনেরই ভিসা আছে।

এবার মেয়ে এমনভাবে আমাদের যাবার তারিখ ঠিক করলো যে আমরা যাবার কয়েকদিন পর তার ক্লাস শেষ হবে। আমরা তাদেরকে বার বার বলেছি যে আমরা কেবলমাত্র তোমাদের সঙ্গ দেব। কোথাও যাব না। কেবলমাত্র তোমার গ্রাজুয়েশন সেরিমোনিতে যোগ দেব। কিন্তু কে শোনে কার কথা। তারা এবারও আমাদেরকে নিয়ে নানা পরিকল্পনা করে রাখে। গতবার যখন আমরা আমেরিকা ছিলাম তখন আমার শ্রদ্ধেয় সাবেক সহকর্মী ও সুহৃদ কানাডার ম্যাকমাস্টার ইউনিভার্সিটির প্রফেসর আহমেদ শফিকুল হক আমাদেরকে কানাডায় বেড়াতে যেতে অনুরোধ করেছিলেন। কিন্তু কানাডা যেতে হলে আমাদের ভিসার প্রয়োজন ছিল। তাছাড়া সময়ও ছিল খুব কম। সে কারণে আমরা তার অনুরোধ রাখতে পারিনি। ফোনে কয়েকবার কথা বলেছি মাত্র। তবে আমি যদি আবার আসি সে কারণে তিনি একটি পরামর্শ দিয়েছিলেন। বলেছিলেন, তোমরা আবার আসলে বাফেলোতে আমেরিকার নায়েগ্রা অংশে জলপ্রপাত দেখতে আসতে পারলে আমাদের সঙ্গে দেখা হতে পারে। কারণ, আমি কানাডিয়ান পাসপোর্টধারী হওয়ায় আমার আমেরিকা ঢুকতে ভিসা লাগবে না। আমি বিষয়টি মেয়েকে বলেছিলাম। সে যে বিষয়টিকে এতটা গুরুত্ব দিয়ে এভাবে মনে রাখবে তা বুঝতে পারলাম তার হার্ভার্ডের গ্রাজুয়েশনে যাবার পর।

নায়েগ্রা ভ্রমণ

মেয়ের শেষ সেমিস্টারের ক্লাসগুলো শেষ হলেই সে আমাদেরকে জানাল যে এবার আমরা নায়েগ্রা যাচ্ছি। শফিক চাচাকে বলো উনি যেন আমাদেরকে সময় দেন।

তারপর সে নিজেই বাফেলোতে নায়েগ্রা জলপ্রপাতের কাছে একটি বাড়ি দুইদিনের জন্য বুকিং দিলো এবং আমাদেরকে বলল চাচাকে জিজ্ঞেস করো যে এই সময়ে আসতে তার কোনো অসুবিধা হবে কিনা। জামাইয়ের তখন পড়ার খুবই চাপ। কিন্তু আমাদের সঙ্গে না গেলে যদি আমরা কিছু মনে করি, সে জন্য সে বলল আমি আপনাদের সঙ্গে যাব, তবে আমি জলপ্রপাত দেখতে যাব না। আপনারা জলপ্রপাত দেখবেন, আমি বাসায় থাকব এবং কাজ করব। দ্বীনি পরিকল্পনা করল যে আমরা যাবার সময় ট্রেনে যাব যাতে করে আমরা সবকিছু দেখতে দেখতে যেতে পারি এবং সে সঙ্গে আমেরিকার লম্বা ট্রেন ভ্রমণের অভিজ্ঞতাটাও আমাদের হয়। তবে আসার সময় আমরা ক্লান্ত থাকব বিধায় আমরা বিমানে আসব। আমাদের আর মতামত কি। তারা যেভাবে পরিকল্পনা করলো আমরা তাতে সম্মতি দিলাম। শফিক ভাই এবং ভাবিও রাজি হলেন। আমরা ভাবিকে যতদূর চিনি, তাঁর তো রাজি না হওয়ার প্রশ্নই ওঠে না। কারণ, তিনি বেড়াতে খুব ভালোবাসেন। আর বাসায় গেলে খাওয়াতেও। শফিক ভাই যখন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে ছিলেন, তখন আমি চট্টগ্রাম শহরের বহদ্দারহাট এলাকায় তাঁদের প্রতিবেশি ছিলাম। তখন ভাবির হাতে অনেক খাবার খেয়েছি। সে স্মৃতি ভোলার নয়। তবে শফিক ভাই বললেন, দেখ, আমার কোনো আপত্তি নেই। তবে তোমরা পৌঁছাতে তো প্রায় রাত হয়ে যাবে। তখন তো তোমরা কিছুটা ক্লান্ত থাকবে। কাজেই তোমাদের বিশ্রাম দরকার। আমরা ভোরে রওনা দেব এবং সকালে তোমাদের ঠিকানায় পৌঁছে যাব। আমরা তাঁর কথায় আপত্তি করিনি।

আমরা যথাসময়ে ট্রেন থেকে নেমে একটি ট্যাক্সি নিয়ে নির্দিষ্ট ঠিকানায় হাজির হলাম। কিন্তু যেখানে চাবি থাকার কথা সেখানে চাবি পাওয়া গেল না। আমরা নির্দিষ্ট বাড়ির প্রথম দরজাটা খুলতে পারলাম। কারণ, এর চাবি আমরা জায়গামত পেয়েছি। কিন্তু পরের মূল দরজার চাবি যেখানে থাকার কথা সেখানে আমরা খুঁজে পেলাম না। ফলে আমরা ঘরে ঢুকতে না পেরে বাড়িওয়ালাকে ফোন করতে বাধ্য হলাম। তিনি নীচের স্টোররুমের একটি বিশেষ জায়গায় চাবি খুঁজে নিতে বললে সে চেষ্টা করে আমরা ব্যর্থ হলাম। সবাই মিলে চেষ্টা করে ব্যর্থ হবার পর বাড়ীওয়ালাকে আবারো ফোন করা হলো। এবার তিনিও কিছুটা বিচলিত হলেন। তিনি অনেক দূরে থাকায় না এসে নিকটস্থ তার এক বন্ধুকে আমাদেরকে চাবি খুঁজে দিতে অনুরোধ করলেন। ওই ব্যক্তি প্রায় ৭ মিনিট পরে এসে আমাদেরকে চাবি খুঁজে দিয়ে গেলেন। আবার আমরা যখন চলে যাব তখন সবকিছু তালা দিয়ে ওই জায়গায় চাবি রেখে যেতে বললেন। ক্লান্ত থাকায় সঙ্গে আনা কিছু হালকা খাবার খেয়ে আমরা তিন বেডরুমের বাসার একটি ভালো রুম শফিক ভাইদের জন্য রেখে ঘুমিয়ে পড়লাম।

সকালে ঘুম থেকে উঠে বাড়িটি ভালো করে দেখলাম। নিরিবিলি এলাকা। অনেক পরে বাসার সামনে দিয়ে হয়ত কোনো একটি-দুটি গাড়ি বা মানুষজন যেতে দেখা যায়। এখান থেকে নায়েগ্রা প্রায় ১৫ মিনিটের ড্রাইভ। সকাল ৮টার

মধ্যেই শফিক ভাই তার মার্সিডিজ গাড়ি চালিয়ে সস্ত্রীক হাজির হলেন। তারপর কেবল গল্প আর গল্প। নায়েগ্রার চাইতে শফিক ভাই আর ভাবিকে দেখে আমাদের আনন্দ লাগছিল বেশি। কারণ, আমি ওয়াটারলু ইউনিভার্সিটিতে পড়াকালীন একবার কানাডা থেকে নায়েগ্রা দেখেছিলাম। কিন্তু আমেরিকান অংশ থেকে নায়েগ্রা দেখা হয়নি। সকালের নাস্তার পর গল্প জমে উঠল। আমি বাড়িটির বারান্দায় চেয়ারে বসে শফিক ভাইয়ের সঙ্গে নানা বিষয়ে গল্পে মেতে উঠলাম (এমন ছবির জন্য দেখুন পরিশিষ্ট- ৫:১৩)। কানাডার ম্যাকমাস্টার ইউনিভার্সিটির গল্প, সিটি ইউনিভার্সিটি অব হংকং-এর গল্প, আর চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের গল্প তো আছেই। বাংলাদেশি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে যে অনিয়মের কোনো শেষ নেই তা আমাদের চেয়ে আর ভালো কে জানে। শফিক ভাই বরাবরের মতো আমাকে এক পর্যায়ে খোঁচা দিতে ভুললেন না। 'দেখ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে যতদিন ছিলাম, আমি অস্থায়ী পদে চাকুরি করেছিলাম, কিন্তু এখন আমি অন্তত একটি স্থায়ী পদে চাকুরি করি।'

দুপুরে আমরা শফিক ভাইয়ের গাড়িতে করে নায়েগ্রার উদ্দেশ্যে বের হলাম। সাকিব বাসায় থেকে গেলো। কানাডায় থাকার কারণে শফিক ভাই অনেকবার নায়েগ্রায় এসেছেন। তিনি বললেন। তোমরা বোট ট্রিপে যাও আমি একটু এখানে বসি। আমি আর যাব না। তিনি আমাদের চারজনকে কোনো সুযোগ না দিয়ে টিকিট কিনে দিলেন। আমরা তিনজন প্লাস্টিকের রেইনকোর্ট গায়ে দিয়ে বোটে উঠার লাইনে দাঁড়ালাম। এই বোটগুলো একেবারে জলপ্রপাতের কাছ থেকে দর্শকদের ঘুরিয়ে নিয়ে এসে আবারো নামিয়ে দেয়। আমার এ অভিজ্ঞতা ছিল। শেফালির জন্য ছিল এটি নতুন অভিজ্ঞতা। বোট জলপ্রপাতের একেবারে কাছাকাছি গেলে সে অন্য অনেকের সঙ্গে আনন্দে চিৎকার করছিল। গাউন পরা থাকা সত্ত্বেও আমরা অনেকটা ভিজে গেলাম। সে এক ভিন্ন আনন্দ (নায়েগ্রা দেখে ফেরার সময়ের ছবির জন্য দেখুন পরিশিষ্ট- ৫:১৪)। নীচে নেমে শফিক ভাইকে নিয়ে আশেপাশে আমরা ঘুরে দেখলাম। বেশ পরিপাটি করে সাজানো। সবুজ ঘাস আর সুন্দর সুন্দর ফুলের গাছ। এত সুন্দর ফুল আমি অন্যত্র দেখিনি। এমনকি এসপ্লানেডেও এমন গাছ দেখিনি। নায়েগ্রার আমেরিকা অংশের স্থল অংশে এমন ফুল দেখে আকুল হয়ে ছবি না তুলে পারলাম না (নায়েগ্রার ফুলগাছের ছবির জন্য দেখুন পরিশিষ্ট- ৫:১৫)। এমন চমৎকার পরিবেশ, ফুল আর গাছ-গাছালির মধ্যে কার না হাঁটতে ভালো লাগে। আমরা বেশ অনেক পথ পার্কের মতো বাগানে হাটলাম। আবার মাঝেমধ্যে বসে জিরিয়ে নিলাম। মনে হচ্ছিল এখানে অনেক দিন ধরে হাঁটি। কিন্তু সবার এনার্জি তো আর এক রকম নয়। তাই পার্কের পাশে বসে আড্ডাও দিলাম অনেকক্ষণ। নায়েগ্রা থেকে ফিরে ফ্রেশ হয়ে খাওয়া দাওয়ার পর আবারও গল্প ও আড্ডা জমল। শেফালি এবং ভাবি দু'জনই গল্পবাজ। তাদের কথার আর শেষ হয় না। শফিক ভাই আর ভাবি আসায় নায়েগ্রা ভ্রমন অধিকতর আনন্দদায়ক হয়েছিল।

হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের কমেন্সমেন্ট সেরিমনি

বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার্থীদের জীবনে কনভোকেশন সেরিমনির গুরুত্ব অপরিসীম। শিক্ষার্থীরা চান লেখাপড়া শেষে ডিগ্রি অর্জন করে যথাসময়ে কর্মজীবনে প্রবেশ করতে। এ উদ্দেশ্যে লেখাপড়া শেষ করে তারা আনন্দঘন পরিবেশে কনভোকেশন সেরিমোনির মধ্য দিয়ে তাদের অর্জিত সনদপত্রটি অনুষদের ডিন, বা কোনো সম্মানিত একাডেমিকের হাত থেকে গ্রহণ করে শিক্ষাজীবন শেষ করেন। সে জন্য বিশ্বব্যাপী বিশ্ববিদ্যালয়গুলো জাঁকজমকপূর্ণভাবে কনভোকেশন সেরিমনি অনুষ্ঠানের আয়োজন করে শিক্ষার্থীদের হাতে সনদপত্র তুলে দেয়। কনভোকেশন স্পিকার হিসেবে আমন্ত্রণ জানায় আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন, সুপরিচিত একাডেমিক ব্যক্তিত্ব, বরেণ্য রাজনীতিবিদ বা জ্ঞান-বিজ্ঞানের অন্য কোনো শাখায় অবদান সৃষ্টিকারী খ্যাতিমান ব্যক্তিত্বকে, যার উপস্থিতি ও দিকনির্দেশনামূলক বক্তব্য প্রদান কনভোকেশন সেরিমনিকে আকর্ষণীয় এবং গ্রাজুয়েটদেরকে উজ্জীবিত করে। কাজেই কনভোকেশন সেরিমনি একজন শিক্ষার্থীর বুকের লালিত স্বপ্ন। বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হবার পর থেকে শিক্ষার্থী ওই দিনটির জন্য অপেক্ষা করেন। স্বপ্ন দেখেন কনভোকেশন গাউন পরিধান করে বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানে কোনো খ্যাতিমান ব্যক্তিত্বের হাত থেকে সনদপত্র গ্রহণের। সেজন্য নিয়মিত কনভোকেশন অনুষ্ঠান আয়োজন করা বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যতম দায়িত্ব। পাশ্চাত্যের বিশ্ববিদ্যালয়গুলো একাডেমিক ক্যালেন্ডার অনুযায়ী প্রতি বছর সুনির্দিষ্ট সময়ে কনভোকেশন আয়োজন করে। এ কারণে এমন অনুষ্ঠান আয়োজনে খ্যাতিমান বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর নিজস্ব পেশাদারিত্ব গড়ে উঠেছে। কনভোকেশনে যোগদান করা কেবল শিক্ষার্থীর একক সাফল্য নয়, এ সাফল্য তার পরিবারেরও। এ কৃতিত্ব সে পিতামাতারও, যাঁরা তাঁদের সন্তানকে লেখাপড়ায় সমর্থন এবং উৎসাহ উদ্দীপনা যুগিয়েছেন। সেজন্য অনেক শিক্ষার্থীই বাবা-মা এবং বন্ধু-বান্ধব সঙ্গে করে কনভোকেশন অনুষ্ঠানে যোগ দেন।

পরিতাপের বিষয়, পাশ্চাত্যের উন্নত দেশগুলোর বিশ্ববিদ্যালয়গুলোয় নিয়মিত কনভোকেশন হলেও অনেক উন্নয়নশীল দেশে বিশ্ববিদ্যালয়গুলো নিয়মিতভাবে কনভোকেশন করতে পারে না। সেশনজট সৃষ্টি করে একাডেমিক ক্যালেন্ডার অনুসরণ করতে না পারা এর একটি কারণ। বিশেষ করে রাজনৈতিক অস্থিরতা, অস্থিতিশীলতা এবং শিক্ষাঙ্গণে বিশৃঙ্খলার কারণে মূলত এমনটি হয়। আবার অনেকক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয়ে চর্চিত দলীয় রাজনীতি, বা কর্তৃপক্ষের সদিচ্ছার অভাবও এ জন্য দায়ী। সে সঙ্গে আর্থিক খরচেরও বিষয় আছে। উদাহরণ হিসেবে আমরা বাংলাদেশের কথা বলতে পারি। এ দেশের প্রবীণ এবং প্রধান বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে ১৯২১ সালে প্রতিষ্ঠিত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বয়স ১০০ বছর হলেও এর কনভোকেশন হয়েছে মাত্র ৫২ বার। কিন্তু বাকি সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর কনভোকেশনের পরিসংখ্যান লজ্জাজনক। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৫৩ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়ে ৬৭ বছরে কনভোকেশন করেছে ১১বার। চট্টগ্রাম ও জাহাঙ্গীরনগর

বিশ্ববিদ্যালয়দ্বয়ের অবস্থা আরও নাজুক। জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৭০ এবং চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৬৬ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়ে যথাক্রমে ৫০ ও ৫৪ বছরে কনভোকেশন করেছে মাত্র ৫ এবং ৪ বার।

সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলো থেকে প্রতি বছর হাজার হাজার শিক্ষার্থী ডিগ্রি অর্জন করে বের হলেও নিয়মিত কনভোকেশন অনুষ্ঠিত না হওয়ায় তারা কনভোকেশনের আনন্দ থেকে বঞ্চিত হয়ে বিশ্ববিদ্যালয় জীবন শেষ করেন। তবে চার, পাঁচ, বা সাত বছর পরে হয়ত কোনো সময় কনভোকেশন হ'লে এ শিক্ষার্থীরা কনভোকেশনে যোগদানের সুযোগ পান। তবে সে সময় তাদের অনেকেই সংসার ও কর্মজীবনের ব্যস্ততার কারণে কনভোকেশনে যোগ দিতে আসেন না। আর বিলম্বিত কনভোকেশনে যোগ দিলেও শিক্ষার্থীরা তা থেকে নিয়মিতভাবে অনুষ্ঠিত কনভোকেশনের আনন্দ পান না। কারণ, ওই সময় তাদের ব্যাচমেটদের হয়ত শতকরা ৮-১০ ভাগও কনভোকেশনে যোগ দেন না। তা ছাড়া যুবক বয়সে ডিগ্রি শেষ করার পরপরই সব ক্লাসমেটদের সঙ্গে একত্রে কনভোকেশনে যোগদানের যে সীমাহীন আনন্দ, কখনোই বিলম্বিত কনভোকেশনে তেমন আনন্দ উপভোগ করা যায় না। তবুও এমন কনভোকেশনেও ক্যাম্পাস, শিক্ষক ও মায়ার টানে অনেক শিক্ষার্থী দেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে এসে যোগদান করেন।

কনভোকেশনে যোগদান বাধ্যতামূলক না হলেও পাশ্চাত্যে একাডেমিক ক্যালেন্ডারের অংশ হিসেবে নিয়মিত কনভোকেশন হওয়ায় এ অনুষ্ঠানে যোগদানের হার প্রায় শতভাগ। শিক্ষার্থীরা এ রকম অনুষ্ঠানে যোগদান করাকে তাদের অধিকার হিসেবে বিবেচনা করেন। লেখাপড়া শেষে সহপাঠীদের সঙ্গে কনভোকেশন গাউন ও হ্যাট পরে অনুষদের ডিনের হাত থেকে সনদপত্র নেবার আনন্দ থেকে কেউ বঞ্চিত হতে চান না। কিন্তু বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে অনুষ্ঠিত কনভোকেশনে যোগদানের হার কম। নিয়মিত কনভোকেশন না হওয়া এর প্রধান কারণ। নিয়মিত কনভোকেশন অনুষ্ঠিত হলে প্রতিটি গ্রাজুয়েট হয়ত ডিন বা খ্যাতিমান একাডেমিকের হাত থেকে তাদের সনদপত্র নেবার সুযোগ লাভ করতেন। কিন্তু ৮-১০ বছর পর অনুষ্ঠিত হলে কনভোকেশনে যোগদানকারী শিক্ষার্থীদের সংখ্যা বেড়ে যায়। কাজেই যারা চ্যান্সেলর গোল্ড মেডেল পান, বা পিএইচডি বা উচ্চতর ডিগ্রি অর্জন করেন, কেবল তারাই হাতে হাতে সার্টিফিকেট গ্রহণের সুযোগ পান। পরে সাধারণ গ্রাজুয়েটরা তাদের সনদপত্র সংগ্রহ করে নেন। এতে তারা প্রত্যেকে সুসজ্জিতভাবে মঞ্চে উঠে গাউন পরা অবস্থায় খ্যাতিমান একাডেমিকদের হাত থেকে নিজ সনদপত্র গ্রহণের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হন।

পাশ্চাতের খ্যাতিমান বিশ্ববিদ্যালয়গুলোয় একাডেমিক ক্যালেন্ডারের অংশ হিসেবে নিয়মিত কনভোকেশন হওয়ায় এ অনুষ্ঠান আয়োজনে এদের পেশাদারিত্ব গড়ে উঠেছে। একজন শিক্ষার্থী কি করবেন, কয়জন অতিথি তার সঙ্গে আনতে পারবেন, কোথায় তাদের খাওয়ানো হবে, কিভাবে সনদপত্র নিতে হবে, সে

সম্পর্কে তাদের স্বচ্ছ ধারণা দেয়া হয়। এ জন্য কনভোকেশনে কোনো ত্রুটি চোখে পড়ে না। তা ছাড়া কে হবেন কনভোকেশন স্পিকার, কারা বক্তব্য রাখবেন, সে সব বিষয় উল্লেখ করে প্রত্যেককে অনুষ্ঠানসূচি সরবরাহ করা হয়। বাংলাদেশে সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের কনভোকেশনে বিশ্ববিদ্যালসমূহের মাননীয় চ্যান্সেলর উপস্থিত থাকেন। তবে কাকে কনভোকেশন স্পিকার করা হবে সে বিষয়ে অনেকক্ষেত্রে রাজনৈতিক প্রভাবের অভিযোগ ওঠে। এ কারণে হয়ত বাংলাদেশের একমাত্র নোবেল লরিয়েট ড. মুহাম্মদ ইউনূসকে কোনো সরকারি বিশ্ববিদ্যালয় কখনো কনভোকেশন স্পিকার হিসেবে ডাকেনি। তবে পাশ্চাত্যের বিশ্ববিদ্যলয়গুলোয় প্রকৃত জ্ঞানী এবং নিজ এলাকায় অবদান সৃষ্টিকারীদের কনভোকেশন স্পিকার হিসেবে আনা হয়, যাতে তার বক্তব্য থেকে শিক্ষার্থীরা দেশসেবা ও মানবকল্যাণের জন্য কাজ করতে উৎসাহ নিয়ে কর্মজীবন শুরু করতে পারেন। তবে এ সব বিশ্ববিদ্যালয় পরিবেশ পরিস্থিতি বিচার করে স্বাধীনভাবে তাদের মিশন ও ভিশনের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে কনভোকেশন স্পিকার মনোনীত করে।

আমি সস্ত্রীক অভিভাবক হিসেবে বর্তমান বিশ্বের অন্যতম খ্যাতিমান বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে বিবেচিত হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ২০১৮ সালের গ্রাজুয়েশন সেরিমনিতে যোগদানের সুযোগলাভ করি। হার্ভার্ডে গ্রাজুয়েশন সেরিমনিকে বলা হয় 'কমেন্সমেন্ট'। 'কমেন্সমেন্ট' শব্দটি ল্যাটিন শব্দ 'ইনসেপটো' থেকে উদ্ভূত, যার মধ্যযুগীয় অর্থ ছিল এমন উৎসব হিসেবে বিবেচনা করা, যেখানে শিক্ষার্থীদেরকে এমএ ডিগ্রির জন্য ভর্তি করা এবং তাদেরকে শিক্ষকতার অনুমতি দেয়া। এ বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম দিকে শিক্ষার্থীর সংখ্যা এত কম ছিল যে এ প্রতিষ্ঠান থেকে এমএ ডিগ্রি অর্জনকারী সবাই শিক্ষকতায় যোগ দিতেন। সে কারণে ওই সময় বছরের শুরুতে কমেন্সমেন্ট অনুষ্ঠান হত। মাত্র ৯ জন গ্রাজুয়েট নিয়ে ১৬৪২ সালের শুরুতে প্রথম হার্ভার্ডের কমেন্সমেন্ট শুরু হয়। পরবর্তীতে শিক্ষার্থীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় সবাই যেহেতু শিক্ষকতায় থাকবেন না, সে কারণে এ অনুষ্ঠান বছরের শেষদিকে আয়োজনের ব্যবস্থা করা হয়, যাতে শিক্ষার্থীরা ডিগ্রি অর্জন শেষে বিভিন্ন পেশায় যোগদান করতে পারেন। হার্ভার্ডের ৩৬৭তম কমেন্সমেন্ট অনুষ্ঠিত হয় ২০১৮ সালের ২৪ মে। এ সেরিমনিতে যারা বিভিন্ন ডিগ্রি নিয়ে গ্রাজুয়েশন করলেন হার্ভার্ড তাদের নামের তালিকাসমৃদ্ধ ১২১ পৃষ্ঠা সংবলিত 'দ্য থ্রি হানড্রেড অ্যানড সিক্সটি-সেভেনথ্ কমেন্সমেন্ট' শিরোনাম দিয়ে ম্যাগাজিন আকৃতিতে প্রকাশ করে তার কপি প্রতি গ্রাজুয়েটকে সনদপত্রের সঙ্গে প্রদান করে। এর প্রথম ১৫ পৃষ্ঠায় ছাপা হয়েছে ১৪ শতাধিক ডিগ্রি অর্জনকারীর নাম। সব পৃষ্ঠা না গুণে বলা যায়, ৩৬৭তম কমেন্সমেন্টে আনুমানিক ১০ সহস্রাধিক শিক্ষার্থী বিভিন্ন ডিগ্রি অর্জন করে সনদপত্র গ্রহণ করেন। কাজটি এলাহি কাণ্ড হলেও হার্ভার্ড নিজ পেশাদারিত্বে এ বিশাল কমেন্সমেন্ট সুশৃংখলভাবে সম্পন্ন করে। বিশ্ববিদ্যালয়টির অপারেশন দক্ষতা অত্যন্ত প্রশংসনীয়। কোনো ভুলত্রুটি চোখে

পড়ে না। এরা সকালের দিকে নানা রকম প্রথাগত অনুষ্ঠানের পর দুপুরে সকল শিক্ষার্থী এবং তাদের অতিথিদের লাঞ্চ খাওয়ান। পরে বিভিন্ন স্কুলে বিভক্ত হয়ে শিক্ষার্থীরা তাদের নিজ নিজ অনুষ্ঠানে ডিনের হাত থেকে সনদপত্র গ্রহণ করেন। উপস্থিতির হার প্রায় শতকরা ১০০ ভাগ। যেমন, হার্ভার্ড বিজনেস স্কুলের ৯ শতাধিক গ্রাজুয়েটের সবাই উপস্থিত ছিলেন। অবশ্য সামরিক বাহিনীতে নিয়োজিত একজন শিক্ষার্থী আফগানিস্তানে থাকায় তাঁর মা উপস্থিত হয়ে সন্তানের সনদপত্র গ্রহণ করেন।

হার্ভার্ড বিজনেস স্কুলের কমেন্সমেন্ট সেরিমনিতে সুসজ্জিত নয় শতাধিক শিক্ষার্থী কনভোকেশন গাউন ও হ্যাট পরে তাদের অভিভাবক ও বন্ধু-বান্ধবসহ এক দর্শনীয় পরিবেশ তৈরি করেন। শ্যাড হল এবং পার্শ্ববর্তী মাঠে নির্মিত তাঁবুতে লাঞ্চের পর বেইকার লনে নির্মিত মঞ্চে শুরু করা অনুষ্ঠানে বক্তৃতার প্রাধান্য ছিল না। মূলত এমবিএ প্রোগ্রামের চেয়ার এবং বরিষ্ঠ সহযোগী ডিন প্রফেসর ফেলিক্স অবারহোলজার-গী এবং বিজনেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন স্কুলের ডিন প্রফেসর নিতিন নরিয়াসহ মাত্র ২-৩ জন সংক্ষিপ্ত বক্তব্যে এ স্কুলের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস ও ঐতিহ্য তুলে ধরে বক্তব্য দেন। তারপর শুরু হয় সনদপত্র দেবার পালা। নয় শতাধিক গ্রাজুয়েটদেরকে এরা ইংরাজী বর্ণমালা 'এ' থেকে 'জে'— এ দশভাগে ভাগ করে সম্মানিত ডিন এবং একেকজন সম্মানিত অধ্যাপকদের হাত দিয়ে সনদপত্র প্রদান করান। এর ফলে প্রত্যেক গ্রাজুয়েট সুসজ্জিত অবস্থায় মঞ্চে উঠে ডিনের হাত থেকে নিজ সনদপত্র গ্রহণের সুযোগ পান। এভাবে সনদপত্র প্রদান অনুষ্ঠান শেষ হয়।

হার্ভার্ড এর ৩৬৭তম কমেন্সমেন্ট স্পিকার হিসেবে আহ্বান করে বর্ণাঢ্য রাজনৈতিক ক্যারিয়ারের অধিকারী আমেরিকার ডেমোক্রাটিক দলের নেতা জন লুইসকে। জন ছিলেন মার্টিন লুথার কিং এর বর্ণ বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনের সহযোগী এবং জর্জিয়া থেকে ৩০ বছর ধরে নির্বাচিত কংগ্রেসম্যান ও মানবাধিকার আন্দোলনের সংগ্রামী নেতা। হার্ভার্ড নিজেই ২০১২ সালে এ মানবাধিকার আন্দোলনের অগ্রসেনানী রাজনীতিবিদকে 'ডক্টর অব ল' ডিগ্রি দিয়ে সম্মানিত করে। এই খ্যাতিমান রাজনীতিবিদ মানুষের অধিকার ও সাম্য প্রতিষ্ঠার আন্দোলন করে ৪৫ বার কারাবরণ করেন। জন লুইস সম্পর্কে জানার জন্য হার্ভার্ড অ্যালামনি অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি সুজান মরিস নভিক-এর বক্তব্য প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেন, 'জন লুইস আমেরিকাকে অধিকতর ন্যায়পরায়ণ এবং আমেরিকান সমাজকে সমানাধিকারসম্পন্ন করতে তার জীবন উৎসর্গ করেছেন। আমি নিশ্চিত যে, তার সাহস, আবেগ এবং জাতিকে সেবার শপথ হার্ভার্ড অ্যালামনি ও শিক্ষার্থীদের অনুপ্রাণিত করবে।' ট্রাম্প-পরবর্তী আমেরিকার সঙ্কটময় রাজনৈতিক অবস্থা বিবেচনায় নিয়ে বলা যায়, এমন সময়ে এমন ব্যক্তিত্বকে কমেন্সমেন্ট স্পিকার মনোনীত করে হার্ভার্ড বিজ্ঞতার পরিচয় দেয়। কমেন্সমেন্ট বক্তা হিসেবে জন লুইস হার্ভার্ডের প্রশিক্ষণ কাজে লাগিয়ে নবীন গ্রাজুয়েটদেরকে গণতান্ত্রিক,

ঐক্যবদ্ধ ও মানবিক আমেরিকা গড়ায় নেতৃত্ব দিতে আহ্বান জানান (জন লুইস ও হার্ভার্ড কমেন্সমেন্ট ২০১৮ এর ছবির জন্য দেখুন পরিশিষ্ট- ৫:১৬)।

হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ৩৬৭তম কমেন্সমেন্টে যোগদান করে আমি বুঝেছি যে, কনভোকেশন সেরিমনি কেবল শিক্ষার্থীদের সনদপত্র গ্রহণের অনুষ্ঠান নয়। এ অনুষ্ঠান থেকে তারা কর্মজীবনে প্রবেশ করে দেশসেবা, ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা ও মানবকল্যাণে নিবেদিত হবার প্রেরণা পান। সে জন্য প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয়ের উচিত নিয়মিতভাবে যথাসময়ে তাদের শিক্ষার্থীদের জন্য জাঁকজমকভাবে কনভোকেশনের আয়োজন করা। এ ব্যাপারে বাংলাদেশ যে অনেক পিছিয়ে আছে তা পূর্বেই উল্লেখ করেছি। পাশ্চাত্যের খ্যাতিমান বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর কনভোকেশন সেরিমনি থেকে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে বাংলাদেশি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর নিয়মিত কনভোকেশন অনুষ্ঠান আয়োজনের মধ্য দিয়ে এ ক্ষেত্রে পেশাদারিত্ব অর্জনের সুযোগ রয়েছে। হার্ভার্ডের কনভোকেশনের দিনে ক্যাম্পাসে এত বেশি ভিড় থাকে যে ভালোভাবে হাঁটাও যায় না। সে জন্য আমরা আমাদের মেয়ে জামাইকে নিয়ে অনুষ্ঠানের পরদিন নিরিবিলি ক্যাম্পাসে ছবি তুলি (হার্ভার্ড গ্রাজুয়েটকে নিয়ে অভিভাবকের ছবির জন্য দেখুন পরিশিষ্ট- ৫:১৭)।

ক্যাসেল আইল্যান্ড

বস্টন মূল শহর থেকে বেশ দূরে মেয়ে আমাদের ক্যাসেল আইল্যান্ড দেখাতে নিয়ে যেতে চাইল। আমরা রাজি হতে চাইছিলাম না। কিন্তু সে বলল আবহাওয়া ভালো, ঘরে বসে থাকতে তোমাদের ভালো লাগবে না। চলো বেরিয়ে পড়ি। এক রকম জোর করেই সে আমাদের নিয়ে গেল। এই উপদ্বীপের ইতিহাস অনেক দীর্ঘ। স্ট্রাটেজিক কারণে ১৬৩৪ সাল থেকে এ জায়গাটি ব্রিটিশদের কাছে গুরুত্ব পায় এবং এখানে সামরিক স্থাপনা তৈরির পরিকল্পনার কথা ভাবা হতে থাকে। আমেরিকা বিপ্লবের সময় এর নাম ছিল ফোর্ট উইলিয়াম এবং ব্রিটিশ সামরিক অভিযানের মূল ঘাঁটি হিসেবে এটি ব্যবহৃত হয়। ১৭৭৬ এর মার্চে ব্রিটিশদের উৎখাতের পর ক্যাসেল উইলিয়াম ধ্বংস করা হয়। এখন জায়গাটি মূল ভূখণ্ডের সঙ্গে সংযুক্ত। সাধারণভাবে দেখে এর ঐতিহাসিক গুরুত্ব অনুধাবন করা যায় না। এখানে বর্তমানে রাষ্ট্রীয় পার্ক করা হলেও সাধারণ মানুষ জায়গাটিকে ক্যাসল আইল্যান্ড নামে জানে। আমরা এখানে এসে সমুদ্রের পাড়ে খোলা হাওয়ায় অনেকক্ষণ ঘোরাঘুরি করলাম। ভালোই লাগল (ক্যাসেল আইল্যান্ডের ছবির জন্য দেখুন পরিশিষ্ট- ৫:১৮)।

বস্টনের খাবার ও হোটেল

বস্টনে একাধিক বিশ্বখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয় থাকায় শহরটি একটি মাল্টিকালচারাল শহরে পরিণত হয়েছে। পৃথিবীর প্রায় সব দেশের শিক্ষার্থীরা এখানে লেখাপড়া করতে আসেন। হার্ভার্ড ও এমআইটির মতো বড় বিশ্ববিদ্যালয়গুলো যেন

একেকটি ছোট পৃথিবী। এ দুই বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়াও এ শহরে বস্টন, নর্থ ইস্টার্নসহ আরও একাধিক বিশ্ববিদ্যালয় রয়েছে। এ কারণে অনেকেই বস্টনকে একটি একাডেমিক সিটি বলে অভিহিত করেন। এসব বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের সুখ-সুবিধা ও চাহিদার দিকে লক্ষ্য রেখে এখানে ব্যবসাকেন্দ্র, হোটেল ও খাবার রেস্টুরেন্ট গড়ে উঠেছে। আমরা তিন সপ্তাহ করে দু'বার বস্টনে থাকাকালীন ওই ছয় সপ্তাহে আমাদের মেয়ে এবং জামাই যে আমাদেরকে কত দেশের খাবার অর্ডার করে খাইয়েছে তা মনে রাখা সম্ভব নয়। ওখানে অনলাইনে খাবার অর্ডার করা এত সহজ যে অনেকটা পিৎজা ডেলিভারির মতো কয়েক মিনিটেই তা বাসায় চলে আসে। এর একটি কারণ হলো আমরা ছিলাম সেন্ট্রাল স্কয়্যারের ব্রুকলাইন স্ট্রিটে যা একেবারে শহরের প্রাণকেন্দ্রে অবস্থিত। টার্কিশ, লেবানিজ, আফ্রিকান, পাকিস্তানি, ইন্ডিয়ান, চাইনিজ, জাপানিজ, আফ্রিকান, ইটালিয়ানসহ আরো হয়ত অনেক দেশের খাবার আমাদেরকে তারা খাইয়েছে, যার সবগুলো স্মরণে নেই। এরপর বাসায়ও আমার মেয়ে আমাদেরকে বিভিন্ন দেশের খাবার রান্না করে খাইয়েছে। আবার হোটেলে নিয়ে গিয়েও খাইয়েছে বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন স্বাদের খাবার।

ইথিওপিয়ান রেস্টুরেন্ট

ক্যাসল আইল্যান্ড থেকে ফেরার পর সন্ধা হয়ে যাওয়ায় দ্বীনি আমাদেরকে বলল,

: আব্বু তুমি কি জানো যে আমাদের বাসার একেবারেই কাছে একটা ইথিওপিয়ান রেস্টুরেন্ট আছে?

: থাকতে পারে, আমি হয়ত খেয়াল করিনি।

: চলো তোমাদেরকে আজকে ওই রেস্টুরেন্টে খাওয়াব।

: তার কোনো দরকার আছে কি? তুমি এখন ক্লান্ত না?

: হ্যাঁ সে জন্যই তো যাব।

: একেবারে আজকেই খেতে হবে?

: আব্বু তুমি ব্যাপারটা বুঝতে পারছো না। তোমরা আফ্রিকার একটি দরিদ্র দেশের খাবারের স্বাদ বুঝতে পারবে। তা ছাড়া এই রেস্টুরেন্টে অনেক উচ্চবিত্ত আমেরিকানরা আফ্রিকার গরিব মানুষের খাবার কেমন সেটা খেয়ে দেখার জন্য আসেন।

: তুমি যখন ছাড়বেই না, তখন চলো দেখা যাক।

আমরা তিনজন ইথিওপিয়ান রেস্টুরেন্টে ঢুকলে একটি আমেরিকান মেয়ে এসে আমাদের স্বাগত জানিয়ে প্রথমেই জানতে চাইলো আমরা কোন স্টাইলে খেতে পছন্দ করব। আমি ব্যাপারটি বুঝতে পারলাম না। দ্বীনি তাকে কিছু বলে বিদায় করে আমাকে বলল, আব্বু এরা এখানে দু'ভাবে খাবার পরিবেশন করে। আফ্রিকায় যেভাবে খাবার পরিবেশন করা হয় সেভাবে, আবার যদি কেউ তাতে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ না করেন, তাহলে তাকে এখানকার সাধারণ রেস্টুরেন্টের মতো কাটা চামচ ছুরি

এবং চীনামাটির প্লেটে খেতে দেন। আমি জানতে চাইলাম তুমি কি বলেছ? দ্বীনি আফ্রিকান কায়দায় খেতে চেয়েছে। কাজেই প্রথমে আমাদের সামান্য ড্রিংস দেবার পর তিন মিনিটের মধ্যেই আমাদের সামনে গোল বেতের তৈরি বাসনের মতো পাত্রে খাবার দেয়া হলো। খাবারের মধ্যে ছিল আধাকাঁচা লাল আটার রুটিকে চার টুকরো করে সাজানো। তার সঙ্গে মিস্টি আলুর ভর্তা জাতীয় একটা কারি বা ঘন্ট এবং সে সঙ্গে আরো কতিপয় অচেনা খাবার। খাবারের দর্শন এবং স্বাদে আমরা কিছুটা বৈচিত্র্য পেলাম। খাবারের স্বাদ মন্দ ছিল না। তবে যে হাফসিদ্ধ রুটি তারা পরিবেশন করেছিল তা যদি একটু সেকা হত তাহলে আমার জন্য খুবই ভালো হত। যা হোক, আমরা তৃপ্তি সহকারেই গরীব দেশের খাবার খেলাম (ইথিওপিয়ান খাবারের ছবির জন্য দেখুন, পরিশিষ্ট- ৫:১৯)।

বস্টনে চাইনিজ খাবার

সাকিবের অনুরোধে আমাদেরকে বস্টনে দু'বার চাইনিজ এবং একবার জাপানিজ খাবার খেতে হয়েছে। প্রথমে চাইনিজ খাবারের কথা বলি। সাকিব আমাদের অনেক অনুরোধ করে চায়না টাউনে খাওয়াতে নিয়ে যায়। ওখানে খেতে গিয়ে আমাদের বিচিত্র অভিজ্ঞতা হয়। সেখানে প্রতি টেবিলেই চুলা ফিট করা আর সে চুলার ওপরে বড় ডিসে ফুটন্ত গরম পানি। আর ওই পানির মধ্যে রয়েছে বিভিন্ন রকমের আধা কাঁচা ও হাফ সেদ্ধ খাবার। নানা করমের খাবার তার মধ্যে চিংড়িসহ কয়েক রকম মাছ, সামুদ্রিক শেওলা, অক্টোপাস, শামুক, ঝিনুক, ডিম, সবজি, পাতলা করে কাটা মাংসের টুকরো, এবং আমাদের অপরিচিত এমন আরো অনেক খাবার। আর মেনুতে আরো অনেক আইটেম ছিল যা চাইলেই তারা এনে গরম পানির মধ্যে ছেড়ে দিয়ে যায়। জামাই এবং মেয়েকে দেখলাম স্বস্তির সঙ্গে কাঠি দিয়ে ওইসব হাফসিদ্ধ খাবার তুলে খাচ্ছে। আমাদের দু'জনের বিব্রতকর অবস্থা দেখে তারা বেশ আনন্দ পায়। দ্বীনি বললো আব্বু, তোমার যা ভালো লাগে তাই খাও। তবে এ ছাড়াও তারা আরও কিছু খাবার এবং সস ইত্যাদি জাতীয় খাবার টেবিলে দিয়েছিল। সেগুলো কাঠিতে ধরে অনেককে গরম ফুটন্ত পানিতে চুবিয়ে চুবিয়ে খেতে দেখলাম। অনেক কষ্টে মুখের চেহারা স্বাভাবিক রেখে আমি সবজি সেদ্ধ, চিংড়ি মাছ, ডিম প্রভৃতি খেলাম। সাকিব আমাকে অক্টোপাস খাবার জন্য অনুরোধ করলেও আমি রাজি হইনি। বললাম, দেখ বাবাজি, শামুক, ঝিনুক, অক্টোপাস, এগুলো ভালো খাবার। তবে আমি এগুলো খেতে অভ্যস্ত নই। তোমরা খেয়ে যাও। খেয়ে দেয়ে বের হবার পর আমার একদম ভালো লাগছিল না। আমার কাছে খাবার স্বাদ লাগেনি। অনেকটা ওষুধ খাবার মতো করে খেয়েছি।

তবে সাকিব আরেকবার বস্টনের অন্য এলাকায় আমাদের প্রায় জোর করে একটি চাইনিজ রেস্টুরেন্টে খাওয়াতে নিয়ে গিয়েছিল। এখানে কোনো টেবিলে চুলা ছিল না। এখানে যেহেতু বুফে সিস্টেম, সে কারণে কর্মচারীরা নানা রকম খাবার বড় টেবিলে দিয়ে যাচ্ছিল। যত খুশি খেতে পারেন। আমি ফিশ আইটেম,

সবজি, ডিম এবং আরো অনেক কিছু প্রথমে একটু করে নিয়ে খেলাম। তারপরে যেটি মুখে খেতে ভালো লাগল সেগুলি আবার বেশি করে ট্রেতে করে নিয়ে এলাম। টেবিলে একটি গামলায়ও অনেক রকম খাবার দেয়া হয়েছিল। এখানে প্রায় প্রতিটি খাবারই ছিল সুস্বাদু। মনে হচ্ছিলো কোনটা রেখে কোনটা খাবো। শেফালিও খাবারের প্রশংসা করল। কোনো সিদ্ধ বা হাফ সিদ্ধ খাবার ছিল না। প্রতিটি খাবার ছিল ভালো করে রান্না করা এবং অনেকগুলোতে আবার রান্নার পরে নানা রকম সস মাখানো। খুবই পরিতৃপ্তি সহকার পেটভরে খেলাম। (বস্টনের দুটি চাইনিজ রেস্টুরেন্টের দু'রকমের খাবারের ছবির জন্য দেখুন পরিশিষ্ট- ৫:২০)।

আরেকবার সাকিবের অনুরোধে বস্টনের অভিজাত এলাকায় একটি জাপানি সুশি বারে খেতে গিয়ে ভিন্ন ধরনের জাপানি খাবারের স্বাদ গ্রহণের অভিজ্ঞতা হলো। ওই খাবারেও আমরা খুব মজা পেয়েছিলাম। তবে প্রথমে কাঠি দিয়ে খেতে না পারায় আমি ওয়েটারের দৃষ্টি আকর্ষণ করে আমাকে কাটা চামচ দিতে বলি। ওয়েটার হেসে দিয়ে বললেন, আমি আপনাকে এমন ব্যবস্থা করে দেব যাতে আপনাদের স্টিক দিয়ে খেতে কোনো অসুবিধা হবে না। তবে আপনাকে কাটা চামচও আমি দেব। পরে সে আমাদেরকে একটি প্লাস্টিকের তৈরি ছোটো টুকরো এনে তার মধ্যে দুটো কাঠি সেট করে দিলেন যাতে করে কাঠি আর পড়ে বা সরে যেতে না পারে। শেফালি সেটা দিয়ে খেতে পারলেও আমি কাটা চামচই ব্যবহার করলাম। জাপানিজ খাবারের অসংখ্য ভ্যারাইটি এবং তাদের খাবারে ভাতের প্রাধান্য থাকায় খেয়ে বেশ মজা পেলাম। প্রায় প্রতিটি খাবারই সুস্বাদু ছিল। এই রেস্টুরেন্টে মাথাপিছু একজনের জন্য নির্দিষ্ট পরিমান অর্থ দিতে হয়। আপনি যত খুশি খেতে পারবেন। কিন্তু আপনি যদি বেশি খাবার অর্ডার করে না খেতে পারেন তাহলে আপনাকে অবশিষ্ট খাবারের জন্য জরিমানা দিতে হবে। তবে জরিমানা দিলেও আপনাকে অবশিষ্ট খাবার বাসায় নিতে দেয়া হবে না। আমরা হিসেব করে অর্ডার দিলাম এবং পেট ভরে খেলাম।

বস্টনের রাস্তায় বৃক্ষসজ্জা

বস্টন একটি ঝকঝকে শহর। রাস্তায় হাঁটলে কেবলই হাঁটতে ইচ্ছে করে। আমি ঘন্টার পর ঘন্টা বস্টনের অপরিরিচিত রাস্তা দিয়ে হেঁটেছি। নিরাপত্তার দিক দিয়েও শহরটি ভালো। এ শহরে বসবাসকরীদের রুচিরও প্রশংসা করতে হয়। আবাসিক এলাকাগুলোতে রাস্তার দু'পাশের বাড়ির সামনে তারা যে সব গাছ এবং ফুল বাগান করেছে তাতে তাদের রুচির পরিচয় পাওয়া যায়। নানা রঙের গাছ। নানা প্রজাতির ফুল। তারা শহরটাকে পরিচ্ছন্ন করে রাখে। কেউ যত্রতত্র ময়লা ফেলেন না। রাস্তার ফুটপাথেও দেখা যায় নানা রকম ফুলের সারি। কিছু কিছু গাছ দেখে আমি মুগ্ধ নয়নে তাকিয়ে ছিলাম। এত বর্ণময় হতে পারে গাছের পাতা। আমাদের দেশে এ সব গাছ কেন লাগাবার চেষ্টা করা হয় না জানি না। আমাদের লোকজন ইউক্যালিপটাস গাছ কেন লাগায় আমি বুঝি না। বস্টনে দোকানের সামনে

দোকানিরা সুন্দর সুন্দর গাছ লাগিয়ে রাখেন। দোকানের সামনেও তারা নানা বর্ণের ফুল লাগায় যা পথচারীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তবে দিনের বস্টনের চেয়ে রাতের বস্টনের সৌন্দর্য অন্য রকম। রাতের বস্টনের সৌন্দর্যকে দৃষ্টিনন্দন করার জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ মনেযোগী ও সতর্ক। ফুটপাথে যেন কোনো অন্ধকার না থাকে সে জন্য নিয়মানুযায়ী দেখভালের ব্যবস্থা থাকে। শহরের কোনো কোনো এলাকায় রাস্তার পাশের গাছে বিদ্যুৎবাতি দিয়ে আলোকসজ্জা করা হয়েছে। এমন দুয়েকটি গাছ আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে (বিদ্যুৎবাতি সজ্জিত বৃক্ষের ছবির জন্য দেখুন পরিশিষ্ট- ৫:২১)। সব মিলিয়ে রাতের বস্টন একটি নিরাপদ এবং মোহনীয় শহর। এমন মোহনীয় শহরের সুখস্মৃতি নিয়ে ফিরে এসে আবার চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভাগীয় কাজে যোগ দিলাম। বিভাগীয় শিক্ষক হিসেব পালন করা দায়িত্বগুলো সম্পর্কে পরের অধ্যায়ে আলোচনা করব।

www.shutterstock.com · 160511093

ছয়
শিক্ষক হিসেবে দায়িত্বপালন

একজন বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক হিসেবে আমি কিভাবে দায়িত্বপালন করেছি সে সম্পর্কে এ অধ্যায়ে আলোচনা করব। এ দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে বিভিন্ন সময় যে সব পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়েছি সে বিষয়গুলো উপস্থাপন করব। বিশ্ববিদ্যালয়ে চলমান রাজনীতি এবং একাডেমিক ও নন-একাডেমিক দায়িত্বপালন বিষয়ে আলোচনা করব। এর মধ্যে ক্লাস নেয়া, পরীক্ষা নেয়া, খাতা দেখা, খাতায় নম্বর প্রদান করা, টিউটোরিয়াল ক্লাস অ্যাসাইনমেন্ট দেয়া সম্পর্কিত আলোচনা থাকবে। এ ছাড়া পরীক্ষা কমিটির কাজ করা ও পরীক্ষার ফলাফল দেয়া সম্পর্কিত আলোচনাও করা হবে। গবেষণা ছাত্রদের তত্ত্বাবধানের কাজ এবং বিভাগীয় ও বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যান্য নন-একাডেমিক কাজের অভিজ্ঞতাও এ অধ্যায়ের আলোচনায় উঠে আসবে।

শিক্ষকের দায়িত্ব

বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক হিসেবে চাকুরি পেয়ে আমি নিজেকে ভাগ্যবান ভাবি। বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করাকে কখনো অন্য চাকুরির মতো মনে করিনি। এ বিষয়ে প্রথম অধ্যায়ে স্বল্প আলোকপাত করা হয়েছে। শিক্ষক হিসেবে আমি সামর্থ অনুযায়ী সযত্নে আমার ওপর অর্পিত দায়িত্ব পালনে সচেষ্ট থেকেছি। আমার মূল দায়িত্ব দু'টি। ক্লাসরুমে শিক্ষার্থীদের পড়ানো এবং গবেষণার মধ্য দিয়ে একাডেমিক প্রকাশনা করা। এ দুটি কাজ আমি মনোযোগ দিয়ে করার চেষ্টা করেছি। ভালোভাবে ক্লাস নেবার জন্য পড়াশুনা করে প্রস্তুতি নিয়ে ক্লাসে যেতে চেষ্টা করেছি। নিজের সাধ্যমত সব সময় কিছু লেখালেখির কাজেও জড়িত থেকেছি। এ মূল কাজ ছাড়া শিক্ষকগণ অবশ্য আরও অনেক দায়িত্ব পালন করেন। তবে সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোয় বিভিন্ন দায়িত্ব ও সুযোগ সুবিধা দলীয় বিবেচনায় বন্টিত হয়। সে কারণে আমি অনেক দায়িত্ব পালনের সুযোগ পাইনি। যেমন, সহকারী প্রক্টর, প্রক্টর, হাউস টিউটর, প্রেভোস্ট, সিনেট ও সিন্ডিকেট সদস্য, অনুষদের ডিন, সোস্যাল সায়েন্স রিসার্চ কাউন্সিলের ডিরেক্টর, চাকসুর পরিচালক, আইকিউএসির পরিচালক, সেন্টার ফর এক্সেলেন্স-এর পরিচালক প্রভৃতি পদে কাজ করার সুযোগ পাইনি। সম্মানীযুক্ত পদে দলীয় বিবেচনায় শিক্ষকদেরকে দায়িত্ব পালনের সুযোগ দেয়া হয়। দলীয় পরিচয়ের বিবেচনায়

বর্ণহীন হওয়ায় আমাকে কখনো এসব দায়িত্ব দেয়া হয়নি। এতে যুগপৎ আমি লাভবান ও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছি। লাভবান হয়েছি এ বিবেচনায় যে, দলীয় পরিচয় না থাকায় যে-কোনো সভা সমাবেশ বা আলোচনায় আমি যা ভালো মনে করেছি, অকপটে বলতে পেরেছি। বর্ণদলীয় পরিচয় থাকলে এসব ক্ষেত্রে হিসেব করে কথা বলতে হয়। নিজ দলের বিপক্ষে বলা যায় না। আরেকটা লাভ হয়েছে। দলীয় পরিচয় না থাকায় বিভিন্ন দায়িত্ব না পাওয়ায় আমি একাডেমিক কাজে অধিক মনোযোগ দিতে পেরেছি। আর ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছি এই বিবেচনায় যে, উল্লিখিত বিভিন্ন পদে দায়িত্ব পালনের সুযোগ পেলে বিশ্ববিদ্যালয়ের অভ্যন্তরীণ প্রশাসনিক কর্মকাণ্ড সম্পর্কে অভিজ্ঞতা হত। সে বিবেচনায় আমার প্রশাসনিক অভিজ্ঞতায় ঘাটতি রয়ে গেছে। আর এসব দায়িত্ব পালন করলে সম্মানী হিসেবে কিছু অর্থপ্রাপ্তি ঘটে, যা থেকে আমি বঞ্চিত হয়েছি। তবে দলীয় রাজনীতিতে যুক্ত না থাকায় আমার আরও কিছু অসুবিধা হয়েছে। এ রকম দুটি নমুনা এখানে উল্লেখ করব।

নব্বই দশকের গোড়ার দিকের কথা। গ্রীসে পিএইচডি স্কলারশিপের জন্য বিভাগ থেকে নমিনেশন চাওয়া হয়। এ ক্ষেত্রে শর্ত ছিল, মনোনীত শিক্ষকের বিদেশি এমএ ডিগ্রি থাকতে হবে। রাজনীতিবিজ্ঞান বিভাগে ওই সময় এমন নমিনেশন পাবার মতো দু'জন শিক্ষক ছিলেন। জনাব ইমদাদুল হক এবং আমি। এ নমিনেশন আসার কিছুদিন আগে জনাব ইমদাদুল হককে বিভাগ একটি নমিনেশন দিয়েছিল। সে কারণে গ্রিক স্কলারশিপের জন্য বিভাগীয় পরিকল্পনা কমিটি আমার নাম সুপারিশ করে। প্রকাশনা বেশি থাকায় অনুষদ থেকেও আমার নাম প্রেরিত হয়। আমার বিভাগের প্রফেসর ড. আর আই চৌধুরী তখন ভাইস চ্যান্সেলর। পরে শুনলাম গ্রিক স্কলারশিপের জন্য রসায়ন বিভাগের একজন শিক্ষকের নাম বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাঠানো হয়েছে। তবে ওই শিক্ষকের বিভাগীয় নমিনেশনই পাওয়ার কথা না। কারণ, তার কোনো বিদেশি এমএ ডিগ্রি ছিল না। যার প্রাথমিক নমিনেশন পাওয়ার কথা নয়, তার নাম কি করে বিভাগ এবং অনুষদ মনোনীত করলো এবং বিশ্ববিদ্যালয়ই বা কিভাবে শর্ত উপেক্ষা করে তার নাম চূড়ান্ত করে পাঠালো তা ভেবে দেখার বিষয়। অনেকের ব্যাখ্যায়, এ শিক্ষকের নাম চূড়ান্ত করার পেছনে ভিসির রাজনীতি ও আঞ্চলিকতাপ্রীতি কাজ করেছিল।

যখন আমি ১৯৯৯ সালে সিডনি বিশ্ববিদ্যালয়ে পিএইচডি গবেষণার শেষ পর্যায়ে— এমন সময় বিভাগে দু'জন অধ্যাপক নেবার জন্য বিজ্ঞাপন দেয়া হয়। সেখানে বিভাগের দু'জন সহযোগী অধ্যাপক আবেদন করেন। আমাকে বিষয়টি জানানো হলে আমি হিসেব করে দেখি যে আমিও অধ্যাপক পদে আবেদনের শর্ত পূরণ করি। আমার যেহেতু বিদেশি এমএ ডিগ্রি ছিল এবং প্রয়োজনের চেয়ে বেশি প্রকাশনা ছিল, সে কারণে আমি রেয়াত পেয়ে আবেদনের যোগ্যতা অর্জন করি। বিভাগ থেকেও আমাকে এমন ধারণা দেয়া হয়। কাজেই আমি কাগজপত্র জোগাড় করে আবেদনপত্র পাঠাই। পরিকল্পনা কমিটির সভায় আবেদনপত্র যাচাই বাছাই করার সময় আমার আবেদনপত্র যোগ্য বিবেচিত হলে বিভাগ থেকে তিনটি

আবেদনপত্র সুপারিশ করে পাঠানো হলে দু'জন আবেদনকারীর পদোন্নতি হয়। আমার আবদনপত্র গ্রহণ না করার ব্যাখ্যায় বলা হয়, আবেদনকারী বিজ্ঞাপনে উল্লিখিত সকল সকল শর্ত পূরণ করেন, তবে তিনি ২৬ দিন (যতদূর মনে করতে পারছি, এর কিছু কম বেশিও হতে পারে) এক্সট্রা অর্ডিনারি ছুটিতে ছিলেন। সে জন্য তার আবেদনপত্র গ্রহণ করা হলো না। যারা বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়ম কানুন জানেন তারা বলেন, আপনার অনেক অর্জিত ও মেডিকেল ছুটি পাওনা ছিল। এ কারণে আপনার দরখাস্ত বাতিল করা ঠিক হয়নি। হয়ত ভিসি সাহেবকে বিষয়টি যথার্থভাবে ব্রিফ করা হয়নি। অথচ, ভিসি সাহেবের দলের গুরুত্বপূর্ণ নেতৃত্বস্থানীয় এমনকি তার বন্ধুস্থানীয় শিক্ষক নেতা তখন আমার বিভাগে কর্মরত ছিলেন। আমি তাদের দল না করায় তারা হয়ত আমার জন্য অনুরোধ করেননি। এ জন্য তাদের সমালোচনা করা যায় না। এর ফলে দু'জন পদোন্নতিপ্রাপ্তদের একজন আমার জুনিয়র থাকলেও পদোন্নতি পেয়ে আমার সিনিয়র হন। এ জন্য আমার অনুতাপ নেই। কারণ, আমি যদি দল না করি, তাহলে আমি দলীয় অধ্যাপকদের সমর্থন পাব কেন? ওই সময় বিভাগীয় সভাপতি ছিলেন প্রফেসর ড. মো. আবদুর রশীদ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর ছিলেন প্রফেসর আবদুল মান্নান।

এ সব লাভক্ষতি হিসেব করার পরও আমি মনে করি, বিশ্ববিদ্যালয়ে বর্ণদলে জড়িত না হয়ে আমি লাভবান হয়েছি। কারণ, বিশ্ববিদ্যালয় একটি একাডেমিক প্রতিষ্ঠান। এ কারণে এখানে একজন অধ্যাপকের একাডেমিক পারফরম্যান্সকে বড় করে দেখা উচিত। কিন্তু বাস্তবতা হলো, অনেক শিক্ষককে অধ্যাপক হওয়া পর্যন্ত পদোন্নতির জন্য প্রকাশনা মনোযোগী দেখা যায়। কিন্তু সিলেকশন গ্রেড অধ্যাপক হওয়ার পর আর পদোন্নতি না থাকায় অনেকেই তখন একাডেমিক প্রকাশনায় মনোযোগ কমিয়ে দেন। আমার নিজ বিভাগেই এমন উদাহরণ রয়েছে। কিন্তু রাজনৈতিক বা প্রশাসনিক দায়িত্বে না থাকায় আমার ক্ষেত্রে তেমনটি ঘটেনি। আমি আমার লেখা প্রথম ২০টি বইয়ের মধ্যে ১৮টি বই ৯টি গবেষণা প্রবন্ধ, একটি করে রিসার্চ মনোগ্রাফ ও রিসার্চ রিপোর্ট এবং সম্পাদিত গ্রন্থে চারটি অধ্যায় অধ্যাপক হওয়ার পর লিখেছি। এছাড়া জাতীয় দৈনিক, সাপ্তাহিক, মাসিক পত্রিকা মিলে আমার প্রায় সাড়ে ৫ শতাধিক প্রবন্ধ পত্রিকা-ম্যাগাজিনে প্রকাশিত হয়েছে। এগুলোর অধিকাংশই অধ্যাপক হওয়ার পর প্রকাশিত হয়েছে। কাজেই অধ্যাপক হওয়ার পর আমার যে একাডেমিক পারফরম্যান্স তাতে আমি অসন্তুষ্ট নই। কারণ, নিজ বিভাগে দেখেছি, অধ্যাপক হওয়ার পর সম্মানিত সিনিয়র অধ্যাপকদের কেউ কেউ লেখালেখি করেননি। এমন অধ্যাপকদের একজন অবসরে যাবার আগের ১৭ বছরে একাডেমিক প্রকাশনা করেননি। আবার কেউ কেউ অবসরে যাবার আগের ১০-১২-বা ১৪ বছরে উচ্চতর ডিগ্রিধারী সুযোগ্য, মেধাবী ও খ্যাতিমান শিক্ষক হওয়া সত্ত্বেও উল্লেখযোগ্য একাডেমিক প্রকাশনা করেননি। এমন নমুনা পেয়ে সচিবদেরকে এমন সমালোচনা করতে শুনেছি, 'বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকগণ পদোন্নতির জন্য গবেষণা প্রকাশনা করেন। সব পদোন্নতি পাবার পর তারা আর

প্রকাশনায় মনোযোগ দেন না।' এমন ঢালাও সমালোচনা সম্পূর্ণ সত্য না হলেও অবহেলা করার মতো নয়। তবে আমার ক্ষেত্রে এমনটি হয়নি। অবশ্য দলীয় রাজনীতিতে জড়িত থেকে বিভিন্ন প্রশাসনিক দায়িত্বে নিয়োজিত থাকলে হয়ত লেখালেখির দিকটিতে আমিও কম মনোযোগ দিতে পারতাম।

একাডেমিক দায়িত্ব পালন

বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকদের শিক্ষকতা ও গবেষণার দুটি মূল কাজের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ হলো শিক্ষার্থীদের ক্লাসে পড়ানো। এ কাজে গাফিলতি করে শিক্ষকের পক্ষে জনপ্রিয় শিক্ষক হওয়া সম্ভব নয়। তবে ক্লাসে পড়াবার সঙ্গে আরো কিছু একাডেমিক কাজ শিক্ষকের গুরুত্বপূর্ণ কাজ হিসেবে বিবেচিত হয়। এর মধ্যে সময়মতো সিলেবাস শেষ করা; জরুরি প্রয়োজনে ক্লাসে না আসতে পারলে শিক্ষার্থীদের জানিয়ে পরে মেকআপ ক্লাস নেয়া, শিক্ষার্থীদের সময়মতো টিউটোরিয়াল কাজ করানো, সময়মতো পরীক্ষা গ্রহণ ও ফলাফল প্রকাশ করা, প্রভৃতি। এ জায়গাগুলোয় আমি ব্যক্তিগতভাবে যত্নবান থাকার চেষ্টা করেছি। তবে দুঃখের সঙ্গে লক্ষ্য করেছি, সকল সম্মানিত শিক্ষক এ জায়গাগুলোতে একই মাত্রায় যত্নবান নন। এ কারণে সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর অনেক বিভাগে সেশনজট সৃষ্টি হয়। যে জন্য সুনির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে একাডেমিক ক্যালেন্ডার অনুযায়ী শিক্ষার্থীরা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডিগ্রি নিয়ে বের হতে পারেন না। নষ্ট হয় তাদের জীবনের মূল্যবান সময়।

নিয়োগ ব্যবস্থায় ত্রুটি

আমার দৃষ্টিতে সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে নিয়োগ ব্যবস্থা ত্রুটিপূর্ণ। এ রকম নিয়োগের মধ্য দিয়ে যোগ্যতাসম্পন্ন মেধাবী প্রার্থীগণ শিক্ষকতায় আসতে পারছেন না। একজন বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষককে একাডেমিক দায়িত্বপালন করতে হলে তাকে যোগ্য হতে হয়। এ যোগ্যতা রাতারাতি অর্জন করা সম্ভব নয়। এ ক্ষেত্রে শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোয় পেশাদারিত্ব গড়ে তোলা দরকার। এ সব বিষয়ে আমি বিভিন্ন সময় যুগপৎ পত্রিকায় এবং প্রকাশিত গ্রন্থে লিখে সরকার ও শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করেছি।[২২] কিন্তু নিয়োগ ব্যবস্থায়

---

২২. এ রকম লেখার নমুনার জন্য দেখুন, মুহাম্মদ ইয়াহ্ইয়া আখতার, *সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে দুর্নীতি; স্বরূপ ও প্রতিকার* (ঢাকা: টিআইবি ও এএইচডিপিএইচ, ২০০৮), পৃষ্ঠা-৫২-৫৫; মুহাম্মদ ইয়াহ্ইয়া আখতার, *শিক্ষা ও সংস্কৃতি ভাবনা* (চট্টগ্রাম: খড়িমাটি, ২০১৯), পৃষ্ঠা-৮৪-৮৮, Muhammad Yeahia Akhter, 'Transparency in Tertiary Education: Politics, Admission and Recruitment', included in Imtiaz Ahmed and Iftekhar Iqbal (eds.), *University of Dhaka: Making Unmaking Remaking* (Dhaka: Prothoma Prokashan, 2016), pp. 273-297.

পরিবর্তন আসেনি। সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠের শিক্ষক নিয়োগে অনেকক্ষেত্রেই যোগ্যদের চাকুরি হয় না। কারো কারো চাকুরি পাবার কারণ হিসেবে শোনা যায় রাজনৈতিক প্রভাব ও বিভিন্ন রকম লেনদেনের তথ্য। যেখানে একটি প্রাইমারি, বা হাই স্কুলে শিক্ষকতার চাকুরি পেতে হলে নিবন্ধন পরীক্ষায় পাশ করতে হয়। পরে লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষা দিয়ে যোগ্যতা প্রমাণ করে চাকুরি পেতে হয়। একটি বেসরকারি কলেজে চাকুরি পেতে হলেও নিবন্ধন পরীক্ষায় পাস করতে হয়। পরে নিয়োগ বোর্ড প্রার্থীদের লিখিত পরীক্ষা নেন। ক্লাস প্রেজেন্টেশন যোগ্যতার পরীক্ষা নেন, তারপর মৌখিক পরীক্ষা নিয়ে যোগ্যতা যাচাই করে প্রকৃত মেধাবীদের বাছাই করে চাকুরি দেন। আর দেশের সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠের শিক্ষক নিয়োগে এসব কিছু না করে কেবল নামকাওয়াস্তের একটি মৌখিক পরীক্ষা গহণ করে শিক্ষক নিয়োগ করা হয়। বাস্তবতা হলো, কারা নিয়োগ পাবেন সে সিদ্ধান্ত আগেই হয়ে থাকে। পরে লোক দেখানোর জন্য একটি ইন্টারভিউয়ের নাটক করা হয়। এভাবে শিক্ষক নিয়োগ করায় তুলনামূলকভাবে কম যোগ্য প্রার্থীরা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক হিসেবে চাকুরি পান। আর এ প্রক্রিয়ায় চাকুরিপ্রাপ্তদের একাডেমিক ও ক্লাস পারফরম্যান্স ভালো হয় না। এ কারণে সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোয় নতুন চাকুরিপ্রাপ্ত শিক্ষকদের মধ্য থেকে প্রত্যাশিত সংখ্যায় খ্যাতিমান একাডেমিক গড়ে উঠছেন না। দুঃখের সঙ্গে লক্ষ্য করছি, এভাবে নিয়োগপ্রাপ্তদের মধ্যে অনেকে চেষ্টা করছেন তাদের সীমাবদ্ধতা কাটিয়ে উঠতে। কিন্তু আবার অনেকে আশ্রয় নিচ্ছেন অন্য সিনিয়র শিক্ষকের অধস্তন (ক্লায়েন্ট) হয়ে যে কোনো উপায়ে জার্নালে লেখা প্রকাশ করে দ্রুত পদোন্নতি পেতে। বিভিন্ন সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে এমনভাবে নিয়োগপ্রাপ্ত কেউ কেউ আবার আশ্রয় নিচ্ছেন নকল করে প্রবন্ধ লিখে পদোন্নতির সিড়ি টপকাতে। তাদের দু'চারজন যে ধরা পড়ছেন না, এমন না। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অনেক সিনিয়র শিক্ষকের মধ্যেও এ প্রবণতা ধরা পড়েছে ; সে সব বিষয় নিয়ে একাধিক তদন্ত কমিটি গঠিত হয়েছে এবং অনেকের শাস্তিও হয়েছে।[২৩]

যথাযথ প্রশিক্ষণের অভাব

বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকদের ক্লাস পারফরম্যান্স ভালো না হবার আরো কিছু কারণ আছে বলে আমি মনে করি। কারণ, বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ শিক্ষকতাকে এতই সহজ মনে করেন যে, তারা যে কোনো আবেদনকারীকে চাকুরি দিয়ে পরদিনই কোনো রকম ওরিয়েন্টেশন বা প্রশিক্ষণ ছাড়াই শ্রেণিকক্ষে পড়াতে পাঠিয়ে দেন।

২৩. প্রাসঙ্গিক তথ্যের জন্য দেখুন, মুহাম্মদ ইয়াহইয়া আখতার, 'একাডেমিক দুর্বৃত্তায়ন রুখতে হবে', *যুগান্তর*, ১৩ অক্টোবর, ২০১৭।

অন্য কোনো চাকুরির বেলায় এটা হয় না। শিক্ষকতা একটি ভিন্নধর্মী পেশা। কেবলমাত্র ভালো ছাত্র হলেই ভালো শিক্ষক হওয়া যায় না। অথচ, এ বিষয়টি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ যেমন আমলে নেন না, তেমনি ইউজিসিও গুরুত্ব দেয় বলে মনে হয় না। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে নবীন শিক্ষকগণ বিভিন্ন সময় বিভিন্ন প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণের সুযোগলাভ করেন। যতদূর জেনেছি ওই সব প্রশিক্ষণে তাদেরকে কিভাবে রিসার্চ প্রজেক্ট করতে হয়, কিভাবে গবেষণা প্রবন্ধ লিখতে হয়, এসব বিষয়ে এবং বিশেষ করে গবেষণা পদ্ধতির ওপর প্রশিক্ষণ দেয়া হয়ে থাকে। আমি এমন প্রশিক্ষণ গ্রহণকারী কয়েকজন নবীন শিক্ষকের সঙ্গে কথা বলে জেনেছি, এ সব প্রশিক্ষণে কিভাবে ক্লাস নিতে হবে, কিভাবে শিক্ষার্থীদেরকে পড়াতে হবে, কিভাবে প্রশ্ন করতে হবে, কিভাবে পরীক্ষার খাতায় নম্বর দিতে হবে, কিভাবে টেবুলেশন সিট লিখতে হবে, কিভাবে পরীক্ষার হলে ইনভিজিলেশন দিতে হবে, কিভাবে দ্রুত পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ করতে হবে— এসব প্রয়োজনীয় বিষয়ে তাদেরকে কোনো প্রশিক্ষণ দেয়া হয়নি। এ জন্য অনেক সময় আমি দুঃখের সংগে কোনো কোনো নবীন শিক্ষককে ভর্তি পরীক্ষার হলে ডিউটি করতে এসে ভর্তি পরীক্ষার্থীদের প্রতি ক্ষমতার দাপট দেখিয়ে ত্রাস সৃষ্টি করে তাদেরকে হম্বিতম্বি করতে দেখেছি। একবার আমার সঙ্গে একই পরীক্ষার রুমে একজন সদ্য নিয়োগপ্রাপ্ত প্রভাষক পরীক্ষার্থীদের সঙ্গে এমন নিষ্ঠুর খবরদারি আচরণ করায় আমি খুব লজ্জা পাই।

পরীক্ষার হলে প্রশ্ন দেবার আগেই এ নবীন শিক্ষক 'এই খবরদার কথা বলছো কেন', 'এক্ষুনি বের করে দেবো', প্রভৃতি বলে চিৎকার করে পরীক্ষার্থীদের তটস্থ করে তোলেন। ওই কক্ষের প্রধান পরিদর্শক হিসেবে আমি লজ্জায় মাটিতে মিশে যাচ্ছিলাম। ভাবছিলাম, এ শিক্ষকের দোষ নেই। কারণ, কিভাবে পরীক্ষা পরিচালনা করতে হয় সে সম্পর্কে তাকে কাজে যোগদানের পর প্রশিক্ষণ দেয়া হয়নি। পরে আরেকজন পরিচিত জুনিয়র শিক্ষক এসেও তার ওই রকম কাণ্ড দেখলে আমি তাঁকে আড়াল ডেকে বলি, বিষয়টি আমি দেখব। আপনি ওই শিক্ষককে কিছু বলবেন না। পরে আমি বাকি তিনজন ইনভেজিলেটরের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বললাম, প্রশ্ন দিতে এখনো প্রায় ৪০ মিনিট বাকি আছে। প্লিজ কষ্ট করে দাঁড়িয়ে না থেকে আপনারা চেয়ারে বসুন। সবাই বসলে আমি পূর্বে আলাপ করা শিক্ষককে উদ্দেশ্য করে বললাম, দেখুন, শিক্ষার্থীদের কত কষ্ট। তাদের চোখমুখের দিকে তাকিয়ে দেখুন। অনেকের চোখ লালাভ। হয়ত তারা রাতে ভালো করে ঘুমাতে পারেনি। এদের অনেকেই দূর দূরান্ত থেকে এসেছে। অপরিচিত জায়গায় এসেছে। দেখুন, এদের চোখেমুখে উৎকণ্ঠা। কারণ, এরা জানে না এরা কোথাও ভর্তি হতে পারবে কিনা। আচ্ছা, আপনি কি বলতে পারবেন এই রুম থেকে কতজন ভর্তি হতে পারবে? ওই শিক্ষক বললেন, স্যার, এটা তো বলা সম্ভব না। আমি বললাম, ঠিক বলেছেন। যে তীব্র প্রতিযোগিতা

তাতে এ রুম থেকে দু'চারজন ভর্তির সুযোগ পেতে পারে, আবার এমনও হতে পারে যে, একজনও সুযোগ পাবে না। সে ক্ষেত্রে এদের সঙ্গে হয়ত আমাদের আর জীবনে দেখা নাও হতে পারে। কাজেই আমাদের এমনভাবে এদের পরীক্ষা নেয়া উচিত হবে, যাতে এরা চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হতে পারুক বা না পারুক, এ বিশ্ববিদ্যালয় এবং এ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের প্রতি একটি ভালো ধারণা নিয়ে ফিরে যেতে পারে। পরীক্ষা যেহেতু শুরু করতে অনেকটা সময় বাকি আছে, আপনারা আমাকে অনুমতি দিলে আমি এদেরকে দু'মিনিট কিছু বলি। আরেকজন ইনভিজিলেটর বললেন, 'স্যার আমাদের অনুমতি লাগবে কেন, আপনি অবশ্যই বলুন।' তারপর আমি দু'তিন মিনিট উপস্থিত পরীক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে কথা বলেছিলাম। কি বলেছিলাম হুবহু মনে নেই। তবে তা অনেকটা এমন ছিল:

> প্রিয় পরীক্ষার্থীবৃন্দ, তোমাদের সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। তোমরা বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে উচ্চশিক্ষা গ্রহণের জন্য চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষা দিতে এসেছো। এ জন্য তোমাদের মতো হাজারো শিক্ষার্থীর পদচারণায় চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস আজ মুখরিত। আমরা এখানে উপস্থিত চারজন এই বিশ্ববিদ্যালয়েরই শিক্ষক। আমাদের পক্ষ থেকে এবং চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে তোমাদেরকে এ বিশ্ববিদ্যালয়ে আমরা স্বাগত জানাচ্ছি। অবস্থানগত কারণে এ বিশ্ববিদ্যালয়টি শহর থেকে দূরে। তোমাদের অনেকের এখানে আসতে কষ্ট হয়েছে। তোমাদের চোখমুখ দেখে মনে হচ্ছে দূর থেকে আগত অনেকের নতুন জায়গায় এসে রাতে ভালো ঘুম হয়নি। এ জন্য আমরা তোমাদের প্রতি সমবেদনা জানাচ্ছি। তোমরা কেউ বাবার সাথে, কেউ মায়ের সাথে, আবার কেউবা ভাই বা বন্ধুদের সঙ্গে এসেছো। তারা এখন তোমাদের থেকে অনেকটা দূরে কোথাও অপেক্ষা করছেন। তবে তোমরা নিজেদের একাকী মনে করবে না। কারণ, আমরা চারজন শিক্ষক এখানে তোমাদের অভিভাবক হিসেবে আছি। তোমাদের কোনো অসুবিধা হলে আমরা অবশ্যই তোমাদের দেখভাল করব। আমরা চাই, তোমরা সবাই ভর্তি পরীক্ষায় ভালো ফল করে এ বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হও। কিন্তু প্রতিযোগিতা এতই তীব্র যে তা হবার নয়। আমরা জানিনা এ রুম থেকে তোমরা কতজন ভর্তি হবার সুযোগ পাবে। যেহেতু ভর্তি পরীক্ষাটা প্রতিযোগিতামূলক, কাজেই তোমরা শৃঙ্খলার সঙ্গে পরীক্ষা দেবে এটাই আমাদের প্রত্যাশা। আমরা ওএমআর শিট দেবার পর কারো কোনো জিজ্ঞাসা থাকলে অন্যের সঙ্গে কথা না বলে হাত উচু করবে। আমি নিজে অথবা আমাদের যে কোনো সহকর্মী তোমাদের কাছে গিয়ে তোমাদের জিজ্ঞাসার জবাব দেব/দিবেন। তোমরা ভর্তি হতে পারলে অভিনন্দন, আর ভর্তি হতে না পারলেও উচ্চশিক্ষার জন্য চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যলয়কে পছন্দ করার জন্য ধন্যবাদ। আমাদের চারজনের পক্ষ থেকে তোমাদের সবার জন্য রইলো অনেক শুভেচ্ছা ও মঙ্গল কামনা।

আমার এ বক্তব্যের পর আমি কয়েকজন পরীক্ষার্থীর সঙ্গে ২০-৩০ সেকেন্ড করে কুশলাদি বিনিময় করি। কে কোথা থেকে এসেছে, কি পড়তে চায়, এসব জিজ্ঞেস করি। প্রথমে একটি মেয়ের সঙ্গে আলাপ করি। তার সঙ্গে 'মামনি তুমি কোথা থেকে এসেছো?' বলে শুরু করে আধমিনিট আলাপ করি। সহানুভূতির সুরে গল্পের মেজাজে পরীক্ষার্থীদের সঙ্গে করা এমন আলাপে তারা সহজ স্বাভাবিক হয়ে ওঠে। তাদের মধ্যে সৃষ্ট ভীতির ভাবটি কেটে যায়। বিশেষ করে যে নবীন শিক্ষক প্রথমে পরীক্ষার্থীদের ওপর খবরদারি করে তাদেরকে তটস্থ করেছিলেন, তিনি আমার কর্মকাণ্ড দেখে চুপ হয়ে যান। পরীক্ষা চলাকালীন তিনি আর একবারও উচ্চস্বরে পরীক্ষার্থীদের ওপর খবরদারি করেননি। একবার মাত্র একটি ছেলে ওএমআর শিটে নাম লিখতে ভুল করায় তিনি কি করবেন সে বিষয়ে আমার কাছে জানতে চাইলে আমি অত্যন্ত নম্রস্বরে তাকে বলি, 'আমাদের কাছে যেহেতু অতিরিক্ত ওএমআর শিট আছে, আপনি ওর ওপর একটু দয়াপরবশ হয়ে ওকে আরেকটি নতুন ওএমআর শিট দিন। আর পুরানো শিটটির ওপরে বাতিল লিখে সই করে রেখে দিন।' নতুন শিক্ষকরা কাজে যোগ দেবার পর দায়িত্ব পালনের ব্যাপারে যদি প্রশিক্ষণ পেতেন তাহলে তারা ভর্তি পরীক্ষার হলে নিশ্চয়ই এমন আচরণ করতেন না।

নতুন শিক্ষকদের যথাযথ প্রশিক্ষণ না দেয়ায় একই অবস্থা হয় পরীক্ষার প্রশ্নপত্র প্রণয়ন, প্রশ্নপত্র লিখন এবং খাতায় নম্বর প্রদান নিয়ে। আমি নিজে পরীক্ষা কমিটিতে কাজ করার সময় যেসব প্রশ্ন কম্পোজ করি, সেগুলির প্রিন্ট আউট নিয়ে পরীক্ষা কমিটির অন্য সদস্যদেরকে পড়তে অনুরোধ করি। কারণ, অনেক সময় নিজের ভুল নিজের চোখে ধরা পড়ে না। তারপরও অনেকক্ষেত্রে ছোটখাটো ভুল থেকে যায়। তবে এ ক্ষেত্রে বার বার পড়তে হয়। যথেষ্ট সতর্ক হতে হয়। এ গ্রন্থ লেখার সময় ২০১৯ সালের এপ্রিল মাসে রাজনীতি বিজ্ঞান বিভাগের চতুর্থ বর্ষের প্রশ্নপত্রে উল্লেখযোগ্যসংখ্যক বানান ভুল থাকায় বিষয়টি বিভিন্ন সংবাদপত্রে রিপোর্ট আকারে প্রকাশিত হয় (এ রকম দুটি রিপোর্টের জন্য দেখুন পরিশিষ্ট-৬:১)।[২৪] সংশ্লিষ্ট প্রশ্নলেখক এবং পরীক্ষা কমিটি সতর্ক হলে এত ভুল থাকত না।

---

২৪. দেখুন, 'চবির রাজনীতি বিজ্ঞান বিভাগের প্রশ্নপত্রে ১০ বানান ভুল', *যুগান্তর*, ১৬ এপ্রিল, ২০১৯; একই তারিখে এ বিষয়ে 'চবির প্রশ্নপত্রে চট্টগ্রামসহ ১০ বানান ভুল' শিরোনামে রিপোর্ট ছাপা হয় *বাংলাদেশ সময়*, *চট্টলার বার্তা* ও *কক্সবাজার বার্তা* পত্রিকায়। একই তারিখে 'চবির প্রশ্নপত্রে ১০ বানান ভুল' শিরোনামে *দৈনিক শিক্ষা*; 'এক প্রশ্নপত্রে ১০ বানানই ভুল' শিরোনামে *স্টুডেন্ট জার্ণাল*; 'চবির প্রশ্নপত্রে বানান ভুল' শিরোনামে *নিউজ ২৪.আওয়ার*; এবং 'চবিতে পরীক্ষার প্রশ্নে ১৩ বানান ভুল' শিরোনামে *সমকাল* পত্রিকায় সংবাদ প্রকাশিত হয়। আবার একই সংবাদ ১৯ এপ্রিল,

অনেকগুলো পত্রিকায় এই রিপোর্ট প্রকাশিত হওয়ায় চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন এ বিষয়টি খতিয়ে দেখতে দুই সদস্যবিশিষ্ট তদন্ত কমিটি গঠন করে।[২৫] নবীন শিক্ষকদেরকে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক হিসেবে কাজে যোগদানের পর যদি তাদের দৈনন্দিন কাজের ওপর একটি বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ দেয়া হত তাহলে প্রশ্নপত্রে এমন ভুলের সংখ্যা কম হত।

ক্লাস পারফরম্যান্স

একজন বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকের প্রধান কাজ হলো শিক্ষার্থীদেরকে শ্রেণিকক্ষে পাঠদান করা। এ কাজে অবহেলা করলে শিক্ষকের পক্ষে শিক্ষার্থীদের কাছে জনপ্রিয় হওয়া সম্ভব নয়। এ জন্য ক্লাস নেবার ব্যাপারে গাফিলতি না করে সকল শিক্ষকের উচিত ক্লাসে মনোযোগী হওয়া। আমার শিক্ষকতা জীবনের অভিজ্ঞতায় বুঝেছি, শিক্ষার্থীরা এ বিষয়ে অবহিত যে, সকল শিক্ষকের একাডেমিক যোগ্যতা ও ক্লাস পারফরম্যান্স এক রকম হয় না। সে জন্য তারা চায় শিক্ষকের আন্তরিকতা। তারা দেখে, শিক্ষক তার সামর্থ্য অনুযায়ী ক্লাসে পড়াবার চেষ্টা করছেন কিনা। ক্লাস নেবার ব্যাপারে আমি সব সময় আন্তরিক থাকার চেষ্টা করেছি। কোনো ক্লাস না নিতে পারলে শিক্ষার্থীদের আগে থেকে জানিয়ে দিয়েছি। পরিতাপের বিষয়, সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল শিক্ষকের মধ্যে এ ব্যাপারে একই রকম দায়িত্বশীলতা লক্ষিত হয় না। এ কারণে অনেক সময় যথাসময়ে সিলেবাস শেষ করতে না পারায় পরীক্ষা পিছিয়ে যায়। অবশ্য সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে রাজনৈতিক কারণেও অনেক সময় বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক কার্যক্রম বাধাগ্রস্ত হয়। এর ফলে সেশন জট সৃষ্টি হয়, যা শিক্ষার্থীরা এবং অভিভাবকগণ একেবারেই পছন্দ করেন না। উল্লেখ্য, কিছু শিক্ষক একাডেমিক কাজকর্মের চেয়ে রাজনৈতিক কাজকর্মে অধিক মনোযোগ দিয়ে থাকেন। এ কারণে তারা একাডেমিক কাজে প্রত্যাশিত মাত্রায় দায়িত্বশীল হতে পারেন না। এমন শিক্ষকের সংখ্যা অবশ্য খুব বেশি নয়।

শিক্ষকদের ক্লাস নেবার বিষয়গুলো আমি আমার নিজের রাজনীতিবিজ্ঞান বিভাগে গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করেছি। অনেক সময় লক্ষ্য করেছি, অনেক শিক্ষক

২০১৯ তারিখে *চট্টগ্রামের আলো* পত্রিকায় ছাপা হয় 'চবির রাজনীতি বিজ্ঞান বিভাগের প্রশ্নপত্রে চট্টগ্রামসহ গুরুত্বপূর্ণ ১০ বানান ভুল' শিরোনামে।

২৫. দেখুন, 'চবির প্রশ্নপত্রে বানান ভুলের ঘটনায় তদন্ত কমিটি', *কালের কণ্ঠ*, ২৩ এপ্রিল, ২০১৯; 'চবির প্রশ্নপত্রে বানান ভুলের ঘটনায় তদন্ত কমিটি', বাংলানিউজটুয়েন্টিফোর.কম, ২১ এপ্রিল, ২০১৯।

ক্লাস নিচ্ছেন না এবং তা ছাত্রদেরকে তাঁরা জানাবারও প্রয়োজন মনে করছেন না। এমনকি শিক্ষক তাঁর অনুপস্থিতির বিষয়টি বিভাগকেও জানাচ্ছেন না। এতে দ্বিবিধ ক্ষতি হয়। প্রথমত, শিক্ষার্থীদের কাছে ওই শিক্ষকের জনপ্রিয়তা হ্রাস পায়; এবং দ্বিতীয়ত, এর ফলে ক্লাসে শিক্ষার্থীদের উপস্থিতি কমে যায়। কারণ, অনেক শিক্ষার্থী যখন দূর দূরান্ত থেকে ক্লাস করতে এসে দেখেন, রুটিন অনুযায়ী তার যে পাঁচটি ক্লাস হবার কথা ছিল তার দুটি অকারণে হয়নি, তখন সে ক্লাস করতে আসতে নিরুৎসাহিত হয়। আমি এ বিষয়গুলো গোপনে দেখভাল করেছি। জুলাই থেকে নভেম্বর ২০১৬ এর মধ্যে আমি বিভাগীয় সেলফ অ্যাসেসমেন্ট কার্যক্রম এর অংশ হিসেবে গোপনে দৈবচয়ন পদ্ধতিতে ১০ দিনের বিভাগীয় ক্লাসচিত্র পর্যবেক্ষণ করে দেখি প্রায় অর্ধেকের কিছু কম ক্লাস হয়নি, যা সারণি-১ এ প্রতিফলিত হয়েছে। অবশ্য এমন চিত্র সব সময়ের নয়। আবার এ কথাও বলে রাখা ভালো যে, অনেক শিক্ষক তাদের রুটিনের সব ক্লাস সময়মত নেন। বিভাগে সেলফ অ্যাসেসমেন্ট কার্যক্রম শুরু হলে শিক্ষকগণের ওপর তার কিছুটা ইতিবাচক প্রভাব পড়ে এবং বিভাগীয় সভাপতি হিসেবে আমি এ ব্যাপারে দেখভাল বাড়িয়ে দিলে শিক্ষকগণ ক্লাস নেবার ব্যাপারে অধিকতর যত্নবান হন।

ক্লাস সংক্রান্ত আরেকটি বিষয় আমি ব্যক্তিগতভাবে পছন্দ করি না। আমি লক্ষ্য করেছি, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনো শিক্ষক মারা গেলে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন তার মৃত্যু উপলক্ষে শোক পালনের কথা বলে ক্লাস সাসপেন্ড করে দেন। এ বিষয়টি আমি মন থেকে মেনে নিতে পারি না। কারণ, এই শিক্ষক সারা জীবন লেখাপড়া এবং ক্লাস নেয়াকে তার মুখ্য কাজ হিসেবে গণ্য করেছেন। অথচ তাঁর মৃত্যুতে শোক পালন, বা তাঁকে শ্রদ্ধা জানাবার নামে মৃত ব্যক্তির মূল কাজ ক্লাস নেয়া বন্ধ করে দেয়া হয়। এ কাজটি মোটেও যৌক্তিক নয়। একজন শিল্পী মারা গেলে তো আমরা গান শোনা বন্ধ করি না। একজন অভিনেতা মারা গেলে তো আমরা নাটক দেখা বন্ধ করি না। বরং শিল্পীর মৃত্যুতে তার গাওয়া গান আরও বেশি করে বাজানো বা দেখানো হয়। অভিনেতার মৃত্যুতে তার অভিনীত নাটক বা সিনেমা বেশি করে প্রচার করা হয়। তাহলে একজন শিক্ষাবিদ মারা গেলে তাকে শ্রদ্ধা জানাবার নামে তার মূল কাজ ক্লাস নেয়া বন্ধ করা হবে কেন? বরং যেহেতু মৃত শিক্ষক সারা জীবন দায়িত্বশীলতার সঙ্গে ক্লাস নিয়েছেন, সে কারণে তাঁকে সম্মান ও শ্রদ্ধা জানাতে ওই দিন সকল শিক্ষককে অধিকতর ক্লাস মনোযোগী হতে বলা শ্রেয়। তাঁকে প্রকৃত শ্রদ্ধা জানাতে চাইলে বরং প্রত্যেক শিক্ষককে তাদের ওই দিনের প্রতিটি ক্লাসের শুরুতে ৫ মিনিট মৃত শিক্ষকের শিক্ষার প্রতি অনুরাগ এবং তাঁর গবেষণা ও অবদান সম্পর্কে শিক্ষার্থীদেরকে ধারণা দেয়ার নির্দেশনা দেয়া হলে তাঁকে প্রকৃত শ্রদ্ধা জানানো হবে। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মানিত অধ্যাপক ও বিশিষ্ট বিজ্ঞানী প্রফেসর জামাল নজরুল ইসলাম ২০১৩ সালের ১৬ মার্চ ইন্তেকাল করেন। তাঁর মৃত্যুতে শোক পালন ও শ্রদ্ধা জ্ঞাপনের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়

সারণি-০১

জুলাই-নভেম্বর ২০১৬ সময়কালে দ্বৈবচয়ন ভিত্তিতে ১০ দিনের ক্লাসচিত্র

তারিখ	রুটিনে ক্লাসসংখ্যা	ক্লাস হবার কথা	ক্লাস হয়েছে	ক্লাস হয়নি
২৭-০৭-২০১৬	২৩	২০	১৩	০৭
০২-০৮-২০১৬	২৬	২৪	১০	১৪
০৩-০৮-২০১৬	২৩	২০	০৪	১৬
০৭-০৮-২০১৬	২৪	২০	১২	০৮
০১-১১-২০১৬	২৩	২২	১১	১১
০৩-১১-২০১৬	২৩	২২	০৭	১৫
০৭-১১-২০১৬	২৬	২৩	১৫	০৮
০৮-১১-২০১৬	২৪	২৪	১৮	০৬
১০-১১-২০১৬	২৩	২২	১০	১২
১৩-১১-২০১৬	২৪	২২	১১	১১
মোট ১০ দিন	২৩৯	২১৯	১১১ (৫০.৬৯%)	১০৮ (৪৯.৩১%)

উৎস: সেলফ অ্যাসেসমেন্ট রিপোর্ট, রাজনীতিবিজ্ঞান বিভাগ, ডিসেম্বর, ২০১৬, পৃষ্ঠা-৪৪।

প্রশাসন ক্লাস বন্ধ করে দেয়। এই প্রফেসর সারাজীবন লেখাপড়ার জন্য ব্যয় করেছেন। নিয়মানুযায়ী যত্নের সাথে ক্লাস নিয়েছেন। তিনি যদি মারা যাবার পর জানতে পারতেন, তাঁর মৃত্যুর কারণে ক্লাস বন্ধ করে দেয়া হয়েছে, আমার ধারণা তিনি আপত্তি জানাতেন। কোনো শিক্ষাবিদের মৃত্যুর সঙ্গে ক্লাস বন্ধ করাকে সম্পর্কিত না করে আমি তাঁকে অন্য বিকল্প উপায়ে শ্রদ্ধা জানাবার পক্ষপাতী। আমি অধ্যাপক ইসলামের মৃত্যুর পর চলমান সংস্কৃতির সমালোচনা করে একটি ফেসবুক স্ট্যাটাস দিয়েছিলাম। যারা এ স্ট্যাটাসটি পড়েছিলেন তাঁদের প্রায় সবাই আমার সঙ্গে একমত হয়েছিলেন।

কেন শিক্ষার্থীরা ক্লাস করতে চায় না? রাজনীতিবিজ্ঞান বিভাগে শিক্ষার্থীদের ক্লাস উপস্থিতি মোটেও সন্তোষজনক নয়। একেকটি বর্ষে শিক্ষার্থীসংখ্যা ১৪০-১৫০ জনের মতো। যদি এ বিভাগে প্রতি ক্লাসে শতকরা ৮০ ভাগ শিক্ষার্থী ক্লাসে উপস্থিত হত, তাহলে বিভাগের পক্ষে প্রতিটি ক্লাসকে দুই সেকশনে ভাগ করা লাগত। কিন্তু একমাত্র প্রথম বর্ষ সম্মান শ্রেণি বাদ দিলে অন্যান্য বর্ষের ক্লাস উপস্থিতি নগণ্য। ওপরের শ্রেণির ক্লাসগুলোতে ৩৫-৪০ জন, বা কখনো খুব বেশি হলে আরও দুচারজন বেশি শিক্ষার্থী ক্লাসে উপস্থিত হয়। এ জন্য এককভাবে শিক্ষার্থীদেরকে দোষ দেয়া যায় না। এ ব্যাপারে শিক্ষকদেরও দায় আছে। আবার সকাল বেলার ক্লাসগুলোতে শিক্ষার্থীর সংখ্যা থাকে আরও কম। শিক্ষার্থীদের ক্লাসে

অধিক মনোযোগী না হবার একটি কারণ হলো পরীক্ষার সময় ক্লাস পারসেন্টেজ কম হলেও তারা পরীক্ষা দিতে পারে। তাদেরকে সতর্ক করে, বা অনেকক্ষেত্রে তাদের কাছ থেকে লিখিত দরখাস্ত বা মুচলেকা নিয়ে পরীক্ষা দিতে দেয়া হয়। সেজন্য শিক্ষার্থীরা জানে, তারা যদি কম ক্লাস করে, তাহলেও তারা পরীক্ষা দিতে পারবে। ফলে ক্লাস করাটাকে তাদের অনেকেই গুরুত্বের সঙ্গে নেয় না। এ জন্য শিক্ষার্থীদের ক্লাস উপস্থিতি বাড়াতে বিভাগ ২০১৬ সাল থেকে ক্লাস উপস্থিতির ওপর ১০ নম্বর দেবার নিয়ম চালু করে। এর পরও ক্লাস উপস্থিতির উল্লেখযোগ্য উন্নতি হয়নি। আমি নিজে এমএসএস ২০১৮ ব্যাচের শিক্ষার্থীদের ২০১৮-২০১৯ সালে 'রাষ্ট্রদর্শনের সমস্যাবলি' শীর্ষক একটি কোর্স পড়াবার সময় আমার ক্লাসে ১৩৫ জনের মধ্যে মাত্র ৩৫-৪০ জনের মতো শিক্ষার্থীকে উপস্থিত পেতাম। দুয়েক ক্লাসে আবার মাত্র ২০-২৫ জন থাকতো। অন্য শিক্ষকদের ক্লাসেও যে অনেক বেশি শিক্ষার্থী থাকতো এমন নয়। মোট কথা, শিক্ষার্থীদের মধ্যে ক্লাস না করে পরীক্ষা দেয়া যায় এবং পাসও করা যায় এমন ধারণা চলমান থাকায় তাদের অনেকে শ্রেণিকক্ষমুখী হতে চায় না। পরের বছর ২০১৯ সালে আমি অনার্স চতুর্থ বর্ষে 'দুর্নীতি ও রাজনীতি' শীর্ষক একটি কোর্স পড়াতে গিয়ে ক্লাসে আরও কম শিক্ষার্থী পাই। এ কোর্সটি আমারই ডিজাইন করা এবং আমি কোর্সটি অনেক বছর ধরে পড়াচ্ছি। তবুও ক্লাসে শিক্ষার্থীর খরা। অবশ্য এ কোর্সে আমাকে রুটিনে ক্লাস দেয়া হয়েছে রবিবারে পরপর দুটি এবং সোমবারে একটি। রবিবারের ক্লাসদুটি সকাল নয়টায় শুরু হয়ে দশটা চল্লিশ মিনিটে শেষ হয়। সোমবারের ক্লাসটি শুরু হয় ১২টা ২০ মিনিটে। রবিবারের ক্লাসের জন্য আমি শহর থেকে সকালের প্রথম বাসে এসে ঠিক নয়টায় ক্লাসে উপস্থিত হই। কিন্তু আরামপ্রিয় শিক্ষার্থীরা হল থেকে ৫-৭ মিনিটের হাঁটার রাস্তা হলেও ক্লাসে আসতে পারে না। আমি কয়েকদিন ঠিক নয়টায় উপস্থিত হয়ে ক্লাসে একজনও না পেয়ে ১০-১৫ মিনিট বসে থাকার পর কয়েকজন এসেছে। যারা এসেছে এরাও হলের নয়। এরা শহর থেকে এসেছে। এমনটি বেশ কয়েক দিন হয়েছে। আবার অনেক দিন আমি নয়টায় ক্লাসে ঢুকে হয়ত একজন বা দু'জনকে পেয়েছি। তাদের সঙ্গে গল্প করতে করতে পরে আরও কয়েকজন এসেছে। কিন্তু ক্লাস শেষ হবার সময় দেখা গেছে ৩০-৩৫জন বা কোনোদিন ৪০-৪২ জন বা এর কিছু কম বেশি শিক্ষার্থী ক্লাসে হাজির হয়েছে। একটি নমুনা উপস্থাপন করি। ৪ আগস্ট, ২০১৯ তারিখ রবিবার আমি ঠিক নয়টায় ক্লাসে ঢুকে মাত্র একজন শিক্ষার্থীকে পাই। প্রমাণস্বরূপ আমি ওই শিক্ষার্থীর ছবি উঠিয়ে রাখি। কিন্তু পরে ধীরে ধীরে দু'চারজন করে আসায় ক্লাস উপস্থিতি বাড়ে এবং যখন ক্লাস শেষ করি তখন ১০টা ৪০ মিনিটে ক্লাসে উপস্থিত পাই ২৭ জনকে (ক্লাস শুরু এবং শেষ সময়ের শিক্ষার্থী উপস্থিতির জন্য দেখুন পরিশিষ্ট- ৬:২)। এদের মোট শিক্ষার্থীর (১৪৮ জন) মাত্র ২৭ জন (১৮.২৫%) ক্লাস করলে আমার নিজেকে অপরাধী মনে হয়। আমি যে কোর্সটি ভালোভাবে পড়াতে পারি না এবং সে কারণে শিক্ষার্থীরা ক্লাসে আসছে না, বিষয়টি এমন নয়।

শিক্ষার্থীদের মধ্যেই ক্লাস না করার প্রবণতা গড়ে উঠেছে, যা আমরা ক্লাস উপস্থিতিতে ১০ নম্বর দেবার বিধান করেও রোধ করতে পারিনি। বলার অপেক্ষা রাখে না যে, শিক্ষার্থীদের ক্লাস উপস্থিতি বাড়াতে বিভাগের বিকল্প ভাবনা প্রয়োজন।

টিউটোরিয়াল ক্লাস

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের রাজনীতিবিজ্ঞান বিভাগে অনার্স শিক্ষার্থীদের টিউরিয়ালের জন্য ২০১৫ সাল পর্যন্ত প্রতি বর্ষে ২৫ নম্বর বরাদ্দ ছিল। পরবর্তীতে ২০১৬ সাল থেকে ক্লাস উপস্থিতি বাড়াতে টিউটোরিয়ালে ১৫ নম্বর এবং ক্লাস উপস্থিতিতে ১০ নম্বর বরাদ্দ করা হয়। যে উদ্দেশ্যে ক্লাস উপস্থিতিতে ১০ নম্বর দেয়ার বিধান করা হয়েছিল, তা যে সফল হয়নি সে আলোচনা ইতিপূর্বে করা হয়েছে। আমি শিক্ষার্থীদের কম উপস্থিতির জন্য তাদেরকে এককভাবে দায়ী করব না। এ ক্ষেত্রে শিক্ষকদেরও দায় আছে। আমরা শিক্ষার্থীদেরকে ক্লাসে আনতে পারছি না। আরেকটি কারণ হলো, সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে যে সব শিক্ষার্থীরা পড়ে, তাদের বেশির ভাগই মধ্যবিত্ত ও নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবারের সন্তান। এদের অনেকেরই টিউশনিসহ বিভিন্ন কাজে ব্যস্ততা থাকে। সে কারণেও অনেকে ক্লাসে নিয়মিত হতে পারে না।

একেক বর্ষের শিক্ষার্থীদের ওই বর্ষের কোর্স শিক্ষকদের মধ্যে টিউটোরিয়াল গ্রুপ করে ভাগ করে দেয়া হয়। প্রতি শিক্ষার্থীকে দু'জন শিক্ষকের সঙ্গে টিউটোরিয়াল কাজ করতে হয়। দু'জন শিক্ষক পৃথকভাবে তাদেরকে নম্বর প্রদান করলে পরীক্ষা কমিটি ওই নম্বর গড় করে তাদেরকে টিউটোরিয়াল নম্বর দেন। সাধারণত একেকটি টিউটোরিয়াল গ্রুপে ২৫ থেকে ৩০ জনের মতো শিক্ষার্থী থাকে। এ ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট শিক্ষকের এখতিয়ার যে তিনি কয়টা টিউটোরিয়াল ক্লাস নিবেন, বা ছাত্রছাত্রীদেরকে দিয়ে কি কাজ করাবেন। অনেক শিক্ষক শিক্ষার্থীদের প্রশ্ন দিয়ে দেন। শিক্ষার্থীরা বাড়ি থেকে উত্তর লিখে এনে শিক্ষককে জমা দেয়। আবার কেউ বিষয়বস্তু বলে দেন এবং ক্লাসে বসিয়ে ওই বিষয়বস্তুর ওপর প্রশ্ন দিয়ে পরীক্ষা নেন। অনেকে বিশেষ বিষয়বস্তু বলে দিয়ে তার ওপর মৌখিক পরীক্ষাও নিয়ে থাকেন। কেউ কেউ মাঝে মাঝে টিউটোরিয়াল ক্লাস নেন এবং ওই ক্লাসে বিশেষ বিশেষ বিষয়ের ওপর আলোচনা করেন। আমি নিজেও কোনো কোনো সময়ে এসব পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীদের টিউটোরিয়াল কাজ যে করাইনি এমন নয়। তবে আমি কখনো টিউটোরিয়াল নম্বর দেবার জন্য মৌখিক পরীক্ষা নেইনি। তবে বেশির ভাগ ক্ষেত্রে আমি টিউটোরিয়াল শিক্ষার্থীদের কাজ করানো নিয়ে নতুন ধরনের পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছি। এর ফলে শিক্ষার্থীরাও যেমন আনন্দ পেয়েছে, তেমনি আমিও তাদের অ্যাসাইনমেন্ট থেকে অনেক কিছু শিখতে পেরেছি। এখানে আমি চতুর্থ বর্ষ সম্মান শ্রেণির শিক্ষার্থীদের দিয়ে করানো এমন দুটি নতুন ধরনের টিউটোরিয়াল অ্যাসাইনমেন্টের নমুনা উপস্থাপন করব।

প্রথম নমুনা

নতুন রকমের প্রথম টিউটোরিয়াল অ্যাসাইনমেন্টটির কথা বলি। এ ক্ষেত্রে আমি প্রথমে টিউটিরিয়াল ক্লাস নেবার জন্য তারিখ ঘোষণা করি। পূর্ব-নির্ধারিত টিউটোরিয়াল ক্লাসে মিলিত হয়ে পারসেন্টেজ নেবার পর শিক্ষার্থীরা জানতে চাইলো—

: স্যার আপনি কি কোনো প্রশ্ন দিবেন?

: দেখ, প্রশ্ন দিলে তো তোমরা উত্তর লিখে আনতে পারবে। এমন টিউটোরিয়াল তো তোমরা অনেক করেছো। নতুন ধরনের কিছু করতে তোমাদের আপত্তি আছে নাকি?

: না স্যার, কোনো আপত্তি নেই। তাহলে তো ভালো হয়।

: বেশ, তাহলে তোমাদের নতুন ধরনের একটি অ্যাসাইনমেন্ট দিচ্ছি। আচ্ছা, তোমরা সংখ্যায় কতজন?

: স্যার আমরা এ গ্রুপে মোট ২৮ জন।

: তোমাদের প্রথম কাজ হবে তোমরা নিজেদেরকে দু'ভাগে ভাগ করবে। তাহলে একেক ভাগে কতজন হবে?

: স্যার আমরা একেক ভাগে হবো ১৪ জন।

: বেশ, এরপর তোমরা প্রতি গ্রুপের একটি নাম দেবে। নদীর নাম দিতে পারো। যেমন, হালদা বা কর্ণফুলি। অথবা তোমাদের পছন্দমত অন্য কোনো নামও দিতে পারো।

: স্যার তারপর?

: তারপর ২৮ জনের সবাই মিলে তোমাদের মধ্য থেকে সুযোগ্য একজনকে সভাপতি নির্বাচিত করবে।

: স্যার ভোটাভুটির মাধ্যমে করব?

: দেখো, এটা তোমাদের ব্যাপার। তবে কনসেনসাসের মাধ্যমে করতে পারলে আর ভোটাভুটির প্রয়োজন হবে না। সভাপতি নির্বাচনের পর প্রতি গ্রুপ থেকে ২ জন করে নিয়ে মোট চারজন বিচারক ঠিক করবে। প্রতি গ্রুপ থেকে একজন দলনেতাসহ মোট ৩ জন করে বিতার্কিক ঠিক করবে। একজন উপস্থাপক এবং একজন সময় রক্ষণকারী ঠিক করবে।

: স্যার আমরা নিশ্চয়ই কোনো বিতর্ক অনুষ্ঠান আয়োজন করতে যাচ্ছি।

: হ্যাঁ, ঠিক তাই।

: স্যার এটা কবে হবে?

: সেটা তোমাদের ব্যাপার। তোমরা সম্মিলিতভাবে এর তারিখ, সময় এবং ভেনু ঠিক করবে।

: স্যার যারা বিতর্কে অংশ নেবে না, তারা কি করবে?

: তারা বিতার্কিকদের তথ্য উপাত্ত জোগাড় করে দেবে। বিতার্কিকরা তাদেরকে দিয়ে লাইব্রেরি ওয়ার্কসহ যে কোনো কাজ করাতে পারবে। তা ছাড়া তারা

প্রিপারেশনের জন্য গ্রুপ ডিসকাশনে অংশগ্রহণ করবে। কেউ যদি অসহযোগিতা করে তাহলে দলনেতা তার নাম লিখে রাখবে। তাছাড়া বিতর্কসভা চলাকালে তারা ভলেন্টিয়ারের কাজ করবে।

: স্যার বিতর্কের বিষয়বস্তু কি হবে?

: রাইট। বিষয়বস্তু লিখে নাও। 'আসন্ন একাদশ সংসদ নির্বাচন দলীয় সরকারের অধীনে সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করা সম্ভব।' কোন দল পক্ষে এবং কোন দল বিপক্ষে বলবে তা তোমরা আলোচনা করে ঠিক করে নেবে। যদি দুই দলই একপক্ষে বলতে চায়, সে ক্ষেত্রে তোমরা লটারি করে পক্ষ-বিপক্ষ ঠিক করবে। তোমরা ইচ্ছামত ২ বা ৩ সপ্তাহ সময় নিতে পারো। সব কিছু ঠিক হলে আমাকে জানাবে। কারো কোনো জিজ্ঞাসা না থাকলে আজকের মতো ক্লাস শেষ করব।

: স্যার আমাদের দুটি জিজ্ঞাসা আছে।

: বলো, কি জানতে চাও?

: স্যার, সবকিছু তো আমরাই করব। আপনি কি করবেন? আর এ বিতর্কসভার দর্শক কারা হবে?

: ভালো প্রশ্ন। আমি পর্যবেক্ষক হিসেবে পেছনের বেঞ্চে বসে থাকব। আর তোমরা একটি রুমে যত লোক বসতে পারে ততজনকে চাইলে দর্শক হিসেবে রাখতে পারবে। তিনদিনের মধ্যে তোমরা প্রাথমিক কাজগুলো করে আমাকে তারিখ, সময় এবং ভেনু সম্পর্কে জানাবে। তবে তোমাদের কাছে আমার একটি অনুরোধ আছে।

: স্যার, বলুন আর কি করতে হবে।

: তোমরা তোমাদের বিতর্কসভার সম্মানিত সভাপতিকে সভাশেষে পর্যবেক্ষক হিসেবে আমাকে ২-৩ মিনিট সময় দিতে অনুরোধ করবে। তিনি যদি তাতে সম্মত হন তাহলে সেটাও আমাকে জানিয়ে দেবে। আরেকটা বিষয় বলা দরকার। টেবিলে কাপড় বিছাতে চাইলে এবং সময় রক্ষণের জন্য ঘন্টার প্রয়োজন হলে আমি অফিস স্টাফদের বলে রাখব। তারা তোমাদের প্রয়োজনীয় সহায়তা দেবে।

: স্যার যদি কিছু না মনে করেন আরেকটা বিষয় জানতে চাইতাম।

: নিঃসঙ্কোচে বলতে পারো।

: স্যার নম্বর কিভাবে দিবেন? যারা বিতর্কে অংশ নেবে না তারা কি একটু কম নম্বর পাবে?

: না। সম্মানিত বিচারকদের রায়ে বিজয়ী দলকে যে নম্বর দেব ওই দলের সব সদস্য একই নম্বর পাবে। আবার বিজিত দলের ক্ষেত্রেও সবাই একই নম্বর পাবে। তবে কেউ যদি দলীয় বা গ্রুপের কাজে অসহযোগিতা করে, কেবল তার জন্য নম্বর কমে যাবে।

আমার প্রকৃত উদ্দেশ্য ছিল শিক্ষার্থীদেরকে একটি বিতর্কসভা আয়োজনের প্রশিক্ষণ দেয়া। তারা নিজেরা কিছু করতে শিখুক। শিক্ষার্থীরা ৫দিন পরে এসে আমাকে

দিন, তারিখ এবং ভেনুর খবর জানাল। আমি তাদের কাছে জানতে চাইলাম, তাদের কোনো অসুবিধা আছে নাকি। তারা বলল, না এখন তারা তথ্য সংগ্রহ এবং বিতর্কের প্রস্তুতি গ্রহণে ব্যস্ত। আমি তাদের জন্য নিজে শহরে গিয়ে ১৩টি গলায় ঝুলানো নামফলক তৈরি করাই।[২৬] সে সঙ্গে দামি র‍্যাপিং পেপার কিনে ১৩টি পুরস্কার তৈরি করি। নির্দিষ্ট দিনে উপস্থিত হয়ে তাদেরকে নামফলকগুলো দিয়ে যার যারটা নিজ গলায় ঝুলিয়ে ব্যবহার করতে বলি। সময়মতই তারা সবকিছু সুসম্পন্ন করতে পারে। সভাপতি, বিচারকবৃন্দ, উপস্থাপক, সময়রক্ষক যথাযথভাবে তাদের দায়িত্ব পালন করেন। সভাপতি ফলাফল ঘোষণার পর পর্যবেক্ষক হিসেবে আমাকে ৫ মিনিটের জন্য ফ্লোর দেন। আমি সভাপতিসহ সবাইকে এত সুন্দরভাবে বিতর্কসভা আয়োজনের জন্য ধন্যবাদ জানাই। বলি, আমি মনে মনে তোমাদের যেমন পারফরম্যান্স আশা করেছিলাম, তোমাদের ব্যবস্থাপনা ও সার্বিক পারফরম্যান্স তার চেয়ে ভালো হয়েছে। এ জন্য আমি দু'গ্রুপের ২৮ জন শিক্ষার্থীকে অভিনন্দন জানাচ্ছি। দেখ, জয় পরাজয়কে এখানে আমি বড় করে দেখছি না। একটি অনুষ্ঠান সম্পূর্ণ নিজেরা আয়োজন করতে পারা এবং তার অংশ হতে পারার মধ্যে যে আনন্দ আছে আমার বিশ্বাস সে আনন্দ তোমরা উপভোগ করেছো। এরপর ব্যাকপ্যাক খুলে বললাম, তোমাদের জন্য অত্যন্ত মূল্যবান কিছু পুরস্কারের ব্যবস্থা করেছি। এগুলো ভলেন্টিয়ারগণ তোমাদের ১৩জনকে পৌঁছে দেবে। উল্লেখ্য, পুরস্কারের প্যাকেটগুলো অত্যন্ত আকর্ষণীয় হলেও প্রতি প্যাকেটের মধ্যে ছিল ২০-২৫ টাকা দামের সস্তা খাদ্যসামগ্রী। যেমন, কোনো প্যাকেটে ছিল একটি বিস্কুটের প্যাকেট এবং একটি ম্যাংগো বার। এই উপহারের দাম কম হলেও এতে ছিল শিক্ষকের ভালোবাসার ছোঁয়া। সে কারণে এই প্যাকেট পেয়ে খোলার পর শিক্ষার্থীদের বডি ল্যাংগুয়েজ দেখে মনে হয়েছে তাদেরকে এক হাজার টাকা দামের পুরস্কার দেয়া হয়েছে।[২৭] সভাপতিসহ বিতর্কে সরাসরি জড়িতরা আমাকে নিয়ে ছবি তোলে (বিতর্ক সভায় আয়োজনকারীদের সঙ্গে লেখকের ছবির জন্য দেখুন পরিশিষ্ট- ৬:৩)। এভাবে টিউটোরিয়াল অ্যাসাইনমেন্ট করাবার কারণে শিক্ষার্থীরা নিজেরা একটি অনুষ্ঠান আয়োজনের প্রশিক্ষণ যেমন পায়, তেমনি কিছুটা বৈচিত্র ও আনন্দও পায়। তারা আমার এ পরিকল্পনার প্রশংসা করে।

---

২৬. সভাপতির জন্য ১টি, বিচারকদের জন্য ৪টি, বিতার্কিকদের জন্য ৬টি এবং উপস্থাপক ও সময়রক্ষকের জন্য একটিসহ মোট ১৩টি গলায় ঝুলাবার নামফলক তৈরি করি।

২৭. প্রাসঙ্গিক তথ্যের জন্য দেখুন, মুহাম্মদ ইয়াহ্ইয়া আখতার, 'শিক্ষক শিক্ষার্থীর ভালোবাসার রসায়ন', *যুগান্তর*, ১৪ ফেব্রুয়ারি, ২০১৮।

দ্বিতীয় নমুনা

পরের বছর আমি একই বর্ষের ভিন্ন শিক্ষার্থীদের সঙ্গে দ্বিতীয় টিউটোরিয়াল এক্সপেরিমেন্টটি করি। এই বর্ষে ওই একই কোর্সের (দুর্নীতি ও রাজনীতি) সঙ্গে সঙ্গতি রেখে ২৫ জন টিউটোরিয়াল শিক্ষার্থীকে আমি যে অ্যাসাইনমেন্ট দেই তার শিরোনাম ছিল: 'তোমার চার বছরের চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার্থী জীবনে তুমি যেসব দুর্নীতি ও অনিয়ম প্রত্যক্ষ করেছো তার একটি বিশ্লেষণমূলক বর্ণনা লিখ।' এটি কিভাবে লিখতে হবে সে সম্পর্কে আমি তাদের ২০ মিনিটের একটি বক্তৃতা দেই। এই বক্তৃতায় আমি তাদেরকে একাডেমিক লেখার নিয়ম-কানুন ও ভঙ্গিমা সম্পর্কে ধারণা প্রদান করি। কাউকে আহত না করে, কারো নাম সরাসরি উল্লেখ না করে, কিভাবে সত্য ঘটনাকে তুলে আনতে হবে সে সম্পর্কে বলি। কোন্ কোন্ বিষয়কে তারা একাডেমিক, প্রশাসনিক বা রাজনৈতিক দুর্নীতির আওতাভুক্ত করতে পারবে সে সম্পর্কে তাদের ধারণা দেই। তাদেরকে এও বলি, তুমি যদি তেমন দুর্নীতি বা অনিয়ম প্রত্যক্ষ না করে থাকো, তাহলে গণমাধ্যমে প্রকাশিত বা বন্ধুবান্ধবদের কাছে শোনা দুর্নীতির তথ্য যদি তোমার কাছে বিশ্বাসযোগ্য মনে হয়, সে বিষয়েও উল্লেখ করতে পারবে। তবে কোনো মিথ্যা তথ্য দেয়া যাবে না, বা কোনো ঘটনাকে অতিরঞ্জিত করার দরকার নেই।

তিন সপ্তাহ সময় নিয়ে শিক্ষার্থীরা এই অ্যাসাইনমেন্ট জমা দেয়। আমি তাদের প্রত্যেকটি খাতা মনোযোগের সঙ্গে পাঠ করি। প্রতিটি লাইন, প্রতিটি শব্দ এবং প্রতিটি বর্ণ পর্যন্ত দেখি। বাক্য গঠন, বানান থেকে শুরু করে সবকিছু দেখে দেই। বিভিন্ন রকম মন্তব্য লিখি এবং প্রতিটি খাতার শেষে একটি মূল্যায়নধর্মী মতামত লিখি। এ কাজে আমাকে অনেক সময় দিতে হয়। তবে তাদের লেখা পড়ে আমি অনেক কিছু শিখতে পারি। এমন অনেক দুর্নীতির তথ্য পাই, যা আমি আগে জানতাম না। তারা বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক, প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক দুনীতি সম্পর্কে তাদের অ্যাসাইনমেন্টে নানাবিধ তথ্য উপস্থাপন করে। ছাত্রাবাস প্রশাসন, গ্রন্থাগার, মেডিকেল, শাটল ট্রেন, বিভাগীয় সেমিনার লাইব্রেরি সম্পর্কেও অনেক অভিযোগ বিবৃত করে। এখানে সংক্ষেপে এই অ্যাসাইনমেন্টে ছাত্রছাত্রীদের উপস্থাপিত দুর্নীতি সংক্ষেপে তুলে ধরব।

শিক্ষার্থীরা তাদের শিক্ষার্থী জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে যেমন দুর্নীতির তথ্য তুলে ধরে, আবার কেউ কেউ পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত বিশ্ববিদ্যালয়ের দুর্নীতি ও অনিয়ম থেকে তথ্য সংগ্রহ করে সূত্র উল্লেখ করে তাদের লেখায় সন্নিবেশিত করে। তাদের লেখাগুলো পড়ে আমি বুঝতে পারি, দুর্নীতি ও অনিয়ম বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছে। আর সে কারণে শিক্ষার্থীরা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সেবা নিতে গিয়ে হয়রানির শিকার হচ্ছে। শিক্ষার্থীরা তাদের লেখায় বিভিন্ন দুর্নীতির তথ্য দিলেও সবচেয়ে গুরুত্ব দিয়ে উল্লেখ করেছে একাডেমিক অনিয়ম ও দুর্নীতির ওপর। এর মধ্যে তারা যেসব বিষয়কে অন্তর্ভুক্ত করেছে তার মধ্যে রয়েছে, ক্লাস ও পরীক্ষা সময়মত না হওয়া, পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশে অনেক বেশি সময় লাগা

এবং সে কারণে সেশন জট সৃষ্টি হওয়া, কোনো কোনো শিক্ষকের ক্লাস কম নেয়া এবং সে বিষয়ে আগে থেকে শিক্ষার্থীদেরকে না জানানো প্রভৃতি বিষয়গুলোকে। তবে অনেক শিক্ষক আছেন যাঁরা সব ক্লাস সময়মত নেন এমন তথ্যও তারা উল্লেখ করেছে। তারা এমনও তথ্য দেয়, দু'একজন শিক্ষক বিশ্ববিদ্যালয়ে এসে বিভাগে উপস্থিত থেকেও ক্লাসে যান না, যা দুর্নীতির পর্যায়ে পড়ে বলে তারা মনে করে। শিক্ষার্থীদের কেউ কেউ শিক্ষক নিয়োগে পেশাদারিত্বের অভাব ও রাজনৈতিক প্রভাবের প্রসঙ্গও তাদের অ্যাসাইনমেন্টে উল্লেখ করে।

অনেক শিক্ষার্থী দু'একজন শিক্ষকের ক্লাসে অপ্রাসঙ্গিক বিষয় আলোচনা করা এবং ক্লাসে দেরি করে এসে দ্রুত ক্লাস শেষ করার বিষয় উল্লেখ করে। প্রায় প্রতিটি শিক্ষার্থী বিভাগীয় সেমিনার থেকে প্রাপ্ত সেবা সম্পর্কে তাদের লেখায় অসন্তোষ প্রকাশ করে। সেমিনার তত্ত্বাবধায়কের বিরুদ্ধেও তাদের অনেক অভিযোগ। প্রায় সময় সেমিনার বন্ধ থাকা, বই থাকলেও অনেক সময় তাদেরকে বই দিতে তালবাহানা করার অভিযোগ ছিল তাদের প্রায় সবার লেখায়। তারা একই রকম অভিযোগ উল্লেখ করে কেন্দ্রীয় লাইব্রেরির কর্মচারীদের বিরুদ্ধেও। সেখানে যারা বই খুঁজে দেয়ার দায়িত্বে আছেন, তারা শিক্ষার্থীদের সঙ্গে সহযোগিতামূলক আচরণ করেন না বলে শিক্ষার্থীরা অভিযোগ করে। একাধিক বই খুঁজতে বললে বিরক্তি প্রকাশ করেন। আবার অনেকে শিক্ষার্থীদের সেবা না দিয়ে মোবাইলে খোশগল্প করেন, বা ফেসবুকে সময় কাটান বলে শিক্ষার্থীরা উল্লেখ করেছে। তা ছাড়া বাইরে থেকে বই লাইব্রেরির ভেতরে নিয়ে পড়তে না দেয়ায় শিক্ষার্থীদের অনেকে লাইব্রেরির স্টাফদের বিরুদ্ধে অসন্তোষ প্রকাশ করে।

শিক্ষার্থীরা শাটল ট্রেনে যাতায়াতের ব্যাপারে সবার সমান সুযোগ না থাকাকে দুর্নীতি বিবেচনা করেছে। তারা বগিভিত্তিক গ্রুপের নেতাদের জন্য বিশেষ বিশেষ বগিতে বিশেষ বিশেষ আসন বরাদ্দ থাকার কথা বলেছে। এ সব আসনে বসতে গিয়ে অনেক শিক্ষার্থী হয়রানির শিকার হয়েছে বলে তাদের লেখায় উল্লেখ করেছে। তা ছাড়া ট্রেনের নিরাপত্তা নিয়েও তাদের অভিযোগ রয়েছে। হল প্রশাসনের বিরুদ্ধেও শিক্ষার্থীদের অনেক অভিযোগ। তাদের মতে যখন যে দল ক্ষমতায় থাকে, সে দলের ছাত্র সংগঠনের নেতাদের হল দখল করে মাতব্বরি করা রেওয়াজে পরিণত হয়েছে। অনেকে সিট বরাদ্দ পেয়েও হলে থাকতে পারে না। হলের খাবারের মান নিয়েও শিক্ষার্থীরা ভীষণ অসন্তুষ্ট। তারা খাবারের সঙ্গে পরিবেশিত মাছ বা মাংশের টুকরার আকৃতি এবং ডালের ঘনত্বকে 'অমানবিক' বর্ণনা করে এর বিরুদ্ধে জোরালো আপত্তি তুলেছে। হলে পড়াশুনার পরিবেশ নেই বলেও অনেকে তাদের অ্যাসাইনমেন্টে দাবি করেছে। রাতে কেউ কেউ মাদক সেবন করে হলে আপত্তিকর আচরণ করে বলেও কোনো কোনা শিক্ষার্থী লিখেছে। শিক্ষার্থীদের জন্য যে তিনদিন মার্কেটিং বাস শহরে যাবার কথা, গাড়ি খারাপ হয়ে যাবার অজুহাতে সে বাস অনেক দিনই চলে না বলে শিক্ষার্থীরা অভিযোগ এনেছে।

মেডিকেল সেন্টারের বিরুদ্ধে শিক্ষার্থীদের উত্থাপিত অনিয়মের মধ্যে জরুরি সময়ে অ্যামবুলেন্স সার্ভিস না পাওয়া, শিক্ষার্থীদের যে কোনো অসুখেই মেডিকেল থেকে কেবল প্যারাসিটামল, হিস্টাসিন, গ্যাসের বড়ি এবং খাবার স্যালাইন জাতীয় ওষুধ দেয়া, তাদের অসুখের বর্ণনা না শুনেই ডাক্তার সাহেবের প্রেসক্রিপশন লিখে ফেলা, প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। প্রায় ২৫ হাজার শিক্ষার্থী এবং নয় শতাধিক শিক্ষকের বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে বইয়ের দোকান না থাকাকে শিক্ষার্থীরা অশোভন মনে করেছে। এ ছাড়া কাম্পাসে চুরি ও ছিনতাই বৃদ্ধির কথাও কয়েকজন শিক্ষার্থীর অ্যাসাইনমেন্টে উঠে এসেছে। একজন শিক্ষার্থীর দুইবার মোটরসাইকেল চুরি হয়ে গেলে সে প্রতিবার নিরাপত্তার দায়িত্বে নিয়োজিত সংশ্লিষ্টদের সহায়তা নিয়েও তা উদ্ধার করতে পারেনি বলে জানিয়েছে। আবার রাতে শহরে টিউশানি করে ফেরার সময় শিক্ষার্থীরা নিরাপত্তহীনতায় ভোগে বলে অভিযোগ করেছে কেউ কেউ। এভাবে শিক্ষার্থীরা গাছ চুরি, মাছ চুরি, ফল চুরিসহ আরও অনেক অজানা অনিয়ম ও দুর্নীতির প্রসঙ্গ তাদের অ্যাসাইনমেন্টে লিখেছে।

দুর্নীতি ও অনিয়ম সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের এস্যাইনমেন্টগুলো পড়ে আমি অনেক অজানা তথ্য জানতে পারি। তবে একটি বিষয় শিক্ষার্থীদের একজনও উল্লেখ না করায় আমি কিছুটা অবাক হই। বিষয়টি হলো, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের শাটল ট্রেন থেকে নেমে গেট দিয়ে ঢুকলেই বাঁ পাশে একটি জলকামান চোখে পড়ে। বিশ্ববিদ্যালয় হলো একটি একাডেমিক প্রতিষ্ঠান। জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চা, গবেষণা ও লেখাপড়ার জায়গা। কামানের স্থান শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে হবে কেন? কামান তো থাকার কথা যুদ্ধক্ষেত্রে, বা ক্যান্টনমেন্টে। আমরা বিশ্ববিদ্যালয়ের পবিত্র ক্যাম্পাসকে কি যুদ্ধক্ষেত্রে পরিণত করেছি? আমি সুনিশ্চিত যে আমার টিউটোরিয়াল গ্রুপের সব শিক্ষার্থীই এ জলকামানটি দেখেছে। কিন্তু অবাক হয়েছি, তাদের কারও অ্যাসাইনমেন্টে এ বিষয়টি তারা লেখেনি। এ বিষয়টি এড়িয়ে যাবার কারণ কি? হয়ত শিক্ষার্থীদের কাছে সন্ত্রাস এতই নৈমিত্তিক ও গা সওয়া হয়ে গেছে যে, এরা বিষয়টিকে স্বাভাবিকভাবে নিয়েছে।

ছাত্রীদের আরেকটি অভিনব দুর্নীতির কথা শিক্ষার্থীরা না লিখলেও আমি এ ক্লাসের শিক্ষার্থীদের কাছে জানতে পারি। বিষয়টি ছাত্রীদের হলকেন্দ্রিক দুর্নীতি। ছাত্রীদের হল পরিচালনা বিধি অনুযায়ী তাদেরকে রাত ৮টার মধ্যে হলে ফিরতে হয়। যদি কোনো ছাত্রী অধিক রাতে বাইরে থাকতে চায় তাহলে সে ক্ষেত্রে তাকে হল প্রশাসনের অনুমতি নিতে হয়। কিন্তু সব ছাত্রী তো এক রকম নয়। খুব কমসংখ্যক হলেও কিছু আইন অমান্যকারী ছাত্রী আছে, যারা মাঝেমধ্যে এ রকম দুর্নীতির আশ্রয় নেয়। এমন কেউ রাত সাড়ে সাতটার সময় হল থেকে বের হয়ে রাত আটটার আগেই মেডিকেলের জরুরি বিভাগে যেয়ে অসুস্থতার ভান করে। চোখমুখ কাঁদো কাঁদো করে ডাক্তারকে পেটে ব্যথার কথা বলে। ডাক্তার এ প্রশ্নবিদ্ধ রোগীকে ভালো করে পরীক্ষা করে কোনো রোগের লক্ষণ না পেয়ে তাকে ব্যথা কমার জন্য প্যারাসিটামল দেন এবং বিশ্রাম নেবার পরও যদি আগামীকাল

ব্যথা না কমে তাহলে পরীক্ষার জন্য আবার আসতে বলেন। এরপর ছাত্রী ওষুধ এবং প্রেসক্রিপশন নিয়ে চলে আসে। পরে বন্ধুদের সঙ্গে রাত দশটা এগারটা পর্যন্ত আড্ডা দিয়ে হলে ফিরে গেলে যখন তাকে হলে ঢুকতে বাধা দেয়া হয়, তখন সে তার অসুস্থতার কথা বলে মেডিকেলে ছিল বলে ডাক্তারের প্রেসক্রিপশন দেখায় এবং মুখ কালো করে বলে ডাক্তার তাকে বিশ্রাম নিতে বলেছেন বলে পেটে ব্যথার অভিনয় করে তাড়াতাড়ি গেট খুলে দিতে বলে। এ প্রক্রিয়ায় হল কর্তৃপক্ষকে ফাঁকি দিয়ে সে অধিক রাত পর্যন্ত বাইরে থাকে। এভাবে টিউটোরিয়াল ক্লাসে নতুন ধরনের অ্যাসাইনমেন্ট দিয়ে একদিকে যেমন শিক্ষার্থীদেরকে তাদের ব্যক্তিজীবনের দুর্নীতির অভিজ্ঞতা লেখার সুযোগ দিয়ে কিছুটা রোমাঞ্চিত করতে পেরেছি, তেমনি আমি নিজেও তাদের অ্যাসাইনমেন্ট পড়ে এবং তাদের সঙ্গে এ বিষয়ে আলাপ আলোচনা করে অনেক কিছু জানতে ও শিখতে পেরেছি।

খাতা দেখা

একজন বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকের একাডেমিক কাজের মধ্যে খাতা দেখে নম্বর দেয়া একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ। আমি নিজে যখন খাতা দেখি তখন ভাবি, আমি গুরুত্বপূর্ণ বিচার কাজে নিয়োজিত বিচারকের আসনে আসীন। আমার রায়ের ওপর নির্ভর করছে একজন পরীক্ষার্থীর পাস, ফেল ও ফলাফলের ভালোমন্দ। বিচারকের একটিই মাত্র কাজ। সুবিচার করা। আমি সেভাবেই খাতা দেখে খাতায় নম্বর প্রদান করি। অস্বীকার করব না, যতটা মনোযোগ দিয়ে খাতা দেখা উচিত, সব সময় হয়ত ততটা মনোযোগ দিতে পারি না। কারণ, অন্যান্য একাডেমিক ব্যস্ততা ও যৌক্তিক সময়ের মধ্যে খাতা ফেরত দেবার জন্য এ কাজে প্রয়োজনমতো সময় ব্যয় করি। আবার, অনেক সময় দেখা যায়, একসাথে কয়েকটি বর্ষের পরীক্ষার খাতা জমা হয়ে যায়। একেকটি বর্ষের খাতার সংখ্যাও ১৫০-১৬০ টির মতো। আর অনার্স মাস্টার্স শ্রেণির খাতার স্বাস্থ্যও অনেক ভালো। দেখতে অনেক সময় লাগে। এ ক্ষেত্রে আমি যে কৌশল প্রয়োগ করি তা হলো, খাতার বান্ডিল খুলে খুব দ্রুত খাতা দেখা শুরু করি না। প্রথমে ধীর লয়ে মনোযোগ দিয়ে পড়ে খাতায় মার্কিং শুরু করি। এভাবে ৩০-৪০টি খাতা দেখার পর কোন প্রশ্নের উত্তর কেমন হবে এবং পরীক্ষার্থীরা কে কেমন লিখেছে, বা কোন বই বা নোট পড়ে লিখেছে সে সম্পর্কে একটি প্রাথমিক ধারণা হয়। তারপর একই রকম উত্তর দেখলে খাতা দেখার গতি একটু বাড়িয়ে দেই। এর মধ্যেও আবার ব্যতিক্রমীভাবে যে খাতাগুলো খুব ভালো, বা খুব খারাপ, সেগুলোর জন্য আবার বেশি সময় নিয়ে সতর্ক হতে হয়। নবীন শিক্ষকদের এ ব্যাপারে কোনো অভিজ্ঞতা থাকে না। নম্বর দেবার ব্যাপারে তাঁরা অনেক সময় যথাযথ ভূমিকা পালন করতে পারেন না। অনেকক্ষেত্রেই নম্বর প্রদানে কমবেশি হয়ে যায়। কিন্তু তাঁরা যদি খাতা দেখার আগে এ ব্যাপারে একটি প্রশিক্ষণ পেতেন, তাহলে তাদের এ কাজ করতে অনেক সুবিধা হত।

একজন পরীক্ষক কর্তৃক গৃহীত খাতার সঙ্গে যেসব সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র থাকে তার মধ্যে থাকে টপশিট (যার মধ্যে খাতার সংখ্যা ও কোড নম্বরগুলো লেখা থাকে), প্রশ্নপত্র, প্রতি প্রশ্নে পাওয়া নম্বর দেয়ার জন্য শিট, জিপিএ সিস্টেমে কত নম্বর থেকে কত নম্বর পেলে পরীক্ষার্থী কোন গ্রেড পাবে সে বর্ণনা সংবলিত একটি শিট এবং পরীক্ষা কমিটির সভাপতি ও পরীক্ষাসমূহের নিয়ন্ত্রকের কাছে নম্বর পাঠাবার খাম। কিন্তু এসব কাগজপত্রের সঙ্গে প্রাপ্ত খাতাগুলো কতদিনের মধ্যে ফেরত দিতে হবে সে সম্পর্কে কোনো লিখিত নির্দেশনামূলক কাগজ থাকে না। বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি কাগুজে নিয়ম থাকলেও তা অধিকাংশ শিক্ষক জানেন না এবং অনুসরণও করেন না। ফলে পরীক্ষকগণ অনেক সময় ধীর লয়ে খাতা দেখেন এবং খাতা ফেরত দিতে বেশি সময় নেন। এ কারণে পরীক্ষার ফলাফল দিতে দেরি হয়। এ ক্ষেত্রে সাধারণত কোনো পরীক্ষা কমিটির সভাপতি যৌক্তিক সময়ের মধ্যে পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ করতে চাইলে তিনি যে সব পরীক্ষক খাতা দিতে দেরি করছেন তাদেরকে মৌখিকভাবে দ্রুত খাতা দেখে দিতে অনুরোধ করতে পারেন। আবার পরীক্ষক সিনিয়র অধ্যাপক হলে তাকে বারবার বলতেও সংকোচ বোধ করেন। এ কারণে পরীক্ষার ফলাফল দিতে দেরি হয় এবং সে জন্য সৃষ্টি হয় সেশন জট। অবশ্য চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে পরীক্ষা সংক্রান্ত কাজে জটিলতা সৃষ্টি হবার আর একটি কারণ হলো ৬৫ জন লোকবলসমৃদ্ধ একটি পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক অফিস থাকা সত্ত্বেও পরীক্ষার যাবতীয় কাজ, এমনকি পরীক্ষার্থীদের গ্রেডশিট লেখার কাজও শিক্ষকদের করতে হয়। পৃথিবীব্যাপী বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকের কাজ হলো শিক্ষার্থীদের পড়ানো, প্রশ্ন করা এবং খাতা দেখে নম্বর দেয়া। কিন্তু চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক অফিসের পরীক্ষা সংক্রান্ত দুর্নীতির কারণে পরীক্ষাসমূহের নিয়ন্ত্রকসহ কয়েকজনের অপরাধ প্রমাণিত হবার পর তাদের নামে মামলা হয় এবং তারা দোষী সাব্যস্ত হয়ে সাজাপ্রাপ্ত হন। ওই দুর্নীতি ধরা পড়ার পর থেকে পরীক্ষাসংক্রান্ত সকল কাজের ভার (খাতা দেখা, নম্বর দেয়া, টেবুলেশন করা, গ্রেডশিট লেখা, প্রভৃতি) শিক্ষকদের ওপর ন্যস্ত করা হয়। এ সিদ্ধান্তটি একেবারেই যৌক্তিক ছিল না। কারণ, শিক্ষকগণকে যদি সারা বছর এ সকল নন একাডেমিক কাজে ব্যস্ত থাকতে হয়, তাহলে তারা গবেষণা করবেন কখন? চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক অফিস কর্মকর্তাদের দুর্নীতি ধরা পড়েছে এবং তাদের শাস্তি হয়েছে। তারপর বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের উচিত ছিল সৎ যোগ্য লোকদেরকে ওইসব পদে নিয়োগ দিয়ে তাঁরা যাতে দুর্নীতি না করতে পারেন সে বিষয়টি দেখভালের ব্যবস্থা সুনিশ্চিত করা। একটি থানার ওসি সাহেব দুর্নীতি করলে তার শাস্তি হতে পারে, বদলি হতে পারে, তাঁর নামে মামলা হতে পারে, তাঁকে বরখাস্ত করা যেতে পারে; কিন্তু তাঁর জায়গায় ডিসি সাহেব নিশ্চয়ই গিয়ে তাঁর কাজ করেন না। কিন্তু চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে এমন ভুল সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। এ ব্যবস্থায় শিক্ষকগণ যতটা গবেষণায় সময় দিতে পারছেন, তার চেয়ে বেশি সময় ব্যয় করে তাদের পরীক্ষার ফলাফল তৈরির কেরানির কাজ করতে

হচ্ছে। অবশ্য গত প্রায় চার বছর ধরে (২০১৬-২০২০) পরীক্ষা পদ্ধতিকে অটোমেশনের আওতায় এনে পরীক্ষার ফলাফল প্রদানের কাজ সহজীকরণের কথা শোনা গেলেও এখনো তা বাস্তবায়নের কোনো লক্ষণ দৃষ্ট হয়নি।

মার্কিংয়ে পার্থক্য

খাতায় মার্কিং করার ব্যাপারে এক শিক্ষকের সঙ্গে আরেক শিক্ষকের অনেক সময় ব্যাপক পার্থক্য দৃষ্টিগোচর হয়। এর কয়েকটি কারণ রয়েছে। একটি কারণ হলো, কিছু সিনিয়র শিক্ষক পুরানো পদ্ধতির বাইরে এখনো গ্রেডিং পদ্ধতিতে নতুনভাবে নম্বর দেবার বিষয়টি আত্মস্থ করতে পারেননি। উল্লেখ্য, পুরানো পদ্ধতিতে ১০০ নম্বরের মধ্যে ৬০ নম্বর পেলে ফার্স্ট ক্লাস নম্বর ধরা হত। কিন্তু বর্তমানে চলমান জিপিএ ব্যবস্থায় ১০০ নম্বরের মধ্যে ৬০ পেলে তা 'বি' গ্রেড ধরা হয়। সেখানে 'এ' গ্রেড পেতে হলে ১০০ নম্বরের মধ্যে ৭৫ থেকে ৭৯ এর মধ্যে নম্বর পেতে হবে। কাজেই জিপিএ ব্যবস্থায় শিক্ষকদেরকে গ্রেড বিবেচনা করে নম্বর দিতে হয়। কিন্তু সিনিয়র শিক্ষকদের অনেকে এ বিষয়টিতে ধাতস্থ হতে পারেননি। ফলে তাদের কাছে শিক্ষার্থীরা কম নম্বর পান। শিক্ষকদের খাতা মার্কিংয়ে দু'জন পরীক্ষকের দেয়া নম্বরের পার্থক্য ১০০ নম্বরের পরীক্ষায় ১৬, ৭৫ নম্বরের পরীক্ষায় ১৩ এবং ৫০ নম্বরের পরীক্ষায় ৯ বা তার বেশি হলে ওই খাতা তৃতীয় পরীক্ষণের জন্য প্রেরণ করতে হয়। তৃতীয় পরীক্ষণের জন্য খাতার সংখ্যা বেশি হলে ওই খাতা আরেকজন শিক্ষককে দিয়ে দেখাতে সময় লাগার কারণে ফলাফল প্রকাশে বিলম্ব হয়ে যায়। খাতার মার্কিং অবশ্যই পরীক্ষার্থীর খাতার পারফরম্যান্সের সঙ্গে সম্পর্কিত হতে হবে। পরীক্ষার্থীর লেখার মান যদি বেশি দুর্বল হয়, তাহলে তো তিনি কোনো পরীক্ষকের কাছেই ভালো নম্বর পাবেন না। শিক্ষকদের মার্কিং পর্যবেক্ষণ করে অনুধাবন করা যায়, কিছু কিছু শিক্ষক আন্ডারমার্কিং করেন, এবং কিছুসংখ্যক শিক্ষক ওভারমার্কিং করেন। এমনটি হওয়া কাম্য নয়। পরীক্ষার্থীর খাতায় অবশ্যই পরীক্ষার্থীর পারফরম্যান্সের ওপর ভিত্তি করে নম্বর দিতে হবে। তাকে তার প্রাপ্য নম্বরের চেয়ে বেশি বা কম নম্বর দেয়ার এখতিয়ার কোনো পরীক্ষকের নেই। কয়েকটি পরীক্ষা কমিটিতে কাজ করে ফলাফল তৈরি করার সময় এ বিষয়ে আমি কিছু গবেষণা করে পরীক্ষকদের খাতায় নম্বর দেবার ব্যাপারে ব্যাপক পার্থক্য লক্ষ্য করেছি। উদাহরণ হিসেবে এখানে আমি ২০১৫ এবং ২০১৭ সালের এমএসএস পরীক্ষায় ৫০ নম্বরের ক্লাস টেস্ট পরীক্ষার ৯টি কোর্সের ১০ জন কোর্স শিক্ষকের প্রদত্ত নম্বর তুলে ধরব। উল্লেখ্য, এমএসএস পরীক্ষা কমিটি এই ১০জন শিক্ষকের ক্লাস টেস্ট পরীক্ষার নম্বর গড় করে পরীক্ষার্থীদের ওই ৫০ নম্বরের মধ্যে নম্বর দেন। সারণি-২ ও সারণি-৩ বিশ্লেষণ করলে ৫০ নম্বরের ক্লাস টেস্ট পরীক্ষায় শিক্ষকদের নম্বর প্রদানে উচ্চ ব্যবধান পরিলক্ষিত হয়।

যেমন সারণি-২ অনুযায়ী এমএসএস-২০১৫ পরীক্ষার ৫০ নম্বরের ক্লাস টেস্ট পরীক্ষায় ১০ জন কোর্স শিক্ষকের মধ্যে ৭ জন শিক্ষকের কাছে যেখানে ১

জনও 'এ' প্লাস গ্রেড পায়নি, দু'জন শিক্ষকের কাছে যথাক্রমে 'এ' প্লাস গ্রেড পেয়েছে ১ ও ৫ জন; সেখানে বাকি একজন শিক্ষকের কাছে ওই পরীক্ষায় ৩৮ জন 'এ' প্লাস পেয়েছে। একইভাবে, একই পরীক্ষায় যেখানে চার জন শিক্ষকের কাছে কেউ 'এফ' গ্রেড পায়নি, তিনজনের কাছে যথাক্রমে ২৩, ৫, ও ৪ জন 'এফ' গ্রেড পেয়েছে, সেখানে বাকি তিনজনের কাছে 'এফ' গ্রেড পেয়েছে যথাক্রমে ৭৭, ৯৫ ও ৯৬জন। আবার এমএসএস ২০১৭ পরীক্ষায় একই ক্লাস টেস্ট পরীক্ষায় যেখানে তিনজন শিক্ষকের কাছে কেউ 'এ' প্লাস পায়নি, চারজন শিক্ষকের কাছে 'এ' প্লাস গ্রেড পেয়েছে যথাক্রমে ১, ২, ২, ও ৬ জন, অন্য দুজন শিক্ষকের কাছে ১৪ ও ২২ জন, সেখানে বাকি একজনের কাছে 'এ' প্লাস গ্রেড পেয়েছে ৪৯ জন। একই অবস্থা 'এফ' গ্রেডের বেলাও লক্ষণীয়। দুজনের কাছে একজনও 'এফ' গ্রেড পায়নি, অন্য চারজনের কাছে পেয়েছে যথাক্রমে ১, ৯, ১০ ও ১১ জন, সেখানে একজনের কাছে 'এফ' গ্রেড পেয়েছে ৯৬ জন। শিক্ষকদের নম্বর প্রদানের এ উচ্চ পার্থক্য প্রমাণ করে, কোনো কোনো শিক্ষক খুব বেশি নম্বর দিচ্ছেন, আবার কেউ কেউ দিচ্ছেন অনেক কম নম্বর, যা মোটেও কাম্য নয়। সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে নবীন শিক্ষকদের যে সব ট্রেনিং প্রোগ্রাম হয়, সেখানে এ ব্যাপারে তাদের প্রশিক্ষণ দিয়ে খাতায় নম্বর প্রদানে যতটা সম্ভব একরুপত্ব আনার চেষ্টা করা উচিত।

সারণি-০২

এমএসএস ২০১৫ পরীক্ষায় ৯টি কোর্সের ১০জন শিক্ষকের ক্লাস টেস্ট পরীক্ষার নম্বর

নম্বর ৫০		A+	A	A-	B+	B	B-	C+	C	D	F
কোর্স নম্বর	পরীক্ষার্থী সংখ্যা	৪০-৫০	৩৮-৩৯	৩৫-৩৭	৩৩-৩৪	৩০-৩২	২৮-২৯	২৫-২৭	২৩-২৪	২০-২২	০০-১৯
৫০১	১৩৪	০০	০৩	০৫	০১	০৩	০৪	০৯	১১	০৩	৯৫
৫০২	১২২	০১	০০	০১	১৬	৪৬	২৬	০৮	০০	০১	২৩
৫০৩	১২৫	০৫	২৯	৩৪	১৮	২২	০৫	০৪	০০	০৩	০৫
৫০৪	১১৬	০০	০১	১৩	৬১	৩০	০৩	০৭	০১	০০	০০
৫০৫	১১৬	০০	০০	৩৫	৩৫	২১	১২	০৭	০০	০২	০৪
৫০৬	১৩৩	০০	০১	০২	০৩	০৩	০৫	০৬	০৬	১১	৯৬
৫০৭	১২৬	০০	০০	১৯	০৯	৪৮	৩৬	০৭	০০	০৭	০০
৫০৭	১১৪	০০	০০	০০	০১	০০	০০	০ ৬	০৭	২৫	৭৭
৫০৮	১২৭	৩৮	২৭	৩২	১৭	০৯	০১	০৩	০০	০০	০০
৫০৯	১২৩	০০	০০	০৪	৯১	১৮	০০	০৭	০২	০১	০০

উৎস: পরীক্ষা কমিটির সদস্য হিসেবে নম্বর গড় করাকালে তথ্য নিয়ে লেখক কর্তৃক সারণিকৃত।

সারণি-০৩

এমএসএস ২০১৭ পরীক্ষায় ৯টি কোর্সের ১০জন শিক্ষকের ক্লাস টেস্ট পরীক্ষার নম্বর

নম্বর ৫০		A+	A	A-	B+	B	B-	C+	C	D	F
কোর্স নম্বর	পরীক্ষার্থী সংখ্যা	৪০-৫০	৩৮-৩৯	৩৫-৩৭	৩৩-৩৪	৩০-৩২	২৮-২৯	২৫-২৭	২৩-২৪	২০-২২	০০-১৯
৫০১	১৩০	০০	০০	০০	০০	০২	০৩	১৫	১৫	৩২	৬৩
৫০১	১৩০	০২	০৫	০৪	০২	১৫	১০	২১	১৭	১৭	৩৭
৫০২	১৩৪	০২	০২	০৩	০২	০৪	০১	০৮	০৫	১১	৯৬
৫০৩	১৩৪	০১	০২	০৪	০১	১০	০৬	১৩	১৩	১০	৭৪
৫০৪	১৩৩	০০	০৫	০৬	১০	০৮	১৮	২২	৩৭	২৭	০০
৫০৫	১৩২	১৪	০২	১৫	১২	১৯	০৯	২৫	১৭	১০	০৯
৫০৬	১৩৪	০০	০২	০৬	৪৪	৩২	০৮	২৮	১৩	০০	০১
৫০৭	১৩৪	২২	১২	০৮	১২	২১	১৭	২৭	০৭	০৮	০০
৫০৮	১৩৪	৪৯	১৬	২৪	০৪	১৯	০২	০৬	০১	০২	১১
৫০৯	১৩০	০৬	০৭	২১	১৫	১১	১১	১৪	১৭	১৮	১০

উৎস: পরীক্ষা কমিটির সদস্য হিসেবে নম্বর গড় করাকালে তথ্য নিয়ে লেখক কর্তৃক সারণিকৃত।

পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ

আমি পরীক্ষা কমিটিতে কাজ করার সময় সেশনজট নিয়ে ভাবি। কিভাবে এ সমস্যা কাটিয়ে উঠে দ্রুত পরীক্ষার ফলাফল দেয়া যায় সে বিষয়ে পরীক্ষ-নিরীক্ষা করি। বিশেষ করে কোনো পরীক্ষা কমিটির সভাপতি হলে তখন দ্রুত পরীক্ষার ফলাফল দেয়ার চিন্তা আমাকে পেয়ে বসে। এ কাজটি একটি টিম ওয়ার্ক। সংশ্লিষ্ট সবাই সহযোগিতা না করলে একা চেষ্টা করে দ্রুত পরীক্ষার ফলাফল দেয়া যায় না। আমি ২০১৫-২০১৬ সেশনের দ্বিতীয় বর্ষ সম্মান পরীক্ষা কমিটির সভাপতি হয়ে এ বিষয়ে মনোযোগ দেই এবং এর আগের বছর দ্বিতীয় বর্ষের ফল প্রকাশে ৭ মাস ২৭ দিন লাগলেও আমি সবার সহযোগিতায় ৪ মাস ৮ দিনে ফল প্রকাশে সক্ষম হই। এরপর ভাবি, আর একটু আন্তরিকতার সঙ্গে চেষ্টা করলে তো আরও দ্রুত পরীক্ষার ফল দেয়া যেতে পারে। এমন অবস্থায় আমি প্রথম বর্ষ সম্মান শ্রেণি পরীক্ষা-২০১৭ এর সভাপতি হলে দ্রুত ফলাফল প্রকাশের জন্য কতিপয় কৌশল অবলম্বন করি। কৌশলগুলো কাজ করায় ওই পরীক্ষার ফলাফল দ্রুত দেয়া সম্ভব হয়। আমি ওই কৌশলগুলো এখানে এ জন্য উপস্থাপন করব যে, কৌশলগুলো যদি অন্য সম্মানিত পরীক্ষা কমিটির সভাপতিগণও অনুসরণ করেন, তাহলে তাদের পক্ষেও যৌক্তিক সময়ে পরীক্ষার ফলাফল দেয়া সম্ভব হবে এবং সেশন জটের কবল থেকে তারা বিভাগকে মুক্ত করতে পারবেন।

প্রথমে আমি প্রথম বর্ষের ৮টি কোর্সের ১৬ জন পরীক্ষকের জন্য পরীক্ষা কমিটির সভাপতি হিসেবে একটি চিঠি লিখে ওই চিঠর একটি করে কপি প্রতি

পরীক্ষককে খাতার সঙ্গে প্রেরিত কাগজপত্রের সঙ্গে দিতে অফিসকে নির্দেশনা দেই। এই চিঠিতে মার্জিত ভাষায় বিনয়ের সঙ্গে পরীক্ষককে যৌক্তিক সময়ের মধ্যে খাতা দেখে দিয়ে বিভাগকে সেশনজটমুক্ত করার কাজে অবদান রাখতে সবিনয় অনুরোধ করি (চিঠির নমুনার জন্য দেখুন পরিশিষ্ট-৬:৪)। এর ফলে পরীক্ষকদেরকে মৌখিকভাবে কিছু বলার আগে খাতা খুলেই তারা যৌক্তিক সময়ের মধ্যে খাতা দেখে দেবার একটি তাগিদ পান। এতে কিছুটা কাজ হয়। তার পরও যদি কেউ বেশি সময় নেন, তাকে ফোন করে মার্জিতভাবে যথাসম্ভব কম সময়ের মধ্যে খাতা ফেরত দিতে অনুরোধ করি। এতে দেখা যায় ৮ জন প্রথম পরীক্ষক খাতা নেবার পর সর্বনিম্ন ৮ দিন থেকে সর্বোচ্চ ১ মাস ৪ দিনের মধ্যে তাঁদের খাতা দেখে ফেরত দেন। একইভাবে সমসংখ্যক দ্বিতীয় পরীক্ষকগণ খাতা নেবার পর সর্বনিম্ন ১৪ দিন থেকে সর্বোচ্চ ১ মাস ২০ দিনের মধ্যে খাতা ফেরত দেন। পরীক্ষকগণ কে কবে খাতা নিলেন এবং ফেরত দিলেন অফিসকে তার রেকর্ড রাখতে বলি। পরীক্ষকদের খাতা গ্রহণ ও প্রদানের দিনলিপি সারণি-০৪ এ উপস্থাপিত হয়েছে। অনেক সময় প্রেস থেকে টেবুলেশন শিট ও গ্রেড শিট প্রিন্ট হয়ে আসতে দেরি হওয়ার কারণে ফলাফল তৈরি প্রক্রিয়া বিলম্বিত হয়। এমনটা যাতে না হতে পারে সে জন্য আমি

সারণি-০৪
প্রথম বর্ষ বিএসএস সম্মান ২০১৬-২০১৭ পরীক্ষার ৮টি
কোর্সের ১৬জন পরীক্ষকের খাতা পরীক্ষণের দিনলিপি

কোর্স	প্রথম পরীক্ষক	খাতা গ্রহণ	খাতা প্রদান	ব্যয়িত দিন	দ্বিতীয় পরীক্ষক	খাতা গ্রহণ	খাতা প্রদান	ব্যয়িত দিন
১০১	এইচএম	০৪-১২-১৭	১১-১২-১৭	০৮	টিএ	১৩-১১-১৭	২৬-১১-১৭	১৪
১০২	ইইউপি	০৫-১২-১৭	২১-১২-১৭	১৭	এমবিইউ	০৯-১১-১৭	২৯-১১-১৭	২১
১০৩	ডিপিবি	১৩-১১-১৭	২৮-১১-১৭	১৬	এমএসি	২৮-১১-১৭	১৮-০১-১৮	৫০
১০৪	এমএসএইচ	১৯-১১-১৭	১৭-১২-১৭	২৯	এসএসি	১৮-১২-১৭	০৭-০১-১৮	২০
১০৫	এমআই	২১-১১-১৭	১১-১২-১৭	২১	এমএএইচ	২৪-১২-১৭	৩১-০১-১৮	৩৯
১০৬	ইউএইচ	০৪-১২-১৭	১৪-০১-১৮	৩৪	এমওয়াইএ	১৫-০১-১৮	২৭-০১-১৮	১৬
১০৭	এনইউ	০২-০১-১৮	২৪-০১-১৮	২৩	এমএফএইচ	০৬-১২-১৭	০২-০১-১৮	২৮
১০৮	এসএস	০৭-১২-১৮	২৭-১২-১৮	২১	এএ	২৮-১২-১৭	১৪-০১-১৮	১৮

এইচএম = প্রফেসর ড. হাসান মোহাম্মদ; ইইউপি = প্রফেসর ড. এনায়েত উল্যা পাটওয়ারী; ডিপিবি = জনাব দ্বীপাঞ্জলী বড়ূয়া; পিংকী, এমএসএইচ = জনাব মোহাম্মদ সেলিমুল হক; এমআই = জনাব মোহাম্মদ ইসহাক; ইউএইচ = জনাব উম্মে হাবিবা; এনইউ = প্রফেসর ড. নাসির উদ্দিন; এসএস = জনাব শুভেন্দু সাহা; টিএ = জনাব তাসলিমা আক্তার; এমবিইউ = জনাব

মো. বখতেয়ার উদ্দিন; এমএসি = জনাব মোহাম্মদ আলম চৌধুরী; এসএসি = প্রফেসর ড. সিদ্দিক আহমেদ চৌধুরী; এমএএইচ = ড. আনোয়ার হোসেন মিঝি; এমওয়াইএ = প্রফেসর ড. মুহাম্মদ ইয়াহ্ইয়া আখতার; এমএফএইচ = জনাব মো. ফারুক হোসেন; এএ = জনাব আব্বাস আহমদ। *এনইউ, এসএস এবং এমএফএইচ অন্যান্য বিভাগের শিক্ষক।

আগেই প্রেসে ফোন করে আমাদের টেবুলেশন শিট ও গ্রেড শিট যথাযথ সময়ের মধ্যে পাঠাতে অনুরোধ করি। সে সঙ্গে আমার কমিটির সদস্যদের অনুমতি নিয়ে সব পরীক্ষকদের নম্বর আসা পর্যন্ত অপেক্ষা না করে যে কোনো কোর্সের দু'জন পরীক্ষকের নম্বর হাতে পেলেই আমরা তা খুলে ফেলে গড় করার জন্য নম্বরপত্র ভাগ করে নেই এবং অ্যাভারেজ শিটে নম্বর ওঠাবার পর কোনো এক ফাঁকে নম্বর মেলানোর কাজটিও করে ফেলি। এভাবে কাজ এগিয়ে রেখে সব নম্বর পাওয়ার পর দ্রুত তৃতীয় পরীক্ষণের কাজ করিয়ে নেই। পরে আমিসহ বাকি দু'জন টেবুলেটর টেবুলেশনের কাজ দ্রুততার সঙ্গে করতে সম্মত ও সক্ষম হই। পরে দুজন মিলে ৭৫ জন ইমপ্রুভমেন্ট পরীক্ষার্থীসহ মোট ২২৯জন পরীক্ষার্থীর গ্রেডশিট স্বল্প সময়ে লিখে ফেলি, যা আরেকজন সদস্য একদিনেই পরিশ্রম করে যাচাই করে দিলে আমরা ফলাফল তৈরির কাজ সম্পন্ন করে পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক অফিসে জমা দেই। আগের দু'বছরে অর্থাৎ ২০১৪-২০১৫ এবং ২০১৫-২০১৬ সেশনে যেখানে প্রথম বর্ষের ফলাফল দিতে সময় লেগেছিল যথাক্রমে ৮ মাস ৪ দিন ও ৯ মাস ৬দিন, আমরা একই বর্ষের ২০১৬-২০১৭ সেশনের ফলাফল ২ মাস ১৮ দিনে দিতে সক্ষম হই। এ থেকে অনুধাবন করা যায়, শিক্ষকগণ আন্তরিকতার সাথে চেষ্টা করলে পরীক্ষার ফলাফল দ্রুত প্রদান করে বিভাগকে সেশনজটমুক্ত করা সম্ভব। এ পরীক্ষায় এত দ্রুত ফলাফল দেবার কৃতিত্ব কিন্তু পরীক্ষা কমিটির সভাপতির নয়, এ কৃতিত্ব এ পরীক্ষার সঙ্গে জড়িত ১৬ জন পরীক্ষক, যারা দ্রুত খাতা দেখে দিয়েছিলেন, এবং কমিটির সদস্যবৃন্দ, যারা দ্রুততার সঙ্গে পরীক্ষার কাজ করেছিলেন, তাদের সবার।

সুপারভিশনের অভিজ্ঞতা

আমার অনেক সহকর্মী এমফিল ও পিএইচডি ছাত্র নেন। তাদের অনেকের ডিগ্রি হয়েছে। আবার কেউ কেউ মাঝপথে ঝরে গিয়েছে। আমি এ দিকটায় মনোযোগ দেইনি। অনেক সিনিয়র সহকর্মীকে চার পাঁচজন করে এমফিল ও পিএইচডি ছাত্রও নিতে দেখেছি। আমার কাছে যে শিক্ষার্থীরা উচ্চতর ডিগ্রি করার জন্য আসেনি এমন নয়। তবে আমি নিজের ব্যক্তিগত গবেষণায় ব্যস্ত থাকায় তাদেরকে ফিরিয়ে দিয়েছি। তবে একবার প্রফেসর সিদ্দিক আহমেদ চৌধুরী ও ড. মুস্তাফিজুর রহমান ছিদ্দিকী একটি ছাত্রকে এমফিল ছাত্র হিসেবে নিতে আমাকে জোরালো

অনুরোধ করেন। প্রফেসর সিদ্দিক বলেন, 'ছেলেটি লেখাপড়ায় ভালো, আমার নেবার উপায় থাকলে আর আপনাকে অনুরোধ করতাম না। আপনি ওকে আপনার অধীনে নেন, আমি পরে আমার কোনো ছাত্রের ডিগ্রি শেষ হলে আপনি সুপারভাইজ করতে না চাইলে ওকে নিয়ে নেবো। তবে এখন আপনি ওর দরখাস্তে সই করে দিন।' এমন জোরালো অনুরোধে আমি মহসিন কলেজের রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সহকারী অধ্যাপক জনাব মোহাম্মদ শাহেদ আলম ভুঁইয়ার এমফিল সুপারভাইজার হিসেবে তার আবেদনপত্রে সই করি। পরে ভাবলাম, সই যখন করেছি তখন দেখি তাকে ডিগ্রি করানো যায় কিনা। কিন্তু শাহেদ যেহেতু সরকারি চাকুরে, কাজেই তার ডিগ্রি করার জন্য ছুটি এবং অন্যান্য করণীয় আছে। সে ওইসব আমলাতান্ত্রিক দায়িত্ব সময়মতো করতে না পারায় তার পক্ষে এমফিল প্রোগ্রামে যোগদান করা সম্ভব হয়নি। পরবর্তীতে সে বদলি হয়ে অন্যত্র চলে যাওয়ায় আমার আর তাকে সুপারভাইজ করা লাগেনি। কিন্তু পাঁচ-ছয় বছর পর শাহেদ আবার চট্টগ্রামে বদলি হয়ে এসে ২০১৬ সালে আমার অধীনে এমফিল করতে আগ্রহ প্রকাশ করলে আমি যেহেতু আগে তাকে নিয়েছিলাম, সে কারণে আর না করতে পারিনি। যা হোক, এবার সে তার ছুটি এবং অন্যান্য করণীয় সম্পন্ন করে। শাহেদ ইউজিসি স্কলারশিপের জন্য আবেদন করে কৃতকার্য হয় এবং যথাসময়ে কোর্সওয়ার্ক পরীক্ষায় পাস করে থিসিস লেখা শুরু করে। সে পরিশ্রমী ছাত্র হলেও গবেষণা কাজ করার পূর্ব অভিজ্ঞতা না থাকায় তার লেখা অধ্যায়গুলো আমাকে মনোযোগ দিয়ে দেখতে হয়। আমি বেশ সময় নিয়ে তার থিসিসের অধ্যায়গুলো দেখি। পরবর্তীতে সে সেমিনার দেয় এবং ২০১৯ সালের মার্চ মাসে থিসিস জমা দেয়। কিন্তু তার থিসিস কমিটি দীর্ঘদিন একাডেমিক কাউন্সিলের সভায় অনুমোদিত না হওয়ায় পরীক্ষকদের কাছে প্রেরণ করা হয়নি। এর মাঝে ভিসি পরিবর্তন হলে আরও অনেক দেরি করে একাডেমিক কাউন্সিলের সভা হলে ২০২০ সালে তার থিসিস পরীক্ষকদের কাছে প্রেরণ করার পর করোনার প্রভাবে শিক্ষা কার্যক্রম অচল হয়ে পড়ে। ফলে কবে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোয় স্বাভাবিক কার্যক্রম শুরু হবে এবং কবে শাহেদের ডিগ্রি হবে তা এক দীর্ঘসূত্রিতার মধ্যে পড়ে।

নাজমুন নাহার নামের চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের সরাইপাড়া ডিগ্রি কলেজের রাষ্ট্রবিজ্ঞানের শিক্ষক ২০১৭ সালে আমার সঙ্গে এমফিল করতে চায়। সে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রিধারী। চট্টগ্রাম সরকারি কলেজ থেকে পাস করেছে। প্রথম দিন আমি তাকে খুব একটা আমলে নেইনি। তবে আরেকজন বিভাগীয় পিএইচডি ছাত্র আমাকে তার সম্পর্কে ইতিবাচক ধারণা দিয়ে বলে, স্যার ও ভালো ছাত্রী। আপনি একটু পরীক্ষা করে দেখুন। পরবর্তীতে আবার এলে সে কি বিষয়ে থিসিস লিখবে আমি সে সম্পর্কে জানতে চাই এবং তাকে একটি প্রোপোজাল লিখে আনতে বলি। দু'দিন পরই সে আমাকে একটি প্রপোজাল লিখে জমা দেয়। প্রপোজালটি পড়ে আমার ভালো লাগে। দেখলাম তার লেখার হাত মন্দ না। ফলে আমি তার সুপারভাইজার হতে সম্মত হই। সে কোর্সওয়ার্ক পরীক্ষায় ভালো করে

এবং মৌখিক পরীক্ষায়ও তার পারফরম্যান্স ভালো ছিল। আমি এই এমফিল কোর্স ওয়ার্ক পরীক্ষা কমিটি-২০১৭ এর সভাপতি ছিলাম। অন্য দুজন সদস্য ছিলেন প্রফেসর ড. ভুঁইয়া মোঃ মনোয়ার কবীর এবং প্রফেসর ড. মুস্তাফিজুর রহমান সিদ্দিকী। এ কমিটির বহিরাগত সদস্য ছিলেন জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের সরকার ও রাজনীতি বিভাগের প্রফেসর ড. শামসুল আলম সেলিম। আমরা ৫ আগস্ট ২০১৯ তারিখে এমফিল পরীক্ষা ২০১৭-এর তিনজন পরীক্ষার্থীর মৌখিক পরীক্ষা গ্রহণ করি। এরা তিনজনই কলেজ শিক্ষক। প্রত্যেকে মৌখিক পরীক্ষায় ভালো করলেও নাজমুন নাহারের পারফরম্যান্স সবচেয়ে ভালো ছিল। মৌখিক পরীক্ষার পর এ তিনজন এমফিল পরীক্ষার্থী এক্সটার্নাল মেম্বারসহ আমাদের সঙ্গে ছবি তুলতে চাইলে আমরা অনুমতি প্রদান করি (পরীক্ষা কমিটির সঙ্গে পরীক্ষার্থীদের ছবির জন্য দেখুন পরিশিষ্ট- ৬:৫)। পরীক্ষা শেষে আমি নাজমুনকে বসে না থেকে থিসিসের সঙ্গে সম্পর্কিত বষয়ে পড়াশুনা করতে বলি। সে থিসিস লেখার ভঙ্গিমা দেখার জন্য আমার বুক সেলফ থেকে একটি থিসিস নিয়ে যায়। আমি আশা করি সে যথাসময়ে তার গবেষণা কাজ শেষ করতে পারবে। এ সময় চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়মানুযায়ী কোর্সওয়ার্ক পরীক্ষায় জিপিএ ৩.৫০ বা তার বেশি পেলে কোনো এমফিল পরীক্ষার্থী তাঁর ডিগ্রি পিএইচডিতে রূপান্তরিত করার জন্য আবেদন করতে পারেন। নাজমুন কোর্সওয়ার্ক পরীক্ষায় ৩.৬৭ পাওয়ায় সে তার থিসিসের শিরোনাম পরিবর্তন করে নতুন করে প্রপোজাল লিখে আমাকে দেখায় এবং আমার সম্মতি নিয়ে পিএইচডি ডিগ্রি করার জন্য আবেদন করে।

ফটিকছড়ি কলেজের আরেকজন শিক্ষক ও আমাদের বিভাগের সাবেক ছাত্র রহমতউল্লাহ আমার সঙ্গে এমফিল ছাত্র হিসেবে রেজিস্ট্রেশন নেয়। বেশ কয়েকজন জুনিয়র কলিগ তার সম্পর্কে আমাকে ইতিবাচক ধারণা দিয়ে বলেন, স্যার ও লেখালেখিতে জড়িত এবং ওর লেখার হাত ভালো। আপনি ওকে এমফিল ছাত্র হিসাবে নিতে পারেন। ও যথাসময়ে ডিগ্রি করতে পারবে। এ ছাত্র এখনো কোর্সওয়ার্ক পরীক্ষা পাস করেনি। আমার বিশ্বাস সে যদি মনেযোগ দিয়ে কাজ করে তাহলে যথাসময়ে ডিগ্রি করতে পারবে।

পরীক্ষা কমিটিতে দায়িত্বপালন

সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে বিভিন্ন পরীক্ষা কমিটি গঠন করা হয়। সংশ্লিষ্ট পরীক্ষা কমিটি ওই বর্ষের/সেমিস্টারের শিক্ষার্থীদের পরীক্ষার জন্য প্রশ্ন প্রণয়ণকারী ঠিক করেন, প্রাপ্ত প্রশ্ন মডারেশন ও মৌখিক পরীক্ষা গ্রহণ করেন এবং পরীক্ষার্থীদের ফলাফল তৈরি করেন। পরীক্ষা কমিটিতে একজন সভাপতি এবং দু'জন সদস্য এবং একজন বহিরাগত সদস্য থাকেন। পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে একটি কোর্সে দুজন প্রশ্ন করেন। মডারেশনে প্রশ্ন চূড়ান্ত করার সময় যিনি কোর্সটি পড়িয়েছেন তাঁর প্রশ্নকে অগ্রাধিকার দেয়া হয়। এ কাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের সব শিক্ষককেই করতে হয়। তবে পরীক্ষা কমিটিতে সাধারণত

সিনিয়র শিক্ষকদের রাখা হয়। এসব ব্যাপারে বহিরাগত সদস্য নির্বাচনে অনেকক্ষেত্রে পরোক্ষভাবে দলীয় প্রভাব কাজ করে। আমার নিজের বিভাগে বহিরাগত সদস্য সংশ্লিষ্ট পরীক্ষা কমিটির সভাপতি তার সদস্যদের সঙ্গে আলোচনা করে ঠিক করেন। আমি কম হলেও ঢাকা, রাজশাহী, জাহাঙ্গীরনগর, ও সিলেট শাহজালাল বিশ্ববিদ্যালয়ে কয়েকবার এবং কুষ্টিয়া ইসলামী ও রংপুরে বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে পরীক্ষা কমিটিতে বহিরাগত সদস্য হিসেবে কাজ করেছি। প্রশ্ন মডারেশন করেছি এবং শিক্ষার্থীদের মৌখিক পরীক্ষা গ্রহণ করেছি।

বহিরাগত সদস্যরা এমন কাজের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ কতৃক নির্ধারিত হারে সম্মানী পেয়ে থাকেন। এ ক্ষেত্রে টিএ এবং ডিএ-র অর্থ প্রায় সব বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকদেরকে হাতে হাতে দিয়ে দেয়া হয়। একমাত্র ব্যতিক্রম ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় (ঢাবি)। ঢাবি-তে গত চার দশকে মাত্র কয়েকবার আমি পরীক্ষাসংক্রান্ত কাজে বহিরাগত সদস্য হিসেবে ডাক পেয়েছি তার কোনোবারই আমার টিএ-ডিএর টাকা আমাকে ওইদিন দেয়া হয়নি। কিন্তু অন্য সব বিশ্ববিদ্যালয়ে বহিরাগত সদস্য হিসেবে কাজ করতে গেলে টিএ-ডিএর অর্থ হাতে হাতে পেয়েছি। ঢাবি-র একাউন্টস অফিসে এ ব্যাপারে কোনো নিয়ম শৃঙ্খলা নেই। ওখানে ওই বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদেরই নিজেদের বিল পেতে তদবির করতে হয়। ফলে আমি কাজ করার পর অনেকক্ষেত্রে ঢাবি-র টিএ-ডিএর চেক পেতে আমাকে এক বছর, বা কোনো ক্ষেত্রে আরও অধিক সময় অপেক্ষা করতে হয়েছে। তাও অ্যাকাউন্টসের কর্মকর্তাগণ আমাকে ডাকযোগে এ চেক পাঠাতে সময় পাননি। আমাকে সংশ্লিষ্ট বিভাগের স্টাফদের অনুরোধ করে খোঁজ খবর করিয়ে তাদের মাধ্যমে এ চেক পেতে হয়েছে। অথচ অন্য কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে এ নিয়ে সমস্যা হয়নি। আর মৌখিক পরীক্ষা গ্রহণ বা মডারেশনের সম্মানী অনেকক্ষেত্রেই আমার হাতে এসে পৌঁছেনি। ফলে আমি ২০১৯ সালে সিদ্ধান্ত নিয়েছি ঢাবির কোনো বিভাগ যদি আমাকে কোনো পরীক্ষাসংক্রান্ত কাজে রাখে আমি টিএ-ডিএর বিল হাতে হাতে দেবার শর্ত মেনে নিলেই ওই কাজে অংশগ্রহণে সম্মত হবো। তা নাহলে তাদের কাজ করব না।

সেমিনার প্রদান ও ওয়ার্কশপে অংশগ্রহণ

একজন বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকের জন্য সেমিনার উপস্থাপন অথবা ওয়ার্কশপে অংশগ্রহণ করা একাডেমিক দায়িত্বের মধ্যে পড়ে। আমি শিক্ষক হিসেবে অনেক সেমিনার দিয়েছি এবং ওয়ার্কশপেও অংশগ্রহণ করেছি। কিন্তু এখানে এমন একটি সেমিনার ও ওয়ার্কশপে অংশগ্রহণের কথা বলব যা বিশেষ কারণে উল্লেখের দাবিদার। যুগপৎ এ সেমিনার ও ওয়ার্কশপটি অনুষ্ঠিত হয় ২০০৭ সালে এক-এগারোর অসাংবিধানিক রাজনৈতিক পরিবর্তনের পর জরুরি অবস্থার মধ্যে সেনা-সমর্থিত ফখরুদ্দীন সরকারের দুই বছরের শাসনকালে। অস্ট্রেলিয়া, কানাডা এবং আমেরিকায় আমি একজন ছাত্র/শিক্ষক হিসেবে একাডেমিক সেমিনার দিয়েছি।

আর নিজ দেশে নিজ বিশ্ববিদ্যালয়সহ আরও কতিপয় বিশ্ববিদ্যালয় ও প্রতিষ্ঠানে বিভিন্ন সময় সেমিনার দিয়েছি, যার দু'একটির কথা এ গ্রন্থে ইতিপূর্বে আলোচিত হয়েছে। আলোচ্য সেমিনারটি অনুরুদ্ধ হয়ে আমাকে দিতে হয়েছিল চট্টগ্রাম প্রেস ক্লাব অডিটোরিয়ামে ২০০৮ সালের ১৪ জানুয়ারি তারিখে। প্রেস ইন্সিটিটিউট অব বাংলাদেশ (পিআইবি) ফখরুদ্দীন সরকারের বর্ষপূর্তি উপলক্ষে সেমিনারটির আয়োজন করে।

সাংবাদিকতা বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক মো. শহীদুল্লাহ লিপন এ সেমিনারটির জন্য আমাকে প্রবন্ধ লিখতে অনুরোধ করেন। প্রবন্ধের বিষয় সামাজিক দুর্নীতি। আমি প্রথমে আপত্তি জানিয়ে বলি, জরুরি অবস্থার মধ্যে এমন সেমিনার প্রদান ঝুঁকিমুক্ত নয়। কিন্তু তিনি আমাকে কোনো চাপ না নিয়ে স্বাধীনভাবে লিখতে বলেন। জরুরি সরকারের সময় তখন চারিদিকে দুর্নীতিবিরোধী অভিযান চলছে এবং বড় দলগুলোর অনেক রাজনীতিবিদদের গ্রেফতার করা হয়েছে। এমন অবস্থায় সরকারের পক্ষ থেকে অনুরোধ এসেছে। যদি সরাসরি নাকচ করি তাহলে আবার ঝামেলায় পড়ি কিনা ভেবে আমি স্বাধীনভাবে লেখার শর্তে এ সেমিনারে প্রবন্ধ লিখতে রাজি হই। নির্দিষ্ট সময়ের কয়েকদিন আগে 'দুর্নীতি দমনঃ সামাজিক দুর্নীতির উৎস ও প্রতিকার' শীর্ষক একটি একাডেমিক প্রবন্ধ লিখে আমি আয়োজকদের পাঠিয়ে দেই। কয়েকদিন পর জানতে পারি, আমার প্রবন্ধের কয়েকটি লাইন নিয়ে আপত্তি করা হচ্ছে। এমনও শুনি যে এ আপত্তি করেছে ডাইরেক্টরেট জেনারেল অব ফোর্সেস ইন্টেলিজেন্স (ডিজিএফআই), যদিও সে কথা আয়োজকরা আমাকে পরিষ্কারভাবে বলেননি। তাঁরা আমাকে বিনয়ের সঙ্গে এ প্রসঙ্গ তুললে আমি বলি, আপনারা আমার লেখার স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করতে পারেন না। আমাকে তো লেখার পূর্ণ স্বাধীনতা দেয়া হয়েছিল। আমি যা লিখেছি তার মধ্যে কোনো অসত্য তথ্য নেই। কাজেই আমি কোনো পরিবর্তনে আগ্রহী নই। সেমিনার বন্ধ করে দিলে আমার আপত্তি থাকবে না। পরে পিআইবি-র একজন কর্মকর্তা আমাকে সম্মান দিয়ে অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে বলেন, স্যার আমরা তো এখানে চাকুরি করি। আপনার প্রবন্ধ ভালো হয়েছে এবং সবই ঠিক আছে। কেবলমাত্র একটি দুটি বাক্যে সামান্য একটু পরিবর্তন প্রয়োজন। আমি রাগ না করলেও এমন ভাব দেখাই যে আমি খুব অসন্তুষ্ট হয়েছি। তাকে বিরক্ত স্বরে বলি, আমাকে এ সম্পর্কে কিছুই বলবেন না। আপনার যা খুশি করুন। আমি পরে দেখব। তিনি আমাকে ধন্যবাদ জানান। পরে লক্ষ্য করি, আমার প্রবন্ধ সবই ঠিক আছে। এক জায়গায় সামান্য একটি বা দুটি বাক্য ঘুরিয়ে লেখা হয়েছে, বা কিছু শব্দ মুছে দেয়া হয়েছে। আমি কাজটি পছন্দ না করলেও বুঝতে পারি যে এতে প্রবন্ধের বক্তব্য ক্ষতিগ্রস্ত হয়নি। তবে প্রবন্ধ উপস্থাপনার সময় আমি পূর্ণ স্বাধীনতা এবং সাহস নিয়ে আমার প্রেজেন্টেশন দিয়েছি। সেমিনারটির উদ্বোধন করেন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. এম বদিউল আলম এবং এতে সভাপতিত্ব করেন পিআইবি মহাপরিচালক মোহাম্মদ

নজরুল ইসলাম, এনডিসি। সেমিনারে মডারেটরের দায়িত্বপালন করেন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় সমাজবিজ্ঞান অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. গাজী সালেহ উদ্দিন। আমি প্রবন্ধে সামাজিক দুর্নীতির নমুনা হিসেবে শিক্ষা, আইন-শৃঙ্খলা, স্বাস্থ্য ও এনজিও খাতের দুর্নীতির ওপর বিশদভাবে আলোচনা করি। সেমিনার উপস্থাপনার পর প্রাণবন্ত আলোচনা হয়।[২৮] পরবর্তীতে প্রবন্ধটি পিআইবি প্রকাশিত গবেষণা সাময়িকী *নিরীক্ষা*-য় প্রকাশিত হয়।[২৯] এভাবে সেনা-সমর্থিত সরকারামলে জরুরি অবস্থার মধ্যে অনুরুদ্ধ হয়ে সেমিনার প্রদানের দায়িত্বপালন সম্পন্ন করি।

এবার ওয়ার্কশপটির কথা বলি। একই সেনা-সমর্থিত অন্তর্বর্তীকালীন জরুরি সরকারামলে পুনর্গঠিত ইসি নতুন ভোটার তালিকা প্রণয়নের কাজ শুরু করে। এ সরকারটি দুই বছর ক্ষমতায় থাকার পরিকল্পনা নিয়ে ক্ষমতায় এসে ছবি সংবলিত ভোটার তালিকা তৈরির উদ্যোগ নেয়। তবে সেনা বাহিনীর আইটি বিশেষজ্ঞগণ তিন মাসের মধ্যে ছবি সংবলিত ভোটার তালিকা তৈরি করে দেয়ার নিশ্চয়তা দিলে সরকারের মন খারাপ হয়। তখন ইসি জরুরি সরকারের ক্ষমতার মেয়াদ দীর্ঘায়িত করার লক্ষ্যে ছবি সংবলিত ভোটার তালিকার সঙ্গে জাতীয় পরিচয়পত্র (এনআইডি) তৈরির কাজ জুড়ে দেয়। সম্ভবত ইসির এমন কাজকর্মকে বৈধতা দেবার জন্য রাজধানীতে নির্বাচন কমিশনের কর্মকাণ্ডের ওপর একটি ওয়ার্কশপ অনুষ্ঠিত হয়। ওই ওয়ার্কশপে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় থেকে লোক প্রশাসন বিভাগের অধ্যাপক ও বিশিষ্ট গবেষক প্রফেসর ড. নিজাম আহমেদ এবং আমাকে আমন্ত্রণ জানানো হয়। প্রফেসর নিজাম না গেলেও তিনি আমাকে যেতে উৎসাহিত করেন। আমি দুই দিনব্যাপী ঢাকায় অনুষ্ঠিত ওই ওয়ার্কশপে অংশগ্রহণ করি। এ ওয়ার্কশপে সীমিতসংখ্যক বাছাইকৃত ব্যক্তি অংশ নেন। তাদের মধ্যে অনেকেই ছিলেন এনজিও ব্যক্তিত্ব, বিদেশি দাতা সংস্থার গুরুত্বপূর্ণ পদে কর্মরত ব্যক্তি, কতিপয় বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাপক এবং ভারতের ১৪তম সাবেক সিইসি জনাব ব্রিজ

২৮. পঠিত প্রবন্ধের উপর যাঁরা আলোচনা করেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন: প্রিমিয়ার বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতির অধ্যাপক ড. জ্যোতি প্রকাশ দত্ত, চট্টগ্রাম কলেজের অধ্যক্ষ অধ্যাপক সৈয়দ মো. শহীদুল্লাহ, *বীর চট্টগ্রাম মঞ্চ*-এর সম্পাদক সৈয়দ ওমর ফারুক, চট্টগ্রাম মহিলা চেম্বার্সের সভাপতি বেগম মনোয়ারা হাকিম আলী, ওয়ার্ড কমিশনার রেহেনা আক্তার রানু, বাংলাদেশ ব্যাংক চট্টগ্রাম শাখার উপ পরিচালক মো. ইব্রাহিম ভূইয়া, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় লোক প্রশাসন বিভাগের অধ্যাপক হোসাইন কবীর, *সুপ্রভাত বাংলাদেশ* সম্পাদক নাসিরুল হক, চসিক-এর প্যানেল মেয়র রেখা আলম চৌধুরী, দুদকের ফিল্ড অফিসার এম এ ওয়াদুদ, সাংবাদিক মোস্তফা নইম, বাসস-এর শাহনেওয়াজ, পুলিশের এএসপি সামসুদ্দিন তালুকদার, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিকতা বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক মোঃ শহীদুল্লাহ লিপন প্রমুখ।

২৯. মুহাম্মদ ইয়াহ্ইয়া আখতার, 'দুর্নীতি দমন: সামাজিক দুর্নীতির উৎস ও প্রতিকার', *নিরীক্ষা*, ১৬৬তম সংখ্যা, জানুয়ারি ২০০৮, পৃষ্ঠা- ২২-৩৮।

বিহারী ট্যান্ডন।[৩০] ওয়ার্কশপটি জরুরি অবস্থার মধ্যে অনুষ্ঠিত হওয়ায় সবাই যাতে নির্ভয়ে আলোচনা করতে পারেন সে জন্য এটি চ্যাথাম হাউস নীতি অনুযায়ী অনুষ্ঠিত হয়।[৩১] অংশগ্রহণকারী আলোচকদের প্রায় সবাই যখন প্রথমদিন নির্বাচন কমিশনের ছবি সংবলিত ভোটার তালিকা এবং এনআইডি তৈরির কাজের উচ্ছসিত প্রশংসা করছিলেন তখন আমি সাহস করে স্রোতের বিপরীতে কথা বলি। আমি জানতে চাই, ইসির সঙ্গে আজ পর্যন্ত যত রাজনৈতিক দলের যত আলাপ আলোচনা হয়েছে, কোনোদিন কোন দল বা ব্যক্তি কি কমিশনের কাছে জাতীয় পরিচয়পত্র তৈরির দাবি করেছে? না, করেনি। তাহলে সমগ্র জাতি যখন দ্রুত নির্বাচন প্রত্যাশী, তেমন সময় কমিশন কেনো ছবি সংবলিত ভোটার তালিকা তৈরি করে দ্রুত নির্বাচন অনুষ্ঠান করছে না? আমি আরও বলি, জাতীয় পরিচয়পত্রের সঙ্গে সুষ্ঠু নির্বাচনের সম্পর্ক নেই। কাজেই নির্বাচনের সঙ্গে সম্পর্কিত নয়, এমন কাজে ইসির জড়িত হয়ে সময় নষ্ট করা উচিত নয়। এনজিও প্রতিনিধিত্বকারী দু'একজন বলেন, এনআইডি নাগরিকদের জন্য অনেক উপকারী। এটি ব্যবহার করে নাগরিকগণ অনেক সুবিধা পাবেন। আমি সে বক্তব্যে আপত্তি জানিয়ে বলি, এমন ভালো আরও অনেক কাজ আছে। কিন্তু ইসির এসব ভালো কাজে মনোযোগী না হয়ে নির্বাচন সংক্রান্ত কাজে মনোযোগ দেয়া উচিত। এতে অংশগ্রহণকারী অনেকেই আমার বক্তব্যে নাখোশ হন। চা বিরতিতে একজন নারী এনজিওপ্রধান বলেন, প্রফেসর সাহেব আপনি এসব বলছেন কেন? আমি বলি, যা সত্য মনে করি তাই বলেছি। আমার বক্তব্যকে খণ্ডন করার মত আপনার কোনো যুক্তি থাকলে আপনিও তা বলুন। একজন কলামিস্ট এনআইডি তৈরির উদ্যোগকে ইসির একটি অনির্বাচিত সরকারকে দীর্ঘ মেয়াদে ক্ষমতায় থাকতে সহায়তা করা হিসেবে ব্যাখ্যা করে এ প্রচেষ্টাকে দ্রুত নির্বাচন প্রত্যাশী জাতির সঙ্গে প্রতারণা হিসেবে বিবেচনা করেন।[৩২] ভারতের মতো প্রতিবেশি বড় দেশের একজন সাবেক সিইসিকে কাছে পেয়ে তার সঙ্গে আলাপের সুযোগ হাতছাড়া করিনি। আমি তাঁর কাছে ভারতীয় নির্বাচনগুলোর সময় এনজিওদের ভূমিকা কেমন সে সম্পর্কে

৩০. জনাব ব্রিজ বিহারী ট্যান্ডন ২০০১ সালের জুন মাসে ভারতীয় নির্বাচন কমিশনে যোগ দেন। তিনি ১৬ মে ২০০৫ থেকে ২৯ জুন ২০০৬ পর্যন্ত ভারতীয় নির্বাচন কমিশনের সিইসি ছিলেন।

৩১. চ্যাথাম হাউস রুল অনুযায়ী যদি কোনো সেমিনার বা ওয়ার্কশপ অনুষ্ঠিত হয় তবে অংশগ্রহণকারীরা ওই সেমিনার বা ওয়ার্কশপ থেকে প্রাপ্ত তথ্য ব্যবহার করতে পারলেও কে কি বলেছেন এবং বক্তাদের পরিচিতি প্রকাশ করতে পারেন না। এসব অনুষ্ঠানে সাংবাদিকদেরও প্রবেশাধিকার দেয়া হয় না। কাজেই গণমাধ্যমেও প্রকাশ পায়না এসব অনুষ্ঠানের সংবাদ।

৩২. প্রাসঙ্গিক তথ্যের জন্য দেখুন, মুহাম্মদ ইয়াহ্ইয়া আখতার, 'কমিশনের অভিনবত্ব ও সিইসি'র পক্ষপাতিত্ব', *নয়া দিগন্ত*, ১২ নভেম্বর, ২০০৮।

ব্যক্তিগতভাবে জানতে চাই। জনাব ট্যান্ডন বলেন, ভারতীয় নির্বাচনে এনজিওদের কোনো উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নেই। ভারতীয় রাজনৈতিক দলগুলোও এনজিওদেরকে নির্বাচনের সময় পাত্তা দেয় না। ওয়ার্কশপে আমার বক্তব্য শোনা হলেও তা মানা হয়নি। উল্লেখ্য, অন্তর্বর্তীকালীন সরকার একটি পরিকল্পনা নিয়ে ক্ষমতাসীন হয় এবং সে অনুযায়ী তারা তাদের কাজ করতে থাকে। ওপরে ওপরে লোক দেখানোর জন্য তারা এসব সেমিনার বা ওয়ার্কশপের আয়োজন ক'রে তাদের কর্মকাণ্ড জায়েজ করতে চেষ্টা করে।

তবে জরুরি অবস্থা ছাড়াও স্বাভাবিক সময়ে প্রদত্ত আমার কিছু সেমিনারেও উত্তেজনা সৃষ্টি হয়। এর সবগুলো মনে না থাকলেও দু'একটির কথা উল্লেখ করতে পারি। জার্মান অর্থায়নে পরিচালিত উদারতাবাদ প্রচারকারী প্রতিষ্ঠান লিবারেল ফোরাম-এর ঢাকার কার্যক্রম দেখভাল করতেন ড. নাজমুল হোসাইন। তাঁর অনুরোধে আমি সম্ভবত ২০০০ সালের দিকে বাংলাদেশের সন্ত্রাস-দুর্নীতি পরিস্থিতির ওপর চট্টগ্রাম সার্কিট হাউসে একটি সেমিনার দিয়েছিলাম। ওই সেমিনারে আমার বক্তব্যে সরকারি নীতির প্রাসঙ্গিক সমালোচনা থাকায় জেলা প্রশাসক মহোদয় অত্যন্ত ক্ষিপ্ত হন। তিনি সেমিনার উপস্থাপন শেষ হবার পর ফ্লোর চেয়ে আমার বক্তব্যের তীব্র প্রতিবাদ করে পরিবেশ উত্তপ্ত করে সেমিনার ভণ্ডুল করার মতো পরিবেশ সৃষ্টি করেন। কিন্তু উপস্থিত একাডেমিকগণ আমাকে সমর্থন করেন এবং আয়োজকদেরকে সেমিনার চালিয়ে যেতে বলেন। অন্যরা বলেন, সেমিনারে প্রদত্ত বক্তব্যের সঙ্গে কেউ একমত না হলে তিনি বক্তব্য ও যুক্তি দিয়ে তার প্রতিবাদ করতে পারেন। এটাই তো সেমিনারের সৌন্দর্য। আয়োজকরা আমার বক্তব্য অপছন্দ করেননি। পরবর্তীতে ২০০৫ সালে ইন্সিটিটিউট অব পার্লামেন্টারি স্টাডিজ-এর ন্যাশনাল কনসালট্যান্ট অন পার্লামেন্টারি কমিটিজ প্রফেসর ড. নিজাম আহমেদ কর্তৃক অনুরুদ্ধ হয়ে আমি চট্টগ্রামের আগ্রাবাদ হোটেলে 'বাংলাদেশের সংসদীয় কমিটি ও সুশীল সমাজের মধ্যকার সম্পর্ক' শীর্ষক একটি সেমিনার প্রদানে সম্মত হই। এই সেমিনারেও একজন সংসদ সদস্য আমার বক্তব্যের তীব্র প্রতিবাদ করে বক্তব্য প্রদান করে আমার ডিফেন্স শোনা পর্যন্ত অপেক্ষা না করে আগেই চলে যান। পরে সুন্দরভাবে সেমিনারটি সম্পন্ন হয় এবং আমি আমার প্রবন্ধটি পরবর্তীতে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় স্টাডিজ-এ প্রকাশ করি।[৩৩] এ ছাড়া চট্টগ্রাম কাস্টমস ট্রেনিং একাডেমিতে 'দুর্নীতি ও উন্নয়ন', ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সিনেট ভবনে 'উচ্চশিক্ষায় স্বচ্ছতা' এবং সাভারে লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে (পিএটিসি) 'দলীয় ব্যবস্থাধীনে স্বচ্ছ সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠানের সম্ভাবনা' শীর্ষক বিষয়ে যে সব সেমিনার প্রদান করি ওই সেমিনারগুলোতেও আমি

৩৩. মুহাম্মদ ইয়াহ্ইয়া আখতার, 'বাংলাদেশে সংসদীয় কমিটি ও সুশীল সমাজের মধ্যকার সম্পর্ক', *চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় স্টাডিজ*, খণ্ড ২৬, সংখ্যা ১, ২০০৬, পৃষ্ঠা- ১৮৭-২০৮।

সাহস করে অনেক তিক্ত সত্য তথ্য উপস্থাপন করি। কিন্তু এসব সেমিনারের অংশগ্রহণকারীগণ বাদানুবাদ করলেও সহনশীলতার সঙ্গে সেমিনারের পরিবেশ বজায় রেখেছিলেন। সে কারণে এ সেমিনারগুলো সম্পর্কে বিস্তারিত বলব না।

নন একাডেমিক দায়িত্ব পালন

আমার সমগ্র শিক্ষকতা জীবনে সব সময় ক্লাসরুমেই পড়াবার দায়িত্ব পালন করেছি। তবে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ৪০ বছরে কখনোই যে আমাকে অন্য কোনো দায়িত্ব দেয়নি এমন নয়। যতদূর মনে আছে আমি তিনবার নন একাডেমিক এবং নন রেমুনারেটিভ কাজে দায়িত্ব পালন করেছি। এর দুটি হলো তদন্ত কমিটির কাজ এবং অন্যটি হলো চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি সাংস্কৃতিক প্রতিনিধিদলকে ঢাকায় নিয়ে যাওয়ার দায়িত্ব পালন। উল্লেখ্য, রাজনৈতিক বর্ণ পরিচয়হীন শিক্ষক হওয়ায় বড় বড় গুরুত্বপূর্ণ পদে বা কাজে আমার পক্ষে দায়িত্বপালন করা সম্ভব হয়নি।

তদন্ত কমিটিতে দায়িত্ব পালন

আমি প্রথম যে তদন্ত কমিটিতে কাজ করার দায়িত্ব পাই ওই দায়িত্বটি প্রথমে দেয়া হয়েছিল আমার বিভাগের একজন সিনিয়র অধ্যাপককে। কিন্তু তিনি দায়িত্ব পালনে অপারগতা প্রকাশ করেছিলেন। কেন দায়িত্ব পালনে অপারগতা প্রকাশ করেছিলেন তা ওই সম্মানিত অধ্যাপকই বলতে পারবেন। তবে আমার কাছে মনে হয়েছিল যে, সংশ্লিষ্ট তদন্তটি যে দুজন শিক্ষকের মধ্যে সংঘটিত বিরোধকে কেন্দ্র করে, তার একজন শিক্ষক ছিলেন ক্ষমতাসীন ভিসির নিকটাত্মীয়। সে কারণেই তিনি এ দায়িত্বপালনে অপারগতা প্রকাশ করেছিলেন, নাকি ব্যস্ততার কারণে তিনি দায়িত্ব পালনে অসম্মত হয়েছিলেন, সে বিষয়ে আমি নিশ্চিত ছিলাম না। তবে আমাকে এবং ইতিহাস বিভাগের একজন সিনিয়র অধ্যাপককে এ দায়িত্ব দেয়া হলে আমি অর্পিত দায়িত্ব পালন করি। প্রথম বৈঠকেই আমার চেয়ে অনেক সিনিয়র ওই সম্মানিত অধ্যাপককে বিনয়ের সাথে বলি, দেখুন স্যার, এ তদন্ত কমিটিতে আমি আপনার মতো একজন ন্যায়পরায়ন এবং সুযোগ্য সিনিয়র শিক্ষকের সঙ্গে কাজ করতে পেরে নিজেকে সৌভাগ্যবান মনে করছি। তিনিও সম্মান করে আমার সম্পর্কে একই রকম ইতিবাচক অভিব্যক্তি প্রকাশ করেন। আনুষ্ঠানিকভাবে কাজ শুরু করার আগে আমি তাকে বলি, স্যার যদি কিছু মনে না করেন আমি আপনাকে এ কাজ সম্পর্কে কিছু বলতে চাই। স্যার আমাকে বলেন, আপনার যা খুশি নিঃসংকোচে বলতে পারেন।

আমি তাকে ধন্যবাদ দিয়ে বলি, স্যার দেখুন, আপনি একজন সম্মানিত শিক্ষক। শিক্ষক সমাজে আপনি শ্রদ্ধার আসনে আসীন। যতদুর জানি আপনার চাকরিও প্রায় শেষ পর্যায়ে। কিছুদিন পর আপনি অবসরে যাবেন। আমিও একদিন এ বিশ্ববিদ্যালয়ের চাকুরি শেষ করে চলে যাব। কিন্তু তদন্ত করে যে প্রতিবেদনটি

আমরা জমা দেব তা কিন্তু চিরস্থায়ী রেকর্ড হয়ে থাকবে। কাজেই আমাদের এমনভাবে কাজ করা উচিত হবে, যাতে ভবিষ্যতে কেউ এ তদন্ত প্রতিবেদন নিয়ে কাজ করলে বুঝতে পারেন, যাঁরা এ রিপোর্টটি লিখেছিলেন তাঁরা সততার সঙ্গে দায়িত্বপালন করেছিলেন। উনি আমার কথার সুর বুঝতে পেরে বলেন, আমি নাকি তার মনের কথাটি বলেছি। আমরা যখন তদন্ত করব, তখন তা অত্যন্ত পেশাদারিত্বের সঙ্গে করব। কে কার পরিচিত বা আত্মীয়, সেসব বিষয় আমাদের মাথায় থাকবে না। আমি স্যারের সুরে সুর মিলিয়ে বললাম, স্যার বিচারকের চেয়ারে বসলে ন্যায়বিচার না করাকে আমি বড় রকম অপরাধ মনে করি। এরপর আমরা ওই দুজন শিক্ষককে একাধিকবার জিজ্ঞসাবাদ করি এবং আমাদের কাছে যেটা সত্য মনে হয়েছে সেভাবে একটি প্রতিবেদন নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বিশ্বাবিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের কাছ জমা দিয়েছি। আমি দ্বিতীয় যে তদন্তটি করেছিলাম সে সম্পর্কে আমার ভালো মনে নেই। তবে ঐ তদন্তে আমার সঙ্গে বাংলা বিভাগের অধ্যাপক আবুল কাসেম কাজ করেছিলেন, যিনি অবসরগ্রহণের পর একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর হন। ওই তদন্তের বিষয়বস্তু সম্পর্কে আমার ভালো মনে না থাকায় সে সম্পর্কে বিস্তারিত লিখছি না। তবে ওই তদন্তেও আমরা বস্তুনিরপেক্ষভাবে পেশাদারিত্বের সঙ্গে কাজ করেছিলাম।

সাংস্কৃতিক দলের পরিচালক

তৃতীয় কাজটি ছিল চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় সাংস্কৃতিক দলের প্রতিনিধিত্ব করা। ঢাকায় ব্রিটিশ কাউন্সিলে ২০০৫ সালের মার্চ মাসে অনুষ্ঠিত একটি সাংস্কৃতিক উৎসবে বাংলাদেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় অংশগ্রহণ করে। কয়েকটি বাইরের দেশের বিশ্ববিদ্যালয় থেকেও সাংস্কৃতিক প্রতিনিধিদল এসেছিল। এর জন্য অংশগ্রহণকারী শিক্ষার্থী এবং তাদের তত্ত্বাবধায়নকারী শিক্ষকের জন্য ব্রিটিশ কাউন্সিল থেকে খরচের জন্য অর্থ বরাদ্দ করা হয়। দশ বারো জনের একটি টিমকে আমি ঢাকায় নিয়ে যাই। এরা ছিল বিভিন্ন বিভাগের ছেলেমেয়ে। ওই টিমে আমার নিজ বিভাগের দু'জন শিক্ষার্থী ছিল। তাদের নাম মনসুরা আকতার শিমু এবং ইমাম হোসেন সাইদ। আরো ছিল আইন, বাংলা, উদ্ভিদবিদ্যা, দর্শনসহ অন্যান্য বিভাগের শিক্ষার্থী। এদের সবার নাম প্রায় ১৪ বছর পরে মনে করা কঠিন হলেও নিজের দু'জন ছাত্র ছাড়া শ্রাবনী সেন শাওন, মোশতাক, মুক্তাশ্রী চাকমা, দীপা দাস, ফারহানা শাহরীয়ার এবং লাবনী বড়ুয়ার নাম মনে করতে পারছি। সাইদ আমাদের জন্য ঢাকায় হোটেল বুক করেছিল এবং আমাদের প্রতিযোগীরা ২ দিনের জন্য নির্দিষ্ট সময়ে ঢাকায় গিয়ে ওই সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে। যাবার আগে শিক্ষার্থীরা রিহার্সেল করার সময় কোনো কোনো শিক্ষক আমাকে পরামর্শ দেন যে, ছেলেমেয়েরা রিহার্সেল করছে, তাছাড়া ঢাকায় গেলেও খরচাপাতি আছে, আপনি ভিসি সাহেবের কাছে কিছু টাকা চান। এতে অংশগ্রহণকারীদের সুবিধা হবে। আমি বললাম, এর জন্য তো ব্রিটিশ কাউন্সিল খরচ দিচ্ছে। তারা বললেন, তারপরও

আপনি চাইতে পারেন, ব্রিটিশ কাউন্সিল তো রিহার্সেলের জন্য খরচ দিচ্ছে না। আমি শিক্ষার্থীদের কিছুই না জানিয়ে ভাবলাম, যদি ওদের লাভ হয় দেখি স্যারের কাছে একবার যাই। স্যারকে গিয়ে বললাম, স্যার, ছেলেমেয়েরা অনেক পরিশ্রম করছে, পারফরম্যান্স বেশ ভালোই হবে মনে হচ্ছে। আপনি যদি স্যার ওদের জন্য কিছু টাকা দিতেন তাহলে খুব ভালো হত। প্রফেসর নুরুদ্দীন চৌধুরী তখন ভাইস চ্যান্সেলর। স্যার বললেন, বলেন, আপনার জন্য কত টাকা লাগবে? আমি বললাম, স্যার আমার কোনো টাকা লাগবে না। আমার খরচ তো ব্রিটিশ কাউন্সিল দিবে। তিনি গড়িমসি করে শিক্ষার্থীদের জন্য মাত্র তিন হাজার টাকা বরাদ্দ করলেন। অনেকে আমাকে এত কম টাকা না নিতে বললেও আমি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের অংশগ্রহণ দেখাতে এ টাকা গ্রহণ করি।

ঢাকায় পৌছে শিক্ষার্থীদের পারফরম্যান্স দেখে তো আমি অবাক। ওই প্রতিযোগিতায় অন্যরা আমাদের ছেলেমেয়েদেরকে মোটেও শক্ত প্রতিদ্বন্দ্বী মনে করেননি। তারা ভেবেছিল, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় আবার কি প্রতিযোগিতা করবে! কিন্তু আমাদের শিক্ষার্থীরা তাদের পারফরম্যান্সের মধ্য দিয়ে সবাইকে চমক লাগিয়ে দেয়। অনেকগুলো আইটেমে তারা পুরস্কৃত হয়। বিচারকগণ প্রায় সবাই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের হওয়ায় সবগুলো আইটেমে ভালো বিচার হয়নি বলে অংশগ্রহণকারীদের কাছে মনে হয়। আমাদের সঙ্গে সঙ্গীত শিল্পী লাবনী বড়ুয়া আসার আগে শর্ত দিয়েছিল, তার মা নিজ খরচে তার সঙ্গে যেতে চান। আমরা তার মাকে সঙ্গে নিলে সে আমাদের সঙ্গে যাবার অনুমতি পাবে। লাবনী ভালো গায়িকা। তার শর্ত মেনে আমরা তাকে দলে আনি এবং লাবনীর মার যেন কোনো রকম কষ্ট না হয় সে জন্য আমাদের শিক্ষার্থীদের বিশেষভাবে বলে দেই। আরও বলি, তার কাছ থেকে ভাড়া বা খাবার খরচ হিসেবে যেন টাকা না নেয়া হয়। শিক্ষার্থীরা অত্যন্ত সম্মানের সঙ্গে তাকে আমাদের সঙ্গে রাখে। শিক্ষার্থীদেরকে ভালো হোটেলে রাখা হয়। ভালো খাবার খাওয়ানো হয় এবং প্রতিযোগিতা শেষ হলে তাদের প্রত্যেককে এসি বাসের ভাড়া দেয়া হয়। কিন্তু তার পরেও আমাদের হাতে কিছু টাকা থেকে গেলে আমরা একজন প্রতিযোগীর জন্মদিন থাকায় কেক কিনে তার জন্মদিন উদ্‌যাপন করি। তখন আমি টিম মেম্বারদেরকে একত্র করে বলি, তোমাদের সঙ্গে আমার আরেকটি আলোচনা আছে। আমি ভিসি সাহেবের কাছে তোমাদের জন্য কিছু আর্থিক বরাদ্দ চেয়েছিলাম। কিন্তু তিনি মাত্র ৩ হাজার টাকা দিয়েছিলেন। সে টাকাটা আমার কাছে আছে। এখন বলো এ টাকা দিয়ে তোমরা কি করতে চাও। তারা বলল, স্যার আপনিই বলেন কি করলে ভালো হয়। আমি বললাম দেখ, খাবার কিনে খেলে তো পরে আর মনে থাকবে না। আমার মনে হয়, তোমরা সবার জন্য একটা গিফট কিনে নাও। তারপর আমি সাইদসহ আরো একজনকে নিয়ে লাবনীর মা-সহ সবার জন্য একটি করে আযাদ প্রডাক্টসের সুদৃশ্য ডায়রি কিনলাম। ছাত্রদের চাপে পড়ে আমার নিজের জন্যও কিনতে হলো। তার পরেও সামান্য কিছু টাকা থেকে যাওয়ায় সে টাকা দিয়ে সবার জন্য

টেলিফোন নম্বর লেখার মিনি নোটবুক কেনা হলো। তারপর তো বিদায়ের পালা। কিন্তু মাত্র দু'দিন একদল গুণী শিক্ষার্থীদের সঙ্গে থেকে যে সময় কাটিয়েছিলাম এবং তাদের পারফরম্যান্সে যে আনন্দ পেয়েছিলাম, এখনও তা স্মৃতিতে উজ্জ্বল হয়ে আছে। বেশ অনেক বছর আগে শ্রাবনী সেন শাওনের মৃত্যু সংবাদ পেয়ে খুব কষ্ট পেয়েছিলাম। শাওন একজন ভালো আবৃত্তিশিল্পী ছিল এবং সে চট্টগ্রামে আবৃত্তি চর্চার সঙ্গে সক্রিয়ভাবে জড়িত ছিল। এ ছাড়া বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার্থীদের অনুরোধে অথবা বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে জড়িত হয়ে শিক্ষার্থীদের সঙ্গে আমার কিছু কাজ করার অভিজ্ঞতা হয়। এমন তিনটি পদে দায়িত্ব পালনের কথা এখানে উপস্থাপন করব।

সিইউডিএস এর উপদেষ্টা

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ডিবেটিং সোসাইটি (সিইউডিএস) আমাকে তাদের উপদেষ্টা হিসেবে কাজ করতে অনুরোধ করলে আমি রাজি হই। কারণ, আমি নিজে ছাত্র থাকাকালীন অনেকবার বিতর্ক প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে পুরস্কৃত হয়েছি। বাংলাদেশ টেলিভিশন প্রথমে ১৯৭৬ সালে জাতীয় বিতর্ক প্রতিযোগিতা শুরু করলে বিটিভির ওই বিতর্ক অনুষ্ঠানে আমি খুলনার বিএল কলেজের টিম সদস্য হিসেবে অংশগ্রহণ করি। ওই টিমে দলনেতা ছিলেন আবুল বাসার (পরে সরকারি কলেজের প্রিন্সিপ্যাল ও যশোর বোর্ডের চেয়ারম্যান হন) এবং অন্য সদস্য ছিলেন বিধান চন্দ্র দাস (পরে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক)। পরবর্তীতে ইউনিভার্সিটিতে পড়াকালীন আমি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের শহীদ শামসুজ্জোহা হলের বিতর্ক টিম সদস্য হয়ে আরেকবার বিটিভির বিতর্ক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেছিলাম। সেবার প্রথম রাউন্ডে আমাদের প্রতিপক্ষ ছিল চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের আলাওল হল। আমরা আলাওল হলকে পরাজিত করেছিলাম। এ ছাড়া খুলনায় বিএল কলেজে থাকাকালীন সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে আমি বিতর্ক প্রতিযোগিতায় একাধিকবার পুরস্কৃত হয়েছিলাম। এ কারণে যেহেতু বিতর্কের সঙ্গে ছাত্রজীবন থেকে আমার সম্পর্ক ছিল, আমি সিইউডিএস-এর উপদেষ্টা হবার প্রস্তাব পেয়ে খুশি হয়েছিলাম। আমার মতো ছাত্ররা বাংলা বিভাগের অধ্যাপক আবুল কাশেম ভাইকেও উপদেষ্টা মনোনীত করেছিল। তবে এদের মডারেটর ছিলেন বাংলা বিভাগের অধ্যাপক ড. মাহবুবুল হক। যতদূর মনে আছে ২০০৮ সাল থেকে একনাগাড়ে পাঁচ-ছয় বছর আমি সিইউডিএস-এর উপদেষ্টা ছিলাম।

এ সময়ে সিইউডিএস-এর কোনো অনুষ্ঠান হলে আমি দাওয়াত পেতাম। সাধারণ শিক্ষকরা যেভাবে অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করতেন, আমিও সেভাবে কয়েকবার এদের অনুষ্ঠানে যোগদান করেছি। এদের বিতর্কসভার পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানেও একাধিকবার অংশগ্রহণ করেছি। যে বিষয়টি আমি লক্ষ্য করেছি, ওইসব অনুষ্ঠানে সবকিছু করতেন মডারেটর ড. মাহবুবুল হক। আমাকে বা কাশেম ভাইকে কখনো স্টেজে ডাকা হত না। আমাদের নাম কখনো এসব

অনুষ্ঠানে উচ্চারিত হত না। সাধারণ শিক্ষকদের সঙ্গে আমি দর্শক সারিতে বসে থাকতাম। তা ছাড়া এই পাঁচ-ছয় বছরে সিইউডিএস তাদের অনুষ্ঠান, বা অন্য কোনো বিষয়ে কখনো আমার উপদেশ নেয়নি। সে জন্য অকারণে এমন একটি পদ ধরে রাখা আমার ভালো লাগছিল না। তারপর একবার হয়ত তারা নতুন করে কমিটি করে। সে কারণে সিইউডিএসের তিন চারজন শিক্ষার্থী এসে আমাকে বলল, স্যার আমরা কিন্তু আপনাকে আমাদের উপদেষ্টা হিসেবে রাখছি। এবার আমি আর লজ্জা না করে আপত্তি জানালাম। তাদেরকে বললাম, পাঁচ-ছয় বছর থেকে আমি সিইউডিএস-এর উপদেষ্টা। কিন্তু আমার তো তোমাদেরকে কোনো উপদেশ দেবার সুযোগ হয়নি। তাছাড়া তোমরা তোমাদের অনুষ্ঠানে আমাকে যতবার দাওয়াত দিয়েছ, আমি সাধারণ শিক্ষকদের সারিতে অন্য শিক্ষকদের মতোই বসে থেকেছি। উপদেষ্টা হিসেবে কোনোদিন স্টেজেও ডাকোনি, বা তোমাদের কোনো অনুষ্ঠানে আমার নামও উচ্চারিত হয়নি। অনুষ্ঠান পরিচালনা থেকে সবকিছু করেছেন সিইউডিএর-এর মডারেটর ড. মাহবুবুল হক ভাই। যা হোক, এ নিয়ে আমার কোনো আপত্তি বা ক্ষোভ নেই। তবে আমি সবিনয়ে জানাচ্ছি যে, আমি আর এ পদে থাকতে চাই না। তারা অনেক অনুরোধ করা সত্ত্বেও আমি রাজি হইনি। পরে তারা আমাকে উপদেষ্টা হিসেবে তাদের আয়োজিত লেকচার সিরিজে লেকচার দিতে আমন্ত্রণ জানালে আমি তাও সবিনয়ে প্রত্যাখ্যান করি। তারা বলে, স্যার অর্থনীতি বিভাগের প্রফেসর ড. মইনুল ইসলাম স্যার একটি লেকচার দিয়েছেন। আমরা ভেবেছি পরের লেকচারটি আপনি দিবেন। আমি বলি দেখ, আমি তোমাদের উপদেষ্টা হিসেবে লেকচার দিতে রাজি হব না। কারণ, আমি তোমাদের উপদেষ্টা থাকব না। তবে তোমরা যদি সত্যিই চাও যে আমাকে লেকচারে আমন্ত্রণ জানাবে, তাহলে তোমরা আমাকে সাধারণ শিক্ষক হিসেবে লেকচার দিতে আহ্বান জানালে আমি বিষয়টি বিবেচনা করব। কিন্তু আমাকে উপদেষ্টা বললে আমার আপত্তি থাকবে। পরে তারা আমাকে সাধারণ শিক্ষক হিসেবে লেকচার দিতে আহ্বান জানালে আমি রাজি হই এবং সিইউডিএস-এর লেকচার সিরিজে একটি লেকচার দেই।

টিআইবির সিনিয়র রিসার্চ ফেলো

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি) ২০০৫ সালে দুর্নীতিবিষয়ক গবেষণা প্রকল্প আহবান করলে আমি 'সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের দুর্নীতি' বিষয়ে একটি গবেষণা প্রকল্প জমা দেই। এ বিষয়ে টিআইবি প্রতিযোগিতার ভিত্তিতে কতিপয় জুনিয়র ও সিনিয়র রিসার্চ ফেলোশিপ প্রদান করবে। টিআইবির নীতি অনুযায়ী জুনিয়র রিসার্চ ফেলোশিপের জন্য আবেদনকারীদের তারা ইন্টারভিউ নেন। আর সিনিয়র রিসার্চ ফেলো, যাদের বয়স ৪০ বা তার বেশি, তাদের সম্পর্কে আবেদনপত্র ও কাগজপত্র দেখে সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। ওই সময় আমার বয়স ৪০ এর বেশি হওয়া সত্ত্বেও নিয়ম ভেঙ্গে টিআইবি আমাকে ইন্টারভিউয়ের জন্য ডাকে। টিআইবিতে তখন

ইউজিসির প্যাডে একটি চিঠি লিখে দিলেন (ইউজিসি চেয়ারম্যানের চিঠির জন্য দেখুন পরিশিষ্ট- ৬:৬)। তিনি বললেন, আপনি যদি কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে তথ্য সংগ্রহ করতে গিয়ে কোনো সহযোগিতা না পান, তাহলে সরাসরি সেখান থেকে আমাকে ফোন করবেন। এভাবে এ কাজ করতে তিনি আমাকে উৎসাহ দিয়েছিলেন।

এ কাজ চলাকালীন সময় প্রফেসর মোজাফফর আহমদ স্যারকে আমি একটি অনুরোধ করি। তাঁকে বলি স্যার, আপনি সারা জীবন আইবিএতে শিক্ষকতা করেছেন। আপনি তো শিক্ষকদের অনুভূতি বুঝতে পারেন। আমি এত কষ্ট করে যে গবেষণা করব, তা আপনারা স্পাইরাল বাইন্ডিং করে গবেষণা প্রতিবেদন আকারে সংরক্ষণ করবেন। এসব রিপোর্ট কে দেখবে? কোনো গবেষকের প্রয়োজন হলে হয়ত তিনি কালেভদ্রে এসে একবার পড়ে দেখতে পারেন। আমরা শিক্ষকরা হচ্ছি প্রকাশনার প্রতি দুর্বল। আপনারা যদি এ গবেষণাকে গ্রন্থাকারে ছাপতেন তাহলে তা বাজারে থাকত এবং আগ্রহীরা তা কিনে পড়তে পারতেন। তিনি আমার প্রস্তাবনাটি আমলে নিয়ে বললেন, দেখুন টিআইবি একটি গবেষণা প্রতিষ্ঠান, প্রকাশক নয়। বই প্রকাশ করা এর গঠনতন্ত্রবিরোধী। তবু আমি আপনার অনুভূতিটি আমলে নিচ্ছি। আমি এটি পরবর্তী ট্রাস্টি বোর্ডের মিটিংয়ে উত্থাপন করে এ ব্যাপারে সবার মতামত চাইব এবং আপনাকে পরে এ বিষয়ে জানাব। আমি স্যারের কথায় খুশি হলাম। পরে স্যার বিষয়টি ট্রাস্টি বোর্ডের মিটিংয়ে উত্থাপন করলে সকল সদস্য আমার অনুভূতিটি উপলব্ধি করতে পারলেন। সিদ্ধান্ত হল, আমার গবেষণা প্রতিবেদনটি যখন তাঁরা বিশেষজ্ঞ পাঠকদের কাছে মূল্যায়নের জন্য পাঠাবেন, তখন তাঁদের কাছে একটি বাড়তি প্রশ্ন করে জানতে চাইবেন যে এটি বই আকারে ছাপা যেতে পারে কিনা। বিশেষজ্ঞদের অধিকাংশ এটিকে বই আকারে ছাপতে বললে টিআইবি আমার অনুরোধ বিবেচনা করবে। স্যার যখন আমাকে এ রকম সিদ্ধান্তের কথা জানালেন আমি খুবই খুশি হলাম। বললাম, স্যার তাহলে প্রস্তাবিত শব্দসীমা ভেঙ্গে আমি একটু বড় করে লিখব। আমি লেখা শেষ করে জমা দেবার পর বেশ কয়েকজন বিশেষজ্ঞের কাছে আমার পাণ্ডুলিপি মূল্যায়নের জন্য পাঠানো হয়। তাদের সবার নাম হয়ত আমি বলতে পারব না। তবে অধ্যাপক মোজাফফর আহমদ, অধ্যাপক খান সরোয়ার মোরশেদ, ইউজিসি চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. এম. আসাদুজ্জামান প্রভৃতিদের নাম এদের মধ্যে ছিল। আমি যা লিখেছি তার সঙ্গে অধ্যাপক মোজাফফর আহমদ মাত্র দু'একটি পরামর্শ দিয়ে আমার বক্তব্যের সঙ্গে একমত পোষণ করেন। অন্যদের মতামত পাওয়ার পর টিআইবি থেকে বলা হয় যে, আমি তাঁদের বিপদে ফেলেছি। কারণ, প্রত্যেক বিশেষজ্ঞই আমার প্রতিবেদনটিকে গ্রন্থাকারে প্রকাশ করতে সুপারিশ করেছেন। টিআইবি একজন পেশাদার প্রকাশককে ডেকে তার সঙ্গে চুক্তি করে আমার প্রতিবেদন যৌথভাবে গ্রন্থাকারে প্রকাশ করে।[৩৪] অবশ্য এ বই প্রকাশের আগে

৩৪. মুহাম্মদ ইয়াহইয়া আখতার, *সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে দুর্নীতি: স্বরূপ ও প্রতিকার* (ঢাকা: টিআইবি ও এ এইচডিপিএইচ, ২০০৮)।

টিআইবির রীতি অনুযায়ী আমাকে এ গবেষণার ওপর ঢাকার সিডরাপ মিলনায়তনে একটি সেমিনার প্রেজেন্টেশন দিতে হয়। ওই সেমিনারে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের ৪-৫ জন ভাইস চ্যান্সেলরসহ অনেক গণ্যমান্য শিক্ষক এবং ছাত্রনেতা উপস্থিত ছিলেন। বইটি প্রকাশের পর ইতিবাচক সাড়া পাওয়া যায় এবং একাধিক পত্রিকায় এর রিভিউ প্রকাশিত হয়। *দ্য ডেইলি স্টার*-এ গ্রন্থটিকে সময়োপযোগী এবং ব্যতিক্রমী গবেষণা উল্লেখ ক'রে এর রিভিউ করেন ড. মাহফুজুল হক চৌধুরী। গ্রন্থটি আমাকে দুর্নীতি বিষয়ের পাঠক এবং গবেষকদের কাছে অধিকতর পরিচিতি দেয়।

শিক্ষার্থীদের পাশে থাকা

চার দশক সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা থেকে বুঝেছি যে একজন শিক্ষক যদি শিক্ষার্থীবান্ধব হন তবে ছাত্রছাত্রীরা তাকে শ্রদ্ধা না করে পারেন না। শিক্ষক তো ক্লাস নিবেন। এটা তো তার প্রাথমিক দায়িত্ব। কিন্তু এ ছাড়াও শিক্ষককে বিভিন্ন সময় ছাত্রছাত্রীদেরকে সময় দিতে হয়। তাদের প্রয়োজনে তাদেরকে সহায়তা করতে হয়। আমি দুঃখের সঙ্গে লক্ষ্য করেছি অনেক জুনিয়র শিক্ষক ছাত্রছাত্রীরা ছবি বা কোনো কাগজপত্র সত্যায়িত করতে এলে বিরক্ত হন। অনেকে তাদেরকে ফিরিয়ে দেন। আবার অনেকে খারাপ ব্যবহারও করেন। আমি কখনও এমন কাজ করিনি। ছাত্রছাত্রীদের জন্য রুমের দরজা খোলা রেখেছি। তারা কোনো কাজে এলে সহায়তা করেছি। ছবি বা কাগজপত্র সত্যায়িত করতে এলে কখনো বিরক্ত হইনি। ফিরিয়ে দেই নি। অন্য বিভাগের শিক্ষার্থীরাও এমন কাজে এলে তাদেরকে সহযোগিতা করেছি। সব সময় ভেবেছি, আমরা যদি ওদের সহায়তা না করি তাহলে ওরা কোথায় যাবে? তবে এর জন্য অনেক সময় শিক্ষার্থীরা বন্ধুমহলে আমার প্রশংসা করে বলে শুনেছি। আর মধ্য ২০২১ সালে তো লিখিত প্রমাণ পেয়েছি। এ মাসের ৯ তারিখে আমাদের বিভাগের চেয়ারপার্সন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে একটি বিজ্ঞপ্তি দিয়ে বিব্রত অবস্থায় পড়েন। ওই বিজ্ঞপ্তিতে তিনি লিখেন, 'এতদ্বারা রাজনীতি বিজ্ঞান বিভাগের সকল শিক্ষার্থীদের জানানো যাচ্ছে যে, শিক্ষার্থীরা এ বিভাগ সম্পর্কে কোনো মন্তব্য সামাজিক মাধ্যমে প্রকাশ করবে না। এতে বিভাগের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন হতে পারে।' শিক্ষার্থীরা এ বিজ্ঞপ্তিটির সমালোচনা শুরু করে এবং একদিনের মধ্যে হাজারো নেতিবাচক মন্তব্যে এটি ভাইরাল হয়ে যায়। বিষয়টি নিয়ে প্রথম আলোসহ বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় রিপোর্ট প্রকাশিত হলে বিষয়টি আরো ছড়িয়ে পড়ে। বিভিন্ন বিভাগের শিক্ষার্থীরা বিষয়টি জেনে এ নিয়ে নেতিবাচক মন্তব্য করে। এ সব মন্তব্য কেবল এ বিষয়ে সীমিত না থেকে শিক্ষকদের নানাবিধ ব্যবহারকেও অন্তর্ভুক্ত করে। চবি ঝুপড়ি ওয়েবসাইটে শত শত নেতিবাচক মন্তব্যের এক জায়গায় শিক্ষার্থীরা শিক্ষকদের কাছে কাগজপত্র সত্যায়িত করতে গিয়ে কেমন অভিজ্ঞতা হয়েছে তার বর্ণনা দেয়। সে সব মন্তব্যে শিক্ষকদের নেতিবাচক ব্যবহার উঠে আসে। কিন্তু এ রকম মন্তব্যের ভিড়ে সাদিয়া আফরোজ তৃণা নামের এক সাহসী শিক্ষার্থী আমার নাম উচ্চারণ করে একটি ইতিবাচক মন্তব্য

লিখে। সে বলে, 'অন্যদিকে ভর্তির সময় সত্যায়িত করতে গিয়ে আমার ডিপার্টমেন্টের ইয়াহিয়া স্যারের ব্যবহারে বেশ অবাক হইসিলাম। বেশ ভয়ে ভয়ে গেসিলাম আদৌ সত্যায়িত করে দিবে কি না। কিন্তু স্যার নিজে চেয়ার টেনে দিয়ে মুছে দিতে যাচ্ছিলো (বসানোর জন্য), চা-বিস্কুট অফার করলো। আর কথাবার্তা তো বললোই। ফেল্ট লাইক আমরা ওনার মেহমান।' উক্তিটি আমার দৃষ্টিতে আনেন প্রাণিবিদ ড. গাজী আসমত। নিজের সম্পর্কে জনৈক অপরিচিত ছাত্রীর এমন মন্তব্য দেখে খুশি হলাম। আমার কাছ থেকে ভালো ব্যবহার না পেলে এ অপরিচিত ছাত্রী নিশ্চয়ই এমন মন্তব্য লিখতো না।

ইয়ুথ ফোরাম ফর ডেমোক্রেসি-র উপদেষ্টা

সেন্টার ফর ডেভেলপমেন্ট কমিউনিকেশন (সিডিসি) এর পরিচালক বিশিষ্ট মিডিয়া ব্যক্তিত্ব মুহাম্মদ জাহাঙ্গীর ২০০৪ সালে ইয়ুথ ফোরাম ফর ডেমোক্রেসি নামে একটি প্রকল্পের কাজ শুরু করেন। এ প্রকল্পের স্পন্সর ছিল ঢাকাস্থ ব্রিটিশ কাউন্সিল। এর উদ্দেশ্য ছিল ছাত্র যুবকদের মধ্যে গণতান্ত্রিক চেতনা জাগ্রত করা। এ প্রকল্পে বিভিন্ন শিক্ষামূলক ও সমসাময়িক বিষয়ে সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে শিক্ষার্থীদের মধ্যে আলোচনা, বিতর্ক প্রভৃতি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হত। আমাকে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে এ প্রকল্পের উপদেষ্টা নিয়োগ করা হয়। এ জন্য আমার তেমন কিছু করা লাগত না। কতিপয় ছাত্রকে দিয়ে এসব অনুষ্ঠানের আয়োজন করাতাম। প্রতি মাসে একটি বা দুটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হত। আমার প্রিয় ছাত্র ইমাম হোসেন সাইদকে আমি এ ব্যাপারে দায়িত্ব বুঝিয়ে দিতাম এবং সে ব্যানার লেখা থেকে শুরু করে একটি অনুষ্ঠান করতে যা করা লাগে তার সব কিছুই নিষ্ঠার সঙ্গে করতো (এমন তিনটি অনুষ্ঠানের ব্যানারের জন্য দেখুন পরিশিষ্ট- ৬:৭)। সাংবাদিকতা বিভাগের আজিজ নামের আরেকজন ছাত্র সাইদকে সহযোগিতা করত। এভাবে ২০০৪ এবং ২০০৫ সালে কয়েক মাসের মধ্যে আমি উল্লেখযোগ্যসংখ্যক অনুষ্ঠানের আয়োজন করি। এ সব অনুষ্ঠানে আমি সভাপতিত্ব করতাম এবং অনুষদের ডিন বা সিনিয়র অধ্যাপকদের আমন্ত্রণ জানিয়ে প্রধান অতিথি করা হত। এর ফলে বিভিন্ন বিভাগের শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের মধ্যে আমার পরিচিতি বাড়ে। এতে শিক্ষার্থীরাও লাভবান হয়। শিক্ষক হিসেবে এসব একাডেমিক ও নন-একাডেমিক দায়িত্ব পালন ছাড়াও বিশ্ববিদ্যালয়, অনুষদ এবং বিভাগ কর্তৃক আয়োজিত পিকনিক, স্টাডি ট্যুর, নবীন বরণ, ছাত্র ও শিক্ষকদের বিদায় সংবর্ধনাসহ বিভিন্ন প্রকার অনুষ্ঠানে যোগদান ও দায়িত্বপালন করেছি। সাধারণ শিক্ষক হিসেবে অনেক দায়িত্ব পালনের সুযোগ না পেলেও বিভাগীয় সভাপতি থাকাকালীন (আগস্ট ২০১৫—আগস্ট ২০১৮) আমাকে অনেক গুরুত্বপূর্ণ কাজে ও অনুষ্ঠানে বিভাগীয় প্রতিনিধিত্ব করার স্বর্থে যোগ দিতে হয়েছে। সেজন্য এ সম্পর্কে পরবর্তী অধ্যায়ে বিভাগীয় সভাপতি হিসেবে আমার পারফরম্যান্স তুলে ধরব।

সাত
সভাপতির একাডেমিক দায়িত্ব পালন

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের রাজনীতিবিজ্ঞান বিভাগের সভাপতি হিসেবে আমার তিন বছর বিভাগ পরিচালনার ভঙ্গিমা ও কৌশল এ অধ্যায়ের আলোচনার বিষয়। বিশেষ করে সভাপতি সম্পাদিত একাডেমিক কর্মকাণ্ডের ওপর এ অধ্যায়ে আলোকপাত করা হবে। বিভাগীয় সভাগুলো পরিচালনা করা, পরীক্ষা দেখভাল করা, সেমিনার ও লেকচার আয়োজন করা এবং বিভাগীয় স্টাফদের কাজকর্ম ও তাদের স্বার্থ দেখভাল করার ওপর আলোচনা উপস্থাপিত হবে। এ ছাড়া নিয়োগ ও পদোন্নতিবিষয়ক কাজকর্ম সম্পাদন করা এবং ছাত্র, শিক্ষক ও কর্মকর্তা-কর্মচারীদের মধ্যে সম্প্রীতি বজায় রাখার দায়িত্ব পালনের কলাকৌশলও এ অধ্যায়ের আলোচনায় উঠে আসবে। অধ্যায়টির পাঠ একজন আগামীদিনের সভাপতিকে তার একাডেমিক কর্মকাণ্ড এবং সে সব কর্মকাণ্ড সম্পাদনে করণীয় এবং সাফল্য ও ব্যর্থতা সম্পর্কে ধারণা দেবে। ভবিষ্যতে সভাপতি হিসেবে বিভাগীয় দায়িত্ব পালনকারীগণ এ অধ্যায় থেকে একাডেমিক কর্মকাণ্ড পরিচালনার ভঙ্গিমা ও কৌশল অবগত হয়ে একজন সফল সভাপতি হবার পরোক্ষ দিকনির্দেশনা পাবেন।

সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ

সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর নিয়মানুযায়ী একজন বিভাগীয় সভাপতি তিন বছরের জন্য দায়িত্ব পালন করেন। তিন বছর পূর্ণ হলে জেষ্ঠতা অনুযায়ী বিভাগে কর্মরত পরবর্তী বরিষ্ঠ শিক্ষককে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ সভাপতির দায়িত্ব প্রদান করে। এ হিসাব অনুযায়ী আমার সভাপতি পদে আসার কথা ছিল ২০১৭ সালের জুন মাসে। কারণ ওই সময় বর্তমান সভাপতি প্রফেসর ড. ভূঁইয়া মোঃ মনোয়ার কবীরের তিন বছরের মেয়াদ শেষ হত। কিন্তু অনিবার্য কারণে তার অনেক আগেই আমাকে সভাপতির দায়িত্বভার গ্রহণ করতে হয়। কারণ, প্রফেসর মনোয়ার ব্যক্তিগত কারণ দেখিয়ে ১৭ আগস্ট, ২০১৫ তারিখে ১ বছর দেড়মাস মাস দায়িত্ব পালনের পর সভাপতির পদ থেকে পদত্যাগ করলে পরবর্তী সিনিয়র শিক্ষক হিসেবে আমার প্রতি নিয়মানুযায়ী প্রশাসনিকভাবে এ দায়িত্ব অর্পিত হয়। বিভাগের সিনিয়র শিক্ষক প্রফেসর ড. মোহাম্মদ আবদুল হাকিম, প্রফেসর ড. মুহাম্মদ শামসুদ্দীনসহ আমরা অনেকে প্রফেসর মনোয়ারকে তাঁর পদত্যাগপত্র

প্রত্যাহার করতে অনুরোধ করি। তিনি সে অনুরোধ রাখেননি। শেষ চেষ্টা হিসেবে আমি তাঁকে পদত্যাগ না করে কয়েক সপ্তাহ ছুটি নিয়ে বিশ্রাম করতে বলি এবং চাইলে ছুটির পরে পদত্যাগ করতে অনুরোধ করি। এ পরামর্শ দিয়েছিলাম এ ভেবে যে, কিছুদিন ছুটিতে বিশ্রামে থাকলে হয়ত তার সিদ্ধান্ত পরিবর্তিত হতে পারে। কিন্তু তিনি আমাদের কারো অনুরোধ না শুনে নিজ সিদ্ধান্তে অনড় থাকেন। শুনেছি মাননীয় উপাচার্য মহোদয়ও তাঁকে ফোন করেছিলেন। কিন্তু তাতেও ফল হয়নি। ফলে প্রশাসনিক নিয়মানুযায়ী বিভাগীয় সভাপতিত্বের দায়িত্ব নির্দিষ্ট সময়ের অনেক আগেই আমার ওপর অর্পিত হয়।

১৮ আগস্ট রেজিস্ট্রার অফিস থেকে আমার নামে নিয়োগপত্র আসার পর আমি যোগদান করিনি। ওইদিন ঢাকাস্থ ইলেকশন ওয়ার্কিং গ্রুপ (ইডব্লিউজি) এবং রাজনীতিবিজ্ঞান বিভাগের যৌথ উৎযোগে বিভাগে একটি পূর্ব-নির্ধারিত সেমিনার অনুষ্ঠান ছিল। উপাচার্য মহোদয় ওই সেমিনারের উদ্বোধনী বক্তব্য দেবার আগে আমাকে চেয়ারম্যান হিসাবে সম্বোধন করবেন কিনা জিজ্ঞেস করলে আমি তাকে বলি, আমি এখনও সভাপতি হিসাবে যোগদান করিনি। ভিসি সাহেব বলেন, আমি তো গতকালই চিঠি পাঠিয়ে দিয়েছি। আমি বললাম, আচ্ছা স্যার, আমি সেমিনারের পর যোগদান করব। পরে সেমিনার শেষে আমি ২০১৫ সালের ১৮ আগস্ট অপরাহ্নে রাজনীতিবিজ্ঞান বিভাগের ১৬তম সভাপতি হিসাবে যোগদান করি। একজন নতুন সভাপতি বিভাগের দায়িত্ব নিলে, বা একজন সভাপতি দায়িত্ব শেষ করলে সাবেক সভাপতিকে বিদায় এবং নতুন সভাপতিকে স্বাগত জানাবার প্রচলিত রেওয়াজ আমার সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণকালে পালিত হয়নি। কারণ, একটি অস্বাভাবিক পরিবেশ ও পরিস্থিতিতে দায়িত্ব গ্রহণ করায় শিক্ষকদের কেউই এমন অনুষ্ঠান করার তাগিদ অনুভব করেননি।

প্রাথমিক অসুবিধা

বিভাগীয় দায়িত্ব নিয়ে আমি প্রথম যে অসুবিধায় পড়ি তা হলো ড. মনোয়ার কেবল বিভাগীয় সভাপতির পদ থেকেই পদত্যাগ করেননি; তিনি আরও অনেক পদ থেকে ইস্তফা দেন। এর মধ্যে বিভিন্ন পরীক্ষা কমিটি ছাড়াও ছিল বিভাগের সেলফ্ অ্যাসেসমেন্ট কমিটি (এসএসি)-র সভাপতির পদ, ইডব্লিউজি-র কর্মকাণ্ড পরিচালনা করার জন্য গঠিত কমিটির সভাপতি পদ, প্রভৃতি। আমি ড. মনোয়ারকে ওইসব কমিটিগুলো থেকে অন্তত পদত্যাগ না করার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করলে তিনি সে অনুরোধ রাখতেও অপারগতা প্রকাশ করেন। ফলে আমার ওপর এ সব কমিটির কাজ পরিচালনার বাড়তি দায়িত্ব এসে পড়ায় আমার ব্যস্ততা বৃদ্ধি পায়। আমি বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকতা জীবনে জাতীয় দলীয় রাজনীতির লেজুড়বৃত্তিভিত্তিক বর্ণদলীয় শিক্ষক রাজনীতিতে কখনো যুক্ত ছিলাম না। কখনো কোনো বর্ণদলে নাম লেখাইনি। কোনো দলের হয়ে কোনো নির্বাচনে দাঁড়াইনি, বা কখনো শিক্ষক দলগুলোর কোনো সভায়ও যোগ দেইনি। বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনো

বিধিবদ্ধ পর্ষদ বা অন্য কোনো পদে কখনো কোনো দায়িত্ব পালন না করায় বিশ্ববিদ্যালয়ের অভ্যন্তরীণ প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে আমার অভিজ্ঞতা ছিল কম। আমার অভিজ্ঞতা ছিল কেবলমাত্র শ্রেণিকক্ষে পাঠদানের মধ্যে সীমায়িত। এ জন্য বিভাগ পরিচালনায় কোনো সমস্যার সম্মুখীন হলে আমাকে ভালো করে জেনেশুনে সিদ্ধান্ত নিতে হত। বিভাগের প্রথম একাডেমিক সভায় আমি সকল সহকর্মীকে আমার এ সীমাবদ্ধতার বিষয়ে অবহিত করে বিভাগ পরিচালনায় সহযোগিতা চাইলে সবাই আমাকে সহযোগিতা প্রদানে সম্মত হন। এ কারণে বিভাগ পরিচালনায় খুব একটা অসুবিধা হয়নি। কারণ, বিভাগের প্রায় সকল শিক্ষক আমাকে সহযোগিতার ব্যাপারে আন্তরিক ছিলেন। তাছাড়া বিভাগীয় কর্মকর্তা কর্মচারীগণ ছিলেন আন্তরিক, সৎ এবং সহযোগী। তাঁরা আমাকে বিভাগ পরিচালনায় সার্বিক সহযোগিতা প্রদানের আশ্বাস প্রদান করেন। বিশেষ করে অফিসপ্রধান সিনিয়র ডেপুটি রেজিস্ট্রার জনাব নুরুল হক চৌধুরী বিভাগীয় কাজকর্ম সম্পাদনের কাজে দক্ষ ও সৎ হওয়ায় আমার পক্ষে বিভাগ পরিচালনায় বিশেষ সুবিধা হয়।

এ ক্ষেত্রে নুরুল হক সাহেবের কথা পৃথকভাবে উল্লেখ করা প্রয়োজন। চার দশকে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে বিভিন্ন সময় অনেক কর্মকর্তার সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছে। এদের মধ্যে যোগ্যতা, অভিজ্ঞতা, বিশ্বস্ততা ও পেশাদারিত্বের দিক থেকে হক সাহেবের মতো কর্মকর্তা আমি কমই পেয়েছি। বিভাগীয় সভাপতিত্বকালে তিন বছরে সে বিষয়টি নতুন করে অনুধাবন করেছি। কেবল সভাপতি বা শিক্ষকদের বেলায় নয়, শিক্ষার্থীদের সঙ্গেও তিনি ভালো আচরণ করতেন। অন্য দু'একজন কর্মকর্তার বিরুদ্ধে শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে অভিযোগ পেলেও হক সাহেবের বেলায় সেটা ঘটেনি। শিক্ষক-শিক্ষার্থী নির্বিশেষে তিনি সবার কাজ করে দিতেন। বিশেষ করে প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের সমস্যা সমাধানে তাঁর এবং আমাদের অন্য কর্মকর্তাদের আন্তরিকতা ছিল খুব বেশি। বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবর্তনশীল নিয়মকানুন সম্পর্কে হক সাহেব ভালো জানতেন। আমি নিজেও অনেক সময় এসব বিষয়ে তার সঙ্গে আলাপ করে জেনে নিতাম। তবে আমি কোনো বিধি সম্পর্কে জানতে চাইলে তিনি প্রথমে সে বিষয়ে আমাকে বলতেন। তারপর কয়েক মিনিটের মধ্যেই সংশ্লিষ্ট ব্যাখ্যার সমর্থনে বিশ্ববিদ্যালয়ের লিখিত বিধান আমাকে দেখাতেন। তার ব্যক্তিগত সততা, প্রয়োজনীয় যোগ্যতা এবং অন্যান্য বিষয় সম্পর্কে না বলে এক কথায় বলা যায়, একজন পেশাদার অফিস সেক্রেটারি হবার জন্য যেসব গুণাবলি থাকা দরকার তার প্রায় সবই ছিল নুরুল হকের মধ্যে। কাজেই সভাপতির দায়িত্বগ্রহণের পর এমন একজন অফিসপ্রধান পাওয়ায় আমার পক্ষে কাজ করা সহজ হয়। বিভাগীয় অন্য স্টাফরাও শিক্ষার্থীবান্ধব এবং নিজ নিজ কাজের প্রতি আন্তরিক থেকে আমাকে সহযোগিতা করেছেন। (কর্মরত নুরুল হকের ছবির জন্য দেখুন পরিশিষ্ট- ৭:১)।

সভাপতির পদত্যাগ, একটি সেমিনার ও ইউজিসি চেয়ারম্যানের প্রবন্ধ

বিভাগের ২৮৪তম সভাটি ছিল প্রফেসর মনোয়ারের শেষ একাডেমিক কমিটির সভা। এ সভায় যে সব বিষয় আলোচনা হয় সেগুলি ছিল রুটিন কাজ। বিভাগের সেলফ অ্যাসেসমেন্ট প্রোগ্রাম পরিচালনার জন্য কমিটি গঠন, ২০১৫-১৬ ও ২০১৬-২০১৭ শিক্ষাবর্ষের যথাক্রমে বিএসএস স্নাতক সম্মান ও স্নাতকোত্তর শ্রেণির পাঠ্যক্রম প্রণয়ন কমিটি গঠন, বিভাগীয় ক্রয় কমিটি পুনর্গঠন, বিভাগীয় বৃত্তি কমিটি গঠনসহ আরো কতিপয় বিষয়ে এ সভায় সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। তবে সভাটি শেষ হলে প্রফেসর ড. মাহফুজুল হক চৌধুরী 'বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশ' বিষয়ে বিভাগে একটি সেমিনার প্রদানে আগ্রহ প্রকাশ করলে সভাপতি সেটি করার ব্যাপারে তাঁকে আশ্বস্ত করেন। সেমিনারটি কিভাবে হবে এ বিষয়ে তিনি একটি মিটিংয়ে আলোচনা করে সেমিনারটি করতে চান। পরবর্তীতে ড. কবীর ও ড. চৌধুরীর মধ্যে এ বিষয়ে টেলিফোনে আলাপ হয়। ড. চৌধুরী ড. মনোয়ারকে ১৬ আগস্ট তারিখে একটি ব্যক্তিগত ই-মেইল বার্তায় প্রস্তাবিত সেমিনারের দু'টি সম্ভাব্য শিরোনাম ('একজন রাজনৈতিক নেতা ও রাষ্ট্রনায়ক হিসেবে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান', অথবা, 'বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান: একজন রাজনৈতিক নেতা ও রাষ্ট্রনায়ক') এবং তারিখ (২৫, ২৭, ২৯ বা ৩১ আগস্ট, ২০১৫) জানান। তিনি সেমিনারটিকে একটি উন্মুক্ত সেমিনার হিসেবে আয়োজন করে এ জন্য একটি আমন্ত্রণপত্র সকল বিভাগ এবং সংশ্লিষ্ট অফিসে প্রেরণ করতে বলেন। এ পত্রে ভিসি ও ডিনদের দাওয়াতে আপত্তি না জানালেও প্রফেসর চৌধুরী বলেন, এ সেমিনারে তিনি কোনো প্রধান অতিথি বা বিশেষ অতিথি পছন্দ করবেন না। তিনি চান বিভাগীয় চেয়ারম্যানের সভাপতিত্বে তিনি এক ঘন্টা বক্তব্য উপস্থাপন করবেন যার পর আধঘন্টার একটি প্রশ্নোত্তর সেশন চলবে। কোনো উন্মুক্ত আলোচনা হবে না। এর পরদিনই প্রফেসর মনোয়োর বিভাগীয় সভাপতির পদ থেকে অব্যাহতি নেন।

প্রফেসর মনোয়ার ব্যক্তিগত কারণ দেখিয়ে দায়িত্ব গ্রহণের ১ বছর দেড়মাস পর পদত্যাগ করলেও তাঁর পদত্যাগের প্রকৃত কারণ সে রকম ছিল বলে প্রতীয়মান হয় না। কোন্ কারণে তিনি পদত্যাগ করেন সে বিষয়ে তিনিই ভালো জানবেন। তবে এ বিষয়ে আমরা নিশ্চিত করে কিছু না বলতে পারলেও বিভাগীয় কিছু ঘটনা এ প্রসঙ্গে বিশ্লেষণ করতে পারি। যেভাবে প্রফেসর চৌধুরী প্রফেসর মনোয়ারকে ই-মেইলে সেমিনার আয়োজনে পরামর্শ দিয়েছিলেন, সেভাবে সেমিনার করতে গেলে হয়ত তিনি কিছুটা বেকায়দায় পড়তেন। কারণ, প্রফেসর চৌধুরী তার সেমিনারে কোনো প্রধান বা বিশেষ অতিথি চাননি, আবার তাকে ভিসিকে দাওয়াত করার কথাও বলেছেন। এমনটা করলে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুষ্ঠানপ্রিয় ভিসি ড. ইফতেখার উদ্দিন চৌধুরী বিষয়টি স্বাভাবিকভাবে নিতেন বলে মনে হয় না। আবার বঙ্গবন্ধুর ওপরে সেমিনার করে সে সেমিনারে ভিসিকে দাওয়াত দেয়া এড়িয়ে গেলে ভিসি ব্যাপারটি জানলে মনক্ষুণ্ন হতেন। তবে এ

বিষয়ে খোলা মনে প্রফেসর চৌধুরীর সঙ্গে পরে তিনি বিষয়টি আলোচনা করে ফয়সালা করে নিতে পারতেন। প্রফেসর চৌধুরীকে আমি যতটা জানি তাতে দেখেছি, অনেক সময় তাঁকে যুক্তি দিয়ে বুঝানো হলে তিনি নিজ সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করেন। প্রফেসর মনোয়ার তেমন কোনো উদ্যোগ নিয়েছিলেন কিনা সে বিষয়ে আমি জানতে পারিনি। তবে প্রফেসর চৌধুরীর ই-মেইল বার্তাটি পাবার পরদিন (১৭-০৮-২০১৫) ড. মনোয়ার পদত্যাগ করেন। একই দিন তিনি দায়িত্ব পালনকালে তাকে সহযোগিতার জন্য কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন এবং দায়িত্বে থাকাকালে তার নিজ ভুল-ত্রুটি ও সীমাবদ্ধতার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে সকল সহকর্মীর মাঝে একটি ব্যক্তিগত চিঠি বিতরণ করেন। তাঁর চিঠির ভাষা ও লিখনভঙ্গিমা বিশ্লেষণ করলে বুঝতে অসুবিধা হয় না যে তিনি চিঠিটি আবেগপ্রবণ হয়ে ব্যস্ত হাতে লিখেছেন (ড. মনোয়ারের চিঠির জন্য দেখুন পরিশিষ্ট- ৭:২)। ড. মনোয়ারের পদত্যাগ অনেকের কাছে রহস্যাবৃত মনে হলেও চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক ভিসি ও মাননীয় ইউজিসি চেয়ারম্যান অধ্যাপক আবদুল মান্নান সভাপতি মনোয়ারের সাহসের অভাবকেই তাঁর পদত্যাগের কারণ হিসেবে তাঁর লেখা একটি প্রবন্ধে উল্লেখ করেন।[৩৫]

বিভাগীয় চেয়ারম্যান পদে যোগদানের দু'দিন পর প্রফেসর চৌধুরী আমাকে বলেন, 'চেয়ারম্যান সাহেব তুমি এবার আমার সেমিনার আয়োজন করো।' আমি তাঁকে আশ্বস্ত করে বলি, নিশ্চয়ই করব। তবে বিষয়টি নিয়ে বিভাগীয় একাডেমিক কমিটিতে আলোচনা করে সবার পরামর্শ ও সহযোগিতা নিয়ে সুন্দরভাবে আপনার প্রস্তাবিত সেমিনারটি করব। এতে তিনি নাখোশ হয়ে বলেন, আবার মিটিং লাগবে কেন? মনোয়ারের সঙ্গে আগে আমার কথা হয়েছে এবং একবার তো বিষয়টি মিটিং-এ আলোচনা করা হয়েছে। আমি বললাম, না বিষয়টি মিটিং-এ আলোচনা হয়নি। আমি সঙ্গে সঙ্গে বিভাগীয় অফিস থেকে ১২ আগস্ট, ২০১৫ তারিখে অনুষ্ঠিত একাডেমিক কমিটির ২৮৪তম সাধারণ সভার কাযবিবরণী সংগ্রহ করে মনোযোগ দিয়ে পড়ে দেখলাম আমার বক্তব্য ঠিক আছে। ওই কার্যবিবরণীতে সেমিনার অনুষ্ঠান সম্পর্কিত কোন সিদ্ধান্ত ছিল না।

পরবর্তীতে আমি বিভাগীয় একাডেমিক কমিটির ২৮৬তম সভার বিবিধ আলোচনায় প্রফেসর মাহফুজুল হক চৌধুরী প্রস্তাবিত সেমিনারের বিষয়টি উত্থাপন করলে এ বিষয়ে কেউ আপত্তি করেননি। ফলে প্রস্তাবিত সেমিনারটি আয়োজনের জন্য একাডেমিক কমিটি সহযোগী অধ্যাপক জনাব মোহাম্মদ আলম চৌধুরী, সহকারী অধ্যাপক জনাব এ জি এম নিয়াজ উদ্দীন ও জনাব মোঃ বখতেয়ার উদ্দিন-এর সমন্বয়ে ৩ সদস্যবিশিষ্ট একটি কমিটি গঠন করে দেয়। এ কমিটি ৩১

---

৩৫. দেখুন, আবদুল মান্নান, 'বিশ্ববিদালয়ে গবেষণার নামে আবর্জনা কেন', *কালের কণ্ঠ*, ২১ সেপ্টেম্বর, ২০১৫।

আগস্ট, ২০১৫ তারিখে সমাজ বিজ্ঞান অনুষদ ভবনের ২০৬ নম্বর কক্ষে বিভাগীয় চেয়ারম্যানকে সভাপতি এবং মাননীয় ভাইস চ্যান্সেলরকে প্রধান অতিথি করে এ সেমিনারটি সুন্দরভাবে আয়োজন করে। পরবর্তীতে একাডেমিক কমিটির সভায় এ সেমিনারের আয়োজক কমিটি এবং সেমিনার উপস্থাপক প্রফেসর ড. মাহফুজুল হক চৌধুরীকে আনুষ্ঠানিকভাবে ধন্যবাদ দেয়া হয়।

অধ্যাপক মনোয়ারের পদত্যাগের মাসাধিককাল পর ২১ সেপ্টেম্বর তারিখে ইউজিসি চেয়ারম্যান অধ্যাপক আবদুল মান্নান *কালের কণ্ঠ* পত্রিকায় গবেষক ও বিশ্লেষক পরিচয়ে 'বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণার নামে আবর্জনা কেন' শিরোনামে একটি প্রবন্ধ লিখেন। প্রবন্ধটিতে তিনি রাজনীতিবিজ্ঞান বিভাগের একজন অধ্যাপকের লেখা *বাংলাদেশে ইসলামী রাজনীতির তিন দশক (১৯৭১-২০০০)* শিরোনামের একটি প্রকাশিত গ্রন্থের মূল্যায়ন করেন। কিন্তু আলোচ্য প্রবন্ধে গ্রন্থ মূল্যায়নের নামে প্রাবন্ধিক চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের অতীত রাজনীতির বিশ্লেষণ করে ওই সময়ের রাজনীতিতে গ্রন্থকারের নেতিবাচক ভূমিকা তুলে ধরেন। আলোচ্য গ্রন্থের মূল্যায়ন করতে গিয়ে অধ্যাপক মান্নান বলেন, লেখক আলোচ্য গ্রন্থে বাংলাদেশের ইতিহাস নিয়ে কটাক্ষ করেছেন এবং গ্রন্থের পাতায় পাতায় পরোক্ষভাবে মওদুদিবাদ প্রতিষ্ঠার ওকালতি করেছেন।[৩৬] একটি প্রবন্ধে কোনো প্রকাশিত গ্রন্থের সমালোচনা করার অধিকার অবশ্যই কোনো লেখকের আছে। তবে সে মূল্যায়নে অযাচিতভাবে একটি বিভাগের সভাপতির পদত্যাগকেন্দ্রিক অভ্যন্তরীণ বিষয়াদি আলোচনায় আনার প্রাসঙ্গিকতা নিয়ে প্রশ্ন করা যায়। আর সে বর্ণনায় যদি সত্য বিকৃত হয়, তাহলে তো তাতে অনেকেরই মনঃক্ষুণ্ন হবার কথা। গ্রন্থ মূল্যায়ন দিয়ে লেখা শুরু করে প্রাবন্ধিক যখন হঠাৎ করে তাঁর প্রবন্ধের দ্বিতীয় প্যারায় এসে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের রাজনীতিবিজ্ঞান বিভাগ সম্পর্কে বলেন,

> একজন গবেষক-অধ্যাপক বিভাগীয় একাডেমিক কমিটির সভায় প্রস্তাব রাখেন, তিনি শোকের মাস আগস্ট উপলক্ষে বিভাগীয় ছাত্রছাত্রীদের উদ্দেশ্যে 'বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশ' বিষয়ে একটি সেমিনার দিতে চান। কোনো বিরোধিতা ছাড়া তা পাস হল। সভা শেষে জামায়াত-বিএনপিপন্থি দু'জন শিক্ষক সভাপতিকে এসে বললেন, তাঁরাও 'গোলাম আযম ও ইসলাম' এবং 'জিয়া ও গণতন্ত্র'-এর ওপর সেমিনার দিতে চান। সভাপতি কিছু না বলে তাঁর পদ থেকে ইস্তফা দেওয়া সমীচীন মনে করেন। একজন সভাপতি যদি এ রকমের ফন্দিসর্বস্ব চাপ সহ্য করতে না পারেন, তাহলে প্রথমেই তাঁদের ওই পদ গ্রহণ করা উচিত নয়। বিশ্ববিদ্যালয়ে বিভাগের সভাপতি, অনুষদের ডিন, বা উপাচার্য হতে হলে একটু সাহস ও নৈতিক মনোবলের প্রয়োজন।[৩৭]

৩৬. *পূর্বোক্ত*।
৩৭. দেখুন, আবদুল মান্নান, 'বিশ্ববিদালয়ে গবেষণার নামে আবর্জনা কেন', *প্রাগুক্ত*।

প্রাবন্ধিকের এ বক্তব্য সত্যাশ্রিত ছিল না। উল্লিখিত একাডেমিক কমিটির সভা চলাকালীন প্রফেসর চৌধুরী সেমিনার দেবার সম্পর্কে আলোচনা করেননি এবং কোনো জামায়াত বা বিএনপিপন্থি শিক্ষকও 'গোলাম আযম ও ইসলাম' এবং 'জিয়া ও গণতন্ত্র'-বিষয়ে সেমিনার দিতে চাননি। অধ্যাপক মান্নান হয়ত তার কোনো ঘনিষ্ঠভাজন শিক্ষকের কথা বিশ্বাস করে এমনটি লিখে থাকতে পারেন। বিষয়টি সম্পর্কে বিভাগীয় সভাপতি বা সিনিয়র শিক্ষকবৃন্দের সঙ্গে আলাপ করে জেনে নিলে তিনি এমনটি লিখতেন না। *কালের কণ্ঠ* পত্রিকার এ লেখাটির প্রতি রাজনীতিবিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষকদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয় এবং এদের দু'একজন আমাকে এ বিষয়টি পরবর্তী একাডেমিক কমিটির সভায় এজেন্ডাভুক্ত করতে পরামর্শ দেন। আমি নিজেও প্রবন্ধটি পাঠ করে হতাশ হই এবং ভাবি, ইউজিসি চেয়ারম্যান-এর মতো পদে থেকে এমন বিষয়ে প্রবন্ধ লেখার আগে অধ্যাপক মান্নানের অধিকতর অনুসন্ধানী ও সতর্ক হওয়া উচিত ছিল। আমি বিষয়টি নিয়ে হোমওয়ার্ক করি। বিষয়টি মিটিংয়ের এজেন্ডাভুক্ত না করে বিবিধ-তে আলোচনা করব বলে ভেবে রাখি এবং পরবর্তী মিটিংয়ে যাবার আগে প্রবন্ধটির একটি প্রিন্টআউট সঙ্গে রাখি।

কতিপয় সিনিয়র শিক্ষক ১২ অক্টোবর, ২০১৫ তারিখে অনুষ্ঠিত বিভাগীয় একাডেমিক কমিটির ২৮৭তম সাধারণ সভার শুরুতে পূববর্তী ২৮৬তম একাডেমিক কমিটির সাধারণ সভার কার্যবিবরণী নিশ্চয়নের প্রসঙ্গ উত্থাপিত হয়। ওই কার্যবিবরণীর বিবিধ বিষয়ের ১ নম্বর সিদ্ধান্তের সূত্র ধরে *কালের কণ্ঠ* পত্রিকায় উপসম্পাদকীয় কলামে অধ্যাপক আবদুল মান্নানের লেখা আলোচ্য প্রবন্ধটির রাজনীতিবিজ্ঞান বিভাগের একাডেমিক কমিটির সংশ্লিষ্ট অংশ নিয়ে প্রফেসর ড. আ ন ম মুনীর আহমদ আলোচনার সূত্রপাত করলে বিষয়টি নিয়ে সভায় বিস্তারিত আলোচনা হয়।[৩৮] এ আলোচনায় একাডেমিক কমিটির কতিপয় সিনিয়র সদস্য অংশগ্রহণ করেন। তাঁরা বলেন, আলোচ্য প্রবন্ধে উপস্থাপিত পূর্ববর্তী একাডেমিক কমিটিতে গৃহীত যে কতিপয় সিদ্ধান্তের উল্লেখ করা হয়েছে তা সঠিক নয়। পরে একাধিক সিনিয়র সহকর্মী লেখাটির সমালোচনা করে ২৮৭তম সভায় ওই লেখাটির কেবলমাত্র বিভাগীয় একাডেমিক কমিটির কার্যক্রমের সঙ্গে সম্পর্কিত

৩৮. বিভাগীয় একাডেমিক কমিটির ২৮৬তম সাধারণ সভার কার্যবিবরণীর ১ নম্বর সিদ্ধান্তঃ '০১। প্রফেসর ড. মাহফুজুল হক চৌধুরী 'বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানঃ একজন রাজনৈতিক নেতা ও একজন রাষ্ট্রনায়ক' (Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman: A Political Leader and a Statesman) বিষয়ের উপর একটি সেমিনার প্রদানে আগ্রহ প্রকাশ করায় প্রস্তাবিত সেমিনার আয়োজনের লক্ষ্যে নিম্নরূপে একটি কমিটি গঠন করা হলো। আহ্বায়কঃ জনাব মোহাম্মদ আলম চৌধুরী, সহযোগী অধ্যাপক; সদস্যবৃন্দঃ জনাব এ জি এম নিয়াজ উদ্দিন, সহকারী অধ্যাপক, জনাব মোঃ বখতেয়ার উদ্দিন, সহকারী অধ্যাপক।'

বিষয়গুলো আলোচনান্তে গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ ২৮৭তম একাডেমিক কমিটির সাধারণ সভার কার্যবিবরণীর ১-এর (খ) সিদ্ধান্তে সন্নিবেশিত করা হয় (২৮৭তম সভার কার্যবিবরণীর ১-এর (খ) সিদ্ধান্তের জন্য দেখুন পরিশিষ্ট- ৭:৩)। একাডেমিক কমিটি সদস্যগণ আলোচ্য ইস্যুটি সম্পর্কে প্রকৃত সত্য জানাবার স্বার্থে কমিটির ২৮৭তম সাধারণ সভার কার্যবিবরণীর একপ্রস্থ প্রয়োজনীয় কাগজপত্রের সঙ্গে ইউজিসি চেয়ারম্যানকে প্রেরণ করতে বিভাগীয় সভাপতিকে অনুরোধ করেন। আমি বিভাগীয় সভাপতি হিসেবে একাডেমিক কমিটির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী মাননীয় ইউজিসি চেয়ারম্যানকে প্রকৃত সত্য জানাবার স্বার্থে একাডেমিক কমিটির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী প্রয়োজনীয় কাগজপত্রসহ গ্যারান্টিযুক্ত দ্রুত ডাক সার্ভিসযোগে ১৩ অক্টোবর, ২০১৫ তারিখে প্রেরণ করি। কয়েকদিন পর বিভাগীয় সভাপতি বরাবর ১৭-১০-২০১৫ তারিখে অধ্যাপক মাহফুজুল হক চৌধুরী দরখাস্ত করে ২৮৭তম একাডেমিক সভার প্রচারিত কার্যবিবরণীর ১ (খ) এর (২) সিদ্ধান্তটি অসত্য দাবি করে সেটি সংশোধনের জন্য বলেন। কিন্তু ২৮৬তম সভা শেষ হয়ে যাবার পর তিনি সেমিনারের বিষয়টি তদানীন্তন সভাপতির কাছে উত্থাপন করায় এবং ঐ একাডেমিক কমিটি সভার কার্যবিবরণীতে এ বিষয়টি লিপিবদ্ধ না থাকায় এ বিষয়টি আমলে নেয়া যায়নি। পরে ১৮-০১-২০১৬ তারিখে অনুষ্ঠিত একাডেমিক কমিটির ২৮৮তম সাধারণ সভার শুরুতে অসংশোধিত অবস্থায় ২৮৭তম সভার কার্যাবলী নিশ্চয়নে কেউ আপত্তি করেননি।

ইনভেজিলেশন, লাঞ্চ ও পরীক্ষা সমস্যা

আমি ২০১৫ সালের মধ্য আগস্টে বিভাগীয় চেয়ারম্যানের দায়িত্ব গ্রহণের পর তৃতীয় বর্ষ বিএসএস সম্মান পরীক্ষা ২০১৪ অনুষ্ঠিত হয়। সেপ্টেম্বর এবং অক্টোবর মাস জুড়ে এ পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হওয়ার সময় আমি কিছু সমস্যার সম্মুখীন হই। এ পরীক্ষার প্রধান পরিদর্শক ছিলেন প্রফেসর ড. মুস্তাফিজুর রহমান সিদ্দিকী, যিনি নিজেই ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষাসমূহের নিয়ন্ত্রক। ড. মুস্তাফিজ পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক অফিসের ব্যস্ততার কারণে বিভাগীয় পরীক্ষার অনেক দায়িত্ব আমার ওপর ছেড়ে দিতে চাইতেন। এ পরীক্ষার একজন ছাত্র জেলখানায় থেকে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে। নিয়মানুযায়ী জেলখানায় পরীক্ষার্থী থাকলে আমরা দুজন শিক্ষক ইনভিজিলেটরকে গাড়ি দিয়ে পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক অফিসের চিঠি, প্রশ্ন, খাতা ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় সামগ্রীসহ জেলখানায় পরীক্ষা গ্রহণ করার জন্য প্রেরণ করি। জেলখানায় পরীক্ষাগ্রহণ করার কাজটি অনেকের কাছে বিরক্তিকর লাগে। সে কারণে অনেক শিক্ষকই জেলখানায় যেতে অনীহা পোষণ করেন। আমি এ কাজে জুনিয়র শিক্ষকদেরকে রাজি করাতে বেশ কিছু কৌশল অবলম্বন করি। পরীক্ষায় ইনভিজিলেশনের সম্মানী ভালো হওয়ায় জুনিয়র শিক্ষকগণ পরীক্ষায় ইভিজিলেশন দিতে অনীহা পোষণ করেন না। যেহেতু বিশ্ববিদ্যালয়ে ইনভিজিলেশন ডিউটির সম্মানী এবং জেলখানায় প্রদত্ত ইনভিজিলেশন ডিউটি দেবার সম্মানীর মধ্যে

ব্যবধান নেই, সে কারণে যেসব জুনিয়র শিক্ষকের বিশ্ববিদ্যালয়ে ইভিজিলেশন ডিউটি থাকে, তাদেরকে জেলখানায় ডিউটিতে যেতে বললে তারা অনীহা পোষণ করেন। এ জন্য আমি প্রথমেই লক্ষ্য করতাম যে পরীক্ষার দিন কোন্ কোন্ জুনিয়র শিক্ষকের ইনভিজিলেশন ডিউটি নেই। এমন জুনিয়র শিক্ষকদরকে চিহ্নিত করে জেলখানায় পরীক্ষার ডিউটি করতে বললে তারা এ কাজে রাজি হতেন। এ প্রক্রিয়া কাজ করছিল। তবে সে ক্ষেত্রেও পরবর্তীতে কিছু জুনিয়র শিক্ষক ইনভিজিলেশন ডিউটি না থাকা সত্ত্বেও জেলখানায় ডিউটি করতে অপারগতা প্রকাশ করলে আমি এর কারণ খুঁজতে চেষ্টা করি। পরে অনুধাবন করি, সব জুনিয়র শিক্ষকদের মধ্যকার পারস্পরিক সম্পর্ক এক রকম নয়। অনেক শিক্ষক বিশেষ বিশেষ শিক্ষকের সঙ্গে জেলখানায় ডিউটি করতে যেতে রাজি হতে চান না। আমি চেষ্টা করে কোন্ কোন্ জুনিয়র শিক্ষকের সঙ্গে কোন্ কোন্ জুনিয়র শিক্ষকের সম্পর্ক কেমন সে বিষয়টি নির্ণয়ে কাজ করি। এরপর পারস্পরিক সুসম্পর্ক আছে এমন দু'জন জুনিয়র শিক্ষককে জেলখানায় ইনভিজিলেশন ডিউটিতে যেতে বললে তারা রাজি হন এবং পরবর্তীতে এ কৌশল কাজ করে। এ ভাবে আমি এ সমস্যা সমাধানে সক্ষম হই।

পরীক্ষায় ইনভিজিলেশন নিয়ে আমাকে আরেকটি সমস্যা মোকাবিলা করতে হয়। সমস্যাটি ছিল আমার জন্য ব্রিবতকর। সে সম্পর্কে বলার আগে বলে নেয়া দরকার, যেহেতু পরীক্ষা শেষ করে শিক্ষকদের বাসায় যেতে দেরি হয়, সে কারণে রাজনীতিবিজ্ঞান বিভাগে পরীক্ষার দিন ইনভেজিলেটর শিক্ষকদের জন্য বিভাগের পক্ষ থেকে মধ্যাহ্নভোজের ব্যবস্থা করা হয়। পরীক্ষা পরিদর্শনের কাজটি রেমুনারেটিভ। সে কারণে অনেক বিভাগে শিক্ষকদেরকে নিজের টাকায় দুপুরের লাঞ্চ খেতে হয়। আমাদের বিভাগের ইনভিজিলেটর শিক্ষকগণ বিভাগীয় খাবার খেতেন। বিভাগ প্রদত্ত এই খাবারে মাছ, মাংশ, ডিম, সবজি ও ডাল থাকায় অনেকে সব খাবার খেতে পারতেন না। অপচয়ের কথা চিন্তা করে পরে বিভাগ থেকে মাছ বা মাংশ এ দুটির একটি বাদ দিয়ে খাবার অর্ডার করা হত। এতে শিক্ষকগণ আপত্তি করেননি। তবে বিভাগীয় একজন সিনিয়র শিক্ষক আমার সভাপতিত্বকালে লাঞ্চের মুরগির মাংশ নিয়ে আপত্তি করা শুরু করেন। উল্লেখ্য, অনুষদ লাউঞ্জে সাধারণত ব্রয়লার মুরগির মাংস রান্না করা হয়। এই সিনিয়র শিক্ষক পরীক্ষার দিন এ নিয়ে আপত্তি করেন। তিনি লাউঞ্জে খাবার সময় বেয়ারাদের বলেন, 'আমি ব্রয়লার মুরগির মাংস খেতে পারি না। আমার জন্য কক বা সোনালি মুরগির মাংশ হলে ভালো হয়।' কিন্তু ওদের পক্ষে একজনের জন্য সেটা করা সম্ভব হত না। তাছাড়া বিভাগের পক্ষ থেকে অর্ডার না থাকলে তারা তা করবেই বা কেন? ফলে তিনি খেতে বসে সিন ক্রিয়েট করতেন। বিষয়টি আমার কানে আসলে প্রথমে আমি না শোনার ভান করি। ভাবি, তিনি হয়ত পরের পরীক্ষায় আর এমনটি করবেন না। কিন্তু তা হয়নি। এ নিয়ে শিক্ষক লাউঞ্জে হাসাহাসি হয়েছে। ওই শিক্ষকের জন্য বেয়ারাদের অনেক সময় বিব্রতকর অবস্থায়

পড়তে হয়েছে। আবার বিভাগের পক্ষেও তার একার জন্য ভিন্ন প্রজাতির মুরগির মাংশ অর্ডার করা বিবেচনাপ্রসূত মনে হয়নি। এ ব্যাপারে সভাপতিকেও অনেক সময় দায়ী করা হতে থাকে। আমি সবার অনুমতি না নিয়ে তার একার জন্য ভিন্ন মুরগির মাংশ অর্ডার দেয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিনি। এজন্য এক পর্যায়ে আমি বিষয়টি একাডেমিক কমিটির সভায় আলোচনার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি। পরে ২৪-১২-২০১৭ তারিখে অনুষ্ঠিত একাডেমিক কমিটির ৩১৫তম সাধারণ সভার বিবিধ বিষয়ের আলোচনায় এ বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করলে পরীক্ষার দিন সকলের জন্য অনুষদ লাউঞ্জে পরিবেশিত স্বাভাবিক মধ্যাহ্নভোজের ব্যবস্থা বহাল রাখার সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।

আমি ২০১৪ সালের এমএসএস পরীক্ষা কমিটির সদস্য হিসেবে কাজ করি। এ কমিটির সভাপতি ছিলেন প্রফেসর ড. মাহফুজুল হক চৌধুরী এবং সদস্য আমি এবং প্রফেসর ড. আনোয়ারা বেগম। ২০১৫ সালের ৭ ডিসেম্বর থেকে পরীক্ষা শুরু হবার কথা থাকলেও দুয়েকজন শিক্ষকের কোর্স শেষ না হওয়ায় তারা পরীক্ষাটি কিছুদিনের জন্য পিছিয়ে দেবার পরামর্শ দেন। ১ ডিসেম্বর, ২০১৫ তারিখে টার্মিনাল পরীক্ষার তারিখ ঘোষণা করা হয়। অধিকাংশ ছাত্রছাত্রী দ্রুত পরীক্ষা দেবার পক্ষে। আমার কাছে ড. মুস্তাফিজুর রহমান ছিদ্দিকী তার কোর্স শেষ না হওয়ায় সম্ভব হলে পরীক্ষা কিছুদিন পিছিয়ে দিতে অনুরোধ করেন। আমি বিষয়টি আমলে নেই এবং এ ব্যাপারে পরীক্ষা কমিটির সভাপতির সঙ্গে কথা বললে তিনি রাজি হন। তবে তিনি বলেন, কমিটির আরেকজন সদস্য যেহেতু চায়নায় রয়েছেন, তিনি ফিরে এলে তার অনুমতি নেবার পর যেন আমি পরীক্ষা পেছানোর নোটিশ দেই। প্রফেসর আনোয়ারা চীন থেকে ফিরে এলে আমি তাঁর অনুমতি নিয়ে আমি পরীক্ষা পেছাবার তারিখ ঘোষণা করে নোটিশ দেই। তবে শিক্ষার্থীদের অনুরোধ উপেক্ষা করে আমরা টার্মিনাল পরীক্ষার তারিখ অপরিবর্তিত রাখি। ১ ডিসেম্বর, যথারীতি টার্মিনাল পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়।

সামি নামের কক্সবাজারের চকোরিয়ার একজন অন্তঃসত্ত্বা ছাত্রীর এক্সপেক্টেড ডেলিভারি ডেট ৩ ডিসেম্বর হওয়ায় সে টার্মিনাল পরীক্ষা দিতে অপারগতা প্রকাশ করে এবং এ ব্যাপারে তাকে বিশেষভাবে পরীক্ষা নিতে বলে। মেয়েটি আমার সঙ্গে টেলিফোনে যোগাযোগ করলে আমি তাকে নিয়মানুগভাবে সব রকম সহায়তা করার আশ্বাস প্রদান করি। আমি তাকে জিজ্ঞেস করি, তুমি তোমার মাহফুজ স্যারের সঙ্গে এ ব্যাপারে কথা বলেছো? মেয়েটি তার উত্তর প্রদান না করে চুপ থাকে। আমি আবারো জিজ্ঞেস করলে সে ইতস্তত করে বলে, 'স্যারের সঙ্গে কথা বলেছি। স্যার আমার সঙ্গে প্রত্যাশিত ব্যবহার করেননি।' এর পর আমি কথা না বাড়িয়ে বলি, তোমার স্যার ব্যস্ত শিক্ষক, তুমি কিছু মনে ক'রো না। আমি এ ব্যাপারে তোমার স্যারের সঙ্গে কথা বলব। পরে আমি প্রফেসর চৌধুরীর সঙ্গে দেখা হলে তাকে এ বিষয়ে জানাই। তিনি বলেন, এমএ ক্লাসের ছাত্রী, পরিকল্পনা করে সব কিছু করতে পারে না? আমি বললাম, হ্যাঁ করতে পারলে তো ভালো

হত। তবে মাহফুজ ভাই, আমরা কি পরিকল্পনা করে সব কিছু করতে পারছি? আমরা কি একাডেমিক ক্যালেন্ডার অনুযায়ী পরীক্ষা সময়মতো নিতে পারছি? তিনি তাতে খুশি না হয়ে বলেন, এটা তুমি কেমন তুলনা করলে? এমন তুলনা করা যায়? আমরা তো একটি প্রতিষ্ঠান, আর সে তো ইন্ডিভিজুয়াল। আমি যেহেতু প্রফেসর মাহফুজের মানসিকতার স্বরূপ জানি, সে জন্য তখন আর এ ব্যাপারে কিছু বলিনি। তবে কয়েকদিন পর তাকে এ বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করি। বলি, মাহফুজ ভাই, আমাদের এ রকম দু'জন পরীক্ষার্থী আছে। এ ব্যাপারে আপনার কিছু করা লাগবে না। আমি এবং ড. আনোয়ারা এ দুজন পরীক্ষার্থীর পরীক্ষা পৃথকভাবে নিয়ে নেব। তখন তিনি একটু নরম হন এবং পরে এ ব্যাপারে আমার প্রস্তাবে রাজি হন। এ দু'জনের আরেকজন ছাত্র ছিল বিশ্ববিদ্যালয় হকি টিমের খেলোয়াড়। টার্মিনাল পরীক্ষার সময় বিশ্ববিদ্যালয় টিম ঢাকায় খেলতে যায়। ওই খেলায় চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় হকি টিম রানার্স আপ হয়। যা হোক এ দুই শিক্ষার্থী আমার সঙ্গে যোগাযোগ করলে আমি ড. আনোয়ারার সম্মতি নিয়ে তাদের জন্য পৃথকভাবে প্রশ্ন করে আমার রুমে বসিয়ে তাদের পরীক্ষা গ্রহণ করি এবং পরীক্ষার পর অফিসকে তাদের খাতা ও প্রশ্ন বুঝিয়ে দিয়ে এ সমস্যার সমাধান করি।

একই পরীক্ষার মৌখিক পরীক্ষা নেবার সময় আমাকে আবারও অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়। এ কমিটির বহিরাগত সদস্য ছিলেন বিভাগের সাবেক সহকর্মী ও বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. মোঃ আবদুর রশীদ। দু'দিনব্যাপী আমরা পরীক্ষার্থীদের মৌখিক পরীক্ষা গ্রহণ করি। পরীক্ষার্থী ছাত্রছাত্রীদের মান বরাবরের মতো খুব একটা ভালো ছিল না। আমরা মৌখিক পরীক্ষার সর্বনিম্ন নম্বর ১২ (পাস নম্বর ১০) ধরে নম্বর দেয়া শুরু করি। কয়েক ঘন্টা পর পরীক্ষা কমিটির একজন সদস্য বলেন, আমাদের নম্বর কম দেয়া হচ্ছে। বহিরাগত সদস্য ড. রশীদ বলেন, 'কিছু না পারলে আমরা কেমন করে বেশি নম্বর দেব?' যা হোক, দু'য়েকজন পরীক্ষার্থী ভালো উত্তর দিতে না পারলেও তাদেরকে 'ভালো' বলে উৎসাহিত করায় ড. রশীদ তাদেরকে সঙ্গত কারণেই কম নম্বর দিতে বলেন। এ নিয়ে দু'জন পরীক্ষকের মধ্যে অদৃশ্য মনোবিরোধ লক্ষ্য করি। মৌখিক পরীক্ষার দ্বিতীয় দিন পরীক্ষা শুরু হলে একজন সদস্য পরীক্ষার্থীদের কোনো প্রশ্ন না করে বসে থাকেন। তাকে প্রশ্ন করতে বলা হলে তার মতামত গৃহীত হচ্ছে না অভিযোগ করে তিনি প্রশ্ন করা থেকে বিরত থেকে মৌখিক পরীক্ষায় শরিক থাকতে চান। পরে কমিটির সভাপতি অনুরোধ করে তাকে প্রশ্ন করাতে সম্মত করেন। এ ভাবে যে কোনো উপায়ে মৌখিক পরীক্ষা শেষ হয়।

মৌখিক পরীক্ষা হয়ে যাবার কয়েকদিন পর পরীক্ষা কমিটির সভাপতি পদত্যাগ করতে চান। কমিটির সভাপতি পদত্যাগ করলে সদস্যদের মধ্যে সিনিয়র হওয়ায় আমার ওপর সভাপতির দায়িত্ব আসবে। সে ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী আরেকজনকে কমিটিতে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। পরীক্ষা হয়ে গেছে, মৌখিক পরীক্ষা হয়ে গেছে, এমন অবস্থায় ফলাফল তৈরি করার আগে যদি পরীক্ষা

কমিটির সভাপতি পদত্যাগ করেন, তাহলে বিষয়টি ভালো দেখায় না। আমি সভাপতিকে পদত্যাগ না করতে অনুরোধ করি। তিনি শারীরিক অসুস্থতার কথা বলে পদত্যাগ করা থেকে সরে আসতে চাননি। আমি তখন কথা না বাড়িয়ে কয়েক ঘন্টা পর তাঁর কক্ষে গিয়ে তাকে বুঝিয়ে বললাম, দেখুন, আপনি যদি সভাপতির পদ থেকে পদত্যাগ করেন আপনাকে আমরা নিবৃত্ত করতে পারব না। এটা আপনার অধিকার। তবে যেহেতু পরীক্ষার অধিকাংশ কাজ হয়ে গেছে, মৌখিক পরীক্ষা গ্রহণও সম্পন্ন হয়েছে, এমন অবস্থায় যদি আপনি পদত্যাগ করেন তাহলে এ থেকে অন্য শিক্ষকগণ ভালো মেসেজ পাবেন না। আপনি যদি টেবুলেশন না করতে চান ভালো, এ কাজ আপনি অন্য কাউকে দিয়ে করাতে পারবেন। বাকি কাজ তো আমরাই করব। আমি আপনাকে সর্বাত্মকভাবে সহায়তা করব, তবে অনুরোধ করব পদত্যাগ না করার জন্য। এ ভাবে অনুরোধ করায় উনার মন কিছুটা নরম হয় এবং উনি সভাপতি থাকতে রাজি হন। কিন্তু তার কিছুদিন পর আর উপায় থাকল না। বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের চ্যান্সেলর প্রফেসর ড. মাহফুজুল হক চৌধুরীকে চট্টগ্রাম ইন্ডিপেন্ডেন্ট ইউনিভার্সিটির (সিআইইউ) ভাইস চ্যান্সেলর নিয়োগ দেয়ায় এবার তিনি পরীক্ষার যাবতীয় কাগজপত্র আমাকে বুঝিয়ে দেন। আমি পরদিন ১০ মে, ২০১৬ তারিখে তাঁর কাছে দশ মিনিটের সময় চাইলে তিনি সময় দিতে রাজি হন। প্রভাষক মুহাম্মদ ইসহাককে পরদিন একটি ফুলের তোড়া নিয়ে আসতে অনুরোধ করি। অত্যন্ত স্বল্প সময়ে তাৎক্ষণিকভাবে উপস্থিত সকর্মীদের ডেকে আমরা বিভাগের পক্ষ থেকে সিআইইউ এর ভাইস চ্যান্সেলর মনোনীত হওয়ায় তাকে অভিনন্দন জানাই। পরে আমাকে এমএসএস পরীক্ষা কমিটির সভাপতি হয়ে পরীক্ষার বাকি কাজ ড. আনোয়ারা বেগম এবং সহকারী অধ্যাপক মোঃ বখতেয়ার উদ্দিনকে নিয়ে এমএসএস পরীক্ষা ২০১৪ এর ফলাফল দিতে হয়।

ইডব্লিউজি-র সহায়তায় গবেষণা ও সেমিনার

ঢাকাস্থ ইলেকশন ওয়ার্কিং গ্রুপ (ইডব্লিউজি) এশিয়া ফাউন্ডেশনের সহায়তায় নির্বাচন বিষয়ে কাজ করে। এর বেশির ভাগ কাজ ঢাকায়। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের রাজনীতিবিজ্ঞান এবং লোক প্রশাসন বিভাগের সঙ্গে সংগঠনটি ২০১৫ সালে নির্বাচন সংক্রান্ত কাজ করার লক্ষ্যে একটি চুক্তি করার প্রস্তাব করে। এই চুক্তির অংশ হিসেবে তারা শিক্ষার্থীদের জন্য ২ লাখ টাকা দেবে। শিক্ষার্থীদেরকে নির্বাচন বিষয়ে শিক্ষকদের তত্ত্বাবধানে গবেষণা পেপার লিখতে হবে। আর নির্বাচন বিষয়ে একটি সেমিনার অনুষ্ঠানের আয়োজন করতে হবে যার খরচের জন্য তারা অর্থ বরাদ্দ করবে। প্রফেসর মনোয়ার তখন বিভাগীয় সভাপতি। এ ব্যাপারে ১৩-০১-২০১৫ তারিখে বিভাগীয় একাডেমিক কমিটির ২৭৭তম তাৎক্ষণিক সভায় ইডব্লিউজির সঙ্গে প্রস্তাবিত এমওইউ-তে স্বাক্ষরের ব্যাপারে কমিটির সদস্যগণ সম্মতি প্রদান করেন। এ সভায় এ কার্যক্রম মনিটরিং করার জন্য সভাপতিকে

আহ্বায়ক, আমাকে সদস্য এবং প্রফেসর ড. আনোয়ারা বেগমকে সদস্য-সচিব করে কমিটি গঠিত হয়। ইডব্লিউজির ২ লাখ টাকা দিয়ে এমএসএস শ্রেণির চারজন শিক্ষার্থীকে নির্বাচন সংক্রান্ত গবেষণা করার জন্য বৃত্তি এবং ৪৭ হাজার ৮০০ টাকা দিয়ে একটি নির্বাচন বিষয়ক সেমিনার আয়োজনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এ লক্ষ্যে ৩-৪ জন শিক্ষার্থীকে সুযোগ দিলে তাদের গবেষণা পেপার লেখার কাজটি ভালো করে দেখভাল করা যেত। কিন্তু পরবর্তীতে এমএসএস ২০১৩-২০১৪ একাডেমিক সেশনের ১১জন আবেদনকারীর সবাইকে[৩৯] এ সুযোগ দেয়ায় এবং তাদেরকে তিনজন শিক্ষক তত্ত্বাবধায়কের অধীনে ন্যস্ত করায় এদের গবেষণা কাজ প্রত্যাশিত মাত্রায় দেখভাল করা যায়নি।

নির্বাচনবিষয়ক সেমিনার দিতে কেউই রাজি না হওয়ায় সভাপতি শেষ পর্যন্ত আমাকে অনুরোধ করে রাজি করান। তবে এ সেমিনার অনুষ্ঠানের আগে সভাপতি পদত্যাগ করলে এ কাজ এগিয়ে নেবার দায়িত্ব আমার ওপর পড়ে। প্রফেসর মনোয়ার পদত্যাগ করার মাত্র একদিন পরেই এ সেমিনার অনুষ্ঠানের দিন ছিল। সমাজ বিজ্ঞান অনুষদ কনফারেন্স রুমে ১৮ আগস্ট ২০১৫ তারিখে অনুষ্ঠিত 'Election, Institution Building and Democracy' শীর্ষক ওই সেমিনারে দুটি প্রবন্ধ উপস্থাপিত হয়। আমি ছিলাম ওই সেমিনারের প্রথম প্রবন্ধের উপস্থাপক। অন্য প্রবন্ধটি উপস্থাপন করেছিলেন ইডব্লিউজি-র পরিচালক ড. মো. আবদুল আলীম। আমার প্রবন্ধের শিরোনাম ছিল 'Caretaker Government and the EC: Examining the Possibility of Holding Free and Fair Parliamentary Election Under a Party Government in Bangladesh' (তত্ত্বাবধায়ক সরকার ও ইসি: বাংলাদেশে দলীয় সরকারাধীনে স্বচ্ছ সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠানের সম্ভাব্যতা পরীক্ষা') আর ড. আলীমের সেমিনারের বিষয়বস্তু ছিল 'Election Management, Administration and Electoral Process: Bangladesh Perspectives' (নির্বাচন ব্যবস্থাপনা, প্রশাসন এবং নির্বাচনী প্রক্রিয়া: বাংলাদেশ পরিপ্রেক্ষিত')।

এ সেমিনারে প্রধান অতিথি এবং বিশেষ অতিথি ছিলেন যথাক্রমে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য প্রফেসর ড. ইফতেখার উদ্দিন চৌধুরী এবং এশিয়া ফাউন্ডেশনের কান্ট্রি ডিরেক্টর জনাব এম হাসান মজুমদার (সেমিনারের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের ছবির জন্য দেখুন পরিশিষ্ট- ৭:৪)। সেমিনারে উপস্থাপিত দুটি প্রবন্ধই ছিল একাডেমিক ও তথ্যবহুল। এই দিনই আমি বিভাগে সভাপতি হিসেবে যোগদান করি। নতুন সভাপতি হিসেবে আমার কাজের চাপ বাড়ে এবং তার ওপর

৩৯. এই ১১ জন শিক্ষার্থী ছিলেন: কাজী ফারহানা ইয়াসমিন, মো: আবদুল কাইয়ুম, ইফতেখার মোহাম্মদ সাগর, সালেহ মো. জাকারিয়া, এ কে এম মাকসুদুন জাহান, আজিজ মিয়া, মো. আফাজ উদ্দিন শাকিল, মো. সেলিম পাশা, মো. দিদার আলম, অপূর্বা চাকমা এবং সৈয়দা পাপিয়া সুলতানা।

আবার ইডব্লিউজির বাড়তি কাজ করতে হয়। যে সব শিক্ষার্থীকে নির্বাচন বিষয়ক গবেষণা পেপার লিখতে দেয়া হয়েছিল তারা ভালো ছাত্র হলেও তাদের গবেষণার অভিজ্ঞতা ছিল না। এ ছাড়া ইংরেজি ভাষার ওপর তাদের সবার দখল একরকম ছিল না। এ জন্য প্রথমে কিভাবে কাজ এগিয়ে নিতে হবে সে সম্পর্কে আমি এবং ড. আনোয়ারা ৩ সেপ্টেম্বর ২০১৫ তারিখে শিক্ষার্থীদের সঙ্গে মত বিনিময় করে একাডেমিক পেপার লেখার নিয়ম কানুন সম্পর্কে তাদেরকে নির্দেশনা দেই। তাদেরকে প্রদত্ত সময়সীমা পরে ইডব্লিউজির অনুমতি নিয়ে বাড়িয়ে দেয়া হয় এবং এক পর্যায়ে তারা কাজ শেষ করে। দায়িত্বপ্রাপ্ত শিক্ষকগণ তাদের লেখা দেখে দেন। এভাবে কিছুটা দেরি করে হলেও আমরা ইডব্লিউজির সঙ্গে কাজ শেষ করি।

আর আই চৌধুরী স্মারক বক্তৃতা ২০১৬

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় রাজনীতিবিজ্ঞান বিভাগের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি প্রফেসর ড. আর আই চৌধুরীর মৃত্যুর পর তাঁর স্মরণে একটি স্মারক বক্তৃতা আয়োজনের বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়। এ বিষয়ে সবাই একমত পোষণ করলেও যে কোনো কারণে অনুষ্ঠানটি করতে অনেক দেরি হয়। পরবর্তীতে কে স্মারক বক্তা হবেন সে বিষয়ে আলোচনা উত্থাপিত হলে এক পর্যায়ে প্রফেসর ড. রওনক জাহানের নাম বিবেচনা করা হয়। বিভাগীয় একাডেমিক কমিটি প্রফেসর ড. ভুঁইয়া মোঃ মনোয়ার কবীর ড. জাহানের ছাত্র হওয়ায় তাকে ড. জাহানের সঙ্গে যোগাযোগের দায়িত্ব প্রদান করে। ড. জাহান ব্যস্ত ব্যক্তিত্ব। কখনো দেশে থাকেন, কখনো বিদেশে। দেশে এলেও তাঁর সিডিউল থাকে খুবই ব্যস্ত। আমার বিভাগীয় সভাপতিত্বকালে বিষয়টি নতুন করে গতি পেয়ে ২৪ ফেব্রুয়ারি তারিখে এ লেকচারের তারিখ নির্ধারিত হয়। প্রফেসর ড. রওনক জাহান একজন বিশিষ্ট সমাজবিজ্ঞানী। এ বিষয়ের প্রস্তুতিপর্বে তারিখ নির্ধারিত হবার আগে বিভাগীয় অধ্যাপক ড. মাহফুজুল হক চৌধুরী অ্যাম্বেসেডর সিরাজুল ইসলামের নামও প্রফেসর আর আই চৌধুরী স্মারক বক্তা হিসাবে প্রস্তাব করে বলেন, তাকে এ প্রস্তাব দেয়ায় তিনিও এ লেকচার দিতে সম্মত হয়েছেন। অ্যাম্বেসেডর সিরাজুল ইসলাম এক সময় চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং পরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করেন। পরবর্তীতে তিনি রাষ্ট্রদূত হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন এবং ২০০৬ সালে জাপানের রাষ্ট্রদূত হিসেবে অবসরে যান। একজন সিনিয়র অধ্যাপক এভাবে মিটিংয়ে তার নাম প্রস্তাব করায় বিরোধিতা না করলেও কেউ কেউ এ ব্যাপারে মনঃক্ষুন্ন হন। কারণ, এ রকম অনুষ্ঠানে স্মারক বক্তা হন সাধারণত একজন। তা ছাড়া সিরাজুল ইসলাম সাহেব ড. রওনক জাহানের ছাত্র। এ রকম একটি অনুষ্ঠানে দু'জন স্মারক বক্তা নির্ধারণ করলে মনস্তাত্ত্বিক কারণে বক্তাদের মধ্যে অসন্তোষ দেখা দিতে পারে।

যা হোক, বিভাগীয় সভাপতির তত্ত্বাবধানে অনুষ্ঠানের যাবতীয় প্রস্তুতি গ্রহণ চলতে থাকে। প্রফেসর মনোয়ার অনুষ্ঠানের চূড়ান্ত সিডিউল ড. জাহানকে জানালে তিনি সম্ভবত দু'জন স্মারক বক্তা দেখে খুশি হননি। তিনি ড. মনোয়ারকে তাঁর

সঙ্গে ঠিকভাবে যোগাযোগ করা হয়নি মর্মে অভিযোগ করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে তার এককভাবে প্রফেসর মোজাফফর আহমদ স্মারক বক্তৃতা এবং প্রফেসর নাজমুল করিম স্মারক বক্তৃতা প্রদানের প্রসঙ্গ উল্লেখ করে তিনি অনুষ্ঠান বন্ধ করে দিতে বলেন। পরবর্তীতে ড. জাহানের ঘনিষ্ঠভাজন এবং আমাদের সাবেক সহকর্মী ও উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. মো. আবদুর রশীদের মধ্যস্থতায় ড. জাহান কিছুটা নমনীয় হন। ড. রশীদ টেলিফোনে এ বিষয় নিয়ে আলাপ করেন এবং আমাকে সভাপতি হিসেবে ড. জাহানকে অনুষ্ঠানে আসতে অনুরোধ করতে পরামর্শ দেন। পরদিন আমি উদ্ভূত পরিস্থিতি মোকাবিলায় একাডেমিক কমিটির সভা আহ্বান করি। ওই সভা থেকে সকলের পরামর্শে ড. জাহানকে বিভাগীয় সভাপতি হিসেবে টেলিফোন করে আমি তাকে অনুষ্ঠানের যাবতীয় প্রস্তুতি বিষয়ে অবহিত করি। তাঁকে এও বলি, মাননীয় উপাচার্য আপনার সম্মানে হোটেল অ্যামব্রোশিয়ায় নৈশভোজের আয়োজনে সম্মত হয়েছেন। এমতাবস্থায় অনুষ্ঠান বন্ধ করা আমাদের জন্য শোভনীয় হবে না। তাকে অনুষ্ঠানে আসতে রাজি করাতে আরও বলি, ম্যাডাম আমি আপনার সরাসরি ছাত্র না হলেও ছাত্রেরই মতো। আমরা তো আপনাদের লেখা পড়েই রাজনীতিবিজ্ঞান শিখেছি। আপনার সঙ্গে যোগাযোগে আমাদের হয়ত কিছুটা দূরত্ব ছিল। আমাদের ভুল-ত্রুটি হতে পারে। তবে বিভাগীয় সভাপতি হিসেবে আমি এ নিশ্চয়তা দিতে পারি যে, বিভাগের সকল শিক্ষক আপনাকে খুবই শ্রদ্ধা করেন এবং আপনি এলে আপনার চট্টগ্রাম সফরকে আরামদায়ক করার জন্য তারা আন্তরিকভাবে চেষ্টা করবেন। আমরা চট্টগ্রাম ক্লাবের একমাত্র ভিআইপি কক্ষটি আপনার জন্য বুক করতে সমর্থ হয়েছি। অনুষ্ঠানের অন্যান্য আয়োজনও সম্পন্ন হয়েছে। আমরা আশা করি আপনি এলে আমরা অনুষ্ঠান সুসম্পন্ন করতে পারব। ড. জাহান তাকে অত্যন্ত সম্মান দিয়ে অনুরোধ করায় কিছুটা খুশি হয়ে এক পর্যায়ে বলেন, ঠিক আছে আমি সকালের ফ্লাইটে গিয়ে বিকালের ফ্লাইটে ঢাকা ফিরে আসব। পরে অবশ্য তিনি মত পরিবর্তন করেন এবং অনুষ্ঠানের পূর্বদিন রাতে এসে একরাত চট্টগ্রাম ক্লাবে অবস্থান করে পরদিন বিকালের ফ্লাইটে চট্টগাম ত্যাগ করেন। আমি নিজে, প্রফেসর মনোয়ার, প্রফেসর মুনির এবং সহকারী অধ্যাপক এ জি এম নিয়াজ উদ্দিন ড. রওনক জাহানকে বিমানবন্দরে স্বাগত জানাই (ড. জাহানকে চট্টগাম বিমান বন্দরে স্বাগত জানাবার ছবির জন্য দেখুন পরিশিষ্ট- ৭:৫)। অন্য স্মারক বক্তাকে প্রফেসর মাহফুজুল হক চৌধুরী ও বিভাগীয় সহকর্মী জনাব মুহাম্মদ ইসহাক বিমানবন্দরে স্বাগত জানান। আমরা বক্তাদের সম্মানে আয়োজিত সম্মানিত ভিসি মহোদয়ের নৈশভোজটি রাতের পরিবর্তে অনুষ্ঠানের দিন ক্যাম্পাসে মধ্যাহ্নভোজে রূপান্তরিত করতে অনুরোধ করায় ভিসি মহোদয় আমাদের অনুরোধ রাখেন।

স্মারক বক্তৃতা সম্পর্কিত আলোচনায় একাডেমিক কমিটির সভায় স্মারক বক্তাদের উপহার প্রদানের বিষয় উত্থাপিত হলে কেউ কেউ তাদেরকে আর্থিক

সম্মানী প্রদানের কথা বলেন। আমি এ ব্যাপারে দ্বিমত পোষণ করে বলি, দেখুন এ রকম সম্মানিত বক্তাদেরকে আর্থিক সম্মানী দেয়ার চিন্তা করলে যে পরিমাণ অর্থ দিতে হবে, তা আমরা হয়ত দিতে পারব না। কাজেই আর্থিক সম্মানী দেবার পরিবর্তে সর্বোচ্চ আন্তরিক আতিথেয়তা প্রদর্শনের সঙ্গে তাদেরকে স্মারক বক্তৃতার স্মৃতিচিহ্ন হিসেবে সুদৃশ্য ক্রেস্ট তৈরি করিয়ে দেয়া যায়। এই প্রস্তাব সমর্থিত হলে আমরা এ রকম পাঁচটি সুদৃশ্য ক্রেস্ট তৈরি করাই, যার দুটি দু'জন সম্মানিত স্মারক বক্তাকে, একটি সম্মানিত ভিসি মহোদয়কে, একটি প্রফেসর আর আই চৌধুরীর পরিবারকে দেয়া হয়। বাকি ক্রেস্টটি বিভাগে স্মৃতি হিসাবে ছাত্র-শিক্ষকদের জন্য সংরক্ষণ করা হয়। সবকিছু মিলে বিভাগীয় সকল সহকর্মীর সহায়তায় স্মারক বক্তৃতা অনুষ্ঠান সফলভাবে সম্পন্ন হয়। স্মারক বক্তাগণও আমাদের আয়োজন, আতিথেয়তা ও আন্তরিকতার প্রশংসা করেন। প্রফেসর রওনক জাহান পরে ঢাকায় গিয়ে আমাদেরকে ধন্যবাদ জানান এবং বিভাগীয় কতিপয় শিক্ষকের একাডেমিক কাজের প্রশংসা করেন। তিনি দু'একজন শিক্ষকের কাছে তাদের প্রকাশিত একাডেমিক কাজের তালিকা পাঠাতে অনুরোধ করেন (স্মারক বক্তৃতা অনুষ্ঠানের ছবির জন্য দেখুন, পরিশিষ্ট- ৭:৬)।

একটু ভালো ব্যবহার, সামান্য প্রশংসা

শিক্ষার্থীদের প্রতি ভালোবাসার প্রকাশ ঘটাতে হলে যে শিক্ষককে ছাত্রছাত্রীদের উপহার দিতে হবে এমন নয়। সামান্য মৌখিক প্রশংসা, ভালো ব্যবহার, বা বর্তমান ও সাবেক শিক্ষার্থীদের একটু খোঁজখবর নেয়ার মধ্য দিয়েও এ ভালোবাসা প্রকাশ করা যায়। শিক্ষার্থীদের প্রতি শিক্ষকের সামান্য ইতিবাচক আচরণ শিক্ষার্থীগণ আজীবন মনে রাখে। শিক্ষার্থীদের কোনো প্রাপ্তি বা সাফল্যকে প্রশংসা করলেও শিক্ষার্থীরা অনেক খুশি হয়। আমি বিভাগীয় সভাপতি থাকাকালে বা এর আগে বা পরে সব সময় শিক্ষার্থীদের সঙ্গে সম্ভাব্য যোগাযোগ রেখেছি। তাদেরকে ভালো কাজে উৎসাহ যোগাতে সচেষ্ট থেকেছি। বুঝেছি, শিক্ষক হিসেবে আমাকে সব সময় শিক্ষার্থীদের সঙ্গে ন্যায়পরায়ণ আচরণ করতে হবে। শিক্ষকের ভালোবাসা যেন সকল শিক্ষার্থীর হৃদয় স্পর্শ করে। শিক্ষকের কখনোই বিশেষ বিশেষ শিক্ষার্থীর প্রতি বিশেষ আচরণ করা উচিত নয়। আমি সব সময় সকল শিক্ষার্থীর প্রতি একই রকম আচরণ করার চেষ্টা করেছি। তাদের ভালো কাজে উৎসাহ দিয়ে প্রশংসা করেছি। এমন আচরণ ছাত্রছাত্রীদের মাঝে আমাকে অধিকতর গ্রহণযোগ্যতা দিয়েছে। আমার এমন আচরণের দু'একটি নমুনা দিচ্ছি।

বর্তমান সময়ে যোগাযোগের গুরুত্ব খুব বেশি। এখন চিঠিপত্রের পরিবর্তে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম যথেষ্ট জনপ্রিয়। এ জন্য আমি অনেক সময় ফেসবুক ব্যবহার করেছি। আমার তিন্ বছরের সভাপতির সময় শিক্ষার্থীদের ইতিবাচক সংবাদ ফেসবুকে পোস্ট দিয়েছি। এতে শিক্ষার্থীরা খুশি হয়েছে এবং ইতিবাচক মন্তব্য লিখে সাড়া দিয়েছে। যেমন, ২০১৭ সালের রমজানের ঈদের সময় আমি

বিভাগীয় সভাপতি হিসেবে বিভাগের সকল সহকর্মী, কর্মকর্তা কর্মচারী এবং বর্তমান ও প্রাক্তন ছাত্রছাত্রীকে ঈদ মোবারক জানিয়ে এবং তাদের প্রত্যেকের জীবনের সুখ, সাফল্য ও সমৃদ্ধি কামনা করে স্ট্যাটাস দিয়েছি। এতে সবাই খুশি হয়েছে/হয়েছেন এবং শত শত বর্তমান ও সাবেক শিক্ষার্থী এ স্ট্যাটাসে সাড়া দিয়েছে/দিয়েছেন। এভাবে খুব সহজে বিভাগের বর্তমান ও সাবেক শিক্ষার্থীদের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করা সম্ভব হয়েছে। একই বছর এপ্রিল মাসে বিসিএস পরীক্ষায় ভালো ক'রে মোহাম্মদ ইসমাইল এবং মোঃ রবিউল হুসেইন নামের বিভাগের দু'জন ছাত্র এডুকেশন ক্যাডার পেয়ে চাকরিতে যোগ দেবার আগে বিভাগে শিক্ষকদের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করতে আসে। আমরা খুশি হয়ে তাদেরকে অভিনন্দন জানাই। তাদের একজন রাঙ্গামাটি সরকারি কলেজে এবং অন্যজন সদরপুর সরকারি কলেজে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের প্রভাষক হিসেবে যোগদান করে। আমি ফেসবুকে তাদের ছবিসহ অন্য ছাত্রছাত্রীদেরকে উৎসাহিত করার জন্য এ দুই কৃতি ছাত্রকে অভিনন্দন জানিয়ে স্ট্যাটাস দেই। এর ফলে ওই দুই কৃতী ছাত্র যেমন খুশি হয়, তেমনি বিভাগের বর্তমান ও সাবেক শিক্ষার্থীগণও খুশি হয়। বিভাগীয় সভাপতি যদি বিভাগের ইতিবাচক খবর বিভাগের সাথে সংশ্লিষ্ট সবাইকে জানান, তাতে সবাই যেমন খুশি হন, তেমনি এতে বিভাগের ভাবমূর্তিও উজ্জ্বল হয়। তবে সব সময় যে কেবল ইতিবাচক খবরই সবাইকে জানাতে হবে এমন নয়। শিক্ষার্থীদের দুঃখ কষ্টের সঙ্গেও শিক্ষককে সম্পর্কিত থাকতে হয়। আমি সব সময় সে চেষ্টাও করেছি।

সম্মান দিয়ে সম্মান অর্জন

আমার আগে বিভাগের সম্মানিত সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালনকারীদের বিভিন্নভাবে বিভাগীয় কর্মকর্তা কর্মচারীদের সঙ্গে ব্যবহার করতে দেখেছি। তাদের কেউ কেউ বিভাগীয় কর্মচারীদেরকে ব্যক্তিগত কাজে ব্যবহার করেছেন। অনেকে তাদেরকে বকাঝকাও করেছেন। কর্মচারীদের ব্যাপারে আমার পলিসি ছিল যতদূর সম্ভব তাদেরকে সম্মান করা। তাদের প্রাপ্য সম্মান দিয়ে তাদের কাছ থেকে কাজ আদায় করে নেয়া। তাদের কোনো কাজ অপছন্দ হলে, বা কোনো কাজ করতে বলার পর না করলে, অন্যদের সামনে বকাঝকা না করে আড়ালে একাকী ডেকে বুঝিয়ে বলা। আমার ধারণা, কর্মকর্তাগণ এতে আমার ওপর খুশি ছিলেন। আমি জ্ঞানত কোনো সময় কোনো কর্মচারীকে দিয়ে কখনোই আমার ব্যক্তিগত কাজ করাইনি। যেমন, আমার নিজের বাসার জন্য কোনো কিছু কিনতে চাইলে কর্মচারীদের হাতে কোনো কাজ না থাকলেও কখনো তাদের ব্যবহার করিনি। আমি নিজে গিয়ে সে কাজ করেছি। তাদেরকে খুশি করার জন্য অনেক ছোট ছোট কাজ করেছি যা তারা পছন্দ করেছেন। যেমন, আমি বিভাগীয় যে কোনো সভার জন্য কোনো খাবার কিনলে শিক্ষকদের সঙ্গে তাদের জন্যও হিসেব করে কিনেছি। অনেক বিভাগের সভাপতিকে দেখেছি তাদের সামান্য হাতব্যাগ বা ব্রিফকেস

নেবার জন্য বিভাগের কর্মচারীকে ফোন করে বাসস্ট্যান্ডে দাঁড় করিয়ে রাখতে। যে জিনিষ আমি নিজেই বহন করতে পারি, এমন জিনিষ বহন করতে আমি কখনো বিভাগের কর্মচারীদের ডাকিনি। এ ছাড়াও আমি কিছু কাজ করেছি, যা আমার ধারণা, কর্মকর্তা কর্মচারীদের খুশি করেছে।

যেমন, রাজনীতিবিজ্ঞান বিভাগের সেলফ অ্যাসেসমেন্ট রিপোর্ট আমি লিখেছি। এ রিপোর্টের পরিশিষ্টে আমি বিভাগীয় শিক্ষকদের তালিকা সন্নিবেশিত করেছি। সেখানে আমি সংশ্লিষ্ট পরিশিষ্টের নাম 'বিভাগের শিক্ষক ও স্টাফ' শিরোনাম দিয়ে ওই তালিকায় সব কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের নাম সন্নিবেশিত করেছি। রাজনীতিবিজ্ঞান বিভাগের রেওয়াজ অনুযায়ী বিভাগের কোনো সম্মানিত শিক্ষক বা তার ঘনিষ্ঠজন মারা গেলে আমরা বিভাগীয় প্যাডে শোকবাণী লিখি। ওই শোকবাণীতে সকল শিক্ষকের স্বাক্ষর নিয়ে সেটি সংশ্লিষ্ট শিক্ষক বা তার আপনজনকে দেয়া হয়। ২০১৭ সালের মে মাসে অধ্যাপক ড. সিদ্দিক আহমেদ চৌধুরীর শাশুড়ি আম্মা ইন্তেকাল করলে আমি শোকবাণীতে সম্মানিত শিক্ষকবৃন্দের সাথে বিভাগীয় কর্মকর্তা কর্মচারীদের নামও সন্নিবেশিত করি। তাদেরকে বলি, আপনারাও এ বিভাগের অংশ। আপনারাও নিশ্চয়ই এই মৃত্যুতে দুঃখিত। আমি শোকবাণীতে আপনাদের নামও সন্নিবেশিত করব। শোকবানীতে আপনারাও স্বাক্ষর করবেন এবং মরহুমার জন্য দোয়া করবেন। এতে শিক্ষকদের সঙ্গে তারা একই শোকবাণীতে স্বাক্ষর করতে পেরে খুশি হয়েছেন। আমি বিভাগের জন্য কোনো সামগ্রী কিনতে আমাদের কর্মকর্তা বা কর্মচারীদের সঙ্গে নিলে মার্কেটে গিয়ে দোকানিদের সঙ্গে তাদের সব সময় 'আমার সহকর্মী' হিসেবে পরিচয় করিয়ে দিয়েছি।

বিভাগীয় অফিসপ্রধান জনাব নুরুল হক চৌধুরী সৎ ও বিশ্বস্ত হওয়া সত্ত্বেও অনেকক্ষেত্রে বিভাগীয় ছোটখাট ক্রয়ের জন্য শহরে গেলে তিনি একা না গিয়ে আমাকে সঙ্গে নিতেন। আমি তাঁকে বিশ্বাস করে একা যেতে বললেও তিনি শুনতেন না। আমি অনেকবার তাঁর সঙ্গে বিভাগের জন্য কাগজ এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী কিনতে শহরের আন্দরকিল্লা গিয়েছি। এ সব ব্যাপারে আমরা সব সময় বিভাগের অর্থ সাশ্রয় করার চেষ্টা করেছি। এ সব ক্ষেত্রে দোকানিদের কাছে আমি তাকে যেমন সম্মান দিয়ে 'আমার সহকর্মী' বলে পরিচয় করিয়ে দিয়েছি, তিনিও আমাকে সব সময় সম্মান দিয়েছেন। আবার বিভাগীয় স্টাফদের বিয়েতে বা অন্য অনুষ্ঠানে দাওয়াত দিলে আমি সব সময় তাতে অংশগ্রহণ করেছি। এ ছাড়া বিভাগীয় ব্রোসারে আমাদের অবসরপ্রাপ্ত স্টাফ জনাব আওলাদ হোসেন দেওয়ানের ছবি যোগাড় করে সন্নিবেশিত করে তাকে সম্মানিত করেছি। এতে তিনি আমার ওপর খুশি হন। জনাব আওলাদ হোসেন দেওয়ান মারা গেলে অন্য অনেক সহকর্মীসহ আমিও শহর থেকে এসে তার জানাজায় শরিক হই। এ ছাড়া আমি বিভাগীয় বিভিন্ন ক্রয় কমিটিতে থাকায় বিভাগের জন্য আমাকে অনেক স্টাফের সঙ্গে বিভাগীয় কেনাকাটার কাজ করতে হয়েছে। ফলে স্টাফরাও

বিভাগীয় কাজের প্রতি আমার মনোযোগ ও বিশ্বস্ততা দেখার সুযোগ পেয়েছেন। ফলে তাদের মধ্যে আমার প্রতি এক ধরনের গ্রহণযোগ্যতা ও বিশ্বাস তৈরি হয়। আমি এও জানি যে, আমার কর্মকাণ্ড নিয়ে অনেক সময় আমার অফিস স্টাফরা নিজেদের মধ্যে হাসাহাসি করেছেন। কারণ, আমি সেলফ অ্যাসেসমেন্ট প্রোগ্রামের হেড হওয়ায় আমাকে অনেকবার বিভিন্ন কেনাকাটা করতে শহরে যাতায়াত করতে হয়েছে। তারা অনেক সময় শহর থেকে মুরাদপুর আসার জন্য আমাকে টেম্পু বা পাবলিক বাসে চড়ে আসতে দেখেছে। এ ব্যাপারে সেলফ অ্যাসেসমেন্ট কমিটির সদস্য জনাব এ জি এম নিয়াজ উদ্দিন এবং জনাব মো. বখতেয়ার উদ্দিনের সঙ্গেও আমি একই ভঙ্গিমায় কাজ করেছি। তারাও আমার অগোচরে কাজের প্রতি আমার সততা, বিশ্বস্ততা নিয়ে অন্যদেরকে ইতিবাচক ধারণা দিয়েছেন। এ সব কাজগুলো ছোট হলেও সভাপতি হিসেবে বিভাগীয় শিক্ষক ও স্টাফদের মধ্যে আমার গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি করেছে। আমি বিশ্বাস করি, আমি যদি বিভাগীয় সভাপতি হয়ে আমার স্টাফদের সম্মান করি, তাহলে তারা আমাকে সম্মান না করে পারবেন না।

সেলফ অ্যাসেসমেন্ট প্রোগ্রাম

আমি ২০১৫ সালের আগস্টে বিভাগীয় সভাপতির দায়িত্ব নেবার আগেই চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে ইনস্টিটিউশনাল কোয়ালিটি অ্যাসিওরেন্স সেল (আইকিউএসি) গঠিত হয় এবং বাণিজ্য অনুষদের ডিন প্রফেসর ড. জাহাঙ্গীর আলমকে আইকিউএসির পরিচালক নিয়োগ করা হয়। পরবর্তীতে পর্যায়ক্রমে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল বিভাগে সেলফ আসেসমেন্ট প্রোগ্রামের কাজ শুরু হয়। এ লক্ষ্যে দ্বিতীয় পর্যায়ে প্রফেসর মনোয়ার সভাপতি থাকাকলীন রাজনীতিবিজ্ঞান বিভাগে এ কাজ শুরু করতে একাডেমিক কমিটি বিভাগীয় সভাপতিকে প্রধান করে তিন সদস্যবিশিষ্ট সেলফ অ্যাসেসমেন্ট কমিটি (এসএসি) গঠন করে। কমিটির বাকি দু'জন সদস্য হন দু'জন সহকারী অধ্যাপক এ জি এম নিয়াজ উদ্দিন এবং মো. বখতেয়ার উদ্দিন। সেলফ অ্যাসেসমেন্ট ম্যানুয়েলে বর্ণিত নিয়মানুযায়ী এ কমিটির সদস্য বিভাগীয় সিনিয়র শিক্ষকদের মধ্য থেকে করার কথা। কিন্তু আমাদের কমিটিতে সে নিয়মের প্রতিফলন ঘটেনি। প্রফেসর মনোয়ার এ কমিটির কাজ ভালোভাবে শুরু করার আগেই ২০১৫ সালের ১৭ আগস্ট তারিখে সভাপতির পদ থেকে ইস্তফা দেন।

প্রফেসর মনোয়ারের বিভাগীয় সভাপতির পদসহ এসএসি প্রধানের পদ থেকে অব্যাহতি নেবার প্রসঙ্গ এ অধ্যায়ের প্রথমদিকে উল্লেখ করেছি। এ সব পদ থেকে তাকে সরে না দাঁড়াতে আমি বিশেষভাবে অনুরোধ করলেও তিনি সে অনুরোধ শোনেননি। ফলে একাডেমিক কমিটির সভা ডেকে আমাকে এ পদগুলোতে নতুন নিয়োগ দিতে হয়। সেলফ অ্যাসেসমেন্ট প্রধানের পদে নিয়োগদানের ক্ষেত্রে সবাই একযোগে আমার নাম প্রস্তাব করলে আমি অপারগতা প্রকাশ করি। কিন্তু প্রায় সব

সহকর্মী আমাকে এ পদে কাজ করতে অনুরোধ করেন। এক পর্যায়ে আমাকে এ কথা বলে কিছুটা কাবু করা হয় যে, সেলফ অ্যাসেসমেন্ট ম্যানুয়েলে লেখা আছে, এ কমিটির প্রধান বিভাগীয় সভাপতি হলে ভালো হয়। এ ভাবে সকলের চাপে অনিচ্ছাসত্ত্বেও আমাকে এ পদ গ্রহণ করতে হয়। তবে কমিটির সদস্য হিসেবে অন্য যে দু'জন সহকর্মী ছিলেন তাদেরকে পরিবর্তন করা হয়নি।

এ ধরনের পদে বা কোনো প্রজেক্টে আমার কাজ করার পূর্ব-অভিজ্ঞতা ছিল না। তবে একবার আমি টিআইবির রিসার্চ ফেলোশিপের অধীনে গবেষণামূলক কাজ করেছিলাম। কিন্তু সেলফ অ্যাসেসমেন্ট কমিটির প্রধান হিসেবে কাজ করা ভিন্ন বিষয়। প্রথমে আমি সেলফ অ্যাসেসমেন্ট ম্যানুয়েল পড়ে সব কিছু পরিষ্কারভাবে বুঝতে পারিনি। অন্য বিভাগগুলোতে যারা প্রথম পর্বে এ কাজ শুরু করেছিলেন এমন দু'একজনের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করে কিছুটা ধারণা পরিষ্কার করি। পরবর্তীতে আইকিউএসি-এর ডিরেক্টর আয়োজিত দু'একটি সেমিনার ও ওয়ার্কশপে যোগ দিলে এ সম্পর্কিত ধারণা পরিষ্কার হয়। এ ব্যাপারে খাতওয়ারি বরাদ্দকৃত অর্থ তুলে কাজ শুরু করতে হবে। প্রথমে বিভাগীয় সহকর্মীদেরকে নিয়মানুযায়ী একটি পরিচিতিমূলক ধারণা দেবার জন্য অ্যাওয়ারনেস ওয়ার্কশপের আয়োজন করি। এ আয়োজনে আইকিউএসির পরিচালক ড. জাহাঙ্গীর আলম এ বিষয়ে সহকর্মীদেরকে প্রাথমিক ধারণা দেন। আমরাও এ বিষয়ে যা জেনেছি তা বিভাগীয় সহকর্মীদের অবগত করি। সবার জন্য উন্নতমানের উপহারসামগ্রী ও দুপুরে লাঞ্চের ব্যবস্থা করা হয়। এভাবে এসএসির প্রাথমিক ওয়ার্কশপটি সুসম্পন্ন হয়।

ওয়ার্কশপ শেষ হবার পর সেলফ অ্যাসেসমেন্ট রিপোর্ট লেখার ব্যাপারে উদ্যোগ গ্রহণ করি। এ লক্ষ্যে পাঁচ রকম স্টেকহোল্ডারদের কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করার জন্য শিক্ষকদের নিয়ে পাঁচটি কমিটি করি। প্রত্যেক কমিটিকে তথ্য সংগ্রহের কাজে ব্যবহারের জন্য অর্থ সরবরাহ করি। তাদেরকে প্রয়োজনীয়সংখ্যক প্রশ্নমালা ফটোকপি করে সরবরাহ করা হয়। এ পাঁচ রকমের স্টেকহোল্ডারদের মধ্যে ছিল: বিভাগীয় শিক্ষক, বিভাগীয় শিক্ষার্থী, নন একাডেমিক অফিসিয়াল স্টাফ, অ্যালামনাই এবং এমপ্লয়্যার। সবচেয়ে আগে শিক্ষার্থীদের তথ্য সংগৃহীত হয়। সংশ্লিষ্ট কমিটি মাত্র কয়েকদিনের মধ্যে এ কাজ সম্পন্ন করেন। এ দায়িত্বপ্রাপ্ত কমিটি বিভাগের সিনিয়র শিক্ষার্থীদেরকে ক্লাসরুমে বসিয়ে তাদেরকে মৌখিকভাবে এ সম্পর্কে একটি ধারণা দিয়ে প্রশ্নপত্র পূরণ করিয়ে সহজে কাজ শেষ করতে পারেন।

অন্য কমিটিগুলো এ কাজ সম্পন্ন করতে ৫-৬ মাসেরও বেশি সময় ব্যয় করে। এমনকি এ ব্যাপারে শিক্ষকদের মধ্যেও তথ্য প্রদানে অনীহা দেখা যায়। তাদেরকে বার বার তাগাদা দিয়েও সংশ্লিষ্ট কমিটি সদসস্যগণ তাদের কাছ থেকে সহায়তা পাননি। আবার অনেকে এ ব্যাপারে সহায়তা করতে যথেষ্ট দেরি করেন। অ্যালামনাই এবং এমপ্লয়ারদের কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহেও সংশ্লিষ্ট কমিটিগুলোর

বেশ দেরি হয়। কারণ, এ দুই শ্রেণির স্টেকহোল্ডারগণ প্রত্যেকে নিজ নিজ কাজে ব্যস্ত। তথ্য প্রদানের জন্য সময় দিতে চান না। অ্যালামনাসদের তথ্য সংগ্রহের জন্য সংশ্লিষ্ট কমিটি বিশেষ কৌশল অবলম্বন করে। শহরে একটি স্কুলে কিছুসংখ্যক অ্যালামনাসকে দাওয়াত দিয়ে একটি গেট টুগেদারের আয়োজন করা হয়। ওই সমাবেশে সবার সঙ্গে কুশলাদি বিনিময়ের পর তাদেরকে দিয়ে প্রশ্নমালা পূরণ করানো হয়। চট্টগ্রাম শহরের নাসিরাবাদস্থ সাউথপয়েন্ট স্কুল অ্যান্ড কলেজে অনুষ্ঠিত অ্যালামনাসদের এ সমাবেশে বিভাগীয় সভাপতি এবং এসএসি প্রধান হিসেবে আমি নিজেও যোগদান করি। এ কৌশলে কাজ করে সহজেই অ্যালামনাসদের তথ্য সংগ্রহ করা সম্ভব হয়। এমপ্লয়ারদের তথ্য সংগ্রহের কাজটিও ছিল বেশ কঠিন। তবে সংশ্লিষ্ট কমিটি অত্যন্ত আন্তরিকতার সঙ্গে কাজ করে যে ভাবেই হোক এক পর্যায়ে কিছুসংখ্যক এমপ্লয়ারের কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহে সক্ষম হন। এ ভাবে কিছুটা দেরি করে এক সময় স্যাম্পল সাইজ ছোট করে হলেও আমরা তথ্য সংগ্রহের কাজ শেষ করি।

তথ্য বিশ্লেষণের ব্যাপারে আমরা পরিসংখ্যান বিভাগের একজন শিক্ষকের সহায়তা গ্রহণ করি। এরপর রিপোর্ট লেখার পালা। অন্যান্য বিভাগে খোঁজ নিয়ে দেখা যায়, তিন সদস্যবিশিষ্ট এসএ কমিটি ভাগাভাগি করে রিপোর্ট লিখেছেন। সেলফ অ্যাসেসমেন্ট ম্যানুয়ালে রিপোর্ট লেখার বিষয়ে কিছু দিক নির্দেশনা দেয়া আছে। তার পর আবার এ বিষয়ে একাধিক ওয়ার্কশপ অনুষ্ঠিত হয়েছে। ওই সব ওয়ার্কশপে ইউজিসি থেকে আগত বিশেষজ্ঞগণ রিপোর্ট লেখার ব্যাপারে দিক নির্দেশনা দিয়েছেন। এমন দু'একটি ওয়ার্কশপে আমি যোগ দিয়েছি। একটি ওয়ার্কশপে যোগ দিয়ে আমরা বুঝতে পারি যে সেলফ অ্যাসেসমেন্ট রিপোর্ট লেখার কাজটি শিক্ষকদের কাছে নতুন অভিজ্ঞতা। এ কারণে প্রায় প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয়ে এ কাজ শিক্ষকগণ সময়মতো শেষ করতে পারছেন না। বিশেষজ্ঞদের বক্তব্য থেকে বুঝতে পারি, যেহেতু এ কাজটি আমরা প্রথম করছি, সে কারণে তারা চাইছেন এ বিষয়ে আমাদের খুব বেশি নিষ্ঠাবান না হলেও চলবে। তথ্য সংগ্রহের স্যাম্পল সাইজ ছোট করে হলেও যে ভাবেই পারি আমাদেরকে এ কাজ শেষ করতে হবে।

অর্থনীতি, লোক প্রশাসন, প্রভৃতি আমাদের নিকটতম বিভাগগুলোতে খোঁজ নিয়ে দেখি যে তাদের রিপোর্ট লেখার কাজ কমিটি সদস্যগণ ভাগাভাগি করে করেছেন। ফলে একেকজন ৩-৪টি করে অধ্যায় লিখেছেন। উল্লেখ্য, সেলফ অ্যাসেসমেন্ট ম্যানুয়েলে রিপোর্ট লেখার ব্যাপারে যে রূপরেখা দেয়া আছে সেখানে রিপোর্টে ১২টি সুনির্দিষ্ট অধ্যায় লেখার জন্য বলা হয়েছে। কিন্তু আমাদের এসএ কমিটি করার সময় কোন্ কোন্ শিক্ষকের এ রকম রিপোর্ট লেখার বিষয়ে পারদর্শিতা আছে সে বিষয়টি বিবেচনায় নিয়ে কমিটি করা হয়নি। কমিটি সদস্য করার সময় বিভাগীয় সিনিয়র সহকর্মীদের কমিটিতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। এ সব কারণে রিপোর্ট লেখার কাজ আমার ওপর পড়ে। আমার কিঞ্চিত লেখালেখির

অভিজ্ঞতা থাকলেও এ রকম প্রজেক্ট রিপোর্ট লেখার অভিজ্ঞতা ছিল না। যা হোক, আমি রিপোর্ট লেখার কাজ শুরু করি এবং রিপোর্টে কি বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা যায় সে বিষয়ে ভাবতে থাকি। সেলফ অ্যাসেসমেন্ট ম্যানুয়েলে রিপোর্টের যে রূপরেখা দেয়া আছে তার বাইরে কোনো প্রাসঙ্গিক বিষয় প্রয়োজনীয় মনে করলে অন্তর্ভুক্ত করার সুযোগ ছিল। আমি ওই সুযোগ কাজে লাগিয়ে আমাদের রিপোর্টে নতুন কিছু বিষয় অন্তর্ভুক্ত করি। এ বিষয়গুলো নিয়ে পরবর্তীতে আলোচনা করব। যেহেতু বিভাগীয় একাডেমিক উন্নয়ন এ কর্মকাণ্ডের মূল উদ্দেশ্য, সে কারণে একাডেমিক বিষয়ে আমাদের বিভাগে বিরাজমান অসুবিধাগুলো চিহ্নিত করে তুলে ধরি। সে সঙ্গে রিপোর্টে বিভাগের ইতিবাচক দিকগুলিসহ সম্মানিত শিক্ষকদের একাডেমিক পারফরম্যান্সও তুলে ধরার পরিকল্পনা করি। কিন্তু দুঃখের সঙ্গে বলতে হয়, বিভাগীয় সহকর্মীদের কাছ থেকে এ বিষয়ে প্রত্যাশিত সহায়তা পাওয়া যায়নি।

সহকর্মীদের সহযোগিতার উদাহরণ হিসেবে একটি নমুনা উল্লেখ করছি। আমি বিভাগীয় এসএ কমিটির প্রধান হিসেবে চিঠি দিয়ে সকল সম্মানিত সহকর্মীদের কাছে তাদের প্রকাশনা তালিকা দুই সপ্তাহ সময়ের মধ্যে প্রদানের জন্য অনুরোধ করি। প্রভাষকদেরকে বলি যে, তাদের কোনো লেখা যদি প্রকাশনার জন্য গৃহীত হয়, তাহলে তারা সে বিষয়টিও উল্লেখ করতে পারবেন। প্রায় সকল শিক্ষকেরই নিজস্ব বায়োডাটা তৈরি করা থাকে। কাজেই তারা যদি তাদের প্রকাশনা তালিকা দিতে আন্তরিক হতেন তাহলে খুব সহজে স্বল্প সময়ে ওই বায়োডাটা থেকে প্রকাশনা তালিকার অংশটুকু প্রিন্ট করে জমা দিতে পারতেন। কিন্তু তারা তা করেননি। প্রদত্ত দুই সপ্তাহ সময়ের পর দেখা যায়, প্রায় ২৫ জন সহকর্মীর মধ্যে আমিসহ মাত্র চারজন সহকর্মী তাদের প্রকাশনা তালিকা জমা দেন। নির্দিষ্ট তারিখের পর আরও একজন তার প্রকাশনা তালিকা জমা দিলে এ সংখ্যা ৫জনে দাঁড়ায়। আমার এসএ কমিটির একজন সদস্যও তার প্রকাশনা তালিকা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে জমা দেননি। আমি এ পাঁচজনের তালিকা রিপোর্টের পরিশিষ্টে কারো ব্যক্তিগত নাম উল্লেখ না করে 'রাজনীতিবিজ্ঞান বিভাগের ৫জন শিক্ষকের প্রকাশনার তালিকা' হিসেবে সন্নিবেশিত করি। কারণ, দু'একজন আমাকে বলেন, 'স্যার কারো প্রকাশনা অনেক বেশি এবং কারো প্রকাশনা অনেক কম, সে ক্ষেত্রে আমাদের যাদের প্রকাশনা কম তাদের কাছে বিষয়টি তো ভালো লাগবে না। তখন আমি কারো নাম উল্লেখ না করে এমন সিদ্ধান্ত নেই। পরে চূড়ান্ত রিপোর্টে সবার নামে পৃথকভাবে তাদের প্রকাশনা তালিকা সংযুক্ত করি। কিভাবে সবার প্রকাশনা সংগ্রহ করা সম্ভব হয় সে বিষয়টি পরিষ্কার করা দরকার।

এসএ রিপোর্টের প্রথম খসড়া দিনব্যাপী ওয়ার্কশপ করে সকল বিভাগীয় সহকর্মীদের সামনে উপস্থাপন করি। এ ওয়ার্কশপে প্রথম চার পাঁচ অধ্যায় শুরুতে সকল শিক্ষকের উপস্থিতিতে উপস্থাপন করি এবং দুপুরে লাঞ্চের পর বাকি অধ্যায়গুলো উপস্থাপন করা হয়। রিপোর্টের কিছু কিছু বিষয় অনেক সহকর্মীর খুব

একটা ভালো লাগেনি। তারপরও সবাই মনোযোগ দিয়ে রিপোর্টের উপস্থাপনা শোনেন এবং শেষে কতিপয় সহকর্মী কিছু মন্তব্য করেন এবং পরামর্শ দেন। এ সকল পরামর্শ অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করা হয় এবং রিপোর্ট চূড়ান্তকরণের আগে সেগুলি রিপোর্টে সন্নিবেশিত করা হয়। বিশেষ করে বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনায় বিভাগীয় শিক্ষকদের ইতিবাচক অবদানের কথা যোগ করা হয়। রিপোর্ট চূড়ান্ত হয়ে গেলে এ রিপোর্ট রিভিউ করার জন্য এবং বিভাগীয় একাডেমিক কার্যক্রম সরেজমিনে পর্যবেক্ষণ করার জন্য তিনজন বিশেষজ্ঞ সদস্যবিশিষ্ট পিয়ার রিভিউ কমিটির আসার কথা। এ তিন সদস্যের মধ্যে একজন সদস্য বিদেশি হবার বাধ্যবাধকতা ছিল।

রাজনীতিবিজ্ঞান এবং লোক প্রশাসন বিভাগ মিলে আমরা যৌথভাবে পিয়ার রিভিউ কাজ সম্পন্ন করার ব্যবস্থা গ্রহণ করি। কিন্তু লোক প্রশাসন বিভাগের রিপোর্ট ওই বিভাগের একাডেমিক কমিটি গ্রহণ না করায় তাদের পিয়ার রিভিউ কার্যক্রম বাধাগ্রস্ত হয়। ফলে রিভিউ কমিটির সদস্যগণ তিনদিন ক্যাম্পাসে অবস্থান করে কেবল আমাদের বিভাগের রিপোর্ট এবং বিভাগীয় কার্যক্রম পর্যালোচনা ও পরীক্ষা করেন। এ কমিটিতে ছিলেন ভারতের দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের প্রফেসর ড. বিদ্যুত চক্রবর্তী, সিলেট শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃবিজ্ঞান বিভাগের প্রফেসর ও ওই বিশ্ববিদ্যালয়ের আইকিউএসির পরিচালক প্রফেসর ড. আবদুল আউয়াল বিশ্বাস এবং জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের সরকার ও রাজনীতি বিভাগের প্রফেসর ড. নইম সুলতান। এরা তিনদিন ক্যাম্পাস ক্লাবে অবস্থান করেন এবং সকাল থেকে বিকাল পর্যন্ত বিভাগে অবস্থান করে তাদের কার্যক্রম পরিচালনা করেন। প্রথম দিন বিভাগে এলে আমরা তাদেরকে স্বাগত জানাই। ওই দিনই সকালে প্রথমে সকল ফ্যাকাল্টি মেম্বারদের সঙ্গে মিটিং ছিল। এ সভায় শিক্ষকদের হাজির হতে দেরি দেখে প্রফেসর চক্রবর্তী অসন্তোষ প্রকাশ করেন। তিনি বিভাগীয় শিক্ষকদের সংখ্যা এবং উপস্থিতির হার দেখে সভা বাতিল করে দিতে বলেন। পরে আরও কয়েকজন সহকর্মী এলে সভা শুরু হয়। প্রথমেই প্রফেসর চক্রবর্তী সকল শিক্ষকের একাডেমিক প্রোফাইল এবং বিশেষ করে তাদের গবেষণা ও প্রকাশনা সম্পর্কে জানতে চান। আমি তাকে অবগত করি যে, আপনাদেরকে যে এসএ রিপোর্টের খসড়া দেয়া হয়েছে ওই রিপোর্টে পাঁচজন বিভাগীয় শিক্ষকের প্রকাশনার উল্লেখ রয়েছে। আমরা চিঠি দিয়ে সবার কাছে তাদের প্রকাশনা তালিকা চেয়েছিলাম, কিন্তু বাকি শিক্ষকগণ যে কোনো কারণেই হোক প্রকাশনা তালিকা জমা না দেয়ায় আমরা তাদের প্রকাশনা রিপোর্টে সন্নিবেশিত করতে পারিনি। তিনি এ বিষয়ে উষ্মা প্রকাশ করলে শিক্ষকগণ পরবর্তীতে তাদের একাডেমিক প্রকাশনার তালিকা জমা দিতে সম্মত হন।

পিয়ার রিভিউ কমিটি তিনদিন অবস্থান করে বিভাগের শিক্ষক, ছাত্র, কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সঙ্গে পৃথক পৃথক সভা করেন (শিক্ষার্থীদের সঙ্গে পিয়ার

রিভিউ কমিটির মিটিংয়ের ছবির জন্য দেখুন পরিশিষ্ট- ৭:৭)। তাঁরা তাদের সমস্যা মনাযোগ দিয়ে শোনেন। তাঁরা ক্লাস রুটিন, ক্লাস লোড, সিলেবাস, সেমিনার লাইব্রেরি, শ্রেণিকক্ষ, কম্পিউটার ল্যাব, প্রভৃতি পর্যবেক্ষণ করেন। এ তিনদিন এসএ কমিটির সদস্য হিসেবে আমরা সার্বক্ষণিকভাবে বিভাগে তাদের সহযোগিতা প্রদান করি। এরা রাতে ক্যাম্পাস ক্লাবে অবস্থান ও খাওয়া দাওয়া করেন। তাঁদের অবস্থান ও খাওয়া দাওয়ায় যাতে কোনো অসুবিধা না হয় সে বিষয়ে আমরা লক্ষ্য রাখি। পিয়ার রিভিউ কমিটির তিনজনের কেউই ল্যাপটপ না আনায় এ তিনদিনের মধ্যে শেষ দু'দিন তাঁরা বিভাগের কম্পিউটার ল্যাব ব্যবহার করে লেখালেখির কাজ করেন। ওই সময় বিভাগীয় কম্পিউটার ল্যাব সহকারী এবং অন্য একজন স্টাফ তাদের সঙ্গে থেকে তাদেরকে সব রকম সহায়তা দেন। সকল পর্যবেক্ষণের কাজ শেষ হলে এরা যাবার কয়েকদিনের মধ্যে এক্সিট রিপোর্ট এবং পরবর্তী ২-৩ সপ্তাহের মধ্যে পূর্ণাঙ্গ রিপোর্ট দেবার কথা। তবে বেশ কয়েকদিন পর আমরা তাদের দেয়া এক্সিট রিপোর্টের একটি কপি হাতে পেলেও ওই কমিটি দীর্ঘদিনেও পূর্ণাঙ্গ রিপোর্ট প্রদান করেননি।

প্রফেসর বিদ্যুত চক্রবর্তীর সম্মানী থেকে 'অধিক হারে' ট্যাক্স কেটে নেয়ায় তিনি মনঃক্ষুণ্ন হন এবং দেশে গিয়ে তিনি এ ব্যাপারে আইকিউএসি এবং পরবর্তীতে ভিসি মহোদয়কে ইমেইল বার্তা দেন। যা হোক, আমরা অনেক দেরি করেও চূড়ান্ত রিপোর্ট না পেয়ে এক্সিট রিপোর্টের আলোকে আমাদের রিপোর্টে কিছু ঘষামাজা করে এসএ রিপোর্ট চূড়ান্ত করি। এক্সিট রিপোর্টে তাঁরা বিভাগীয় কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ করে বিভাগকে 'ভালো' হিসেবে মূল্যায়ন করেন। তাঁরা সিলেবাসে নতুনত্ব আনতে পরামর্শ দেন। সে সঙ্গে তাঁরা আমাদের কার্যক্রমে দক্ষিণ এশীয় মেহমানি সংস্কৃতির প্রতিফলন ঘটেনি বলে উল্লেখ করেন। আমরা তাঁদের আদর-যত্নে কোনো ত্রুটি করিনি। তার পরেও একটিমাত্র কারণে তাঁরা এমন মন্তব্য করেন। যে দু'দিন তাঁরা অফিস আওয়ারের পর বিভাগীয় কম্পিউটার ল্যাবে কাজ করেছিলেন, সে সময় আমরা কেউ তাঁদের সঙ্গে না থাকায় তাঁরা বিষয়টিকে ভালোভাবে নেননি। এ বিষয়ে আমার কিছু করার ছিল না। কারণ, ক্যাম্পাস থেকে আমাদের শেষ বাস ছাড়ে বিকেল পাঁচটায়। আমি ওই বাসে শহরে চলে এসেছি। কমিটির অন্য এক সদস্যও শেষ বাসে, বা তার আগে চলে এসেছেন। কাজেই তাঁদের কারো কাছে ল্যাপটপ না থাকায় যখন সন্ধ্যায় কম্পিউটার ল্যাবে তাঁরা কাজ করেছেন তখন তাঁদের সঙ্গে কেবলমাত্র কম্পিউটার ল্যাব সহকারী এবং একজন চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারী চা-পানি সরবরাহ করার জন্য অবস্থান করেছেন। তাঁরা হয়ত আশা করেছিলেন যে, তাঁদের সঙ্গে একজন শিক্ষকও থাকবেন। বিষয়টি আমরা বুঝতে পারিনি। তাহলে হয়ত আমরা নিজেরা না থাকতে পারলেও সে ব্যবস্থা করতে পারতাম। কারণ, তাঁরা রিপোর্ট লেখা সংক্রান্ত ব্যক্তিগত গোপনীয় কাজ করবেন। সেখানে আমরা আমাদের থাকাটা প্রয়োজনীয় মনে করিনি।

রিপোর্ট চূড়ান্ত করার আগে সকল শিক্ষকের প্রকাশনা তালিকা রিপোর্টের পরিশিষ্টে যোগ করি। এ কাজ করতে গিয়ে আমাকে যথেষ্ট সময় ও শ্রম দিতে হয়। কারণ, শিক্ষকগণের দু'একজন বাদে অন্যরা তাদের প্রকাশনা তালিকা একেকজন একেকভাবে জমা দেন। কেউ কেউ তাঁদের প্রকাশনাসহ পূর্ণ জীবনবৃত্তান্ত জমা দেন। শিক্ষকদের প্রকাশনার ওপর কাজ করে এগুলোতে একরূপত্ব এনে পরিশিষ্টে সন্নিবেশিত করতে গিয়ে আমি তাঁদের প্রকাশনা তালিকায় বেশ কিছু অসঙ্গতি লক্ষ্য করি। এ সব অসঙ্গতি ঠিক করতে গিয়ে আমাকে ইন্টারনেটে প্রচুর সময় ব্যয় করতে হয়। পরে অসঙ্গতিগুলো ঠিক করে আবার সংশ্লিষ্ট শিক্ষকদের দেখিয়ে সেগুলো চূড়ান্ত করি। এ সব অসঙ্গতির মধ্যে কয়েকটি অসঙ্গতি ছিল নিম্নরূপ:

(ক) যৌথভাবে প্রকাশিত কোনো প্রকাশনাকে অনেক শিক্ষক তাঁর সহ-লেখকদের নাম উল্লেখ না করে একনামে দেখান;
(খ) কতিপয় শিক্ষক তাঁদের প্রকাশনার সাল ভুলভাবে লিখেন;
(গ) কিছুসংখ্যক শিক্ষক তাঁদের প্রকাশিত প্রবন্ধের ভল্যুম সংখ্যা এবং পৃষ্ঠার নম্বর উল্লেখ করেননি;

এ সব খুঁটিনাটি বিষয় সম্পাদনা করে শিক্ষকদের প্রকাশনাগুলো গ্রন্থ, প্রবন্ধ, মনোগ্রাফ, অধ্যায়, রিসার্চ নোট, রিসার্চ রিপোর্ট প্রভৃতি ক্যাটেগরিতে ভাগ করে বরিষ্ঠতা অনুসারে পরিশিষ্টে যোগ করা হয়। এ ভাবে রিপোর্ট চূড়ান্ত করে আমরা তা বাঁধাই করি।

রিপোর্ট লেখার কাজটি এসএ কমিটির প্রধান হিসেবে আমাকে করতে হয়। এসএ ম্যানুয়েলের ফরম্যাটে ১২ অধ্যায়বিশিষ্ট রিপোর্ট লিখার নির্দেশনা ছিল। এর সবগুলো অধ্যায়ই আমাকে লিখতে হয়। সে কারণে রিপোর্টে লেখক হিসেবে আমার নাম উল্লেখ করি। কারণ, অন্য সদস্যরা কিছু না লেখায় আমি রিপোর্টে লেখক হিসেবে তাঁদের নাম দিতে চাইনি। আমি হয়ত লেখক হিসেবে বাকি দুই সদস্যের নাম দিলে তাঁরা খুশি হতেন। কিন্তু এমনটা করতে আমার বিবেক আমাকে বাধা দিয়েছে। তা ছাড়া এমনটি করলে আমাকে পরে প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হত। এসএ কমিটির কয়েকটি ওয়ার্কশপ অনুষ্ঠিত হলেও ওই ওয়ার্কশপগুলোর হিসাব নিকাশ আইকিউএসিকে বুঝিয়ে দিতে পারিনি। এ ব্যাপারে আমি এসএ কমিটি সদস্যদের একজনকে বার বার তাগাদা দিয়েও এ কাজ সম্পন্ন করাতে পারিনি। আমি নিজে হয়ত চেষ্টা করলে এ কাজ করতে পারতাম। কিন্তু আমি তা করিনি। কারণ, আমি চেয়েছি, কমিটির অন্য সদস্যগণও যেন এ কাজে সংশ্লিষ্ট হন। কারণ, কোনো কাজ না করে যদি তাঁরা পরবর্তীতে এসএ কমিটির সদস্য হিসেবে সম্মানী গ্রহণ করেন, তাহলে তাঁদের ভালো লাগবে না। আমি কমিটির কাজে তাঁদের অংশগ্রহণ চেয়েছি এবং শেষের দিকে অনুষ্ঠিত

ওয়ার্কশপগুলোতে, পিয়ার রিভিউরারদের এসএ কমিটির কাজ পরিদর্শনকালে এবং হিসাব নিকাশের কাগজপত্র তৈরির ব্যাপারে আমি তাঁদের পূর্ণ সহযোগিতা পেয়েছি।

কেমন হলো এসএ রিপোর্ট? যেহেতু এককভাবে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ১২ অধ্যায়ের এ রিপোর্ট লিখতে হয়েছে সে জন্য সবকিছুই যে এ রিপোর্টে আনা সম্ভব হয়েছে এমন দাবি করব না। উল্লেখ্য, এ রিপোর্ট লেখার ১২ অধ্যায়ের যে ফরম্যাট এসএ ম্যানুয়েলে উল্লেখ করা হয়েছে তা বিশ্বব্যাংকের বিদেশি বিশেষজ্ঞদের ডিজাইন করা। ওই ম্যানুয়েলে বাংলাদেশি সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর স্থানীয় বাস্তবতার অনেক কিছু সন্নিবেশিত করা হয়নি। উল্লেখ্য, এ রিপোর্টের মূল লক্ষ্য হলো বিভাগের একাডেমিক উন্নয়ন সুনিশ্চিত করা। সে লক্ষ্যকে সামনে রাখলে এ ১২টি অধ্যায়ের মধ্যে একটি অধ্যায় করা উচিত ছিল বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষকদের দলীয় রাজনীতির ওপর। কারণ, ছাত্র-শিক্ষকদের দলীয় রাজনীতি সরকারি বিশ্ববিদালয়গুলোর একাডেমিক তৎপরতায় ব্যাঘাত ঘটায়। বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে সেশন জট তৈরি করে। কিন্তু এসএ ম্যানুয়েলে সে রকম কিছু ছিল না। তবে যেহেতু ম্যানুয়েলে উল্লিখিত বিষয়গুলোর বাইরেও স্থানীয় বাস্তবতা বিবেচনায় নিয়ে লেখার অনুমতি ছিল, সে জন্য আমি এ রিপোর্টে এ সব বিষয় আলোচনা করেছি। আমার এমন আলোচনা অনেকের পছন্দ হয়নি। এমনকি পিয়ার রিভিউ কমিটির তিনজন সম্মানিত সদস্যের উপস্থিতিতে রিপোর্টে সন্নিবেশিত সংশ্লিষ্ট অধ্যায় উপস্থাপনাকালে আমি সরকারি বিশ্ববিদালয়গুলোর ভাইস চ্যান্সেলর নিয়োগের স্বরূপ এবং অনেক ভিসির দুর্নীতিমূলক কাজের আলোচনা উপস্থাপন করলে একজন রিভিউ কমিটির সদস্য এ বিষয়ে তাঁর বক্তব্যে আমাকে ভিসিদের প্রসঙ্গ আলোচনায় না আনতে পরামর্শ দেন। আমি বিনয়ের সঙ্গে তাঁর বক্তব্য গ্রহণ করতে রাজি হইনি। তাঁর সঙ্গে দ্বিমত পোষণ করে বলেছি, দেখুন, ভাইস চ্যান্সেলরগণ হলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক এবং একাডেমিক প্রধান। দলীয় দৃষ্টিভঙ্গির কাছে যদি তাদের পেশাদারিত্ব ক্ষুণ্ন হয় তাহলে বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক উন্নতি বাধাগ্রস্ত হতে বাধ্য। যেমন, আমাদের এ রিপোর্ট লেখার উদ্দেশ্য হলো বিভাগের একাডেমিক উন্নয়ন সুনিশ্চিত করা। এখন ভিসি মহোদয় যদি অযোগ্য চাকুরি প্রার্থীদেরকে দলীয় বিবেচনায়, বা অন্য কোনো কারণে শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ দিয়ে বিভাগে যোগদান করান, তাহলে কিভাবে বিভাগের একাডেমিক উন্নয়ন হবে? আমার এমন যুক্তি তুলে ধরার পর তাঁরা তা মেনে নেন। আমি রিভিউ কমিটি সদস্যের উল্লিখিত প্রস্তাব গ্রহণ করিনি।

আরও কিছু নতুন বিষয় আমি চিন্তা-ভাবনা করে রিপোর্টে যুক্ত করি। যেমন, বিভাগীয় শিক্ষকদের মধ্যে ক্লাস কম করার প্রবণতা তুলে ধরার জন্য আমি গোপনে দুই সপ্তাহের জন্য সহকর্মীদের ক্লাস উপস্থিতি দেখভাল করাই। এ পর্যবেক্ষণে দেখা যায়, শিক্ষকরা ওই দুই সপ্তাহে প্রায় শতকরা ৪৯ ভাগ ক্লাস

নেননি। এমন তথ্য সব সময়ের চিত্র না হলেও এটি আতঙ্কের বিষয়। আবার শিক্ষকদের মধ্যে খাতা পরীক্ষা করা এবং পরীক্ষার ফলাফল প্রদানের ব্যাপারে গড়িমসি আছে, যে কারণে পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশে বিলম্ব ঘটে। আমি বিভাগীয় অফিসের সহায়তা নিয়ে গত ৬টি পরীক্ষায় ফলাফল প্রকাশে কেমন সময় লেগেছে তার ওপর একটি সারণি তৈরি করে রির্পোটে সন্নিবেশিত করি, যা সংক্ষিপ্তাকারে সারণি- ৭:১-এ দেখানো হলো। এ সারণিতে দেখা যায়, ছয়টি পরীক্ষায় প্রায় ৮মাস সময়ের আগে আমরা পরীক্ষার ফলাফল দিতে পারিনি।

এসএ রিপোর্ট লেখার কাজ শেষ করার পর আমাদের হাতে সামান্য টাকা থেকে যায়। আমরা ভাবছিলাম এ টাকা ফেরত দেব কিনা। পরে আমরা ভেবে দেখলাম, শিক্ষার্থীদের একাডেমিক উন্নয়নের জন্য এতকিছু করা হলেও তাদেরকে নিয়ে আমরা সেলফ অ্যাসেসমেন্ট প্রোগ্রামে উল্লেখযোগ্য কিছু করিনি। আমরা কেবলমাত্র একবার তাদের কাছ থেকে বিভাগের বিভিন্ন সমস্যাদি সম্পর্কে প্রশ্নপত্র পূরণ করিয়েছিলাম। আইকিউএসি শিক্ষার্থীদের নিয়ে অনুষ্ঠান করবে বলার দু'মাস পার হলেও তারা তখনও কিছু করেনি, যদিও তাদের চাহিদামত আমরা মেধার ভিত্তিতে বিভাগীয় ২৫ জন শিক্ষার্থীর একটি তালিকা অনুরুদ্ধ হয়ে আইকিউএসিতে পাঠিয়েছিলাম। কাজেই আমরা মনস্থ করি, আইকিউএসি করুক বা না করুক, আমরা আমাদের বিভাগীয় শিক্ষার্থীদেরকে নিয়ে একটি সেলফ অ্যাসেসমেন্ট অ্যাওয়্যারনেস ওয়ার্কশপ করব। যে টাকা আছে তা খরচ করলে আমরা তা করতে পারব। এসএ কমিটির দুইজন সদস্য এ ব্যাপারে সম্মতি দিলে আমরা পূর্বে তালিকাকৃত ২৫ জনকে নিয়ে ২০১৭ সালের ৬ নভেম্বর তারিখে বিভাগের একটি শ্রেণিকক্ষে ওয়ার্কশপ করি। এসএ কমিটির দুই সদস্য সেলফ অ্যাসেসমেন্ট কমিটির উদ্দেশ্য, লক্ষ্য এবং আমরা কতদূর কি করেছি এবং করার পরিকল্পনা করছি সে সম্পর্কে অংশগ্রহণকারী শিক্ষার্থীদেরকে বিস্তারিতভাবে জানান। আমিও তাদের উদ্দেশ্যে বক্তব্য রাখি এবং আমাদের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা সম্পর্কে তাদেরকে অবহিত করি। এরপর আমরা ফ্লোর ওপেন করে তাদের পরামর্শ শুনি। বিভাগের উন্নয়নের জন্য তারা আমাদেরকে মন খুলে অনেক পরামর্শ দেয়। বিশেষ করে ক্লাস ও পরীক্ষা যাতে নিয়মিতভাবে সময়মত হয়, পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশে যাতে বিলম্ব না হয়, বিভাগে যাতে এক্সট্রা কারিকুলার কার্যক্রম বাড়ানো যায়, প্রভৃতি আরো নানা পরামর্শ আসে শিক্ষার্থীদের পক্ষ থেকে। আলোচনা শেষে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে একাডেমিক কাজে ব্যবহারযোগ্য কিছু উপহারসামগ্রী বিতরণ করে তাদেরকে মধ্যাহ্নভোজে আপ্যায়ন করা হয় (ওয়ার্কশপে অংশগ্রহণকারীদের ছবির জন্য দেখুন পরিশিষ্ট- ৭:৮)। শিক্ষার্থীরা এতে আমাদের ওপর দারুন খুশি হয়। কারণ, তারা ভালো করেই জানত, অন্য সব বিভাগে সেলফ অ্যাসেসমেন্ট কার্যক্রম পরিচালিত হলেও সে সব বিভাগে শিক্ষার্থীদের সঙ্গে পৃথক ওয়ার্কশপ করা হয়নি।

সারণি-৭:১

পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশে ব্যয়িত সময়

পরীক্ষা	শিক্ষাবর্ষ	পরীক্ষা শুরু	পরীক্ষা শেষ	ফল প্রকাশ	সময় মাস দিন
এমএসএস	২০১৪-'১৫	২৮-১২-'১৫	১২-০২- '১৬	১৯-০৯-'১৬	০৮ ১৬
৪র্থ বর্ষ সম্মান	২০১৪-'১৫	০৬-১০-'১৫	০৩-১২-'১৫	০৮-০৮-'১৬	০৮ ০৬
৩য় বর্ষ সম্মান	২০১৪-'১৫	২৬-০৮-'১৫	১৭-১০-'১৫	০১-০৬-'১৬	০৮ ১৩
২য় বর্ষ সম্মান	২০১৪-'১৫	১৮-০৪-'১৫	৩০-০৫-'১৫	২৬-০১-'১৬	০৭ ২৭
১ম বর্ষ সম্মান	২০১৪-'১৫	১৪-০২-'১৫	১১-০৪-'১৫	১৫-১১-'১৫	০৮ ০৪
১ম বর্ষ সম্মান	২০১৫-'১৬	১৯-১২-'১৫	০৩-০২-'১৬	০৯-১১-'১৬	০৯ ০৬

উৎস: এসএ রিপোর্ট-২০১৮, রাজনীতিবিজ্ঞান বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, পৃষ্ঠা-২৩।

এরপর আমরা উন্নয়ন পরিকল্পনা তৈরির কাজ শুরু করি। খোঁজ নিয়ে জানতে পারি, অনেক বিভাগ তিন বছরের জন্য ৮ কোটি, ১০ কোটি বা তারও বেশি টাকার উন্নয়ন পরিকল্পনা তৈরি করে জমা দেয়। আমাকেও অনেক বিভাগীয় সহকর্মী বেশি করে টাকা চেয়ে উন্নয়ন পরিকল্পনা তৈরি করতে পরামর্শ দেন। কিন্তু আমি তাঁদের পরামর্শ সম্মান করলেও একটা যৌক্তিক পরিমাণে অর্থ দাবি করে উন্নয়ন পরিকল্পনা তৈরি করি। বিভিন্ন ক্ষেত্রে যেমন, গভর্নেন্স, পাঠ্যক্রম, ছাত্র ভর্তি, ছাত্র সেবা, এক্সট্রা কারিকুলার কার্যক্রম, অবকাঠামোগত সুবিধা, প্রশিক্ষণ, কর্মকর্তা কর্মচারীদের সুযোগ-সুবিধা, গবেষণা, প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়ভিত্তিক পৃথক বরাদ্দ দেখিয়ে মোট ৩ কোটি ৭৫ লাখ ৮০ হাজার টাকার উন্নয়ন বাজেট তেরি করি। প্রথমে আমরা পিয়ার রিভিউয়ারদের ফাইনাল রিপোর্ট না পাওয়ায় সেলফ অ্যাসেসমেন্ট রিপোর্ট চূড়ান্ত করতে পারিনি। পরে খুব বেশি দেরি না করে এক্সিট রিপোর্টের ওপর ভিত্তি করে আমাদের রিপোর্ট চূড়ান্ত করি এবং ১০ ডিসেম্বর ২০১৭ সালে তা আইকিউএসি অফিসে সম্মিলিতভাবে গিয়ে জমা দেই। এরপর আমরা ২০১৮ সালের ৮ মার্চ তারিখে গিয়ে আমাদের তিন বছরের জন্য তৈরিকৃত (২০১৮-২০২১) উন্নয়ন পরিকল্পনা জমা দিয়ে সেলফ অ্যাসেসমেন্ট কমিটির কার্যক্রম শেষ করি। অনেক পরে আমাদের জমা দেয়া কারিকুলাম বিশ্বব্যাংক প্রদর্শিত ফরম্যাট অনুযায়ী হয়নি বিধায় আমাদেরকে চিঠি দেয়া হলে আমাকে নতুন করে ফরম্যাট অনুযায়ী কারিকুলাম তৈরি করে জমা দিতে হয়। প্রায় তিন বৎসরাধিক সময় এসএ কমিটির কাজে জড়িত থেকে আমি অনেক কিছু শিখতে পারি। সম্মানিত শিক্ষক ও কর্মকর্তাদের মনস্তত্ব এবং শিক্ষার্থীদের চিন্তা-ভাবনা ও চাহিদা সম্পর্কে আমাদের বাস্তব ধারণা অধিকতর সমৃদ্ধ হয়।

বিভাগে শিক্ষক নিয়োগ

বিভাগীয় শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে দুটি কমিটি থাকে। একটি কমিটি প্রভাষক এবং সহকারী অধ্যাপক এবং অন্য কমিটি সহযোগী অধ্যাপক ও অধ্যাপক নিয়োগের জন্য গঠিত হয়। প্রতি দু'বছর পর পর এ কমিটি পুনর্গঠিত হয়। এ সব নিয়োগ কমিটি সব সময় দলীয়ভাবেই গঠিত হয়ে থাকে। বিভাগ থেকে যে নামই পাঠানো হোক না কেন, বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ তাদের নিজ বর্ণদলীয় সমর্থক শিক্ষকদেরকে দিয়ে এমন কমিটি গঠন করে। এ ক্ষেত্রে বিভাগ থেকে যাদের নাম পাঠানো হয় তাদেরকে বাদ দিয়ে নিজ বর্ণদলীয় পছন্দমতো শিক্ষকদেরকে দিয়ে এমন কমিটি গঠনের উদাহরণ আছে। সে ক্ষেত্রে বিভাগীয় সভাপতি এবং শিক্ষকদের অসম্মানিত বোধ করার কথা। এ সব ভেবে রাজনীতিবিজ্ঞান বিভাগ কমিটি করার জন্য নাম চাইলে জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে প্রথম দশ জনের নাম পাঠিয়ে দেয়। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ সেখান থেকে তাদের দলীয় বিবেচনা মাথায় রেখে কমিটিতে শিক্ষকদেরকে মনোনয়ন দেন। সে জন্য যে বর্ণদলীয় শিক্ষকদের সমর্থিত রাজনৈতিক দল সরকারে থাকে, তাঁরাই সাধারণত শিক্ষক নিয়োগ কমিটিতে জায়গা পান। আর আমার মতো যদি বর্ণহীন কোনো শিক্ষক থাকেন, তাহলে তাঁরা কোনো নিয়োগ কমিটিতে জায়গা পান না। এ কারণে আমার চেয়ে জুনিয়র হয়েও অনেকে দলীয় বিবেচনায় নিয়োগ কমিটিতে জায়গা পেয়েছেন। কিন্তু আমার অবসরের সময় কাছে এলেও আজ পর্যন্ত দলীয় বর্ণ পরিচয় না থাকার কারণে আমাকে কখনো উল্লেখিত দুই কমিটির কোনো নিয়োগ কমিটিতে মনোনীত করা হয়নি।

আমার তিন বছরের সভাপতির সময়কালে নিয়োগ নিয়ে জটিলতা হয় এবং এ সব বিষয় নিয়ে একাধিক তদন্ত কমিটি গঠিত হয়। বিষয়টির শুরু আমার পূর্ববর্তী পদত্যাগী সভাপতি প্রফেসর মনোয়ার কবীর-এর আমল থেকে। মধ্য-২০১৪ সালে রাজনীতিবিজ্ঞান বিভাগে চারজন প্রভাষক নিয়োগের জন্য বিজ্ঞাপন দেয়া হলে সে আবেদনে উল্লেখযোগ্যসংখ্যক আবেদনপত্র জমা পড়ে। পরের বছর এর সিলেকশন বোর্ড বসে এবং চারজনের জায়গায় বিভাগে অধিক শিক্ষকের চাহিদা না থাকা সত্ত্বেও সাত জনকে নিয়োগ দেয়া হয়। এই নতুন নিয়োগ পাওয়া সাত জনের মধ্যে ছয়জন আমাদের বিভাগ থেকে এবং একজন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাশ করা শিক্ষক।[৪০] আবার এদের মধ্যে পাঁচজন নারী এবং দুইজন পুরুষ। ২০১৫ সালের ১৩ মে তারিখে এরা বিভাগে প্রভাষক পদে যোগদান করেন। এ নিয়োগ নিয়ে বিভিন্ন রকম অভিযোগ ওঠে। যেহেতু অধিকাংশ প্রার্থীরাই ছিলেন আমাদের বিভাগের শিক্ষার্থী, কাজেই অন্তত তাদের প্রত্যেকের

৪০. এরা হলেন: সর্বজনাব মো: সেলিমুল হক, মুহাম্মদ ইসহাক, উম্মে হাবিবা, শারমিলা কবির সীমা, তাসলিমা আক্তার, হাসিনা আফরোজ শান্তা ও দীপাঞ্জলী বড়ুয়া পিংকি।

মান সম্পর্কে আমাদের যেমন ধারণা ছিল, সিলেকশন বোর্ডের তিনজন সিনিয়র অধ্যাপকেরও তেমনই ধারণা ছিল। তাঁরা যাঁদেরকে নিয়োগ দেন তাঁদের প্রতি পূর্ণ সম্মান রেখে বলা যায়, নিয়োগপ্রাপ্তদের কারও কারও চেয়ে অধিকতর মেধাবী কতিপয় ভালো প্রার্থী থাকা সত্ত্বেও তাঁদের চাকুরি হয়নি। সবার নাম উল্লেখ না করে এ ক্ষেত্রে সালেহ শাহরিয়ার নামের আমাদের বিভাগ থেকে পাস করা একজন ছাত্রের কথা বিশেষভাবে বলা যায়। এ আবেদনকারী যে একজন মেধাবী ছাত্র ছিল এবং শিক্ষক হলে যে সে একজন ভালো শিক্ষক হতে পারত সে সম্পর্কে বিভাগীয় সকল শিক্ষক একমত পোষণ করলেও তার চাকুরি হয়নি। চাকুরি না পেয়ে এ মেধাবী ছেলেটি বৃত্তি নিয়ে চীনে পিএইচডি করতে যান এবং ২০১৯ সালে চায়নার নর্থ ওয়েস্ট এ অ্যান্ড এফ ইউনিভার্সিটি থেকে পিএইচডি ডিগ্রি অর্জন করেন। পিএইচডি করাকালীন তিনি রিসার্চ জার্নালে কতিপয় গবেষণা প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। ওই ইউনিভার্সিটির গ্রাজুয়েট স্কুল প্রদত্ত আউটস্ট্যান্ডিং ওয়ার্ক অ্যাওয়ার্ড-২০১৯ অর্জনের মধ্য দিয়ে বিদেশি বিশ্ববিদ্যালয়ে আমাদের বিভাগের সম্মান বৃদ্ধি করেন (শাহরিয়ারের পিএইচডি ডিগ্রি অর্জনের ছবির জন্য দেখুন পরিশিষ্ট- ৭:৯)। চাকুরি পাওয়া সাতজনের দু'জন জহিরুল কাইয়ুম এবং হাসিনা আফরুজ শান্তা চীনের দুটি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পিএইচডি এবং আরেকজন দীপাঞ্জলী বড়ুয়া পিংকী কানাডার একটি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এমএ ডিগ্রি করেন। এদের নিয়োগের প্রকৃতি অস্থায়ী ছিল। শান্তা অস্থায়ী পদে থাকা সত্ত্বেও তার শিক্ষা ছুটি মঞ্জুর করা হয়, কিন্তু দীপাঞ্জলীর ছুটির দরখাস্ত স্কলারশিপ না থাকার অজুহাতে মঞ্জুর করা হয়নি। পরে অর্জিত ছুটি নিয়ে কানাডায় যাবার পর স্কলারশিপ পাওয়া সত্ত্বেও তার ছুটির দরখাস্ত মঞ্জুর করা হয়নি।

এই সাতজনের মধ্যে তিনজনের পদ ছিল অস্থায়ী। এরা বিভাগে যোগদানের বছর দেড়েক পর আমার কাছে এসে এদের পদ স্থায়ী করার জন্য বিজ্ঞাপন দিতে অনুরোধ করেন। আমি ভাবি, এমনিতে আমাদের লোক চারজনের জায়গায় সাতজন নেয়া হয়েছে। বিভাগে লোকবল সঙ্কট নেই। কোনো শিক্ষকেরই দু'তিনটির বেশি কোর্স পড়াতে হচ্ছে না। এমতাবস্থায় যদি তিনজন প্রভাষকের পদ বিজ্ঞাপিত হয় তাহলে সেখানে আরও কয়েকজন রাজনৈতিক প্রভাব খাটিয়ে চাকুরিতে ঢুকে যেতে পারেন। এ কারণে আমি এ ঝুঁকি নিতে চাইনি। সে জন্য আমি তাদেরকে সরাসরি আমার আশঙ্কার কথা জানিয়ে বলি, আমার এমন বিজ্ঞাপন দিতে আগ্রহ নেই। তবে তোমরা যদি এমন বিজ্ঞাপন দিতে অনুরোধ জানিয়ে কোনো আবেদনপত্র দাও তাহলে আমি সে বিষয়টি পরিকল্পনা কমিটির সভায় উত্থাপন করব। এমনিতেই আর কিছুদিন পরে তোমাদের পদোন্নতি হয়ে যাবে। তবে তারা বার বার অস্থায়ী পদে থাকলে বিদেশে যাওয়া যাবে না বলে আমাকে দুর্বল করতে চাইলে আমি বলি, অস্থায়ী পদে থেকে অনেকেই বিদেশে লেখাপড়া করতে গিয়েছেন এমন উদাহরণ রয়েছে। আমি তাদের অনুরোধে বিজ্ঞাপন দিতে সাড়া দেইনি। কারণ, এমন বিজ্ঞাপন দিলে রাজনৈতিক প্রভাব

খাটিয়ে যারা বিভাগে ঢুকে যেতেন তাদের প্রতিহত করার মতো শক্তি আমার মতো বর্ণহীন শিক্ষকের ছিল না। তা ছাড়া বেশি লোক শিক্ষক হিসেবে বিভাগে যোগ দিলে তাদেরকে ক্লাস দেয়াও সম্ভব হত না।

পদোন্নতি জটিলতা

নতুন সাতজন প্রভাষকের সহকারী অধ্যাপক হবার ক্ষেত্রে পদোন্নতি নিয়ে জটিলতা সৃষ্টি হয়। এদের মধ্যে তাসলিমা আকতার-এর এমফিল ডিগ্রি, বেসরকারি কলেজে শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা ও প্রকাশনা থাকায় সে অন্যদের চেয়ে আগে সহকারী অধ্যাপক পদে আবেদনের যোগ্যতা অর্জন করে। তাসলিমা পদোন্নতির জন্য আবেদনপত্র জমা দিলে আমি যথারীতি পরিকল্পনা কমিটির সম্মতিসাপেক্ষে তার আবেদনপত্র সুপারিশ করি। কিন্তু অন্য অনেক বিভাগের প্রার্থীদের সিলেকশন বোর্ড হয়ে যেতে থাকলেও তাসলিমার সিলেকশনের তারিখ পড়ে না। এ ব্যাপারে জনাব তাসলিমা সংশ্লিষ্ট দপ্তরে যোগাযোগ করলে তাকে বলা হয়, আপনার আবেদনপত্র স্ক্রুটিনি করে আমরা কোনো ঘাটতি পাইনি এবং তা সরাসরি উচ্চতর অফিসে পাঠিয়ে দিয়েছি। এ ব্যাপারে তাসলিমা আমার কাছেও উদ্বেগ প্রকাশ করে এবং আমাকে খোঁজ খবর নিতে অনুরোধ করলে আমি তাকে সরাসরি ভিসি সাহেবের সঙ্গে দেখা করতে বলি। তাকে আরও বলি, তুমি বললে আমি ভিসি সাহেবের সঙ্গে এ ব্যাপারে কথা বলতে পারি, তবে যেহেতু আমার দলীয় পরিচিতি নেই সে কারণে আমি দেখা করলে তোমার লাভ হবে না লোকসান হবে সে ব্যাপারে আমি নিশ্চিত নই। পরবর্তীতে সেও আমাকে আর এ ব্যাপারে অগ্রসর হতে অনুরোধ করেনি। তবে প্রায় ৭-৮ মাস পর তার সিলেকশন বোর্ড বসে। আমি সভাপতি হিসেবে ওই বোর্ডে ছিলাম। আমরা কেন তার বোর্ড এতো দেরি করে আয়োজিত হলো সে সব জিজ্ঞেস না করলেও ভাইস চ্যান্সেলর সাহেব তাকে বোর্ডে যে সব কথা বলেছিলেন তাতে আমার কাছে মনে হয়েছিল, হয়ত কেউ তার বিরুদ্ধে এর আগে ভিসি সাহেবকে কোনো নেতিবাচক কথাবার্তা বলে থাকতে পারেন। তিনি তাকে বলেন, তুমি বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনো অনুষ্ঠানে থাকো না কেন? বিভাগে সবার সঙ্গে মিলেমিশে থাকবে, ইত্যাদি। যা হোক নতুন জয়েন করা ৭ জনের মধ্যে সবার আগে তার পদোন্নতি হয়।

বিভাগে যোগদানের দুই বছরেরও আগে বাকি ছয়জন প্রভাষকের মধ্যে ২০ এপ্রিল, ২০১৭ তারিখে প্রভাষক জনাব উম্মে হাবিবা সহকারী অধ্যাপক পদে পদোন্নতির জন্য আবেদনপত্র জমা দেন। এই আবেদনপত্রের সঙ্গে তিনি কুমিল্লার কোড়েরপার আদর্শ কলেজে ১ বছর ৫ মাস ২৫ দিন শিক্ষকতার অভিজ্ঞতার সমর্থনে কাগজপত্র এবং দুটি প্রকাশনা সংযুক্ত করেন। আমি এই দরখাস্ত পেয়ে ০৩-০৫-২০১৭ তারিখে পরিকল্পনা কমিটির সভা আহ্বান করি। এই সভার আগে অন্য প্রভাষক যারা আবেদন করেননি, তাদেরকেও এ বিষয়ে জানাই যে তাঁরা যদি কেউ পদোন্নতির শর্ত পূরণ করে থাকেন তাহলে তাঁরাও যাতে আবেদন করতে

পারেন। পরিকল্পনা কমিটির ২৭৮তম সভায় জনাব হাবিবার আবেদনপত্র নিয়ে আলোচনা শুরু হয়। একজন সদস্য তার আবেদনপত্রের সঙ্গে জমা দেয়া বাংলাদেশ ইতিহাস পরিষদ কর্তৃক প্রকাশিত *ইতিহাস* শীর্ষক জার্নালে 'বাংলাদেশের সংসদীয় নির্বাচনের ইতিহাস ও নারীর অংশগ্রহণ' শীর্ষক প্রকাশিত প্রবন্ধটি একটি এমফিল থিসিস থেকে নকল করে লেখা হয়েছে বলে অভিযোগ করেন। ভারতের শিলং থেকে প্রকাশিত *ম্যান অ্যান্ড সোসাইটি* শীর্ষক যে জার্নালে জনাব হাবিবার অন্য প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয়েছে, পরিকল্পনা কমিটির একই সদস্য ওই জার্নালের মান নিয়ে প্রশ্ন তোলেন। ইংরেজি ভাষায় লিখিত এ প্রবন্ধটি আবেদনকারীর নিজস্ব রচনা কিনা তা নিয়েও সন্দেহ প্রকাশ করা হয়। আরও অভিযোগ করা হয়, ইতিপূর্বে সমাজ বিজ্ঞান অনুষদের একটি বিভাগ উল্লিখিত জার্নালকে মানসম্পন্ন নয় বলে ওই জার্নালে প্রকাশিত প্রবন্ধকে বিভাগীয় পরিকল্পনা কমিটি পয়েন্ট না দিয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। এ সব অভিযোগ খতিয়ে দেখতে আমি তদন্ত কমিটি করতে চাইলে সভায় উপস্থিত সবাই আমার অনিচ্ছা সত্ত্বেও বিভাগীয় সভাপতি হিসেবে আমাকে এ সব বিষয়ে সকল সদস্যের সহায়তা নিয়ে খতিয়ে দেখার অনুরোধ করেন এবং সে মর্মে পরিকল্পনা কমিটির সভায় সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

আমি অনন্যোপায় হয়ে এ বিষয়ে খোঁজখবর করি। কুমিল্লার কোড়েরপার কলেজে ফোন করে প্রথমে ওই কলেজের অধ্যক্ষকে আবেদনকারী তার কলেজে উল্লিখিত সময়ে শিক্ষকতা করেছেন কিনা তা যাচাই করে ঘটনার সত্যতা খুঁজে পাই। তবে ওই কলেজের ব্যক্তিগত এমপিও ইনডেক্স নম্বর না থাকায় ওই প্রতিষ্ঠানে শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা যে গ্রহণযোগ্য হবে না সে বিষয়টি আমি উদ্ঘাটন করতে পারিনি। কিন্তু রেজিস্ট্রার অফিসের সংশ্লিষ্ট শাখা এ বিষয়টি চিহ্নিত করতে পারে এবং ১৬ আগস্ট ২০১৮ তারিখ বেলা ৩:০০ টায় এদের সিলেকশন বোর্ড বসলে সে সভায় সরবরাহকৃত ব্রিফিংয়ে তা উল্লেখ করে। *ইতিহাস* পত্রিকার সঙ্গে জড়িত একাধিক শিক্ষককে ফোন করে এ পত্রিকা কিভাবে কোন প্রক্রিয়ায় প্রকাশিত হয় সে সম্পর্কে জানতে চাই। আবেদনকারীর সঙ্গে কথা বলে জানতে পারি যে, *ম্যান অ্যান্ড সোসাইটি* জার্নালে তার লেখাটি তিনি নিজে ওই জার্নালের সম্পাদককে পাঠান। আর সমাজ বিজ্ঞান অনুষদের নৃবিজ্ঞান বিভাগের সভাপতির সঙ্গে দেখা করে জানি, ওই বিভাগের ২৩ আগস্ট ২০১৫ তারিখে অনুষ্ঠিত পরিকল্পনা কমিটি *ম্যান অ্যান্ড সোসাইটি* জার্নালটির মান, ফরম্যাট, লেখার মান, কন্টেন্ট ইত্যাদি বিবেচনা করে জার্নালটিকে পিয়ার রিভিউড জার্নাল হিসেবে বিবেচনা করেনি। এ সব সংগৃহীত তথ্য আমি ১৫ মে, ২০১৭ তারিখে অনুষ্ঠিত পরবর্তী পরিকল্পনা কমিটিতে উপস্থাপন করলেও যেহেতু আবেদনকারী তার আবেদনপত্র লিখিতভাবে স্বেচ্ছায় প্রত্যাহার করে নেন, সে কারণে ওই সভা জনাব উম্মে হাবিবার আবেদনপত্রের ওপর কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেনি (আবেদনকারীর চিঠির জন্য দেখুন পরিশিষ্ট- ৭:১০)।

এমন অবস্থায় ১৮ মে, ২০১৭ তারিখে জাগো নিউজ ২৪.কম শীর্ষক একটি অনলাইন পত্রিকায় 'পদোন্নতি পেতে চবি শিক্ষিকার জালিয়াতি' শীর্ষক আবদুল্লাহ রাকীব লিখিত একটি প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়। এই প্রতিবেদনে জনাব উম্মে হাবিবার বিরুদ্ধে স্বামীর এমফিল গবেষণা থেকে নকল করে প্রবন্ধ প্রকাশ করে সহকারী অধ্যাপক পদে পদোন্নতি পাবার চেষ্টার অভিযোগ এবং ভারতের শিলং থেকে প্রকাশিত *ম্যান অ্যান্ড সোসাইটি* জার্নালের মান এবং ওই জার্নালে ইংরেজি ভাষায় প্রকাশিত প্রবন্ধ জনাব উম্মে হাবিবার নিজের লেখা কিনা সেসব বিষয়ে বিভাগীয় পরিকল্পনা কমিটিতে অভিযোগ ওঠার প্রসঙ্গ তুলে ধরা হয়। প্রতিবেদনে জনাব হাবিবার কনভোকেশন গাউন পরিহিত গ্রাজুয়েশনের ছবিও ব্যবহার করা হয়। এ রকম প্রতিবেদন বিভাগের ভাবমূর্তির জন্য ভালো ছিল না। এ প্রতিবেদন প্রকাশের দু'দিন পর জনাব উম্মে হাবিবা 'প্রকাশিত সংবাদে চবি শিক্ষিকার প্রতিবাদ' শিরোনামে একই পত্রিকায় পূর্বোক্ত সংবাদের লিখিত প্রতিবাদ করেন (পদোন্নতি জালিয়াতির অভিযোগ এবং এ সম্পর্কিত প্রতিবাদ সম্পর্কিত দুটি প্রতিবেদনের জন্য দেখুন পরিশিষ্ট- ৭:১১)। ওই প্রতিবাদের এক জায়গায় তিনি বলেন, 'আমার এ প্রবন্ধের বিরুদ্ধে রাজনীতিবিজ্ঞান বিভাগের ভিন্নমতাবলম্বী রাজনৈতিক দলের কয়েকজন শিক্ষক প্রতিহিংসা ও উদ্দেশ্যমূলকভাবে এ অপপ্রচারে অংশ নেন বলে আমি মনে করি।' তিনি এ বিষয়ে ২১ মে তারিখে বিভাগীয় সভাপতিকে একটি দরখাস্ত লিখে জাগো নিউজ২৪. কম পত্রিকার বিরুদ্ধে দ্রুত সময়ের মধ্যে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ না করলে আইনি পদক্ষেপ গ্রহণ করতে বাধ্য হবেন বলে উল্লেখ করেন।

আমরা ২৯ মে, ২০১৭ তারিখে অনুষ্ঠিত একাডেমিক কমিটির ৩১১তম সভায় ২১ মে, ২০১৭ তারিখে পেশকৃত উম্মে হাবিবার আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে ১৮ মে, ২০১৭ তারিখে প্রকাশিত 'পদোন্নতি পেতে চবি শিক্ষিকার জালিয়াতি' শীর্ষক প্রতিবেদনটি পর্যালোচনা করে এ প্রতিবেদনে অনেক অপ্রাসঙ্গিক, নেতিবাচক ও ভিত্তিহীন তথ্য থাকায় সংশ্লিষ্ট পত্রিকা, উল্লিখিত প্রতিবেদন ও প্রতিবেদকের নিন্দা করি।[৪১] এরপর পরিকল্পনা কমিটির ০৭-০৬-২০১৭ তারিখে অনুষ্ঠিত ২৮১তম সভায় জনাব হাবিবার ২১-০৫-২০১৭ তারিখে পেশকৃত লিখিত অভিযোগ (যা ইতোপূর্বে ৩১১তম বিভাগীয় একাডেমিক কমিটিতে আলোচিত) আমলে নিয়ে পরিকল্পনা কমিটির সম্মানিত সদস্যদের পরামর্শের ভিত্তিতে জাগো নিউজ২৪. কম পত্রিকায় 'পদোন্নতি পেতে চবি শিক্ষিকার জালিয়াতি' শীর্ষক পূর্বে আলোচিত প্রতিবেদনটি খতিয়ে দেখে ঈদের ছুটির পর ১০ কর্মদিবসের মধ্যে একটি রিপোর্ট প্রদানের জন্য অধ্যাপক ড. মুস্তাফিজুর রহমান ছিদ্দিকী-কে আহ্বায়ক এবং ড.

---

৪১. দেখুন, রাজনীতিবিজ্ঞান বিভাগের একাডেমিক কমিটির ৩১১তম সভার কার্যবিবরণীর ৬ নম্বর সিদ্ধান্ত।

মো. এনায়েত উল্যা পাটওয়ারী, সহযোগী অধ্যাপক এবং ড. মোহাম্মদ আনোয়ার হোসেন মিঝি, সহযোগী অধ্যাপক-কে সদস্য করে একটি কমিটি গঠন করা হয়। এ কমিটি গঠিত হবার অব্যবহিত পরে ১৬-০৭-২০১৭ তারিখে প্রশাসনিক ব্যস্ততার প্রসঙ্গ তুলে ড. মুস্তাফিজুর রহমান ছিদ্দিকী কমিটির আহ্বায়ক হিসেবে কাজ করতে লিখিতভাবে অপারগতা প্রকাশ করেন। পরে ১৩-০৭-২০১৭ তারিখে অনুষ্ঠিত পরিকল্পনা কমিটির ২৮২তম সভায় কমিটির সিনিয়র সদস্য ড. মো. এনায়েত উল্যা পাটওয়ারী-কে আহবায়ক করে এবং নতুন করে সহযোগী অধ্যাপক জনাব মোহাম্মদ আলম চৌধুরীকে সদস্য হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করে কমিটি পুনর্গঠন করা হয়। এরপর ১৯-০৭-২০১৭ তারিখে কমিটি সদস্য ড. আনোয়ার হোসেন মিঝি বিশেষ কারণে কমিটিতে কাজ করতে লিখিতভাবে অপারগতা প্রকাশ করলে দ্রুত সময়ের মধ্যে রিপোর্ট প্রদানের জন্য সহকারী অধ্যাপক জনাব এ জি এম নিয়াজ উদ্দিন-কে অন্তর্ভুক্ত করে পরিকল্পনা কমিটির ২৮৩তম সভায় আলোচ্য কমিটি আবারো পুনর্গঠিত করা হয়। পরবর্তীতে ০৬-১২-২০১৭ তারিখে কমিটির আহ্বায়ক ড. মো. এনায়েত উল্যা পাটওয়ারী পরীক্ষা সংক্রান্ত কাজ বৃদ্ধি পাওয়া এবং কিছু ব্যক্তিগত অসুবিধার কথা বলে এ কমিটি থেকে লিখিতভাবে অব্যাহতি নিলে ০৮-০১-২০১৮ তারিখে অনুষ্ঠিত পরিকল্পনা কমিটির ২৮৮তম সভায় কমিটির সিনিয়র সদস্য জনাব মোহাম্মদ আলম চৌধুরীকে আহবায়ক এবং নতুন সদস্য হিসেবে সহকারী অধ্যাপক জনাব আককাছ আহমদ কে সদস্য করে কমিটি আবারো পুনঃর্গঠিত হয়। এ কমিটিও এ সংক্রান্ত কোনো রিপোর্ট পেশ করেনি। পরবর্তীতে এ কমিটি ক্রমান্বয়ে ম্রিয়মান হয়ে পড়ে এবং পরবর্তী পরিকল্পনা কমিটিগুলোর সভায় আর কেউ এ প্রসঙ্গ উত্থাপন করেননি।

ইতিমধ্যে জনাব উম্মে হাবিবা ১৫ মে, ২০১৭ তারিখে তার যে আবেদনপত্র তিনি স্বেচ্ছায় লিখিতভাবে প্রত্যাহার করে নিয়েছিলেন, তা আবার নতুন করে ১ জুন, ২০১৭ তারিখে বিভাগে জমা দেন। তার আগে ৩০ মে, ২০১৭ তারিখে সভাপতির মাধ্যমে রেজিস্ট্রার বরাবর 'সহকারী অধ্যাপক পদে পদোন্নতির আবেদন বহাল ও পুনঃবিবেচনা প্রসঙ্গে' বিষয়ে একটি আবেদন করেন। এ আবেদনে তিনি ১৫ মে, ২০১৭ তারিখে 'বিভাগীয় সভাপতির ক্রমাগত চাপের মুখে' আবেগের বশবর্তী হয়ে তিনি তাঁর আবেদনপত্র প্রত্যাহারে বাধ্য হন বলে দাবি করেন। তিনি তাঁর নতুন করে জমা দেয়া আবেদনপত্রটি প্রথম আবেদন করার তারিখ (২০-০৪-২০১৭) থেকে বহাল রাখতে পুনঃবিবেচনার অনুরোধ করেন। তবে পরিকল্পনা কমিটির ৭ জুন, ২০১৭ তারিখে অনুষ্ঠিত ২৮১তম সভার ৫ নম্বর সিদ্ধান্তে জনাব উম্মে হাবিবা ৩০ মে, ২০১৭ তারিখে পেশকৃত পদোন্নতির আবেদনে উল্লেখিত 'বিভাগীয় সভাপতির ক্রমাগত চাপের মুখে' বক্তব্যসমূহ সঠিক নয় বলে রেকর্ড করা হয়।

এর মধ্যে ৭ জুন, ২০১৭ তারিখে প্রভাষক সেলিমুল হক পরিকল্পনা কমিটি কর্তৃক নির্দেশিত হয়ে জনাব উম্মে হাবিবার আবেদনে সংযুক্ত প্রকাশনা সম্পর্কিত

আপত্তি লিখিতভাবে বিভাগীয় সভাপতির কাছে জমা দেন। এ সব বিষয় নিরসনের জন্য বিভাগীয় ২৮১তম পরিকল্পনা কমিটির সভায় দুটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়। প্রথমে জনাব উম্মে হাবিবার পদোন্নতির আবেদনপত্রে সংযুক্ত প্রকাশনাগুলোর বিরুদ্ধে প্রভাষক জনাব সেলিমুল হকের আনীত নকলের লিখিত অভিযোগ খতিয়ে দেখে ০৮-০৬-২০১৭ তারিখ থেকে ০৭ কর্ম দিবসের মধ্যে একটি রিপোর্ট প্রদানের জন্য অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ শামসুদ্দিন-কে আহ্বায়ক করে তিন সদস্যবিশিষ্ট একটি কমিটি গঠন করা হয়। কমিটির অন্য দু'জন সদস্য ছিলেন অধ্যাপক ড. হাসান মোহাম্মদ ও অধ্যাপক ড. রাশিদা খানম। এ কমিটির সদস্য অধ্যাপক ড. রাশিদা খানম রিপোর্ট প্রদানের জন্য কিছুটা সময় বৃদ্ধির অনুরোধ করলে ২০ জুলাই ২০১৭ তারিখে অনুষ্ঠিত ২৮৩তম পরিকল্পনা কমিটির সভায় তাঁদের অনুরোধ আমলে নিয়ে যত দ্রুত সম্ভব রিপোর্ট প্রদানের জন্য অনুরোধ করা হয়। পরে ২ আগস্ট, ২০১৭ তারিখে এ কমিটি তাদের রিপোর্ট পেশ করে (কমিটির রিপোর্টের জন্য দেখুন পরিশিষ্ট- ৭:১২)। পরবর্তীতে ৯ আগস্ট, ২০১৭ তারিখে অনুষ্ঠিত পরিকল্পনা কমিটির ২৮৪তম সভায় আলোচ্য রিপোর্ট দেবার জন্য কমিটিকে ধন্যবাদ জানানো হয় এবং কমিটি সদস্যদেরকে রিপোর্টটি পড়ে শোনানো হয়। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, একবার ধন্যবাদ জানাবার পর আবার ১৪ সেপ্টেম্বর ২০১৭ তারিখে অনুষ্ঠিত পরিকল্পনা কমিটির ২৮৫তম সভায় পূর্বে উল্লেখিত কমিটিকে তাদের প্রদত্ত একই রিপোর্টের জন্য পুনরায় ধন্যবাদ জানিয়ে পূর্বোক্ত তিনজন সিনিয়র অধ্যাপক সমন্বয়ে গঠিত কমিটি প্রদত্ত রিপোর্টটি পুনরায় পর্যালোচনা করে সুপারিশ প্রদানের জন্য তিনজন তুলনামূলকভাবে জুনিয়র অধ্যাপককে দিয়ে একটি কমিটি করে ওই কমিটিকে সাত কর্মদিবসের মধ্যে সুপারিশ প্রদানের জন্য অনুরোধ করা হয়। এ কমিটিতে আহ্বায়ক করা হয় অধ্যাপক ড. সিদ্দিক আহমেদ চৌধুরী-কে এবং সদস্য হিসেবে তার সঙ্গে রাখা হয় অধ্যাপক ড. আনোয়ারা বেগম এবং অধ্যাপক ড. মুস্তাফিজুর রহমান ছিদ্দিকী-কে। সাত কর্মদিবস সময় দেয়া হলেও এ কমিটি ৬৩ দিন পর ১৬ নভেম্বর, ২০১৭ তারিখে বিভাগীয় সভাপতিকে এক চিঠির মাধ্যমে পূর্বোক্ত সিনিয়র অধ্যাপকদের কমিটি প্রদত্ত রিপোর্ট পর্যালোচনা করে সে বিষয়ে সুপারিশ প্রদানের জন্য এ কমিটি কোনো প্রকার সমঝোতায় পৌছাতে পারেনি বলে দুঃখ প্রকাশ করে (কমিটির রিপোর্টের জন্য দেখুন পরিশিষ্ট- ৭:১৩)।

ইতিমধ্যে ২৪ মে, ২০১৭ তারিখে জনাব সেলিমুল হক সহকারী অধ্যাপক পদে তাঁর আবেদনপত্র জমা দেন। ওই আবেদনপত্রে তিনি *সমাজ নিরীক্ষণ* জার্নালে প্রকাশিত একটি প্রকাশনা এবং একাধিক বেসরকারি কলেজে চাকুরির অভিজ্ঞতা দেখান। এর মধ্যে যে সূক্ষ্ম ভুলত্রুটি ছিল পরিকল্পনা কমিটি তা শনাক্ত করতে পারেনি। পরবর্তীতে নাম ঠিকানাবিহীন 'রাজনীতিবিজ্ঞান বিভাগের প্রভাষক সেলিমুল হকের বিরুদ্ধে তথ্য গোপন ও দুর্নীতির মাধ্যমে সহকারী অধ্যাপক পদে

পদোন্নতির চেষ্টার অভিযোগ প্রসঙ্গে' শীর্ষক একটি চিঠি পেয়ে রেজিস্ট্রার অফিস বিষয়টি আমলে নেয় এবং এ বিষয়ে খোঁজখবর নিয়ে জনাব সেলিমুল হকের আবেদনপত্রে ক্রটি খুঁজে পায়। জনাব হক পেস্তারপাড় আসমা খাতুন সিটি কর্পোরেশন মহিলা কলেজে ১৩-০৪-২০১১ থেকে ১৪-০৩-২০১৫ পর্যন্ত ৩ বছর ১১ মাস ০১ দিন স্নাতক পর্যায়ে শিক্ষকতার যে অভিজ্ঞতা দাবি করেন তা সঠিক ছিল না। ওই কলেজে ২০১৪-২০১৫ শিক্ষাবর্ষ থেকে স্নাতক পাস কোর্স চালু হওয়ায় ০১-০৭-২০১৪ তারিখের আগের অভিজ্ঞতা গণনা করা যাবে না। এ ভুল চিহ্নিত করে রেজিস্ট্রার অফিস কলেজ পর্যায়ের অভিজ্ঞতা হিসেব করার ক্ষেত্রে তার প্রাপ্য অভিজ্ঞতা বিজয় সরণী কলেজে প্রভাষক পদে ০৪-১১-২০১০ হতে ১২-০৪-২০১১ পর্যন্ত মোট ৫ মাস ৮ দিন এবং পেস্তারপাড় আসমা খাতুন সিটি কর্পোরেশন মহিলা কলেজে ০১-০৭-২০১৪ থেকে ১৩-০৩-২০১৫ তারিখ পর্যন্ত ৮ মাস ১২ দিন নির্ধারণ করে। এতে বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়মানুযায়ী মোট ১ বছর ১ মাস ২০ দিন অভিজ্ঞতার ২৫% হিসেব করলে তিনি ০৩ মাস ১২ দিনের অভিজ্ঞতা তার বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রভাষক হিসেবে চাকুরির অভিজ্ঞতার সঙ্গে যোগ করতে পারবেন। এ হিসেবে আবেদনের তারিখে (২৪-০৫-২০১৭) তিনি ০৩ বছরের পরিবর্তে ২বছর ৫ মাস ২৩ দিনের অভিজ্ঞতা নিয়ে আবেদন করেন। রেজিস্ট্রার অফিস এ কারণে জনাব সেলিমুল হকের আবেদনপত্র শর্ত পূরণ না করায় ১৮-১০-২০১৭ তারিখে বিভাগে ফেরত পাঠান। জনাব হক অভিজ্ঞতা হিসেবের ক্ষেত্রে তার ভুল স্বীকার করেন এবং নতুন করে শর্তে উল্লেখিত অভিজ্ঞতা পূরণ করার পর ২৫-০১-২০১৮ তারিখে পুনরায় আবেদনপত্র জমা দেন।

এ পদোন্নতি প্রক্রিয়াটি নানান জটিলতায় দীর্ঘদিন চলমান থাকে। পরে শারমিলা কবীর সীমা ও দীপাঞ্জলী বড়ুয়া পিংকিও সহকারী অধ্যাপক পদে পদোন্নতির জন্য আবেদন করেন। জনাব দীপাঞ্জলী কানাডা থেকে প্রকাশিত *এশিয়ান প্রোফাইল* জার্নালে একটি প্রকাশনা করার পর আবেদন করেন। জনাব সীমা জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের সরকার ও রাজনীতি বিভাগ থেকে প্রকাশিত জার্নালের প্রকাশনা দিয়ে আবেদন করায় তাঁর আবেদনপত্র নিয়ে জটিলতা হয়। আবেদনপত্র জমাদানকাল আমি তাঁকে বলি, আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে এখন কোনো বিভাগ থেকে প্রকাশিত জার্নালের প্রবন্ধে পয়েন্ট দেয়া হচ্ছে না। এমনকি আমাদের বিভাগ থেকে যে *বাংলাদেশ পলিটিক্যাল স্টাডিজ* জার্নালটি প্রকাশিত হয়, গবেষণামূলক জার্নাল প্রকাশের নীতিমালা অনুসরণ করা সত্ত্বেও এ জার্নালে প্রকাশিত প্রবন্ধও এখন পয়েন্ট পাচ্ছে না। যা হোক পরিকল্পনা কমিটির সম্মানিত সিনিয়র সদস্যদের পরামর্শে আমরা তার আবেদনপত্র সুপারিশ করি। কিন্তু পরে সংশ্লিষ্ট অফিস স্ক্রুটিনির সময় জনাব সীমার আবেদনপত্র আমলে নেয়নি এবং সিলেকশনের সময় তাকে ইন্টারভিউ কার্ড সরবরাহ করেনি। ১৬ আগস্ট, ২০১৮ তারিখ বিকালে এদের ইন্টারভিউ হয় এবং সীমা বাদে অন্য সবার পদোন্নতি হয়।

সভাপতি হিসেবে আরও কিছু নতুন কাজ করি

আমি সভাপতির দায়িত্ব গ্রহণ করে শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের জন্য কল্যাণকর কিছু করতে চাই। অনেক ভেবে আমি প্রথমে একটি সুদৃশ্য ফার্স্ট এইড বক্স ক্রয় করি। অনেক সময় দেখা যায় আমাদের স্টাফ, বা শিক্ষার্থীরা কোনো কাজ করতে গিয়ে সামান্য একটু হাত কেটে গেলে চিকিৎসার জন্য তাকে মেডিকেলে যেতে হয়। যদি বিভাগে একটি ফার্স্ট এইড বক্স থাকে তাহলে প্রাথমিকভাবে হালকা চিকিৎসা দেয়া সম্ভব হয়। এ জন্য আমি নিজে আন্দরকিল্লা যেয়ে সায়েন্টিফিক স্টোরগুলোতে খোজাখুজি করে একটি সুদৃশ্য ফার্স্ট এইড বক্স ক্রয় করি। সবাই এ উদ্যোগ প্রশংসা করেন। আমরা মিটিংয়ে সকল শিক্ষককে এ বিষয়ে জানিয়ে দেই, যাতে প্রয়োজনে যে কেউ এটি ব্যবহার করতে পারেন। এ ছাড়া সেলফ অ্যাসেসমেন্টের বেঁচে যাওয়া টাকা দিয়ে আমি একটি ভিজিটরস বুক তৈরি করি। বিভাগে গণ্যমান্য একাডেমিক এলে যাতে বিভাগ সম্পর্কে তাঁর মন্তব্য গ্রহণ করা যায় সে জন্য আমি এটি তৈরি করিয়ে রাখি। এ ছাড়া বিভাগের অফিস থেকে অনেক সময় ছোটখাটো জিনিষ চুরি যাবার ঘটনা জানার পর আমি বিভাগীয় অফিসে, করিডোরে, সেমিনার লাইব্রেরি এবং কম্পিউটার ল্যাবে সিসিটিভি ক্যামেরা সংযুক্ত করি। বিভাগীয় সভাপতির টেবিলে একটি মনিটরের ব্যবস্থা করি যাতে করে সভাপতি তাঁর চেয়ারে বসেই বাইরের সুনির্দিষ্ট জায়গাগুলোতে কি হচ্ছে তা দেখতে পারেন। সিসিটিভি ক্যামেরা লাগাবার পর অফিস কক্ষ থেকে আর চুরির ঘটনা ঘটেনি। এ সময় অনুষদ কর্তৃক পরীক্ষার হলেও সিসিটিভি ক্যামেরা লাগানো হয়। এর ফলে কয়েক শ' শিক্ষার্থী পরীক্ষা দিলেও চেয়ারে বসে মনিটরের দিকে তাকালে সব শিক্ষার্থীদের ওপর নজরদারি করা যায়। ফলে এতে নকল প্রবণতা হ্রাস পায়। এসব কার্যাবলির পাশাপাশি আমাদের যে শ্রেণিকক্ষগুলোতে প্রজেক্টর ছিল না সেখানে প্রজেক্টর লাগাবার ব্যবস্থা করি।

বিভাগীয় ব্রোসার প্রকাশ

বিভাগে প্রথম বর্ষের শিক্ষার্থীদের জন্য ওরিয়েন্টেশন প্রোগ্রাম অনুষ্ঠান করার রেওয়াজ আছে। এ সময় শিক্ষার্থীদেরকে বিনা মূল্যে নতুন সিলেবাস বই এবং বিভাগীয় ব্রোসার দেয়া হয়। পূর্ববর্তী সভাপতি মহোদয় একটি ব্রোসার বের করেছিলেন যা ২০১৭ সালে শেষ হয়ে যায়। ফলে ২০১৭ সালে যে সব শিক্ষার্থী ভর্তি হবে তাদের ওরিয়েন্টেশন অনুষ্ঠানে ব্রোসার দিতে চাইলে ২০১৮ সালের জানুয়ারির আগে নতুন ব্রোসার প্রকাশ করতে হবে। আমি এ ব্যাপারে একটু আগে থেকে একা কাজ শুরু করি। ব্রোসারটি ইংরেজি ভাষায় প্রকাশিত হয়। কাজেই সবার কাছে সহায়তা পাওয়া যাবে না। আবার এ সব নন রেমুনারেটিভ কাজে সহযোগিতা করতে অনেকে আগ্রহী হন না। ফলে আমি একাই শহরে আন্দরকিল্লার একটি প্রেসে গিয়ে কাজ শুরু করি। পূর্বের ব্রোসারটি ভালোভাবে স্টাডি করে এর কোনো দুর্বলতা আছে কিনা তা পর্যবেক্ষণ করে কিভাবে নতুন

ব্রোসারটি আরও উন্নত করা যায় সে জন্য পরিকল্পন করি। আগের ব্রোসারটির মলাট উল্টালেই ছবি দিয়ে শুরু করার বিষয়টি পাল্টে দিয়ে অনেকটা উন্নত ম্যাগাজিন বা জার্নালের স্টাইল অনুসরণ করি। একটি মুখবন্ধ লিখে বিভাগীয় ব্রোসার কি এবং এর প্রয়োজনীয়তা কতটা সে সব বিষয় আলোচনা করি। তা ছাড়া আগের ব্রোসারে প্রত্যেক শিক্ষকের পরিচিতির সঙ্গে তাঁর প্রধান চারটি একাডেমিক প্রকাশনা সংযুক্ত করা হয়েছিল। এবার আমি শিক্ষকদের পূর্ণ একাডেমিক প্রকাশনার তালিকা প্রকাশ করি। এ কাজে আমার কিছুটা সুবিধা হয় এ জন্য যে, আমি আগে বিভাগীয় এসএ কার্যক্রম পরিচালনাকালে এর রিপোর্টে সন্নিবেশিত করার জন্য শিক্ষকদের গবেষণা তালিকা অনেক কষ্ট করে যোগাড় করে ওই রিপোর্টে প্রকাশ করি। কাজেই এবার শিক্ষকদেরকে কেবল তাদের কোনো নতুন প্রকাশনা হয়ে থাকলে তা আমাদেরকে জমা দিতে বলি। ফলে এ ব্রোসারটি দেখলে কোনো শিক্ষার্থী, বা তার অভিভাবক বিভাগের সম্মানিত শিক্ষকদের একাডেমিক কাজ সম্পর্কে ধারণা পাবেন। আকর্ষণীয় কাগজে নতুন আঙ্গিকে বিভাগীয় সাম্প্রতিক একাডেমিক কার্যক্রমের ছবি সংযুক্ত করে এ ব্রোসার প্রকাশ করি। দৃষ্টিনন্দন ব্রোসারটি প্রশংসিত হয়। আমাকে ছবি দিয়ে সহায়তা করায় আমি নিজে বিশ্ববিদ্যালয়ের ফটোগ্রাফি সেকশনে গিয়ে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদেরকে এক কপি ব্রোসার সৌজন্য সংখ্যা হিসেবে দিয়ে আসি। ওই সময় ভিসি সাহেব স্টেশনে না থাকায় সহ-উপাচার্য ড. শিরীন আখতারকে নিজে গিয়ে এক কপি ব্রোসার দিয়ে আসি (সহ উপাচার্যকে ব্রোসার প্রদানের ছবির জন্য দেখুন পরিশিষ্ট- ৭:১৪)। ব্রোসারটির ওপর *প্রথম আলো* পত্রিকা 'চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের রাজনীতিবিজ্ঞান বিভাগের ব্রোসার' শিরোনাম দিয়ে এর ২০১৮ সালের ২২ জানুয়ারি সংখ্যায় এ ব্রোসারের ওপর সচিত্র সংবাদ প্রকাশ করে।

অতিথি বক্তা আমন্ত্রণ

সভাপতি থাকাকালে আমি লক্ষ্য করেছি রাজনীতিবিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষার্থীরা বিভাগে কোনো সেমিনার, বা শিক্ষামূলক কার্যক্রম হলে তাতে আগ্রহ নিয়ে অংশগ্রহণ করে। বহিরাগত কেউ এসে বিভাগে লেকচার দিলে তারা তা আগ্রহের সঙ্গে শোনে এবং শেখার চেষ্টা করে। আমি চতুর্থ বর্ষ সম্মান শ্রেণির শিক্ষার্থীদের 'দুর্নীতি ও রাজনীতি' শিরোনামের একটি কোর্স পড়াই। শিক্ষার্থীদের জানার জন্য এ কোর্সের সঙ্গে সম্পর্কিত 'পুলিশ দুর্নীতি' ও 'কর দুর্নীতি'র ওপর অতিথি বক্তা হিসেবে যথাক্রমে পুলিশের এসপি জনাব মুহাম্মদ আইউব এবং চট্টগ্রাম বিভাগের যুগ্ম কর কমিশনার জনাব ইকবাল হোসেনকে অতিথি বক্তা হিসেবে আমন্ত্রণ জানাই। এরা দু'জনই আমাদের বিভাগের সাবেক ছাত্র এবং তারা এ আমন্ত্রণ গ্রহণ করে যথাক্রমে ২০১৭ ও ২০১৮ সালে বিভাগে এসে শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে উল্লেখিত বিষয়ে বক্তৃতা করেন। শিক্ষার্থীরা তাদের বিভাগের সাবেক ছাত্রকে কাছে পেয়ে পুষ্পস্তবক দিয়ে স্বাগত জানায়। সভাপতি হিসেবে আমি তাদেরকে বিভাগীয়

ব্রোসার উপহার দেই। শিক্ষার্থীরা এ দুটি বক্তৃতা থেকে অনেক উপকৃত হয় এবং আমাকে ইতিবাচক ফিডব্যাক দিয়ে এ রকম আরো লেকচারের আয়োজনের জন্য অনুরোধ করে (এ দুই বক্তার ছবির জন্য দেখুন পরিশিষ্ট- ৭:১৫)।

সভাপতি হিসেবে সক্রিয়তা

সভাপতি হিসেবে তিন বছর দায়িত্ব পালনকালে বিভাগীয় একাডেমিক ও প্রশাসনিক কাজে অনেক বেশি সময় দিয়েছি। এ সময় প্রত্যেক দিন সকালে বিভাগে হাজির থাকতাম। বিভাগীয় সভাপতি না থাকার কারণে কোনো শিক্ষার্থীকে কষ্ট পেতে হয়েছে, বা কোনো কাজে বিলম্ব ঘটেছে, এমনটি হয়নি। আবার সভাপতির দায়িত্বের বাইরে ক্লাস এবং একাডেমিক ও সামাজিক দায়িত্বেও সক্রিয় থেকেছি। বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন আয়োজিত প্রতিটি মিটিংয়ে উপস্থিত থাকার চেষ্টা করেছি। দলীয় বর্ণহীন শিক্ষক হওয়ায় যখন যেটা ভালো মনে করেছি সে মতামত ব্যক্ত করতে পেরেছি। মাননীয় ভাইস চ্যান্সেলরের সঙ্গে অনুষ্ঠিত সভাগুলোতে তাকে অনেক গঠনমূলক পরামর্শ দিয়েছি। সে সব পরামর্শ আমলে নেয়া হোক বা না হোক, আমার দায়িত্ব পালনে আমি সচেষ্ট থেকেছি। যেমন, উদাহরণ হিসেবে আমি এখানে একটি পরামর্শের উল্লেখ করতে চাই। এ পরামর্শটি আমি অন্তত তিনটি সভায় ভিসি মহোদয়কে বাস্তবায়নের জন্য অন্য শিক্ষকদের উপস্থিতিতে উপস্থাপন করেছি। ভিসি মহোদয়ও আমার সাথে একমত পোষণ করেছেন। কিন্তু তিনি পরামর্শটি বাস্তবায়ন করে যেতে পারেননি। পরামর্শটি ছিল এ রকম: চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় দেশের অন্যতম একটি বড় সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়। এখানে ২৬ হাজারের মতো শিক্ষার্থী এবং প্রায় ৯০০-এর বেশি শিক্ষক রয়েছেন। অবস্থানগত দিক থেকে এ বিশ্ববিদ্যালয় শহর থেকে অনেক দূরে। অথচ বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে কোনো বুক স্টোর নেই। এ কারণে কোনো শিক্ষক বা শিক্ষার্থীর কোনো বই কিনতে হলে শহরে যেতে হয়। কিন্তু অধিকাংশ বড় বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে বুক স্টোর এবং সুভেনির শপ থাকে। সুভেনির শপ বিনা খরচে ইউনিভার্সিটির প্রচারণার কাজ করে। ভিজিটর, শিক্ষার্থী, অভিভাবকরা যদি বিশ্ববিদ্যালয়ের লোগো সংবলিত একটি টি শার্ট, ব্যাকপ্যাক, বা কফি মগ কিনে নিয়ে যান, তাতে পরোক্ষভাবে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রচারণা হয়ে যায়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় রাজধানীর প্রাণকেন্দ্রে অবস্থিত হলেও তাদের ক্যাম্পাসে নিজস্ব বুক স্টোর রয়েছে। বেসরকারি নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়েরও রয়েছে ক্যাম্পাসে বুক স্টোর। অথচ চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের অবস্থানগত কারণে এটি এখানে বেশি জরুরি হলেও ক্যাম্পাসে বুক স্টোর নেই। সে জন্য আমি ভিসি মহোদয়কে তিনবার ক্যাম্পাসে একটি বুক স্টোর ও সুভেনির শপ প্রতিষ্ঠার পরামর্শ দিয়েছি। এও বলেছি যে, বিনিয়োগের দিক দিয়েও এটি লাভজনক হবে। তিনি আমার সাথে একমত হয়েছেন। বলেছেন, 'আমি করব।' কিন্তু ভিসি পদের মেয়াদ শেষ হয়ে গেলেও তিনি করে যেতে পারেননি। আশা করি কোনো একদিন অন্য কোনো ভাইস

চ্যান্সেলর আমার এ পরামর্শের গুরুত্ব উপলব্ধি করে ক্যাম্পাসে একটি বুক স্টোর স্থাপন করে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের শহরে গিয়ে বই কেনার কষ্ট নিরসন করবেন।

বিভাগীয় সভাপতি থাকাকালীন নিয়মিত ক্লাস নেয়া ছাড়াও একাডেমিক কাজেও সক্রিয় থাকার চেষ্টা করেছি। এ সময় পত্রিকার কলাম লেখায়ও সক্রিয় ছিলাম। আমার সভাপতির সময়কালে *যুগান্তর* পত্রিকার উপসম্পাদকীয় পাতায় আমার লেখা শতাধিক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। এ সময়ে আমার দুটি বই প্রকাশিত হয়েছে যথাক্রমে ২০১৬ এবং ২০১৯ সালে। ২০১৯ সালের ফেব্রুয়ারিতে প্রকাশিত হলেও মূলত বইটির কাজ করেছি আমি সভাপতি থাকার (আগস্ট ২০১৫- আগস্ট ২০১৮) সময়ের মধ্যে। এ ছাড়া এ সময়ে আমি একাধিক সম্পাদিত গ্রন্থে অধ্যায় লিখেছি। আমার এ সব লেখা আমাকে সারা দেশে এবং দেশের বাইরেও পরিচিতি দিয়েছে। অনেক পাঠকের অভিনন্দন পেয়েছি। অনেকে সমালোচনাও করেছেন, যদিও তাঁদের সংখ্যা খুবই কম। আমার প্রকাশিত লেখাগুলো আমি সব সময় ফেসবুকে শেয়ার করেছি যাতে করে আরও অধিকসংখ্যক পাঠক আমার লেখা পড়ে ওই লেখার ওপর আলোচনা সমালোচনা করতে পারেন। আমার পত্রিকায় প্রকাশিত অনেক লেখা আমার অনুমতি নিয়ে বিভিন্ন পত্রিকা ও সাময়িকী পুনঃপ্রকাশ করেছে। আবার আমেরিকা ও ইউরোপ থেকে প্রকাশিত কিছুসংখ্যক বাংলা দৈনিক ও সাপ্তাহিক পত্রিকা আমার লেখা প্রবন্ধ আমার অনুমতি না নিয়ে তাদের পত্রিকায় প্রকাশ করেছে। এ বিষয় জানলেও আমি কিছু বলিনি। ওইসব পত্রিকার সম্পাদককে অভিযোগ করিনি। কারণ, আমি চেয়েছি আমার লেখাগুলো যত বেশি পাঠক পড়তে পারেন এবং লেখার বিষয় নিয়ে আলোচনা সমালোচনা করতে পারেন, ততই আমার জন্য ভালো।

নিজের বিশ্ববিদ্যালয় বাদে বেসরকারি নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি কনভোকেশনে সস্ত্রীক যোগ দিয়েছি। নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আমার ছোট মেয়ে গ্রাজুয়েশন করলে ওই কনভোকেশনে না গেলে তার মন ছোট হয়ে যাবে। কারণ, বড় মেয়ের কনভোকেশনে আমেরিকার হার্ভার্ডে যেতে পেরেছি, আর ছোট মেয়ের কনভোকেশনে ঢাকায় যেয়ে যদি অংশগ্রহণ না করি, স্বাভাবিকভাবেই সে মন খারাপ করবে। সে কারণে তাকে খুশি করতে ৬ মার্চ, ২০১৯ তারিখে নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ের ২২তম কনভোকেশনে সস্ত্রীক যোগ দেই। নবেল লরিয়েট স্যার রিচার্ড জে রবার্টস কনভোকেশন স্পিকার হিসেবে আকর্ষণীয় বক্তব্য রাখেন। অনুষ্ঠান চলেছে হয়ত দিনব্যাপী। আমরা কয়েক ঘণ্টা থেকে মেয়ের সঙ্গে এবং তার বান্ধবী ও সহপাঠীদের সঙ্গে গল্পগুজব করে এবং ছবি তুলে চলে আসি (*ছোট মেয়ের কনভোকেশনের ছবির জন্য দেখুন পরিশিষ্ট-৭:১৬)*। বিভাগীয় সভাপতি থাকাকালে আমি কেবল একাডেমিক দায়িত্ব পালন করিনি। অনেক এক্সট্রা কারিকুলার দায়িত্বও পালন করেছি। এ সম্পর্কে পরবর্তী অধ্যায়ে আলোকপাত করব।

আট
সভাপতির কো-কারিকুলার কার্যক্রম

একজন বিভাগীয় সভাপতিকে একাডেমিক কার্যক্রম ছাড়া অনেক রকম কো-কারিকুলার কার্যক্রম করতে হয়। শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের আয়োজিত বিভিন্ন সামাজিক, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করতে হয়। এ ছাড়া অনুষদ ও বিভাগ কর্তৃক আয়োজিত বিনোদনমূলক কার্যক্রম, বিতর্ক সভা ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতাসহ অন্যান্য অনুষ্ঠানেও যোগদান করতে হয়। শিক্ষার্থীদের বিপদাপদে তাদের খোঁজখবর নেয়াসহ আরো নানাভাবে শিক্ষার্থীদের সহায়তা করার কাজও সভাপতির অনানুষ্ঠানিক কাজের আওতার মধ্যে পড়ে। এ সব ব্যাপারে সঠিকভাবে দায়িত্বপালন শিক্ষার্থীদের মধ্যে সভাপতির গ্রহণযোগ্যতা ও জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি করে। এ অধ্যায়ে আমার সভাপতিত্বকালে আমি এ প্রকৃতির যে সব কাজ করেছি তার কিছু নমুনা উপস্থাপন করা হবে। অধ্যায়টির সতর্ক পাঠ আগামী দিনের সভাপতিদেরকে শিক্ষার্থীদের মাঝে এ রকম কাজ করে অধিকতর গ্রহণযোগ্য ও জনপ্রিয় হবার কৌশল ও কার্যক্রম সম্পর্কে ধারণা দেবে।

প্রিয়াংকা মজুমদার

রাজনীতি বিজ্ঞান বিভাগের এমএসএস ২০১৭ ব্যাচের পরীক্ষা ২০১৮ সালের শেষ দিকে শুরু হয়। এ পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারীদের একজন পরীক্ষার্থী প্রিয়াংকা মজুমদার ছিল অন্তঃসত্ত্বা। এ কারণে কখন টার্মিনাল পরীক্ষা হবে, কখন মৌখিক পরীক্ষা হবে, এসব বিষয় নিয়ে সে সব সময় আমার সঙ্গে যোগাযোগ রাখত। আমিও তাকে সব সময় নিজের যত্ন নিতে বলতাম এবং তাকে সর্বাত্মক সহযোগিতার আশ্বাস দিতাম। এক পর্যায়ে পরীক্ষা শুরু হলো এবং সেও হলে বসে পরীক্ষা দিতে থাকল। আমি অবশ্য একবার তাকে বলেছিলাম, সে চাইলে সিক বেডে হাসপাতালে পরীক্ষার ব্যবস্থা করা যাবে। এভাবে আটটি পরীক্ষা দেবার পর তার সন্তানের জন্ম হওয়ায় শেষ পরীক্ষাটি সে দিতে পারেনি। তাতে কিছু এসে যায় না। পরের বার সে ওই পরীক্ষাটি দিলে তার ডিগ্রি পেতে কোনো অসুবিধা হত না। জমজ সন্তানের জন্ম হবার পর ফোনে প্রিয়াংকা আমার সঙ্গে কথা বলেছিল। আমি তাকে সান্ত্বনা দিয়েছিলাম। নিজের এবং বাচ্চার যত্ন নিতে বলেছিলাম। কিন্তু তার দুয়েক দিনের মধ্যেই পেলাম তার মৃত্যু সংবাদ। তার অভিভাবদের সঙ্গে কথা বলে জানলাম, তাকে রক্ত দেবার পরই সে ক্রমান্বয়ে

অসুস্থ হয়ে পড়ে এবং মারা যায়। তার মৃত্যু আমাকে কষ্ট দিয়েছিল। কিন্তু একাডেমিক ব্যস্ততার চাপে সে কষ্ট প্রায় ভুলেই গিয়েছিলাম। তবে পরীক্ষা কমিটির সভাপতি হিসেবে ওই ব্যাচের পরীক্ষার ফলাফল তৈরি প্রক্রিয়ায় আমি জড়িত ছিলাম। যখন টেবুলেশন পেপারে সব পরীক্ষার্থীর নম্বর ওঠানো শুরু করি, তখন আবার পুরানো কষ্টটা মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। গর্ভকালীন অসুস্থতা নিয়ে পরীক্ষা দিয়েও প্রিয়াংকা ভালো মার্কস পেয়েছিল। কিন্তু দ্রুত রেজাল্ট দেবার পর আমার বার বার তার কথা মনে হতে থাকে। কারণ, এমএসএস পরীক্ষার গড় ফলাফল অন্যান্যবারের তুলনায় ভালো হয়েছিল। এ সময় মনের কষ্ট প্রকাশ করে আমি প্রিয়াংকাকে নিয়ে তার ছবিসহ ফেসবুকে একটি স্ট্যাটাস দেই। স্ট্যাটাসটি ছিল এরকম:

> প্রিয়াংকা মজুমদারের জন্য কষ্ট
>
> প্রিয়াংকা, তোমাদের এমএসএস পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হয়েছে। তোমার সহপাঠী বন্ধুরা হাসিমুখে হল থেকে তাদের গ্রেডসিট নিয়ে যাচ্ছে। তোমার গ্রেডসিট কেউ নেবে কিনা জানি না। না ফেরার দেশে গ্রেডসিট পাঠানো গেলে আমি তোমাকে পাঠাতাম। তুমি দেখতে ৫০১ নম্বর কোর্সে তুমি ৭২ [A−] পেয়েছ। ৫০৪ নম্বর কোর্সে ৩৫ [A−], ৫০৬ নম্বর কোর্সে ৩৭ [A−], ৫০৭ নম্বর কোর্সে ৩৫ [A−] এবং অন্য কোর্সগুলোতেও তুমি প্রসবকালীন অসুস্থতার মধ্যে পরীক্ষা দিয়েও ভালো ফল করেছ। জমজ সন্তান জন্ম দিয়ে আমার সঙ্গে তুমি মুঠোফোনে কথা বলে সান্ত্বনা পেয়েছিলে। অথচ ৫০৯ নম্বর কোর্সের পরীক্ষা না দিয়ে ভুল চিকিৎসার শিকার হয়ে সবাইকে কাঁদিয়ে অভিমান করে চলে গেলে না ফেরার দেশে। টেবুলেশন সিটে তোমার নম্বর তোলার সময় আমি বড়ই কষ্ট পেয়েছি। হৃদয়ে বার বার ভেসে উঠেছে তোমার মিষ্টি মুখের ছবি। যেখানেই থাকো প্রিয়াংকা মামনি, ভালো থেক। পবিত্র রমযান মাসে প্রিয় ছাত্রীর জন্য শিক্ষকের এই দোয়া রইল।
>
> সূত্র: লেখকের ফেসবুক টাইমলাইন, ১৫ মে, ২০১৯।

আমার এ স্ট্যাটাসটি পড়ে অনেকেই কষ্ট পান। অনেকে আবেগঘন প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেন। *প্রথম আলো* পত্রিকার সাংবাদিক তাসনীম হাসান এ স্ট্যাটাসটি পড়ে আবেগাপ্লুত হয়ে 'প্রিয়াংকার জন্য গ্রেড শিট পাঠানো হল না' শিরোনামে ১৬ মে, ২০১৯ তারিখে *প্রথম আলো* পত্রিকায় আরো আবেগঘন একটি রিপোর্ট করেন। এর ফলে বিশ্বব্যাপী পত্রিকা পাঠকরা শিক্ষার্থীদের প্রতি শিক্ষকের প্রকৃত ভালোবাসার রসায়নের জায়গাটি যে এখনও দূর্বল হয়ে যায়নি সে সম্পর্কে ধারণা পান। রিপোর্টার তাসনীম হাসানও তার সচিত্র রিপোর্টসহ একটি আবেগঘন ফেসবুক স্ট্যাটাস দেন (*প্রিয়াংকা মজুমদারের ছবির জন্য দেখুন পরিশিষ্ট- ৮:১*)। মানবদরদী সাংবাদিক জনাব তাসনীমের রিপোর্টটি পড়ে পত্রিকা পাঠকগণ আবেগাপ্লুত ও দুঃখ ভারাক্রান্ত হন এবং মন্তব্য লিখে প্রিয়াংকার আত্মার শান্তি

কামনা করেন। আমি নিজে রিপোর্টটি পড়ার পর তাঁকে ফোন করে ধন্যবাদ জানাই। তিনি বলেন, স্যার, ছাত্রীর প্রতি আপনার দরদমাখা স্ট্যাটাস দেবার কারণেই আমি এমন করে লিখতে পেরেছি।

ফারহানা আকতার

২০১৭ সালের ১০ সেপ্টেম্বর সদ্য পাস করা এমএসএস ২০১৫ সেশনের কতিপয় শিক্ষার্থী ঢাকায় ব্যাংকে চাকুরির ইন্টারভিউ দিয়ে চট্টগ্রামে ফিরে আসার সময় বাস দুর্ঘটনায় আহত হয়। এদের পাঁচজনকে প্রাথমিক চিকিৎসা দিয়ে ছেড়ে দিলেও ফারহানা আকতার নামের একটি মেয়ের আঘাত ছিল গুরুতর। এ দুর্ঘটনায় ফারহানার পায়ের হাড় এবং গলার কলার বোন ভেঙ্গে যায়। ফলে তাকে এক মাসের মতো চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে থাকতে হয়। আমি যখন এ দুর্ঘটনার খবর পাই তার কয়েকদিন আগে সস্ত্রীক আমেরিকা থেকে এসেছি। বিদেশ ভ্রমণের ক্লান্তি তখনও ভালো করে কাটেনি। সে জন্য আমি যেদিন খবর পাই তার দু'দিন পর হাসপাতালে ফারহানাকে দেখতে যাই। তাকে দেখে অনেক কষ্ট পাই। এ মেয়েটি নিয়মিত ক্লাস করত এবং লেখাপড়ায় ভালো ছিল। তার সম্পর্কে খোঁজ নিয়ে জানতে পারি, তার পরিবার থাকে কক্সবাজার। ফারহানা আর্থিকভাবে অস্বচ্ছল পরিবারের বড় মেয়ে। পরদিন আমি বিভাগীয় সিনিয়র সহকর্মীদের সঙ্গে পরামর্শ করে ফারহানাকে দশ হাজার টাকা চিকিৎসা খরচের জন্য দেয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি। নিজের সামান্য কিছু অর্থসহ ওই টাকা আমি নিজে হাসপাতালে গিয়ে ফারহানাকে দিয়ে আসি। তবে আমাদের বিভাগীয় সম্মানিত সহকর্মীদের অনেকে ফাহানাকে হাসপাতালে দেখতে যান এবং তাদের অনেকে তাকে ব্যক্তিগতভাবে অর্থ সহায়তা করেন। আমি নিজে সম্মানিত সহকর্মীদের মধ্যে 'মনোযোগ আকর্ষণ' শিরোনামে একটি বিজ্ঞপ্তি প্রচার করি। ওই বিজ্ঞপ্তিতে ফারহানার হাসপাতালের পরিবর্তিত ঠিকানা, ওয়ার্ড ও বেড নম্বর সহকর্মীদের জানিয়ে সবিনয়ে বলি, কেউ যদি ব্যস্ততার কারণে ফারহানাকে দেখতে যেতে না পারেন, বা তাকে কিছু সহায়তা করতে চান, এমন ক্ষেত্রে বিভাগে সে অর্থ জমা দিলে বিভাগের তরফ থেকে তা অসুস্থ ফারহানাকে পৌঁছে দেয়া হবে। আমার এ কৌশলী আবেদনে কাজ হয়। পরে অনেকে হাসপাতালে দেখতে গিয়ে তাকে সাহস দেন এবং তাকে আর্থিক সহায়তাও করেন। একজন প্রভাষক আমার বিজ্ঞপ্তিতে সাড়া দিয়ে বিভাগে অর্থ জমা দিলে আমি নিজে হাসপাতালে গিয়ে সে অর্থ ফারহানাকে দিয়ে আসি। ফারহানার প্রতি যাতে ডাক্তাররা বিশেষভাবে যত্নবান হন সে জন্য বিভাগীয় অধ্যাপক ও সম্মানিত পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক মেডিকেল কলেজ কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ করেন। তার অপারেশনের আগে আমি আবারো হাসপাতালে গিয়ে তার খোঁজখবর নেই। তার বন্ধুবান্ধব এবং সহপাঠীরা তার প্রতি সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেয়। এদের দু'জন ছিল সোহেল ও মইন। এদের কাছে জানতে পারি, চিকিৎসার ব্যাপারে ফারহানার আপাতত আর্থিক কোনো সমস্যা নেই।

অপারেশন হবার পর ফারহানা চট্টগ্রাম শহরের ষোলো শহর ২ নম্বর গেটের আল ফালাহ গলির ভেতরে হাড়ভাঙ্গা গলির ৬ তলায় একটি মেয়েদের মেসে ওঠে। এ গলিতে যে এত মেয়ে মেসে থেকে কষ্ট করে লেখাপড়া করে আমার জানা ছিল না। একদিন আমি তার মেসে ৬ তলার ঠিকানায় উপস্থিত হয়ে দেখি দরজার সামনে প্রায় ১২-১৩ জোড়া স্যান্ডেল। তখনই বুঝতে পারি যে এটি মেস। ফারহানা একটি রুমে ছিল। আমি যাওয়ায় কয়কজন মেয়ে আমাকে দেখতে আসে। তাদের কেউ বিশ্ববিদ্যালয়ে আবার কেউ কেউ শহরের বিভিন্ন কলেজে পড়ে। কেউ আমাকে ফল কেটে দেয়, কেউ নুডুলস খেতে দেয়, আবার কেউ নিয়ে আসে লেবুর সরবত। আমি বললাম, মামনিরা তোমরা লেখাপড়া করো, তোমাদের কাজ করো। আমি আমার ছাত্রীকে দেখতে এসেছি। তার সঙ্গে সামান্য কথাবার্তা বলে চলে যাব। পরবর্তীতে ফারহানা মেয়র গলিতে একটি মেসে ওঠে। এবার তার মেস ছিল এক তলায়। সেখানে একাধিকবার আমি তাকে দেখতে যাই। প্রথমবার তাকে ক্র্যাচে ভর দিয়ে হাঁটতে দেখে খুশি হই। তাকে উৎসাহ দিয়ে আসি। আরো খুশি হই এ খবর জেনে যে সে স্কুল ও কলেজে শিক্ষকতার চাকুরি করার জন্য যে নিবন্ধন পরীক্ষা দিয়েছিল তার দুটিতেই পাস করেছে।

এর কিছুদিন পর সম্ভবত এপ্রিল মাসে জানলাম যে ফারহানার কলার বোন, যা অপারেশন না করেই ভালো হয়ে যাবে বলে তার ডাক্তার ভেবেছিলেন, তা হচ্ছে না। সে কলারবোনে ব্যথা অনুভব করে। কাজেই তাকে আবার হাসপাতালে ভর্তি হতে হবে। সে যথারীতি ভর্তি হয়ে অপারেশনের জন্য দ্রুত ডেট করাতে সক্ষম হয়। পরে খবর পেলাম তাকে ওটিতে ঢোকাবার পর ডাক্তাররা তার অপারেশন করতে পারেননি। কারণ, তার ওপর অ্যানেসথেসিয়া কাজ করেনি। পরে আরও কয়েকদিন সময় নিয়ে ডাক্তাররা নিজেদের মধ্যে পরামর্শ করে আবারও তাকে অপারেশনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। এবার অপারেশন সফল হয়। তার শরীরের অন্য স্থান থেকে হাড় কেটে গলায় লাগানো হয়। অপারেশনটি বেশ ক্রিটিক্যাল ছিল। সে অনেক কষ্ট পায়। তাকে বেশ কয়েকদিন হাসপাতালে থাকতে হবে শুনে এবার একদিন সস্ত্রীক তাকে দেখতে যাই। এই অপারেশনের কথা অনেকে জানতেন না। তাকে খুঁজে বের করে দেখি তার অবস্থা করুণ। বললাম, তোমার সাথে কেউ নেই কেন? ফারহানা বলল ওর ছোট বোন আছে, সে সন্ধ্যার পর আসবে। সঙ্গে যে যৎসামান্য টাকা ছিল তার হাতে দিয়ে এলাম। ভাবলাম, সে সংকোচে হয়ত কিছু বলছে না। আমার কেনো জানি মনে হলো, তার কিছু আর্থিক সহায়তা দরকার। এবার আমি অন্য কৌশল ব্যবহার করলাম। আমাদের সহকর্মী প্রফেসর ড. মাহফুজুল হক চৌধুরী, যিনি প্রাথমিক সহায়তা দেবার সময় আমরা তাকে ফারহানার বিষয়টি জানাতে পারিনি। পরে তিনি আমাকে এক পর্যায়ে বলেন, তুমি টাকার দরকার হলে কাউকে তো আমার কাছে পাঠিয়ে দিতে পারতে। আমি তাকে আশ্বস্ত করেছিলাম যে, মাহফুজ ভাই আমি ওর অপারেশনের আগে খোঁজ নিয়েছিলাম। প্রয়োজনের চেয়ে বেশি টাকা থাকার

কারণে আপনাকে স্মরণ করিনি। তবে কোনো সময় প্রয়োজন হলে আপনার স্মরণাপন্ন হতে পারি। ওই কথাটি আমার মনে ছিল। সকালে হাঁটতে গেলে তাঁর সঙ্গে প্রায়ই আমার দেখা হত। পরদিন দেখা হলে আমি বিনয়ের সঙ্গে কথা বলার ফাঁকে ফারহানার প্রসঙ্গ টানলাম। তিনি আগ্রহের সঙ্গে তার খোঁজ খবর নেয়ার এক ফাঁকে বললাম, মাহফুজ ভাই এবার তাকে হাসপাতালে দেখতে গিয়ে আমি যৎসামান্য টাকা দিয়ে এসেছি। আমার মনে হয় এখন হয়ত তার কিছু আর্থিক সাহায্য দরকার। উনি সঙ্গে সঙ্গে বললেন, তুমি কাউকে পাঠিয়ে দিও আমি কিছু সহায়তা দেব। আমি প্রভাষক সেলিমুল হককে বললে তিনি আমাকে মাহফুজ ভাইয়ের কাছ থেকে একটি সম্মানজনক অঙ্কের টাকা এনে দেন। ফারহানা তখন হাসপাতাল ছেড়েছে। সপ্তাহে দু'য়েক পর একদিন তাকে হাসপাতালে যেতে হয়। আমি সময় করে তার মেসে গিয়ে ওই টাকা তার হাতে দিয়ে আসি এবং ঐখানে বসেই টেলিফোনে মাহফুজ ভাইকে ফোন করে তার সহায়তা পৌঁছে দেবার কথা জানাই এবং ফারহানার সাথেও কথা বলিয়ে দেই। তিনি তাকে ফোনে জিজ্ঞেস করেন যে, সে তার ক্লাস করত কিনা। ফারহানা যেহেতু ক্লাসে নিয়মিত ছিল কাজেই উনি কি পড়িয়েছেন সে তার সব কিছু তার স্যারকে বলে।

ফারহানা মনের দিক থেকে সংগ্রামী মেয়ে। আমার বিশ্বাস, সে উঠে দাঁড়াবে এবং জীবন সংগ্রামে জয়ী হবে। সে হাসপাতালে থাকাকালীন আমি নামাজ পড়ে আল্লাহর কাছে তার জন্য দোয়া করেছি। আমার সম্মানিত সহকর্মীবৃন্দও তাকে সহায়তা করেছেন। কর্মজীবনে তাকে সুপ্রতিষ্ঠিত দেখলে আমি খুব খুশি হব। ফারহানা এখন পুরোপুরি সুস্থ। তার কোনো শারীরিক সমস্যা নেই। তবুও তার প্রতি আমি এক রকম মায়া অনুভব করি। এ জন্য অনেকদিন পর পর তার খোঁজখবর নেই। সুবর্ণ জয়ন্তীর অনুষ্ঠানে ফারহানাকে হাসিখুশি দেখে খুবই ভালো লাগে। ফারহানা ১৪ মার্চ, ২০২০ তারিখে আমাকে ফোন করে জানায় যে সরকারি প্রাইমারি স্কুলে তার চাকুরি হয়েছে। এ খবর শুনে আমি খুবই খুশি হয়ে আল্লাহ পাকের দরবারে শুকরিয়া জানাই। মে মাসে সে প্রথম বেতন পাবার পর আমাকে ফোন করে জানায়। এ খবরে যে আমি কত খুশি হই তা বলে বুঝাতে পারব না। কাজেই কেবল প্রিয়াংকা এবং ফারহানা নয়, আমার শিক্ষকতা জীবনে এ রকম আরো অনেক উদাহরণ রয়েছে। কাজেই একজন সফল শিক্ষক বা সভাপতিকে কেবল শিক্ষার্থীর খুশির খবরে তাকে অভিনন্দিত করলে দায়িত্ব শেষ হয়ে যায় না, দুঃখের দিনেও যতটা সম্ভব তাদের পাশে দাঁড়াতে হয়। আমার অভিজ্ঞতা থেকে দেখেছি, দুঃখের দিনের সহায়তাকারী শিক্ষককে শিক্ষার্থীরা কোনোদিনও ভুলতে পারে না।

প্রফেসর মুনিরের ইন্তেকাল

প্রফেসর ড. আ ন ম মুনির আহমদ ছিলেন রাজনীতিবিজ্ঞান বিভাগের একজন বরিষ্ঠ শিক্ষক। বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্ণদলীয় রাজনীতিতে তিনি ছিলেন খুবই সক্রিয় এবং সাদা দলের অন্যতম নেতা ও নীতি নির্ধারক। তিনি চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

শিক্ষক সমিতির সভাপতি এবং সাধারণ সম্পাদকও ছিলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ নীতি নির্ধারণী পর্ষদ সিন্ডিকেটে লেকচারার থেকে অধ্যাপক পর্যন্ত প্রতি ক্যাটেগরি থেকে তিনি নির্বাচিত সিন্ডিকেট সদস্য হিসেবে দায়িত্বপালন করেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের রাজনীতিতে একটি দল করলেও সব দলের শিক্ষকদের মাঝে তার গ্রহণযোগ্যতা ছিল। শিক্ষক হিসেবেও তিনি ভালো ছিলেন। তবে তিনি শিক্ষক হিসেবে যতটা ভালো ছিলেন, তার চেয়ে মানুষ হিসেবে ছিলেন অনেক উদার, অমায়িক, পরোপকারী এবং বন্ধুবৎসল। বিপদাপদে শিক্ষকদেরকে সহায়তা করা ছিল তাঁর একটি অন্যতম চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। সংগঠক হিসেবেও প্রফেসর মুনির ছিলেন অসাধারণ গুণের অধিকারী। চট্টগ্রাম শহরের নাসিরাবাদ আবাসিক এলাকায় সাউথপয়েন্ট স্কুল অ্যান্ড কলেজ নামে তিনি কয়েকজন বন্ধুকে নিয়ে চট্টগ্রামে প্রথম ন্যাশনাল কারিকুলামের ইংরেজি স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন। অনেক পরিশ্রম করে তিনি এ প্রতিষ্ঠানটিকে একটি সফল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসেবে দাঁড় করান। তাঁর আর্থিক স্বচ্ছলতার মূলেও ছিল এই স্কুল থেকে প্রাপ্ত মুনাফা। আমাদের অনেকের সঙ্গে, বিশেষ করে আমার সঙ্গে বয়সের ব্যবধান থাকা সত্ত্বেও তিনি সব সময় বন্ধুর মতো আচরণ করতেন। আমি নিজেও তাঁকে আমার একজন শুভানুধ্যায়ী এবং বড় ভাইয়ের মতো মনে করতাম। ২০১৫ সালের আগস্ট মাসে বিভাগীয় দায়িত্ব নেবার পর থেকে আমি বিভিন্ন সময় তাঁর কাছে বিভাগ পরিচালনার অনেক বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছি। লক্ষ্য করেছি, তিনি সব সময় আমাকে এমনভাবে পরামর্শ দিতেন যাতে বিভাগের স্বার্থ সমুন্নত থাকে।

প্রফেসর মুনির ছিলেন একজন শিক্ষানুরাগী ব্যক্তিত্ব। ২০১৬ সালের মে-জুন মাসে তিনি আমেরিকা, যুক্তরাজ্য এবং তুরস্ক সফর করেন। আমেরিকার টেক্সাস বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁর ছোট মেয়ে পিএইচডি গবেষণারত ছিল। তাঁর একমাত্র ছেলে এ এল এম মিসবাহুল মুনির লুবাব লন্ডনে ব্যারিস্টারি পড়ত। তিনি একমাস আমেরিকা ভ্রমণ করেন। পরে লন্ডনে ছেলের সঙ্গে কিছুদিন সময় কাটিয়ে তুরস্ক হয়ে বাংলাদেশে ফিরে আসেন। লন্ডনে থাকাকালে রাজনীতিবিজ্ঞান বিভাগের সাবেক শিক্ষার্থীরা তাঁকে সম্মাননা জানাবার উদ্দেশ্যে গেট টুগেদারের আয়োজন করেন। শিক্ষার্থীরা যে বিদেশের মাটিতেও শিক্ষকদের ভুলে যায় না, তা অধ্যাপক মুনিরকে লন্ডনের মন্টেরফোর সেন্টারে ২৭ মে, ২০১৬ তারিখে সম্মাননা জানাবার মধ্য দিয়ে রাজনীতিবিজ্ঞান পরিবারের শিক্ষার্থীরা প্রমাণ করেন (লন্ডনে অধ্যাপক মুনিরকে প্রদত্ত সম্মাননা অনুষ্ঠানের ছবির জন্য দেখুন পরিশিষ্ট- ৮:২)। বাংলাদেশে আসার পর তিনি যেদিন বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদান করেন, সে দিন আমি তাঁর সঙ্গে তাঁর গাড়িতে বিশ্ববিদ্যালয়ে যাই। এর দু'দিন পর আমি বিভাগীয় একাডেমিক কমিটির মিটিং দিলে তিনি আমাকে টেলিফোনে জানান, তিনি শারীরিকভাবে অসুস্থ বোধ করছেন বলে মিটিং-এ আসতে পারবেন না। পরে জানলাম তার মাথা ঘুরাচ্ছে এবং এ জন্য তিনি চট্টগ্রাম শহরস্থ সিএসসিআর ক্লিনিকে চিকিৎসার জন্য ভর্তি হয়েছেন। আমি এবং আমার প্রতিবেশি প্রফেসর

ড. সিদ্দিক আহমেদ চৌধুরী তাকে সিএসসিআর-এ দেখতে যাবার আগেই শুনলাম তিনি ঢাকায় চলে গেছেন এবং পপুলার ক্লিনিকে ভর্তি হয়েছেন। পরে সেখান থেকে তিনি ল্যাব এইডে ভর্তি হন। ইতিমধ্যে তিনি যে ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়েছেন সে খবর শিক্ষকদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে। বিভিন্ন বিভাগের অনেক শিক্ষক আমি বিভাগীয় সভাপতি হওয়ায় আমার কাছে ফোন করে তাঁর শারীরিক অবস্থা সম্পর্কে খোঁজ নিতেন। আমি প্রফেসর মুনিরের ঘনিষ্ঠভাজন শিক্ষক প্রফেসর এস এম নছরুল কাদির এবং তার ছেলে লুবাবকে ফোন করে যা জানতে পারতাম, তা তাদেরকে জানাতাম। কিন্তু আমি নিজে তাঁকে দেখতে না পারায় এক রকম অশান্তিতে ভুগছিলাম। পরে সস্ত্রীক ঢাকা গিয়ে পর পর দু'দিন তাঁকে ল্যাব এইডে দেখতে গেলাম। তাঁর অবস্থা ভালো ছিল না। তবুও তিনি আমাদের সঙ্গে কথা বললেন। অসুস্থ অবস্থায় তাঁর ক্লাসের খোঁজখবর নিলেন। আমি তাঁকে বললাম, আপনি আপনার ক্লাস নিয়ে কোনো চিন্তা মনে আনবেন না। ওসব বিষয় আমরা দেখব। আপনি মন শক্ত রাখুন এবং সুস্থ হবার চেষ্টা করুন। তিনি আমাদের কাছে দোয়া চাইলেন। আমি বললাম, রাজনীতিবিজ্ঞান পরিবারের সকল সদস্য এবং চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় পরিবারের সকল শিক্ষক কর্মকর্তা-কর্মচারী আপনার জন্য দোয়া করছেন। ইনশায়াল্লাহ আপনি সুস্থ হয়ে আমাদের মাঝে ফিরে আসবেন।

আমি প্রফেসর মুনিরকে তাঁর শারিরিক অবস্থার কথা ভয়ে এবং সংকোচে জিজ্ঞেস করিনি। পরে তাঁর বড় মেয়ে ডাক্তার নওমা আফরিনের কাছে রুমের বাইরে এসে জানতে চাইলে সে বলল, চাচা আব্বার অবস্থা ভালো না। স্টেজ ফোর। শুনে খারাপ লাগল। পরদিন দেখতে গিয়ে তাঁর ৫৬৩ নম্বর রুমে আমরা কয়েকজন মাগরিবের নামাজ পড়লাম। তিনিও বসে আমাদের সঙ্গে নামাজ আদায় করলেন। তাঁর জন্য বিশেষভাবে দোয়া করা হলো। এ মানুষটি ২০১৬ সালের মে-জুন মাসে আমেরিকা, লন্ডন ও তুরস্ক ভ্রমণ করলেন। আমেরিকায় স্বাস্থ্য চেক আপ করালেও কোনো অসুখ ধরা পড়ল না। সুস্থ অবস্থায় কাজে যোগদান করার পর হঠাৎ অসুস্থ হয়ে তাঁকে ঢাকায় প্রথমে পপুলার এবং শেষে ল্যাড এইডে ভর্তি হয়ে দুরারোগ্য ব্যাধি ক্যান্সারের সঙ্গে যুদ্ধ করতে হলো। আমরা যখন তাঁকে অসুস্থ অবস্থায় ঢাকার ল্যাব এইডে দেখতে যাই, তখন দুর্বল হলেও তাঁর মনোবল শক্ত ছিল। আমরা তাঁকে সাহস দিয়েছিলাম এবং তিনিও মনে জোর রেখে ভেবেছিলেন, তিনি হয়ত বেঁচে যাবেন।

মুনির ভাই অসুস্থ অবস্থায় ঢাকার ধানমন্ডিস্থ ম্যারিয়ট কনভেনশন সেন্টারে তাঁর ছোট মেয়ে মালিহা তাবাসসুম হুমার বিয়ে দিয়ে যান। ডাক্তারের বিশেষ অনুমতি নিয়ে তিনি হুইল চেয়ারে কিছু সময়ের জন্য ওই বিবাহ অনুষ্ঠানে যোগ দেন। আমরা জন দশেক বিভাগীয় শিক্ষক মাইক্রোবাস নিয়ে ঢাকার ল্যাবএইডে তাকে দেখে বিয়েতে যোগদান করি। আমার অনুরোধে বিভাগীয় প্রভাষক দীপাঞ্জলী বড়ুয়া পিংকী ঢাকায় থাকায় ওই বিয়েতে স্বামীসহ আমাদের সঙ্গে

যোগদান করেন। ছোট মেয়েকে বিয়ে দিতে পেরে অধ্যাপক মুনির খুশি হন। আমরা ওই রাতেই মাইক্রোবাস নিয়ে ঢাকা থেকে চট্টগ্রামে ফিরে আসি। এরপর প্রফেসর মুনিরের অবস্থার অবনতি হতে থাকে। আমাদের সঙ্গে ওই দেখাই যে তাঁর শেষ দেখা হবে তা বুঝতে পারিনি। এরপর সবাইকে কাঁদিয়ে ২০১৬ সালের ২২ আগস্ট তারিখ সকাল ১১ টায় তিনি আমাদের ছেড়ে না ফেরার দেশে চলে যান।

প্রফেসর মুনিরের লাশ চট্টগ্রামে এলে একদফা জানাজা হবার পর তাঁকে তাঁর গ্রামের বাড়ি আনোয়ারায় নিয়ে যাওয়া হয়। আমরা চট্টগ্রামের জানাজায় শরিক হই। পরে লাশের সঙ্গে গিয়ে তাঁর গ্রামের বাড়ির জানাজায়ও শরিক হই। তাঁকে দাফন করা হলে বিভাগের পক্ষ থেকে আমরা শেষ শ্রদ্ধা জানাই (শেষ শ্রদ্ধাজ্ঞাপনের ছবির জন্য দেখুন পরিশিষাট- ৮:৩) প্রফেসর মুনির যে গোপনে কত মানুষকে সহায়তা করতেন, এলাকায় যে তিনি কত জনপ্রিয় ছিলেন, তা আমরা আনোয়ারায় না গেলে বুঝতে পারতাম না। আমাদের সঙ্গে শিল্পপতি সুফি মিজানুর রহমানসহ আরো অনেক গণ্যমান্য ব্যক্তিত্ব প্রফেসর মুনিরের আনোয়ারার গ্রামের বাড়ির জানাজায় শরিক হন। পরে আমরা বিভাগের পক্ষ থেকে তাঁর স্মরণে ২৯ আগস্ট তারিখে শোকসভার আয়োজন করি। অনুষদের ডিন, কতিপয় বিভাগীয় সভাপতিসহ বিভাগের সকল শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণে শোকসভাটি সম্পন্ন হয় (বিভাগীয় শোকসভার ছবির জন্য দেখুন পরিশিষ্ট- ৮:৪)। পরদিন ৩০ আগস্ট তারিখে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি প্রফেসর মুনিরের স্মরণে শোকসভার আয়োজন করে। আমরা বিভাগের উল্লেখযোগ্যসংখ্যক শিক্ষক ওই শোকসভায় যোগদান করি। ভিসি এবং প্রোভিসি মহোদয়সহ অনেক গণ্যমান্য শিক্ষক শোকসভায় বক্তব্য রাখেন।

প্রফেসর মুনিরের মৃত্যুর পর কিছু অসাধু ব্যক্তি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে তার 'স্বাধীনতাবিরোধী' ভূমিকা ছিল বলে অপপ্রচারণা চালান। এ বিষয়টি আমার নজরে আসে। একজন শিক্ষক, যিনি সাড়ে তিন দশক ধরে শিক্ষকতা করাকালীন রাজনৈতিকভাবে সক্রিয় এবং শিক্ষক সমিতির সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক এবং সিনেট সিন্ডিকেটসহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে দায়িত্বপালন করা সত্ত্বেও তাঁর বিরুদ্ধে তাঁর রাজনৈতিক প্রতিপক্ষরাও কখনো এমন অভিযোগ করেননি। তাঁর মৃত্যুর পর এমন অভিযোগ উত্থাপন ছিল অত্যন্ত অশোভন ও নিন্দনীয় ঘটনা। আমি অনেক চিন্তভাবনা করে বিভাগীয় শোকসভায় আমার বক্তব্যে এ বিষয়টির অবতারণা করিনি। ভেবেছি, একজন মৃত মানুষের নামে এমন অসত্য অপবাদের প্রসঙ্গটি যত কম আলোচনা হয় ততই ভালো। তা ছাড়া আমাদের ছাত্ররা এ বিষয় জানে না। যদি আমি বিষয়টি আমার বক্তব্যে উত্থাপন করি তাহলে সব ছাত্রছাত্রীরা জানবে, যা আমাদের জন্য সম্মানজনক হবে না। বিভাগীয় অন্য শিক্ষকগণের অনেকেই এ বিষয়টি জানলেও তাঁদের আলোচনায় উত্থাপন করেননি। কিন্তু শিক্ষক সমিতির শোকসভায় মাননীয় উপাচার্য তাঁর বক্তব্যে এ বিষয়টির অবতারণা করেন এবং

কঠোর ভাষায় এর নিন্দা করে বিষয়টি অসত্য ও ভিত্তিহীন বলে নাকচ করে দেন। প্রফেসর মুনিরের মৃত্যু বিভাগের জন্য ছিল একটি বড় ধাক্কা। কারণ, তিনি বিভাগীয় সভাগুলোতে সব সময় ইতিবাচক ভূমিকা রাখতেন এবং বিভাগের মঙ্গলার্থে সিদ্ধান্ত গ্রহণে সহায়তা করতেন। বিভাগের শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের মধ্যে সহমর্মিতা বজায় রাখতেও সব সময় তাঁর ইতিবাচক ভূমিকা থাকত।

সামাজিক ও এক্সট্রাকারিকুলার কার্যক্রমে মনোযোগ

একজন বিভাগীয় সভাপতি তাঁর বিভাগের সহকর্মী ও শিক্ষার্থীদের একাডেমিক কার্যক্রমে যেভাবে মনোযোগী হবেন, তেমনি তাঁকে তাঁদের সামাজিক ও এক্সট্রা-কারিকুলার কার্যক্রমেও মনোযোগী হতে হবে। বিভাগে মাঝে-মধ্যে যদি সেমিনারের আয়োজন করে তাতে ছাত্রছাত্রীদের অংশগ্রহণ করানো হয়, তাহলে তারা তা ইতিবাচকভাবে গ্রহণ করে। এমনকি একাডেমিক কার্যক্রম ছাড়াও অন্যসব সামাজিক কার্যক্রমের ব্যবস্থা করলেও শিক্ষার্থীরা তাতে অংশগ্রহণ করে এবং তারা এতে আনন্দ পায়। একাডেমিক কার্যক্রম ছাড়া আমাদের অনুষদ ও বিভাগে আমরা বেশকিছু এক্সট্রাকারিকুলার কার্যক্রম আয়োজন করতাম। এর মধ্যে ছিল প্রতি বছর নবাগত শিক্ষার্থীদের জন্য ওরিয়েন্টেশন প্রোগ্রাম, বিদায়ী শিক্ষার্থীদের জন্য বিদায় সংবর্ধনা এবং এসব অনুষ্ঠানের অংশ হিসেবে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান করা, অনুষদ আয়োজিত বিভিন্ন সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতায় বিভাগীয় শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণ করানো, বিশ্ববিদ্যালয় আয়োজিত বাৎসরিক স্পোর্টস ছাড়াও বিভাগ কর্তৃক আয়োজিত খেলাধূলার আয়োজন, প্রভৃতি। এ সত্য স্বীকার্য, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা যতটা এক্সট্রা-কারিকুলার কার্যক্রমে অংশগ্রহণের সুযোগ পায়, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা বিশ্ববিদ্যালয়টি শহর থেকে দুরে অবস্থিত হওয়ায় এখানে তত বেশি অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণের সুযোগ পায় না। তাছাড়া ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্র (টিএসসি) না থাকাও এ রকম অনুষ্ঠান কম হওয়ার একটি কারণ। তারপরও আমরা যখনই সুযোগ পেয়েছি তখনই শিক্ষার্থীদের জন্য এ রকম অনুষ্ঠান করার চেষ্টা করেছি। বিভাগে বেশি সেমিনারের আয়োজন হয় না। এর কারণ হলো বিভাগীয় শিক্ষকরা সেমিনার দিতে বেশি আগ্রহী নন। এ কাজে আর্থিক বরাদ্দ না থাকায় নবীন শিক্ষকগণের অনেকে সেমিনার প্রদানের চেয়ে রিসার্চ প্রজেক্ট পেতে আগ্রহী। কারণ, সেখানে বিশ্ববিদ্যালয়ের আর্থিক বরাদ্দ থাকে। আর এ কাজ করতে পারলে একদিক থেকে শিক্ষক যেমন আর্থিক দিক দিয়ে কিছুটা লাভবান হন, আবার অন্যদিক দিয়ে তিনি ওই প্রজেক্টের গবেষণালব্ধ তথ্য ব্যবহার করে নিজের জন্য গবেষণা প্রবন্ধ তৈরি করে প্রকাশনা করার সুযোগ পান। এ ছাড়া কিছু শিক্ষক আবার বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়িয়ে বাড়তি উপার্জন করেন। তবে তাদের মধ্যে অনেকে এ বিষয়টি বিশ্ববিদ্যালয়কে জানালেও আবার অনেকে এ বিষয় বিশ্ববিদ্যালয়কে না জানিয়েই এ কাজ করেন। ফলে এসব দিকে সময় দেয়ায় বিশ্ববিদ্যালয়ে নিজ বিভাগে সেমিনার দিতে শিক্ষকরা ততটা উৎসাহিত হন না।

আমার সভাপতি থাকাকালে ২০১৮ সালে বিভিন্ন বর্ষের মধ্যে জাঁকজমকভাবে অনুষ্ঠিত হয় পলিটিক্যাল সায়েন্স প্রিমিয়ার লিগ-২০১৮ শীর্ষক ক্রিকেট প্রতিযোগিতা। এই খেলার উদ্বোধনী দিনে আমি, অধ্যাপক ড. মুস্তাফিজুর রহমান সিদ্দিকী এবং আরও কতিপয় সহকর্মী মিলে এ এফ রহমান হল মাঠে উপস্থিত হয়ে খেলার উদ্বোধন করি এবং খেলার শেষ দিনেও অন্যান্য সহকর্মী নিয়ে মাঠে উপস্থিত থেকে পুরস্কার বিতরণ করি। খেলা চলাকালীনও আমি অন্য সহকর্মীদের নিয়ে মাঠে গিয়ে খেলোয়াড়দের উৎসাহিত করি। বিপুলসংখ্যক শিক্ষার্থীদর উপস্থিতিতে ম্যাচগুলো অনুষ্ঠিত হয় (পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানের ছবির জন্য দেখুন পরিশিষ্ট- ৮:৫)। এ ছাড়া আমার সভাপতি থাকাকালে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ক্রিকেট টিমের ক্যাপ্টেন মনোনীত হন বিভাগীয় কৃতি ক্রিকেটার ওসমান গনি মিঠু।

পিকনিক ও স্টাডি ট্যুর

রাজনীতিবিজ্ঞান বিভাগে শীতকালে বিভিন্ন বর্ষের শিক্ষার্থীরা পৃথকভাবে পিকনিকের আয়োজন করে। আর এমএসএস শেষ বর্ষের শিক্ষার্থীরা আয়োজন করে র‍্যাগ ডে এবং স্টাডি ট্যুর। স্টাডি ট্যুরের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকে আর্থিক বরাদ্দ থাকে, যদিও ওই বরাদ্দের পরিমাণ কম। যেমন, এমএসএস ক্লাসের ১৩৫-১৪০ জনের মতো শিক্ষার্থীর স্টাডি ট্যুরের জন্য বরাদ্দ দেয়া হয় ২৮ বা ২৯ হাজার টাকা। শিক্ষার্থীরা ৩ দিনের একটি ট্যুর এত কম টাকায় সম্পন্ন করতে পারে না। সে ক্ষেত্রে তারা নিজেরা চাঁদা দিয়ে ফান্ড তৈরি করে। তবে যেহেতু সব শিক্ষার্থী স্টাডি ট্যুরে যায় না, সে জন্য তারা কক্সবাজার, সেন্ট মার্টিন বা অন্য কোনো স্থানে স্টাডি ট্যুর করে আসতে পারে। টাকায় সংকুলান না হলে অনেক সময় তারা বিভাগের কাছে আর্থিক সহায়তা চায়। আমি সভাপতি থাকাকালীন দু'একবার এমন আবেদনে সাড়া দিয়ে স্টাডি ট্যুরের জন্য অর্থ বরাদ্দ করেছি। শিক্ষার্থীদের মানসিক বিকাশের জন্য এমন উদ্যোগ ভালো। অধিকাংশ সময় এমন আয়োজন শিক্ষার্থীরা সফলভাবে সম্পন্ন করতে পারে। তবে কখনোই যে তাদের মধ্যে গ্রুপিংজনিত কারণে কোনো অদৃশ্য মনোমালিন্য হয়নি এমন নয়।

বিভিন্ন বর্ষের পিকনিক আয়োজনের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের আর্থিক বরাদ্দ থাকে না। শিক্ষার্থীরা নিজেরা চাঁদা তুলে এমন আয়োজন করে। তবে তারা বিভাগের কাছেও অধিকাংশ সময় কিছু আর্থিক সহায়তা চায়। আমি বিভাগীয় সভাপতি থাকাকালে এমন আবেদন পেলে তাদেরকে আর্থিক সহায়তা দিয়েছি। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে আমি তাদেরকে হাজার পাঁচেক টাকা বরাদ্দ করেছি। এ রকম বার্ষিক পিকনিক, বা স্টাডি ট্যুরে শিক্ষার্থীরা ভদ্রতা করে সকল শিক্ষককে আমন্ত্রণ করলেও সাধারণত দু'তিনজন শিক্ষক যোগ দেন। তবে বিভাগের পক্ষ থেকে শিক্ষক ছাড়া শিক্ষার্থীদের পিকনিকে যাবার অনুমতি দেয়া হয় না। এমন পিকনিকগুলো সাধারণত একদিনে শেষ হয়। সকালে রওনা দিয়ে শিক্ষার্থীরা রাতে ফিরে আসে। লেখাপড়ার একঘেয়েমি থেকে এ রকম পিকনিক অন্তত একদিনের জন্য হলেও

শিক্ষার্থীদের ভিন্ন পরিবেশে নিয়ে যায়, যেখানে তারা মুক্ত হাওয়ায় উপভোগ করে ভিন্ন রকম আনন্দ।

বিভাগীয় চেয়ারম্যান হিসেবে আমি প্রতিটি পিকনিক পার্টির সঙ্গে আমন্ত্রিত হলেও সব সময় যোগ দিতে পারিনি। তবে আমি তাদের সঙ্গে শিক্ষকদেরকে অনুরোধ করে পাঠিয়েছি। আবার অনেক সময় আমি না যেতে পারলেও শহরের যে স্পট থেকে তাদের বাস ছেড়েছে, সেখানে হাজির থেকে তাদেরকে উৎসাহ দিয়ে এসেছি। তারপর সারা দিনে শিক্ষকদেরকে এবং শিক্ষার্থীদের মধ্যে কয়েকজন ছেলে এবং মেয়ের ফোনে কয়েক ঘন্টা পরপর ফোন করে তাদের সুবিধা-অসুবিধার খোঁজ নিয়েছি। এতে শিক্ষার্থীরা বুঝেছে, বিভাগীয় সভাপতি না আসতে পারলেও তিনি তাদেরকে পর্যবেক্ষণে রেখেছেন। এতে শিক্ষার্থীরা খুশি হয়েছে। দুটি বর্ষের শিক্ষার্থীরা আমার কাছে যে সততার পরিচয় দিয়েছে তাতে আমি খুশি হয়েছি। এরা পিকনিক থেকে ফিরে আসার পর আমাকে জানিয়েছে যে, আমি তাদেরকে যে পাঁচ হাজার টাকা আর্থিক অনুদান দিয়েছিলাম তা সব খরচ হয়নি। তারা বেঁচে যাওয়া টাকা ফেরত দিতে চেয়েছে। আমি খুশি হয়ে তাদেরকে এ টাকা দিয়ে বন্ধুবান্ধব মিলে খেতে বলা সত্ত্বেও তারা সে অর্থ দিয়ে তাদের শিক্ষকদেরকে মিষ্টি কিনে দিতে চেয়েছে। আমি তখন তাদেরকে বিভাগীয় একাডেমিক কমিটির মিটিংয়ের দিন মিষ্টি কিনে দিলে বিভাগের অর্থ সাশ্রয় হবে জানালে তারা রাজি হয়েছে। এভাবে প্রতিটি পিকনিক ও স্টাডি ট্যুর যাতে শিক্ষার্থীদের জন্য উপভোগ্য হয় সে জন্য আন্তরিকভাবে চেষ্টা করেছি। সবগুলো পিকনিকে না যেতে পারলেও আমি ২০১৩-২০১৪ সেশনের তৃতীয় বর্ষের এবং ২০১৫-২০১৬ সেশনের শিক্ষার্থীদের সঙ্গে যথাক্রমে ২০১৭ এবং ২০১৮ সালে রাঙ্গামাটি ও বান্দরবন পিকনিকে অংশগ্রহণ করে অনেক আনন্দ করেছি (পিকনিকের ছবির জন্য দেখুন পরিশিষ্ট- ৮:৬)। আবার ২০১৩-২০১৪ সেশনের শিক্ষার্থীরা যখন চতুর্থ বর্ষের ছাত্র হিসেবে কক্সবাজারের সেন্ট মার্টিনে শিক্ষা সফরে যায়, তখন আমি না যেতে পারলেও রাত ১২টায় শহরের শপিং কমপ্লেক্স থেকে তাদের বাস ছাড়ার আগে সেখানে উপস্থিত হয়ে তাদেরকে রওনা করে দিতে গেলে তারা খুশি হয় এবং আমাকে সফরের জন্য বিশেষভাবে তৈরি গেঞ্জি উপহার দেয়। আবার সফর থেকে ফিরে আসার পরে তারা আমাকে ওই সফরের ছবি ফটোফ্রেমে বাধাই করে একজন শিক্ষকসহ এসে উপহার দেয়।

ভালোবাসার চাদর

এমএসএস ২০১৫ ব্যাচের শিক্ষার্থীরা নিয়মানুযায়ী শিক্ষা সফরের আয়োজন করে। এরা শিক্ষা সফরের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ২৯ হাজার টাকা অনুদান পায়। এর সঙ্গে এরা ব্যক্তিগত চাঁদা সংগ্রহ করে তহবিল তৈরি করে। কিন্তু তাতেও প্রয়োজনীয় অর্থের সংকুলান না হলে শিক্ষার্থীরা বিভাগ থেকে আর্থিক অনুদান চেয়ে একটি দরখাস্ত লিখে আমার সঙ্গে দেখা করে। তারা বিভাগের কাছ

থেকে শিক্ষা সফরের জন্য ২৫-৩০ হাজার টাকা আর্থিক সাহায্য চায়। আমি অপারগতা প্রকাশ করি। তাদেরকে বুঝিয়ে বলি, বিভাগের আর্থিক অবস্থা ভালো না। তার ওপর আবার কম্পিউটার ল্যাব সহকারী নিয়োগ দিয়ে তাকে প্রতি মাসে বিভাগীয় তহবিল থেকে ৭ হাজার টাকা বেতন দিতে হচ্ছে। ফলে এ পরিমাণ টাকা দিলে সারা বছর বিভাগের খরচ চালানো কঠিন হবে। আমি তাদেরকে হতাশ না করে বলি, তোমরা পরে এসো দেখি আমি তোমাদের জন্য কিছু করতে পারি কিনা। অনেক চিন্তা-ভাবনা করে পরে শিক্ষার্থীরা এলে আমি তাদের জন্য ১৫ হাজার টাকা সহায়তা মঞ্জুর করি। এতে আবেদনকারী শিক্ষার্থীরা খুব একটা খুশি হয়নি বলে আমার কাছে মনে হয়। যা হোক, তারা দু'জন শিক্ষকের তত্ত্বাবধানে কক্সবাজারের সেন্ট মার্টিন দ্বীপপুঞ্জে গিয়ে দু'দিন থেকে সফলভাবে শিক্ষা সফর শেষ করে ফিরে আসে। প্রত্যাবর্তনের ২-৩ দিন পর কয়েকজন শিক্ষার্থী আমার সঙ্গে দেখা করে। আমি তাদেরকে সফলভাবে শিক্ষা সফর শেষ করে আসায় অভিনন্দন জানাই এবং আগামীতে যখন বিভাগীয় ব্রোসার প্রকাশ করা হবে, তখন ওই ব্রোসারে প্রকাশের জন্য তাদেরকে শিক্ষা সফরের কয়েকটি গ্রুপ ছবি আমাকে দিতে বলি। তারা আমাকে ছবি দেবে বলে প্রতিশ্রুতি দেয়। তারপর তারা আমাকে একটি প্যাকেট দেয়।

: এটা কি?
: স্যার এটা আমাদের পক্ষ থেকে আপনার জন্য একটি সামান্য উপহার।
: কি আছে এতে?
: স্যার একটি চাদর আছে।
: চাদরের দাম কত?
: স্যার উপহারের দাম বলতে নেই। আমরা তো আপনার কাছ থেকে দাম নিতে পারব না।

আমি কিছুটা আবেগপ্রবণ হয়ে চুপ থাকি। বুঝতে পারি, তারা নিতান্ত ভালোবেসেই আমার জন্য এ উপহার এনেছে। আমি শিক্ষার্থীদেরকে ধন্যবাদ জানাই। তবে তখনই মনে মনে তাদের এ নিঃস্বার্থ ভালোবাসার প্রতিদান দিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি। শিক্ষার্থীরা আমাকে ভালোবেসে উপহার দেবে, আর আমি তার প্রতিদান দেব না, তা হতে পারে না। কারণ, একতরফা ভালোবাসা টেকসই হয় না। সে জন্য এ বিষয়টি নিয়ে আমি বেশ কয়েকদিন ভেবে একটি পরিকল্পনা তৈরি করি। আমার বড় মেয়ের উন্নত ক্যামেরায় তাকে দিয়ে শিক্ষার্থীদের উপহার দেয়া চাদরটি গায়ে দিয়ে একটি ছবি ওঠাই। তারপর ছয় লাইনের একটি কবিতা লিখে আমার চাদর পরিহিত ছবির সঙ্গে ওই কবিতা জুড়ে দিয়ে ফটোপেপারে কালার প্রিন্টারে ছেপে আকর্ষণীয় ভিউকার্ডের মতো একটি উপহার তৈরি করি। ওই উপহারটি একটি সাদা কাগজের খাম তৈরি করিয়ে তাতে ভরে খামের মুখে লাভ হার্ট বা স্টার স্টিকার লাগিয়ে ১২৮ জন শিক্ষার্থীর জন্য তৈরি করে রাখি। আর ওই একই উপহারের একটি দুইফুট বাই পৌণে চারফুট সাইজের ব্যানার বানিয়ে

ওই ব্যাচের বিদায় সংবর্ধনায় চেয়ারম্যানের ব্যক্তিগত উপহার হিসেবে ওই ব্যাচের সকল পরীক্ষার্থীকে দেবার পরিকল্পনা করি। চট্টগ্রামের আন্দরকিল্লার একটি কম্পিউটার ফার্ম থেকে এ কাজ সম্পন্ন করি। নিখুঁতভাবে এ কাজ করতে ব্যস্ততার মধ্যে আমাকে কয়েকবার আন্দরকিল্লা যেতে হয়। আমি যখন দ্বিতীয়বার উপহারগুলো আনতে যাই তখন কার্ড এবং খাম ঠিক দেখলেও ব্যানারে কিছু ত্রুটি লক্ষ্য করি। আমি তাদেরকে ব্যানারটিতে কি ভুল হয়েছে তা বুঝিয়ে দিয়ে আবার বানাতে বলি। তারা পরদিন এসে ব্যানার নিয়ে যেতে বলেন। আমি আবার পরদিন আন্দরকিল্লা যাই।

: কই আমার ব্যানার দিন। রেডি আছে তো?
: হ্যাঁ স্যার। গতকালই আমরা করিয়ে রেখেছি।
: আমাকে আবার দেখতে হবে খুলে ফেলুন।
: নিশ্চয়ই স্যার। আপনি যেভাবে বলেছিলেন সেভাবেই করেছি। ভুল শুদ্ধ করা হয়েছে।

আমি ব্যানারটি খুঁটিয়ে পরীক্ষা করে বলি,

: ব্যানারটি আরো একবার তৈরি করতে হবে।
: কেন স্যার? ভুল শুদ্ধ করা হয়নি?
: হয়েছে। কিন্তু এর উপরে পেছনের দিকে একটি পট্টি লাগানো কেন?
: স্যার ওটাতো পেছনে। দেয়ালে টানালে দেখা যাবে না। দিন আমি টানিয়ে আপনাকে দেখাই।
: দেখুন, আপনার দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে আমার দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য আছে। আপনি এ সব বুঝবেন না। আচ্ছা শুনুন, মনে করুন আপনি একটি মেয়েকে ভালোবাসেন। তাকে আপনি একটি থ্রিপিছ উপহার দিতে চান। দোকানে গিয়ে একটি থ্রিপিছ আপনার পছন্দ হলো। কিন্তু দাম দেবার আগে যদি দেখেন ওই থ্রিপিছের ওড়নার এক কোনায় একটু দাগ আছে, বলুন তো আপনি কি সেটি কিনবেন? নিশ্চয়ই কিনবেন না। আপনি যদি ওই দৃষ্টিতে দেখেন, তাহলে ব্যানারটি আপনাকে আবার বানাতে হবে। কারণ, শিক্ষার্থীদেরকে এ উপহারটি আমি ভালোবেসে দিচ্ছি। এতে কোনো ত্রুটি থাকলে আমি তা নিতে পারি না। আবারো যদি আমি কোনো ত্রুটি দেখি, আমি আবারো বানাতে বলব। এ জন্য যত খরচ লাগে আমি দেব।

তিনি বিষয়টি বুঝতে পেরে তাঁর সহকারী রাসেলকে বললেন, কোনো কথা না বলে স্যারকে এখনই ওই দোকানে নিয়ে যাও।

যেখানে ব্যানার বানায় রাসেল আমাকে সেখানে নিয়ে গেল। এই প্রথম আমি ব্যানার প্রিন্ট করার উন্নত মেশিন দেখলাম। রাসেলকে দেখে দোকানিদের একজন বললেন, তোমাদের এই ব্যানার গতকাল সংশোধন করে দিয়েছি তো, এটা আবার নিয়ে এসেছ কেন? রাসেল প্রশ্নের জবাব না দিয়ে বলল, স্যারের সঙ্গে কথা বলেন। আমি তাকে একই ব্যাখ্যা প্রদান করলাম। তিনি কিছুটা অবাক হয়ে তার

সঙ্গীকে বললেন, এই এক্ষুনি মেশিন অন কর। আর স্যারকে এক কাপ চা দিতে বল। তারপর তিনি আমার প্রতিটি নির্দেশ মনোযাগ দিয়ে শুনে আমার সামনেই ব্যানার প্রিন্ট করলেন। এবার আমি কোনো ভুল ধরতে পারলাম না এবং সন্তুষ্টচিত্তে ব্যানার নিয়ে এলাম। আমি তাদেরকে তিনবার প্রিন্ট করার খরচ দিতে চাইলেও তারা সম্মান করে কিছু টাকা কম রাখলেন।

সবকিছু প্রস্তুত করার পর ওই ব্যাচের শেষ পরীক্ষার দিন পরীক্ষার হলে একটি নোটিশ দেই। নোটিশে বলা হয়, তোমাদের ১২৮ জন পরীক্ষার্থীর প্রত্যেককে বিভাগীয় সভাপতি একটি ব্যক্তিগত উপহার দিবেন। আগামীকাল তোমাদের মৌখিক পরীক্ষা শুরু হবার আধঘন্টা পূর্বে সশরীরে হাজির হয়ে বিভাগীয় সভাপতির কাছ থেকে প্রত্যেককে তার উপহার সংগ্রহ করতে বলা হচ্ছে। এমন ধরনের নোটিশ এর আগে কখনো পরীক্ষার হলে দেয়া হয়নি। এ নোটিশ পাবার পর পরীক্ষার হলের ইনভিজিলেটর শিক্ষকগণ কৌতূহলী হয়ে আমি কি উপহার দেব জানতে চান। আমি কৌতূহল বাড়াতে তাদের বলি, দেখা যাক কি দেয়া যায়। কাল পর্যন্ত অপেক্ষা করেন। পরীক্ষার পর পরীক্ষার্থীদের মধ্যে এ নিয়ে অনেক জল্পনা কল্পনা হয়। শিক্ষার্থীদের জন্য যে উপহার তৈরি করি তা ছিল তাদের কল্পনার বাইরে। এ উপহারে সংযোজিত কবিতাটি ছিল এ রকম:

ভালোবাসার চাদর

শীতকালে শীত না করার একটা কারণ আছে
কনকনে শীত পরাজিত ভালোবাসার কাছে।
আমার ছাত্রীদের শ্রদ্ধা আর ছাত্রদের আদরে
উষ্ণ হয়ে থাকি শীতে ভালোবাসার চাদরে।
বিদায় নিয়ে শিক্ষার্থীরা যেথায় থাকুক নাকো
হে পরোয়ার ওদের তুমি দুধে-ভাতে রাখো।

এ কবিতার সঙ্গে চাদর গায়ে দেয়া আমার ছবি ছেপে তার নীচে এক বাক্যের ব্যাখ্যায় শিক্ষার্থীদেরকে বিভাগীয় সভাপতিকে চাদর উপহার দিয়ে সকল শিক্ষককে সম্মানিত করায় অভিনন্দন জানানো হয় (উপহারের নমুনার জন্য দেখুন পরিশিষ্ট- ৮:৭)।

শিক্ষার্থীরা এ উপহার পেয়ে অভিভূত হয়। তারা ভেবেছিল আমি হয়ত তাদেরকে কলম, বা অন্য কোনো ছোটখাটো উপহার দিতে পারি। কিন্তু আমি যে তাদের ভালোবাসার এমন সৃষ্টিশীল প্রতিদান দেব তা তারা কল্পনাও করতে পারেনি। তাদের চোখে ছিল আনন্দ এবং কৃতজ্ঞতার আবেগ। এ উপহার পাবার পর এক ছাত্র বলল, 'স্যার, সুন্দর কবিতা লিখেছেন!' আরেক বিদায়ী ছাত্রী বলল, 'এত সুন্দর একটি উপহার আপনি আমাদের জন্য তৈরি করেছেন। এটি তো একটি শো'পিস হয়েছে স্যার। এ উপহারকে আমরা আজীবন মনে রাখব। সযত্নে সংরক্ষণ করব।' পাশ থেকে আরেক ছাত্র বলে উঠল, 'স্যার আপনি আমাদের জন্য অনেক কষ্ট করেছেন।' আমি বলি, তোমরা যদি আমাকে ভালোবেসে চাদর

উপহার দিতে পারো, আমি কি এতই দরিদ্র যে তোমাদেরকে একটি ছোট্ট উপহারও দিতে পারব না? তবে হ্যাঁ, এ উপহার পরিকল্পনা ও তৈরি করতে আমার অনেকটা সময় লেগেছে। কিন্তু তোমরা খুশি হওয়ায় কষ্ট সার্থক হয়েছে। এ ভাবে 'ভালোবাসার চাদর' শীর্ষক কবিতাকে একটি আকর্ষণীয় রঙীণ শো'পিস হিসেবে উপহার দিয়ে শিক্ষার্থীদের ভালোবাসার প্রতিদান দেয়ার চেষ্টা করি। এ চেষ্টা সফল হয়। অনেক শিক্ষার্থী এ উপহারটিকে লেমিনেট করে রাখে, আবার কোনো কোনো শিক্ষার্থী ফ্রেমে বাঁধাই করে রাখে। আর এ উপহারের যে ব্যানার ভার্সন তাদেরকে বিদায় সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে উপহার হিসেবে দেয়া হয়, সেটি তারা খুবই পছন্দ করে। তারা আমাকে জিজ্ঞেস করে, স্যার এটি কে নেবে? আমি বলি, এটি তোমাদেরকে সম্মিলিতভাবে উপহার দিয়েছি। এখন তোমরা এটি কাকে দেবে বা কি করবে সেটি তোমাদের ব্যাপার। পরে তারা অনেক চিন্তা-ভাবনা করে উপহারটি কেউ না নিয়ে বিভাগীয় সেমিনার লাইব্রেরিতে টানিয়ে রাখে। এ ব্যাচের বিদায় সংবর্ধনা অনুষ্ঠিত হয় ২০১৭ সালের ১২ ফেব্রুয়ারি তারিখে। তার দু'দিন পর ১৪ ফেব্রুয়ারি পালিত হয় বিশ্ব ভালোবাসা দিবস। ওই তারিখে *যুগান্তর* পত্রিকায় এ পুরো বিষয়টি নিয়ে আমার লেখা 'ভালোবাসার অভিনব প্রতিদান' শীর্ষক একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। প্রবন্ধটি পরবর্তীতে আমার লেখা একটি গ্রন্থেও স্থান পায়।[৪২] ওই প্রবন্ধে শিক্ষার্থী ও শিক্ষকের মধ্যকার ভালোবাসার রসায়নের স্বরূপ বিশ্লেষণ করি। শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর মধ্যকার ভালোবাসা অনেকক্ষেত্রেই কেন টেকসই হচ্ছে না, কেন 'শিক্ষক কর্তৃক ছাত্রী লাঞ্ছিত' ধরনের সংবাদ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়, এ সব বিষয় বিশ্লেষণ করি। প্রবন্ধটিতে শিক্ষার্থীদেরকে দেয়া আমার উপহারের নমুনাও উপস্থাপন করা হয়। বিদায়ী শিক্ষার্থীসহ সকল শিক্ষার্থীরা এ প্রবন্ধটি পড়ে খুব খুশি হয়।

কেবল যে চাদর দিয়েই আমাকে শিক্ষার্থীরা ভালোবাসা প্রকাশ করেছে তা নয়। সাবেক শিক্ষার্থীরা যে সব প্রতিষ্ঠানে কাজ করেছে সে সব প্রতিষ্ঠানে কোনো কাজের জন্য গেলে অনেক সম্মান ও শ্রদ্ধা পেয়েছি। চট্টগ্রামের এমন কোনো ব্যাংক নেই যেখানে কোনো কাজে গিয়ে কদাচিৎ আমাকে লাইনে দাঁড়াতে হয়েছে। প্রায় প্রতিটি ব্যাংকের শাখায় শিক্ষার্থী পাওয়া গিয়েছে যারা আমার কাজ করে দিয়ে এবং আমাকে আপ্যায়ন করেছে। অন্য গ্রাহকদের সামনে সালাম করে সম্মানিত করেছে। সব সময় আমার শারীরিক সুস্থতার খোঁজখবর নিয়েছে। একবার নব্বইয়ের দশকে ব্যাকপেইনে আক্রান্ত হয়ে চট্টগ্রাম শহরের জয়নগরের বাসায় শুয়ে থাকতাম। ক্লাস নিতে পারিনি কয়েক সপ্তাহ। চট্টগ্রামে আমার তেমন আত্মীয়স্বজনও ছিল না। কিন্তু বেশ কয়েকটি ক্লাসে আমাকে অনুপস্থিত পেয়ে যখন

---

৪২ দেখুন, মুহাম্মদ ইয়াহ্‌ইয়া আখতার, *শিক্ষা ও সংস্কৃতি ভাবনা* (চট্টগ্রাম: খড়িমাটি, ২০১৯), পৃষ্ঠা-২৩৮-২৪২।

শিক্ষার্থীরা জানতে পারে আমি অসুস্থ, তখন তারা দল বেঁধে আমাকে বাসায় দেখতে এসেছিল। সেদিন আমার প্রতি তাদের চোখমুখে মায়া ও উদ্বেগ দেখে আনন্দে আমার চোখ ভিজে গিয়েছিল। যখন নাসিরাবাদ হাউজিং সোসাইটির একটি হাইরেইজ বিল্ডিং এর নয়তলায় থাকতাম, আশপাশের সাবেক ছাত্ররা আমার খোঁজখবর নিত। সমাজতত্ত্বের দিদার, রাজনীতিবিজ্ঞানের সালাউদ্দিন, রনি, ফয়সাল, নিজের ছেলের মতোই আমার সুবিধা-অসুবিধা দেখত। ২০১৯ সালে কোরবানীর ঈদে এক গরীব আত্মীয়কে দিয়ে গ্রামে কোরবানি করাই। এটা জানতে পেরে এক ছাত্র টিফিন ক্যারিয়ার ভর্তি রান্না করা মাংস ও অন্যান্য খাবার নিয়ে বাসায় চলে আসে। কাছাকাছি নাসিরাবাদ হাউজিং সোসাইটির ৬ নম্বর রোডে বসবাসকারী এক ছাত্রের বাসায় পারিবারিক অনুষ্ঠান ছিল। সে আমাকে কিছু না বলে টিফিন ক্যারিয়ার ভরে বিভিন্ন উপাদেয় খাবার বাসায় দিয়ে যায়। আমি এসবে বিব্রত হই। শিক্ষার্থীদেরকে এসব ব্যাপারে নিরুৎসাহিত করি। কিন্তু অনুমতি না নিয়ে একেবারে বাসায় চলে এলে তো আর খারাপ ব্যবহার করা যায় না। এ ছাড়াও সাবেক শিক্ষার্থীদের অনেকে বছরের শুরুতে ডায়েরি, কলম, নোটবুক ডাকযোগে উপহার পাঠায়। আমি সেগুলো আবার আমার ছাত্রছাত্রীদেরকে উপহার দেই।

আমি ২০১৯ সালে বুক জ্বালা, গ্যাস এবং পিঠের ব্যথায় কষ্ট পাই। প্রথমে ভাবি কিডনিতে কোনো সমস্যা হয়েছে। কিন্তু চেকআপে কিছু ধরা না পড়ায় গ্যাসের সমস্যা বিবেচনা করি। তবে আমার ইউরিক অ্যাসিডের মাত্রা বেশি ছিল। সে কারণে প্রোটিনসমৃদ্ধ এবং বিচি জাতীয় খাবার খাওয়া নিয়ন্ত্রণ করি। প্রথম বর্ষ-২০১৯ এর এক ছাত্র বিষয়টি জানতে পারে। সে ২০১৯ সালে কোরবানির ঈদে বাড়ি গিয়ে ফিরে আসার সময় আমার জন্য কষ্ট করে অর্জুন গাছের ছাল নিয়ে আসে। আমি যখন ২৮ আগস্ট, ২০১৯ তারিখে আমার রুমে বিশ্ববিদ্যালয় বাস ধরার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছি এমন সময় আমার রুমে এসে আমাকে সেগুলি দেয়। বলে, স্যার এগুলো গুড়া করে পানিতে ভিজিয়ে খেলে আপনি ভালো থাকবেন। আর যদি গুড়া না করতে চান, তাহলে পানিতে ভিজিয়ে রস খেলেও হবে। আমি হতবাক হয়ে যাই। প্রথম বর্ষের ছাত্র। আমি তাদের ক্লাস নেই না। পড়াই না। অথচ সুদুর খুলনার ফুলতলা থেকে আমার জন্য কষ্ট করে অর্জুন গাছের ছাল নিয়ে এসেছে (অর্জুন গাছের ছালের ছবির জন্য দেখুন পরিশিষ্ট- ৮:৮)। এ ভালোবাসার প্রতিদান কেমন করে দেব? আবেগে আমার চোখ ভিজে যায়। তাকে ধন্যবাদ দিতে পারিনি।

শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের বিবাহ

সভাপতির সামাজিক কাযক্রমের মধ্যে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের বিবাহে যোগদান অন্যতম। শিক্ষক এবং শিক্ষার্থীরা তাদের বিবাহের অনুষ্ঠানে সভাপতিসহ শিক্ষকদেরকে দাওয়াত করেন। সভাপতি এ সব সামাজিক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ

করলে শিক্ষার্থীরা খুশি হন। আমি সভাপতি থাকাকালে বিবাহের দাওয়াত পেলে সে অনুষ্ঠানে যথাসম্ভব অংশগ্রহণ করতে চেষ্টা করেছি। শিক্ষক, স্টাফ এবং শিক্ষার্থী এমনকি অনেকক্ষেত্রে ছাত্রছাত্রীদের ভাইবোনদের বিয়েতেও অনুরুদ্ধ হয়ে যোগ দিয়েছি। ওইসব অনুষ্ঠানে গেলে অনেক সাবেক শিক্ষার্থীর সঙ্গে আলাপ আলোচনার সুযোগ হয়। এতে দাওয়াত প্রদানকারীও খুশি হন। বিয়ের ব্যাপারে সহকর্মীদের সম্পর্কে বা ছাত্রীদের সম্পর্কে অনেক সময় সভাপতির কাছে খোঁজখবর নিতে বিয়ের অন্য পক্ষ আসেন। সে সব ক্ষেত্রে আমি সততার সঙ্গে তাদেরকে আমাদের সহকর্মী ও শিক্ষার্থীদের সম্পর্কে ইতিবাচকভাবে তথ্য প্রদান করেছি। তবে কিছুক্ষেত্রে যে সমস্যা হয়নি এমন নয়। এখানে এমন একটি বিবাহকেন্দ্রিক জটিলতার প্রসঙ্গ তুলে ধরবো।

বিভাগের একজন সহকারী অধ্যাপকের বিয়ে নিয়ে সমস্যা হয়। এই সহকর্মী আমার ছাত্র। আমার বিভাগীয় সভাপতির পদে আসার আগেই সে বিভিন্ন জটিলতায় জড়িয়ে পড়ে। সহকর্মী লেখাপড়ায় ভালো। জুনিয়র সহকর্মীদের মধ্যে সে উল্লেখযোগ্য লেখালেখি ও প্রকাশনা করেছে। তবে সভাপতির পদে আসার আগে অন্য শিক্ষকদের কাছে জানতে পারি, সে শহরের একটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগের একজন শিক্ষককে বিয়ে করেছে। এটা তার ব্যক্তিগত ব্যাপার। সে এমন বিয়ে করতেই পারে। কিন্তু এ বিয়ে সম্পর্কে সে বিভাগকে, বা বিভাগীয় সভাপতি হিসেবে আমাকে বা অন্য কোনো শিক্ষককে কিছুই বলেনি। বিয়ের বেশ কিছুদিন পর এ শিক্ষক স্কলারশিপ নিয়ে উচ্চশিক্ষার উদ্দেশ্যে জাপান চলে যায়। জাপানের ন্যাশনাল গ্রাজুয়েট ইন্সিটিটিউট অব পলিসি স্টাডিজ থেকে এক বছরের মধ্যে কৃতিত্বের সাথে মাস্টার অব পাবলিক পলিসি (এমপিপি) ডিগ্রি করে আবার বিভাগে এসে যোগদান করে। অন্যদের কাছে জানতে পারি, দেশে আসার আগেই স্ত্রীর সঙ্গে এ সহকর্মীর বনিবনার সমস্যা দেখা দেয়। এ নিয়ে দু'য়েকজন শিক্ষক দেন-দরবার করেন বলে খবর পাই। যা হোক, এ মতবিরোধ চরম পর্যায়ে পৌছালে বিভাগের একজন সিনিয়র অধ্যাপকের বাসভবনে একাধিক সালিসি বৈঠক হয় এবং এক পর্যায়ে আমাদের সহকর্মীর সঙ্গে তার স্ত্রীর বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটে। এ শিক্ষক তার স্ত্রীকে মোহরানার অর্থ বাবদ কয়েক লাখ টাকা প্রদান করার মধ্য দিয়ে বিষয়টি মিটমাট হয় বলে জানতে পারি। সমঝোতা বৈঠকে উভয় পক্ষ পরস্পরকে বিরক্ত করবে না মর্মে প্রতিশ্রুতি দেয়। কিন্তু পরবর্তীতে সে প্রতিশ্রুতি তাঁরা রাখতে পেরেছেন বলে প্রতীয়মান হয়নি।

২০১৬ সালের এপ্রিল মাসের শেষ সপ্তাহে এ সহকর্মীর সাবেক স্ত্রী আমাকে নিজের পরিচয় দিয়ে টেলিফোনে আমার সহকর্মীর বিরুদ্ধে তাকে নানাভাবে হুমকি ধমকি করা ও নির্যাতন করার অভিযোগ করেন। তিনি বলেন, তিনি তাঁর বিরুদ্ধে মামলা করার প্রস্তুতি নিচ্ছেন। এ ছাড়া তাঁর আর কোন পথ নেই। তাঁর নামে অভিযোগ করে এর আগে তিনি দু'বার থানায় জিডি করেছেন বলে আমাকে জানান। তাছাড়া তিনি তাঁর বিরুদ্ধে মাননীয় ভাইস চ্যান্সেলরের কাছে লিখিত

অভিযোগ করবেন বলে আমাকে জানান। তিনি আরও বলেন, তাঁর সঙ্গে এ সহকর্মীর ছাড়াছাড়ি হবার পর তাঁর সাবেক স্বামী অন্যত্র বিয়ের চেষ্টা করে ব্যর্থ হওয়ায় তিনি তাঁদেরকে সন্দেহ করেন। তিনি তাঁর এমন সন্দেহকে একেবারেই 'অমূলক' বলে অভিহিত করেন। তাঁর ভাষায়, আমার সহকর্মীর প্রতি তিনি এবং তাঁর পরিবারের সদস্যগণ এত বেশি বিরক্ত যে, তাঁরা কেউ তাঁর ছায়া পর্যন্ত মাড়াতে চান না। এ ভাবে অনেক অভিযোগ শোনার পর আমি তাঁকে শান্ত করার চেষ্টা করে বলি, দেখুন, মামলা করার অধিকার আপনার আছে। আপনি চাইলে মাননীয় ভাইস চ্যান্সেলরের কাছেও তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ করতে পারবেন। কিন্তু যেহেতু আপনি আমাকে বিভাগীয় চেয়ারম্যান হিসেবে ফোন করেছেন, আমি আপনাকে একটু ধৈর্য ধরতে অনুরোধ করব। আমি মনে করি, এ রকম কাদা ছোড়াছুড়িতে আপনাদের দু'জনের কারও লাভ হবে না। তা ছাড়া আপনার বয়স কম। আপনাকে ভবিষ্যতে ঘর সংসার করতে হবে। কাদা ছোড়াছুড়ি হলে আপনারও মান সম্মানের হানি হবে। আমি আপনাকে এক-দু'দিন ধৈর্য ধরতে অনুরোধ করছি। আমি আগামীকাল আমার সহকর্মীর সঙ্গে এ বিষয়ে কথা বলব। সে যাতে আপনাকে আর বিরক্ত না করে সে জন্য তাকে অনুরোধ করব। সহকর্মী হলেও সে আমার ছাত্র। আমার বিশ্বাস, সে আমার কথা শুনবে। আর যদি এর পর আমার কথা না শুনে আপনাকে আবারও বিরক্ত করে, সে ক্ষেত্রে আপনি যে কোনো পদক্ষেপ নিতে পারবেন।

ভদ্রমহিলা আমার কথায় নরম হলেন। তবে পরদিন তিনি আমাকে আবারও ফোন করে বললেন, স্যার আমি আপনাকে আবারও ফোন করার জন্য দুঃখিত। আপনার সহকর্মী আবার আমার বাবাকে ফোন করে হুমকি দিয়েছে। আমি বললাম, আপনি চিন্তা করবেন না, আমি বিষয়টি দেখছি। আমি তার সঙ্গে এখনও কথা বলতে পারিনি। আমার বিশ্বাস, আমি তার সঙ্গে কথা বলার পর সে আপনাকে বিরক্ত করবে না। আমি ফোন করে জানতে পারলাম, আমাদের সহকর্মী ভারত যাবার জন্য বেনাপোলে আছে। কিছুদিন আগে সে রোগীর অ্যাটেনডেন্ট হিসেবে ভারতে গিয়েছিল। একই ভিসায় সে আবারও ভারত যেতে চাইলে এবার সঙ্গে রোগী না থাকায় যাবার অনুমতি না পেয়ে ফিরে আসছে। আমি তাকে বিভাগে এসে জরুরি ভিত্তিতে আমার সঙ্গে দেখা করতে বলি। সে বিভাগে এলে আমি তাকে বিষয়টির গুরুত্ব বুঝাতে চেষ্টা করি। কাছে বসিয়ে বলি দেখ, নারীঘটিত ব্যাপারে জড়িয়ে পড়লে তুমি ক্ষতিগ্রস্ত হবে। তোমার বিরুদ্ধে তো তোমার সাবেক স্ত্রীর আগেই থানায় একাধিক জিডি করা রয়েছে। এর পর যদি তিনি আবার ভিসি সাহেবের কাছে তোমার বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ করেন, সেক্ষত্রে ভিসি সাহেব তদন্ত কমিটি করলে তুমি বিপদে পড়বে। এমন কি তোমার চাকরি নিয়ে সমস্যা হতে পারে। সে একটু নরম হলেও ওই মেয়ের বিরুদ্ধে নানা রকম অভিযোগ করে। এ সব অভিযোগের মধ্যে একটি অভিযোগ ছিল— ওই মেয়ে তাঁর জাপান থাকাকালীন সময়ে এক সাংবাদিকের সঙ্গে মেলামেশা করেন।

তার সঙ্গে ঘন্টার পর ঘন্টা ফোনালাপ করেন। তার কাছে ওই মেয়ের ওই সময়ের ফোন রেকর্ড রয়েছে যা সে দালিলিক প্রমাণ হিসেবে আমাকে দেখায়। আমি তার কথা অবিশ্বাস করিনি। তবে তাকে এ বলে পরামর্শ দেই, দেখ, ওই মহিলা এখন আর তোমার স্ত্রী নন। কাজেই তিনি কি করেন না করেন, তা তোমার দেখা উচিত নয়। তুমি এসব দেখতে যেও না। এর ফলে তিক্ততা বাড়বে। তিনি যাকে খুশি তাকে বিয়ে করুন। তুমি ওই চ্যাপ্টার ভুলে যাও। নতুন করে শুরু করো। বিয়ে করতে চাইলে অন্যত্র মেয়ে দেখ। আমি তোমাকে সহায়তা করব।

এর পর সে আবার নতুন মেয়ে দেখে বিয়ের চেষ্টা করতে থাকে এবং একদিন সে এ ব্যাপারে আমার সঙ্গে কথা বলে। আমি তাকে উৎসাহ দেই। সে আমার সহায়তা চায়। বলে, স্যার যদি আপনাকে কোনো মেয়ের অভিভাবক ফোন ক'রে আমার সম্পর্কে জানতে চান, তাহলে আপনি একটু দেখবেন। আমি তাকে আশ্বস্ত করে বলি, তুমি কোনো চিন্তা করবে না। এমন হলে আমি তোমার সম্পর্কে একটি ইতিবাচক ধারণা দেবার চেষ্টা করব। তবে আমি তোমাকে এ প্রসঙ্গে একটি পরামর্শ দিতে চাই। তুমি যে কোনো মেয়েকে বিয়ের প্রপোজাল দাও না কেন, ওই মেয়ের অভিভাবকদের সঙ্গে আলাপ আলোচনার এক পর্যায়ে তোমার আগের বিয়ের ব্যাপারে একটি ধারণা আগে থেকেই তাদেরকে দিও। নানা কারণে মানুষের বিবাহ বিচ্ছেদ হতে পারে। তোমার বিবাহ বিচ্ছেদ হয়েছে মানে যে তুমি দোষী, ব্যাপারটা তো এ রকম নাও হতে পারে। তবে তুমি যদি বিষয়টি গোপন করো, তাহলে পরে একদিন না একদিন তাঁরা বিষয়টি জানতে পারবেন এবং তখন তোমাকে প্রতারণাকারী বলে অভিযুক্ত করবেন। আমাকে যদি ফোন করে কোনো মেয়ের অভিভাবক তোমার সম্পর্কে জানতে চান, আমি তোমার সম্পর্কে ইতিবাচক ধারণা দেবার সঙ্গে এ বিষয়ে সত্য কথাটি বলব এবং আমি মনে করি, এতে তোমার মঙ্গল হবে। পরে অঙ্ক বিভাগের এক অধ্যাপক আমাকে ফোন করে তার ব্যাপারে খোঁজখবর নেন। তার এক সহপাঠীর মেয়ের সঙ্গে আমাদের সহকর্মীর বিয়ের ব্যাপারে কথাবার্তা হয়েছিল। আমি ওই অধ্যাপককে আমার এ ছাত্রের একাডেমিক যোগ্যতা, লেখাপড়া, প্রকাশনা, বিদেশে ডিগ্রি করাসহ সবকিছু বলি। আগের বিয়ের ব্যাপারেও জিজ্ঞাসিত হলে আমি তাকে সত্য ধারণা দেই এবং আমার সহকর্মীর পক্ষে বলার চেষ্টা করি।

এ সহকর্মী বিদেশি এমএ ডিগ্রি করায় তার সহযোগী অধ্যাপক পদে পদোন্নতির সময় হয়। সে বলে, স্যার আমি ২০১৭ সালের আগস্ট মাসে সহযোগী অধ্যাপক পদে আবেদনের যোগ্যতা অর্জন করব। সে আমাকে জানায়, বিভাগ যদি পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিয়ে দরখাস্ত আহ্বান করত তাহলে সে আরও আগে এ পদে আবেদনের যোগ্যতা অর্জন করতে পারত। আরেকজন বিভাগীয় ছাত্র সহকর্মী এ সহকর্মীর সিনিয়র হলেও সে তখনো সহযোগী অধ্যাপক পদে আবেদন করার যোগ্যতা অর্জন করতে পারেনি। কারণ, তার কোনো সেকেন্ড ডিগ্রি ছিল না। প্রকাশনার দিক থেকেও সে পিছিয়ে ছিল। অন্যদিকে, প্রথমোক্ত

সহকর্মীর সেকেন্ড ডিগ্রিসহ প্রায় ৮-৯টি প্রকাশিত প্রবন্ধ ছিল। এ কারণে ২০১৭ সালের জুন মাসে সে আমাকে তার সহযোগী অধ্যাপক পদে পদোন্নতির বিষয়টি মনে করিয়ে দিলে আমি বলি, যোগ্যতা অর্জিত হলে তুমি আবেদন করবে। সে বলে স্যার, আমি আবেদন করে আপনাদের সবাইকে একদিন খাওয়াব। আমি বিদেশ থেকে ডিগ্রি করে এসে আপনাদের আপ্যায়ন করতে চেয়েছিলাম। সে খাওয়ার অনুষ্ঠানটি তখন করব। আমি বলি, তুমি জাপান থেকে ডিগ্রি করে আসার জন্য যদি খাওয়াতে চাও, সেটা ভালো কথা। তবে আমার পরামর্শ থাকবে, এর সঙ্গে তুমি তোমার সহযোগী অধ্যাপক পদে আবেদনের বিষয়টি না জড়ালে ভালো হবে। সে আমার বক্তব্য বুঝতে পারে এবং বলে স্যার, ঠিক আছে, আমি যে কোনো একটি বিভাগীয় মিটিংয়ে এ উপলক্ষে সহকর্মীদেরকে খাওয়াব। আমি তাতে খুশিমনে সম্মতি প্রদান করি। এর বেশ কয়েক মাস পর ২০১৮ সালের সেপ্টেম্বরে আমার সভাপতির মেয়াদ শেষ হবার পর সে বলে স্যার, এবার যদি আমি বিয়ে করি তাহলে গোপনে বিয়ে করে ফেলব। আমার পেছনে অনেকে লেগে আছে, তারা আমার ভালো চায় না। কাজেই আমি কাউকে জানাব না। আমি বলি, এটা তোমার ব্যক্তিগত ব্যাপার। তুমি যদি সেটা ভালো মনে করো, তাহলে তেমনই করবে। আমি তখন তার কথাবার্তা এবং হাবভাব দেখে ভাবি, হয়ত সে বিয়ে করে ফেলেছে, অথবা বিয়ে ঠিক করে ফেলেছে। যা হোক এর কিছুদিন পর সে আমাকে তার বিয়ের কথা জানায়। আমি তাকে অভিনন্দন জানাই। তবে সে বলে স্যার, আমার স্ত্রী আমার চেয়ে বয়সে অনেক ছোট। আমি তাকে বলি, এ নিয়ে মন খারাপ করবে না। দু'জনের মনের মিল থাকলে বয়স কোনো ব্যাপার না। তুমি সংসার জীবনে সুখী হও এই দোয়া করি। আমার এ ছাত্র এবং সহকর্মী এখন সস্ত্রীক সন্তানসহ সুখে শান্তিতে আছে। এ কারণে তার একাডেমিক পারফরম্যান্সও ভালো হচ্ছে।

আমার সভাপতির মেয়াদকালে আরও একাধিক সহকর্মী শিক্ষক ও স্টাফদের বিয়ে হয়। এ সবগুলো বিয়েতে আমি অংশগ্রহণ করি। তবে ওই বিয়েগুলো স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় সম্পন্ন হয় বলে বিশেষ আলোচনার দাবি রাখে না। রেওয়াজ অনুযায়ী আমরা বিভাগের পক্ষ থেকে তাদেরকে উপহার প্রদান করি। বর্তমানে এ উপহার নগদ টাকায় দেয়া হয় (কতিপয় সহকর্মীর বিয়ের ছবির জন্য দেখুন পরিশিষ্ট-৮:৯)। এ ছাড়া শিক্ষার্থীদের বিয়েতে আমন্ত্রিত হয়ে সভাপতি ও শিক্ষকগণ গেলে তারা খুব খুশি হয়। আমার সভাপতির মেয়াদকালে আমি এমন প্রায় প্রতিটি বিয়েতে অংশগ্রহণের চেষ্টা করেছি। অনেকক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর ভাই-বোনের বিয়েতেও অনুরুদ্ধ হয়ে অংশগ্রহণ করেছি। এর ফলে ওইসব বিয়েতে শিক্ষার্থীদের সঙ্গে এবং বিশেষ করে সাবেক শিক্ষার্থীদের সঙ্গে আলাপ আলোচনা ও দেখা সাক্ষাৎ করার সুযোগ পেয়েছি। এতে শিক্ষার্থীদের সঙ্গে শিক্ষকদের সম্প্রীতির বন্ধন মজবুত হয়েছে। (শিক্ষার্থীদের বিয়ের ছবির জন্য দেখুন পরিশিষ্ট- ৮:১০)।

শিক্ষার্থীদের বরণ ও বিদায় অনুষ্ঠান

রাজনীতিবিজ্ঞান বিভাগে প্রথম বর্ষে নবাগত শিক্ষার্থীদের বরণ এবং এমএসএস শেষ বর্ষের শিক্ষার্থীদের বিদায় জানাবার রেওয়াজ আছে। তবে নবাগত শিক্ষার্থীদের সংবর্ধনা জানাবার জায়গাটিতে সমাজ বিজ্ঞান অনুষদে পরিবর্তন এনে ২০১৬ সাল থেকে অনুষদভুক্ত সব বিভাগের নবাগত শিক্ষার্থীদের একসঙ্গে বরণ করার জন্য জাঁকজমকপূর্ণ অনুষ্ঠান করা হচ্ছে। এ অনুষ্ঠানে প্রতিটি শিক্ষার্থীকে গলায় পরার জন্য আইডি নম্বরসহ বিভাগ থেকে পরিচিতি কার্ড ও ভিন্ন রঙের গেঞ্জি তৈরি করে দেয়া হয়। উদ্যোগটি ইতিবাচক। এর ফলে সব বিভাগকে পৃথক পৃথকভাবে নবীন বরণ অনুষ্ঠান করতে হচ্ছে না। মাননীয় ভাইস চ্যান্সেলর ও প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর অতিথি হিসেবে প্রতিটি বিভাগের নিমন্ত্রণ রক্ষা না করে একদিনই সমাজবিজ্ঞান অনুষদভুক্ত নয়টি বিভাগের অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে সময় বাঁচাতে পারছেন। তাছাড়া এমন অনুষ্ঠানে একজন খ্যাতিমান শিক্ষাবিদকে ওরিয়েন্টেশন বক্তা হিসেবে আনা হয়। সকল বিভাগের সভাপতি স্টেজে বসেন এবং পর্যায়ক্রমে শুভেচ্ছা বক্তব্য দেন। প্রথম পর্বের অনুষ্ঠানের পর সব বিভাগের শিক্ষার্থীদের পরিবেশনায় অনুষ্ঠিত হয় আকর্ষণীয় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, ২০১৭-২০১৮ সেশনের প্রথম বর্ষের ঐক্যবদ্ধ ওরিয়েন্টেশন ও সাংস্কৃতিক উৎসব অনুষ্ঠিত হয় ৪ ফেব্রুয়ারি ২০১৮ তারিখে। এ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের চেয়ারম্যান প্রফেসর আবদুল মান্নান। অতিথিকে আমি রাজনীতিবিজ্ঞান বিভাগের পক্ষ থেকে আমাদের সদ্য প্রকাশিত ব্রোসার উপহার দেই। এ অনুষ্ঠানে আমি রাজনীতিবিজ্ঞান বিভাগের সভাপতি হিসেবে বক্তব্য রাখি (ছবির জন্য দেখুন পরিশিষ্ট- ৮:১১)। হলভর্তি শিক্ষার্থীদের উপস্থিতিতে এ অনুষ্ঠান জাঁকজমকপূর্ণভাবে অনুষ্ঠিত হয়। দুপুরের পর অনুষ্ঠিত হয় বিভিন্ন বিভাগের শিল্পীদের পরিবেশনায় আকর্ষণীয় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। এ উদ্যোগ চালু হবার পর আমরা আর বড় করে বিভাগীয় নবীন বরণ অনুষ্ঠান করি না। তবে প্রথম ক্লাসের দিন সব শিক্ষককে নিয়ে নবীন শিক্ষার্থীদের শ্রেণিকক্ষে একটি ওরিয়েন্টেশন প্রোগ্রাম করে তাদেরকে ফুল, সিলেবাস এবং ব্রোসার দিয়ে স্বাগত জানানো হয়। এ অনুষ্ঠানে শিক্ষার্থীদের মধ্য থেকে দু'জন এবং শিক্ষকদের মধ্য থেকে অনেকে বক্তব্য রাখেন।

নবীন বরণের মতো বিদায় অনুষ্ঠান ঐক্যবদ্ধভাবে করা সম্ভব নয়। আমাদের বিভাগে প্রতি বছর বিদায়ী শিক্ষার্থীদের জন্য দুটি অনুষ্ঠান হয়। এর একটি হলো র‍্যাগ ডে এবং অন্যটি বিদায় সংবর্ধনা অনুষ্ঠান। র‍্যাগ ডে শিক্ষার্থীরা আয়োজন করে। তারা এ অনুষ্ঠান উপলক্ষে পৃথকভাবে প্রিন্ট করা গেঞ্জি গায়ে দিয়ে কেক কেটে হাসি ও আনন্দ-বেদনার মিশেলে এক আবেগঘন পরিবেশ তৈরি করে (র‍্যাগ ডে' উদ্বোধনের ছবির জন্য দেখুন পরিশিষ্ট- ৮:১২)। এ উপলক্ষে শিক্ষার্থীরা বাদ্য বাজিয়ে র‍্যালি করে ক্যাম্পাস প্রদক্ষিণ করে। একসাথে একই পরিবারে পাঁচ থেকে

ছয় বছর কাটিয়ে বিভাগ থেকে পৃথক হবার চিন্তায় বিদায়ী শিক্ষার্থীদের অনেককে কাঁদতে দেখা যায় (র‍্যাগ ডে'র আবেগঘন ছবির জন্য দেখুন পরিশিষ্ট- ৮:১৩)। এ অনুষ্ঠানে জুনিয়র শিক্ষার্থীরাও তাদের সিনিয়রদের সঙ্গে যোগ দেয়। বিদায় অনুষ্ঠান করা হয় বিভাগের পক্ষ থেকে। পরীক্ষাশেষে শিক্ষার্থীদের সঙ্গে আলোচনা করে তাদের সুবিধাজনক সময়ে এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। আমার সময় সর্বশেষ ২০১৫-২০১৬ মাস্টার্স সেশনের শিক্ষার্থীদের বিদায় সংবর্ধনা অনুষ্ঠান হয় ২০১৮ সালের ১৮ ফেব্রুয়ারি তারিখে। হলভর্তি দর্শক নিয়ে জাঁকজমকভাবে বিদায়ী শিক্ষার্থীদেরকে বিদায় দেয়া হয় (কতিপয় বিদায় অনুষ্ঠানের ছবির জন্য দেখুন পরিশিষ্ট- ৮:১৪)। বিদায় অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে যে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হয় তাতে বিভাগের শিল্পীরা নিজেদের সংস্কৃতি চর্চাকে স্টেজ পারফরম্যান্সের মাধ্যমে শানিত করার সুযোগ পায়। এ সব অনুষ্ঠান হয় খুব উপভোগ্য (বিদায় অনুষ্ঠানের একটি পারফরম্যান্সের জন্য দেখুন পরিশিষ্ট- ৮:১৫)। এ ধরনের সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের মধ্যে লেখাপড়ার একঘেয়েমি দূর করে তাদেরকে ভিন্ন রকম আনন্দ দেয়।

বিভাগীয় শিক্ষকদের বিদায়

আমি বিভাগীয় সভাপতির দায়িত্ব গ্রহণের পর লক্ষ্য করি, বিভাগীয় শিক্ষকদের মধ্যে বিদায় না নেবার সংস্কৃতি চালু হয়েছে। বিভাগ থেকে ইতিপূর্বে চাকুরিজীবন শেষ করার পর অনেক শিক্ষককে বিদায় দিতে চাইলে তারা বিদায় নিতে সম্মত হননি। এর মধ্যে অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ আবদুল হাকিম, অধ্যাপক শেখ জহির আহমেদ, অধ্যাপক ড. মাখদুম-ই-মুলক মাশরাফী, অধ্যাপক জিয়াউন নাহার খান, সহকারী অধ্যাপক নজরুল ইসলাম প্রভৃতি শিক্ষকগণ বিভাগ থেকে অবসরে গেলেও তাদের বিদায় দেয়া সম্ভব হয়নি। এ ছাড়া প্রফেসর ড. ইমদাদুল হক, প্রফেসর ড. জোহরা খানম প্রভৃতি শিক্ষক চাকুরি নিয়ে অন্য বিশ্ববিদ্যালয়ে গেলে তাদেরও বিদায় হয়নি। ফলে বিভাগে বিদায় না নিয়ে চলে যাবার একটা সংস্কৃতি গড়ে ওঠে। আমি হিসেব করে দেখি, আমার সভাপতিত্বকালে তিনজন অধ্যাপক চাকুরিজীবন শেষ করবেন। সে জন্য আমি এ ব্যাপারে শিক্ষকদের বিদায় না নেবার মনস্তত্ত্ব অনুধাবনের চেষ্টা করে এর পেছনে তেমন কোনো কারণ খুঁজে পাইনি। আমি ভাবি, যে ভাবেই হোক এ তিনজন অধ্যাপককে আমি বিদায় সংবর্ধনা গ্রহণে রাজি করিয়ে তাদেরকে সম্মানের সঙ্গে বিদায় দেব। এজন্য আমি অনেক সতর্কতা ও বিনয়ের সঙ্গে পৃথকভাবে তিনজনের সঙ্গে এ বিষয় নিয়ে আলোচনা করে তাদের বিদায় সংবর্ধনা গ্রহণে রাজি করাই। তারিখ ও সময়ের ব্যাপারে তাদের মতামতকে অগ্রাধিকার দিয়ে প্রত্যেকের সম্মতি নিয়ে ১৮ জুলাই ২০১৮ তারিখে এই বিদায় সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের দিন নির্ধারণ করি। এ লক্ষ্যে এ অনুষ্ঠানকে সফল করার জন্য ১১-০৭-২০১৮ তারিখে অনুষ্ঠিত বিভাগের ৩২১তম

একাডেমিক কমিটির সভায় বিভাগীয় সভাপতিকে আহ্বায়ক করে আরও তিনজন সদস্য নিয়ে কমিটি গঠন করা হয়।[৪৩] কমিটির সদস্যদেরকে বলি, দীর্ঘদিন থেকে বিভাগে শিক্ষকদের বিদায় অনুষ্ঠান হচ্ছে না। আমরা যখন তিনজন অধ্যাপককে বিদায় সংবর্ধনা গ্রহণে রাজি করাতে পেরেছি, তখন তাদেরকে আকর্ষণীয়ভাবে সম্মাননা প্রদান করব। এর ফলে আগামীতে যারা বিভাগ থেকে অবসরে যাবেন তাঁরা বিদায় সংবর্ধনা গ্রহণে রাজি হবেন। কমিটি সদস্যরা সর্বসম্মতভাবে আমার সঙ্গে একমত হন।

আমরা ভিসি এবং প্রোভিসিকে যথাক্রমে প্রধান এবং বিশেষ অতিথি করে সমাজ বিজ্ঞান অনুষদ মিলনায়তনে এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করি। বিদায়ী অতিথিদের যত রকমভাবে সম্মানিত করা যায় তার পরিকল্পনা করি। বিদায় অনুষ্ঠানে তাঁদেরকে পুষ্পস্তবক, সম্মাননাপত্র, সম্মাননা ক্রেস্ট এবং প্রত্যেককে আকর্ষণীয় উপহারসামগ্রী প্রদান করা হয় (অতিথিদের সম্মাননা ও উপহার প্রদানের ছবির জন্য দেখুন পরিশিষ্ট- ৮:১৬)। আমরা আগে থেকে পরিকল্পনা করে তিনজন বিদায়ী অধ্যাপকের জন্য ফটোফ্রেম কিনে রাখি। অনুষ্ঠানে প্রত্যেককে ভাইস চ্যান্সেলর কর্তৃক ক্রেস্ট প্রদানের ছবি অনুষ্ঠানের পর প্রিন্ট করে ওই ফটোফ্রেমে সেট করে তাদেরকে পৃথকভাবে অনুষ্ঠানের অব্যবহিত পরে পৌঁছে দেয়া হয়। তাছাড়া আমি বিদায় অনুষ্ঠানের পর রাজনীতিবিজ্ঞান পরিবারের দেশ-বিদেশের সাবেক শিক্ষার্থীরাও যাতে জানতে পারেন সে জন্য এ অনুষ্ঠানের ওপর একটি সচিত্র ফেসবুক স্ট্যাটাস দেই। ওই স্ট্যাটাসটিতে ৫ দিন শত শত শিক্ষার্থীরা তাদের মতামত ও শ্রদ্ধা জানাবার পর সচিত্র স্ট্যাটাসটি এবং এতে ব্যক্ত মতামতের স্ক্রিনশট প্রিন্ট করে ৩৪ পৃষ্ঠার *বিদায়ী সম্মাননাপ্রাপ্ত শিক্ষকদের প্রতি শিক্ষার্থীদের ভালোবাসার নমুনা* শীর্ষক পুস্তিকা প্রকাশ করে বিদায়ী সম্মাননা প্রদান কমিটির পক্ষ থেকে সে পুস্তিকার কপি প্রত্যেক বিদায়ী শিক্ষককে পৌঁছে দেই। বিদায়ী সম্মাননাপ্রাপ্ত শিক্ষকগণ খুশি হন এবং আমাদের আন্তরিক আয়োজনের প্রশংসা করেন। পরবর্তীতে ৩০-০৭-২০১৮ তারিখে অনুষ্ঠিত বিভাগীয় একাডেমিক কমিটির ৩২৩তম সাধারণ সভায় বিদায় সংবর্ধনা অনুষ্ঠানটি সফল হওয়ায় বিভাগীয় একাডেমিক কমিটির পক্ষ থেকে সম্মাননা প্রদান কমিটি এবং বিভাগের সকল শিক্ষক, কর্মকর্তা, কর্মচারী ও শিক্ষার্থীবৃন্দকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা হয়।

একজন শিক্ষক এলপিআর শেষ করার পর সাধারণত তাঁকে বিদায় দেয়া হয়। কিন্তু বিভাগীয় রেওয়াজ অনুযায়ী একজন শিক্ষককে তাঁর চাকুরিজীবনের শেষদিনে পুষ্পস্তবক দিয়ে তাঁকে সম্মানিত করার রেওয়াজ চালু আছে। এ ছাড়া

---

৪৩. এ তিনজন সদস্য হলেন জনাব মোহাম্মদ আলম চৌধুরী, জনাব এ জি এম নিয়াজ উদ্দিন এবং জনাব মো. বখতেয়ার উদ্দিন।

কোনো শিক্ষক কোনো সম্মানজনক অ্যাসাইনমেন্ট পেলে তাকে বিভাগের পক্ষ থেকে সম্মান জানানো হয়। এ ব্যাপারে আমি সতর্ক ছিলাম। আমার সভাপতিত্বকালে যে সব সম্মানিত শিক্ষক চাকুরিজীবন শেষ করেছেন তাদেরকে শেষ কর্মদিবসে পুষ্পস্তবক দিয়ে সম্মানিত করা হয়েছে। এ রকম অনাড়ম্বর অনুষ্ঠানে শিক্ষকগণ বিভাগীয় সভাপতির কক্ষে মিলিত হয়ে কর্মজীবন শেষ করা অধ্যাপকের উদ্দেশ্যে তাঁদের অনুভূতি প্রকাশ করেন (এমন দু'জন শিক্ষককে সম্মাননা জানাবার ছবির জন্য দেখুন পরিশিষ্ট- ৮:১৭)। নতুন অ্যাসাইনমেন্ট পাওয়া শিক্ষকদেরকেও ফুলেল শুভেচ্ছা জানিয়ে তাদের সাফল্য কামনা করা হয়।

বিশ্ববিদ্যালয়ের সুবর্ণ জয়ন্তী উৎসব

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৬৬ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়ে ২০১৬ সালে ৫০ বছরে পদার্পণ করে। এ উপলক্ষে এ বিশ্ববিদ্যালয় ঘটা করে ২০১৬ সালের ১৯ নভেম্বর এর সুবর্ণ জয়ন্তী উৎসব পালন করে। এ সময় ভাগ্যক্রমে আমি রাজনীতিবিজ্ঞান বিভাগের সভাপতি ছিলাম। বিশ্ববিদ্যালয়ের সুবর্ণ জয়ন্তী অনুষ্ঠানটি ছিল বিশাল আয়োজন। বর্তমান ও সাবেক মিলিয়ে প্রায় ৩০ হাজার ছাত্রছাত্রী ও অতিথি বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে সমবেত হন। আসেন সাবেক শিক্ষক, শিক্ষার্থী, বরেণ্য ও গণ্যমান্য ব্যক্তিত্ব। তবে সবকিছু মিলিয়ে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় এ আয়োজন সফলভাবে সম্পন্ন করে। আমি বলব না, আয়োজনে কোনো ভুলত্রুটি ছিল না। কিন্তু সবার মাঝে ছিল আনন্দ করার উচ্ছ্বাস। আগত অতিথিরা কেউই কোনো ভুলকে ভুল হিসেবে দেখেননি। তাদের মধ্যে এমন ভাব ছিল যে, আমরা তো এসেছি আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে। এর ভালোমন্দ সব তো আমাদেরই। তারা অতীত স্মৃতি রোমন্থন এবং পুরানো বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে মিলিত হয়ে আনন্দ করাটাকে বড় করে দেখেন। বিশ্ববিদ্যালয় খেলার মাঠে বিশাল শামিয়ানা টানিয়ে এ বর্ণাঢ্য আয়োজন উপভোগ করেন হাজার হাজার অতিথি। তাদেরকে উষ্ণভাবে আপ্যায়ন করা হয়। এ সব আয়োজনে কোনো ক্ষেত্রে ভুলত্রুটি হলেও আয়োজকদের আন্তরিকতার অভাব ছিল না। জমকালোভাবে এর উদ্বোধন করেন জাতীয় সংসদের মাননীয় স্পিকার ড. শিরিণ শারমিন চৌধুরী। তাঁর সঙ্গে ছিলেন অন্য অতিথিবর্গ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ও সহ-উপাচার্য (সুবর্ন জয়ন্তীর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের ছবির জন্য দেখুন পরিশিষ্ট-৮:১৮)

আমাদের বিভাগের শিক্ষার্থীদের মধ্যেও সুবর্ণ জয়ন্তীর উৎসাহ উদ্দীপনা ছড়িয়ে পড়ে। তারাও এর অংশ হতে পেরে আনন্দে মেতে ওঠে। তারা তাদের বিভাগের সাবেক পরিচিত এবং অপরিচিত শিক্ষার্থীদের সেবা যত্নে ত্রুটি করেনি। নিজেরা এ উপলক্ষে এক রঙের টি শার্ট তৈরি করে আকর্ষণীয় ডিসপ্লে করেছে (ডিসপ্লের ছবির জন্য দেখুন পরিশিষ্ট-৮:১৯)। যে সব সাবেক শিক্ষার্থী সুবর্ণ জয়ন্তীতে আসবেন তাঁরা তো স্মৃতিকাতর হয়ে নিজের বিভাগে একবার না এসে পারবেন না। হয়ত শিক্ষকদের সাথেও সৌজন্য সাক্ষাত করবেন। এটা স্বাভাবিক।

এ জন্য প্রতিটি বিভাগ পৃথকভাবে সাবেক শিক্ষার্থীদেরকে আদর যত্ন করার ব্যবস্থা করে। রাজনীতিবিজ্ঞান বিভাগ একটি বড় এবং পুরানো বিভাগ হওয়ায় এ বিভাগের সাবেক শিক্ষার্থীর সংখ্যা অনেক বেশি। তাদের অনেকেরই বিভাগ পরিদর্শনে আসা স্বাভাবিক। এ জন্য আমাকে বিভাগের কতিপয় সিনিয়র শিক্ষক ২০ কেজি মিষ্টি কিনে রাখতে বলেন। কারণ, সাবেক গণ্যমান্য শিক্ষার্থীরা বিভাগ পরিদর্শনে এলে তাদেরকে আপ্যায়ন করতে হবে। তবে কতজন সাবেক ছাত্র রেজিস্ট্রেশন করেছেন এবং তার মধ্যে কতজন অনুষ্ঠানে যোগ দেবেন, তার মধ্য থেকে আবার কতজন বিভাগ পরিদর্শনে আসবেন সে হিসেব করা সম্ভব ছিল না। সে জন্য আমি ২০ কেজি মিষ্টি কেনার পরামর্শ গ্রহণ করিনি। কারণ, পরে যদি অধিকসংখ্যক সাবেক শিক্ষার্থী বিভাগে না আসেন, তাহলে এই মিষ্টি নষ্ট হবে। আমি এ ক্ষেত্রে নিজের বুদ্ধি খাটিয়ে উন্নত মানের শুকনো খাবার, দামি বিস্কুট, ড্রাই কেক, বিভিন্ন রকম ফল এবং চা-কফির ব্যবস্থা করি। এমন সব খাদ্যদ্রব্য কিনি, যা ওইদিন খাওয়া না হলেও নষ্ট হবে না। আমার ধারণা সত্য হয়। বিশ কেজি মিষ্টি কিনলে এক কেজিও খরচ হত কিনা সন্দেহ। পরে দেখা গেল সকালের দিকে তেমন কেউই বিভাগ পরিদর্শনে আসেননি। সাবেক শিক্ষার্থীরা বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে আড্ডায় ব্যস্ত থেকেছেন। তাঁরা বিভাগে আসা শুরু করেন লাঞ্চের পর থেকে এবং তাঁদের প্রায় সবাই অনুষ্ঠানে পরিবেশিত লাঞ্চ খেয়ে আসেন। তারপরও যাঁরাই বিভাগ পরিদর্শনে এসেছেন, আমি নিজে তাদেরকে আপ্যায়নের চেষ্টা করেছি। কিন্তু খুব কমজনকেই আপ্যায়ন করতে সমর্থ হয়েছি। কারণ, তারা সবাই লাঞ্চ খেয়ে আসায় কিছু খেতে চাননি। তবে অনেককে সামান্য ফল বা কাউকে চা কফি খাওয়াতে পেরেছি। বিভাগ পরিদর্শনে আসা সাবেক শিক্ষার্থীদের মধ্যে খাবার আগ্রহ ছিল না। তারা বিভিন্ন শিক্ষকদের সম্পর্কে খোঁজ খবর নিয়েছেন। তাঁরা কেমন আছেন জানতে চেয়েছেন। এককভাবে না এসে তাঁরা দলে দলে এসেছেন এবং নিজেদের বিভাগীয় স্মৃতিচারণেই ব্যস্ত থেকেছেন। ফলে আমার শুকনো খাবার কেনার পরিকল্পনা সফল হয়। যে খাবার বেঁচে যায় তার কিছুই নষ্ট হয়নি। সেগুলি আমরা পরবর্তীতে নিজেরা ব্যবহার করেছি। আমি যেহেতু বিভাগীয় সভাপতি, অনেকে এসে আমার সঙ্গে ছবি তুলেছেন। অনেকে বিভাগীয় সভাপতির কক্ষে নিজেরা নিজেদের ছবি তুলেছেন। এ ভাবে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের সুবর্ণ জয়ন্তী অনুষ্ঠান সুসম্পন্ন হয়েছে এবং আমরাও বিভাগ থেকে যা করার তা আমাদের সাময়িক মেহমানদের জন্য করতে পেরেছি।

বিভাগের সুবর্ণ জয়ন্তী উৎসব

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের সুবর্ণ জয়ন্তী উৎসব পালন করার পর এ বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথমদিকে যেসব বিভাগ খোলা হয়েছিল ওই বিভাগগুলোর বয়স ৫০ বছর হতে থাকে। এসব বিভাগ ক্রমান্বয়ে তাদের সুবর্ণ জয়ন্তী অনুষ্ঠান উদ্‌যাপন শুরু করে। উদাহরণ হিসেবে অর্থনীতি, পদার্থবিদ্যা, রসায়ন, ব্যবস্থাপনা, দর্শন, ইতিহাস

প্রভৃতি বিভাগ তাদের বিভাগীয় সুবর্ণ জয়ন্তী অনুষ্ঠান সম্পন্ন করে। প্রথম দিকে কয়েকটি বিভাগ এমন অনুষ্ঠান করার পর ২০১৮ সালের প্রথম দিকে রাজনীতিবিজ্ঞান বিভাগে সুবর্ণ জয়ন্তী অনুষ্ঠান করার কথা ওঠে। বিভাগীয় সভাপতি হিসেবে দেরি না করে আমি বিষয়টি ১১ এপ্রিল ২০১৮ তারিখে অনুষ্ঠিত একাডেমিক কমিটির ৩১৮তম সাধারণ সভায় এজেন্ডাভুক্ত বিষয় হিসেবে আলোচনা করি। ওই সভাতেই বিভাগের বরিষ্ঠতম অধ্যাপক প্রফেসর ড. হাসান মোহাম্মদ-কে আহ্বায়ক, প্রফেসর ড. সিদ্দিক আহমেদ চৌধুরীকে সিনিয়র যুগ্ম আহ্বায়ক, প্রফেসর ড. এনায়েত উল্যা পাটওয়ারীকে যুগ্ম আহ্বায়ক এবং সহযোগী অধ্যাপক মোহাম্মদ আলম চৌধুরীকে সদস্য সচিব করে একটি সাংগঠনিক কমিটি গঠন করা হয়। আমি ভাবি, সাংগঠনিক কমিটি পরবর্তীতে সাব কমিটিগুলো গঠন করবে এবং অ্যালামনাসদের সঙ্গে যোগাযোগ করে পরবর্তী কাজ এগিয়ে নেবে। এরপর আমি তিন সপ্তাহের জন্য আমেরিকা যাই এবং সেখান থেকে ফিরে এসে বুঝতে পারি, এ অনুষ্ঠান স্বল্প সময়ে সম্পন্ন হবে না। কারণ, প্রথমে সাংগঠনিক কমিটি থেকে সদস্য সচিব মোহাম্মদ আলম চৌধুরী পদত্যাগ করেন। পরবর্তীতে সাংগঠনিক কমিটি আল্যামনাসদের সঙ্গে সভা করে এবং সেখানে নানা রকম আলোচনা হয়। সাবেক শিক্ষার্থীরা সাংগঠনিক কমিটির গুরুত্বপূর্ণ কিছুসংখ্যক পদে থাকতে চান, কিন্তু শিক্ষকরা ছিলেন এ সব পদ নিজেদের মধ্যে রাখার পক্ষে। সাবেক ছাত্রদের সঙ্গে অনুষ্ঠিত শিক্ষকদের সভায় নানা বিষয় আলোচনা হয়। সভা আনুষ্ঠানিকভাবে শেষ হবার পর কোনো কোনো সিনিয়র অধ্যাপক আবার তাদের কারো কারো সঙ্গে একান্ত বৈঠকে বসেন। এ সব বিষয় বিবেচনায় নিয়ে ৮ জুলাই ২০১৮ তারিখে অনুষ্ঠিত একাডেমিক কমিটির ৩২১তম সভায় সাংগঠনিক কমিটি থেকে সদস্য সচিবের পদ বিলুপ্ত করে যুগ্ম আহবায়ককে সমন্বয়কারী হিসেবে আহ্বায়কের সঙ্গে সমন্বয় করে দায়িত্ব পালন করতে অনুরোধ করা হয়।

পরবর্তীতে কমিটির আহ্বায়ক অধ্যাপক ড. হাসান মোহাম্মদ ১৫ জুলাই, ২০১৮ তারিখে অসুস্থতাজনিত কারণ দেখিয়ে লিখিতভাবে আহ্বায়কের দায়িত্ব পালনে অপারগতা প্রকাশ করেন। অধ্যাপক হাসানের দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি নেবার পর বেশ কয়েকটি একাডেমিক কমিটির সভায় রেওয়াজ অনুযায়ী পরবর্তী সিনিয়র অধ্যাপক ড. সিদ্দিক আহমেদ চৌধুরীকে আহ্বায়কের দায়িত্ব গ্রহণে সবাই অনুরোধ করলে তিনি রাজি হননি। এর মধ্যে ছিল একাডেমিক কমিটির ৩২১তম, ৩২৩তম সভাসমূহ এবং আমার সভাপতির মেয়াদকাল শেষ হবার অব্যবহিত পূর্বে ০৯ আগস্ট, ২০১৮ তারিখে অনুষ্ঠিত ৩২৪তম একাডেমিক কমিটির সভা। এসব সভায় একাডেমিক কমিটির সকল সদস্য অনুরোধ করলেও অধ্যাপক চৌধুরী আহ্বায়কের পদ গ্রহণে রাজি হননি। সে জন্য এ সময় সুবর্ণ জয়ন্তীর প্রস্তুতিমূলক কাজ হয়নি। তবে আমার সভাপতির মেয়াদকাল শেষ হবার ১ মাস ১৮দিন পর ২ অক্টোবর, ২০১৮ তারিখে অনুষ্ঠিত একাডেমিক কমিটির ৩২৭তম সাধারণ সভায়

অধ্যাপক চৌধুরী সুবর্ণ জয়ন্তীর আহ্বায়কের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। পরে ১০ অক্টোবর ২০১৮ তারিখে ৩২৮তম একাডেমিক কমিটির তাৎক্ষণিক সভায় সাংগঠনিক কমিটি পুনর্গঠিত হয়।[৪৪]

অধ্যাপক সিদ্দিকের ২ অক্টোবর, ২০১৮ তারিখে বিভাগীয় ৫০ বছর পূর্তি উৎযাপন কমিটির আহ্বায়ক হবার পর ১০ জুলাই ২০১৯ তারিখ শেষ কর্মদিবস পর্যন্ত তার হাতে ৯ মাস ৮ দিন সময় ছিল। আন্তরিকভাবে চেষ্টা করলে এ সময়ের মধ্যে সুন্দরভাবে সুবর্ণ জয়ন্তী অনুষ্ঠান করা সম্ভব হত। তবে বর্ণিত সময়ের মধ্যে সুবর্ণ জয়ন্তী অনুষ্ঠান করতে না পারলেও তিনি আহ্বায়কের দায়িত্ব নেবার ১ মাস ৩ দিন পর ৫ নভেম্বর, ২০১৮ তারিখে কেক কেটে এবং র‍্যালি করে সুবর্ণ জয়ন্তী অনুষ্ঠানের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন ঘোষণা করেন (কেক কাটা এবং উদ্বোধন অনুষ্ঠানের ছবির জন্য দেখুন পরিশিষ্ট-৮:২০)। এরপর বিভাগীয় সভাপতির অফিসে প্রেস কনফারেন্স আহ্বান করা হয়। সেখানে বিশ্ববিদ্যালয়ে কর্মরত সাংবাদিকদের উপস্থিতিতে ২০১৯ সালের মধ্য ফেব্রুয়ারি, অর্থাৎ দায়িত্ব গ্রহণের প্রায় সাড়ে চার মাসের মধ্যে প্রফেসর সিদ্দিক সুবর্ণ জয়ন্তী অনুষ্ঠান করার আনুষ্ঠানিক ঘোষণা দেন। কিন্তু তিনি সে ঘোষণা অনুযায়ী সুবর্ণ জয়ন্তী অনুষ্ঠান করতে পারেননি। অনুষ্ঠানের উদ্বোধন ঘোষণা, কেক কাটা ও র‍্যালি করার পর ড. সিদ্দিকের হাতে তাঁর চাকুরির শেষ কর্মদিবসের আগে ৮ মাস ৪ দিন সময় ছিল। আন্তরিকভাবে সবার সহযোগিতা নিয়ে এ সময়ের মধ্যে তার পক্ষে জাঁকজমকভাবে সুবর্ণ জয়ন্তী অনুষ্ঠান করে প্রশংসিত হবার সুযোগ ছিল। কিন্তু তিনি উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের পর সুবর্ণ জয়ন্তী উপলক্ষে একটিও সভা না করে ব্যক্তিগত অসুবিধার কারণ দেখিয়ে ২৩ জানুয়ারি ২০১৯ তারিখে দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি নেন। সভাপতিকে লেখা ওই পদত্যাগপত্রে তিনি ১০-১০-২০১৮ তারিখে অনুষ্ঠিত একাডেমিক কমিটির ৩২৮তম তাৎক্ষণিক সভার সিদ্ধান্তে তাকে সুবর্ণ জয়ন্তী উদ্‌যাপনের জন্য গঠিত সাংগঠনিক কমিটির আহ্বায়ক করা হয় বলে যে তথ্য উল্লেখ করেন তা সঠিক নয়। তাকে এ দায়িত্ব দেয়া হয়েছিল ০২-১০-২০১৮ তারিখে অনুষ্ঠিত একাডেমিক কমিটির ৩২৭তম সাধারণ সভায়, যা ওই সভার কার্যবিবরণীর ২ নম্বর সিদ্ধান্তে উল্লেখিত আছে। অধ্যাপক চৌধুরী ২০১৮ সালের ৫ নভেম্বর সহকর্মীদের নিয়ে কেক কেটে এবং র‍্যালি করে সুবর্ণ জয়ন্তী অনুষ্ঠানের উদ্বোধনের পর থেকে ২০১৯ সালের ২৩ জানুয়ারি তার দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি নেয়া পর্যন্ত যে ৭৮দিন সময় পার করেন, সে সময়ের মধ্যে সুবর্ণ

৪৪. পুনর্গঠিত কমিটিতে প্রফেসর ড. সিদ্দিক আহমেদ চৌধুরী আহ্বায়ক, প্রফেসর ড. মুস্তাফিজুর রহমান ছিদ্দিকী সদস্যসচিব, প্রফেসর ড. এনায়েত উল্যা পাটওয়ারী যুগ্ম আহ্বায়ক ও সমন্বয়কারী, জনাব এ জি এম নিয়াজ উদ্দিন যুগ্ম সদস্যসচিব এবং জনাব মো. বখতেয়ার উদ্দিন-কে ট্রেজারার পদ দেয়া হয়।

জয়ন্তীবিষয়ক কোনো কর্মকাণ্ড করেননি। একটি সভাও ডাকেননি। পদত্যাগের আগে প্রফেসর সিদ্দিক একটি প্রেস রিলিজ দিয়ে বলতে পারতেন, ২০১৮ সালের নভেম্বর মাসে প্রেস কনফারেন্স করে ২০১৯ সালের মধ্য ফেব্রুয়ারিতে সুবর্ণ জয়ন্তীর যে অনুষ্ঠান করতে চেয়েছিলাম তা অনিবার্য কারণবশত আমরা করতে পারছি না। পরবর্তীতে আমরা এ অনুষ্ঠানের জন্য নতুন তারিখ ঘোষণা করব। কিন্তু তিনি বা নতুন আহ্বায়কও এ কাজটি করেননি। এর ফলে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে সুবর্ণ জয়ন্তীর র‍্যালি এবং কেক কাটার ছবি দেখে বিভ্রান্ত হয়ে অনেকে ভাবেন, সুবর্ণ জয়ন্তী অনুষ্ঠান হয়ত হয়ে গেছে। অনেকে ফোন করে এ বিষয়ে শিক্ষকদের কাছে জানতে চান। ড. সিদ্দিকের পদত্যাগের পর ৪১দিন সুবর্ণ জয়ন্তীর সাংগঠনিক কমিটি নেতৃত্বহীন অবস্থায় থাকে। সে কারণে এ সময় সুবর্ণ জয়ন্তী অনুষ্ঠানবিষয়ক কোনো কর্মকাণ্ড হয়নি। পরবর্তীতে ৬ মার্চ ২০১৯ তারিখে বিভাগীয় সভাপতি ড. আনোয়ারা বেগম একাডেমিক কমিটির ৩৩৬তম সাধারণ সভায় সুবর্ণ জয়ন্তী উদ্‌যাপন কমিটির আহ্বায়কের পদ গ্রহণ করলে বিভাগীয় সহকর্মীরা ভাবেন, এবার হয়ত আলোচ্য অনুষ্ঠানের কাজ গতি পাবে। কিন্তু তেমনটি হয়নি। নতুন আহ্বায়ক দায়িত্ব গ্রহণের পাঁচ মাস ২৪দিন পর ১ সেপ্টেম্বর, ২০১৯ তারিখে সুবর্ণ জয়ন্তীর সাংগঠনিক কমিটির সভা ডাকেন। পরবর্তীতে ১৯ নভেম্বর, ২০১৯ তারিখে দ্বিতীয়বারের মতো প্রেস কনফারেন্স করে ৬ ও ৭ জানুয়ারি সুবর্ণ জয়ন্তীর তারিখ এবং ৫ ডিসেম্বর ২০১৯ থেকে ২৫ জানুয়ারি ২০২০ তারিখ পর্যন্ত রেজিস্ট্রেশনের সময়কাল নির্ধারণ করা হয়। এর পর ট্রেজারার পদ থেকে সহকারী অধ্যাপক জনাব মো. বখতেয়ার উদ্দিন পদত্যাগ করলে সে পদে সহযোগী অধ্যাপক জনাব এ জি এম নিয়াজ উদ্দীনকে এবং জনাব নিয়াজের যুগ্ম সদস্য সচিব পদে সহকারী অধ্যাপক জনাব মো. সেলিমুল হককে মনোনীত করা হয়। পরে জনাব সেলিমুল হক নিয়োজিত পদে দায়িত্ব পালনে অপারগতা প্রকাশ করায় ওই পদে সহযোগী অধ্যাপক জনাব আককাস আহমদ দায়িত্বপ্রাপ্ত হন। পরে আবারো সুবর্ণ জয়ন্তীর সিডিউল পরিবর্তন করা হয়। ২০২০ সালের ২ জানুয়ারি এক ভিডিও বার্তায় ২ জানুয়ারি থেকে রেজিস্ট্রেশন শুরু করে ৩১ জানুয়ারি রেজিস্ট্রেশন শেষ করে ১৩ ও ১৪ ফেব্রুয়ারি সুবর্ণ জয়ন্তীর তারিখ ঘোষণা করা হয়। এই তারিখেও সুবর্ণ জয়ন্তী অনুষ্ঠান করার মতো করে কাজ এগিয়ে নেয়া সম্ভব না হলে আবারো এর তারিখ বদল করে ৫ ও ৬ মার্চ নির্ধারণ করা হয়।

সুবর্ণ জয়ন্তীর জন্য বড় অঙ্কের বাজেট করা হয়। তবে আমাদের প্রিয় সাবেক শিক্ষার্থীরা উদারভাবে সহযোগিতার হাত প্রসারিত করায় টাকার কোনো সমস্যা হয়নি। বেশ কয়েকজন জুনিয়র সহকর্মীকে আমি উপযাজক হয়ে বলি, আমি সুবর্ণ জয়ন্তী অনুষ্ঠানে আসব। সিনিয়র শিক্ষকগণ ব্যস্ততার কারণে এ ব্যাপারে আমার সঙ্গে কথা বলার সময় পাননি। তবে বিভাগীয় সভাপতি মহোদয় অনুষ্ঠনের দু'দিন আগে আমাকে টেলিফোনে আনুষ্ঠানিকভাবে দাওয়াত দেন। আমি ধন্যবাদ জানিয়ে

বলি, আমি তো বিভাগেরই অংশ। আমাকে দাওয়াত না দিলেও শিক্ষার্থীদের টানে আমি চলে আসব। তবে সভাপতির দাওয়াতের আগে দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে শিক্ষার্থীরা আমাকে ফোনে সুবর্ণ জয়ন্তি অনুষ্ঠানে আসতে অনুরোধ করেন। আমি অনুষ্ঠানের একদিন আগে ক্যাম্পাসে পৌঁছে যাই। আমার কোনো দায়িত্ব না থাকায় অনুষ্ঠানের আগের দিন বিভাগীয় কক্ষে গিয়ে বসে থাকি। আগে থেকে চলে আসা কেউ কেউ এবং বিভাগীয় শিক্ষার্থীরা দলে দলে আমার কক্ষে এসে আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে। আমার কুশলাদি জানতে চায়। তাদের দেখে মনটা ভালো হয়ে যায়। তার আগে বিভাগে উপস্থিত হয়ে দেখি বিভাগকে পরিচ্ছন্ন করে সাজানো হয়েছে। মেঝেতে রঙিন আলপনা আঁকা হয়েছে এবং দেয়ালে করা হয়েছে আকর্ষণীয় ও দৃষ্টিনন্দন সাজসজ্জা। অনুষদ ভবনের সামনে ঝুলানো হয়েছে আকর্ষণীয় ব্যানার। সুবর্ণ জয়ন্তীর আকর্ষণীয় লোগোর সঙ্গে মূল বানী লেখা হয়েছে 'পরিবর্তনে প্রবহমান পঞ্চাশ' (দেয়াল সজ্জার জন্য দেখুন পরিশিষ্ট-৮:২১)। এ উপলক্ষে দু'দিনের অনুষ্ঠানসুচি ছিল আকর্ষণীয় ও বিনোদনমূলক।

প্রথম দিন সকালের নাস্তা ও গিফট ব্যাগ দেবার পর অনুষ্ঠিত হয় বর্ণাঢ্য র‍্যালি। আমি র‍্যালিতে যোগ দিলেও শারীরিকভাবে কিছুটা অসুস্থ থাকায় কিছুদূর গিয়ে রুমে ফিরে আসি (র‍্যালির ছবির জন্য দেখুন পরিশিষ্ট-৮:২২)। এ দিনও সাবেক শিক্ষার্থীরা আমার সঙ্গে এসে দলে দলে দেখা করতে থাকে/থাকেন। তুলতে থাকে/থাকেন ছবি। অনেকে ছাত্রী স্বামীকে এবং ছাত্র স্ত্রীকে আমার সঙ্গে পরিচিয় করিয়ে দেয় এবং একসঙ্গে ছবি তোলে (ছাত্রীর স্বামীসহ তোলা ছবির জন্য দেখুন পরিশিষ্ট-৮:২৩)। স্কুল শিক্ষক এ ছাত্রীর বিয়েতে কয়েক বছর আগে আমি বিভাগীয় সভাপতি হিসেবে অংশগ্রহণ করেছিলাম। কলেজ শিক্ষক জামাই বাবাজিকে বলেছিলাম, 'মিলেমিশে থেক। আমার মেয়েকে দেখেশুনে রেখো।' আজ দুজনের হাস্যউজ্জ্বল মুখচ্ছবি দেখে বুঝতে পারি জামাই বাবাজি আমার অনুরোধ রেখেছেন। এদেরকে হাসিখুশি দেখে প্রাণ জুড়িয়ে যায়। শহীদ আবদুর রব হল মাঠে লাল সবুজ রঙের বিশাল শামিয়ানা টানিয়ে করা হয় প্রথম দিনের মূল অনুষ্ঠান (অনুষ্ঠানের প্যান্ডেলের ছবির জন্য দেখুন পরিশিষ্ট- ৮:২৪)। মাঠ এবং বিভাগের সাজসজ্জা ছিল আকর্ষণীয়। তবে তার চেয়ে অধিক আকর্ষণীয় ছিল বিভাগসহ অনুষদের আলোকসজ্জা। এ দৃষ্টিনন্দন আলোকসজ্জায় রাতের অনুষদ ভবনকে স্বপ্নময় মনে হয় (অনুষদ ভবনের আলোকসজ্জার জন্য দেখুন পরিশিষ্ট- ৮:২৫)। সকালের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের পর বিকেলে বিভাগীয় শিল্পীদের সাংস্কৃতিক পরিবেশনা। তারপর ক্লোজআপ তারকা সঙ্গীতশিল্পী সাব্বির এবং ব্যান্ডদল 'চিরকুট' সঙ্গীত পরিবেশন করে। আমার কাছে আমাদের বিভাগীয় শিল্পীদের পরিবেশনা বেশি উপভোগ্য মনে হয়। বিভাগীয় সংস্কৃতিকর্মীদের একটি যাত্রাপালার পরিবেশনা এবং নামকরণ ছিল আকর্ষণীয়। তারা এ যাত্রাপালার নাম দেয় 'অস্থানে তুলসী অপাত্রে রূপসী।' এ নামকরণের মধ্য দিয়ে হয়ত তারা প্রতীকীভাবে বাংলাদেশের সরকারি বিশ্ববিদ্যালগুলোর মানের অবনমন ও নৈরাজ্যিক ব্যবস্থাপনার প্রতি ইঙ্গিত করেন

বলে মনে হয়। (যাত্রাপালার বিজ্ঞাপনের জন্য দেখুন পরিশিষ্ট-৮:২৬)। তবে প্রথম দিনের অনুষ্ঠানে মঞ্চে বসা নিয়ে সাবেক সিনিয়র শিক্ষার্থীদের মধ্যে কিছুটা কানাঘুষা হয় বলে জানতে পারি। মঞ্চে রাজনৈতিক নেতাসহ সিটি কর্পোরেশনের ওয়ার্ড কাউন্সিলর জায়গা পেলেও বিভাগের প্রতিষ্ঠাতা প্রফেসর ড. আর আই চৌধুরীর অন্যতম সহযোগী প্রফেসর ড. বেনু প্রসাদ বড়ুয়াকে মঞ্চে স্থান না দেয়ার বিষয়টি শিক্ষার্থীদের অনেকের কাছে বেমানান মনে হয়। আবার বিভাগের দু'জন সম্মানিত অধ্যাপক প্রথম দিনের অনুষ্ঠানের মঞ্চে সুন্দরভাবে বক্তৃতা করার পর তারাই আবার মহামান্য রাষ্ট্রপতি ও সম্মানিত প্রধানমন্ত্রীর বাণী পাঠ করেন।[৪৫] এ কাজ ভিন্ন দু'জন শিক্ষককে দিয়ে করালে বিষয়টি যুগপৎ অধিকতর দৃষ্টিনন্দন ও অংশগ্রহণমূলক হত। তবে বড় অনুষ্ঠান করতে গেলে ইচ্ছায়, অনিচ্ছায় অথবা অসতর্কতার কারণে ছোটখাটো ত্রুটি হতে পারে। তবে এগুলি নিয়ে কেউ উচ্চবাচ্য করেননি। পরিবর্তে, সবাই আনন্দে মাতোয়ারা ছিলেন এবং তাঁরা পুরানো বন্ধুদের কাছে পেয়ে স্মৃতিচারণ ও গল্পগুজবে সময় পার করেন।

চট্টগ্রাম শহরের স্বাধীনতা উদ্যানে অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় দিনটি ছিল প্রাণচাঞ্চল্যে ভরা। ওইদিন দুপুরে জুম্মার নামাজের পর অতিথিদের চট্টগ্রামের ঐতিহ্যবাহী মেজবান খাওয়ানো হয়। দিনব্যাপী ছিল গল্প, আড্ডা আর স্মৃতিচারণমূলক বক্তব্য। তবে দিন শেষে সাংস্কৃতিক পরিবেশনার ব্যবস্থা ছিল। কিন্তু এদিন প্রিয় শিক্ষার্থীরা আমাকে মোটেও অনুষ্ঠান মনোযোগী হতে দেয়নি। এদের সঙ্গে কুশল বিনিময় এবং ফটোসেশন করতে করতে আমি দুপুরের পর ক্লান্ত হয়ে পড়ি। তার পরও অনুষ্ঠান শেষে অনেক শিক্ষার্থী ফেসবুকে অভিযোগ করে, স্যার আপনাকে খুঁজে পাইনি। আপনার সাথে ছবি তুলতে পারলাম না। এদেরকে সান্ত্বনা দেয়া ছাড়া উপায় ছিল না। অধিক ক্লান্ত হয়ে পড়ায় আমি দ্বিতীয় দিনের সাংস্কৃতিক পরিবেশনা না শুনে সন্ধ্যার আগেই বিশ্রাম নিতে ক্যাম্পাসে ফিরে আসি। কারণ, পরদিন সকালে আমাকে খুলনার উদ্দেশ্যে রওনা দিতে হবে ।

সত্য যে, এ জাতীয় অনুষ্ঠান সাধারণত বিনোদনমূলক হয়ে থাকে। তবে অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের সুবর্ণ জয়ন্তী অনুষ্ঠানের সঙ্গে একাডেমিক প্রতিষ্ঠানের সুবর্ণ জয়ন্তী অনুষ্ঠানের পার্থক্য থাকে। বিশ্ববিদ্যালয় হচ্ছে সর্বোচ্চ একাডেমিক বিদ্যাপীঠ। এজন্য এ প্রতিষ্ঠানের বিভাগীয় সুবর্ণ জয়ন্তী অনুষ্ঠনে কিছুটা একাডেমিক ফ্লেভার থাকা ভালো। এ প্রক্রিয়ায় নিজ ডিসিপ্লিনের খ্যাতিমান কোনো একাডেমিক ব্যক্তিত্বকে সুবর্ণ জয়ন্তী বক্তা হিসেবে আনলে অনুষ্ঠানের মর্যাদা বাড়ত। তাছাড়া অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারীদের কাছে বিভাগীয় শিক্ষকদের একাডেমিক পারফরম্যান্স তুলে ধরার মধ্য দিয়েও বিভাগের একাডেমিক

৪৫. এ দু'জন অধ্যাপক হলেন প্রফেসর ড. ভুঁইয়া মোঃ মনোয়ার কবীর এবং প্রফেসের ড. মুস্তাফিজুর রহমান ছিদ্দিকী।

ভাবমর্যাদা বৃদ্ধি করা যেত। বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্য কোনো বিভাগ যে এমনটা করেনি তা নয়। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের উদাহরণ দেয়া যায়। এ বিভাগটি এর সুবর্ণ জয়ন্তী অনুষ্ঠানে বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ প্রফেসর রেহমান সোবহানকে সুবর্ণ জয়ন্তী বক্তা হিসেবে এনেছিল। আবার আয়োজকগণ একটি স্টলে বিভাগের সকল শিক্ষকের প্রকাশনা প্রদর্শনের ব্যবস্থা করেছিলেন। এতে অর্থনীতি বিভাগের সুবর্ণ জয়ন্তী অনুষ্ঠান কিছুটা একাডেমিক চরিত্র পেয়েছিল।

একই ভঙ্গিমায় আমরা যদি সুবর্ণ জয়ন্তী অনুষ্ঠানে সমাজবিজ্ঞানী প্রফেসর ড. রওনক জাহান, অথবা অস্ট্রেলিয়া বা কানাডা থেকে যথাক্রমে ড. হাবীব জাফরুল্লাহ বা ড. আহমেদ শফিকুল হক, বা এমন মাপের কোনো বড় গবেষককে সুবর্ণ জয়ন্তী বক্তা হিসেবে আনতাম, তাহলে অনুষ্ঠানটি বিনোদনমূলক চরিত্রের পাশাপাশি একাডেমিক চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য অর্জন করত। অনুষদ ভবনের সামনে 'বিভাগীয় শিক্ষকদের প্রকাশনা' শীর্ষক বড় ব্যানার লিখে সকল শিক্ষকের প্রকাশনা দিয়ে একটি স্টল সাজালে বহিরাগত অতিথিবৃন্দ বিভাগীয় শিক্ষকদের একাডেমিক গবেষণামূলক কাজকর্ম সম্পর্কে জানতে পারতেন। এ ছাড়া সুবর্ণ জয়ন্তী অনুষ্ঠানের আর একটি মূল আকর্ষণ থাকে এর সুভেনির। এ রকম সুভেনিরে সকল অংশগ্রহণকারীর ছবি, নাম, পরিচয়, ঠিকানা ও তাদের সঙ্গে যোগাযোগের জন্য ফোন নম্বর ও ইমেইল ঠিকানা ছাপা হয়। সে কারণে এমন সুভেনির সাবেক শিক্ষার্থীদের মধ্যে যোগাযোগের বন্ধন মজবুত করে। প্রকাশনা উপকমিটি ব্যস্ততার কারণে আন্তরিকভাবে কাজ করেও সুভেনিরটি যথাসময়ে প্রকাশ করতে পারেনি। তবে কমিটির আহ্বায়ক প্রফেসর ড. মো. এনায়েত উল্যা পাটওয়ারি তাড়াহুড়া না করে দ্রুত সময়ের মধ্যে আকর্ষণীয় ও নির্ভুলভাবে সুভেনিরটি প্রকাশ করে সকল অংশগ্রহণকারীর কাছে পৌঁছে দেবার প্রতিশ্রুতি দেন। সুভেনিরের জন্য আমার কাছে লেখা চাইলে আমি তাকে একটি লেখা পাঠিয়ে দেই।

সব মিলিয়ে রাজনীতিবিজ্ঞান বিভাগের সুবর্ণ জয়ন্তী অনুষ্ঠানটি সুসম্পন্ন হয়। এ অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ না করলে অনেক সাবেক শিক্ষার্থীর সঙ্গে আমার দেখা হত না। অনেকে শিক্ষার্থী আজ কর্মজীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত। অনেকে এসেছেন সপরিবারে। তাদের দেখে খুবই ভালো লাগে। পরদিন ৭ মার্চ সকালে দামপাড়া সোহাগ বাস কাউন্টারে গিয়ে বাসে উঠি। সাড়ে আটটায় বাস ছাড়লে আমি সিটে শরীর এলিয়ে দিয়ে চোখ বুজলে মানসপটে ভেসে ওঠে গত দু'দিনব্যাপী দেখা হওয়া শিক্ষার্থীদের প্রিয় মুখগুলো। ভাবি, এদের যে ভালোবাসা পেয়েছি সেটাই আমার জীবনের সবচেয়ে বড় সম্পদ হয়ে থাকবে। বাস ভাটিয়ারি পার হলে মানিব্যাগ থেকে কুরিয়ার সার্ভিসের একটি পুরানো রসিদ বের করে তার ওপর শিক্ষক-শিক্ষার্থীর মিষ্টি-মধুর সম্পর্কের ওপর 'ভালোবাসার রসায়ন' শীর্ষক একটি ছোট্ট কবিতা লিখি। খুলনায় পৌঁছে শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে নিবেদিত এ কবিতাটি ফেসবুকে পোস্ট করলে ফেসবুক বন্ধু ও শিক্ষার্থীরা কবিতাটির প্রশংসা করেন। সুবর্ণ জয়ন্তীর স্মৃতি বুকে নিয়ে লেখা ওই কবিতাটি নীচে উপস্থাপন করছি।

ভালোবাসার রসায়ন

বারে বারে কেন তারা পায়ে হাত দিতে যায়?
দু'চোখে তাকায় কেন সুগভীর মমতায়?
ছবি নিতে কেন চায় হাজারে হাজার জন?
টগবগে প্রেমে যেন সমৃদ্ধ সবারই মন।
সাবেক ছাত্রী ভাবে স্যার কি রেখেছে মনে?
নাম ধরে ডাক দিলে জল জমে আঁখিকোণে।
বাবা নই তবু পিতা মানে তারা গুরুজন
একে কি যায় বলা ভালোবাসার রসায়ন?

উল্লেখ্য, বিভাগীয় সুবর্ণ জয়ন্তীর স্যুভেনির দ্রুত প্রকাশ করে সবার কাছে পৌঁছে দেয়ার প্রতিশ্রুতি দেয়া হলেও করোনা ভাইরাসের কারণে এ কার্যক্রম বিলম্বিত হয়। প্রকাশনা উপকমিটির কাছে প্রয়োজনীয় মেটেরিয়াল থাকা সত্ত্বেও কমিটি সদস্যদের লকডাউনে গৃহবন্দি হয়ে পড়া ছিল এ বিলম্বের অন্যতম কারণ। প্রায় সাত মাস পর করোনাভীতি একটু কমলে প্রকাশনা উপকমিটি কর্মতৎপর হয়। ২০২০ সালের মধ্য অক্টোবরে প্রকাশনা উপকমিটির আহ্বায়ক টেলিফোনে আমাকে জানান, আমার লেখার আকৃতি নিয়ে কিছুটা সমস্যা হচ্ছে। তিনি বলেন, স্যার লেখাটি আর একটু ছোট করতে পারলে ভালো হত। কারণ, এর কয়েকটি লাইন একটি পৃষ্ঠায় চলে যাওয়ায় দেখতে ভালো লাগছে না। তা ছাড়া তিনি আমার কাছে বিভাগীয় অনুষ্ঠানের প্রাসঙ্গিক গ্রুপ ছবি থাকলে পাঠাতে অনুরোধ করেন। আমি ওই দিনই লেখাটির প্রথম প্যারার প্রায় অর্ধেকটা মুছে দিয়ে শেষে ১৬ লাইনের কবিতাটি ৮ লাইনে পরিবর্তিত করে দিলে সমস্যার সমাধান হয়। এ ছাড়া আমি তাকে বিভাগীয় বিভিন্ন অনুষ্ঠানের ছয়টি ছবি পাঠাই। তবে এর তিনদিন পর তিনি আমাকে আবার ফোন করে জানান, প্রকাশনা উপকমিটির কেউ কেউ আমার লেখার কন্টেন্ট নিয়ে আপত্তি জানান এবং সেখান থেকে সম্ভব হলে কিছু তথ্য কমিয়ে দিতে অনুরোধ করেন। আমি বলি, আমি এটি চিন্তা-ভাবনা করে লিখেছি। এটি পরিবর্তনের কোনো ইচ্ছে আমার নেই। আমার অনুমতি ছাড়া লেখাটিতে পরিবর্তন কাম্য নয়।

পরে ১৭ অক্টোবর তারিখ রাতে বিভাগীয় সভাপতি এ ইস্যু নিয়ে আমার সঙ্গে দীর্ঘক্ষণ টেলিফোনে আলোচনা করেন। তবে আমি তাকে ভদ্রভাবে বিনয়ের সাথে আমার লেখায় পরিবর্তন না করার ব্যাপারে আমার আগের সিদ্ধান্ত অবগত করি। আর তাদের কথায় আমি লেখাটি পরিবর্তনে রাজি হবই বা কেন? কারণ, আমি ওই লেখায় কোনো অসত্য তথ্য উপস্থাপন করিনি। আমার লেখাটি প্রকাশিত হলে কেন সুবর্ণ জয়ন্তী অনুষ্ঠান করতে দেরি হয়েছে সে সম্পর্কে শিক্ষার্থীরা একটি বাস্তব ধারণা পেতেন। একটি আদর্শ সুবর্ণ জয়ন্তী অনুষ্ঠানের জন্য প্রয়োজনীয় করণীয় সম্পর্কেও তাদের ধারণা স্পষ্ট হত। ডিসেম্বরে সুভেনির বিতরণ শুরু হলে ছাত্রদের কাছে জানতে পারি আমার লেখাটি সুভেনিরে প্রকাশ করা হয়নি। পরে

২০২১ সালের জানুয়ারি মাসে স্যাবাটিক্যাল ছুটি শেষে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে গিয়ে কাজে যোগদান করলে আমাকে 'স্মৃতি সুবর্ণ' শীর্ষক সুবর্ণ জয়ন্তীর একটি কপি দেয়া হয়। আকর্ষণীয় প্রচ্ছদে দৃষ্টিনন্দন স্বরূপে স্মরণিকাটি প্রকাশ করা হয়। এটি প্রকাশের সঙ্গে জড়িতদের ধন্যবাদ প্রাপ্য। আমার প্রায় ৪০ বছরের শিক্ষকতা জীবনে যাদেরকে পড়িয়েছি সে সব শিক্ষার্থীসহ বিভাগের প্রায় দুই হাজারের মত শিক্ষার্থীর প্রিয় মুখ এবং তাদের সঙ্গে যোগাযোগের ঠিকানা রয়েছে এ সুভেনিরে। এখন আমি চাইলে সহজে এদের অনেকের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারব। কিছুসংখ্যক শিক্ষার্থী দৃষ্টিনন্দন এ সুভেনিরে আমি ছাড়া আর সব বিভাগীয় শিক্ষকের লেখা থাকায় কেন আমি লিখিনি জানতে চায়। ভাবছি বিষয়টি যেহেতু এ গ্রন্থে আমি সংক্ষিপ্তভাবে এ সম্পর্কে বিশ্লেষণ করেছি, কাজেই এমন প্রশ্নকারীদের উত্তর না দিয়ে এ গ্রন্থটি প্রকাশিত হবার পর এ গ্রন্থ পাঠ করে তাদের প্রশ্নের উত্তর জেনে নিতে অনুরোধ করব। এ রকম একটি বড় বাজেটের জাঁকজমকপূর্ণ অনুষ্ঠান সম্পন্ন হওয়ার পর বৎসরাধিককাল পার হলেও এর আর্থিক আয় ব্যয়ের হিসাব নিকাশ বিভাগীয় একাডেমিক কমিটিতে পেশ করা হয়নি। আমি বিভাগীয় একাডেমিক কমিটির ৩৬৬তম ভার্চুয়াল সাধারণ সভায় বিভাগীয় সভাপতিসহ এ অনুষ্ঠান সম্পন্ন করতে যারা পরিশ্রম করেন তাদের সবাইকে আমার পক্ষ থেকে অভিনন্দন জানাই এবং ভবিষ্যতে আমাদের অবর্তমানে বিভাগীয় ৭৫ বা শতবর্ষ পূর্তি উৎসব পালনকালে সংশ্লিষ্টগণ যাতে করে আমাদের অভিজ্ঞতা কাজে লাগাতে পারেন সে জন্য ৫০বর্ষপূর্তি অনুষ্ঠানের আয় ব্যয়ের হিসাব সম্পন্ন করে রাখার জন্য সভাপতিকে অনুরোধ করি।

অন্যান্য কার্যক্রমে যোগদান

সভাপতি হিসেবে অন্যান্য নন-একাডেমিক অরাজনৈতিক অনুষ্ঠানেও আমি যোগদান করেছি। তবে প্রতি বছর রমজান মাসে যেসব ইফতার পার্টির দাওয়াত পেয়েছি, কেবলমাত্র চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি আয়োজিত ইফতার পার্টি ব্যতীত অন্যগুলোতে আমি যাইনি। বিশেষ করে ছাত্র সংগঠনগুলো এবং সাংবাদিক সংগঠনগুলো আয়োজিত ইফতার পার্টি আমি ইচ্ছে করে এড়িয়ে গিয়েছি। চট্টগ্রাম সাহিত্য সংগঠনগুলো থেকে আমি তাদের আয়োজিত অনুষ্ঠানে তেমন একটা দাওয়াত পাইনি। কারণ, এদের মধ্যে এমন একটা ধারণা হয়ত কাজ করে, সাহিত্য সাধনা বাংলা বিভাগের পৈত্রিক সম্পত্তি। সে জন্য এ সংগঠনগুলিকে তাদের অনুষ্ঠানে অধিকাংশ সময় বাংলা বিভাগের শিক্ষকদেরকে দাওয়াত দিতে দেখা যায়। তাদের জানা উচিত যে, হুমায়ুন আহমেদ রসায়নের শিক্ষক হয়ে যদি জনপ্রিয় উপন্যাস ও নাটক রচনা করতে পারেন, তাহলে আমরা রাজনীতির শিক্ষক হয়ে সাহিত্য রচনায় ভালো করতে পারব না কেন? তবে আমার সভাপতিত্বকালে আমার ছাত্র ও বিভাগীয় সহযোগী অধ্যাপক মোহাম্মদ আলম চৌধুরীর দুটি সাহিত্যবিষয়ক দাওয়াতে আমি অংশগ্রহণ করেছি। এর একটি ২০১৮ সালের

ফেব্রুয়ারিতে তার লেখা *আহমদ ছফার সংসার* শীর্ষক গ্রন্থের মোড়ক উন্মোচনে শহরে অভিজাত বইয়ের দোকান বাতিঘরে।[৪৬] অন্যটি চট্টগ্রাম প্রেস ক্লাবে মুশফিক হোসাইন সম্পাদিত *প্রকৃতি* নামের একটি প্রকৃতি সংরক্ষন বিষয়ক ম্যাগাজিনের ২০১৮ সালের জুলাই সংখ্যার প্রকাশনা উৎসবে। এ দুটি অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে আমি বক্তব্যও রাখি। *প্রকৃতি*-র ওই সংখ্যাটিতে জনাব আলম চৌধুরী 'মানুষের শ্রেষ্ঠ চতুষ্পদ বন্ধু কুকুর' শীর্ষক একটি তথ্যসমৃদ্ধ প্রবন্ধ লিখেন।[৪৭] সম্পাদক *প্রকৃতি*-র পরবর্তী 'কাক' সংখ্যার ওপর আমাকে একটি লেখা দিতে অনুরোধ করেন। আমি বলি, এটি তো প্রাণীবিজ্ঞানীদের বিষয়। তাদের কাছ থেকে লেখা সংগ্রহ করা ভালো হবে। সম্পাদক মহোদয় বলেন, তারা তো অবশ্যই লিখবেন। আমরা আপনার কাছ থেকেও একটি লেখা আশা করছি। আমি বলি, আমি তো রাষ্ট্রবিজ্ঞানের শিক্ষক। আমি লিখলে সে লেখায় রাজনীতির ছাপ পড়তে পারে। তিনি হেসে বলেন, অসুবিধা কি, আপনি আপনার মতোই লিখুন। পরে আমি তার অনুরোধ রেখেছিলাম। তাকে 'অবহেলিক কাক ও নির্বাচন' শীর্ষক একটি প্রবন্ধ লিখে দিয়েছিলাম। তিনি প্রবন্ধটি ২০২০ সালে প্রকাশিত *প্রকৃতি*-র দৃষ্টিনন্দন 'কাক' সংখ্যায় ছেপেছিলেন।[৪৮] এ ছাড়া আমি খুলনার কবি হাফিজুর রহমান রচিত কাকের ওপর একটি কবিতা সম্পাদককে এনে দিয়েছিলাম। তিনি সে কবিতাটিও 'কাক' সংখ্যায় প্রকাশ করেন। এ ছাড়াও আমি আমন্ত্রিত হয়ে অনেক সুশীল সমাজ, এনজিও ও অরাজনৈতিক সংগঠনের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেছি (এমন দুটি অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণের নমুনার জন্য দেখুন পরিশিষ্ট- ৮:২৭)। যেমন ২০১৯-এর আগস্টে সুজন চট্টগ্রাম আয়োজিত রাজনৈতিক সংস্কার বিষয়ক অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখি।[৪৯] এ ছাড়াও মাঝেমধ্যে বিভিন্ন অরাজনৈতিক সংগঠন কর্তৃক আমন্ত্রিত হয়ে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে যোগদান করি। এর মধ্যে রয়েছে ধর্মীয়, সাহিত্য ও শিক্ষা বিষয়ক অনুষ্ঠান।

ধর্মীয় অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ

ধর্মীয় অনুষ্ঠানের মধ্যে চট্টগ্রামের ফটিকছড়ির রাঙ্গামাটিয়া দরবার শরিফের পির সাহেব হযরত মাওলানা শফিকুল ইসলাম সাহেবের রাঙ্গামাটিয়া দরবারস্থ মাদ্রাসার বাৎসরিক মাহফিলে তাঁর একজন ভক্ত ও মুরিদ আমাকে বিশেষ অতিথি হিসেবে দাওয়াত দিলে আমি অবাক হই। কারণ, আমার মতো কুরআন-হাদিস মূর্খ

---

৪৬. মোহাম্মদ আলম চৌধুরী, *আহমদ ছফার সংসার* (ঢাকা: তৃতীয়চোখ, ২০১৮)।

৪৭. দেখুন, মোহাম্মদ আলম চৌধুরী, 'আমাদের বিশ্বস্ত চতুষ্পদ বন্ধু কুকুর', *প্রকৃতি*, জুলাই ২০১৮ সংখ্যা, পৃষ্ঠা- ৩০-৪৬।

৪৮. মুহাম্মদ ইয়াহ্ইয়া আখতার, 'অবহেলিত কাক ও নির্বাচন', *প্রকৃতি*, কাকসংখ্যা, ২০২০, পৃষ্ঠা- ৫৭-৫৮।

৪৯. অনুষ্ঠানে প্রদত্ত লেখকের বক্তব্যের জন্য দেখুন, *দৈনিক ইনকিলাব*, ২৫ আগস্ট, ২০১৯।

সাধারণ লাইনে লেখাপড়া করা লোককে তো ধর্মীয় মাহফিলে দাওয়াত দেবার কথা না। কিন্তু দাওয়াত প্রদানকারী আমাকে বলেন, তিনি এখন এ ব্যাপারে আমার মতামত শুনবেন না। তিন দিন পরে এ ব্যাপারে আমার সঙ্গে কথা বলবেন। আমি যেন তাঁকে এ দাওয়াতে যাবার, বা না যাবার ব্যাপারে এখনই কিছু না বলি। বিভিন্ন পিরের দরবারের নামে বিভিন্ন স্থানে নানান ভণ্ডামি চলে। আবার এ লাইনে যে একেবারেই ভালো লোক নেই তা নয়। তবে তাদের সংখ্যা খুবই কম। আমি চট্টগ্রামের লোক না হওয়ায় এদের ব্যাপারে আমার অভিজ্ঞতা ও জানাশোনা কম। অগত্যা আমি ইসলামের ইতিহাস বিভাগের প্রফেসর ড. শব্বির আহমদ-এর শরণাপন্ন হই। তাঁকে বলি, শব্বির ভাই আপনি তো চট্টগ্রামের লোক, আমাকে একটা পরামর্শ দিন। তারপর কারা আমাকে তাদের মাহফিলে দাওয়াত দিয়েছেন তাদের সম্পর্কে বলে জানতে চাই, এই দাওয়াতে আমার যাওয়া উচিত কিনা। তিনি দাওয়াতকারী পির সাহেবের সিলসিলা এবং এবং তাদের পূর্বসুরিদের ইতিহাস এমন বিস্তারিতভাবে বলা শুরু করলেন যা শুনে আমি বুঝলাম যে এ ব্যাপারে তিনি একজন বিশেষজ্ঞ। আমি তাঁকে থামিয়ে বললাম, আমি এত কিছু জানতে চাইনি। আপনার পরামর্শটি বলুন। তিনি বলেন, আমি মনে করি আপনার যাওয়া উচিত। কারণ, এদের মধ্যে ছক্কাপাঞ্জা নেই। আমি বললাম, ফটিকছড়ি এলাকায় তো সন্ত্রাস। যেতে ভয় করে। তিনি আমার কথা শুনে হেসে দিয়ে বললেন, আপনি নির্ভয়ে যান। যদি আপনাকে কোনো সন্ত্রাসী আক্রমণ করে এবং আপনি যদি তাকে বলেন যে আপনি ওই দরবারের মাহফিলে আমন্ত্রিত অতিথি হিসেবে যাচ্ছেন, তাহলে তারা আপনার ক্ষতি করবে না। আপনাকে সঙ্গে করে তাজিমের সঙ্গে মাহফিলে পৌঁছে দেবে। কারণ, আমার জানামতে ওই এলাকার কতিপয় সন্ত্রাসী ওই পির সাহেবের সংস্পর্শে এসে ভালো হয়ে গেছে।

তিনদিন পর দাওয়াতকারী আমার মতামত জানতে চাইলে আমি সম্মতি দিলাম। তিনি নির্দিষ্ট দিনে আমাকে এবং আরেকজন মাদ্রাসার মুহাদ্দিস সাহেবকে গাড়িতে করে নিয়ে গেলেন। ফটিকছড়ি পৌঁছার পর আমাদেরকে প্রথমে হুজুরের বাড়িতে একটি ঘরে আপ্যায়ন করা হয়। বলা হলো, আমাকে মাগরিবের নামাজের পর বক্তব্য রাখতে হবে। আমরা একটু পরেই মাহফিলে যাব। আমি পির সাহেবের এক ঘনিষ্ঠজনকে কাছ ডেকে বললাম, আপনি কি অনুমান করতে পারেন আমার মতো সাধারণ লাইনের লোককে এমন ধর্মীয় মাহফিলে কেন দাওয়াত দেয়া হয়েছে? তিনি যে উত্তর দেন তা আমার কাছে যৌক্তিক মনে হয়। তিনি বলেন, হুজুরই ভালো জানেন আপনাকে কেন দাওয়াত দিয়েছেন। তবে আমার একটা অনুমান আছে। আপনি অনুমতি দিলে বলতে পারি। আমার সম্মতি পেয়ে তিনি বলেন, দেখুন আপনি সঠিক বলেছেন যে এ রকম মাহফিলে বিভিন্ন মাদ্রাসার বড় বড় আলিম ওলামারাই আসেন এবং তারা হাদিস কোরআন জানা লোক। তারা তাদের মতো করে সুর করে ওয়াজ করেন। এমনটাই হয়। তবে আমাদের পির সাহেবের অনেক মুরিদ আছেন যারা স্কুল, কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র।

আপনাদের মতো ব্যক্তিত্ব যখন কিছু বলবেন তখন সে বক্তব্য তাদের কাছে হুজুরদের বক্তব্যের চেয়ে অধিকতর গ্রহণযোগ্য হতে পারে। তার কথায় আমি কিছুটা যুক্তি খুঁজে পাই।

আসরের নামাজের পর হুজুরের সঙ্গে আমার দেখা হলো। আমি তাঁর কাছে দোয়া চাইলাম। মঞ্চে ওঠার অনেক পর আমি তাঁর কানের কাছে মুখ নিয়ে নিম্নস্বরে বললাম, হুজুর আমি কি বিষয়ে বক্তব্য রাখব? তিনি বললেন, আপনার যা খুশি তাই বলবেন। আমি বললাম, পিরদের অনেক ভণ্ডামি, লাল কাপড় টানিয়ে মাজার ব্যবসা করা ইত্যাদি সম্পর্কে বলব? তিনি ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানালেন এবং বললেন, আপনার যা খুশি স্বাধীনভাবে বলবেন। পির সাহেবকে আমার খুব সাদামাটা সহজ সরল মানুষ বলে মনে হলো। পরে আমি আমার বক্তব্যে পিরবাদ কি, এর উৎপত্তি কিভাবে হলো, বর্তমান পৃথিবীতে অধ্যাত্মবাদী সাধনার উপযোগিতা আছে কিনা, ইত্যাদি সম্পর্কে উদাহরণ দিয়ে শ্রোতাদের বুঝাবার চেষ্টা করলাম। যুব সমাজ এ সাধনায় যুক্ত হলে সমাজের কোনো উপকার হবে কিনা সে সম্পর্কেও বলেছিলাম। এমন বক্তব্য দিতে আমার খুব একটা প্রস্তুতি নিতে হয়নি। কারণ আমি নিজেও ধর্মবিশ্বাসী এবং নকশাবন্দিয়া মোজাদ্দেদিয়া তরিকার একজন গাফেল মুরিদান। আমি যার কাছে মুরিদ হয়েছিলাম তিনি আজ বেঁচে নেই। তাঁর কোনো গদিনশিনও নেই। তবে ওই সময় তিনি বেঁচে ছিলেন। আমি এ অনুষ্ঠানে আসার আগে তাঁকে ফোন করে অনুমতি চেয়েছিলাম। তিনি পির সাহেবের নাম জিজ্ঞেস করায় আমি নাম ভুলভাবে বলায় তিনি তাঁর নাম শুদ্ধ করে দিয়ে আমাকে অবাক করেছিলেন। আমাকে অনুমতিও দিয়েছিলেন। পরবর্তীতে আবারও এদের কতিপয় ইফতার মাহফিল এবং ধর্মীয় অনুষ্ঠানে আমি যোগ দিয়েছি। ২০১৯ সালে সেপ্টেম্বর মাসে আবারো আমাকে ফটিকছড়ির রাঙ্গামাটিয়া দরবারের একটি মাহফিলে দাওয়াত দেয়া হয়। আমি মনে মনে ভাবছিলাম, বক্তব্য না দেবার শর্তে মাহফিলের দিন গিয়ে ঘুরে আসব কিনা। কিন্তু এর মধ্যে ঢাকায় দুর্নীতিবিরোধী অভিযানের অংশ হিসেবে মদ জুয়া ও মাদকের আখড়া ক্যাসিনো মালিকদের কয়েকজনকে গ্রেফতার করায় এ নিয়ে সারা দেশে তোলপাড় হয়ে যায়। সরকারদলীয় যুব সংগঠনের জি কে শামিম, সম্রাট (ক্যাসিনো সম্রাট হিসেবে পরিচিত) প্রভৃতিদেরকে গ্রেফতার করা হয়। তাদের ক্যাসিনো এবং বাসস্থান থেকে কোটি কোটি টাকা উদ্ধার করা হয়। কিন্তু রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম-এর দেশে ক্লাবের মধ্যে বছরের পর বছর লাইসেন্সবিহীন মদ জুয়ার আসর চললেও প্রশাসন এবং আইন-শৃঙ্খলা বাহিনী এ ব্যাপারে নীরব ছিল। এ বিষয়টি প্রকাশ্যে আসার পরও দেশের আলিম সম্প্রদায় এর বিরুদ্ধে সোচ্চার হননি। এ জন্য আমি 'ক্যাসিনোর গডফাদাররা কোথায়?' শীর্ষক একটি প্রবন্ধ লিখে আলিম সম্প্রদায়ের সমালোচনা করি। প্রবন্ধটি *যুগান্তর* পত্রিকার ২০১৯ সালের ২৩ সেপ্টেম্বর সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। ওই প্রবন্ধে আমি লিখি—

> আশ্চর্য! যে দেশের সংবিধানে রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম, সে দেশে লাইসেন্স না নিয়ে মদ জুয়া ব্যবসার বিরুদ্ধে ধার্মিক জনগণ নীরব! কোথায় আজ ইসলামি তাহজীব তমদ্দুন রক্ষায় নিবেদিতপ্রাণ দাবিদার হযরত মাওলানা আহমেদ শফী হুজুর? কোথায় বঙ্গভবনে দাওয়াত খেয়ে নিজেদের মাদ্রাসার ডিগ্রিকে এমএ সমমানের স্বীকৃতি নেয়া সে আলিম সম্প্রদায়, যারা নিজেদের দাবি করেন ইসলামি সংস্কৃতি রক্ষার অভিভাবক?[৫০]

হেফাজতে ইসলামসহ অনেক আলিম ওলামাগণের ক্যাসিনোকাণ্ডের বিরুদ্ধে সমালোচনা না করায় আমি আমার প্রবন্ধে তাঁদেরকে সমালোচনা করে লিখি—

> বাংলাদেশে সম্মানিত আলিম ওলামা, মাদ্রাসা শিক্ষক ও ওয়ায়েজদের মধ্যে নামের শেষে মাদ্রাসার নাম বা জন্মস্থানের নাম জুড়ে দেয়ার রীতি প্রচলিত আছে। যেমন, হযরত মাওলানা অমুক নারায়নগঞ্জী, বা হযরত মাওলানা ওমুক নানুপুরি, ইত্যাদি। এখন এসব সম্মানিত আলিম ওলামাদের কর্মকাণ্ড বিশ্লেষণ করে মনে হয়, নামের সঙ্গে প্রতিষ্ঠান বা জন্মস্থানের নাম জুড়ে দেয়ার পরিবর্তে তাদের কর্মকাণ্ডের প্রতিফলন ঘটে এমন বিশেষণ জুড়ে দেয়া প্রাসঙ্গিক। সে ক্ষেত্রে তাদের সম্ভাব্য নাম হতে পারেঃ হযরত মাওলানা অমুক সুবিধাবাদী; অথবা, হযরত মাওলানা অমুক সুবিধাভোগী, প্রভৃতি।[৫১]

এহেন সমালোচনার পর আমি আর ওই ধর্মীয় মাহফিলে যোগ দেয়া ভালো মনে করিনি। কারণ, আমি এমন সমালোচনা করার পর ওই মাহফিলে গেলে সম্মানিত হুজুরদের অনুসারী অন্ধ ভক্তগণ যদি কোনো সিন ক্রিয়েট করতেন সেটা যুগপৎ আমার বা মাহফিল আয়োজকদের জন্য ভালো হত না। এ ছাড়া অন্য কতিপয় ধর্মীয় অনুষ্ঠানেও আমার যোগ দেবার অভিজ্ঞতা আছে। এখানে এমন একটি অনুষ্ঠানে যোগ দেবার অভিজ্ঞতা উল্লেখ করা অপ্রাসঙ্গিক হবে না।

আমি এক সময় চট্টগ্রামের নাসিরাবাদ হাউজিং সোসাইটির ৫ নম্বর রাস্তার ২৪ নম্বর বাসার দোতলায় ভাড়া থাকতাম। আমার এক প্রতিবেশি ছিলেন মাওলানা নজরুল ইসলাম। দেখা সাক্ষাৎ হলে আমাদের মধ্যে সালাম বিনিময় হত। পরে জেনেছিলাম তিনি মাইজভাণ্ডার শরিফের চট্টগ্রামস্থ অফিসে কাজ করেন। একদিন তিনি আমাকে বলেন, স্যার আপনাকে আমি মাইজভাণ্ডার শরিফ আয়োজিত সেমিনারে একবার নিয়ে যাব। আমি তাকে কোনা কথা না দিয়ে বলেছিলাম 'দেখা যাবে।' এর আগে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে অর্থনীতি বিভাগের অধ্যাপক প্রফেসর ড. আবদুল মান্নান চৌধুরী আমাকে বিভিন্ন সময় মাইজভাণ্ডার শরিফ আয়োজিত সেমিনারে এবং হাটহাজারীর কাটিরহাটের শাজাহান শাহ এর

৫০. দেখুন, মুহাম্মদ ইয়াহ্ইয়া আখতার, 'ক্যাসিনোর গডফাদাররা কোথায়?', *যুগান্তর*, ২৩ সেপ্টেম্বর, ২০১৯।
৫১. *পূর্বোক্ত।*

মাযারের ওরস উপলক্ষে আয়োজিত বাৎসরিক সেমিনারে একাধিকবার প্রবন্ধ লিখতে এবং অংশগ্রহণ করাতে চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়েছেন। তবে মাত্র একবার তিনি আমাকে চট্টগ্রাম শহরে অনুষ্ঠিত এ ধরণের একটি মারিফতী অনুষ্ঠানে নিতে পেরেছিলেন। ওই অনুষ্ঠানটির আয়োজন কারা করেছিলেন আমার মনে নেই। যা হোক মান্নান ভাই মাইজভান্ডার লাইনের একজন তাত্ত্বিক এবং এ লাইনে তাঁর অভিজ্ঞতা ও প্রকাশনা আছে। কিন্তু আমি তাঁর প্রায় প্রতিটি দাওয়াত বিনয়ের সঙ্গে ফিরিয়ে দিয়েছি। যা হোক, মাওলানা নজরুল ইসলাম একদিন হঠাৎ আমাকে বলেন, স্যার আমি আপনার নাম দিয়েছি। মাইজভান্ডারের লালদিঘী মাহফিলে আপনি বক্তব্য রাখবেন। আমি তো অবাক। এ কথা শুনে আমি অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে বলি, বলেন কি, আপনি আমার অনুমতিও নেয়া প্রয়োজন মনে করলেন না? তিনি অবাক হয়ে বলেন, স্যার এ সব অনুষ্ঠানে অনেক বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক আসেন। আমি এও জানলাম এ মাহফিলের খবর প্রচারের জন্য যে পোস্টার প্রচার করা হয়েছে সেখানেও আমার নাম ছাপা হয়েছে। আমি সরাসরি যখন বললাম, আমি যাব না। তখন মাওলানা সাহেবের মুখটি অন্ধকার হয়ে গেল। পরে আমি ভাবলাম, তিনি ভুল করে ফেলেছেন। আমি না গেলে তিনি অবশ্যই বকুনি খাবেন এবং তার চাকুরিও যেতে পারে। পরে আমার একটু মন নরম হলো। ভাবলাম, আচ্ছা একবার না হয় গিয়ে দেখি তারা কি করেন। নির্দিষ্ট দিনে আমি শার্ট প্যান্ট কোর্ট গায়ে দিয়ে লালদিঘী যাওয়ার পর আমার মাথা ঘুরে যায়। লোকে লোকারণ্য। লক্ষ লক্ষ লোকের সমাগম। মাঠের মাঝখানে স্টেজ। আমি ভাবলাম এত লোকের ভিড় ঠেলে আমি স্টেজ পর্যন্ত পৌঁছাতে পারব না। একজন ভলেন্টিয়ারকে বললাম, আমি এ মাহফিলে নিমন্ত্রিত অতিথি কিন্তু কিভাবে স্টেজে যাব বুঝতে পারছি না। তিনি আমার দিকে তাকিয়ে আমার বক্তব্য ঠিকমত বুঝতে না পারায় আরেকজন বুকে বড় ব্যাজ লাগানো ভলেন্টিয়ারকে ডেকে আনলেন। আমি তাকে একই কথা বলায় তিনি আমার নাম শুনেই 'স্যার' 'স্যার' বলে বিচলিত হয়ে উঠলেন। আমার হাত ধরে ভিড় ঠেলতে ঠেলতে আমাকে নিয়ে স্টেজের দিকে রওনা হলেন। স্টেজ পর্যন্ত যেতে ২-৩ মিনিট লেগে গেল। আমাকে স্টেজে ওঠানো হলো। আমাকে বসতে দেয়া হলো এবং মাইকে আমার নামও ঘোষণা করা হলো। তখন স্টেজে বসে ছিলেন বিএনপি নেতা আবদুল্লাহ আল নোমান, আওয়ামী লীগ নেতা মহিউদ্দিন চৌধুরী, সাদার্ন ইউনিভার্সিটির ভাইস চ্যান্সেলর প্রফেসর ড. মইনুদ্দিন আহমদ খান, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর প্রফেসর ড. আনোয়ারুল আজিম আরিফ, একজন কলেজ অধ্যক্ষ, মাওলানা নজিবুল বাশার মাইজভান্ডারী প্রমূখ ব্যক্তিত্বগণ।

আমি বুঝতে পারছিলাম না যে এমন মাহফিলে কি বলতে হবে। ভাগ্য ভালো, আমাকে প্রথমে বলতে না দিয়ে কলেজের অধ্যক্ষ সাহেবকে প্রথমে মাইক দেয়া হলো। আমি দেখলাম, তিনি চার থেকে সাড়ে চার মিনিট বক্তব্য রাখলেন। এর ফলে আমি বুঝি, এটা দীর্ঘ বক্তৃতা দেয়া বা ওয়াজ করার মঞ্চ নয়। শুভেচ্ছা

বক্তব্য দিতে হবে। পরে বুঝেছিলাম, এরা সকালের দিকে ভক্তকুলকে দিয়ে দোয়া কালাম ও জিকির আজগার করান। তারপর একটু বেলা হলে গণ্যমান্যদেরকে স্টেজে উঠিয়ে তাদেরকে দিয়ে শুভেচ্ছা বক্তব্য প্রদান করিয়ে ভক্তকুলকে বুঝাতে চান যে দেখুন, কত সব গণ্যমান্য লোকজন আমাদের সাথে আছেন। যাহোক আমি সেখানে মারিফাত সাধনা ও এর গুরুত্বের ওপর মিনিট পাঁচেক বক্তব্য রেখেছিলাম। হয়ত আমার বক্তব্য ভালো হয়েছিল। কারণ, আমি বক্তব্য শেষ করার পর একজন বাবরি চুলওয়ালা সাদা কাপড়ের লুঙ্গি পরা এ লাইনের বৃদ্ধ লোক কাছে এসে আমার পিঠ চাপড়ে দিয়ে চট্টগ্রামের ভাষায় বলেছিলেন, 'তোর লাইন ঠিক আছে। চালিয়ে যা।' আমার এ বক্তব্য শুনে এরা পরে আমাকে ঢাকার পল্টন ময়দানে এবং এদের বড় বড় মাহফিলে নেবার অনেক চেষ্টা করে ব্যর্থ হন। আমি পরিষ্কার বলে দেই, দেখুন, আপনারা আলিম ওলামাদেরকে নিয়ে যান। আমি সাধারণ লাইনে লেখাপড়া করা কোরআন-হাদিস মূর্খ লোক। আমার এমন অনুষ্ঠানে যেয়ে বক্তব্য দেয়া মানায় না। তবে আমার ওই বক্তব্যটি এখনও তাঁরা রেকর্ড করে রেখে দিয়েছেন। কারণ, আমার অনেক ছাত্র আমাকে বলেছে, স্যার আপনি মাইজভান্ডারে সংক্ষিপ্ত হলেও খুব ভালো বক্তব্য রেখেছেন। আমি তাদেরকে বলেছি, আমি জীবনে কোনোদিন মাইজভান্ডারে যাইনি। তোমরা যে বক্তব্যটি শুনেছ ওটি লালদিঘী ময়দানে প্রদত্ত বক্তব্য। এক ভুল বুঝাবুঝির মধ্য দিয়ে আমি ওই অনুষ্ঠানে যেতে বাধ্য হয়েছিলাম। তোমরা হয়ত ওই বক্তব্যটির রেকর্ড শুনেছ।

বিলম্বিত বিদায় ও বরণ অনুষ্ঠান

একজন বিভাগীয় সভাপতি সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়মানুযায়ী তিন বছর দায়িত্ব পালন করেন। তারপর বিভাগের অন্যান্য শিক্ষকদের মধ্য থেকে পরবর্তী সিনিয়র শিক্ষককে সভাপতির দায়িত্ব প্রদান করা হয়। তবে কোনো সভাপতি যদি স্বেচ্ছায় পদত্যাগ করেন, তাহলে এ নিয়মের ব্যত্যয় ঘটে। আমার সভাপতির দায়িত্ব গ্রহণের সময় এ নিয়মের ব্যত্যয় ঘটেছিল। কারণ, আমার পূর্ববর্তী সভাপতি বৎসরাধিককাল দায়িত্ব পালন করে স্বেচ্ছায় পদত্যাগ করেন। এ কারণে নির্দিষ্ট সময়ের প্রায় দুই বছর আগে অপ্রস্তুত অবস্থায় একটি অস্বাভাবিক পরিস্থিতিতে আমাকে ২০১৭ সালের পরিবর্তে ২০১৫ সালের ১৮ আগস্ট সভাপতির দায়িত্ব গ্রহণ করতে হয়। সভাপতির দায়িত্ব পালন শেষ হলে তাঁকে বিদায় দেবার এবং নতুন সভাপতিকে স্বাগত জানাবার একটি প্রথা আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রচলিত আছে। সে জন্য আমি আমার সভাপতির মেয়াদ শেষ হবার আগে ১২ আগস্ট, ২০১৮ তারিখে অনুষ্ঠিত একাডেমিক কমিটির ৩২৪তম সাধারণ সভায় সাবেক ও নতুন সভাপতির যথাক্রমে বিদায় ও বরণ সুসম্পন্ন করার লক্ষে অধ্যাপক ড. মোঃ এনায়েত উল্যা পাটওয়ারী-কে আহ্বায়ক এবং জনাব এ জি এম নিয়াজ উদ্দিন, মো. বখতেয়ার উদ্দিন এবং জনাব মো. সেলিমুল হক-কে সদস্য করে চার

সদস্যের একটি কমিটি গঠন করে দিয়েছিলাম। আমার শেষ কর্মদিবস ১৮ আগস্ট ২০১৮ তারিখ সাপ্তাহিক ছুটির দিন (শনিবার) হওয়ায় আমি ১৬ আগস্ট তারিখে নবাগত চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. আনোয়ারা বেগমকে অনাড়ম্বর অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সভাপতির দায়িত্বভার হস্তান্তর করি। ওই দিন নবাগত সভাপতির কাছে বিদায়ী সভাপতির দায়িত্ব হস্তান্তরকালে বিভাগীয় শিক্ষকগণ সভাপতির কক্ষে একত্রিত হয়ে উভয় সভাপতিকে ফুলেল শুভেচ্ছা জানান। নবাগত সভাপতির হাতে আমি ফুলের তোড়া তুলে দিয়ে তাঁকে স্বাগত জানাই এবং সভাপতি হিসেবে আমার শেষ কর্মদিবসে আমার হাতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন বিভাগের বরিষ্ঠ অধ্যাপক ড. হাসান মোহাম্মদ (ছবির জন্য দেখুন পরিশিষ্ট- ৮:২৮)।

বিভাগে স্বাভাবিকভাবে দায়িত্ব শেষ করার পর পূর্ববর্তী সকল চেয়ারম্যানদের বিদায় এবং নবাগত চেয়ারম্যানকে স্বাগত জানানো হয়েছে। আমি যেহেতু এ ব্যাপারে আগেই একটি কমিটি করে দিয়েছিলাম, সে জন্য ভাবি, অচিরেই নতুন চেয়ারপার্সন গঠিত কমিটির মাধ্যমে এ অনুষ্ঠান করবেন। সাধারণত এ সব অনুষ্ঠান বেশি দেরি করে করা হয় না। ক্ষমতার রদবদলের কয়েক দিনের মধ্যেই এ রকম অনুষ্ঠান সম্পন্ন করা হয়। সে ক্ষেত্রে পরিস্থিতি স্বাভাবিক থাকলে খুব বেশি হলে ৫-৭ দিন, বা ১০-১২ দিনের মধ্যেই এমন অনুষ্ঠান করা হয়। কিন্তু আমার ক্ষেত্রে তেমন কোনো উদ্যোগ দেখা যায়নি। নিজেই এ অনুষ্ঠানের অংশ হওয়ায় আমি এ ব্যাপারে প্রথম দিকে খোঁজ খবর নেইনি। কিন্তু বেশ কিছুদিন হয়ে গেলে আমার ঢাকা ও খুলনা যাবার পরিকল্পনা থাকায় আমি গঠিত কমিটি সদস্যদের সঙ্গে আলাপ করে বুঝি, তাঁরা এ অনুষ্ঠান করতে তখনও নবাগত সভাপতির অনুমতি পাননি। তাঁদের যথানিয়মে প্রত্যাশিত সময়ের মধ্যে এ অনুষ্ঠান করে ফেলার ইচ্ছে থাকা সত্ত্বেও সভাপতির সহযোগিতা না পাওয়ায় তারা তা করতে পারেননি। ইতোমধ্যে এক সপ্তাহের মধ্যে সভাপতি রদবদলের ঘটনাটি বিভাগের সকল শিক্ষার্থীরা জেনে যায়। সফলভাবে বিভাগ পরিচালনার জন্য আমাকে অভিনন্দিত করার জন্য পৃথক পৃথক বর্ষের শিক্ষার্থীরা ফুলের তোড়া এনে দলবেঁধে আমাকে অভিনন্দন জানাতে থাকে (এমন অভিনন্দন জানাবার নমুনার জন্য দেখুন পরিশিষ্ট- ৮:২৯)। প্রত্যাশিত সময়ের মধ্যে অনুষ্ঠানটি করলে শিক্ষার্থীরা পৃথকভাবে আমাকে ফুল দিয়ে অভিনন্দন জানাবার সুযোগ পেত না।

সংশ্লিষ্ট কমিটি কয়েকবার নতুন সভাপতির সঙ্গে আলাচনা করে এ ব্যাপারে তাঁর অনুমতি না পাওয়ায় আমি ভাবি, সভাপতি হয়ত আমাকে বিদায় দিতে আগ্রহী নন। তা না হলে একমাস হয়ে যাবার পরও এ ব্যাপারে আমাকে কোনো কিছু জানান হয়নি, যেখানে পাঁচ-সাত দিনের মধ্যেই এমন অনুষ্ঠান সম্পন্ন করা প্রত্যাশিত। শিক্ষক এবং শিক্ষার্থীদের মধ্যেও এ বিষয়টি নিয়ে আলোচনা শুরু হলে সভাপতি এক পর্যায়ে কমিটির অনুরোধে এ অনুষ্ঠানে সম্মতি প্রদান করেন এবং আমার সভাপতির দায়িত্ব হস্তান্তরের (১৬ আগস্ট) ৫৪ দিন পর ১০ অক্টোবর বিভাগ কর্তৃক এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। ছাত্র-শিক্ষকদের উপস্থিতিতে এ

অনুষ্ঠানে বিদায়ী ও নবাগত সভাপতিকে পুষ্পস্তবক ও ক্রেস্ট দিয়ে সম্মানিত করা হয় (বর্তমান ও সাবেক সভাপতির ক্রেস্ট গ্রহণের ছবির জন্য দেখুন পরিশিষ্ট- ৮:৩০)। এ সভায় সহকর্মীরা নবাগত সভাপতিকে বিভাগ পরিচালনায় সব রকম সহযোগিতার আশ্বাস দেন এবং বিদায়ী সভাপতিকে সফলভাবে দায়িত্ব পালনের জন্য অভিনন্দন জ্ঞাপন করেন।

এভাবে আমি সকল শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সহায়তা নিয়ে তিন বছর সভাপতির দায়িত্ব পালন করি। তবে আমার সভাপতিত্বকালীন সময়টি কুসুমাস্তীর্ণ ছিল না। এ সময় শিক্ষকদের পদোন্নতি নিয়ে অনেক সমস্যা হয়। মিটিংয়ের পর মিটিং করা লাগে এবং অনেকগুলো তদন্ত কমিটি গঠন এবং একাধিকবার সেগুলি পুনর্গঠন করতে হয়। আমার সভাপতির মেয়াদের শেষদিকে বিভাগের ৫০ বছর পূর্তি অনুষ্ঠানও নানা জটিলতা ও মারপ্যাঁচের মধ্যে পড়ে। উক্ত অনুষ্ঠানের সাংগঠনিক কমিটি একাধিকবার গঠন করেও অনুষ্ঠানের কাজে প্রত্যাশিত অগ্রগতি হয়নি। তবে আমি নিঃস্বার্থভাবে সব সময় বিভাগের জন্য যা ভালো মনে করেছি, তাই করার চেষ্টা করেছি। সে জন্য দায়িত্ব শেষ করার পর আমি এক রকম প্রশান্তিলাভ করি। বিভাগীয় সভাপতি হিসেবে যদি ভালো কিছু করে থাকি, তা সবার সহযোগিতায় করা সম্ভব হয়েছে। বিশেষ করে আমার জুনিয়র সহকর্মীরা আমাকে সব রকম সহযোগিতা প্রদান করেছেন। সেজন্য তাদের কাছে আমি কৃতজ্ঞ। সিনিয়র সহকর্মীরাও সব সময় বুদ্ধি পরামর্শ দিয়ে সহযোগিতা করেছেন। সহযোগিতা করেছেন বিভাগীয় কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ। বিশেষ করে বিভাগীয় অফিস প্রধান সিনিয়র ডেপুটি রেজিস্ট্রার জনাব নুরুল হক চৌধুরী ও জনাব জামাল উদ্দিন অফিস পরিচালনায় আমাকে আন্তরিকভাবে সহযোগিতা করেছেন। তবে যাই করি না কেন, বিভাগীয় সভাপতি হিসেবে আমি ন্যায়নিষ্ঠ থাকার চেষ্টা করেছি। সকল শিক্ষার্থীকে একই চোখে দেখেছি। বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়মকানুন মেনে বিভাগ পরিচালনা করেছি। এর ফলে আমার সময় সেশন জট অনেকটা কমে আসে। তবে এ কৃতিত্ব আমার নয়, বিভাগের সকল সহকর্মীর প্রাপ্য। বিভাগীয় সভাপতি হিসেবে এবং একজন সাধারণ শিক্ষক হিসেবে আমি বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতার কাজটি উপভোগ করেছি। নিজ অফিসে, শ্রেণিকক্ষে বা ক্যাম্পাসে যতক্ষণ উপস্থিত থেকেছি, আমার কাছে মনে হয়েছে আমি এক আনন্দময় পরিবেশ ও সংস্কৃতির জগতে আছি। পরবর্তী অধ্যায়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব সংস্কৃতি সম্পর্কে আলোচনা করব।

নয়
উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংস্কৃতি

একেকটি প্রতিষ্ঠানের পরিবেশ ও সংস্কৃতি একেক রকম। সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের কাজকর্মের সংস্কৃতি ও পরিবেশে পার্থক্য আছে। একইভাবে রাজনৈতিক বা প্রশাসনিক প্রতিষ্ঠানের পরিবেশের সঙ্গে শিক্ষাঙ্গণের সংস্কৃতি ও পরিবেশের ভিন্নতা সুস্পষ্ট। এ অধ্যায়ে আমার দেখা সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে বিরাজমান সংস্কৃতির স্বরূপ ও গতিধারার ওপর আলোকপাত করব। এ আলোচনায় বিশেষভাবে স্থান পাবে একাডেমিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে সরকারি বিশ্ববিদালয়গুলোর সংস্কৃতির স্বরূপ ও গতিপ্রকৃতি। এর মধ্যে উঠে আসবে ছাত্র ও শিক্ষক রাজনীতি, ছাত্রাবাস, ক্যাম্পাস ও শাটল ট্রেনের পরিবেশ, বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক অফিসের সংস্কৃতি, ছাত্র-শিক্ষকদের অপরাধ ও শাস্তি, লেখাপড়া ও ক্যাম্পাস সংস্কৃতি, ঝুপড়ির আড্ডা, ক্যাম্পাস সংস্কৃতির ওপর প্রযুক্তির প্রভাব, দুর্নীতি ও যৌন দুর্নীতি বৃদ্ধি, প্রভৃতি প্রসঙ্গ।

চরিত্রভ্রস্ট একাডেমিক প্রতিষ্ঠান

সর্বোচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে একাডেমিক কার্যক্রমের অগ্রাধিকার পাওয়া উচিত। কিন্তু বাংলাদেশি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে, বিশেষ করে সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোয় একাডেমিক কার্যক্রম অগ্রাধিকার পায় না। চলমান সংস্কৃতিতে সব রকম সিদ্ধান্ত হয় বর্ণের আবরণে দলীয় রাজনীতি দ্বারা প্রভাবিত হয়ে। এখানে শিক্ষক নিয়োগে মেধার চেয়ে শিক্ষকদের বর্ণদলীয় রাজনীতির প্রভাব পড়ে। শিক্ষকদের মধ্যে বিভিন্ন পদ ও সুযোগ সুবিধা বন্টনের ক্ষেত্রে ক্ষমতাসীন দলের সঙ্গে সম্পর্কিত শিক্ষকগণ অগ্রাধিকার পান। সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে আমার মতো কোনো বর্ণদলেই নাম না লেখানো শিক্ষক খুবই কম। আমি শিক্ষকতা জীবনে কোনোদিন কোনো বর্ণদলে নাম লেখাইনি। কখনো শিক্ষকদের কোনো বর্ণদলীয় সভায় যোগ দেইনি। বিশ্ববিদ্যালয়ে এমন শিক্ষকের সংখ্যা কম। এরা বিভিন্ন রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক সুবিধা থেকে বঞ্চিত হন। আমার কাছে মনে হয়, ১৯৭৩-এর সরকারি বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাদেশ/আইন বাংলাদেশি সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর একাডেমিক চরিত্র নষ্ট করে দিয়েছে। সরকারি বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাদেশ-১৯৭৩ হলো শিক্ষকদেরকে দেয়া বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের উপহার। অথচ, নিজেদেরকে বঙ্গবন্ধুপ্রেমিক ও মুক্তিযুদ্ধের স্বপক্ষের সরকার দাবিকারিগণের জন্য

পদে পদে এ অধ্যাদেশকে অসম্মান করে ভিসি নিয়োগ দেয়া কি পরোক্ষভাবে বঙ্গবন্ধুকে অসম্মান করা নয়? এ অধ্যাদেশ অনুযায়ী বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি, ডিন, সিন্ডিকেট ও সিনেট সদস্যগণ শিক্ষকদের ভোটে নির্বাচনের মাধ্যমে নির্বাচিত হয়ে থাকেন। এতে দোষের কিছু নেই। এ প্রক্রিয়ায় যদি এসব গুরুত্বপূর্ণ পদে শিক্ষকগণ নির্বাচিত হয়ে আসেন তাহলে তো সে পদ্ধতিকে গণতান্ত্রিক বলা যায়। কিন্তু, সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে সব সময় তা হচ্ছে কি?

অধিকাংশ সময় ভিসি নিয়োগ দেয়া হচ্ছে সরকারি দলের গুডবুকে থাকা কোনো সুবিধাবাদী তদবিরকারী শিক্ষককে। ভিসি মনোনয়ন দেবার সময় সংশ্লিষ্ট শিক্ষকের একাডেমিক ও প্রশাসনিক যোগ্যতা দেখা হয় না। বড় সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে যে ভাবে সিনেট সদস্যদের ভোটে নির্বাচিত তিন সদস্যের প্যানেল থেকে একজনকে বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের চ্যান্সেলর মহোদয়ের ভিসি হিসেবে নিয়োগ দেবার কথা, তা খুব কম ক্ষেত্রেই অনুসৃত হয়। সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোয় ১৯৭৩ সালের সরকারি বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাদেশ/আইন পদে পদে লজ্জিত হতে দেখছি। সরকার, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বা ইউজিসি চাইলে তো এ অধ্যাদেশ সংস্কার করে একে যুগোপযোগী করতে পারে। অধ্যাদেশ রেখে একে না মানলে তেমন অধ্যাদেশ রেখে লাভ কি? একই বক্তব্য প্রযোজ্য ডিন নির্বাচনের বেলায়। ডিন একটি গুরুত্বপূর্ণ একাডেমিক পদ। যে সকল শিক্ষকের উজ্জ্বল একাডেমিক পরিচিতি রয়েছে, তাদেরকে ডিন পদে মনোনয়ন দেয়া উচিত। কিন্তু অধিকাংশক্ষেত্রে তা হয় না। হলের প্রভোস্টও দেয়া হয় ভিসির ঘনিষ্ঠভাজন শিক্ষকদেরকে। সত্য যে, প্রভোস্ট পদে কাজ করতে কিছু প্রশাসনিক দক্ষতার প্রয়োজন। কিন্তু সেখানেও একাডেমিক যোগ্যতাসম্পন্ন শিক্ষকদের পদায়ন করা উচিত। কারণ, একটি হলে শত শত শিক্ষার্থী থাকে। প্রভোস্ট নিজে একাডেমিক ব্যক্তিত্ব হলে তাঁর কথাবার্তা ও কাজকর্মের মধ্য দিয়ে তিনি শিক্ষার্থীদের একাডেমিক কাজে উৎসাহিত করতে পারেন। ১৯৭৩-এর সরকারি বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাদেশ সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর শিক্ষকদের অবাধ স্বাধীনতা দিলেও তাদের দায়িত্বশীলতা নিশ্চিত করতে পারেনি। এ বিশ্ববিদ্যালয়গুলোয় শিক্ষকগণ ইচ্ছামতো বিশ্ববিদ্যালয়ে আসা-যাওয়া করেন। তাদের অনেকেরই কোনো দায়বদ্ধতা আছে বলে মনে হয় না। কোনো হাজিরার খাতায় সই করতে হয় না। কেউ কেউ পর পর কয়েকদিন না এলে বিভাগে, বা শিক্ষার্থীদের জানাবার প্রয়োজনও মনে করেন না। অবশ্য ঢালাওভাবে সব শিক্ষকদের বেলায় এমন অভিযোগ করা যায় না। কারণ, যথাযথভাবে দায়িত্ব পালনকারী শিক্ষকের সংখ্যাই বেশি। তবে সান্ধ্যকালীন প্রোগামে ক্লাস নেয়া এবং বেসরকারি বিশ্ববিদালয়ে পাঠদানের কারণে এখন নিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের মূল দায়িত্বপালনে অবহেলাকারী শিক্ষকের সংখ্যা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে।

একজন বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষককে দায়িত্বশীল হতে হয়। এ দায়িত্বশীলতা কেবল নিজ স্বার্থের বেলায় প্রদর্শন না করে সর্বক্ষেত্রে প্রদর্শন করা উচিত। কিন্তু

বর্তমানে সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে অধিকাংশ শিক্ষকই প্রত্যাশিত মাত্রায় দায়িত্বশীলতা প্রদর্শন করেন না। একাডেমিক, প্রশাসনিক বা অন্যসব ক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকদের পারফরম্যান্স একই রকম। অনেক উদাহরণ দেয়া যেতে পারে। এখানে আমার পর্যবেক্ষিত একটি সাম্প্রতিক নমুনা উপস্থাপন করব। প্রফেসর আবদুল মান্নান-এর ইউজিসি চেয়ারম্যানের মেয়াদ শেষ হয় ২০১৯ সালে। পরে সরকার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কলা অনুষদের একাধিকবার নির্বাচিত ডিন ও ইতিহাস বিভাগের প্রফেসর কাজী শহীদুল্লাহকে ইউজিসির চেয়ারম্যান হিসেবে নিয়োগ দেন। প্রফেসর শহীদুল্লাহ ইউজিসি চেয়ারম্যান হবার পর কিছু নতুন পদক্ষেপ নেন। এমন একটি পদক্ষেপ হলো সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর র‍্যাংকিংয়ে উন্নতি ঘটানো। তিনি বুঝতে পারেন, বাংলাদেশি সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলো র‍্যাংকিংয়ে পিছিয়ে পড়ার একটি অন্যতম প্রধান কারন হলো এ বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর শিক্ষকদের দেশীয় জার্নালে প্রকাশিত প্রকাশনাগুলো অনলাইনে না থাকা। সে কারণে এ সব প্রকাশনা র‍্যাংকিং করার ক্ষেত্রে আমলে নেয়া হয় না। তিনি সকল সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়কে তাদের নিজস্ব ওয়েব পোর্টাল তৈরি করে সেখানে শিক্ষকদের প্রকাশনা উপস্থাপন করতে নির্দেশনা দেন। এটি নিঃসন্দেহে একটি ভালো উদ্যোগ। কিন্তু শিক্ষকরা এই শুভ উদ্যোগে কতটা আন্তরিকতার সঙ্গে সাড়া দিয়েছেন তার নমুনা দেখাব।

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে উপরিউক্ত বিষয়ে দায়িত্বপ্রাপ্ত কম্পিউটার সায়েন্স বিভাগের প্রফেসর ড. হানিফ সিদ্দিকীর কাছ থেকে আমি ২০১৯ সালের জুন মাসে একটি ইমেইল বার্তা পাই। যতদূর মনে পড়ে ওই ইমেইলে ৩০ জুনের মধ্যে ওয়েবপোর্টালে আমাদের গবেষণা প্রকাশনা যুক্ত করতে বলা হয়। আমি তখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগে পরীক্ষার কাজে ঢাকায় যাই। ঢাকা থেকে ফিরে যত দ্রুত সম্ভব আমি আমার প্রকাশনা ওয়েবপোর্টালে আপলোড করি। আমি বিষয়টিকে গুরুত্ব দিয়ে দেখি। ভাবি, আমার যদি একটি প্রকাশনা থাকে এবং সেটা যদি আমি ওয়েবপোর্টালে আপলোড করি তাহলে আমার বিশ্ববিদ্যালয় নিজের র‍্যাংকিং পজিশন ওপরে ওঠাতে সামান্য হলেও লাভবান হবে। কিন্তু অন্যান্য শিক্ষকদের মধ্যে এ বিষয়ে আগ্রহ লক্ষ্য করিনি। বিশেষ করে যাঁদের প্রকাশনা কম, তাঁদেরকে এ ব্যাপারে গড়িমসি করতে দেখা যায়। আবার যাঁদের অনেক প্রকাশনা আছে, তাঁদের মধ্যেও এ ব্যাপারে ত্বরিৎ তৎপরতা লক্ষ্য করিনি। এ কাজ শুরু হবার পর দু'মাস অতিক্রান্ত হয়ে গেলে সমাজ বিজ্ঞান অনুষদভুক্ত নয়টি বিভাগের দেড় শতাধিক শিক্ষকের মধ্যে শতকরা ১২ ভাগেরও কম শিক্ষক ওয়েবপোর্টালে তাঁদের গবেষণা প্রকাশনা আপলোড করেন। ওই সময়ে আমার নিজের রাজনীতিবিজ্ঞান বিভাগের ২৩জন শিক্ষকের মধ্যে ৫জন ওয়েবপোর্টালে ছবি যুক্ত করলেও আমিসহ মাত্র তিনজন শিক্ষক ওয়েবপোর্টালে তাদের গবেষণা প্রকাশনা উপস্থাপন করেন। অন্য শিক্ষকদের অনেক প্রকাশনা থাকা সত্ত্বেও কেন তাঁরা তা ওয়েব পোর্টালে আপলোড করেননি বা এখনও করছেন না, তা ভাবার

বিষয়। হয়ত অধিকাংশ শিক্ষকগণ বিষয়টি আমলে নেননি। পরে যদি ওপর থেকে চাপ আসে তাহলে হয়ত তাঁরা এ কাজ করতে বাধ্য হবেন। এ কাজ শুরু হবার ২ মাস পর সমাজবিজ্ঞান অনুষদভুক্ত নয়টি বিভাগের ওয়েবপোর্টাল পর্যবেক্ষণ করে দেখা যায়, শিক্ষকরা বিষয়টিকে মোটেও গুরুত্বপূর্ণ বিবেচনা করেননি যা সারণি ৯:১-এ প্রতিফলিত হয়েছে। এ সারণির বিশ্লেষণ বলে দেয়, নিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের র‍্যাংকিং বাড়বে বা কমবে এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে তথ্য প্রদানের ক্ষেত্রে শিক্ষকগণ কতটা দায়িত্বশীলতার পরিচয় দিয়েছেন। অবগত হবার দু'মাস পর একটি অনুষদের ওয়েব পোর্টাল যাচাই করে দেখা যায়, ৮৮.৭৫ ভাগ শিক্ষক তাদের প্রকাশনার তালিকা ওয়েবপোর্টালে উপস্থাপন করেননি। অন্যান্য অনুষদগুলোর চিত্র যে একেবারেই ভিন্ন এমন নয়।

সারণি: ৯:১

ওয়েবপোর্টালে গবেষণা প্রকাশনা তুলে ধরার চিত্র

বিভাগ	ডায়রিতে নামের সংখ্যা	ওয়েবপোর্টালে নাম দিয়েছেন	ওয়েবপোর্টালে ছবি দিয়েছেন	ওয়েবপোর্টালে গবেষণা তথ্য দিয়েছেন %	ওয়েবপোর্টালে গবেষণা তথ্য দেননি %
অর্থনীতি	২৫	১১	০৭	০৩	২২
রাজনীতিবিজ্ঞান	২৩	২২	০৫	০৩	২০
সমাজতত্ত্ব	২৬	০৮	০৮	০১	২৫
লোক প্রশাসন	২১	০৭	০৭	০৪	১৭
নৃবিজ্ঞান	২২	০৭	০৬	০০	২২
আন্তর্জাতিক সম্পর্ক	১৩	১০	০৭	০২	১১
সাংবাদিকতা	২২	২০	১৯	০৩	১৯
ক্রিমিনলোজি	০৪	০৪	০৩	০২	০২
ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজ	০৪	০৩	০৩	০০	০৪
মোট	১৬০	৯২	৬৫	১৮	১৪২
শতকরা হার (%)	১০০	৫৭.৫০	৪০.৬৩	১১.২৫	৮৮.৭৫

বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকদের দায়বদ্ধতার জায়গাটি ভুলে যাওয়া উচিত নয়। এ দায়বদ্ধতা যে কেবল ছাত্র পড়ালে শেষ হয়ে যায় না, সে বিষয়টি আমি স্মরণে রেখেছি। বিশ্বাস করেছি, নিজ গবেষণা ও প্রকাশনা করলেই একজন শিক্ষকের দায়বদ্ধতা শেষ হয়ে যায় না। শিক্ষককে শিক্ষার্থীদের সময় দিতে হয়। ছাত্রছাত্রীদের চাহিদা অনুযায়ী তাদের একাডেমিক কাজে সহায়তা করতে হয়। এমনকি তাদের ব্যক্তিগত সুবিধা অসুবিধারও খোঁজখবর নিতে হয়। আর এ জন্য শিক্ষককে নিয়মিত বিশ্ববিদ্যালয়ে আসতে হয়। তাঁকে তাঁর নিজের কক্ষে অবস্থান করতে হয়, যাতে শিক্ষার্থীরা তাঁকে প্রয়োজনের সময় খুঁজলে পেতে পারে। তাঁর

সঙ্গে কথা বলতে পারে। এ ব্যাপারে আমি সব সময় ছাত্রবান্ধব থাকার চেষ্টা করেছি। শিক্ষার্থীদের সময় দিয়েছি। আমার কাছে কোনো শিক্ষার্থী ছবি বা কাগজপত্র সত্যায়িত করতে আসলে খুব বেশি জরুরি বা পরীক্ষাসংক্রান্ত গোপনীয় কাজে ব্যস্ত না থাকলে কখনো না বলিনি। বিরক্ত হইনি। ভেবেছি, আমরা যদি ওদের সাহায্য না করি, ওরা কার কাছে যাবে? তবে বিরাজিত বাস্তবতা যাচাই করলে দেখা যায়, কিছুসংখ্যক শিক্ষকের মধ্যে এ ব্যাপারে আন্তরিকতার অভাব রয়েছে। পাশ্চাত্যের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোয় শিক্ষকগণ তাদের বসার ঘরের দরজায় ভিজিটিং আওয়ার লিখে রাখেন। তার সঙ্গে কোনো শিক্ষার্থী দেখা করতে চাইলে যাতে অন্তত ওই সময় আসলে তাঁকে তাঁরা কক্ষে পায়। কেউ হয়ত লিখে রাখেন 'সোম থেকে বুধবার—সকাল ১০ থেকে ১২টা।' অর্থাৎ ওই সময় তাকে রুমে পাওয়া যাবেই। তবে ওই সময় ছাড়াও অন্য সময় শিক্ষক কক্ষে থাকলে তাঁর অনুমতিসাপেক্ষে শিক্ষার্থীরা তাঁর সঙ্গে দেখা করতে পারে। আলাপ আলোচনা করতে পারে। কিন্তু শিক্ষক যদি বিশ্ববিদ্যালয়ে না আসেন, তাঁর রুমেই না বসেন, তাহলে শিক্ষার্থীরা কিভাবে তাঁর সঙ্গে তাদের সমস্যা নিয়ে আলাপ আলোচনা করবে?

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজ বিজ্ঞান অনুষদে বিরাজিত শিক্ষক সংস্কৃতি জরিপ করে দেখা যায়, বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাদেশে 'অফ ডে' বলে কোনো বিষয় না থাকলেও অনেক শিক্ষক নিজেরা দুই দিনের সাপ্তাহিক ছুটি থাকার পরও 'অফ ডে' তৈরি করে নেন। ওই 'অফ ডে'-তে তাঁরা রুটিনে কোনো ক্লাস রাখেন না এবং জরুরি প্রয়োজন না হলে অনেকে বিশ্ববিদ্যালয়েও আসেন না। ফলে পাঁচ দিনের কর্মদিবসের মধ্যে অনেক শিক্ষক ৩ দিন, বা কোনো কোনো শিক্ষক মাত্র দুইদিন রুটিনে ক্লাস রেখেছেন এমনও দেখা গেছে। শিক্ষকদের 'অফ ডে' চিহ্নিত করার জন্য আমি ২০১৯ সালে সমাজ বিজ্ঞান অনুষদের তিনটি বিভাগের ক্লাস রুটিন জরিপ করেছি। এ রুটিনগুলোর জরিপের ফলাফল অনুযায়ী ওই বিভাগগুলোর কতজন শিক্ষকের সপ্তাহে কতদিন ক্লাস আছে সে পরিসংখ্যান সারণি ৯:০২-এ প্রতিফলিত হয়েছে। উল্লেখ্য, যেসব দিন রুটিনে কোনো শিক্ষকের ক্লাস থাকে না, ওই

সারণি: ৯:২

শিক্ষকদের আইন বহির্ভূত 'অফ ডে'-র চিত্র

বিভাগ	শিক্ষক সংখ্যা	সপ্তাহে ৫দিন ক্লাস আছে	সপ্তাহে ৪দিন ক্লাস আছে	সপ্তাহে ৩দিন ক্লাস আছে	সপ্তাহে ২দিন ক্লাস আছে	সপ্তাহে ১দিন ক্লাস আছে
রাজনীতিবিজ্ঞান	২০	০১	০৬	০৯	০৪	০০
লোক প্রশাসন	১৭	১০	০৬	০১	০০	০০
সমাজতত্ত্ব	২১	০৮	০৬	০৫	০১	০১

পরীক্ষা বা অন্য কোনো অস্বাভাবিকতা থাকলে তেমন দিনে এ হিসাব করা হয়নি।

দিনগুলোয় যদি তিনি না আসেন, তাহলে সে বিষয়টি দোষের ধরা হয় না। আবার কতজন শিক্ষক তাদের রুমে বসেন এবং শিক্ষার্থীরা তাদের সঙ্গে দেখা করতে পারেন, সে বিষয়ও জরিপ করেছি। সমাজ বিজ্ঞান অনুষদের ৯টি বিভাগের মধ্যে ৬টি বিভাগ জরিপ করে দেখা যায় যে শিক্ষকদের রুমগুলো অধিকাংশ সময় বন্ধ থাকে। ফলে মাত্র দু'একজন শিক্ষক রুমে বসলে তারা কাজে মনোসংযোগ করতে পারেন না। কারণ, শিক্ষার্থীরা তাদের কাগজপত্র সত্যায়িত করতে এবং অন্য অনেক প্রয়োজনেও অন্য শিক্ষক না পেয়ে তাদের কাছে আসেন। এখানে সমাজ বিজ্ঞান অনুষদের তিনটি বিভাগের শিক্ষকদের কক্ষসংখ্যা এবং ক্লাস চলাকালীন সময়ে তার কতগুলি কক্ষ খোলা থাকে তার তিন দিনের একটি হিসাব দৈবচয়ন পদ্ধতিতে সারণি ৯:৩-এ উপস্থাপন করা হলো। উল্লেখ্য, এ জরিপকালীন আলো জ্বলা রুমগুলো তালাবদ্ধ থাকলেও সে কক্ষে শিক্ষক আছেন বলে ধরা হয়েছে।

প্রসঙ্গ ছাত্র রাজনীতি

আমি ছাত্রজীবনে কখনো ছাত্র রাজনীতিতে জড়িত ছিলাম না। তবে আমার পাঁচ ভাইবোনের মধ্যে একমাত্র আমার বড় বোন একেবারে স্কুলজীবন থেকে ছাত্র রাজনীতিতে সক্রিয় ছিলেন। স্কুল, কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয় জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে তিনি ছাত্র রাজনীতিতে সক্রিয়ভাবে জড়িত ছিলেন। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াকালীন তিনি ছাত্রলীগের মহিলা সম্পাদিকা নির্বাচিত হন। পরে তিনি মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন এবং কোলকাতায় নার্সিং ও সেমি গেরিলা ট্রেনিং ইন্সিটিউটের সুপারিটেনডেন্ট পদে কাজ করেন। এই ইন্সিটিটিউট যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধাদের চিকিৎসা ও সেবা প্রদান করতো। স্বাধীনতাত্তোরকালেও তিনি প্রথমে আওয়ামী লীগের এবং পরে জাতীয় পার্টির রাজনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তৃতীয় জাতীয় সংসদ নির্বাচনে তিনি খুলনা-৩ আসনে জাতীয় পার্টি থেকে সরাসারি নির্বাচন করে আওয়ামী লীগ নেত্রী বেগম মন্নুজান সুফিয়ানকে পরাজিত করে এমপি নির্বাচিত হন। এ ছাড়াও তিনি জাতীয় সংসদের হুইপ, সাধারণ বীমা কর্পোরেশনের চেয়ারপার্সন এবং খুলনা সিটি কর্পোরেশনের ডেপুটি মেয়রসহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে দায়িত্ব পালন করেন। তাঁর মতো বর্ণাঢ্য রাজনৈতিক ক্যারিয়ার আমাদের অন্য কোনো ভাইবোন বা নিকটাত্মীয়র ছিল না।

যেহেতু বড় বোন রাজনীতি করতেন, সেই সুবাদে আমাদের বাসায় অনেক বড় বড় ছাত্রনেতা আসতেন। তাদেরকে অনেক কাছ থেকে দেখেছি। পাকিস্তান আমলে যাঁরা ছাত্র রাজনীতি করতেন তাঁদের মধ্যে দেশপ্রেম ছিল। পারস্পরিক সৌহার্দ্য ছিল। কিন্তু স্বাধীনতার পর থেকে ছাত্র রাজনীতি ক্রমান্বয়ে কলুষিত হতে থাকে। ছাত্র রাজনীতিতে বিভক্তি, দ্বন্দ্ব-কলহ এবং খুন খারাবি ছড়িয়ে পড়ে। সে সঙ্গে এ রাজনীতিতে লাগে বণিকবৃত্তির ঢেউ। আরও পরে চাঁদাবাজি, টেন্ডারবাজি, হল দখল, সিট দখল, মনোনয়ন বাণিজ্য এবং পদ কেনাবেচা এ রাজনীতির অংশে পরিণত হয়। ষাটের দশকে ছাত্রনেতারা সমাজ ও রাজনীতিতে যে সম্মান পেতেন,

সারণি: ৯:৩

শিক্ষক কক্ষে শিক্ষক উপস্থিতি

বিভাগ	তারিখ	সময়	শিক্ষক কক্ষ	শিক্ষক আছেন	শিক্ষক নেই
রাজনীতিবিজ্ঞান	০১-১০-'১৯	১১:৩০	১৭	০৮	০৯
লোক প্রশাসন	০১-১০-'১৯	১১:৩০	১৪	০৬	০৮
সমাজতত্ত্ব	০১-১০-'১৯	১১:৩০	১৫	০৯	০৬
রাজনীতিবিজ্ঞান	১২-১১-'১৯	১২:০০	১৭	০৯	০৮
লোক প্রশাসন	০২-১০-'১৯	১২:০০	১৪	০৯	০৫
সমাজতত্ত্ব	০২-১০-'১৯	১২:৩০	১৫	০৯	০৬

পরীক্ষা বা অন্য কোনো অস্বাভাবিকতা থাকলে তেমন দিনে এ জরিপ করা হয়নি।

পরবর্তীতে তারা সে সম্মান ধরে রাখতে পারেননি। ১৯৯০ এর পর দেশ সামরিক শাসন থেকে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় উত্তরণের পর ছাত্র রাজনীতিতে গণতন্ত্রায়ণ হয়নি। নব্বই পরবর্তী তিন দশকে ছাত্র নেতাদেরকে কোটা সংস্কার ও নিরাপদ সড়ক আন্দোলন বাদে আর কোনো ছাত্র স্বার্থবিষয়ক একাডেমিক আন্দোলন গড়ে তুলতে দেখা যায়নি। অবশ্য এ দুটি আন্দোলনে কেন্দ্রীয় ছাত্র নেতৃত্বের চেয়ে সাধারণ শিক্ষার্থীদের অবদান বেশি ছিল।

আমি ছাত্র রাজনীতির অবনমন নিয়ে লিখেছি। আমার লেখা কতিপয় প্রকাশিত গ্রন্থে এবং গ্রন্থভুক্ত অধ্যায়ে ছাত্র রাজনীতিবিষয়ক আলোচনা আছে।[৫২] ওই সব আলোচনায় স্থান পেয়েছে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের অসুস্থ রাজনীতির গতিধারা ও তার কুফল। ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি) ও এ এইচ ডেভেলপমেন্ট পাবলিশিং হাউস কর্তৃক যৌথভাবে ২০০৮ সালে প্রকাশিত আমার লেখা *সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে দুর্নীতি: স্বরূপ ও প্রতিকার* শীর্ষক গ্রন্থে ছাত্র রাজনীতি বন্ধ করা সংক্রান্ত রাজনৈতিক নেতাদের বাহাস সম্পর্কে

৫২. নমুনা হিসাবে দেখুন, মুহাম্মদ ইয়াহ্ইয়া আখতার, *সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে দুর্নীতি, স্বরূপ ও প্রতিকার* (ঢাকা: টিআইবি ও এএইচডিপিএইচ, ২০০৮); *মহাজোট সরকারের দুই বছর* (ঢাকা: অসডার পাবলিকেশন্স, ২০১১); *মহাজোট সরকারের বিকাল বেলা* (ঢাকা: অসডার পাবলিকেশন্স, ২০১৩); Muhammad Yeahia Akhter, 'Transparency in Tertiary Education: Politics, Administration and Recruitment', in Imtiaz Ahmed and Iftekhar Iqbal (eds.), *University of Dhaka: Making Unmaking Remaking* (Dhaka: Prothoma Prokashan, 2016), pp. 273-297.

আলোচনা করেছি। প্রকাশকালে সরকার, শিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং ইউজিসি এ গ্রন্থটিকে আমলে নিয়েছিল। তবে ওই পর্যন্তই। কাজের কাজ কিছু হয়নি। কিছু ব্যতিক্রম ব্যতীত ১৯৭৩ সালের সরকারি বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাদেশ অবজ্ঞা করে বড় সরকারি বিশ্ববিদ্যলয়গুলোয় দলীয় বিবেচনায় ভিসি নিয়োগ অব্যাহত আছে। এ সব ভিসিগণের অনেকেই দুর্নীতিজড়িত হয়ে পড়েন। ভিসি হবার তদবিরে এরা কেউ কেউ ছাত্র নেতাদের ব্যবহার করেছেন। দুর্নীতির অভিযোগ প্রমাণিত হওয়া সত্ত্বেও এসব ভিসিদেরকে শাস্তি দেবার পরিবর্তে পদ থেকে সরিয়ে দেয়া হয়েছে। এর ফলে নতুন ভিসিদের মধ্যে দুর্নীতি করার প্রবণতা বেড়েছে। কারণ, তারা মনে করেছেন, দুর্নীতি করে ধরা পড়লে আমাদেরকেও সরিয়ে দিলে আমরা স্বপদে ফিরে যাব। ইউজিসির চেয়ারম্যান এবং সদস্যগণ রাজনৈতিক বিবেচনায় নিযুক্ত হওয়ায় এরাও দুর্নীতিবাজ ভিসিদের সাজা দেবার ব্যাপারে কঠোর উদ্যোগ নেননি। কারণ, রাজনৈতিক কারণ বিবেচনায় নিয়ে ইউজিসি ভেবেছে, সরকার কর্তৃক নিযুক্ত এসব ভিসির শাস্তি হলে সরকারের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন হবে। এ জন্য ইউজিসি তেমনটি চায়নি। ফলে যুগপৎ সরকারি ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে ভিসিগণ অব্যাহতভাবে দুর্নীতি করেছেন। এ দুর্নীতি শিক্ষক-কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়োগকে প্রভাবিত করেছে। সারণি ৯:৪-এ নমুনা হিসেবে একটি সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে কর্মচারী নিয়োগে আর্থিক লেনদেনের চিত্র উপস্থাপন করা হলো।

সারণি: ৯:৪

নোয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে কর্মকর্তা পদে নিয়োগের জন্য ঘুষের হার

ক্রম	নিয়োগকৃত কর্মকর্তা	পদবি	ঘুষের পরিমাণ (টাকা)
১	জসিম উদ্দীন	উপনিবন্ধক	৩,০০,০০০
২	শফিকুল ইসলাম	সহকারী পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক	৫,০০,০০০
৩	আবদুল্লাহ ফারুক	সিস্টেম অ্যানালিস্ট	৭,০০,০০০
৪	নিতাই চন্দ্র রায়	পরিকল্পনা কর্মকর্তা	৭,০০,০০০
৫	গোলাপ হোসেন	উপনিবন্ধক	১০,০০,০০০

উৎস: ২০১২ সালের ৬ আগস্ট *সমকাল* পত্রিকায় প্রকাশিত সাব্বির নেওয়াজের প্রতিবেদন 'এনএসটিইউ-এর উপাচার্যের দ্বারা সংঘটিত অনিয়ম' শীর্ষক অনুসন্ধানী প্রতিবেদনে উপস্থাপিত তথ্যের ওপর ভিত্তি করে লেখক কর্তৃক তৈরিকৃত। উল্লেখিত হয়েছে, Imtiaz Ahmed and Iftekhar Iqbal (eds.), *University of Dhaka: Making Unmaking Remaking* (Dhaka: Prothoma Prakashan, 2016) p. 292.

বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোয় দুর্নীতি পরিস্থিতি আরও ভয়াবহ। আমি বিভিন্ন সময়ে কতিপয় বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে খণ্ডকালীন শিক্ষক হিসেবে পাঠদানের জন্য প্রস্তাব পেয়েও কখনো বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করিনি।[৫৩] তবে আমার অনেক সহকর্মী, বন্ধু ও ছাত্র বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ান। তাঁদের কাছ থেকে এসব বিশ্ববিদ্যালয়ের অনিয়ম ও দুর্নীতির বিষয়ে অনেক কিছু শুনেছি। সে দীর্ঘ আলোচনা না করে কেবল এ ক্ষেত্রে ইউজিসি ও টিআইবির পর্যবেক্ষণ তুলে ধরা যৌক্তিক বিবেচনা করছি। ইউজিসি ২০১৩ সালে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর ১৩ রকম দুর্নীতি তুলে ধরলেও সেগুলি নিরসনে দৃশ্যমান পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারেনি।[৫৪] অন্যদিকে, টিআইবি ২০১৪ সালে এক গবেষণা প্রতিবেদনে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর প্রায় প্রতি স্তরে ঘুষ-দুর্নীতি চর্চার এক লোমহর্ষক চিত্র উপস্থাপন করে। এ প্রতিবেদনে একটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনে ১ থেকে ৩ কোটি টাকা, উপাচার্য, উপ-উপাচার্য ও কোষাধ্যক্ষ নিয়োগে ৫০ হাজার থেকে ২ লাখ, নতুন অনুষদ খুলতে ৩০ এবং বিভাগ খুলতে ২০ হাজার, ভুয়া সনদের জন্য ৫০ হাজার থেকে ৩ লাখ টাকা ঘুষগ্রহণের তথ্য উপস্থাপন করা হয়। এ ছাড়া শিক্ষার্থীদের নম্বর বাড়িয়ে দিতে শিক্ষকদের উপহার সামগ্রী গ্রহণ এবং বিশ্ববিদ্যালয় পরিদর্শনকালে ইউজিসি কর্মকর্তাদের উপহারসামগ্রী গ্রহণের তথ্যও টিআইবি প্রতিবেদনে তুলে ধরা হয়।[৫৫] টিআইবির এ প্রতিবেদন প্রকাশিত হবার পর যুগপৎ সুশীল সমাজ ও শিক্ষাঙ্গণে ঝাঁকি লাগে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ২০২১ সালে এর শতবর্ষপূর্তি উদ্‌যাপনের আগে এ বিশ্ববিদ্যালয়কে কিভাবে একাডেমিকভাবে অধিকতর সফল করা যায় সে বিষয় নিয়ে জার্মান অর্থায়নে একাধিক সেমিনার ও ওয়ার্কশপের আয়োজন করে। এমন একটি সেমিনারে ওই বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের বিশিষ্ট গবেষক প্রফেসর ড. ইমতিয়াজ আহমেদ কর্তৃক অনুরুদ্ধ হয়ে আমি একটি প্রবন্ধ

---

৫৩. উল্লেখ্য আমি যেসব বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে খণ্ডকালীন শিক্ষক হিসেবে কাজ করতে অনুরুদ্ধ হয়েছি তার মধ্যে ছিল: চট্টগ্রামের প্রিমিয়ার ইউনিভার্সিটি, ইস্ট ডেল্টা ইউনিভার্সিটি, বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব প্রফেশনালস এবং এশিয়ান উইমেন ইউনিভার্সিটি।

৫৪. এসব দুর্নীতির মধ্যে ছিল: অননুমোদিত কোর্স চালু করা, অবৈধ ক্যাম্পাস খোলা, পরীক্ষায় দুর্নীতি, বিশ্ববিদ্যালয়কে আর্থিক মুনাফালাভকারী প্রতিষ্ঠানে রূপান্তরিত করা, পরীক্ষায় প্রতারণা, অযোগ্য শিক্ষক নিয়োগ, ট্রাস্টিবোর্ড সদস্যদের মধ্যে দ্বন্দ্ব, বিশ্ববিদ্যালয়কে পারিবারিক সংস্থায় পরিণত করা, উপাচার্য, উপ-উপাচার্য ও কোষাধ্যক্ষ ছাড়া বিশ্ববিদ্যালয় চালানো, সভায় অংশগ্রহণের নামে অর্থ চুরি, স্থায়ী ক্যাম্পাসে স্থানান্তরিত না হওয়া, শিক্ষক-কর্মকর্তা নিয়োগে নিয়ম ভঙ্গ করা, এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য বিদেশ থেকে তহবিল সংগ্রহ করা।

৫৫. দেখুন, *দ্য ডেইলি স্টার*, ২ আগস্ট, ২০১৪।

লিখি এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সিনেট ভবনে আয়োজিত সেমিনারে প্রবন্ধটি উপস্থাপন করি।[৫৬] এ প্রবন্ধে আমি সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের দুর্নীতি সংস্কৃতির স্বরূপ তুলে ধরি।

ক্যাম্পাস সংস্কৃতিতে কেবল শিক্ষার্থীদেরই দুর্নীতিজড়িত ভাবার কারণ নেই। অনেক বিশ্ববিদ্যালয়ে ভিসি থেকে শুরু করে কর্মকর্তা কর্মচারীরাও দুর্নীতিজড়িত। তবে রাজনীতির নামে এখন ২০১৯-২০২০ সালে শিক্ষার্থীরা যা করছেন তাকে আমি ব্যক্তিগতভাবে ছাত্র রাজনীতি না বলে 'ছাত্র ব্যবসা' বলতে আগ্রহী। কারণ, ছাত্রনেতাগণ এখন সাধারণ ছাত্রদের একাডেমিক স্বার্থকেন্দ্রিক রাজনীতি করেন না। তাঁরা তাঁদের রাজনৈতিক ও আর্থিক আখের গোছাতে কাজ করেন। বড় সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোয় ছাত্রনেতাগণ বড় বড় কাজে ব্যস্ত। নিয়োগ বাণিজ্য, টেন্ডার বাণিজ্য, চাঁদাবাজিসহ আরও অনেক বড় কাজে তাঁদের আগ্রহ বেশি। তবে এর সঙ্গে এরা কিছু ছোট কাজও করেন। যেমন, ভর্তি বাণিজ্য, দখল বাণিজ্য, মনোনয়ন বাণিজ্য, তদবির বাণিজ্য, সাংগঠনিক কমিটি গঠনকালে পদ বেচাকেনা বাণিজ্য, প্রভৃতি। তাঁরা যেভাবে চান, সেভাবেই ছাত্রাবাসগুলো পরিচালিত হয়। কেউ তাদের অবাধ্য হলে তাঁরা তাঁকে নির্যাতন করেন। এ জন্য তাঁরা হলে হলে গড়ে তোলেন টর্চার সেল। ছাত্রনেতাদের অপকর্ম বা দুর্নীতির জন্য শাস্তির উদাহরণ বিরল। ফলে ছাত্রনেতাগণ ফ্রি-স্টাইলে দুর্নীতি করেন। আইন-শৃঙ্খলা বাহিনী বা দুদক দুর্নীতির দায়ে অনেক অপরাধী ও দুর্নীতিবাজদের ব্যাংক একাউন্টের হিসাব খতিয়ে দেখলেও এ প্রতিষ্ঠানগুলো কেন্দ্রিয় ছাত্রনেতাদের ব্যাংক একাউন্টের খবর নেয় না। ফলে ছাত্র নেতাগণ দীর্ঘদিন থেকে দুর্নীতি চর্চায় অঘোষিত ছাড় পেয়ে আসছেন। সরকার বা সরকারদলীয় নেতাগণও সম্প্রতি এদেরকে বকা দেবার অধিকার হারিয়েছেন। কারণ, নির্বাচনের সময় এদের অনেকে এ সব ছাত্রনেতা-কর্মীদের ব্যবহার করে অবৈধভাবে ব্যালট বাক্স ভরার কাজ করিয়েছেন। এমনভাবে রাজনৈতিক প্রশ্রয় পেয়েই ছাত্র নেতারা অধিকতর দুর্নীতিপরায়ন হয়ে উঠেন। এ কারণেই ২০১৯ সালের ৮ আগস্ট তারিখে ওই সময়ের ছাত্রলীগের কেন্দ্রিয় সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক যথাক্রমে রেজওয়ানুল হক চৌধুরী শোভন ও গোলাম রাব্বানী জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের কাছে ওই বিশ্ববিদ্যলয়ের উন্নয়ন প্রকল্পের ১ হাজার ৪৪৫ কোটি টাকা থেকে ৮৬ কোটি টাকা চাঁদা দাবি করেন। ভিসি মহোদয় এ ঘটনা ফাঁস করে প্রধানমন্ত্রীকে অবগত করায় এ দুই শীর্ষ নেতা পদ হারান।[৫৭] এর আগে ২০১১ থেকে ২০১৫

---

৫৬ আমার উপস্থাপিত প্রবন্ধটির শিরোনাম ছিল: 'Transparency in Tertiary Education: Politics, Administration and Recruitment.'

৫৭ প্রাসঙ্গিক তথ্যের জন্য দেখুন, 'আমরা ন্যায্য পাওনা দাবি করেছিলাম: রাব্বানী', *দ্য ডেইলি স্টার*, ১৪ সেপ্টেম্বর, ২০১৯; ছাত্রলীগ সভাপতি-সাধারণ সম্পাদক চাপে', *প্রথম*

সাল পর্যন্ত ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্বপালনকারী সিদ্দিকী নাজমুল আলম অবৈধ প্রক্রিয়ায় টাকা পাচার করে বিনিয়োগ ভিসায় লন্ডন গিয়ে সেখানে একাধিক ব্যবসা করছেন।[৫৮] উল্লেখ্য, ব্রিটিশ সরকারের আইন অনুযায়ী লন্ডনে বিনিয়োগ ভিসা পেতে কমপক্ষে ২ লাখ পাউন্ড বিনিয়োগ করতে হয়। তার বিরুদ্ধে ক্ষমতার অপব্যবহার ও দুর্নীতির অসংখ্য অভিযোগ তদন্তাধীন রয়েছে। উল্লেখ্য, ক্ষমতাসীনদলীয় ছাত্র সংগঠনের নেতা-কর্মীদের দুর্নীতিজড়িত হওয়া কোনো সাম্প্রতিক বিষয় নয়। স্বাধীনতাত্তোর কাল থেকে এ বিষয়ের ক্রমান্বয় বৃদ্ধি লক্ষ্য করছি। সব শাসনামলেই ক্ষমতাসীনদলীয় ছাত্র সংগঠনের দুর্নীতি, দখলদারিত্ব ও দৌরাত্ম্য ছিল। মহাজোট সরকারামলে সরকারদলীয় ছাত্র সংগঠনের দৌরাত্ম্য এতটাই বাড়ে যে, সরকারদলীয় সাধারণ সম্পাদক জনাব ওবায়দুল কাদের অতিষ্ঠ হয়ে বলেন, 'ছাত্রলীগ যেভাবে চলছে তাতে একে হোমিওপ্যাথি আর এলোপ্যাথি নয়, সরাসরি সার্জারি করতে হবে।'[৫৯]

ছাত্র রাজনীতির স্বরূপে একরূপত্ব নেই। একেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্র রাজনীতির চরিত্র একেক রকম। আবার একেক সরকারের আমলে এ রাজনীতি একেক রকম চরিত্র ধারণ করে। এর অবদান, ভূমিকা, ক্ষমতাসীন দলের ছাত্র সংগঠনের সঙ্গে অন্য ছাত্র সংগঠনগুলোর সম্পর্ক ও তাদের প্রতি সহনশীলতার মাত্রাও বিভিন্ন সময় বিভিন্ন রূপ ধারণ করে। আবার অবস্থানগত কারণেও ছাত্র রাজনীতির চরিত্র ভিন্ন হতে পারে। যেমন, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় শহর থেকে অনেক দূরে হওয়ায় এ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র রাজনীতির চরিত্র কিছুটা ভিন্ন। এখানে অধিকাংশ শিক্ষার্থীরা শাটল ট্রেনে যাতায়াত করে। ফলে এ বিশ্ববিদ্যালয় হরতালজনিত কারণে যদি কোনো ছাত্র সংগঠন বন্ধ করে দিতে চায়, তাহলে তারা তা সহজে ট্রেন যাতায়াত বন্ধ করে দিয়ে করতে পারে। আর শাটল ট্রেন বন্ধ করা ছাত্রদের জন্য কঠিন কাজ নয়। ট্রেনের ড্রাইভারকে অপহরণ করে ট্রেনের হোস পাইপ কেটে দিয়ে ট্রেন চলাচল বন্ধ করে দেয়া যায়। এ বিশ্ববিদ্যালয়ে বহুবার হরতাল আহ্বানকারী ছাত্র সংগঠনগুলোকে এমন কাজ করতে দেখেছি। ছাত্র

আলো, ১২ সেপ্টেম্বর, ২০১৯; 'ঈদ খরচ হিসেবে ওই টাকা দাবি করেছিলেন রাব্বানী', *যুগান্তর*, ১৪ সেপ্টেম্বর, ২০১৯।

৫৮ সিদ্দিকী নাজমুল আলমের লন্ডনে ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে রয়েছে ফ্রেক্সফগ লিমিটেড, এলিট সিটি লিমিটেড, নাজ ইউকেবিডি প্রোপার্টিজ লিমিটেড, এসএনআর ইউকেডিডি লিমিটেড ও কার মিউজিয়াম লিমিটেড। এর মধ্যে নাজ ইউকেবিডি প্রোপার্টিজ নামের আবাসন ব্যবসার তিনি একক পরিচালক, যার মূলধন দেখানো হয়েছে ৮ লাখ পাউন্ড। দেখুন, 'ছাত্রলীগের সাবেক সম্পাদক নাজমুলের কত টাকা?', *মানবজমিন*, ২৯ সেপ্টেম্বর, ২০১৯।

৫৯ উল্লেখিত হয়েছে, মুহাম্মদ ইয়াহ্ইয়া আখতার, *মহাজোট সরকারের বিকাল বেলা* (ঢাকা: অসডার পাবলিকেশন্স, ২০১৩), পৃষ্ঠা-২১৭।

সংগঠনগুলো এ বিশ্ববিদ্যালয়ে গড়ে তুলেছে এক ধরণের শাটল ট্রেনকেন্দ্রিক রাজনীতি ও আড্ডাবাজি। এদের মধ্যে রয়েছে অনেকগুলো বগিভিত্তিক গ্রুপ।[৬০] শাটল ট্রেনের আড্ডার আলোচনার সিলেবাস নেই। বিষয়বস্তু পাঁচমিশালী। এর সঙ্গে বোনাস হিসেবে যুক্ত হয় সম্মিলিত কণ্ঠের সঙ্গীত। গড়ে ওঠে শাটলভিত্তিক ব্যান্ডগ্রুপও।[৬১] এমন গ্রুপ আবার কখনো কখনো ক্যাম্পাসে আনুষ্ঠানিকভাবেও সঙ্গীত পরিবেশন করে (এমন অনুষ্ঠানের ছবির জন্য দেখুন পরিশিষ্ট-৯:১)। আবার এ গ্রুপগুলো প্রায়শই নিজেদের মধ্যে দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষে লিপ্ত হয়। এ কারণে বিরক্ত হয়ে ছাত্রলীগের কেন্দ্রিয় নেতৃত্ব বগিভিত্তিক রাজনীতি নিষিদ্ধ করে দেয়। কেন্দ্র থেকে নেতা-কর্মীদেরকে বগিভিত্তিক গ্রুপের নামে চিকা মারতে, বা টি সার্ট তৈরি করতে নিষেধ করা হয়। তবে এমন নির্দেশনার মধ্যেও অঘোষিতভাবে এমন গ্রুপভিত্তিক ছাত্র রাজনীতি অপ্রকাশ্যভাবে চলমান আছে।

ছাত্র রাজনীতি বন্ধ করা প্রসঙ্গে

দেশপ্রেমিক নাগরিক এবং একাডেমিকদের একাংশ দীর্ঘদিন থেকে ছাত্র রাজনীতির সমালোচনা করে আসছেন। যুগপৎ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও ছাত্রদের দলীয় রাজনীতি বন্ধ করে দিতে পরামর্শ দিয়েছেন অনেক বিজ্ঞজন। তবে সরকারি সদিচ্ছার অভাবে এ ক্ষেত্রে উদ্যোগ নেয়া সম্ভব হয়নি। আমি ছাত্র রাজনীতির গতিধারা পর্যবেক্ষণ করে এ রাজনীতির সমালোচনা, বা এ রাজনীতি বন্ধের দাবি কখন সোচ্চার হয় তার একটা ফর্মূলা বের করেছি। এ ফর্মূলা অনুযায়ী যখন উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে লাশ পড়ে, অথবা বড় কোনো দুর্ঘটনা হয়, তখনই ছাত্র রাজনীতির মন্দ প্রভাব নিয়ে সমালোচনা শুরু হয়। এ প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে দেশ স্বাধীন হবার পর ১৯৭৩ সালে ঢাকা বিশববিদ্যালয়ে সূর্য সেন হলের বহুল আলোচিত সেভেন মার্ডার হবার পর থেকে। মাঝে মাঝে বিরতি দিয়ে তা চলমান ছিল এবং ২০১৯ সালের ৭ অক্টোবর বুয়েটে শেরে বাংলা হলে ছাত্রলীগ নেতা-কর্মীগণ কর্তৃক আবরার ফাহাদ হত্যার মধ্য দিয়ে আবারও সে আলোচনা বেগবান হয়।

আত্মঘাতী ছাত্র রাজনীতির বলি হয়ে অনেক মায়ের কোল খালি হলেও ছাত্র রাজনীতি বন্ধ হয়নি। বদলায়নি এর স্বরূপও। এ প্রক্রিয়ায় আমার নিজ বিভাগেরও এক ছাত্র খুন হয়। তাকে আমি ক্লাসে পড়িয়েছি। মহিউদ্দিন মাসুম

৬০. চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে শাটল ট্রেনের বগিভিত্তিক গ্রুপগুলোর মধ্যে রয়েছে: সিএফসি, ভিএক্স, সিক্সটিনাইন, বাংলার মুখ, একাকার, উল্কা, কনকর্ড, এপিটাফ, দোস্ত, সাম্পান, অলওয়েজ, ককপিট, খাইট্টা খা, ওয়ারিয়র্স, ফাটাফাটি, ইউরেকা, ফাইট ক্লাব, বিজয়, প্রভৃতি।

৬১. এমন একটি শাটলভিত্তিক ব্যান্ডগ্রুপের নাম 'বগিবাজ'।

নামের ওই নিরীহ ছাত্রটির মুখ মনে হলে এখনও কষ্ট পাই। তবে ছাত্র রাজনীতি বন্ধ না হলেও বেশ কয়েকবার এ নিয়ে নাগরিক সমাজে কথা উঠেছে। প্রথমে ১৯৮০-র দশকে জেনারেল এরশাদ ছাত্র রাজনীতি বন্ধের উদ্যোগ নেন। ওই উদ্যোগটি ছিল অসৎ উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। কারণ, নিজ দল সমর্থিত ছাত্র সংগঠন জাতীয় ছাত্র সমাজকে শিক্ষাঙ্গণে দাঁড় করাতে না পেরে উত্তাল সামরিক সরকারবিরোধী আন্দোলন স্তিমিত করার জন্য এরশাদ ওই উদ্যোগ নিয়েছিলেন। এ লক্ষ্যে ১৯৮৭ সালের ১২ ফেব্রুয়ারি শিক্ষাঙ্গণে অস্ত্রের রাজনীতি বন্ধের লক্ষে জাতীয় সংসদে একটি সিদ্ধান্ত প্রস্তাব পাশ করা হয়। তবে ছাত্র রাজনীতি বন্ধ করা সম্ভব হয়নি। পরবর্তীতে বিএনপির নেতৃত্বে চারদলীয় জোট সরকার ক্ষমতায় এলে ২০০২ সালে সরকারি দল থেকে বিরোধী দলকে ছাত্র রাজনীতি বন্ধের প্রস্তাব দেয়া হয়। উল্লেখ্য, ওই সময় সরকারি জোটভুক্ত দুটি বড় দলের ছাত্র সংগঠন যথাক্রমে ছাত্রদল এবং ইসলামী ছাত্র শিবির দুর্বল ছিল না। এমন অবস্থায় সরকারি দলের এ ব্যতিক্রমী প্রস্তাবটি বিরোধীদলীয় নেতা ২০০২ সালের ৪ ফেব্রুয়ারি ছাত্রলীগের বর্ধিত সভায় প্রদত্ত বক্তৃতায় কঠোর ভাষায় প্রত্যাখ্যান করেন। তিনি বলেন, 'যাদের ছাত্রত্ব ছিল না তারা ছাত্র রাজনীতির কি বুঝবে। তারা তো ছাত্র রাজনীতি বন্ধ করতে চাইবেই। তাদের একজন এইট পাস, আরেকজন আই এ পাস, আর একজন রাজপুত্র আসছেন তিনিও আই এ পাসের ওপর যাননি।'[৬২] ফলে চারদলীয় জোট সরকারের ছাত্র রাজনীতি বন্ধের উদ্যোগ ব্যর্থ হয়। এবার ২০১৯ সালে আবরার হত্যার পর বুয়েট সাধারণ শিক্ষার্থীদের আন্দোলনের চাপে ছাত্র রাজনীতি বন্ধের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। বুয়েটের সাধারণ শিক্ষার্থী, শিক্ষক সমিতি ও বুয়েট প্রশাসন এ জন্য প্রশংসার দাবিদার। এখন দেখার বিষয়, অন্য স্বায়ত্তশাসিত বিশ্ববিদ্যালয়গুলো বুয়েটের মত একই রকম দৃষ্টান্ত স্থাপন করে কিনা।

এর আগে বুয়েট ক্যাম্পাসে ২০০২ সালের ৮ জুন ছাত্রদলের দুই গ্রুপের টেন্ডারবাজিকেন্দ্রিক সংঘর্ষে মেধাবী শিক্ষার্থী সাবেকুন নাহার সনির লাশ পড়েছিল। তখনও সুশীল সমাজে ছাত্র রাজনীতি বন্ধ করা নিয়ে আলোচনা উঠেছিল। এ নিয়ে কিছুদিন সরব ছিল প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়া। একই অবস্থা হয়েছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ২০১০ সালে ছাত্রলীগের দু'গ্রুপের দ্বন্দ্বে আবু বকর নিহত হলে। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে ২০০৯ সালে শিবিরের সাধারণ সম্পাদক শরীফুজ্জামান নোমানী, ২০১০ সালে ছাত্রলীগ কর্মী ফারুক হোসেন এবং নসরুল্লা নাসিম, ২০১২ সালে ছাত্রলীগ কর্মী আবদুল্লাহ আল হাসান সোহেল নিহত হলেও একই আলোচনা শুরু হয়েছিল। একই পরিস্থিতি তৈরি হয় চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে ২০১০ সালে মহিউদ্দিন মাসুম, হারুন অর রশিদ কায়সার, আসাদুজ্জামান এবং

৬২. দেখুন, *প্রথম আলো*, ৫ ফেব্রুয়ারি, ২০০২।

২০১২ সালে মুজাহিদুল ইসলাম ও মাসুদ বিন হাবিব এবং আরও পরে ছাত্রলীগ নেতা দিয়াজ ইরফান চৌধুরী নিহত হলে। পরিস্থিতি বদলায়নি সিলেট বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে ২০১১ সালে খায়রুল কবীর ও দীপঙ্কর ঘোষ নিহত হলেও। পরবর্তী বছরগুলোয় নিহতের এ পরিসংখ্যানের সাথে মেডিকেল কলেজ এবং অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্র রাজনীতির দ্বন্দ্বে নিহতদের সংখ্যা যোগ করলে তা হয় আশংকাজনক এবং গভীরভাবে ছাত্র রাজনীতির অস্তিত্ব নিয়ে ভাবনা উদ্রেককারী। এক বেসরকারি পরিসংখ্যানে দেখা যায় গত ৪৫ বছরে দেশের চারটি বড় বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৩২ জন শিক্ষার্থী হত্যাকাণ্ডের শিকার হন।[৬৩] তবে এ সব হত্যাকাণ্ডের বিচার হতে দেখা যায়নি।

এ কথা কেউ অস্বীকার করবেন না যে, ছাত্র রাজনীতির একটি সোনালি অতীত ছিল। তবে তখন ছাত্র রাজনীতিতে নৈতিকতা ছিল। ছাত্র নেতাদের মধ্যে দেশপ্রেম ছিল। তাদের মধ্যে ছাত্রদের স্বার্থ নিয়ে ভাবার ও কাজ করার আবেগ ও আগ্রহ ছিল। সাধারণ মানুষের জন্যও তাদের অন্তরে ভালোবাসা ছিল। বন্যায় বা শীতে বাসায় বাসায় গিয়ে কাপড় সংগ্রহ করে গ্রামে গিয়ে দুস্থদেরকে ছাত্রনেতা-কর্মীরা সে সাহায্য পৌঁছে দিতেন। কিন্তু এখন ছাত্র নেতাদের অত সময় নেই। এখন তারা বড় বড় কাজ নিয়ে ব্যস্ত। বিশ্ববিদ্যালয়ে টেন্ডারবাজি। অন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের মেগা প্রজেক্ট থেকে ৬% চাঁদা (৮৬ কোটি টাকা) দাবি, ভর্তি বাণিজ্য, পদ বেচাকেনার ব্যবসা, আরও নানান বড় বড় কাজে তারা ব্যস্ত। শিক্ষার্থীদের একাডেমিক স্বার্থ দেখার মতো তাদের সময় কই? ছাত্র সংসদ নির্বাচন না হওয়ায় নেতাদের সাধারণ শিক্ষার্থীদের সমর্থনের দরকার হয় না। এ কারণে তারা কথায় কথায় সাধারণ শিক্ষার্থীদের মারধর করতে পারেন। তাদের নির্যাতন করার জন্য আবাসিক হলে টর্চার সেল গঠন করতে পারেন। নিরীহ ছাত্র পিটিয়ে হত্যা করতে পারেন। এ সব দুর্নীতিবাজ ছাত্র নেতাদের সাজা না হওয়ায় সরকারদলীয় নেতা এবং শিক্ষক নেতাদের প্রশ্রয় পেয়ে এরা যা খুশি তাই করতে পারেন।

ছাত্র-শিক্ষকদের অপরাধের বিচার

আমার দীর্ঘ শিক্ষকতা জীবনে দেখেছি যে ছাত্র ও শিক্ষকগণ অপরাধ করলে কদাচিৎ তাদের শাস্তি হয়। বিশেষ করে ছাত্রনেতা ও শিক্ষকনেতাদের অপরাধের বিচারের ঘটনা খুবই কম। তালিকাভুক্ত সন্ত্রাসী ও পেশাদার চাঁদাবাজগণ চাঁদা চাইলে অপরাধ হয়। তাদেরকে গ্রেফতার করা হয়। রিমান্ডে নেয়া হয়। তাদের শাস্তি হয়। একইভাবে যে কোনো ছাত্র সংগঠনের কেন্দ্রিয় নেতাগণ চাঁদা চাইলে তাদেরও দোষী হবার কথা। ছাত্র নেতারা চাঁদাবাজি করলে তাদেরকে বিশেষ

৬৩. দেখুন, ড. কুদরাত-ই-খুদা বাবু, শিক্ষাঙ্গণে খুনের রাজনীতি বন্ধ হবে কবে?', *যুগান্তর*, ২১ অক্টোবর, ২০১৯।

বিবেচনায় ছেড়ে দেবার মতো কোনো আইন বাংলাদেশে নেই। বরং, সাধারণ বিবেচনায় প্রতীয়মান হয়, অশিক্ষিত সন্ত্রাসীদের চাঁদাবাজি করার চেয়ে শিক্ষিত নেতাদের চাঁদাবাজি করা আরও বড় অপরাধ। যদি তাই হয়, তাহলে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পত্রিকার ভাষ্য অনুযায়ী ৮৬ কোটি টাকা চাঁদা দাবিকারীদের শাস্তি কি কেবল প্রাতিষ্ঠানিক বহিষ্কারাদেশে সীমাবদ্ধ থাকবে? তাদের ঘড়বাড়ি সার্চ করে কেন দেখা হবে না যে সেখানে কোনো টাকা রাখার ডিজিটাল ভল্ট আছে কিনা? কেন তাদের ব্যাংক একাউন্ট পরীক্ষা করে দেখা হবে না যে তারা স্বনামে বা বেনামে টাকার পাহাড় সঞ্চয় করেছেন কিনা? পেশাদার চাঁদাবাজ ও ছাত্রনেতা চাঁদাবাজদের অপরাধ কি পৃথক আইনে বিচার করা হবে?

ছাত্রনেতাদের সৎভাবে উপার্জিত হাজার কোটি টাকা থাকলে দোষের হবে না। তবে সে টাকা যদি পদ পদবী কেনাবেচার এবং চাঁদাবাজি-টেন্ডারবাজির টাকা হয়, তাহলে সে অপরাধের শাস্তি কেবল প্রাতিষ্ঠানিক বহিষ্কারাদেশে কেন সীমাবদ্ধ থাকবে? শিক্ষক রাজনীতি আর ছাত্র রাজনীতি মিলেমিশে একাকার হয়ে যাওয়ায় সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলো আজ দুর্নীতি চর্চার আখড়ায় রূপান্তরিত হয়েছে। একজন ভিসি যদি নিয়োগ বাণিজ্য করেন, যদি দুর্নীতি করেন এবং সে দুর্নীতি যদি প্রমাণিত হয়, তাহলে কেন তার শাস্তি কেবল পদ থেকে সরিয়ে দেয়ায় সীমাবদ্ধ থাকবে? এ কাজ করা তো শাস্তির পরিবর্তে তাকে পুরস্কৃত করা। এর ফলে ভবিষ্যতে যারা ভিসি হবেন, তাঁদেরকে দুর্নীতি করতে পরোক্ষভাবে উৎসাহিত করা হয়। কারণ, এমন সিদ্ধান্তে হবু ভিসিগণ ভাববেন, আমরাও দুর্নীতি করে টাকা বানাব। পরে ধরা পড়ার পর আমাদেরকে পদ থেকে সরিয়ে দিলে আমরা বিভাগে যোগ দিয়ে শিক্ষকতা করব। বিভিন্ন সরকারামলে ভিসি হিসেবে দায়িত্বপালনকারী অনেক শিক্ষকের বিরুদ্ধেই দুর্নীতির অভিযোগ আছে। অনেক ছাত্রনেতার বিরুদ্ধে চাঁদাবাজি, টেন্ডারবাজি, পদ কেনাবেচার অভিযোগ আছে। কিন্তু ক'জন ভিসি বা ক'জন ছাত্রনেতার এ কারণে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি হয়েছে? শিক্ষাঙ্গনে চলছে যেন এক বিচারহীনতার সংস্কৃতি। এ প্রক্রিয়া চলমান রাখতে চাইলে সরকারের উচিত হবে ভিসি ও ছাত্রনেতাদের জন্য জাতীয় সংসদে তাদের দুর্নীতি ও চাঁদাবাজির বিচারের জন্য জন্য পৃথক একটি দায়মুক্তি আইন পাস করা।[৬৪]

শিক্ষক রাজনীতি অধিক ক্ষতিকর

বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃতিতে শিক্ষকদের দলীয় রাজনীতির লেজুড়বৃত্তিতে জড়িত হওয়া আমার কাছে বিবেচনাপ্রসূত মনে হয় না। বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক ক্যাম্পাসে তার একাডেমিক স্বার্থকেন্দ্রিক অধিকার নিয়ে দর কষাকষি করার জন্য তাদের

৬৪. প্রাসঙ্গিক আলোচনার জন্য দেখুন, মুহাম্মদ ইয়াহ্ইয়া আখতার, 'আত্মঘাতী ছাত্র রাজনীতি কি বন্ধ হচ্ছে?' *যুগান্তর*, ১৩ অক্টোবর, ২০১৯।

সমিতির মাধ্যমে কাজ করতে পারেন। বিশ্বব্যাপী প্রতিটি সরকারি ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে এ রকম শিক্ষক সমিতি রয়েছে। তবে তারপরও যদি কোনো উচ্চাভিলাষী শিক্ষক সক্রিয়ভাবে রাজনীতি করতে চান, এমপি বা মন্ত্রী হতে চান, তাহলে তো সে ক্ষেত্রে কোনো সাংবিধানিক বাধা নেই। এ রকম শিক্ষকের তো আগে থেকেই শিক্ষকতার পেশায় আসা উচিত নয়। যা হোক, তার পরও যদি কোনো শিক্ষক এ পেশায় আসার পর মনে করেন তিনি ভুল করেছেন, তার রাজনীতির পেশায় যাওয়া উচিত, তিনি শিক্ষকতা ছেড়ে দিয়ে রাজনীতিতে সক্রিয়ভাবে যোগ দিতে পারেন। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকতায় থেকে তিনি ক্যাম্পাসে 'সাদা', 'লাল', 'নীল', 'গোলাপী' প্রভৃতি বর্ণের আবরণে দলীয় রাজনীতি করে একাডেমিক পরিবেশ কলুষিত করবেন, তা তো হতে পারে না। শিক্ষক চাইলে শিক্ষকতা ছেড়ে দিয়ে যে কোনো পছন্দনীয় রাজনৈতিক দলে নাম লেখাতে পারেন। তা না করে শিক্ষক যদি ক্যাম্পাসে দলীয় রাজনীতির লেজুড়বৃত্তি করেন, তাহলে তা একাডেমিক চর্চা ও উৎকর্ষতার সঙ্গে যায় না। আর সবচেয়ে ক্ষতিকর হলো শিক্ষক রাজনীতি এবং ছাত্র রাজনীতির মিশ্রণ। এমন মিশ্রিত রাজনীতি সকল শিক্ষার্থীর প্রতি শিক্ষকের সমান আচরণের অহঙ্কারকে দুর্বল করে দেয়। তার নিরপেক্ষতা ও পেশাদারিত্বকে আঘাত করে। একজন অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতির বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক ও ছাত্রদের চলমান দলীয় রাজনীতি করার সমালোচনা আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তিনি বলেন,

> যেসব শিক্ষক দলীয় রাজনীতিতে জড়িত, তাদের কাছে সবিনয়ে নিবেদন করি, একটু ভেবে দেখুন, সক্রিয় রাজনীতিতে আপনাদের সংশ্লিষ্টতা কি শিক্ষার উপকারে এসেছে, না তাতে রাজনীতির কোনো উপকার হয়েছে? সক্রিয় দলীয় রাজনীতিতে জড়িত ছাত্রছাত্রীদের কাছে নিবেদন করি, জাতির মাহেন্দ্রক্ষণে আপনাদের অবদান ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে, কিন্তু এ মাহেন্দ্রক্ষণ কি অনন্তকাল চালু থাকে?[৬৫]

বিশ্ববিদ্যালয় রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান নয়। এটি একাডেমিক প্রতিষ্ঠান। বিশ্ববিদ্যালয় রাজনীতিবিদ তৈরির ফ্যাক্টরি নয়; মেধাবী গ্রাজুয়েট তৈরির কারখানা। ভুলে গেলে হবে না, উন্নত দেশগুলোর বিশ্ববিদ্যালয়গুলোয় সাংঘর্ষিক দলীয় রাজনীতির চর্চা না থাকলেও তাদের যোগ্য রাজনৈতিক নেতার অভাব হয় না। প্রকট রাজনৈতিক ভাবমূর্তি মুছে দিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়কে তার একাডেমিক চরিত্র ফিরিয়ে দিতে হবে। রাজনীতি বন্ধ করে শিক্ষক ও ছাত্রদের ওপর একাডেমিক চাপ বাড়াতে পারলে

৬৫. দেখুন, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদালয়ের তৃতীয় সমাবর্তন অনুষ্ঠানে প্রদত্ত বিচারপতি মোস্তফা কামালের বক্তৃতা। উল্লেখিত হয়েছে, মুহাম্মদ ইয়াহ্ইয়া আখতার, *সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে দুর্নীতি, স্বরূপ ও প্রতিকার* (ঢাকা: টিআইবি ও এইচডিপিএইচ, ২০০৮), পৃষ্ঠা-৩৪।

কোনো আবরারকে আর প্রাণ দিতে হবে না। বড় সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোয় তদবির ও দলবাজির ওপর ভিত্তি করে ভিসি নিয়োগ দেয়া যাবে না। এমনভাবে ভিসি নিয়োগ দেয়ার অর্থ হলো বঙ্গবন্ধুকে অসম্মান করা। কারণ, ১৯৭৩ সালের বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাদেশ/আইন বঙ্গবন্ধু কর্তৃক প্রদত্ত। এ অধ্যাদেশকে অবজ্ঞা করার অর্থ তাঁকে অসম্মান করা। তবে শিক্ষক সমাজ চাইলে শিক্ষার স্বার্থে এর সংশোধন বা একে যুগোপযোগী করতে পারেন। কিন্তু অধ্যাদেশও থাকবে, আবার একে পদে পদে অমান্য করা হবে, তা হতে পারে না। প্রতি বছর যদি বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির নির্বাচন হতে পারে, তাহলে কেন নিয়মিত ছাত্র সংসদ নির্বাচন হবে না? আমি মনে করি, নিয়মিত ছাত্র সংসদ নির্বাচন হলে ছাত্রনেতারা শিক্ষার্থীবান্ধব হবেন। তখন তাঁরা দলীয় লেজুড়বৃত্তির রাজনীতি বন্ধ করে শিক্ষার্থীদের সমর্থন পেতে শিক্ষার্থীবান্ধব একাডেমিক স্বার্থসংশ্লিষ্ট কর্মসূচি গ্রহণ করবেন। সাধারণ শিক্ষার্থীদের তখন তাঁরা টর্চার সেলে না নিয়ে রেস্টুরেন্টে নিয়ে শিঙ্গাড়া খাওয়াবেন। সাধারণ শিক্ষার্থীদের সমর্থন নিয়ে জনপ্রিয় হতে তাঁরা প্রতিযোগিতা করে তাদের সঙ্গে ভালো ব্যবহার করবেন। ছাত্র নেতাগণ তখন শিক্ষার্থীদের স্বার্থকেন্দ্রিক রাজনীতি করবেন। নিজেদের আখের গোছাতে চাঁদাবাজি, টেন্ডারবাজি, দলীয় রাজনীতির লেজুড়বৃত্তি আর পদ কেনাবেচার ব্যবসা করবেন না। তবে সবচেয়ে ভালো হয় ২০১৯ সালের অক্টোবরে বুয়েটের মতো সকল বিশ্ববিদ্যালয়ে দলীয় রাজনীতির লেজুড়বৃত্তিভিত্তিক আত্মঘাতী রাজনীতি আনুষ্ঠানিকভাবে বন্ধ করলে। তবে সরকার যেহেতু ছাত্র রাজনীতি টিকিয়ে রাখার পক্ষে, সে জন্য হয়ত ছাত্র রাজনীতি বন্ধ হবে না। আমি মনে করি, শিক্ষক রাজনীতির ব্যাপারে সরকার সব সময় দ্বিমুখী ভূমিকা পালন করে। সরকার মুখে বলে, শিক্ষকদের দলীয় রাজনীতি করা উচিত নয়। তাদের লেখাপড়া ও গবেষণা করা উচিত। কিন্তু যখন কোনো বড় সরকারি পদে ডেপুটেশনে কোনো শিক্ষককে নিয়োগ দেবার প্রশ্ন আসে, তখন সরকার ভালো করে ম্যাগনিফায়িং গ্লাস দিয়ে যাচাই করে দেখে যে ওই শিক্ষক বাস্তবে সরকারদলীয় নীতি আদর্শের অনুসারী কিনা। সরকারের এমন দ্বিমুখী আচরণে শিক্ষকগণ দলীয় রাজনীতি করতে উৎসাহ পান।

আমার মনে হয়, বড় চারটি সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক রাজনীতি বন্ধ করতে হলে ১৯৭৩ সালের সরকারি বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাদেশ/আইন পরিবর্তন করতে হবে। কারণ, এ আইন এ সব বিশ্ববিদ্যালয়ে ভিসি, ডিন, সিনেট ও সিন্ডিকেট সদস্যসহ অনেক গুরুত্বপূর্ণ পদে নির্বাচনের ব্যবস্থা রেখেছে। আর এ সব নির্বাচনী মনোনয়ন দলীয় পরিচয়ের ওপর ভিত্তি করে দেয়া হয়। একাডেমিক যোগ্যতাকে এখানে প্রাধান্য দেয়া হয় না। এর ফলে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকদের একাডেমিক পারফরম্যান্স দুর্বল হয়ে পড়ে। তাদেরকে দলীয় স্বার্থের দিকে খেয়াল রেখে কথাবার্তা বলতে হয়। তবে শিক্ষক রাজনীতি জিইয়ে থাকার জন্য বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকদেরকে আমি যতটা দায়ী করব, তার চেয়ে বেশি দায়ী করব সরকারকে। এর কারণ আমি আগেই উল্লেখ করেছি।

কাজেই ১৯৭৩ সালের সরকারি বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাদেশকে যুগোপযোগী না করে সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের দলীয় রাজনীতির লেজুড়বৃত্তি চর্চা কমানো যাবে না। তাঁদের মধ্যে একাডেমিক প্রতিযোগিতা বাড়ানো যাবে না। কমানো যাবে না পদ-পদবি ও ভিসি-প্রোভিসি হবার জন্য শিক্ষকদের মধ্যে তদবিরের দৌড়াদৌড়ি ও এজন্য একজন অন্যজনের দোষত্রুটি তুলে ধরে নিজের অবস্থানকে পোক্ত করার অশুভ প্রতিযোগিতা। সরকার অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সিনেট নির্বাচনকে অবজ্ঞা করে তদবিরের উপর ভিত্তি করে দলীয় শিক্ষককে ভিসি নিয়োগ দেয়। এ ক্ষেত্রে নিয়ম-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করতে সরকার, শিক্ষা মন্ত্রণালয় বা ইউজিসির কোনো মাথা ব্যথা আছে বলে মনে হয় না। এমন লোককেও সরকার ভিসি নিয়োগ দেন, যিনি ভাইস চ্যান্সেলর হবার চেয়ে সরকারি দলের যুব সংগঠনের সভাপতি হওয়াকে শ্রেষ্ঠতর মনে করেন।[৬৬]

সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে শিক্ষকগণ তাদের একাডেমিক স্বার্থ দেখভালের রাজনীতি করেন না। তাঁরা বর্ণের আবরণে জাতীয় দলীয় রাজনীতি চর্চা করেন। লেখাপড়া ও গবেষণায় মনোযোগী না হয়ে এদের অনেককে ক্ষমতাসীন দলের মুখপত্রের মতো ভূমিকা পালন করতে দেখা যায়। এর নেতিবাচক প্রভাব পড়ে শ্রেণিকক্ষে, গবেষণা প্রকাশনা, শিক্ষার মানোন্নয়ন, সেশন জট নিরসন এবং গ্রাজুয়েটদের মানোন্নয়নে। কাজেই শিক্ষকদের মধ্যে একাডেমিক চর্চা ও গবেষণার প্রবণতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে অকার্যকর ও পদে পদে লজ্জিত ১৯৭৩ সালের সরকারি বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাদেশ/আইন যুগোপযোগী ও সময়োপযোগী করা সময়ের দাবি। জাতির প্রয়োজনে সংবিধানকে যদি ১৭ বার পরিবর্তন করা সম্ভব হয়, তাহলে শিক্ষাঙ্গন ও শিক্ষকতায় পেশাদারিত্ব সৃষ্টি ও শিক্ষার মানোন্নয়নে ১৯৭৩ সালের সরকারি বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাদেশ/আইনকে কেন পরিবর্তন করে সময়োপযোগী করা যাবে না সে বিষয়টি বোধগম্য নয়। এ সব বিষয় নিয়ে আমি অনেক লেখালেখি করেছি। সরকার, শিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং ইউজিসিকে শিক্ষার মানোন্নয়নের স্বার্থে এ বিষয়টি নিয়ে শিক্ষাপ্রেমী সম্মানিত শিক্ষকদের সঙ্গে সম্মিলিতভাবে বসে ভাবতে অনুরোধ করলেও কাজের কাজ হয়নি।[৬৭]

শিক্ষার্থীরা এখন হারাতে পারে না

উচ্চ শিক্ষাঙ্গণে সম্প্রতি শিক্ষক-শিক্ষার্থী সম্পর্কে নতুনত্ব যুক্ত হয়েছে। এ নতুনত্ব এনেছে প্রযুক্তির উন্নয়ন। স্বাধীনতার পর বিশ্ববিদ্যালয়গুলো থেকে শিক্ষার্থীরা মাস্টার্স ডিগ্রি করে বিদায় নিয়ে চলে যাওয়ার পর শিক্ষকদের সঙ্গে তাদের কদাচিৎ

---

৬৬. ২০১৯ সালে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য মহোদয় এমন বক্তব্য দেন।

৬৭. প্রাসঙ্গিক আলোচনার জন্য দেখুন, মুহাম্মদ ইয়াহ্ইয়া আখতার, 'শিক্ষক রাজনীতি হলো যত নষ্টের গোড়া', *যুগান্তর*, ১০ নভেম্বর, ২০১৯।

দেখা সাক্ষাৎ হত। হয়ত কোনো গেট টুগেদার বা বিয়ের অনুষ্ঠানে দেখা হত অনেক বছর পর। দেশের বিভিন্ন জেলা থেকে আগত শিক্ষার্থীদের মধ্যে বন্ধুত্ব গড়ে উঠলেও বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাস করে চলে যাবার পর সহপাঠীরাও আর নিজেদের মধ্যে যোগাযোগ রাখতে পারত না। যেমন আমি যাদের সঙ্গে স্কুল, কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়েছি, তাদের মাত্র দু'চারজনের সঙ্গে আমার যোগাযোগ আছে। বাকিরা সব হারিয়ে গেছে। তাদের কে কোথায় আছে, কেমন আছে জানি না। তবে এখন যারা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাস করে যায়, তারা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের কারণে সহপাঠীদের কাছ থেকে যেমন হারায় না, তেমনি হারায় না তাদের শিক্ষকদের কাছ থেকেও। ফেসবুকসহ অন্য যেসব সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম আছে তার মাধ্যমে তারা বন্ধুদের সঙ্গে, সহপাঠীদর সঙ্গে, শিক্ষকদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে পারে। পরস্পরের সুখ দুঃখের খোঁজ খবর নিতে পারে। একে অপরের সহায়তায় এগিয়ে আসতে পারে। এ কারণে দূরে থেকেও শিক্ষার্থীরা সহপাঠীদের সঙ্গে বন্ধুত্বের বন্ধন অটুট রাখতে পারে। শিক্ষকদের সঙ্গেও তারা সম্পর্কিত থাকতে পারে।

আমি নিজেও ফেসবুক ব্যবহার করে শিক্ষার্থীদের সঙ্গে সম্পর্কিত থাকি। হয়ত আমি সব সময় তাদের জিজ্ঞাসার জবাব দিতে পারি না। কারণ, আমি ফেসবুকে খুব বেশি সময় দিতে পারি না। তবে ফেসবুক ব্যবহারের ব্যাপারে কয়েকটি কাজ আমি নিয়মিত করে থাকি। যেহেতু আমি একজন কলামিস্ট, সে কারণে আমার কোনো লেখা প্রকাশিত হলে আমি সে লেখাটি ওইদিনই ফেসবুকে সবার পড়ার জন্য শেয়ার করি। এর ফলে আমার বন্ধু-বান্ধব ও শিক্ষার্থীরা এ লেখা পড়তে পারেন। আলোচনা ও সমালোচনা করতে পারেন। এতে আমার উপকার হয়েছে। কারণ, যাঁরা আমার লেখার সমালোচনা করেছেন, আমি তাঁদের যৌক্তিক সমালোচনাগুলো মনোযোগ সহকারে পাঠ করেছি এবং আমার কোনো ভুল হলে তা সংশোধন করে নিয়েছি। তবে এমন সমালোচনা খুব কমই পাওয়া গেছে। কেউ আমার লেখার সমালোচনা করলে আমি কখনোই তার ওপর বিরক্ত হইনি। বরং কেউ অপ্রাসঙ্গিক সমালোচনা করলে অনেক সময় তাকে আমার লেখার যৌক্তিকতা বুঝিয়ে দিয়েছি।

শিক্ষার্থীরা এখন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহার করে তাদের ভালোমন্দ শিক্ষকদেরকে জানান। যারা বিদেশে আছে তারাও তাদের শিক্ষকদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখে এবং অনেক সময় ফোন করে। আমি নিজে ভুলে গেলেও আমার অনেক ছাত্রছাত্রী আমাকে ভোলে না। তারা দাওয়াত দেয়, অনেক সময় গিফট পাঠায়। এটা তাদের শিক্ষকের প্রতি ভালোবাসার বহিঃপ্রকাশ। আমেরিকার নিউইয়র্কে বসবাসকারী এ রকম একজন ছাত্র সেহেল রানা। সে পাঁচ ছয় বছর পর একবার বাংলাদেশে আসে। চট্টগ্রামে এলে সে তার সহপাঠীদের সঙ্গে একত্রিত হয়ে গেট টুগেদার করে গল্পগুজব করে। ২০১৯ সালের অক্টোবর মাসের মাঝামাঝি আমি সোহেলের কাছ থেকে একটি ফোনকল পাই। সোহেল বহু বছর বিদেশে থেকে ভালোই ভদ্রতা শিখেছে।

: স্যার আমি আপনার ছাত্র। একুশতম ব্যাচের সোহেল রানা। আমেরিকার নিউইয়র্কে থাকি। আপনি কেমন আছেন স্যার?

: ভালো আছি বাবা। তুমি কি এখন দেশে?

: জ্বি স্যার, আমি কয়েকদিন হলো দেশে এসেছি। স্যার আমি চার পাঁচ বছর পর একবার দেশে আসি। দেশে এলে বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে একত্রে মিলিত হই। গল্পগুজব ও আড্ডার ব্যবস্থা করি।

: ভালো। খুব ভালো। জেনে খুশি হলাম। তোমরা ভালো আছো জানলে ভালো লাগে।

: স্যার আপনি আমাদের পড়িয়েছেন। আপনাকে ভুলতে পারিনি। একটা বিশেষ কারণে ফোন করেছি স্যার।

: বল সোহেল। কি করতে পারি তোমার জন্য।

: স্যার ২১ তারিখে শনিবার দুপুরে আমরা লালখান বাজারে পিটস্টপ রেস্টুরেন্টে বন্ধুবান্ধবেরা একত্রিত হব। একটু আড্ডা ও গল্পগুজবের ব্যবস্থা করেছি। আপনি যদি একটু সময় দিতেন আপনাকে সালাম করতাম স্যার।

ছাত্র বিদেশে থাকে। দীর্ঘদিন পর দেশে এসেছে। অনেক ভদ্রতার সঙ্গে দাওয়াত করছে। না বলি কি করে। রাজি হলাম। নির্দিষ্ট সময়ে হাজির হলাম। আরও ছয় সাতজন শিক্ষক আসলেন। আমাদেরকে ফুল দিয়ে তারা সম্মানিত করল। তারা প্রায় বিশজনের মতো তাদের সহপাঠীদের জড়ো করতে পেরেছিল। এদের মধ্যে নুরুল হক, শম্পা এবং আরও কয়েকজনকে আমার ভালোই মনে আছে। এরা সবাই প্রতিষ্ঠিত। আমি বাসা থেকে বের হবার সময় সোহেলের জন্য একটি বিভাগীয় ব্রোসার নিয়ে গেলাম। বললাম, এটি তোমার জন্য এনেছি। পরে পড়লে বিভাগীয় সব শিক্ষকবৃন্দ এবং তাদের কাজকর্ম সম্পর্কে তোমার ধারণা হবে। তারপর আর কি। আড্ডা আর গালগল্প। এর মধ্যে এরা আমাদের সঙ্গে ছবি তুললো (ছবির জন্য দেখুন পরিশিষ্ট- ৯:২)। আমাদের সবার খোঁজখবর নিলো। আমরাও তাদের সবার খোঁজখবর নিলাম। সবকিছু মিলিয়ে ঘন্টাতিনেক আনন্দময় সময় কাটিয়ে ফিরে এলাম।

লেখাপড়ার সংস্কৃতিতে পরিবর্তন

আমার স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় জীবনকালে আমি লেখাপড়া করতাম। কিন্তু সাম্প্রতিক সময়ে শিক্ষার্থীরা লেখাপড়ার চেয়ে পড়ালেখা করে বেশি। ফটোকপি কালচার শিক্ষার্থীদের মধ্যে জনপ্রিয় হবার পর তাদের মধ্যে নিজে লিখে নোট তৈরি করার প্রবণতা কমে গেছে। আর অ্যানড্রয়েড ফোন আসার পর শিক্ষার্থীদের মধ্যে বই কেনার এবং পড়ার প্রবণতাও হ্রাস পেয়েছে। এখন শিক্ষার্থীরা পড়ার চেয়ে দেখে বেশি। নিজে বই পড়ে লাইব্রেরি ওয়ার্ক করে নোট তৈরি করলে হাতের লেখার চর্চা হত। ফটোকপি মেশিনের সৌজন্যে এখন লেখার চর্চা কমে গেছে। সে কারণে এখন আমাদের পরীক্ষার খাতা দেখতে কষ্ট হয়। কারণ,

অধিকাংশ পরীক্ষার্থীর হাতের লেখা খারাপ। ক্লাস উপস্থিতি এবং হোমওয়ার্ক করে ক্লাসে আসার ব্যাপারেও শিক্ষার্থীদের মধ্যে পরিবর্তন এসেছে। ১৯৯০-এর দশকে বা তার পরের দশকেও ক্লাসে কোনো নতুন বিষয় পড়াবার আগে যদি কোনো রেফারেন্স দিয়ে পড়ে আসতে বলতাম, তাহলে অন্তত ১৪০ জনের মধ্যে ক্লাসে ৫০-৬০ জন উপস্থিত থাকলে অন্ততপক্ষে ২-৩ জন পড়ে আসতো। কিন্তু সম্প্রতি এ রকম রেফারেন্স দিলে শিক্ষার্থীরা একজনও পড়ে আসে না। ক্লাসের প্রস্তুতি এবং পড়াকে শিক্ষার্থীরা মোটেও গুরুত্বের সঙ্গে নিচ্ছে না। তাদের অনেকে ক্লাস না করেও বন্ধুর কাছ থেকে নোট ফটোকপি করে পরীক্ষায় পাস করে যায়। ক্লাস উপস্থিতির ওপর ১০% নম্বর দেয়ার বিধান চালু করেও আমার বিভাগের শিক্ষার্থীদের ক্লাস উপস্থিতি বাড়াতে পারিনি। অবশ্য এ জন্য কেবল শিক্ষার্থীদের দোষ দেয়া যায় না। একটিও ক্লাস না করে যদি তারা পরীক্ষা দিতে পারে, তাহলে তারা ক্লাস করার ব্যাপারে মনোযোগী হবে কেন? তা ছাড়া সম্মানিত শিক্ষকদের সবার দায়িত্বশীলতা এক রকম নয়। অনেক সময় শিক্ষার্থীরা অনেক দূর থেকে ক্লাস করতে এসে যদি দেখে, তার রুটিনে যে ৫টি ক্লাস হবার কথা ছিল, তার ৩টি হয়েছে কিন্তু বাকি দুটি হয়নি, তাহলে সে ক্লাসের ব্যাপারে আগ্রহ হারিয়ে ফেলে। এ বিষয়ে এ গ্রন্থের ষষ্ঠ অধ্যায়ে আমি আলোকপাত করেছি।

ঝুপড়ির আড্ডা

বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার্থীগণ কেবল লেখাপড়া করে জ্ঞান অর্জন করে না। তারা বিভিন্ন মাধ্যম থেকে জ্ঞান অর্জন করে। শ্রেণিকক্ষের বাইরে শিক্ষকদের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করে তারা অনেক কিছু জানতে পারে। আরও বেশি শিখতে পারে বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে আড্ডায় বসে। এ আড্ডা হয় সহপাঠীদের সঙ্গে, অন্য বিভাগের বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে, শাটল ট্রেনে, খেলার মাঠে, ছাত্রাবাসে এবং বিভিন্ন দোকানের ঝুপড়িতে। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রতিটি একাডেমিক ভবনের আশেপাশে রয়েছে ঝুপড়ি। এসব ঝুপড়িতে পাওয়া যায়, চা, শিঙ্গাড়া, চিপস থেকে টুকিটাকি খাবার সামগ্রী, কাগজ, কলম, মোবাইলে টাকা চার্জ করার সুবিধাসহ আরো কিছু সুবিধা। তবে ঝুপড়ির মূল আকর্ষণ হচ্ছে আড্ডা। এ আড্ডা থেকে শিক্ষার্থীরা অনেক কিছু জানতে পারে। শিক্ষার্থীদের সঙ্গে আলাপ করে জানা যায়, ঝুপড়ির আড্ডার কোনো বিশেষ বিষয়বস্তু নেই। এখানে দেশ বিদেশের রাজনীতি, ফ্যাশন, সাহিত্য থেকে শুরু করে ক্লাসের পাঠ্যক্রম, টিউটোরিয়াল ক্লাসের বিষয়বস্তু পর্যন্ত যে যা খুশি আলোচনা করতে পারে। কেবল আলোচনা নয়, এর সঙ্গে চলে টেবিল চাপড়ে সম্মিলিত কণ্ঠের গান। গলায় সুর না থাকলে কোনো অসুবিধা নেই। শব্দ থাকলেই হলো। গানের বিষয়বস্তু নির্বাচনেও নেই কোনো নিয়ম। যার যা খুশি তাই গাইতে পারে। প্রেম ও বিরহের গান থেকে শুরু করে নজরুল, রবীন্দ্র, লালন, বা ব্যান্ডের গানও চলে একাধারে। আবার অনেক সময় বিভিন্ন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বিষয় নিয়ে হয় সিরিয়াস আলোচনা। ওই

আলোচনায় সবাই শ্রোতা, সবাই বক্তা। আড্ডাবাজদের বিষয়বস্তুর ওপর দখল থাক বা না থাক, বিশেষজ্ঞ মতামত দিতে সব অংশগ্রহণকারী সিদ্ধহস্ত। আবার দিনের ঝুপড়ির আড্ডার সঙ্গে রাতের ঝুপড়ির আড্ডার বিষয়বস্তুতে কিছুটা পার্থক্য থাকে। ক্লাস চলাকালীন দিনে সকালের আড্ডার বিষয়বস্তুতে অধিকাংশ সময় ক্লাস, পরীক্ষা, নোট, সাজেশন, টিউটোরিয়াল প্রভৃতি বিষয়বস্তু স্থান পায়। তবে বিকেলে ও রাতের আড্ডায় এ সব বিষয় কমই স্থান পায়। বিকেলের আড্ডার বিষয়বস্তুতে রাজনীতি, প্রেম ও রোমান্টিতা প্রায়শ আলোচিত বিষয়। সন্ধ্যার পরের আড্ডাগুলোতে অনেক সময় সিগারেট এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে মাদক সেবনের খবরও পাওয়া যায়। তবে সতর্ক শিক্ষার্থীরা আড্ডা থেকে অনেক কিছু জানতে ও শিখতে পারে। এতে তাদের সাধারণ জ্ঞানের আওতা বাড়ে (ঝুপড়ির আড্ডার ছবির জন্য দেখুন পরিশিষ্ট- ৯:৩)।

ক্যাম্পাসের সৌন্দর্যের স্বরূপ

চার দশক চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে কাজ করে আমি আমার শিক্ষকতা জীবন উপভোগ করেছি। শহুরে কোলাহল থেকে ২২ কিলোমিটার দূরে ১ হাজার ৭৫৩ একর পাহাড়ি জমির ওপর প্রতিষ্ঠিত এ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়েছি। বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসটিকে প্রকৃতি যেন তার নিজের সবটুকু সৌন্দর্য উজাড় করে সাজিয়েছে। ছোট ছোট সবুজে ঘেরা টিলা পাহাড়, নাম না জানা হাজার রকমের গাছপালা, ঝর্ণা, ঝুলন্ত সেতু, জাদুঘর, সুনামি গার্ডেন, শহীদ মিনার, বুদ্ধিজীবী চত্বর, মুক্তমঞ্চ, সুবিশাল মাঠ, মায়া হরিন, সজারু, শিয়াল, বেজি, বানর, সাপসহ নানা প্রজাতির প্রাণী, স্বাধীনতা স্মৃতি ম্যুরাল, স্মরণ ভাস্কর্য, জয়বাংলা ভাস্কর্য, চালন্দা গিরিপথ, ঝুপড়ি, কাটা পাহাড়ের মাঝ দিয়ে পিচঢালা পথ, নির্মল বাতাস আর শাটল ট্রেনযাত্রার মায়াবী আকর্ষণ এ বিশ্ববিদ্যালয়কে অপরূপ সৌন্দর্যমণ্ডিত করেছে। শাটল ট্রেনটি এ বিশ্ববিদ্যালয়ের এক অনন্য বৈশিষ্ট্য। শাটল ট্রেন এসে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় স্টেশনে থামলে কাটাপাহাড়ের মধ্য দিয়ে যখন বন্যার মতো শিক্ষার্থীদের ঢল প্রবাহিত হয় সে দৃশ্য দেখার মতো।

ক্লাস চলাকালীন ক্যাম্পাসটি থাকে শিক্ষার্থীদের কলকাকলীমুখরিত। ক্লাস, গল্প, সেমিনার লাইব্রেরিতে লেখাপড়া আর আড্ডাবাজিতে মেতে থাকে শিক্ষার্থীরা। শিক্ষকরাও কাটান ব্যস্ত সময়। এ সময় ক্যাম্পাসের এক চিত্র। আবার বিকেল থেকে রাত আটটা পর্যন্ত ক্যাম্পাস ভিন্ন রূপ ধারণ করে। তখন ছেলেমেয়েরা জুটিতে জুটিতে ঘুরে বেড়ায়। দল বেঁধে ঘুরে বেড়ায়। শহীদ মিনার চত্বর, মেয়েদের হলের সামনে, নিরিবিলি জায়গায়, বিশ্ববিদ্যালয় খেলার মাঠ, হলগুলোর মাঠের আশপাশ, ছেলেমেয়েদের জুটিতে বা দলবেধে ঘোরার বিষয়টি বিকেলের ক্যাম্পাসে এক সাধারণ চিত্র। এসব জুটির মধ্যে আবার সহজাতভাবে গড়ে ওঠে বন্ধুত্ব ও ক্ষেত্রেবিশেষে প্রেমের সম্পর্ক। চলে মন দেয়া নেয়া। তবে

অ্যাফেয়ার বা প্রেমের সম্পর্ক গড়ে তোলার ক্ষেত্রে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার্থীরা অন্য পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর শিক্ষার্থীদের তুলনায় পিছিয়ে আছে বলে পরিসংখ্যানে প্রতীয়মান। কতিপয় পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের ওপর সম্পাদিত এক জরিপে দেখানো হয়েছে, প্রেমের সম্পর্ক গড়ার ক্ষেত্রে দেশে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা সবচেয়ে এগিয়ে রয়েছে। আর প্রেমবঞ্চিত শিক্ষার্থীর সংখ্যা সবচেয়ে বেশি চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে।[৬৮]

প্রেমিক জুটি আর রাজনৈতিক কর্মীদের আড্ডা বাদ দিলে বিকেলের ক্যাম্পাসে আরেক রকম জুটির অস্তিত্ব লক্ষণীয়। এটা হলো মাদকসেবীদের গ্রুপ। এরাও দলে দুই থেকে চারজন থাকে। এদের সংখ্যা কম। চলাফেরা অন্যরকম। বিশেষ বিশেষ স্পট থেকে এরা মাদক সংগ্রহ করে। তবে তারা তা রাতে হলেই সেবন করে বেশি। এর মধ্যে রাজনৈতিক নেতা কর্মীদের সংখ্যা উল্লেখযোগ্য হলেও সাধারণ শিক্ষার্থীও থাকে। আমার শিক্ষকতা জীবনে অনেক বিপথগামী শিক্ষার্থীকে কাউন্সেলিং করার সুযোগ হয়েছে। অভিভাবকসুলভ ব্যবহারের মায়ায় জড়িয়ে তাদের দু'চারজনকে যে স্বাভাবিক জীবনে ফেরাতে পারিনি এমন নয়। আমি যেসব মাদকসেবী শিক্ষার্থীর সঙ্গে আলাপ করার সুযোগ পেয়েছি তাদের প্রত্যেকেই অত্যন্ত ভদ্র ও বিনয়ী। আমি তাদেরকে জোর করে চা শিঙ্গাড়া খাইয়েছি। তারপর বিভিন্ন কলাকৌশলে তাদেরকে সুপথে আনতে চেষ্টা করলেও সবক্ষেত্রে সফল হতে পারিনি। সবকিছু মিলে বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতা জীবন আমার কাছে উপভোগ্য মনে হয়েছে। সব সময় তরুণ, উচ্ছল, স্বপ্নবাজ ও সম্ভাবনাময় শিক্ষার্থীদের সঙ্গে সময় কাটাবার সুযোগ পেয়েছি। অন্য কোনো পেশায় থাকলে আমি এমন সুযোগ ও আনন্দ পেতাম না।

ক্যাম্পাস সংস্কৃতিতে পরিবর্তন

আমি আমার শৈশব থেকে শুরু করে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার্থীজীবন পর্যন্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে যে রকম অনুষ্ঠান হতে দেখেছি তা শিক্ষকজীবনের শেষপ্রান্তে এসে ক্রমান্বয়ে পরিবর্তিত হতে দেখছি। ধর্মীয় অনুষ্ঠানগুলোর মধ্যে আশৈশব দেখেছি সনাতন ধর্মাবলম্বী শিক্ষার্থীদেরকে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বিদ্যাদেবী হিসেবে সরস্বতী পূজা উদ্‌যাপন করতে। স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়সহ সব রকম শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এ পূজা উৎযাপিত হয়েছে এবং এখনও তা হয়। কিন্তু এক পর্যায়ে মঙ্গল শোভাযাত্রা এবং ২০১২-২০১৩ সাল থেকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে চারুকলায় শুরু

৬৮. এ বেসরকারি পরিসংখ্যান অনুযায়ী চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে ৭০%, খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ে ৫৯%, রাজশাহী বিশ্বিবিদ্যারয়ে ৫৮, জগন্নাথ ৪৫, ঢাকা ৪৫ এবং জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে ২৭% শিক্ষার্থী প্রেমবঞ্চিত। দেখুন, *চিটাগাং ইউনিভার্সিটি নিউজ*, ১৪ ফেব্রুয়ারি, ২০১৫।

হয় হোলি খেলা। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় চারুকলা ইন্সিটিটিউট থেকে প্রথমে ১৯৮৯ সালে বাংলা বর্ষবরণ উপলক্ষে মঙ্গল শোভাযাত্রার সূচনা হয়। তবে তখন এর নাম ছিল বর্ষবরণ আনন্দ শোভাযাত্রা। পরবর্তীতে ১৯৯৬ সালে এর নাম করা হয় মঙ্গল শোভাযাত্রা।[৬৯] এ শোভাযাত্রায় পাপেট, বাঘ, হাতি, কুমির, ময়ুর, ঘোড়া, লক্ষী প্যাঁচা, কুমির, পাখি, পুতুল ও নানা রকমের মুখোশসজ্জিত হয়ে রঙীন পোশাক পরিধান করে সেজেগুজে শিক্ষার্থীরা অংশগ্রহণ করে। আনন্দ শোভাযাত্রাকে কেন মঙ্গল শোভাযাত্রা নামকরণ করা হলো সে বিষয়ে ভাবার সুযোগ আছে। তবে ১৯৮৯ সালে শুরু হওয়া এ শোভাযাত্রা এখনও চলমান আছে (মঙ্গল শোভাযাত্রার ছবির জন্য দেখুন পরিশিষ্ট-৯:৪)। তবে আবহমান থেকে চলমান খেলা, মেলা বা নবান্ন উৎসবকে যেভাবে হাজার বছরের সংস্কৃতি বলা যায়, ১৯৮৯ সাল থেকে প্রচলিত একটি শোভাযাত্রাকে কি হাজার বছরের সংস্কৃতির পর্যায়ে ফেলা যায় কিনা সে বিষয়টি নৃবিজ্ঞানী ও সমাজতাত্ত্বিকগণ ভালো বলতে পারবেন।

আবার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বিদ্যাদেবী সরস্বতীর পূজা হলেও আমি আমার শিক্ষার্থীজীবনে এ দেশের কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে হোলি খেলার প্রচলন দেখিনি। উত্তর ভারতের হোলি পশ্চিমবঙ্গের অনেক জায়গায় দোল পূজা নামে পরিচিত সনাতন এবং বৈষ্ণব ধর্মাবলম্বীদের অন্যতম ধর্মীয় উৎসব কিভাবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলায় প্রচলিত হলো সে বিষয়ে সমাজবিজ্ঞানীরা ব্যাখ্যা দিতে পারবেন। ১৯৯১ সালে চারুকলার কিছু শিক্ষার্থী যে বসন্ত উৎসব উদযাপন করে, তা পরবর্তীতে ১৯৯৩ সালে হোলি হিসেবে পালিত হওয়া শুরু হয়। অবশ্য ভারতে শান্তি নিকেতনে হোলি বা দোল উৎসবকে বসন্ত উৎসব হিসেবে পালন করা হয়। পরবর্তীতে চারুকলায় এ উৎসব জাঁকজমকভাবে পালিত হতে থাকে এবং বর্তমানে তা অন্যত্রও পালন শুরু হয়। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এ উৎসব পালনের পেছনে বাংলাদেশি নারী ও যুব মানসের ওপর ভারতীয় স্যাটেলাইট বাংলা ও হিন্দি চ্যানেলগুলোর প্রভাবও কিছুটা কাজ করেছে বলে অনেকে মনে করেন (চারুকলায় উদ্‌যাপিত বসন্ত ও হোলি উৎসবের ছবির জন্য দেখুন পরিশিষ্ট- ৯:৫)।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্রছাত্রীদর মধ্যে অ্যাফেয়ার বা প্রেমের সম্পর্ক গড়ে ওঠা প্রসঙ্গ না হলেও এ বিষয়টির মধ্যে যে গোপনীয়তার ভাব ছিল তা ক্রমশ হ্রাস পেতে থাকে। ১৯৯০-এর দশক থেকে বাংলাদেশে ১৪ ফেব্রুয়ারি তারিখে বিশ্বব্যাপী পালিত 'ভ্যালেন্টাইন ডে' বা বিশ্ব ভালোবাসা দিবস উদ্‌যাপিত হওয়া শুরু হলে শহর এলাকার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে, বিশেষ করে বড় সরকারি ও বেসরকারি বিশ্বদ্যিালয়গুলোতে বিশ্ব ভালোবাসা দিবস পালন শুরু হয়। ভারতে ২০০৩ সালে এ অনুষ্ঠান উদ্‌যাপন বাধাপ্রাপ্ত হলেও ক্রমান্বয়ে এর প্রচলন ছড়িয়ে পড়ে। ওই বছর ১৩ ফেব্রুয়ারি ভালোবাসা দিবসকে 'খ্রিস্টান সংস্কৃতির অংশ'

৬৯. দেখুন, 'বাঙালির বর্ষবরণ মিলন মেলায়', দৈনিক *আজকের কাগজ*, ১৬ এপ্রিল, ১৯৯৬।

হিসাবে প্রচার করে শিবসেনা সদস্যরা ভ্যালেন্টাইন কার্ড বিক্রয় করায় নয়া দিল্লীর দুটি দোকান ভেঙ্গে দিয়ে ভারতবাসীকে এ দিবস পালন না করতে আহ্বান জানিয়েছিল।[৭০] ঢাকায় সংস্কৃতি ফোরাম ২০০২ সালে 'অকৃত্রিম ভালোবাসার জন্য আনুষ্ঠানিকতার প্রয়োজন নেই' থিম সংবলিত পোস্টার প্রকাশ করেছিল। ওই বছর জাতীয় মসজিদের খতিব মহোদয় 'মুসলমানদের অনুষ্ঠান নয়' ব্যাখ্যাসহ সমালোচনা করে ভালোবাসা দিবস পালন থেকে দেশবাসীকে রক্ষার জন্য মোনাজাত করেছিলেন। তবে ক্রমান্বয়ে এ অনুষ্ঠান শহুরে যুব সম্প্রদায়, বিশেষ করে শিক্ষার্থীদের মাঝে পালিত হয়। এখন বাংলাদেশে এ অনুষ্ঠান গণমাধ্যমেও উদ্‌যাপিত হয়। বাংলাদেশের শহরাঞ্চলের বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসগুলো এ অনুষ্ঠানের দিন বর্ণিল সাজে সজ্জিত হয়। তবে এ অনুষ্ঠান পরিকল্পনায় গঠনমূলক পরিকল্পনার অভাব থাকলেও ক্রমান্বয়ে অনুষ্ঠানটি বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার্থীদের মধ্যে গ্রহণযোগ্যতা পায়। ক্যাম্পাসে এ দিবস ঘিরে, বিশেষ করে নারী শিক্ষার্থীরা বর্ণিল সাজে সজ্জিত হয় এবং ফুলের দোকানে বিক্রি বেড়ে যায়। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়েও এর ঢেউ লাগে। এ ক্যাম্পাসে ২০১৫ সালে প্রেমবঞ্চিত শিক্ষার্থীরা সিঙ্গেল ঐক্য পরিষদ-এর ব্যানারে 'কেউ পাবে, কেউ পাবে না তা হবে না, তা হবে না' স্লোগান দিয়ে ক্যাম্পাসে মিছিল করে। একই বছর ঢাকা ইউনিভার্সিটি সিঙ্গেল সোসাইটি (ডিইউএসএস) পুঁজিবাদী প্রেমের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে আহ্বান জানিয়ে প্রেমকে সার্বজনীন করার লক্ষ্যে ভালোবাসা দিবসে বিক্ষোভ মিছিল করে (ছবির জন্য দেখুন পরিশিষ্ট-৯:৬)। ২০১৮ সালে ইউনিলিভারের সৌজন্যে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে ভালোবাসা দিবসে প্রেমিক জুটিদের জন্য সুসজ্জিত ফ্রি রিক্সা ড্রাইভের আয়োজন করতে চাইলে প্রক্টর অফিস স্থানীয় সংস্কৃতির কথা বিবেচনায় নিয়ে তাতে অনুমতি দেয়নি (এমন সুসজ্জিত রিক্সার ছবির জন্য দেখুন পরিশিষ্ট- ৯:৭)। তবে আমি আমার বিভিন্ন লেখায় বাংলাদেশে ভালোবাসা দিবস উদ্‌যাপনকারীদের 'অপরাধী' বলে অভিহিত করেছি।[৭১] এ অপরাধ হচ্ছে ভালোবাসার মতো একটি মহান পবিত্র ও সর্বত্র বিরাজিত সম্পর্ককে কেবলমাত্র প্রেমিক-প্রেমিকা জুটিতে সীমায়িত করার অপরাধ। আমাদের তরুণ-তরুণী ও যুবক-যুবতীদের মধ্যে ভালোবাসার কোনো ঘাটতি নেই। যেখানে ভালোবাসার

---

৭০. দেখুন, মুহাম্মদ ইয়াহ্ইয়া আখতার, *শিক্ষা ও সংস্কৃতি ভাবনা* (চট্টগ্রাম: খড়িমাটি, ২০১৯), পৃষ্ঠা- ৩০১।

৭১. ভালোবাসা দিবসের ওপর আমার লেখা কতিপয় প্রকাশিত প্রবন্ধের জন্য দেখুন, মুহাম্মদ ইয়াহ্ইয়া আখতার, 'রাজনৈতিক অঙ্গনে ভালোবাসার খরা', *যুগান্তর*, ১৪ ফেব্রুয়ারি, ২০১৯; 'শিক্ষক শিক্ষার্থীর ভালোবাসার রসায়ন', *যুগান্তর*, ১৪ ফেব্রুয়ারি, ২০১৮; 'ভালোবাসার অভিনব প্রতিদান', *যুগান্তর*, ১৪ ফেব্রুয়ারি, ২০১৭; 'ভালোবাসার পবিত্রতাকে কলুষিত করবেন না', *যুগান্তর*, ১৪ ফেব্রুয়ারি, ২০১৬; 'ভালোবাসা সীমিতকরণ অপরাধের শাস্তি', *আমার দেশ*, ১৪ ফেব্রুয়ারি, ২০১০।

ঘাটতি আছে তেমন জায়গায় ভালোবাসা দিবস পালনকারীদের কাজ করা উচিত। এ দৃষ্টিভঙ্গিতে বিচার করলে ভালোবাসা দিবস পালনকারীদের সর্বাগ্রে রাজনৈতিক পরিমণ্ডলে ভালোবাসা সৃষ্টি করতে কর্মসূচি গ্রহণ করতে হবে।[৭২]

এ সব কিছু বিবেচনা করে বলা যায়, বাংলাদেশের উচ্চ শিক্ষাঙ্গণের সংস্কৃতি এমন রূপ নিয়েছে, যা সারা বিশ্বের বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসের সংস্কৃতি থেকে অন্য রকম। এখানে ক্যাম্পাসে শিক্ষার্থীদের মধ্যে দখলদারিত্বের সংস্কৃতির সঙ্গে শিক্ষকদের মধ্যে দলীয় রাজনীতির লেজুড়বৃত্তি এবং কিছুক্ষেত্রে একাডেমিক চৌর্যবৃত্তির সমন্বয় ঘটেছে। যত দিন যাচ্ছে ততই ক্যাম্পাসে পুলিশের উপস্থিতি ও সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। বিশ্ববিদ্যালয় একটি একাডেমিক প্রতিষ্ঠান হওয়া সত্বেও চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে শাটল ট্রেন থেকে নেমে গেট দিয়ে ঢুকলে অনেক সময় হাতের বাঁয়ে একটি জলকামানচোখে পড়ে। কামানের স্থান হবে ক্যানটনমেন্টে বা যুদ্ধক্ষেত্রে। বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো একাডেমিক প্রতিষ্ঠানে কামান থাকবে কেন? পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর হলে হলে বাড়ছে টর্চার সেল। প্রায় প্রতিটি বিভাগে, এমনকি ক্যাম্পাসেও স্থাপন করা হচ্ছে সিসিটিভি ক্যামেরা। যে সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠে হবে লেখাপড়া, জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা ও গবেষণা, সেখানে পুলিশ হল রেইড করে পাচ্ছে রাম দা, কিরিচ, অস্ত্র আর লাঠিসোটা। এ কেমন শিক্ষাঙ্গন? এ কেমন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান!

প্রযুক্তির প্রভাব

এ গ্রন্থের সপ্তম অধ্যায়ে ইতিপূর্বে রাজনীতিবিজ্ঞান বিভাগে প্রযুক্তির ব্যবহার করে কিভাবে চুরি কমানো হয়েছে সে বিষয়ের উল্লেখ করা হয়েছে। সাম্প্রতিক সময়ে বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসগুলোতে নেতিবাচক কর্মকাণ্ড খুব একটা না কমলেও প্রযুক্তির ব্যবহারের ফলে ক্যাম্পাস সংস্কৃতির ওপর একটা ইতিবাচক প্রভাব পড়েছে। এখন অনেক বিভাগে, গ্রন্থাগারে, ছাত্রাবাসে এমনকি ক্যাম্পাসের গুরুত্বপূর্ণ সড়কের মোড়গুলোতে সিসিটিভি ক্যামেরা বসানো হয়েছে। ফলে শিক্ষার্থীদের মধ্যে এ বিষয়টি জানাজানি হওয়ায় তারা অন্তত ওই বিশেষ বিশেষ স্থানে নিজেদের আচরণ অনেকটাই সংযত করেছে। এ ছাড়া অনেক আগে থেকেই ক্যাম্পাসে শান্তি শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠার জন্য পুলিশ ফাঁড়ি স্থাপন করা হয়েছে। এসব ফাঁড়িতে কর্তব্যরত পুলিশ সদস্যদের কাছেও রয়েছে শিক্ষার্থীদের মনিটর করার মতো উন্নত প্রযুক্তি ও অস্ত্রশস্ত্র। এরা যদি প্রযুক্তির সর্বোচ্চ ব্যবহার ঘটিয়ে ছাত্রনেতাদের মোবাইল ট্র্যাকিং করেন, তাহলে তাদের পক্ষে নেতাদের নেতিবাচক কর্মকাণ্ড নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব হয়। তারা যে সেটা করছেন না এমনটা বলা যাবে

---

৭২. প্রাসঙ্গিক তথ্যের জন্য দেখুন, মুহাম্মদ ইয়াহ্ইয়া আখতার, 'ভাষায় দূষণ এবং ভালোবাসায় সংকোচন', *যুগান্তর*, ১৪ ফেব্রুয়ারি, ২০২০।

না। তবে প্রযুক্তির ব্যবহার যেন ব্যক্তিগত জীবনকে প্রভাবিত না করে সে দিকটায় খেয়াল রাখা জরুরি। ডিজিটাল যুগে ছাত্রনেতাদের ব্যাংক একাউন্ট নজরদারি করেই তো তাদের চাঁদাবাজি-টেন্ডারবাজির খবর বের করা সম্ভব। যে কোনো সময়ের ক্ষমতাসীন সরকার চায় না দেখেই হয়ত এমনটা করা হয় না। তা না হলে দুদক কত নেতার, কত ব্যবসায়ীর ব্যাংক হিসাব দেখভাল করে, অথচ তারা বা ক্যাম্পাসে দায়িত্ব পালনরত পোশাকধারী বাহিনীর সদস্যগণ কেন বিশেষ অনুমতি নিয়ে কখনো ছাত্রনেতাদের ব্যাংক হিসাব খতিয়ে দেখেন না? এর কারণ হলো সরকার হয়ত চায় না এমনটা করা হোক। কারণ, অধিকাংশ সময় সরকারি দলের অনুসারী ছাত্র সংগঠনের হাতেই থাকে ক্যাম্পাসের দখলদারিত্ব। তাদের অসম্মানে সরকারি দলের ভাবমূর্তিও ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে ভেবেই হয়ত ছাত্রনেতাদেরকে কঠোর নজরদারি থেকে অঘোষিত ছাড় দেয়া হয়। তবে প্রযুক্তির ব্যবহার শুরু হবার পর থেকে ক্যাম্পাসে সংঘটিত দাঙ্গা ফাসাদ কিছুটা হলেও কমেছে। আর এমন সহিংসতা হলেও ভিডিও ফুটেজ দেখে অপরাধীদের শনাক্ত করার কাজটি সহজ হয়ে গেছে। কাজেই বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন আন্তরিক হলে প্রযুক্তির ইতিবাচক ব্যবহার ঘটিয়ে ক্যাম্পাসে সংঘটিত সন্ত্রাস নিয়ন্ত্রণে ভালো করতে পারে।

উচ্চশিক্ষায় দুর্নীতি বৃদ্ধি

সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে ছাত্র-শিক্ষকদের একাডেমিক, প্রশাসনিক ও আর্থিক দুর্নীতি ক্রমান্বয়ে প্রকট হচ্ছে। শিক্ষকদের মধ্যে বাড়ছে একাডেমিক দুর্বৃত্তায়ন। নকল করে থিসিস লেখা, একজনের থিসিস অন্যজন লিখে দেওয়া, যৌথভাবে লেখা ও প্রকাশিত প্রবন্ধ এককনামে চালিয়ে দেয়া, নিয়োগের সময় মেধাবী আবেদনকারীদেরকে বাদ দিয়ে অনেকক্ষেত্রে লেনদেন বা রাজনৈতিক প্রভাবে তুলনামূলকভাবে অযোগ্যদেরকে শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ দেয়া, প্রভৃতি। আর ছাত্রছাত্রীদের দুর্নীতির ক্ষেত্র ও আওতার পরিধি তো আরো অনেক বড়, যে সম্পর্কে এ অধ্যায়ের প্রথম দিকে আলোচনা করা হয়েছে। এর সঙ্গে বাড়ছে কর্মকর্তা কর্মচারীদের দুর্নীতি। এর মধ্যে সবচেয়ে ভয়াবহ দুর্নীতি হলো শিক্ষক নিয়োগে দুর্নীতি। কারণ, শিক্ষক যদি মেধার ভিত্তিতে নিয়োগ দেয়া না হয়, তাহলে বিশ্ববিদ্যালয়ের মূল কাজ একাডেমিক চর্চা ও গবেষণা দুর্বল হয়ে পড়ে। সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে নিয়োগ দুর্নীতির ব্যাপকতা প্রসারিত হয়ে পড়লে এক সময় ২০১২ সালের পর তা ক্রমশ বিস্তারিত হতে থাকে এবং ২০১৫ সালের দিকে এসে এত বেড়ে যায় যে টিআইবি সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রভাষক নিয়োগের অনিয়ম খতিয়ে দেখার জন্য একটি গবেষণা প্রকল্প গ্রহণ করে। এ লক্ষ্যে টিআইবি গবেষকগণ ১৩টি সরকারি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রভাষক নিয়োগের অনিয়ম ও দুর্নীতির তথ্য উপাত্ত সংগ্রহ করে গবেষণা প্রতিবেদন রচনা করেন। এ গবেষণার জন্য টিআইবি গবেষকগণ চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় থেকেও তথ্য সংগ্রহ করেন। এ

সময় তাঁরা আমাকেও বিভাগীয় সভাপতি হিসেবে ইন্টারভিউ করেছিলেন। তাঁরা আমাকে সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোয় প্রভাষক নিয়োগ সংক্রান্ত অনিয়ম ও দুর্নীতি সম্পর্কে অনেক প্রশ্ন করেছিলেন। আমি এ সম্পর্কে যতদূর জানি তাদেরকে বলেছিলাম। আমাকে তাদের এমন প্রশ্নেরও সম্মুখীন হতে হয়েছিল,

: স্যার, এখন প্রভাষক নিয়োগের বাজার দর কত চলছে?

: দেখুন, আমি যা প্রমাণ করতে পারব না, তেমন তথ্য আপনাদের দেব না।

: স্যার আপনি কি এ বিষয়ে কিছুই জানেন না?

: দেখুন, আমি এ কথা বলব না যে, আমার কানে এ সম্পর্কিত কোনো কথাই কোনো সময় আসেনি। কিন্তু যেহেতু আমি এসব বিষয় সুনির্দিষ্টভাবে জানি না, সে কারণে আমি এ প্রশ্নের উত্তর আপনি যেভাবে চাইছেন সেভাবে সরাসরি দিতে পারছি না। তবে আপনারা এসেছেন যখন, তখন খোঁজ খবর নিয়ে বের করতে চেষ্টা করুন। আমি তাদেরকে প্রশ্ন করি—

: আচ্ছা আপনারা কাদের কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করছেন আমাকে একটু বলবেন কি? আমার এ প্রশ্নের উত্তর দেন টিআইবির সিনিয়র গবেষক জনাব রেজাউল করিম।

: আমরা কতিপয় শিক্ষকের সঙ্গে কথা বলেছি। কিছুসংখ্যক কর্মকর্তা কর্মচারী এবং শিক্ষার্থীদের সঙ্গেও আলাপ আলোচনা করে তথ্য সংগ্রহ করেছি। আগামীকালও আমরা কিছু শিক্ষক নেতা ও কর্মকর্তা কর্মচারী নেতাদের সঙ্গে কথা বলব।

: ভালো। তবে কিছু মনে না করলে আমি কি আপনাদের এ বিষয়ে একটা পরামর্শ দিতে পারি?

: কেন নয়? প্লিজ, বলুন স্যার।

: দেখুন, একটি বিভাগে মনে করুন দু'জন প্রভাষক নিয়োগের জন্য বিজ্ঞাপন দেয়া হলো। কিন্তু সেখানে তো আবেদন করেন অনেকে। হয়ত ২০-৩০ জন, বা তারও বেশি। চাকুরি পান হয়ত ২ জন, বা তার চেয়ে দু'য়েকজন বেশি। বাকি যাদের চাকুরি হয় না, তাঁদের মধ্যে অনেক মেধাবী আবেদনকারী থাকেন। তুলনামূলকভাবে অধিকতর যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও চাকুরি না হওয়া প্রার্থীও থাকেন। আমার পরামর্শ হলো, যেসব ভালো প্রার্থীর চাকুরি হয় না, আপনারা তাঁদের ইন্টারভিউ করুন। তাদের কাছে হয়ত অনেক তথ্য পেতে পারেন।

: স্যার আপনার পরামর্শটি ভালো। আমরা তাদের সঙ্গেও কথা বলব।

টিআইবি ১৩টি বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে ৮টিতে প্রভাষক নিয়োগে অবৈধ আর্থিক লেনদেনের তথ্য পায়। আর্থিক লেনদেনের দুর্নীতি ছাড়া প্রভাষক নিয়োগের আগে ও পরে কিভাবে বিভিন্নভাবে দুর্নীতি অনুষ্ঠিত হয় সে সম্পর্কে এ গবেষণায় আলোচনা করা হয়েছে। দেখানো হয়েছে, কিভাবে একজন শিক্ষার্থীকে আগে থেকে টার্গেট করে শিক্ষক বানাবার চেষ্টা করা হয়। অনেকক্ষেত্রে নম্বর কমিয়ে বা বাড়িয়ে, বা ফলাফল ইঞ্জিনিয়ারিং করে বিশেষ বিশেষ শিক্ষার্থীকে চাকুরি দেয়া হয়। তাছাড়া

পছন্দের প্রার্থীকে কিভাবে সিলেকশন বোর্ডে স্বাভাবিক প্রশ্ন করে প্রশংসা করা হয়, এবং কিভাবে অপছন্দের প্রার্থীকে অপ্রয়োজনীয় প্রশ্ন করে নাজেহাল করে অপ্রস্তুত করা হয় সেসব বিষয়েও এ গবেষণায় আলোকপাত করা হয়েছে।[৭৩] যেমন একজন অপছন্দের প্রার্থীকে তার অনেকগুলো প্রকাশিত প্রবন্ধ থাকায় বলা হয়, 'তুমি কেবল পাশ করেছো। পাশ করার সাথে সাথে আর্টিকেল ছাপলে? এতো জ্ঞানী হয়ে গেলে?' আবার একই বোর্ডে একই প্রশ্নকারীর পছন্দের প্রার্থীর দুটি প্রকাশনা থাকায় মন্তব্য করা হয়, 'দেখেছেন এতো অল্প বয়সেই দুটি পাবলিকেশন করে ফেলেছে।' আমার নিজের বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক নিয়োগ বোর্ডে অনেক সময় দেখা গিয়েছে, মাত্র আধঘন্টায় ২০-৩০ জন প্রার্থীর মৌখিক পরীক্ষা গ্রহণ করা হয়েছে। সে ক্ষেত্রে অপছন্দের প্রার্থীদেরকে তেমন কিছুই জিজ্ঞেস করা হয়নি এবং পছন্দের প্রার্থীকে কয়েকটি সোজা প্রশ্ন করে প্রশংসা করা হয়েছে।

সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে কেবল ছাত্র-শিক্ষকরাই যে দুর্নীতিজড়িত তা নয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক অফিসে কর্মকর্তা কর্মচারীদের মধ্যেও দুর্নীতি চর্চার প্রচলন রয়েছে। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের এক সময়ের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক এবং ওই অফিসের আরো দুজন কর্মকর্তার বড় রকমের দুর্নীতি করার কারণে তাঁদের নামে মামলা হয় এবং অপরাধ প্রমাণিত হবার পর তাঁরা সাজাপ্রাপ্ত হন। শিক্ষার্থীরা তাঁদের কোনো কাজের জন্য প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের কাছে গেলে যে কাজ হয়ত কয়েক মিনিটে হয়ে যাবার কথা, তা তাঁরা কয়েক ঘন্টায়ও অনেক সময় করাতে পারেন না। সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ প্রশাসনিক নিয়ম কানুনের মধ্যে ইচ্ছে করে কিছু জটিলতা তৈরি করে রাখেন, যাতে তাঁরা শিক্ষার্থীদের হয়রানি করতে পারেন। একটা উদাহরণ দেয়া যাক। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে কয়েক বছর আগে পাশ করা অনেক শিক্ষার্থী অনেক সময় তাঁদের সনদপত্র বা নম্বরফর্দ উঠাবার জন্য দূরবর্তী কোনো জেলা থেকে প্রশাসনিক অফিসে আসেন। এমন কোনো শিক্ষার্থী এ লক্ষ্যে জমা দেয়া কাগজপত্রের সঙ্গে অনার্স ফাইনাল পরীক্ষার মার্কস শিট জমা দেন। কারণ, ওই মার্কস শিটে তার প্রথম বর্ষ থেকে চতুর্থ বর্ষ পর্যন্ত সব বর্ষের নম্বর ও ফলাফল থাকে। কিন্তু অফিস তখন বলে, তাকে সব বর্ষের মার্কস শিট পৃথকভাবে জমা দিতে হবে। এ ক্ষেত্রে কোনো শিক্ষার্থীর কাছে সব বর্ষের মার্কস শিট না থাকলে তাকে তখন দীর্ঘসূত্রিতার ফাঁদে ফেলে অফিসারদের পক্ষে তার কাছে থেকে কিছু অবৈধ সুবিধা গ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি করা সম্ভব হয়। অফিসারগণের হাতে এ কাজের জন্য হয়ত কোনো প্রশাসনিক নির্দেশ বা বিধি করিয়ে রাখা থাকতে পারে। কিন্তু তেমন কিছু যদি থাকেও তাহলে ওই বিধি শিক্ষার্থীদের

৭৩. মো. রেযাউল করিম, দিপু রায় ও মো. মোস্তফা কামাল, 'সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রভাষক নিয়োগ: সুশাসনের চ্যালেঞ্জ ও উত্তরণের উপায়', ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি) গবেষণা প্রতিবেদন, ২০১৬, পৃষ্ঠা-১৩-২৭।

হয়রানি করার জন্য। অবশ্যই এমন কোনো নির্দেশ শিক্ষার্থীবান্ধব নয়। কারণ, যে চতুর্থ বর্ষের মার্কস শিট শিক্ষার্থী জমা দিচ্ছেন তা তো এ বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত। কাজেই বিশ্ববিদ্যালয় কর্মকর্তাগণ কেন তাদের প্রদত্ত সে কাগজকে অবিশ্বাস করবেন? যারা ছাত্র রাজনীতিতে জড়িত তারা বড় বড় কাজ যেমন, টেন্ডারবাজি, চাঁদাবাজি, হল দখল, প্রভৃতি নিয়ে ব্যস্ত। ছাত্রনেতাদের শিক্ষার্থীদের পক্ষে এসব ছোট ছোট কাজ করার তাদের সময় কই?

যৌন দুর্নীতি বৃদ্ধি

শিক্ষার্থীর কাছে শিক্ষক হিসেবে আমি হব একজন একাডেমিক পিতা। শিক্ষার্থীকে দেখব আমার একাডেমিক সন্তানের মতো। আমার সঙ্গে শিক্ষার্থীর সম্পর্ক হবে গুরু-শিষ্যের সম্পর্ক। দুঃখের বিষয়, বণিকবৃত্তির প্রভাব ও নীতিহীনতার কারণে সাম্প্রতিককালে কিছুসংখ্যক শিক্ষকের আদর্শিক ও নৈতিক জায়গাটি দুর্বল হয়ে পড়েছে। বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক হয়েও কেউ কেউ ছাত্রীদের সঙ্গে গড়ে তুলছেন অনৈতিক সম্পর্ক। এর চেয়ে দুঃখের আর লজ্জার কি হতে পারে! পত্র-পত্রিকায় সংবাদ প্রকাশিত হচ্ছে 'শিক্ষক কর্তৃক ছাত্রী লাঞ্ছিত' শিরোনামে। সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের চেয়ে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে নৈতিক স্খলনের ঘটনা বেশি। অনেক সময় কিছু দুষ্ট ছাত্রীরাও কোনো অনৈতিক শিক্ষকের ঘনিষ্ঠ হয়ে তার কাছ থেকে বিধিবহির্ভূতভাবে একাডেমিক সুবিধা পেতে চেষ্টা করেন। এ সুযোগ বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে বেশি। কারণ, সেখানে একজন শিক্ষক প্রশ্ন করেন, খাতা দেখেন এবং নম্বর দেন। কিন্তু সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে দুইজন শিক্ষক খাতা দেখায় কোনো শিক্ষার্থীকে একজন শিক্ষক চাইলেই বেশি নম্বর দিয়ে তা সুনিশ্চিত করতে পারেন না। তার অর্থ এ নয়, সরকারি বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকগণ নৈতিক দিক দিয়ে সবাই ভালো। ২০১৬ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সিন্ডিকেট সভা এক ছাত্রীর যৌন হয়রানির লিখিত অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় ফলিত গণিত বিভাগের একজন অধ্যাপককে শাস্তি দেয়। এ ছাড়া এ বিশ্ববিদ্যালয়ের আরো যেসব বিভাগের শিক্ষকদের যৌন দুর্নীতি প্রকাশিত হয়ে পড়ে তার মধ্যে রয়েছে ইসলামের ইতিহাস, নাট্যকলা, আরবী, ফার্সি, পরিসংখ্যান, প্রাণ পরিসংখ্যান ও তথ্য পরিসংখ্যান, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, ট্যুরইজম অ্যান্ড হসপিটালিটি ম্যানেজমেন্ট, উর্দু, ফরাসী ভাষা ও সাহিত্য, মৎস্য বিজ্ঞান, সমাজবিজ্ঞান, ফিনান্স, মনোবিজ্ঞান, প্রভৃতি।[৭৪] এ প্রসঙ্গে বলা দরকার, অনেক যৌন দুর্নীতির ঘটনা ছাত্রীরা লোকলজ্জার কারণে প্রকাশ না করায় সে ঘটনাগুলো আলোচনায় আসে না।

৭৪. বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকদের যৌন দুর্নীতি প্রাসঙ্গিক আলোচনা ও তথ্যের জন্য দেখুন, মুহাম্মদ ইয়াহ্ইয়া আখতার, 'শিক্ষকদের কি এ নৈতিক স্খলণ সাজে?', *যুগান্তর*, ১৮ মে, ২০১৬।

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় সিন্ডিকেট সভা ভূ-তত্ত্ব ও খনিবিদ্যা বিভাগের একজন অধ্যাপকের বিরুদ্ধে এক ছাত্রীর দায়েরকৃত যৌন হয়রানির অভিযোগের প্রমাণ পেয়ে তাকে বাধ্যতামূলক অবসরে পাঠায়। আহসানউল্লাহ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের তড়িৎ কৌশল বিভাগের একজন শিক্ষক ও সহকারী প্রক্টরের সুন্দরী ছাত্রী টার্গেট করে নিজ অফিস, ফ্ল্যাট, বা ল্যাবে নিয়ে যৌন নির্যাতন করার কাহিনী অধিকাংশ জাতীয় পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। কুষ্টিয়া ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন প্রোভিসির বিরুদ্ধে ছাত্রীদের যৌন হয়রানির অভিযোগ প্রকাশিত হয়। নারী কেলেঙ্কারীর অভিযোগ নিয়ে বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন উপাচার্য পদত্যাগ করেন। তার সঙ্গে ওই নারীর যৌন কেলেঙ্কারির স্থিরচিত্র বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় সামুদ্রিক বিজ্ঞান ইন্সটিটিউটের একজন প্রভাষকের অনৈতিক প্রস্তাবে রাজি না হয়ে এক ছাত্রী ওই শিক্ষকের বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ করলে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ অভিযোগটি যৌন নির্যাতন বিষয়ক সেলে না পাঠিয়ে তদন্ত কমিটি গঠন করে।

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের একজন সহযোগী অধ্যাপকের বিরুদ্ধে এক ছাত্রীকে অনৈতিক প্রস্তাব দেয়ার অভিযোগ প্রকাশ পায়। এ শিক্ষকের বিরুদ্ধে স্নাতক পর্যায়ের আরও দু'জন ছাত্রী যৌন হয়রানির লিখিত অভিযোগ দাখিলের পর বিশ্ববিদ্যালয়ের ৭১তম সিন্ডিকেট সভা তাকে বরখাস্ত করে। জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকদের যৌন অপরাধের সংখ্যা আরও বেশি। এ রকম ঘটনায় এ বিশ্ববিদ্যালয়ের নাট্যতত্ত্ব, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক, বাংলা, একাউন্টিং অ্যান্ড ইনফরমেটিক্স বিভাগের শিক্ষকরা বিভিন্ন সময় সাজাপ্রাপ্ত হন। শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের বিরুদ্ধে কতিপয় যৌন অপরাধের অভিযোগ উত্থাপিত হলেও অভিযুক্তদের শাস্তির দৃষ্টান্ত নেই। এ বিশ্ববিদ্যালয়ে গঠিত তদন্ত কমিটি এ রকম একটি অভিযোগ তদন্ত করে শাস্তির সুপারিশ করলে অভিযুক্ত শিক্ষক তদন্ত রিপোর্ট প্রকাশের আগেই উচ্চশিক্ষার জন্য বিদেশ যাওয়ার ব্যবস্থা করতে সমর্থ হন। অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের নৈতিক স্খলনের তথ্য উপস্থাপন না করেও বলা যায়, উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যৌন অপরাধ আশঙ্কাজনকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে এবং এমন অপরাধে জড়িত হয়ে অনেক শিক্ষক তাদের সম্মানের জায়গাটিকে ভূলুণ্ঠিত করেছেন। তবে একথা সত্য, এখনও নৈতিকভাবে সৎ ও চরিত্রবান শিক্ষকের সংখ্যা অনেক বেশি। তবে এ ক্ষেত্রে উন্নতি করার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর যৌন হয়রানি প্রতিরোধ কমিটিগুলোকে অধিকতর সক্রিয় করা দরকার। শিক্ষক নিয়োগের সময় প্রার্থীদের একাডেমিক রেজাল্টের পাশাপাশি তাদের দুর্নীতি ও নৈতিকতার রেকর্ড যতটা সম্ভব আমলে নেয়া দরকার। আর প্রয়োজন শিক্ষার্থীদের মধ্যে এ বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টি করা। কারণ, অনেক শিক্ষার্থী হয়রানির শিকার হলে অভিযোগ না করে লজ্জায় ঘটনা চেপে যায়। যৌন হয়রানির ঘটনা ঘটলে কোথায় কার কাছে কিভাবে অভিযোগ করতে হবে সে বিষয়গুলো নবাগত শিক্ষার্থীদেরকে ভালোভাবে অবগত করা প্রয়োজন। পরবর্তী অধ্যায়ে আমরা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকের ছুটিকালীন অভিজ্ঞতার ওপর আলোচনা করব।

দশ
স্যাবাটিক্যাল ছুটির অভিজ্ঞতা

সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকগণ 'শিক্ষা ছুটি' ছাড়া গবেষণা করার জন্য শিক্ষকতা জীবনে একবার স্যাবাটিক্যাল ছুটি নিতে পারেন। এ ছুটির মেয়াদকাল সর্বোচ্চ এক বছর। আমার নিজ বিভাগে প্রফেসর ড. মাহফুজুল হক চৌধুরী এবং প্রফেসর ড. রাশিদা খানম এ ছুটি নিয়েছিলেন। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়মানুযায়ী এ ছুটি নিতে হলে একটি গবেষণা প্রস্তাবনাসহ আবেদন করতে হয়। এক বছরে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ সর্বোচ্চ ৫ জনকে এমন ছুটি মঞ্জুর করতে পারে। আমার কোথাও কোনো ঘরবাড়ি নেই। খুলনার বাস্তুভিটার পৈত্রিক বাড়ি আপোষ বন্টকনামার সময় এক বোনের ভাগে ফেলা হয়। ফলে খুলনায় এলে প্রথমদিকে বন্টকনামার শর্তানুযায়ী আমি ওই বাড়ির একটি রুমে থাকতাম। বেশ কয়েক বছর পর চিন্তা-ভাবনা ও সার্বিক পরিস্থিতি বিবেচনায় নিয়ে আমি হোটেলে থাকা শুরু করি। তবে আমার জেষ্ঠ ভ্রাতা মোস্তফা কামাল অসুস্থ অবস্থায় আমাকে তাঁর বাড়িতে থাকার সনির্বন্ধ অনুরোধ করলে আমি সে অনুরোধ রাখি। খুলনা শহরের প্রাণকেন্দ্রে জাতিসংঘ পার্কের কাছে তাঁর তিনতলা বাড়ির ছাদের চিলেকোঠায় থাকা শুরু করি। আমার ভাবি একজন অমায়িক মহিলা। তিনি সব সময় আমাকে নিজের ছোটো ভাইয়ের মতো আদর যত্ন করেছেন। তবে আমার একমাত্র বেহিসেবি ভাতিজা অনেকগুলো গিটার কিনে ওই চিলেকোঠাটির জানালাগুলো বন্ধ করে ঘরটিকে একটি মিউজিক স্টুডিও তৈরি করে। এর নাম দেয় ভ্যাম্পায়ার মিউজিক স্টুডিও। রুমের ভেতরে দেয়ালে ভ্যাম্পায়ের ছবি লাগায়। ওই বন্ধ রুমে সে বন্ধুবান্ধব নিয়ে রাত জেগে গানবাজনার কসরৎ করে। ফলে আমি ওই রুমে থাকলে সে গানের আসর বসাতে পারত না। অন্য কোনো থাকার জায়গা না থাকায় খুলনায় এলে পরবর্তীতে আমি প্রেস ক্লাবের গেস্ট হাউসে থাকা শুরু করি। সামান্য আর্থিক সঞ্চয় দিয়ে ফ্লাট কিনব না বাড়ি করব, এমন দ্বন্দ্বে ছিলাম। একবার ভাবলাম ঢাকায় ফ্লাট কিনব। কিন্তু আমার স্ত্রী কিছুতেই শেষ জীবনে ঢাকায় থাকতে রাজি হননি। ঢাকাকে যথার্থই 'গ্যাস চেম্বার' উল্লেখ করে তিনি খুলনায় শ্বশুরের ভিটায় বাড়ি করে বসবাস করতে চান। আমি তার সিদ্ধান্ত যুক্তিপূর্ণ মনে করি। সে জন্য খুলনা শহরের হাজি ইসমাইল রোডস্থ বানরগাতি এলাকার পৈত্রিক ভিটায় বাড়ি করার সিদ্ধান্ত নিয়ে স্যাবাটিক্যাল ছুটির জন্য আবেদন করি। উদ্দেশ্য ছিল গবেষণার ফাঁকে ফাঁকে বাড়ির কাজ কন্ট্রাক্ট দিয়ে তার দেখাশোনা করব।

পরিকল্পনায় বাধা

কবি চৌধুরী ফরিদ আহমেদের মাধ্যমে চট্টগ্রামে ইঞ্জিনিয়ার আসাদের সঙ্গে পরিচয় হয়। তিনি খুলনার ছেলে। চুয়েট পাস আর্কিটেক্ট ও সিভিল ইঞ্জিনিয়ার। খুলনার নিরালা আবাসিক এলাকায় তাঁর অফিস আছে। তবে কাজের সুবাদে তিনি চট্টগ্রামে থাকেন। আসাদের সঙ্গে খুলনা উন্নয়ন কতৃপক্ষ (কেডিএ)-এর স্টাফদের লিয়াজো আছে। আসাদকে বাড়ির প্ল্যান করার দায়িত্ব দিলাম। তিনি আমাদের সাথে কয়েকদিন বসলেন। আমাদের পরিকল্পনা শুনে কয়েকবার স্কেচ পরিবর্তন করলেন। এর মধ্যে পহেলা সেপ্টেম্বর ২০১৯ থেকে ৩১ অক্টোবর ২০২০ পর্যন্ত এক বছরের জন্য আমার স্যাবাটিক্যাল ছুটি মঞ্জুর হলে বিপদে পড়ি। কারণ, এমন সময় ছুটিতে গেলে আমি যে তিনটি কোর্স পড়াচ্ছিলাম তার মধ্যে দুটি শেষ করে যাওয়া সম্ভব হবে না। মাঝপথে এ কোর্সদুটি অন্য শিক্ষক পড়ালে শিক্ষার্থীরা স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করবে না। সে কারণে আমি কোর্সদুটি শেষ করে ছুটি নিতে মনস্থ করি। এ জন্য আমি আরেকটি দরখাস্ত লিখে ছুটি বাতিল করে পহেলা জানুয়ারি ২০২০ থেকে ৩১ ডিসেম্বর ২০২০ পর্যন্ত ছুটি চাই। এ জন্য একজন ডিনের সঙ্গে দেখা করে আমার অভিপ্রায় ব্যক্ত করলে তিনি তা যৌক্তিক বিবেচনা করেন। পরে ডিনস কমিটি মিটিংয়ে আমার ছুটি ১ জানুয়ারি ২০২০ থেকে ৩১ ডিসেম্বর ২০২০ পর্যন্ত অনুমোদন করা হয়।

ছুটি মঞ্জুর হলেও আমার সব পরিকল্পনা সময়মতো কার্যকরী হলো না। প্রায় অন্য সবার মতো আমিও ইঞ্জিনিয়ার আসাদের সঙ্গে প্যাকেজ ডিলে গেলাম। তারা আমার বাড়ির স্কেচ তৈরি করবেন, অনাপত্তিপত্র (এনওসি) সংগ্রহ করবেন, সয়েল টেষ্ট করাবেন, কেডিএ থেকে প্ল্যান পাস করাবেন এবং কাজ শুরু হলে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করবেন। খুলনায় এসে জানলাম যে আমার প্ল্যান সহজে পাস হবে না। কারণ, ডিলেইলড এরিয়া প্ল্যান (ড্যাপ)-এ আমার জমিতে ৪৫ ফুট চওড়া ও ৬০ ফুট লম্বা ময়লা ফেলার একটি সেকেন্ডারি ট্রান্সফার স্টেশন (এসটিএস) তৈরির জন্য চিহ্নিত করা হয়েছে। এর জন্য সময়মতো আমার জমি অধিগ্রহণ করে আমাকে অর্থ প্রদান করা হবে। আমি বললাম, জমির মালিক তো আমি। আমাকে তো এ ব্যাপারে কিছু জানানো হয়নি। আমাকে বলা হয়, আপত্তি থাকলে আপনি কেডিএর ১৪-এর ২ ধারায় অভিযোগ দায়ের করতে পারেন। আমি খুলনায় এসে কেডিএতে গিয়ে ইঞ্জিনিয়ারদের সঙ্গে দেখা করে ব্যাপারটির সত্যতা জানলাম। এ ব্যাপারে তাদের সহায়তা চাইলাম। তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী জনাব শামিম জিহাদ আমার সামনেই আসাদ যে ইঞ্জিনিয়ারের সঙ্গে লিয়াজো করে কাজ করেন তাকে ডেকে ১৪-এর ২ ধারায় অভিযোগ দায়ের করতে বললেন এবং আমাকে সহায়তার আশ্বাস দিলেন। এরপর আমি এবং প্রফেসর ড. গাজী আবদুল্লাহেল বাকী ভাই একসঙ্গে কেডিএর চেয়ারম্যান ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মোঃ আব্দুল মুকিম সরকার বিপিজিএম, এনডিসি, পিএসসি মহোদয়ের সঙ্গে দেখা করলাম। চেয়ারম্যান সাহেব আমাকে জিজ্ঞেস করলেন যে আমি ১৪-২ ধারায় অভিযোগ করেছি কিনা।

আমি সম্মতি জানালে তিনি বললেন, ওই ফাইল তো আমার কাছে আসবে, তখন আমি ব্যাপারটি দেখব। আমার জায়গাটি চারিপাশে লোকবসতির মধ্যে। আমি জানি না কোন্ টাউন প্ল্যানার এমন ঘনবসতিপূর্ণ জায়গায় এসটিএস তৈরির সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। অনেকে বললেন, এরা নগরবাসীকে হয়রানি করার জন্য অনেক সময় এমন সিদ্ধান্ত নেন। অনেকে আবার এর মধ্যে ষড়যন্ত্র তত্ত্ব খুঁজলেন। কেউ কেউ বললেন, লোকাল কাউন্সিলরের অজান্তে এমন সিদ্ধান্ত হয়নি। আমি এসব শুনে কোনো মন্তব্য করিনি, বা লোকাল কাউন্সিলরকেও কিছু বলিনি। তবে আমার খালাত ভাই আসিফ ইকবাল লিটন লোকাল কমিশনার জনাব আলী আকবর টিপুকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলে তিনি এ বিষয়ে অবহিত নন বলে জানান। আমার পক্ষে বিশ্বাস করা কষ্টকর ছিল যে সিটি কর্পোরেশন একটি এসটিএস করার জায়গা নির্দিষ্ট করার সময় সংশ্লিষ্ট এলাকার কমিশনারকে অবহিত না করেই তা করবেন।

ফলে আমার পরিকল্পনা বাধাগ্রস্ত হল। এখন প্রথমে কেডিএর মাস্টারপ্ল্যানের বিরুদ্ধে আমার অভিযোগ গৃহীত হলে আমাকে বাড়ি করার জন্য অনাপত্তিপত্র (এনওসি) দেয়া হবে। তারপর সয়েল টেস্ট ও প্ল্যান পাসের প্রশ্ন। ফলে বিষয়টি ঝুলে যায়। আমি লিটনকে দিয়ে তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলীকে বিষয়টি ত্বরান্বিত করাবার চেষ্টা করে ব্যর্থ হই। সে কাজ এতো ধীর গতিতে হয় যে, কেডিএর পরিকল্পনা কর্মকর্তার খুলনা সিটি কর্পোরেশন (কেসিসি)-এর প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তাকে চিঠি দিয়ে আমার জমিতে কেসিসির এসটিএস নির্মাণ পরিকল্পনা ও এর ব্যাখ্যা চেয়ে একটি চিঠি পাঠাতে ৮ মাস সময় লাগে।[৭৫] আমি এ চিঠির একটি অনুলিপি জোগাড় করে প্রায় তিন সপ্তাহ পর কেসিসির প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তার সঙ্গে দেখা করলে তিনি এ বিষয়ে অবহিত নন বলে জানান। তিনি তিনজন কেসিসির উচ্চপদস্থ কর্মকর্তার সঙ্গে আলাপ করলে তারাও কেউ এ চিঠির বিষয়ে অবহিত নন বলে জানান। পরে আমার কাছ থেকে চিঠির কপি নিয়ে তিনি এ বিষয়টি ফয়সালা করতে তিন সদস্যের একটি কমিটি করে দেন। আমি খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক রেজিস্ট্রার ও অধ্যাপক, নর্থ ওয়েস্টার্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিন, প্রফেসর ড. গাজী আবদুল্লাহেল বাকী ভাইকে দিয়ে কেসিসির প্রধান পরিকল্পনা কর্মকর্তাকে এ বিষয়টি ফয়সালা করে দিতে অনুরোধ করাই। এর আগে আমি চট্টগ্রামের বাসা ছেড়ে দেই। খুলনা শহরে আমার জমির নিকটে প্রিয় ছাত্র মাছুম বিল্লাহর সহায়তায় পৈ পাড়ায় আমার জমির কাছাকাছি হাজি ইসমাইল লিংক রোডে দোতলায় একটি বাসায় উঠি। ওই বাসায় উঠতে মাছুম আমাকে আন্তরিকভাবে সহায়তা করে। দীর্ঘদিন শিক্ষকতা করায় দেশের সর্বত্র ছাত্র রয়েছে। প্রয়োজনের সময় এদের অনেকের সহায়তা পাওয়া যায়। শিক্ষক

---

৭৫ চিঠির স্মারক নং-৬৬৩-২০২০/৯২৩/০৩, তারিখ: ১০-০৮-২০২০।

শিক্ষার্থীবান্ধব ও নিষ্ঠাবান হলে বিপদাপদে শিক্ষার্থীরা পাশে না দাঁড়িয়ে পারে না। আমার প্রতি আমার ছাত্রছাত্রীদের ভালোবাসা বিভিন্ন সময় আমি যুগপৎ উপলব্ধি ও উপভোগ করেছি। শিক্ষার্থীদের কাছে অনেক সময় সহায়তা চাইলে তারা যথাসাধ্য চেষ্টা করে আমাকে সহায়তা করেছে। ফলে ডিসেম্বর ২০১৯ এ আমি উল্লিখিত ভাড়া বাসায় বসবাস শুরু করি।

ফ্রিস্টাইল ঘোরাঘুরি

বাড়ি করার পরিকল্পনা বাধাগ্রস্ত হওয়ায় আমি কোনো চাপ না নিয়ে ছুটি কাটাবার মুডে ঘোরাঘুরি শুরু করি। কারণ, বৈষয়িক বিষয় নিয়ে অধিক চিন্তা করে রক্তচাপ বাড়াইনি। সে জন্য পত্রিকার কলাম লেখা অব্যাহত রাখি এবং বন্ধুবান্ধবের ডাকে সাড়া দিতে থাকি। সে সঙ্গে স্যাবাটিক্যাল ছুটিতে গবেষণা কাজটি কিভাবে করব সে বিষয়ে ভাবি। ইংরেজি বছর ২০২০-র প্রথম দিন বটিয়াঘাটা উপজেলার খুলশিবুনিয়া জিপিবি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে অন্যান্য অতিথিদের সঙ্গে শিক্ষার্থীদের হাতে নতুন বই তুলে দেই। মেধাবী শিক্ষার্থীদের হাতে তুলে দেই সুভাসি বৃত্তির নগদ অর্থ (ছবির জন্য দেখুন পরিশিষ্ট-১০:১)। সঙ্গ পাই জার্মানির ব্রিমেন বিশ্ববিদ্যালয়ের ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং ও ইনফরমেশন টেকনলজির প্রফেসর ড. বিভূতি রায়, সোনামুখ পরিবারের প্রতিষ্ঠাতা কামরুল ইসলাম এবং খুলনা উন্নয়ন আন্দোলনের আবুল বাশার ভাইয়ের। ফিরতি পথে কামরুল ভাইয়ের সৌজন্যে মিলিত হই কিশোরী মমো মল্লিকের সঙ্গে। দরিদ্র কৃষিজীবী পিতা শঙ্কর মল্লিকের মেয়ে মমো হোগলাবুনিয়া স্কুলের দশম শ্রেণির ছাত্রী। স্কুলে যাবার পথে ২০১৯ সালে ২ লাখ টাকা কুড়িয়ে পেয়ে বটিয়াঘাটা থানায় জমা দিয়ে মেয়েটি সততার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করে। এ রকম একজন কিশোরীর সঙ্গে কথা বলে খুশি হই এবং তাকে লেখাপড়ায় উৎসাহ দেই (ছবির জন্য দেখুন পরিশিষ্ট- ১০:২)। জানুয়ারির শেষ সপ্তাহে অনুরুদ্ধ হয়ে যোগ দেই বনলতা সাহিত্য পরিষদের দ্বাদশ প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীতে। পরিচিত হই কতিপয় গুণী কবি সাহিত্যিক ও শিল্পীর সঙ্গে। সঙ্গ পাই প্রফেসর ড. গাজী আবদুল্লাহেল বাকী, মিনু মমতাজ, দিদারুল আলম, সৈয়দ আলী হাকিমসহ আরো কতিপয় লেখকের সঙ্গে।

একই সপ্তাহে যোগ দেই ঢাকা থেকে আগত রাষ্ট্রচিন্তা-র দুটি অনুষ্ঠানে। এর একটি ছিল তরুণ যুবকদের সঙ্গে একটি ওয়ার্কশপ এবং আরেকটি ছিল খুলনার অধ্যয়ন পরিষদ কর্মকর্তাদের সঙ্গে রাষ্ট্রচিন্তার মত বিনিময় সভা। এ সব সমাবেশে যোগ দিয়ে পরিচিত হই রাষ্ট্রচিন্তা-র রাষ্ট্র মেরামত পরিকল্পনা ভাবনার সঙ্গে। জানতে পারি, অচিরেই এরা সংবিধান সংস্কারের ওপর দিনব্যাপী ওয়ার্কশপ করবেন। করবেন ছাত্র যুবকদের সঙ্গে খোলামেলা মত বিনিময়, যা তারা দেশব্যাপী শুরু করেছেন। একই মাসের ২৪ জানুয়ারি খুলনা জেলা স্কুলে অনুষ্ঠিত বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে আয়োজিত আন্তঃস্কুল বিতর্ক প্রতিযোগিতার শেষ দিন প্রধান অতিথি হিসেবে বিতার্কিকদের উদ্দেশ্যে বক্তব্য প্রদান ও পুরস্কার

বিতরণ করি। সঙ্গ পাই খুলনা জেলা শিক্ষা অফিসারসহ কতিপয় গুণী ব্যক্তিত্বের। খুলনার সবুরুন্নেছা স্কুলের মাঠে ৩১ জানুয়ারি অনুষ্ঠিত খুলনা ইসলামিয়া ক্যাডেট স্কুলের ৩৬তম বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় প্রধান অতিথি হিসেবে যোগদান করে ওই অনুষ্ঠানের শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করি। সঙ্গে ছিলেন খুলনা প্রেস ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক মামুন রেজা, খুলনা ইউনেস্কো ক্লাবের সভাপতি নুরুল ইমাম খান মিটু, নাগরিক ফোরামের সমন্বয়কারী সিলভী হারুন এবং স্কুলের সম্মানিত শিক্ষকবৃন্দ (ছবির জন্য দেখুন পরিশিষ্ট- ১০:৩)। পরের মাসে ৭ ফেব্রুয়ারি বন্ধুবর শ ম আবদুর রাজ্জাক আমাকে নিয়ে যান খুলনা রাইটার্স ক্লাবের সাপ্তাহিক সাহিত্য আসরে। ক্লাবের পরিচালকবৃন্দ আমাকে খ্যাতিমান সুফি দার্শনিক বান্দা খলীলের লেখা *আত্মদর্শনে সত্যদর্শন* শীর্ষক একটি অনন্যসাধারণ বই উপহার দিয়ে সম্মানিত করেন (ছবির জন্য দেখুন পরিশিষ্ট- ১০:৪)। একদল সাহিত্যমোদী কবি, গল্পকার, ছড়াকারসহ কতিপয় গুণী ব্যক্তিত্বের কণ্ঠে শুনি মানসম্পন্ন কবিতা, ছড়া ও আলোচনা। অনুরুদ্ধ হয়ে অনুষ্ঠানে উপস্থিত কবি-সাহিত্যিকদের উদ্দেশ্যে সংক্ষিপ্ত বক্তব্যে তাদেরকে সামাজিক দায়বদ্ধতার জায়গাটি মনে রেখে সাহিত্য চর্চা অব্যাহত রাখতে অনুরোধ করি। ক্লাব কর্মকর্তা ডি. কে. মণ্ডল অনুষ্ঠান শেষে তাঁর সম্পাদিত মাসিক *ধুপছায়া* ম্যাগাজিনের চলমান সংখ্যার একটি কপি উপহার দিয়ে আমাকে ওই ম্যাগাজিনে লিখতে অনুরোধ করেন। পরে তিনি ওই ম্যাগাজিনের ফেব্রুয়ারি সংখ্যায় আমার শিক্ষাবিষয়ক একটি প্রবন্ধ পুনঃপ্রকাশ করেন।[৭৬] তবে এর আগেও খুলনার বিভিন্ন সাহিত্য সংগঠন আমাকে সম্মাননা জানায়। উল্লেখ্য, সাহিত্য মজলিস বেশ কয়েক বছর আগে কবি আবু বকর সিদ্দিক ও আমাকে ফুলেল সংবর্ধনা জানিয়েছিল (ছবির জন্য দেখুন পরিশিষ্ট- ১০:৫)।

খুলনার প্রকাশনা জগত

ফেব্রুয়ারি ২০২০-এর বইমেলায় আমার দুটি বই পুনঃপ্রকাশিত হওয়ার কথা ছিল। ছাত্র ও শিক্ষকদের কাছে চাহিদা থাকা সত্ত্বেও দীর্ঘদিন বইদুটো বাজারে পাওয়া যাচ্ছিল না। একটি বই ঢাকার নভেল পাবলিশিং হাউস এবং আরেকটি চট্টগ্রামের 'বই পড়ি' নামের একটি নতুন প্রকাশকের প্রকাশ করার কথা। নভেল পাবলিশিং হাউস বইটি যথাসময়ে প্রকাশ করলেও বই পড়ি তাদের চুক্তিমতো কাজ করতে ব্যর্থ হয়। এরা জানায়, এপ্রিল মাস নাগাদ কাজ শেষ করে ১৪ এপ্রিল, ২০২০ তারিখ পহেলা বৈশাখের দিন বইটির প্রকাশনা অনুষ্ঠান করবে। তারা সে কথাও রাখতে পারেনি। তবে আমি বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশনের ওপর একটি নতুন প্রবন্ধ সংকলনের পাণ্ডুলিপি তৈরি করি। আমি জানি, এ রকম

৭৬. দেখুন, মুহাম্মদ ইয়াহ্ইয়া আখতার, 'বিদেশি বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাস প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ আত্মঘাতি', মাসিক *ধুপছায়া*, ১৯তম বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা, ফেব্রুয়ারি, ২০২০।

রাজনৈতিক বইয়ের প্রকাশক খুঁজতে অনেক সময় লাগবে। ফেব্রুয়ারি মাসে প্রকাশকগণ ব্যস্ত। আমি বইটি এ জন্য ছাপতে চাই যে, বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশনের ওপর প্রকাশিত বইয়ের সংখ্যা খুব কম। কাজেই গণতান্ত্রিক সঙ্কটকালে নির্বাচন কমিশনের ওপর লেখা প্রবন্ধ সংকলনে পাঠকদের আগ্রহ থাকবে। এসব গুরুত্বের দিক ভেবে অল্প সংখ্যায় হলেও আমি খুলনা থেকে বইটি নিজেই প্রকাশের সিদ্ধান্ত নেই।

খুলনার প্রকাশনা জগত আমার কাছে অপরিচিত। এখানে পেশাদার প্রকাশনা সংস্থা চোখে না পড়লেও উল্লেখযোগ্যসংখ্যক প্রেস আছে। সে কারণে প্রতিবেশি ছোট ভাই নুরুল ইমাম খান মিটুকে এ বিষয়ে বললে সে আমাকে ফ্রেন্ডস প্রিন্টার্স-এ নিয়ে যায়। প্রেস মালিক জনাব মিজানুর রহমানকে ৩০০ বই করতে বলি। পাণ্ডুলিপির সফট কপি দেয়া হয়। পেজ মেকার সনৎ রায় পেজ মেকিংয়ের পর প্রুফ দেখার জন্য আমাকে প্রিন্টআউট দেন। আমি দ্রুত সময়ের মধ্যে ভুলত্রুটি ঠিক করে দেই। তিনি একদিনে প্রায় অর্ধেকটা সংশোধন করেন। পরদিন গিয়ে দেখি আমার কাজ বন্ধ। আমার জিজ্ঞাসার উত্তরে জানান, আমার বইয়ে সরকারের সমালোচনা আছে। আমি বললাম, রাষ্ট্রবিরোধী তো কিছু নেই। নির্বাচন কমিশনের সমালোচনা আছে। তাতে অসুবিধা কি? সেটা থাকাই তো স্বাভাবিক। কারণ, বইটি তো নির্বাচন কমিশনের ওপর। আমি বলি, আপনারা তো বইটির মুদ্রক, প্রকাশক নন। আপনাদের কাছে কম্যুনিস্ট পার্টি, বিএনপি, বা জাসদ কর্মীরা পোস্টার ছাপতে আসলে আপনারা কি সেসব কাজ করেন না? জবাব না পেয়ে কথা না বাড়িয়ে বিষয়টি মিটুকে জানাই। সে মিজান সাহেবের সঙ্গে কথা বলে জানায়, তারা বইটি ছাপতে ভয় পাচ্ছেন। তাদেরকে বলি, এ বইয়ে সন্নিবেশিত প্রতিটি প্রবন্ধ প্রকাশিত। সে কারণে এগুলো প্রকাশে ঝুঁকি নেই। কিন্তু তাতে কাজ হয়নি।

প্রকাশক নিয়েও অসুবিধায় পড়ি। খুলনা সাহিত্য মজলিসের প্রতিষ্ঠাতা জনাব রুহুল আমিন সিদ্দিকী ভাইয়ের সঙ্গে আমার অনেক দিনের সখ্য। তাকে বলি, ভাই আমি কি আমার বইয়ের প্রকাশক হিসেবে সাহিত্য মজলিসের নাম ব্যবহার করতে পারি? কারণ, প্রকাশকের জায়গায় লেখকের নাম ব্যবহার করা ভালো দেখায় না। সিদ্দিকী ভাই বলেন, আমি সভাপতিসহ অন্য সবার সঙ্গে আলোচনা করে আপনাকে জানাব। পরে তিনি আর জানাননি। বুঝলাম তাঁদের আপত্তি আছে। আরেক কবির কাছে তিনি বলেন, দিনকাল ভালো যাচ্ছে না। আমরা ঝামেলায় পড়তে পারি। পরে মিটু আমাকে অধ্যয়ন পরিষদের সভাপতি অ্যাডভোকেট মো. কুদরত-ই-খুদা-র কাছে নিয়ে যান। তাকে আমার অভিপ্রায় ব্যক্ত করলে তিনি পাণ্ডুলিপি পড়ে দেখতে চাইলেন। আমি পাণ্ডুলিপির একটি কপি তাঁকে দিলাম। তিনি পাণ্ডুলিপি পড়ার পর তার কমিটি সদস্যদের সঙ্গে এ বিষয়ে আলোচনা করে আমার সঙ্গে বসেন। অনেকের সামনে আমার লেখার প্রশংসা করেন। আমাকে বলেন, আপনি যা লিখেছেন এ তো আমাদের মনের কথা। আমরা সানন্দে এ

গ্রন্থের প্রকাশক হব। আপনি বলুন আপনার আর কি সহায়তা লাগবে। আমি ধন্যবাদ জানিয়ে বলি, আপনাদের নামটি ব্যবহার করতে পারলেই আমি খুশি। তবুও তারা 'প্রকাশকের কথা' লিখে দিলেন। আরও বললেন, এ গ্রন্থ প্রকাশিত হলে আমরা খুলনার এলিট কবি-সাহিত্যিক ও লেখকদের দাওয়াত করে এর প্রকাশনা উৎসব করব।

পরে কুদরত ভাইকে ফ্রেন্ডস প্রিন্টার্সের ঘটনা জানাই। তিনি বলেন, আমরা অধ্যয়ন পরিষদের কাজ করাই রবি প্রিন্টিং প্রেস থেকে। চলুন সেখানে আপনাকে পরিচয় করিয়ে দেব। রবি প্রেসের স্বত্বাধিকারী গোলাম রব্বানী ভাই প্রথমে কিছু বলেননি। আমরা যখন তাঁকে গ্রন্থটির জন্য আইএসবিএন নম্বর আনতে বলি, তিনি বলেন, এ রকম শিরোনামযুক্ত গ্রন্থের জন্য আইএসবিএন নম্বর পাওয়া যাবে না। অথচ, আমার অনুরোধে বন্ধুবর কবি চৌধুরী ফরিদ আহমেদ মাত্র দু'দিনের মধ্যে আমাকে আইএসবিএন নম্বর এনে দেন। কিন্তু পরে রব্বানী ভাইও গ্রন্থটি মুদ্রণে রাজি হননি। তাঁকে এও বলেছি যে, প্রতিটি প্রবন্ধের শেষে ওই প্রবন্ধটি কোন পত্রিকায় কত সালে কোন মাসের কত তারিখে প্রকাশিত হয়েছে সে তথ্যও দিয়ে দেয়া হবে। কিন্তু তাতেও তিনি মত বদলাননি। অগত্যা 'প্রেমের কবিতার পাণ্ডুলিপি তৈরি করতে পারলে পরে আপনার সাথে দেখা করবো' বলে আমি তাঁর কাছ থেকে বিদায় নেই।

কবি চৌধুরী ফরিদ আহমেদ আমার আত্মীয়। তিনি হার্ডওয়্যার ব্যবসায়ী হলেও একজন সুহৃদ, বন্ধুবৎসল এবং পরোপকারী ব্যক্তিত্ব। কবি ফরিদ একজন অভিজ্ঞ ডাক্তারও। সাপ্তাহিক ছুটির দিনে তিনি রোগী দেখেন। তবে দোকানে বসে তিনি অনেক গরীব দোকানদার এবং কর্মচারীর জন্য ফ্রি প্রেসক্রিপশন লেখেন। আমি নিজেও শারীরিক সমস্যায় তাঁর চিকিৎসা নিয়েছি। খুলনা শহরের ফুল মার্কেটের কাছে সিমেট্রি রোডে তাঁর দোকান খুলনা পেইন্ট হাউস কবি সাহিত্যিকদের একটি আড্ডার জায়গা। সম্প্রতি তাঁর দোকানের আকৃতি ছোট হয়ে যাবার পর সে আড্ডা কমলেও বন্ধ হয়ে যায়নি। আমাকে তিনি তাঁর দোকানে অনেক কবি সাহিত্যিকদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন। এরা নানা গুণের অধিকারী। অনেকেই লেখক, শিক্ষক, কবি, গবেষক এবং বিভিন্ন রকম ব্যক্তিত্ব। এসব ব্যক্তির সবাইকে মনে না থাকলেও দুজন মাঝবয়সী যুবকের কথা আমার মনে থাকবে। এদের একজন ওয়াহিদুজ্জামান সোহাগ যিনি ইলেকট্রনিক গণমাধ্যমে চাকুরি করেন। চাকুরির অবসরে তাঁর কাজ হলো দুষ্প্রাপ্য পুরানো বই সংগ্রহ করে তা নিজ খরচে প্রকাশ করা। কাজেই তাঁর অবসর কাটে পুরানো বইয়ের দোকানে। আরেকজন আমির হোসেন, লেখালেখি ও প্রকাশনা শিল্পের সঙ্গে জড়িত একজন লেখক, কবি ও আলোকিত যুবক। দীর্ঘদিন ঢাকায় থাকার কারণে মননশীল লোকজনের সঙ্গে চলাফেরা করে তিনি অনেক তথ্যের অধিকারী। এদের সঙ্গে আলাপ করে আমার বেশ ভালো লাগে। জনাব আমির আমাকে বলেন, স্যার আপনি পাণ্ডুলিপি তৈরি করে রাখুন। এগুলো প্রকাশের জন্য ঢাকায়

প্রকাশক পাওয়া যাবে। করোনাকালে গৃহবন্দি থাকায় ফরিদ ভাইয়ের দোকানে বেশি যাওয়া হয়নি। ফরিদ ভাই নিজে লেখার সময় পান না। তবে তিনি অন্যদের লেখালেখির খোঁজখবর রাখেন এবং সেসব মনোযোগ দিয়ে পড়েন। ফেব্রুয়ারির বই মেলা চলাকালে অনেক কবি ও লেখক তাঁকে তাঁদের প্রকাশিত বই পাঠান এবং তিনি সেগুলো নিজে মনোযোগ দিয়ে পড়েন এবং অন্য সবাইকে দেখান ।

কাজী জেবেলের ফোন

ডিসেম্বর ২০১৯ এর শেষ সপ্তাহে খুলনায় আসার পর পত্রিকায় কলাম লেখা অব্যাহত রাখি। এর মধ্যে ২০২০ সালের ফেব্রুয়ারির ১ তারিখে ঢাকা সিটি কর্পোরেশন (ডিসিসি) নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। অধিকাংশ রাজনৈতিক দল, প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী এবং সুশীল সমাজের অনুরোধ উপেক্ষা করে নির্বাচন কমিশন ডিসিসি নির্বাচনটি ইভিএমে করে। ফলে অনেক অসুবিধা হয়। ভোটারগণ ভোটকেন্দ্রবিমুখ হয়ে পড়েন। শতকরা ২৭ ভাগের মতো ভোট কাস্ট হয়। অবশ্য নির্বাচন পর্যবেক্ষক এবং নির্বাচন বিশেষজ্ঞদের মতে প্রকৃত কাস্টিং রেট ছিল আরো কম। এসব বিষয় নিয়ে আমি পত্রিকায় প্রবন্ধ লিখি। অবশ্য এর আগেও গত এক দশকে বাংলাদেশের মতো প্রযুক্তি-অসচেতন ভোটারের দেশে নির্বাচন অনুষ্ঠানে কাগজের ব্যবহারবিহীন ইভিএম ব্যবহারের সমালোচনা করে আমি উল্লেখযোগ্যসংখ্যক প্রবন্ধ প্রকাশ করি। তারই ধারাবাহিকতায় সিটি নির্বাচনের প্রচারণাকালীন সময়ে একটি এবং এ নির্বাচন শেষ হয়ে গেলে আরেকটি প্রবন্ধ লিখি। এ প্রবন্ধগুলোতেও আমি বরাবরের মতো ইভিএমে ভোটগ্রহণের নেতিবাচকতা তুলে ধরি।[৭৭] প্রবন্ধগুলো সুশীল সমাজ ও নির্বাচন কমিশনের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। *যুগান্তর* পত্রিকার নির্বাচনবিষয়ক রিপোর্টার কাজী জেবেল সিটি নির্বাচন অনুষ্ঠানের পর ফেব্রুয়ারি মাসে আমাকে দু'দিন ফোন করেন। প্রথম দিন কুশলাদি বিনিময়ের পর তিনি বলেন, ইসি কমিশনার ব্রিগেডিয়ার

৭৭. আমার লেখা ইভিএম প্রাসঙ্গিক কতিপয় প্রকাশনার জন্য দেখুন, মুহাম্মদ ইয়াহ্ইয়া আখতার, 'ইভিএম: দলের চেয়ে ইসির আগ্রহ বেশি', *আমার দেশ*, ২৩ জুলাই, ২০১১; 'কার স্বার্থে ইভিএমে নির্বাচন করতে আগ্রহী কমিশন', *যুগান্তর*, ৩ মার্চ ২০১২; 'আবার ইভিএম? ইসির মতলবটা কি?' *যুগান্তর*, ২২ জুলাই, ২০১৪; 'ইভিএমে লুকানো দুরভিসন্ধি', *যুগান্তর*, ১৯ মে, ২০১৫; 'ইসির ঘাড় থেকে ইভিএমের ভূত নামেনি', *যুগান্তর*, ২৯ মার্চ ২০১৮; 'ইভিএমে এতো মধু কী এমন আছে যাদু?', *যুগান্তর*, ৭ মে, ২০১৮; 'ইভিএম মেলা, নাকি ছলচাতুরির খেলা?', *যুগান্তর*,২৩ জুলাই, ২০১৮; 'সরকার কি ইভিএমে আশ্রয় খুঁজছে?', *যুগান্তর*, ৩০ আগস্ট, ২০১৮; 'ইভিএমে কেন এতো আগ্রহ?', *যুগান্তর*, ১৮ এপ্রিল, ২০১৯; 'আগামী নির্বাচনগুলোয় কি তবে নিঃশব্দে দুর্নীতি হবে?', *যুগান্তর*, ৯ মে, ২০১৯; 'ইভিএম ইসির জন্য শাঁখের করাত', *যুগান্তর*, ৩ ফেব্রুয়ারি, ২০২০; 'সিটি নির্বাচনের পোস্টমর্টেম', *যুগান্তর*, ১০ ফেব্রুয়ারি, ২০২০; 'ইভিএম কি এতই জরুরি?', *যুগান্তর*, ৪ জানুয়ারি, ২০২১, উল্লেখিত হয়েছে, মুহাম্মদ ইয়াহ্ইয়া আখতার, *প্রসঙ্গ নির্বাচন কমিশন* (খুলনা: অধ্যয়ন পরিষদ, ২০২১), পৃষ্ঠা-১৫-১৮।

জেনারেল শাহাদাত হোসেন চৌধুরী আমার সঙ্গে চা পান করতে চান। আমি বিষয়টি ইতিবাচকভাবে নিয়ে বলি, আমি তো খুলনায়। ঢাকায় থাকলে এ আমন্ত্রণে সাড়া দিতে পারতাম। তার সঙ্গে আলাপ করে বুঝি, আমার ইভিএম প্রাসঙ্গিক লেখাগুলো নিয়ে হয়ত ইসি কমিশনার মহোদয় আমার সঙ্গে মত বিনিময় করতে চান। পরে জেবেল বলেন, স্যার আমি কি উনাকে আপনার ফোন নম্বর দিতে পারি যাতে উনি আপনার সঙ্গে ফোনে আলাপ করতে পারেন। আমি সম্মতি দিয়ে বলি, নিশ্চয়ই পারেন। উনি কেন, যে কেউ আমার ফোন নম্বর চাইলে আপনি দিতে পারেন। কিন্তু আমি ইসি কমিশনারের কোনো ফোনকল পাইনি। পরে ১৭ ফেব্রুয়ারি তারিখে আবার জেবেল আমাকে ফোন করে একই রকম বক্তব্য দেন এবং আমিও তাকে আগের মতোই আমার মতামত ব্যক্ত করি। কিন্তু পরের বারও আমি ইসি কমিশনারের ফোনকল পাইনি। এমনভাবে একজন পত্রিকার ইলেকশন রিপোর্টারকে দিয়ে ফোন করিয়ে হয়ত আমাকে ইভিএম বিষয়ে লিখতে পরোক্ষভাবে নিরুৎসাহিত করার ব্যর্থ চেষ্টা করা হয়।

কাজী জেবেলের ফোনকলে প্রভাবিত না হয়ে আমি আমার লেখনী অব্যাহত রাখি। সরকারের তরফ থেকে আমাকে কোনো হুমকি ধমকি করা হয়নি। কাজেই এমন ফোনকল পাওয়ার পরও আমি ইভিএম প্রসঙ্গে আমার অবস্থান অপরিবর্তিত রাখি এবং পরবর্তী লেখাগুলোতেও সে দৃষ্টিভঙ্গি প্রতিফলিত হয়। পরে মার্চ মাসের ২১ তারিখে করোনা ভাইরাসের সংক্রমণের মধ্যে কমিশন ভোটারদের নিরাপত্তা চিন্তা না করে তিনটি সংসদীয় শূন্য আসনে উপনির্বাচন করে। এর একটিতে (ঢাকা-১০) আবারও ইভিএম ব্যবহার করা হলে ওই নির্বাচনে মাত্র ৫.২৮% ভোট কাস্ট হয়। ইভিএমে ভোট, তাও আবার করোনা সংক্রমণের মধ্যে হওয়ায় ভোটারগণ ভোটকেন্দ্রে যেতে চাননি। এ রকম পরিস্থিতিতে নির্বাচন স্থগিত করে পিছিয়ে দেবার সাংবিধানিক সুযোগ থাকলেও ইসি একগুয়েমি করে নির্বাচনে দায়িত্বপালনকারী কর্মকর্তা ও ভোটারদের জীবন হুমকিযুক্ত করে এ নির্বাচন করায় আমি আবারও ইসির সমালোচনা করে প্রবন্ধ লিখলে ২৮ তারিখে ওই প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়।[৭৮] তবে এ প্রবন্ধটি প্রকাশিত হবার পর আমি জেবেলের ফোনকল পাইনি।

গ্রন্থের মোড়ক উন্মোচন

প্রফেসর ড. আবদুল্লাহেল বাকী ভাইয়ের অনুরোধে ২০২০ সালের ২৩ ফেব্রুয়ারি আমি খুলনা পাবলিক লাইব্রেরি চত্বরে অনুষ্ঠিত একুশে বইমেলায় যাই। কারণ, ওইদিন তার লেখা *সং অফারিঙস্: রবীন্দ্রনাথের নোবেল বিজয়* শীর্ষক গ্রন্থের মোড়ক

৭৮. দেখুন, মুহাম্মদ ইয়াহ্ইয়া আখতার, 'করোনা ও পাঁচ শতাংশ ভোটের গল্প', *যুগান্তর*, ২৮ মার্চ, ২০২০। উল্লেখিত হয়েছে, মুহাম্মদ ইয়াহ্ইয়া আখতার, *বাংলাদেশি নির্বাচন* (খুলনা: অধ্যয়ন পরিষদ, ২০২১), পৃষ্ঠা-১১-১৫।

উন্মোচন করা হবে। বাকী ভাইকে ছাত্রজীবন থেকে চিনি। আমার বড় বোনের ব্যাচমেট। আমার বোন ছিলেন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা সাহিত্যের ছাত্রী, আর বাকী ভাই ছিলেন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগের প্রথম ব্যাচের ছাত্র। বাকী ভাই লেখক, কবি, অনুবাদক, সুহৃদ, সজ্জন এবং সাহিত্যানুরাগী ব্যক্তিত্ব। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি হবার প্রতিযোগিতায় যখন ২০১৯ সালে শিক্ষকদের মধ্যে তীব্র তদবিরের প্রতিযোগিতা চলছিল, আমি তখন 'ভিসি হব' শীর্ষক একটি ব্যঙ্গ কবিতা লিখলে কবিতাটি ফেসবুকে ভাইরাল হয়। পরে কবিতাটি ঢাকা থেকে প্রকাশিত সাপ্তাহিক *সাম্প্রতিক দেশকাল* পত্রিকা প্রকাশ করে।[৭৯] বাকী ভাই এ কবিতাটি দেখে পছন্দ করেন এবং এর ইংরেজি অনুবাদ করেন। বাকী ভাই আমাকে নিজের ছোট ভাইয়ের মতো দেখেন। তাঁর অনুরোধ না রেখে পারা যায় না। যথাসময়ে মেলায় গিয়ে কিছুক্ষণ বিশ্ব বাংলা সাহিত্য পরিষদের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান দেখি। পরে বাকী ভাইয়ের গ্রন্থের মোড়ক উন্মোচন অনুষ্ঠানে যোগ দিতে বাংলা সাহিত্যের অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক আবদুল মান্নান স্যার আসেন। আসেন আরেক সাহিত্যবোদ্ধা ও সাংবাদিক গোলাম মোস্তফা সিন্দাইনি। সিন্দাইনি ভাইও আমার বড় বোনের সহপাঠী ছিলেন। কিন্তু মোড়ক উন্মোচন অনুষ্ঠানে এসব গুণী সাহিত্যবোদ্ধাদের সঙ্গে অনুরুদ্ধ হয়ে আমাকেও মঞ্চে উঠতে হয়। এদের সঙ্গে আমাকেও আলোচ্য গ্রন্থের ওপর বক্তব্য রাখতে হয় (মোড়ক উন্মোচন অনুষ্ঠানের ছবির জন্য দেখুন পরিশিষ্ট- ১০:৬)। তবে মোড়ক উন্মোচনের সময় যে বইটি অতিথিদের হাতে দেয়া হয়, তা আর ফেরত নেয়া হয়নি। বাসায় আসার পর বইটি আমি পড়ার সময় পাইনি। এপ্রিল মাসে করোনাবন্দি অবস্থায় বইটি পড়ে চমকৃত হই। গবেষক ড. বাকীর যুগপৎ ইংরেজি ও বাংলা সাহিত্যে দখল থাকায় তাঁর পক্ষে এমন একটি গবেষণাধর্মী গ্রন্থ লেখা সম্ভব হয়েছে। তিনি চমৎকারভাবে দেখিয়েছেন, রবীন্দ্রনাথ ইংরেজি ভাষায় রচিত যে *সং অফারিঙস্* গ্রন্থটির জন্য নোবেল পুরস্কার পেয়েছিলেন, ওই গ্রন্থে ইংরেজিতে অনূদিত কবিতাগুলো তাঁর মূল বাংলা কবিতাগুলো থেকে কতটা সরে এসেছে। মূল বাংলা কবিতার ছন্দ ও অন্তমিল হারিয়ে কিভাবে পরিণত হয়েছে ইংরেজি গদ্য কবিতায়। এ কাজ করতে গিয়ে তাঁকে রবীন্দ্রনাথের নির্বাচিত মূল বাংলা কবিতাগুলো এবং তার পাশাপাশি তাঁর ইংরেজিতে অনূদিত কবিতাগুলো পড়তে এবং বুঝতে হয়েছে। আর তারপর তিনি নিজস্ব মুনশিয়ানায় নোবেল পুরস্কার পাওয়া ইংরেজি গ্রন্থটির কবিতাগুলো বাংলায় অনুবাদ করেছেন। পরিশ্রমের কাজ। তবে সাহিত্যের ছাত্র না হয়েও বুঝতে পেরেছি, বাংলা ও ইংরেজি সাহিত্যের ছাত্রদের জন্য বইটি উপকারী হবে।[৮০]

৭৯. মুহাম্মদ ইয়াহ্ইয়া আখতার, 'ভিসি হব', সাম্প্রতিক দেশকাল, ৩ অক্টোবর, ২০১৯।
৮০. দেখুন, ড. গাজী আবদুল্লাহেল বাকী, *সং অফারিঙস্: রবীন্দ্রনাথের নোবেল বিজয়* (খুলনা: লেখক কর্তৃক প্রকাশিত, ২০২০)।

বইমেলা ও রাষ্ট্রীয় পদক

ফেব্রুয়ারি মাস এলে বইমেলা, নতুন বইয়ের প্রকাশনা এবং গ্রন্থকেন্দ্রিক আলোচনা শুরু হয়। সে সঙ্গে গুঞ্জন শুরু হয় একুশে ও স্বাধীনতা পদক কারা পাবেন সে বিষয় নিয়ে। এ দুটি ক্ষেত্রেই আমি নানা রকম অব্যবস্থাপনা দেখি। এ সব বিষয়ে বিভিন্ন সময় আমি লেখনীর মাধ্যমে সরকার ও বাংলা একাডেমিকে পরামর্শ দিয়েছি।[৮১] কিন্তু তাতে খুব একটা উপকার হয়নি। ঐতিহ্যবাহী বই মেলাটি বাংলা একাডেমি প্রকাশকবান্ধব মেলা হিসবে আয়োজন করে। প্রতি বছর হাজার হাজার নতুন বই প্রকাশিত হয়। বিক্রয় হয় কোটি কোটি টাকার বই। তবে যে লেখক বইয়ের স্রষ্টা, তিনি এ টাকার কতটা পান? আর প্রকাশকই বা পান কতটা? বাংলা একাডেমির কি সে হিসেব আছে? সব প্রকাশকগণ কি লেখকের সঙ্গে চুক্তি করেন? সে চুক্তিমতো তাকে কি তাঁর লেখক সম্মানী প্রদান করেন? এ ক্ষেত্রে চলছে চরম বিশৃঙ্খলা। গ্রামগঞ্জে অনেক গুণী লেখক আছেন। তাঁদের অনেকের লেখার মান ভালো হলেও প্রকাশকরা তাঁদের পাত্তা দেন না। পাণ্ডুলিপি নিয়ে এলে অধিকাংশ প্রকাশকই তাঁদের সাথে এমন আচরণ করেন যে, তাঁর এ বই ছাপলে বাজারে চলবে না। তিনি অনেকটা দয়া করে তাঁর বই প্রকাশ করছেন। তাঁর সঙ্গে কোনো চুক্তি করেন না। লেখক সম্মানী দেন না। অনেকক্ষেত্রে কোনো কোনো প্রকাশক লেখককে বলেন কয়েকশ' কপি টাকা দিয়ে কিনে নিতে। প্রবাসী লেখকদের বেলায় এমনটা বেশি হয়। অথচ খুব সহজে বাংলা একাডেমি এ ব্যাপারে লেখকদের পাশে দাঁড়াতে পারে। মেলায় স্টল বরাদ্দের সময় একাডেমি প্রকাশকদের কাছ থেকে প্রকাশিতব্য বইয়ের তালিকা জমা নেয়। একাডেমি যদি কেবল সে সঙ্গে প্রকাশকদের কাছে প্রকাশিতব্য বইগুলোর লেখকদের সঙ্গে সম্পাদিত চুক্তির একটি ফটোকপি জমা দেয়া বাধ্যতামূলক করে, তাহলে লেখকদের জন্য বিরাট উপকার হয়। সে ক্ষেত্রে প্রকাশকগণ লেখকদের সঙ্গে চুক্তি করতে বাধ্য হবেন। এমন পরামর্শ আমি একাধিকবার দিয়েছি। কিন্তু একাডেমি সে দিকে মনোযোগ দেয়নি। এ ছাড়া একাডেমির নিজস্ব রুটিন কাজকর্মের মধ্যেও বিশৃঙ্খলা আছে।

এ হলো বইকেন্দ্রিক বিশৃঙ্খলা। এর সঙ্গে রয়েছে পদক প্রদানকেন্দ্রিক অনিয়ম। পদক তো কেবল বাংলাদেশে দেয়া হয় না। আন্তর্জাতিকভাবে, মহাদেশীয়ভাবে এবং রাষ্ট্রীয়ভাবেও বিশ্বব্যাপী পদক দেবার প্রচলন আছে। আন্তর্জাতিক ও মহাদেশীয় পদকের নমুনা হিসেবে যথাক্রমে 'নোবেল' এবং

৮১. এমন পরামর্শমূলক আমার লেখা কয়েকটি প্রকাশিত প্রবন্ধের জন্য দেখুন, মুহাম্মদ ইয়াহ্ইয়া আখতার, 'রাষ্ট্রীয় পদক প্রদানে বিশৃঙ্খলা কাম্য নয়', *যুগান্তর*, ১৩ এপ্রিল, ২০২০; 'বইমেলা লেখকবান্ধব নয় প্রকাশকবান্ধব', *যুগান্তর*, ০৭ ফেব্রয়ারি, ২০১৯; 'বইমেলা কবে লেখকবান্ধব হবে?', ৭ ফেব্রুয়ারি, *যুগান্তর*, ২০১৬; 'বই মেলাকে লেখকবান্ধব করতে হবে', *যুগান্তর*, ২০ ফেব্রুয়ারি, ২০১৩; 'ভাষা ও সংস্কৃতীপ্রেমীরা নীরব কেন?', *আযাদী*, ২৯ জানুয়ারি, ২০১৫।

'ম্যাগাসাইসাই' পুরস্কারের কথা বলা যায়। বাংলাদেশে ক্ষুদ্র ঋণের প্রবক্তা ড. মুহাম্মদ ইউনূস নোবেল পুরস্কার এবং উল্লেখ্যযোগ্যসংখ্যক ব্যক্তিত্ব ম্যাগাসাইসাই পুরস্কার পেয়েছেন।[৮২] আর রাষ্ট্রীয়ভাবে প্রায় প্রতিটি দেশে পুরস্কার দেবার রেওয়াজ আছে। যেমন, ভারতে 'ভারতরত্ন', 'পদ্মভূষণ', 'পদ্মশ্রী'; পাকিস্তানে 'নিশান-ই-পাকিস্তান', 'হিলাল-ই-পাকিস্তান', 'তমঘা-ই-পাকিস্তান'; বাংলাদেশে 'স্বাধীনতা পদক', 'একুশে পদক', 'বাংলা একাডেমি পুরস্কার', প্রভৃতি। তবে অন্যান্য দেশে এসব পুরস্কার দেবার সময় যেভাবে মেধা ও যোগ্যতার বিচার করা হয়, বাংলাদেশে তা হয় না। এখানে পুরস্কারের জন্য যোগ্য ব্যক্তিদের বাছাই করার কাজটিতে পেশাদারিত্ব লক্ষিত হয় না। তাছাড়া বাছাই প্রক্রিয়াটি 'দাঁত থাকতে দাঁতের মর্যাদা না বুঝার নীতি' দ্বারা প্রভাবিত। যে কারণে স্বাধীনতা পদকপ্রাপ্ত তিন শতাধিক সম্মানিত ব্যক্তিত্বের মধ্যে ২০২০ সাল পর্যন্ত পদকপ্রাপ্তদের এক তৃতীয়াংশই পেয়েছেন মরণোত্তর (১০৫ জন) পুরস্কার।

সাহিত্য বিভাগে স্বাধীনতা পুরস্কার প্রসঙ্গে আসা যাক। এ পর্যন্ত (২০২০ সাল) সাহিত্যে ৩৬ জন স্বাধীনতা পদক পান, যার মধ্যে পাঁচজন নারী আর বাকিরা পুরুষ।[৮৩] দুঃখের সঙ্গে বলছি, সাহিত্যে স্বাধীনতা পুরস্কারের জন্য যেসব নাম প্রস্তাবিত হয়, সে নামগুলো থেকে বাছাই করার কাজটি পেশাদারিত্বের সঙ্গে করা হয়নি। বলতে পারলে খুশি হতাম, সাহিত্য বা সংস্কৃতি বিভাগে যাঁরা স্বাধীনতা পদক পান, তাঁদেরকে যথাক্রমে সাহিত্যবোদ্ধা ও সংস্কৃতি বিষয়ে বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিত্বগণ বাছাই করেছেন। এমনটি হলে ২০২০ সালে জনাব এস এম রইজ উদ্দিন আহম্মদ-কে সাহিত্যে স্বাধীনতা পদক দেয়া হত না। ব্যক্তি রইজ উদ্দিনের সঙ্গে আমার যেমন আলাপ-পরিচয়, বন্ধুত্ব বা শত্রুতা নেই, তেমনি সাহিত্যিক রইজ উদ্দিনও আমার কাছে অপরিচিত। ঢাকার খ্যাতিমান প্রকাশনা থেকে তাঁর কোনো বই প্রকাশিত হয়েছে বলে শুনিনি। প্রায় সব বই যদি গাঙচিল প্রকাশনা থেকে প্রকাশিত হয়, তাহলে বলার কিছু থাকে না। যতদূর জানি, গাঙচিল লেখকদের সঙ্গে বোঝাপড়া করে বই প্রকাশ করে। এদের প্রকাশিত বইয়ের সংখ্যা অনেক। তবে পেশাদারিত্ব নিয়ে বইগুলোর মান বিচার করে প্রকাশ করলে ভালো হত। উল্লেখ্য, বাংলা একাডেমির হিসেবে ২০২০ সালে একুশে বইমেলায় প্রকাশিত ৪ হাজার ৫৯১টি নতুন বইয়ের মধ্যে মাত্র ৪৮৮টি বই ছিল

৮২. উল্লেখ্য, বাংলাদেশিদের মধ্যে তাহরুন্নিসা আবদুল্লাহ ১৯৭৮ সালে, ফজলে হাসান আবেদ ১৯৮০, ড. মুহাম্মদ ইউনূস ১৯৮৪, জাফরুল্লাহ চৌধুরী ১৯৮৫, এ্যাঞ্জেলা গোমেজ ১৯৯৯, আবদুল্লাহ আবু সাইদ ২০০৪, মতিউর রহমান ২০০৫, এ এইচ এম নোমান খান ২০১০ এবং সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান ২০১২ সালে নিজ নিজ এলাকায় কাজের স্বীকৃতিস্বরূপ ম্যাগসাইসাই পুরস্কার পান।

৮৩. এ পাঁচজন নারী হলেন: সৈয়দা মোতাহেরা বানু, সুফিয়া কামাল, রোমেনা আফাজ, রাবেয়া খাতুন এবং সেলিনা হোসেন।

মানসম্পন্ন। গাঙচিল প্রকাশনাও যদি এর প্রকাশিত বইগুলো সাহিত্যবোদ্ধাদের দিয়ে যাচাই করিয়ে মানসম্পন্ন বইয়ের তালিকা তৈরি করত, তাহলে নিশ্চয়ই এদের মানসম্পন্ন বইয়ের তালিকা ছোট হত। পত্রিকা পড়ে জানলাম, জনাব রইজ উদ্দিন ত্রিশটির মতো বই লিখেছেন। তা তিনি লিখতেই পারেন। তবে সাহিত্যমান বিচারে এর কয়টি মানসম্পন্ন বই সে বিষয়টি মূখ্য। বইয়ের সংখ্যাটি এখানে গৌণ বিষয়। জনাব রইজ একটি বা দুটি বই লিখে স্বাধীনতা পদক পেলে আমি আপত্তি করব না। তবে সে বই সাহিত্যমান বিচারে অবদানমূলক হতে হবে। সাহিত্যে স্বাধীনতা পদকের জন্য জনাব রইজের নাম ঘোষিত হবার পর অনেকে এর তীব্র সমালোচনা করেন।[৮৪] সংস্কৃতিতে কালিপদ দাস এবং ভাষা ও সাহিত্যে নাজমুন নেসা পিয়ারীকে যথাক্রমে স্বাধীনতা ও একুশে পদক দেয়া নিয়েও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ও পত্র-পত্রিকায় সমালোচনা হয়। যোগ্য ব্যক্তিদের বাদ দিয়ে তুলনামূলকভাবে কম যোগ্যদের পদক দেয়া হলে পদকপ্রাপ্তদের চেয়ে তাদের বাছাইকারীগণ অধিক দায়ী। সরকারের উচিত সাহিত্য ও সংস্কৃতিবোদ্ধাদের সমন্বয়ে কমিটি গঠন করে ওইসব কমিটিকে স্বাধীনভাবে বাছাই কাজ করতে দেয়া। সব কাজে সরকারের আমলাদের ব্যবহার করা উচিত নয়। অবশ্য আকবর আলী খান, আসফউদ্দৌলা, হাসনাত আবদুল হাই বা আবদুশ শাকুর এর মতো আমলাদের দিয়ে এমন কাজ করালে কেউ আপত্তি করবেন না। কিন্তু সম্প্রতি আমলাতন্ত্রে মানের যে অবনমন ঘটেছে তাতে এমন আমলার সংখ্যা আশঙ্কাজনকভাবে কমে গেছে। রাষ্ট্রীয় পদক প্রদানে ২০২০ সালে যে ঘটনা ঘটেছে তা ভালো হয়নি। সাহিত্যে স্বাধীনতা পদকের জন্য নাম ঘোষণা করে ২০ দিন পর আবার কবি সাহিত্যিকদের ব্যাপক আপত্তি বিবেচনা করে সংশোধিত প্রেস বিজ্ঞপ্তি দিয়ে সে পদক বাতিল করা নজিরবিহীন লজ্জাজনক ঘটনা। এতে দেশে-বিদেশে সরকারের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন হয়েছে। আমি আমার একটি লেখায় সরকারকে এ রকম জাতীয় পদক প্রদানের ক্ষেত্রে যাতে প্রকৃত যোগ্যরাই পদক পান সে জন্য বাড়তি সতর্কতা গ্রহণের পরামর্শ প্রদান করি।[৮৫]

পলিসি ডায়লগে বক্তব্য প্রদান

ফেব্রুয়ারি মাসের তৃতীয় সপ্তাহে ঢাকাস্থ ডেমোক্রেসি ইন্টারন্যাশনাল-এর ড. মো. আবদুল আলিম ফোন করে খুলনার সিটি ইন হোটেলে ২৪ ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠিতব্য পলিসি ডায়লগে যোগদানের জন্য আমাকে দাওয়াত করেন। প্রতিষ্ঠানটি গণতন্ত্র

৮৪. এদের মধ্যে ছিলেন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের প্রেসিডিয়াম সদস্য ড. নূহ আলম লেনিন, বাংলা একাডেমির সাবেক মহাপরিচালক অধ্যাপক শামসুজ্জামান খান, জাদুশিল্পী জুয়েল আইচ, ড. সেলিম জাহানসহ আরও অনেকে।

৮৫. দেখুন, মুহাম্মদ ইয়াহ্ইয়া আখতার, 'রাষ্ট্রীয় পদক প্রদানে বিশৃঙ্খলা কাম্য নয়', *বার্তা ২৪*, ১৩ এপ্রিল, ২০২০।

শক্তিশালী করার জন্য রাজনৈতিক দলগুলোর নেতা-কর্মীদের সঙ্গে কাজ করছে। এ অনুষ্ঠানে পলিসি পেপার উপস্থাপন করেন প্রতিষ্ঠানটির সিনিয়র ডিরেক্টর ড. মো. আবদুল আলিম। পলিসি পেপারের বিষয়বস্তু ছিল 'নির্বাচনী পদ্ধতি: ফার্স্ট পাস্ট দ্যা পোস্ট এবং সমানুপাতিক প্রতিনিধিত্বমূলক ব্যবস্থার তুলনামূলক আলোচনা'। আলিম সাহেব আমার পূর্ব পরিচিত। তিনি নির্বাচন বিষয়ে অনেক বছর ধরে কাজ করছেন। এর আগে ইলেকশন ওয়ার্কিং গ্রুপ (ইডব্লিউজি)-এর ডিরেক্টর থাকাকালীন তিনি আমাদের বিভাগের সঙ্গে এমওইউ করে শিক্ষার্থীদের নির্বাচন বিষয়ে কাজ করার সুযোগ করে দেন। তাছাড়া ইডব্লিউজির স্পনসরশিপে আমরা নির্বাচন বিষয়ে একটি সেমিনার আয়োজন করি, যে বিষয়ে এ গ্রন্থে ইতিপূর্বে আলোচনা করেছি। কাজেই আলিম সাহেবের নিমন্ত্রণ গ্রহণ করি। এ অনুষ্ঠানে ঢাকা থেকে ড. আলিমের সঙ্গে আরও আসেন প্রতিষ্ঠানটির ফোকাল পার্সন লেসলি রিচার্ডস। আমন্ত্রিত অতিথিদের মধ্যে ছিলেন খুলনার বড় রাজনৈতিক দলগুলোর মূখ্য নেতৃবৃন্দ, কতিপয় শিক্ষাবিদ এবং অন্যান্য পেশাজীবী ও বিশিষ্ট নাগরিকবৃন্দ। রাজনৈতিক নেতাগণ তাদের মতো করে বক্তব্য রাখেন। আমি আমার আলোচনায় বলি, দলীয় সরকারের অধীনে সংসদ নির্বাচন হলে ওই নির্বাচন গ্রহণযোগ্য হবে না। এমন নির্বাচনে সব সময় সরকারি দল জিতবে। যেখানে প্রধানমন্ত্রী, মন্ত্রী এবং এমপিগণ নিজ নিজ পদে থাকবেন, জাতীয় সংসদ ভাঙ্গা হবে না, প্রশাসন হবে দলীয়করণকৃত, নির্বাচন কমিশন দুর্বল, সেখানে সরকারদলীয় প্রার্থীকে হারানো সম্ভব নয়। আরও বলি, রাজনৈতিক নেতারা সম্মিলিতভাবে নির্বাচন গ্রহণযোগ্য করার জন্য নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থার প্রবর্তন করেছিলেন। সে জন্য তারা ধন্যবাদ পেতে পারেন। কিন্তু এ ব্যবস্থা সংস্কার না করে এককভাবে বাতিল করে ভুল করা হয়েছে। কাজেই এখন রাজনৈতিক দলগুলোকেই আবার সম্মিলিতভাবে কোনো গ্রহণযোগ্য নির্বাচনী ব্যবস্থার উদ্ভাবন করতে হবে। এ ছাড়া আমি ইভিএমে নির্বাচন করার বিরুদ্ধে জোরালো বক্তব্য রাখি। বলি, আমাদের ভোটারগণ প্রযুক্তি অসচেতন। তাছাড়া আমাদের ইভিএমে ভারতীয় ইভিএমের মতো কাগজের ব্যবহার নেই। ভোট পুনঃগণনার ব্যবস্থা নেই। এ মেশিন হ্যাকপ্রুফ নয় বলে অভিযোগ রয়েছে। অধিকাংশ রাজনৈতিক দল এবং ভোটারগণ মেশিনে ভোট চান না। এমতাবস্থায় নির্বাচন কমিশনের ইভিএমে ভোট করতে এত আগ্রহ কেন? আরও বলি, নির্বাচন কমিশনের ভোটারদেরকে মানসিক যন্ত্রণা দেয়ার অধিকার নেই। ব্যালটে ভোট দিলে একজন অশিক্ষিত ভোটার যে মানসিক পরিতৃপ্তি পান, ইভিএমে ভোট দিয়ে তিনি সে তৃপ্তি পান না। নিজের সমর্থিত প্রার্থী হেরে গেলে তিনি মনে করেন, তার ভোট হয়ত অন্য মার্কায় চলে গেছে। এ মেশিনে সম্প্রতি অনুষ্ঠিত বিভিন্ন নির্বাচনে ফিঙ্গারপ্রিন্ট না মেলায় অনেক ভোটার বিরক্ত হয়ে ভোট না দিয়ে বাড়ি চলে যান। স্বয়ং সিইসি ২০২০ সালের ১ ফেব্রুয়ারি তারিখে অনুষ্ঠিত ডিসিসি নির্বাচনে ইভিএমে ভোট দিতে গেলে তার আঙ্গুলের ছাপ মেলেনি। পরে ২১ মার্চ তিনটি

শূন্য সংসদীয় আসনে করোনা ঝুঁকির মধ্যে ঢাকা-১০ আসনে ইসি ইভিএমে নির্বাচন করে।[৮৬] ওই নির্বাচনেও সরকারদলীয় প্রার্থীর ফিঙ্গারপ্রিন্ট না মেলায় তিনি প্রাথমিকভাবে ভোট দিতে ব্যর্থ হন। তাছাড়া এসব নির্বাচনগুলোয় কাপড়ঘেরা ভোট দেবার জায়গায় সরকারদলীয় নেতা-কর্মীগণ উপযাজক হয়ে ভোটারদেরকে ভোটদানে সহায়তা (?) করেন। এই সহায়তার নামে অনেক ভোটারের ভোট তারাই দিয়ে দেন বলে অভিযোগ পাওয়া যায়। আমি সংবিধানে সুযোগ থাকা সত্ত্বেও রাজনৈতিক দলগুলোর নির্বাচন কমিশন গঠনের জন্য আইন তৈরি না করায় তিনটি বড় রাজনৈতিক দলের সমালোচনা করি।

থিসিস সুপারভিশন

স্যাবাটিক্যাল ছুটিতে থাকলেও আমাকে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে হয়। এমফিল এবং পিএইচডি ছাত্র সুপারভিশনের কাজ করতে হয়। আমার এমফিল ছাত্র সরকারি কলেজ শিক্ষক জনাব মোহাম্মদ শাহেদ আলম ভূঁইয়া থিসিস জমা দেবার পর দীর্ঘদিন তা আটকে থাকে। প্রথমে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি পরিবর্তন হওয়ায় একাডেমিক কাউন্সিলের সভা দীর্ঘদিন না হওয়ায় তাঁর থিসিস পরীক্ষকের কাছে পাঠানো হয়নি। পরে নতুন ভিসি এসে মিটিং করতে দেরি করেন। আরও পরে একাডেমিক কাউন্সিল এবং সিন্ডিকেট হওয়ার পর তার থিসিস পরীক্ষণের জন্য প্রেরণ করা হয়। তবে থিসিস প্রেরণের পর করোনা ভাইরাসের জন্য সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ করে দেয়া হয়। কাজেই প্রেরিত থিসিস পরীক্ষকরা কবে পাবেন, পরীক্ষা করে কবে রিপোর্ট পাঠাবেন, আর কবে তার ডিগ্রি হবে সে বিষয়টি প্রশ্নবিদ্ধ হয়ে পড়ে। আরেক ছাত্রী নাজমুন নাহার এমফিল কোর্সওয়ার্কে ভালো করায় সে তার গবেষণা কাজ পিএইচডিতে কনভার্ট করার সুযোগ পায়। তার পিএইচডি ভর্তির বিভিন্ন কাগজে সুপারভাইজার হিসেবে আমার স্বাক্ষর লাগবে। এগুলো সে আমাকে কুরিয়ারযোগে পাঠালে আমি সই করে তাকে পাঠাই। তাছাড়া লেখাপড়া সম্পর্কিত গাইডলাইনও আমি তাকে ফোন করে মাঝেমধ্যে প্রদান করি। তার থিসিসের বিষয়বস্তুর সঙ্গে সম্পর্কিত কোনো প্রবন্ধ বা বই দেখলে আমি তাকে ইমেইলে তা পাঠিয়ে দেই। এমন অবস্থায় ৫ ও ৬ মার্চ, রাজনীতি বিজ্ঞান বিভাগের সুবর্ণ জয়ন্তী অনুষ্ঠানে যোগ দিতে চট্টগ্রাম গেলে অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় দিন অনুরুদ্ধ হয়ে স্বাধীনতা উদ্যানে জনসমাগমের মধ্যেও এক ফাঁকে নাজমুনের সঙ্গে বসে তাকে কিছু একাডেমিক নির্দেশনা প্রদান করি (ছবির জন্য দেখুন পরিশিষ্ট- ১০:৭)। আমি প্রথম থেকে এ ছাত্রীকে উৎসাহের ওপর রাখি। কারণ, প্রথমদিকে সে ভাবতো, সে হয়ত ভালো করতে পারবে না। কিন্তু

---

৮৬. বাকি দুটি সংসদীয় আসনে ব্যালটে ভোট হয়। এ দুটি আসন ছিল গাইবান্ধা-৩ ও বাগেরহাট-৪।

এমফিল কোর্সওয়ার্ক পরীক্ষায় ভালো ফলাফল করে সে আস্থা ফিরে পায়। এ বৈঠকেও আমি তাকে বলি, তুমি পড়তে থাকো। তোমাকে নতুন করে কোর্স করতে হবে, সেমিনার এবং পরীক্ষা দিতে হবে। এগুলো তো তুমি আগেও দিয়েছ। কাজেই ভয় পাবার কিছু নেই। সুবর্ণ জয়ন্তী থেকে ফেরার পর সে প্রয়োজনে আমার সঙ্গে টেলিফোনে একাডেমিক আলোচনা চালিয়ে যায়। আমিও তাকে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দিতে থাকি। কিন্তু পরে এ মেধাবী শিক্ষার্থীকে নিয়মের মারপ্যাঁচে পড়ে যথেষ্ট ভোগান্তির শিকার হতে হয়। একই রিসার্চ মেথডলজির কোর্স তাকে দিয়ে দুইবার করানো হয়। অথচ বিভাগ চাইলে এ কোর্সটি সে যেহেতু এম. ফিল ডিগ্রি করাকালীন করেছে, সে কারণে কোর্সটি থেকে তাকে অব্যাহতি দিতে পারতো।

কোভিড-১৯ আতঙ্ক

৮ মার্চ-২০২০ তারিখে বাংলাদেশে নভেল করোনা ভাইরাসের উপস্থিতি ধরা পড়লেও সরকারের তরফ থেকে বিষয়টি আমলে নেয়া হয়নি। যদিও এর অনেক আগেই ডিসেম্বর ২০১৯ থেকে এ ভাইরাসের সংক্রমণ পৃথিবীর অন্যান্য দেশে শুরু হয়। তবে আশ্চর্যের বিষয় হলো প্রথম দিকে সরকার বিষয়টি গুরুত্ব দেয়নি। উল্লেখ্য, ২৮ জানুয়ারি, স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে 'করোনাভাইরাস, সচেতনতা ও করণীয়' শীর্ষক সংবাদ সম্মেলনে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী জনগণকে আতঙ্কিত না হতে পরামর্শ দিয়ে বলেন, করোনাভাইরাস সার্স ভাইরাসের মতো ভয়াবহ নয়। এ ভাইরাস শীতকালে দেখা দিলেও গরমকালে টিকতে পারবে না। কাজেই এ নিয়ে আতঙ্কিত হওয়া যাবে না। মন্ত্রিসভার আরও কতিপয় মন্ত্রী করোনা মোকাবিলার প্রস্তুতি গ্রহণ না করে এ সম্পর্কে হাস্যকর বক্তব্য দেন।[৮৭] মন্ত্রীদের এহেন বক্তব্য শুনে আমি লজ্জিত হই। জাপা সাংসদ মুজিবুল হক চৌধুরী ৬ ফেব্রুয়ারি সংসদে পয়েন্ট অব অর্ডারে বলেন, চীনের সাদার্ন এয়ারলাইনসে আগত দেড়শ' যাত্রী হযরত শাহজালাল বিমান বন্দর দিয়ে কোনো রকম পরীক্ষা ছাড়া বাংলাদেশে প্রবেশ করেন। তিনি সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীকে বিবৃতি দিয়ে দেশবাসীকে আশ্বস্ত করতে বলেন যে, বিনা পরীক্ষায় দেশে

৮৭. যেমন, পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, 'করোনা মারাত্মক রোগ নয়; এটা সর্দি জ্বরের মতো।'; সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী বলেন, 'করোনার চেয়েও আওয়ামী লীগের শক্তি অনেক বড়।'; সরকারদলীয় প্রেসিডিয়াম সদস্য জনাব মোহাম্মদ নাসিম বলেন, 'শেখ হাসিনার মতো নেত্রী পেয়েছি বলেই করোনা প্রতিরোধ করতে পারছি।'; তথ্যমন্ত্রী বলেন, 'করোনা নিয়ে বিএনপি জনগণকে আতঙ্কিত করছে।'; নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রী বলেন, 'শেখ হাসিনা থাকতে করোনা ভাইরাস আমাদের কিছু করতে পারবে না।'; এ ছাড়াও আরও কয়েকজন মন্ত্রী এমন দায়িত্বজ্ঞানহীন বক্তব্য প্রদান করেন।

প্রবেশকারীদের শরীরে করোনা ভাইরাস ছিল না।[৮৮] তবে বাংলাদেশে যতই পরীক্ষা বাড়ে ততই করোনা রোগী শনাক্ত হতে থাকে। বাড়তে থাকে মৃত্যুও। সরকার পরে বিষয়টিতে গুরুত্ব দেয়। প্রথমে ২৬ মার্চ থেকে ৪ এপ্রিল, পরে দফায় দফায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছুটি বাড়াতে থাকে। এ সময় সীমিত আকারে অফিস-আদালত খোলা হলেও সবাইকে ঘরে থাকতে অনুরোধ করা হয়। উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা বন্ধ ঘোষণা করা হয়। অনেক সরকারি বিশ্ববিদ্যালয় পরবর্তী নির্দেশ না দেয়া পর্যন্ত অনির্দিষ্টকালের জন্য ক্লাস-পরীক্ষা বন্ধ করে দেয়, যার মধ্যে আমার নিজের চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ও ছিল।

লকডাউনে জনগণকে উদ্বুদ্ধ করতে রাস্তাঘাটে পুলিশ এবং সেনাবাহিনী নামানো হয়। প্রথমদিকে এরা মানুষকে ঘরে থাকতে উদ্বুদ্ধ করেন। সঙ্গে চলে প্রশাসনিক তদারকি। প্রশাসন তো মানুষকে সেবাদানের জন্য। তাদেরকে কষ্ট দেবার জন্য নয়। করোনা নতুন ভাইরাস। জনগণ অশিক্ষিত ও স্বল্পশিক্ষিত। তারা এ সম্পর্কে বুঝেন না। তারা কি জানেন পিপিই কি? ভেন্টিলেটর কি? ফিজিক্যাল ডিসট্যান্সিং কতটুকু কিভাবে বজায় রাখতে হবে? না, অধিকাংশ মানুষই এ সব জানেন না। তাঁরা বুঝেন না 'লকডাউন' মানে কি। যে ফেরিওয়ালা সকালে ঘর থেকে বেরিয়ে উপার্জন করার পর চাল-ডাল কিনে সন্ধ্যায় ঘরে ফিরেন, তিনি কিভাবে লকডাউন বুঝবেন? যে রিক্সাওয়ালার রিক্সা না চালালে সংসার চলে না, তাঁর পক্ষে কি লকডাউন মানা সম্ভব? আমাদের দেশপ্রেমিক সেনাবাহিনীকে রাস্তায় দায়িত্ব পালনকালীন সময় গরিব মানুষের সঙ্গে ভালো ব্যবহার করতে দেখা যায়। চায়ের দোকানের আড্ডা ভাঙ্গতে, রাস্তার জটলা ও আড্ডাবাজি ভেঙ্গে দিয়ে ঘরে থাকতে তাঁরা জনগণকে বুঝিয়ে রাজি করান। বুঝান, তারা ঘরে থাকার ব্যাপারে যে কড়াকড়ি করছেন, তা তাদের কল্যাণের জন্য করছেন।

সরকারের প্রণোদনা প্যাকেজের ত্রাণ একদলীয়ভাবে বিতরণ করায় বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়। তবে পুলিশ ও প্রশাসনের লোকজন রাস্তায় জনগণের প্রতি অনেকক্ষেত্রে ভালো ব্যবহার করেননি। পুলিশ কিছুক্ষেত্রে জনগণকে প্রকাশ্যে লাঠিপেটা করে। প্রশাসনের কেউ কেউ লকডাউন তদারকির নামে মানুষের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করেন। প্রশাসকদের জনগণকে অবরোধ মেনে চলতে উদ্বুদ্ধ করতে নির্দেশনা দেয়া হয়। মানুষকে শাস্তি দিতে বলা হয়নি। কিন্তু কেউ কেউ এ নির্দেশ না মেনে জনগণকে শাস্তি দেন। যেমন, যশোরের মনিরামপুরের এসি ল্যান্ড অবরোধ পরিস্থিতির তদারকিতে গিয়ে গরীব বৃদ্ধ ভ্যানচালকেদের মুখে মাস্ক না থাকায় তাদেরকে কান ধরিয়ে ওঠবস করিয়ে শাস্তি দেন (ছবির জন্য দেখুন পরিশিষ্ট-১০:৮)। গরিব মানুষের প্রতি এহেন নির্দয় আচরণ সর্বস্তরে নিন্দিত হলে পরবর্তীতে তদন্ত কমিটি গঠন করে ওই প্রশাসককে দায়িত্ব থেকে প্রত্যাহার করে খুলনা বিভাগীয়

৮৮. প্রাসঙ্গিক তথ্যের জন্য দেখুন, *মানবজমিন*, ৭ ফেব্রুয়ারি, ২০২০।

কমিশনারের কার্যালয়ে ন্যস্ত করা হয়। এসব দেখে আমি মর্মাহত হই। করোনার কারণে আমার একাডেমিক পরিকল্পনা বাধাগ্রস্ত হয়।

যেহেতু এ নতুন মহামারির কোনো ঔষধ ছিল না, সে কারণে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা ঘোষিত স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলতে নাগরিকদেরকে মাইকিং করে অনুরোধ করা হয়। এর মধ্যে ছিল ঘন ঘন সাবান দিয়ে হাত ধোয়া, জরুরি প্রয়োজনে বাইরে গেলে মুখে মাস্ক পরিধান করা, জীবানুমুক্তকরণের জন্য হ্যান্ড স্যানিটাইজার ব্যবহার করা, ঘরে থাকলেও হালকা ব্যায়াম করে শারীরিক ফিটনেস বজায় রাখা, এবং ভিটামিন 'সি' ও জিঙ্কসমৃদ্ধ খাবার খেয়ে শরীরের রোগপ্রতিরোধক ক্ষমতা বৃদ্ধি করা। করোনার কাছে বিশ্বের মহাশক্তিধর বড় বড় রাষ্ট্রগুলো অসহায় হয়ে পড়ে। যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, ইতালি, ফ্রান্স, স্পেন, ইরানসহ পৃথিবীর প্রায় সব রাষ্ট্রেই এ অদৃশ্য ভাইরাস ছড়িয়ে পড়ে। মক্কায় কাবা শরিফের তাওয়াফ বন্ধ করা হয়। ওয়াজ মাহফিলসহ সকল ধর্মীয়, রাজনৈতিক ও সামাজিক সমাবেশ বন্ধ করা হয়। মসজিদে জামায়াতে অত্যন্ত সীমিতসংখ্যক লোক নিয়ে নামাজ পড়তে নির্দেশনা দেয়া হয়। বাংলাদেশে বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী, পহেলা বৈশাখসহ অন্যান্য অনুষ্ঠানাদি সীমিত করা হয়। দেশের পর দেশ, শহরের পর শহর লক ডাউন ঘোষণা করা হতে থাকে, যাতে মানুষের মাধ্যমে এ মরণব্যধি সংক্রামিত হতে না পারে। তবে বাংলাদেশে অধিকহারে দিনমজুর, শ্রমিক, রিক্সাওয়ালা ও ফেরিওয়ালা থাকায় তাদের অনেককেই পেটের দায়ে লকডাউন ভেঙ্গে ঘরের বাইরে আসতে হয়।

ত্রাণচুরি ও অব্যবস্থাপনা

সরকার গরিবদের জন্য প্রণোদনা প্যাকেজ ঘোষণা করলেও কিছুসংখ্যক সরকারদলীয় জনপ্রতিনিধি করোনার ত্রাণসামগ্রী আত্মসাৎ করেন। এসব ত্রাণচোরদের অনেকে হাতেনাতে ধরা পড়ে। তাদের দু'একজনের ঘরের মেঝে খুঁড়ে এবং অনেকের গোডাউন থেকে আত্মসাৎ করা চাউলের বস্তা উদ্ধার করা হয়। বক্স খাটের মধ্য থেকে উদ্ধার করা হয় আত্মসাৎকারীদের লুকিয়ে রাখা সয়াবিন তেলের ক্যান (প্রাসঙ্গিক ছবির জন্য দেখুন পরিশিষ্ট -১০:৯)। তবে দলীয় কারণে এদের শাস্তি হুমকি ধমকি, সতর্কীকরণ, আটক, বহিষ্কার, গ্রেফতার বা বরখাস্তের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ত্রাণ দুর্নীতিকারীদের বিরুদ্ধে কঠোর হুশিয়ারি দেন। তিনি বলেন, 'যদি প্রয়োজন হয়, সেখানে মোবাইল কোর্ট বসিয়ে তাৎক্ষণিকভাবে তাদের শাস্তি দেয়া হবে। বিচার পরে দেখা যাবে।'[৮৯] সেতুমন্ত্রী বলেন, ত্রাণ বিতরণ কার্যক্রমে কোনো ধরনের অনিয়ম সহ্য করা হবে না। আইজিপি ত্রাণচুরি রোধে পুলিশকে কঠোর হতে নির্দেশনা দেন। দুদক চেয়ারম্যানও ত্রাণ দুর্নীতিকারীদের আইনের আওতায় আনার কথা বলেন। জাসদ ব্যাখ্যা দেয়,

৮৯. দেখুন, *বিডিনিউজ টুয়েন্টিফোর ডটকম*, ২ এপ্রিল, ২০২০।

'ত্রাণ বিতরণে ভয়ঙ্কর চুরি নিরন্ন মানুষদের বিপন্ন করেছে। এ অবস্থা চলতে থাকলে হতদরিদ্রদের মাঝে তীব্র খাদ্যসঙ্কট দেখা দেবে।' এসব হুশিয়ারির পরও আমরা দেখি এপ্রিলের দ্বিতীয় সপ্তাহে জেলায় জেলায় ত্রাণের চালচুরির ঘটনা পত্র-পত্রিকায় ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ে।[৯০] তবে সরকার মুখে মুখে ত্রাণ চোরদের বিরুদ্ধে কঠোরতা প্রদর্শন করলেও তাদেরকে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিতে পারেনি। কারণ, ইতিপূর্বে এসব নেতা-কর্মীদের অনেককে দিয়ে তারা নির্বাচনে দুর্নীতি করিয়ে তাদের শাস্তির পরিবর্তে প্রশ্রয় দিয়েছে। ফলে এখন এসব নেতা-কর্মীরা কার নির্দেশনা শুনবেন? রাজনীতিবিদদের নাকি প্রশাসকদের? নির্বাচনের সময় যে এরা এদের নির্দেশে অন্যায় কাজ করেছেন তা তো ভুলে যাননি। এমন পরিস্থিতিতে ত্রাণের চাল চুরির ব্যাপারে সরকারের বড় গলার আওয়াজ শুনে আফ্রিকার একজন দুর্নীতি গবেষকের বক্তব্য বাংলাদেশের জন্য প্রযোজ্য মনে হয়। তিনি বলেন, 'রাজনৈতিক নেতৃত্বের কাছ থেকে বেশি বেশি দুর্নীতির বিরুদ্ধে ঘোষণা আসলে বুঝতে হবে এটা সংশ্লিষ্ট ঘোষকদের নিজেদের দুর্নীতি ঢাকবারই একটা কৌশল।'[৯১]

৯০. ত্রাণচুরির কয়েকটি পত্রিকার সংবাদ শিরোনামের জন্য দেখুন, 'ত্রাণের চালে রাক্ষুসে থাবা' (*যুগান্তর*); 'ত্রান চুরি বন্ধে পুলিশকে কঠোর নির্দেশনা' (*কালের কণ্ঠ*); 'হতদরিদ্রদের চাল চুরি— 'কাঙালের ধনেও থাবা' (*সমকাল*); 'চাল চুরির হিড়িক' (*ইনকিলাব*), 'চালের গাড়ি যাচ্ছিলো স্বেচ্ছাসেবক লীগ নেতার গোডাউন থেকে আওয়ামী লীগ নেতার বাড়িতে' (*মানবজমিন*); 'করোনাতেও ২২২৪ বস্তা সরকারি ত্রাণের চাল চুরি' (*কালের কণ্ঠ*); 'সরকারি ত্রাণ ক্ষমতাসীনদের বাড়িতে: রিজভি' (*প্রথম আলো*); 'নয়-ছয় তদন্তের পাঁয়তারা' (*ইনকিলাব*); 'লালমোহনে ইউপি সদস্যের ঘরের মাটি খুঁড়ে চাল উদ্ধার করলো পুলিশ' (*মানবজমিন*); 'পাবনায় ত্রানের চালসহ আটক আ'লীগ নেতাকে চেয়ারম্যান পদ থেকে বরখাস্ত' (*যুগান্তর*) 'খাগড়াছড়িতে ২৮ বস্তা চালসহ আটক ১' (*মানবজমিন*); ত্রাণের টাকা আত্মসাৎ, হটলাইন অকার্যকর' (*সমকাল*); 'শিবচরে একশ' বস্তা চালসহ সহযোগী আটক, পালালো আওয়ামী লীগ নেতা' (*মানবজমিন*); 'বিভিন্ন স্থানে ৭ জনকে সাজা, আটক ১০: আরও ৮শ' বস্তা চাল জব্দ' (*যুগান্তর*); ত্রাণ বিতরণে অনিয়ম, দুর্নীতি নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করবে দুদক' (*মানবজমিন*); 'মির্জাগঞ্জে চাল চুরি করে জরিমানা গুনলেন ইউপি সদস্য' (*যুগান্তর*); 'পেকুয়ায় চাল নিয়ে চালবাজি, জব্দ ৩০০ বস্তা' (*মানবজমিন*); 'গরিবের ত্রাণের চাল আত্মসাৎ করেছেন আওয়ামী লীগের নেতারা, ব্যবস্থা কী?' (*কালের কণ্ঠ*)। 'সিঙ্গাইরে চলছে চাল নিয়ে চালবাজি' (*মানবজমিন*); 'আড়াই টন চাল জব্দের ঘটনায় আ'লীগ নেতার বিরুদ্ধে এজাহার' (*যুগান্তর*); 'শরীয়তপুরে ৫৩ বস্তা চালসহ স্বেচ্ছাসেবক লীগ নেতা আটক' (*মানবজমিন*); 'পেকুয়ায় ইওএনও সাঙ্গীকা সাহাদাত প্রত্যাহার' (*কালের কণ্ঠ* অনলাইন); 'নড়াইলে চালচুরির মামলায় বরখাস্তকৃত ইউপি চেয়ারম্যান গ্রেফতার' (*মানবজমিন*); প্রমুখ।

৯১. দেখুন, Thomas M. Callaghy, `State-subject Communication in Zaire: Domination and the Concept of Domain Consensus', *Journal of Modern African Studies*, September, 1990. উল্লেখিত হয়েছে, মুহাম্মদ ইয়াহ্ইয়া আখতার, 'করোনার ত্রাণ চুরি সমাচার', *যুগান্তর*, ১৮ এপ্রিল, ২০২০।

সরকার করোনা মোকাবিলার প্রাথমিক ব্যবস্থাপনায় কিছু ভুল করে বলে আমার মনে হয়। সরকার যদি দেশব্যাপী সর্বদলীয় কমিটি করে ঐক্যবদ্ধভাবে বিষয়টি মোকাবিলা করত, তাহলে দুস্থদের মাঝে ত্রাণ বিতরণের কাজটি অধিকতর পেশাদারিত্বের সঙ্গে করা সম্ভব হত। এ ছাড়া ঘরে থাকা, মাস্ক পরিধান করা, এবং শারীরিক দূরত্ব বজায় রাখার সরকারি নির্দেশনা মানাবার ব্যাপারেও প্রশাসন জনগণকে সরকারের কথামতো কাজ করাতে পারেনি। মে মাসের মাঝামাঝি করোনার সংক্রমণ ও মৃত্যুর হার বৃদ্ধি পায়। যেখানে সৌদি আরবের মক্কায় পবিত্র কাবা শরিফের তাওয়াফ বন্ধ করা হয়, বন্ধ করা হয় মসজিদে জামায়াতে নামাজ পড়া, ওয়াজ মাহফিলসহ সকল ধর্মের মাহফিল, সেখানে বাংলাদেশ প্রথমদিকে এসব আমলে নেয়নি। গার্মেন্টস শ্রমিকদের কাজে যোগদানের সিদ্ধান্ত নিয়ে পরে তাদের আবার বাড়ি ফেরত পাঠাবার নির্দেশ দিয়ে করোনার সংক্রমণ বৃদ্ধি করেছে। আবার ১৮ এপ্রিল, ব্রাহ্মণবাড়িয়ার সরাইলে লক্ষাধিক লোক বাংলাদেশ খেলাফত মজলিসের নায়েবে আমির মাওলানা জুবায়ের আহমেদ আনসারীর জানাজার নামাজ পড়েন। যেখানে জুম্মার নামাজ ও পাঁচ ওয়াক্তের ফরজ নামাজে সরকার ১০-২০ জনের বেশি লোক সমাগম হতে দেয়নি, সেখানে প্রশাসনের উপস্থিতিতে সরকারি নীতিবিরোধী এতোবড় জানাজা নামাজ কেমন করে অনুষ্ঠিত হলো? কি করছিলেন ব্রাহ্মণবাড়িয়ার জেলা ও পুলিশ প্রশাসন? পরে এ কারণে পুলিশ প্রশাসনের দু'য়েকজনকে প্রত্যাহার করার আগেই ক্ষতি যা হবার তা হয়ে যায়। লাখো লোককে তো আর কোয়ারান্টাইনে রাখা সম্ভব ছিল না। এমন চরম দায়িত্বহীনতার শাস্তি কি কেবল দু'জন পুলিশ অফিসারকে দায়িত্ব থেকে প্রত্যাহার করা?

পৃথিবীর কতিপয় দেশে করোনা সামগ্রী ক্রয়, উৎপাদন, রোগী ভর্তি, প্রভৃতি নিয়ে দুর্নীতি হয়। নিম্নমানের করোনা পরীক্ষার কিট ক্রয়ের কারণে জিম্বাবুয়ের স্বাস্থ্যমন্ত্রী চাকুরি হারান। তবে করোনা দুর্নীতিতে সবচেয়ে এগিয়ে যায় বাংলাদেশ। এ দেশে করোনার ত্রাণচুরি থেকে শুরু করে করোনার সংগৃহীত নমুনা পরীক্ষা না করে ভুয়া সনদপত্র বিক্রয় করে একাধিক বেসরকারি হাসপাতালের কোটি কোটি টাকার অবৈধ বাণিজ্য করা দেখে আমি ব্যথিত হই। এতে একদিকে মানুষের জীবন বিপন্ন হয়, অন্যদিকে বহির্বিশ্বে ক্ষুণ্ন হয় দেশের ভাবমূর্তি। এসব প্রতিষ্ঠানের মধ্যে রাজধানীর রিজেন্ট হাসপাতাল, জোবেদা খাতুন হেলথ কেয়ার (জিকেজি) হাসপাতালের নাম উল্লেখ করা যায়। এ প্রতিষ্ঠানগুলো অবৈধ পন্থায় করোনার নমুনা পরীক্ষার অনুমতি সংগ্রহ করে। আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যগণ জিকেজির প্রধান আরিফ চৌধুরী ও তার স্ত্রী ডা. সাবরিনা চৌধুরী, রিজেন্ট হাসপাতালের প্রতিষ্ঠাতা শাহেদ করিমকে গ্রেফতার করে রিমান্ডে নিলে চাঞ্চল্যকর দুর্নীতির তথ্য প্রকাশ পায়। এ রকম দুর্নীতি করে এরা একদিকে যেমন দেশে করোনার সংক্রমণ বৃদ্ধি করে, তেমনি অন্যদিকে আন্তর্জাতিক বিশ্বে দেশের ভাবমূর্তি ভূলুণ্ঠিত করে। এমতাবস্থায় *দ্য নিউইয়র্ক টাইমস* 'বিগ বিজনেস ইন বাংলাদেশ: সেলিং ফেক করোনাভাইরাস সার্টিফিকেট' শিরোনামে প্রতিবেদন

প্রকাশ করে। দুর্নীতি ও ব্যর্থতার দায়ে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালক পদত্যাগ করেন। দেশ ও সরকারের ভাবমূর্তি ম্লান করার জন্য এর চেয়ে ক্ষতিকর কাজ আর কি হতে পারে? এমন দুর্নীতিকারীদের কয়েকজন আটক হন। এদের শাস্তি হতে পারে। তবে এরা যেসব গডফাদারের প্রশ্রয়ে এহেন দুর্নীতি করেন, তাদের কিছুই হয়নি। আমার অতীত অভিজ্ঞতা বলে, দুর্নীতির গডফাদারগণের নাম প্রকাশিত হয় না, তারা পর্দার অন্তরালেই থেকে যান।[৯২] দেশপ্রেমিক নাগরিকদের মতো আমিও এ সব দেখে কষ্ট পাই। লক্ষ্য করি, কতিপয় সরকারের সুবিধাভোগী লেখক অন্যান্য কতিপয় দেশে করোনাকেন্দ্রিক দুর্নীতির খবর প্রকাশ করে তার সঙ্গে বাংলাদেশের করোনাবিষয়ক দুর্নীতির বিষয়টিকে একই কাতারভুক্ত করে দেখান। আমি আমার লেখায় এ বিষয়টির প্রতিবাদ করে বলি, দুটি কারণে অন্য দেশের করোনাকেন্দ্রিক দুর্নীতির সঙ্গে বাংলাদেশের এ বিষয়ক দুর্নীতিকে এক কাতারভুক্ত করা যাবে না। প্রথমত, বিশ্বের আর কোনো দেশে করোনা পরীক্ষার জন্য সংগৃহীত নমুনা পরীক্ষা না করেই ভুয়া সনদপত্র বিক্রয় করা হয়নি। দ্বিতীয়ত, অন্যান্য দেশে করোনাকেন্দ্রিক দুর্নীতি হয়েছে স্বাভাবিক সময়ে, কিন্তু বাংলাদেশে এ দুর্নীতি হয়েছে সরকারের দুর্নীতির বিরুদ্ধে 'শূন্য সহনশীলতা' নীতি চলাকালীন সময়ে।[৯৩]

দ্রুততম সময়ে কঠোর শাস্তি না হওয়ায় করোনাকেন্দ্রিক দুর্নীতি চলমান থাকে। জুলাই মাসে চাঞ্চল্যকর দুর্নীতি ধরা পড়ার পর আবার আগস্টে কোভিড-১৯ ইমার্জেন্সি রেসপন্স অ্যান্ড প্যান্ডেমিক প্রিপেয়ার্ডনেস (ইআরপিপি) প্রকল্পের কেনাকাটায় ব্যাপক দুর্নীতি হয়। সিম কর্পোরেশন নামের একটি নামসর্বস্ব ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান বাজারদরের চেয়ে অনেক বেশি দাম দেখিয়ে ক্রয় প্রক্রিয়ার নিয়মনীতি উপেক্ষা করে ঔষধ প্রশাসন অধিদফতরের এনওসি ছাড়া চীন থেকে চোরাচালানের মাধ্যমে মাস্ক ও ইনফ্রায়েড থার্মোমিটার আনে। এসব ৯ কোটি ২০ লক্ষাধিক টাকার পণ্য টেকনিক্যাল কমিটির অনুমোদন পাওয়ার আগেই দুর্নীতিকারীগণ কারসাজি করে দু'দফায় ৮ কোটি ২৮ লাখ টাকা তুলে নেয়।[৯৪]

---

৯২ প্রাসঙ্গিক তথ্যের জন্য দেখুন, শওকত হোসেন, 'করোনায় দুর্নীতির অভিনবত্বে এগিয়ে বাংলাদেশ', *প্রথম আলো*, ২০ জুলাই, ২০২০; আল-আমিন, 'শাহেদের ২৫ সদস্যের গ্যাং', *মানবজমিন*, ১৩ জুলাই, ২০২০; শুভ্র দেব, 'রিমান্ডে যা বললেন সাবরিনা', *মানবজমিন*, ১৩ জুলাই, ২০২০; রুদ্র মিজান, 'শাহেদকে ছাড়াতে তদবির করেছিল যারা', *মানবজমিন*, ১৮ জুলাই, ২০২০; আল-আমিন ও শুভ্র দেব, '৪ সুন্দরীর ফাঁদ শাহেদের, সাবরিনা ফের রিমান্ডে', *মানবজমিন*, ১৮ জুলাই, ২০২০।

৯৩ প্রাসঙ্গিক আলোচনার জন্য দেখুন, মুহাম্মদ ইয়াহ্ইয়া আখতার, 'চুনোপুঁটি হাজতে, রাঘববোয়লরা কোথায়?', *যুগান্তর*, ২৫ জুলাই, ২০২০।

৯৪ দেখুন, রাশেদ রাব্বি, 'নয় কোটি টাকার ক্রয়ে আট কোটিই লোপাট', *যুগান্তর*, ২ সেপ্টেম্বর, ২০২০।

একই সময় কুয়েত বাংলাদেশ মৈত্রী হাসপাতালেও করোনাসংক্রান্ত যন্ত্রপাতি ক্রয়ে ব্যাপক দুর্নীতির অভিযোগ ওঠে। হাসপাতালের ক্রয় কমিটিকে পাশ কাটিয়ে মেসার্স আলী ট্রেডার্স নামের একটি নামসর্বস্ব প্রতিষ্ঠানকে হাসপাতালের তত্ত্বাবধায়ক ১২ কোটিরও অধিক টাকা মূল্যের যন্ত্রপাতি ক্রয়ের কার্যাদেশ দেন। এসব মালামাল স্টোরে জমা হবার আগেই পরিশোধ করে দেয়া হয় সব বিল।[৯৫] মানুষের জীবন-মরণ নিয়ে এহেন দুর্নীতি দেখে বিবেকবান নাগরিকগণ হতাশ হয়ে পড়েন। আমিও কষ্ট পাই।

নাগরিকদের মধ্যে ২০২০ সালের জুলাই আগস্ট-মাসের দিকে করোনাকে আমলে না নেবার প্রবণতা বৃদ্ধি পায়। মানুষ অনেকটা স্বাভাবিকভাবে চলাফেরা শুরু করেন। অফিসেও সেবাগ্রহীতাদের ভিড় লক্ষিত হয়। যদিও এ সময় রোগতত্ত্ব, রোগ নিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা ইন্সিটিটিউট (আইসিইডিসিআর) ইউএসএইড এবং বিল অ্যান্ড মিলেন্ডো গেটস ফাউন্ডেশনের অর্থায়নে ১৮ এপ্রিল থেকে ৫ জুলাই রাজধানীর দুই সিটি কর্পোরেশনে জরিপ পরিচালনা করে দেখায়, সরকারি হিসেবের চেয়ে জনগণের মধ্যে করোনার সংক্রমণ ১০ গুণ বেশি। সে হিসেবে ওই সময় ঢাকার ২ কোটি জনসংখ্যার মধ্যে ১৮ লাখ ছিল করোনাক্রান্ত। এর মধ্যে উপসর্গহীন করোনাক্রান্তদের সবচেয়ে বিপজ্জনক হিসেবে বিবেচনা করা হয়। কারণ, এদের স্বাভাবিক চলাফেরায় করোনা অধিকহারে সংক্রমিত হয়।

অদ্ভুত মানবাচরণ

করোনার সময় বাংলাদেশে মানুষের সাধারণ মনস্তত্ত্ব কাজ করেনি। যেখানে প্রতিদিন হাজার হাজার মানুষ মহামারিতে সংক্রামিত হচ্ছেন, মারা যাচ্ছেন ৩০ থেকে ৫০ জনের মতো, তেমন দুঃসময়ে বারবার ছুটি ঘোষণা করে ঘরে থাকতে বলার সরকারি আহ্বান পালিত হয়নি। এ বিষয়ে সরকারি তদারকিও ছিল দুর্বল। ঘর থেকে বেরিয়ে মানুষ নিজে সংক্রামিত হয়ে অন্যদেরকেও সংক্রামিত করেছেন। মৃত্যুঝুঁকি নিয়ে সীমিত লকডাউনে করোনা উপেক্ষা করে তারা ঈদের কেনাকাটা করতে শপিং মলে ছুটেছেন। এ কেমন মনস্তত্ত্ব! জীবনের চেয়ে কি ঈদের নতুন পোষাক বেশি জরুরি? রিক্সাওয়ালা বা ফেরিওয়ালাদের পেটের তাগিদে রাস্তায় বের হওয়া মেনে নেয়া যায়। কিন্তু শিক্ষিত, স্বচ্ছল লোকজন করোনাকালে ঈদ শপিংয়ে গেলে সে মনস্তত্ত্ব অনুধাবন করা দুরূহ। করোনা নিজে চরিত্রভ্রস্ট হয়নি। এ নিঃষ্ঠুর ভাইরাস দল, মত, পেশা, শ্রেণি নির্বিশেষে সবাইকে আক্রমণ করেছে। অথচ মানুষ তার স্বাভাবিক মনস্তত্ত্ব ভুলে গরীবের ত্রাণের চাল চুরি করেছে। জনপ্রতিনিধি হয়ে ক্ষুধার্ত দুস্থের ত্রাণসামগ্রী আত্মসাৎ করেছে! দরিদ্রদের জন্য বরাদ্দকৃত চাল তাদের না দিয়ে জনপ্রতিনিধিরা নিজ আত্মীয়স্বজন

---

৯৫ দেখুন, *মানবজমিন*, ২ সেপ্টেম্বর, ২০২০।

ও আস্থাভাজনদের নামে উত্তোলন করে বিক্রয় করেছে। পত্রিকার সংবাদ অনুযায়ী খাদ্য সহায়তা কর্মসূচির কার্ড বিতরণেও হয়েছে দুর্নীতি ও পক্ষপাতিত্ব। এদের মধ্যে যাঁরা ধরা পড়েন, তাঁদের দু'চারজন 'ম্যানেজ' করে বাঁচলেও দু'চারজনের শাস্তিও হয়েছে। কাজেই করোনার মতো বৈশ্বিক মহামারিও বাংলাদেশি জনপ্রতিনিধিদের মনে মৃত্যুভয় জাগাতে পারেনি। বিষয়টি মনস্তত্ত্ববিদদের জন্য নতুন গবেষণার বিষয়।

মনস্তত্ত্ববিদরা তাদের তত্ত্ব ব্যবহার করে এসব ব্যাখ্যা করতে পারবেন। কিন্তু আমরা সাধারণ মানুষ ভাবি, একজন নাগরিকের ঘরে আগুন লাগলে প্রতিবেশিরা তাকে সহায়তা করেন। তার ঘরের আগুন নেভাতে এগিয়ে আসেন। তেমনি মহামারির মতো বড় কোনো বিপদেও মানুষ বিপদগ্রস্তদের পাশে দাঁড়াবেন। কিন্তু করোনাকালে এ ভাবনা কাজ করেনি। আমাদের বিশ্লেষণে মনে হয়, জনপ্রতিনিধিরা করোনাকালে মৃত্যুকে ভয় পেলেও দুর্নীতিকে ভয় পাননি। কারণ, তাঁরা কিভাবে জনপ্রতিনিধি হয়েছেন, তাঁরা তা ভালোই জানেন। দেশের আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক দুর্নীতির গতিবিধি সম্পর্কেও তারা অবহিত। তাঁরা আরও দেখেছেন যে, সংসদ থেকে শুরু করে সব রকম নির্বাচনে দুর্নীতি করে প্রশ্রয় পাওয়া যায়। সরকারের দুর্নীতির প্রতি 'জিরো টলারেন্স' নীতি ঘোষণার পর অনুষ্ঠিত নির্বাচনগুলোতেও দুর্নীতিকারীরা প্রশ্রয় পেয়েছে। এ অভিজ্ঞতা থেকে জনপ্রতিনিধিরা ভেবেছেন, ত্রাণ নিয়ে দুর্নীতি করে তারা বিপদে পড়বেন না। একইভাবে অপরাধীদের মনস্তত্ত্বেও করোনা কোনো প্রভাব রাখতে পারেনি। এ কারণে করোনার আবির্ভাবের পর খুন, ধর্ষণসহ সামাজিক অপরাধ কমেনি। বরং কতিপয় অপরাধীর পিপিই পরিধান করে করোনার নমুনা সংগ্রহের নামে বাসাবাড়িতে চুরি ডাকাতি করার খবর পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।

করোনা বিশ্বব্যাপী লাখ লাখ প্রাণ সংহার করলেও এর কিছু ইতিবাচকতাও ছিল। আমার দৃষ্টিতে করোনা কেবল প্রাণ সংহার করেনি, বিশ্বমানব সমাজের সাধারণ মেডিকেল জ্ঞান বৃদ্ধি করেছে। কিভাবে রোগপ্রতিরোধক ক্ষমতা বাড়ানো যায়, কিভাবে শরীর সুস্থ্য রাখা যায়, কিভাবে সাবানে হাত ধুয়ে সংক্রমণ রোধ করা যায়, এ বিষয়গুলো সম্পর্কে বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার নির্দেশনা মাইকিং করে দেশে দেশে প্রচারিত হয়েছে। গণমাধ্যমে অব্যাহতভাবে স্বাস্থ্যবিধির ঘোষণা দেয়ায় এ সম্পর্কে মানুষের প্রাথমিক জ্ঞান বেড়েছে। কি লক্ষণ দেখে বুঝতে হবে করোনা হয়েছে কিনা সে সম্পর্কেও মানুষ ওয়াকিবহাল হয়েছেন। এর সঙ্গে সাধারণ জনগণ করোনার কারণে কিছু অপরিচিত মেডিকেল টার্মের সঙ্গে পরিচিত হয়েছেন। এর মধ্যে রয়েছেঃ কোভিড-১৯, পিপিই, এন৯৫ মাস্ক, করোনা টেস্টিং কিট, এন্টিবডি, স্যানিটাইজার, ফিজিক্যাল ডিসট্যান্সিং, ব্রিদিং এক্সারসাইজ, ভেন্টিলেটর, হোম কোয়ারান্টাইন, ড্রপলেট, আইসোলেশন, লক ডাউন, ইমিউনিটি, কমিউনিটি ট্রান্সমিশন, প্রভৃতি। এ ছাড়া ওষুধ ও ভ্যাকসিন তৈরির গবেষণাকে করোনা গতিশীল করেছে। করোনাকালের সামাজিক ও পারিবারিক বন্ধন সাধারণ সময়ের চেয়ে

অধিকতর মজবুত হয়েছে। গতিশীলতা বেড়েছে ফেসবুকসহ অন্যান্য সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহারে। আমি নিজে করোনাকলে গৃহবন্দি অবস্থাকে ইতিবাচকভাবে ব্যবহার করেছি। এই একাডেমিক অটোবায়োগ্রাফি লেখার কাজটি আমি পাঁচ-ছয় বছর আগে শুরু করলেও করোনার সময়ে নিরবচ্ছিন্ন অবসর সময় পাওয়ায় কাজটি এগিয়ে নেয়া সম্ভব হয়েছে। এ সময় পত্রিকায় কলাম লেখা ছাড়াও কিছু গল্প লিখেছি। এ ছাড়া করোনাকালে আমি তিনটি চিত্রনাট্যের স্ক্রিপ্ট লিখেছি, যার দুটি চিত্রায়নের জন্য পরিচালকদের কাছে জমা দিয়েছি। করোনায় গৃহবন্দি না হলে হয়ত এসব কাজগুলো এত কম সময়ে করা সম্ভব হত না।

নূর নবীর ফোন

বাসায় ওয়াইফাই থাকায় নেটওয়ার্কের মধ্যে থাকি। কিন্তু ২৮ এপ্রিল বাসার বাইরে কয়েক ঘন্টা কাটিয়ে ঘরে এসে দেখি নূর নবী নামে কেউ আমাকে ৪-৫ বার মেসেঞ্জারে ফোন দিয়েছেন। ভদ্রলোককে চিনতে পারিনি বলে আর কলব্যাক করিনি। কিন্তু আধঘন্টা পর আবার ফোন এল। এবার ভদ্রলোক পরিচয় দেবার পর চিনলাম। ইনি বইয়ের ব্যবসা করেন। চট্টগ্রাম নিউমার্কেটের কাছে এবং ঢাকার বনানীতে জনাব নবীর বইয়ের দোকান আছে। মূলত তাঁর ব্যবসা বিদেশি বই এনে বিক্রয় করা। ইউরোপ, আমেরিকা, ভারতসহ প্রায় সব দেশ থেকে গ্রাহকের চাহিদা অনুযায়ী তিনি বই আনেন। যাহোক, কুশলাদি বিনিময়ের পর তিনি বললেন, তাঁর কাছে আমার ফোন নম্বর ছিল না। সরকারদলীয় নেতা উপাধ্যক্ষ আবদুস শহীদের সঙ্গে তাঁর সখ্য আছে। এই নেতা নাকি আমার *যুগান্তর* পত্রিকার ১৮ এপ্রিল সংখ্যায় প্রকাশিত 'করোনার ত্রাণ চুরি সমাচার' শীর্ষক প্রবন্ধটি পড়েছেন। তার পর তিনি এ বিষয়ে তাঁর সঙ্গে মত বিনিময় করার পর প্রবন্ধিক সম্পর্কে তাকে জিজ্ঞেস করেছেন এবং আমার ফোন নম্বর আছে কিনা জানতে চেয়েছেন। উপাধ্যক্ষ শহীদ সাহেব আওয়ামী লীগের শালীন নেতাদের মধ্যে একজন। তাঁর অনেক টকশো আমি শুনেছি। কথাবার্তায় আক্রমণাত্মক নন। যাহোক, নূর নবী ভাই আমাকে বললেন, ওনার সঙ্গে কি আপনাকে আমি একটু মিলায়ে দেব। উনি এ কথার মধ্য দিয়ে কি বুঝাতে চাইলেন আমার কাছে তা স্পষ্ট হয়নি। আমি বললাম, শহীদ সাহেব একজন ভদ্র নেতা। মিলিয়ে দিবেন না কি করবেন আমি জানি না। তবে উনি যদি আমার ফোন নম্বর চান তাহলে আপনি অবশ্যই আমার ফোন নম্বর দিবেন। উনি কেন, যে কোনো ব্যক্তি আমার ফোন নম্বর চাইলে আপনি দিতে পারেন। কারণ, আমার ফোন নম্বর কোনো গোপনীয় কিছু নয়। আর আমিও কোনো ভিআইপি নই। আমার ফোন নম্বর তো বিশ্ববিদ্যালয়ের ডায়েরিতে ছাপা আছে। পরে এই নেতার কোনো ফোনকল পাইনি। আর ফোন পেলেও কোনো উদ্বেগের কিছু ছিল না। কারণ, উল্লিখিত প্রবন্ধে আমি যা লিখেছিলাম তাতে কোনো অতিরঞ্জন বা মিথ্যাচার ছিল না। ওই প্রবন্ধে আমি ত্রাণ ও রিলিফ চুরির ধারাবাহিক একাডেমিক আলোচনার মধ্য দিয়ে করোনাকেন্দ্রিক ত্রাণচুরির বিষয়টি তুলে ধরেছিলাম।

টাইম পাসে অসুবিধা

করোনা শুরু হবার প্রথম এক দু'মাস মানুষ ঘরে থাকতে অসুবিধা বোধ করেনি। কিন্তু পাঁচ-ছয়মাস পর ফলদায়ক সরকারি পলিসি গৃহীত না হওয়ায় করোনার প্রভাব বাড়তে থাকে এবং তা দেশের সব জেলায় ছড়িয়ে পড়ে। অন্যদের মতো আমিও ঘরে থাকতে থাকতে বিরক্ত হয়ে উঠি। লেখালেখি করে, টিভি দেখে, নাটক দেখে, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহার করে প্রথম কয়েক মাস সময় অতিবাহিত করার পর আর ভালো লাগে না। তাছাড়া প্রতিদিন মৃত্যু আর সংক্রমণের হার বৃদ্ধি পাওয়ায় মনের ওপর তার একটা প্রভাব পড়ে। ক্রমান্বয়ে আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব ও পরিচিতজনদের সংক্রমণ ও মৃত্যুর খবরে মন ভারাক্রান্ত হয়। এ সময় আমি ঘরের বাইরে যাওয়া প্রায় বন্ধ করে দেই। প্রায় ১৫-২০ দিন পর একবার মাস্ক পরে কোনরকম বাইরে গিয়ে ওষুধপত্র বা বেশি করে প্রয়োজনীয় মাছ তরকারি কিনে নিয়ে আসি। আর বাসায় ফিরে বাথরুমে ঢুকে সাবান দিয়ে গোসল করে ফেলি। স্কুলের সহপাঠী আরিফ আহমেদ এবং নিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগের শিক্ষক সাবরিনা সুইটি করোনাক্রান্ত হয়ে মারা গেলে মনটা আরও দুর্বল হয়ে পড়ে। আত্মীয়স্বজনদের কয়েকজনের আক্রান্তের খবরে মন অশান্ত হয়ে ওঠে। এ সময় সিনেমা নাটক দেখে ঘরে সময় কাটাতে ভালো লাগে না। শারীরিক ফিটনেস ঠিক রাখার জন্য রাস্তায় না গিয়ে ঘরেই হাঁটাহাঁটি করি। দোতলায় বাসা হওয়ায় এবং রাস্তা দিয়ে ফেরিওয়ালা যাওয়ায় ব্যাগে দড়ি বেঁধে তার মধ্যে টাকা দিয়ে কুয়ো থেকে পানি তোলার মতো করে মাছ, তরকারি ও ফল কেনা শুরু করি। ভাংতি টাকা ফেরত পেলে সেগুলি সাবান দিয়ে ধুয়ে এবং ব্যবহৃত ব্যাগ ৫-৭ ঘন্টা রোদে ঝুলিয়ে রেখে জীবানুমুক্ত করি। মোট কথা যত রকম সতর্কতা গ্রহণ করা সম্ভব, তার সবই করি। তবে অনেকে ঘরে থেকেও আক্রান্ত হচ্ছে বলে খবর পাই। আমার স্কুলজীবনের বন্ধুবান্ধবদের 'স্কুল ফ্রেন্ডস' নামে হোয়াটসআপ গ্রুপে পোস্ট দিয়ে ও চ্যাটিং করে কিছুটা সময় কাটাই। এর মধ্যে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে গতিশীলতা বৃদ্ধি পায়। অনেকে জুম কনফারেন্স করে আড্ডা দেয়। আমাদের গ্রুপের বন্ধুরা ২০২০ সালের ২৬ জুন রাত আটটায় একটি জুম আড্ডার আয়োজন করে। আমি আগে স্কাইপিতে দেশ-বিদেশে কথা বললেও এসব ব্যাপারে কাঁচা। আমাকে লিংক পাঠানো হলে আমি এ আড্ডায় অংশগ্রহণ করি। দেশ-বিদেশে অবস্থানরত সহপাঠী বন্ধুদের চেহারা দেখে এবং তাদের সঙ্গে কথা বলে ভালো লাগে। এই জুম আড্ডায় ঢাকা থেকে ১০ জন, খুলনা থেকে ২ এবং সিঙ্গাপুর এবং কানাডা থেকে একজন করে বন্ধু যোগ দেয়[৯৬]

৯৬. জুম কনফারেন্সে যোগদানকারী বন্ধুদের মধ্যে ঢাকা থেকে ফয়সাল, রতন, মাসুদ, সিরাজ, রাজ, শহীদুল্লাহ, রহিম, মুনীর, হাফিজুর, জাহিদুল; খুলনা থেকে ইয়াহইয়া ও কচি এবং সিঙ্গপুর ও কানাডার টরেন্টো থেকে যথাক্রমে কিরণ ও মাসুদ যোগ দেয়।

(জুম আড্ডার স্থিরচিত্রের জন্য দেখুন পরিশিষ্ট- ১০:১০)। পরবর্তীতে গ্রুপ বন্ধুদের মধ্যে মতবিরোধ ও বাগযুদ্ধ লক্ষ্য করি। গ্রুপ পরিচালকরা রাজনৈতিক বিষয়ে কথা বলা ও পোস্ট দেয়াকে নিরুৎসাহিত করায় আমি গ্রুপে থাকলেও নিজেকে গুটিয়ে নেই। কারণ, আমি রাজনীতির শিক্ষক হিসেবে কথা বললে রাজনীতি চলে আসে। ডিজিটাল সিকিউরিটি অ্যাক্ট চলাকালীন পত্রিকায় রাজনৈতিক বিষয় লিখতে এবং বাইরে এ বিষয়ে কথা বলতে পারছি। অথচ আমার প্রিয় স্কুলবন্ধুদের সঙ্গে খোলামনে সবকিছু আলোচনা করতে পারব না কেন? এ বিষয়টি মেনে নিতে না পারাই আমার গ্রুপে নিষ্ক্রিয় হবার কারণ।

অক্টোবর মাসে দুটি ওয়েবিনারে যোগ দেই। এর একটির আয়োজক ঢাকাস্থ আমেরিকান দূতাবাস। 'Reimaging Higher Education in a Post-Covid-19 World' শীর্ষক বিষয়ে কথা বলেন আমেরিকার পারডিউ ইউনিভার্সিটি গ্লোবাল এর চ্যান্সেলর ড. ফ্রাংক জে. ডুলি এবং ঢাকার ইউনিভার্সিটি অব লিব্যারাল আর্টস (ইউল্যাব) এর প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর ড. শামসাদ মর্তুজা। ভার্চুয়াল ক্লাস ও অনলাইনে লেখাপড়ার বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে মূলত এ ওয়েবিনারে আলোচনা হয়। আর অন্যটি হলো চট্টগ্রামস্থ রোট্যারাক্ট ক্লাব অব ইসলামাবাদ এর ৫ পর্বের সিরিজ ওয়েবিনারের তৃতীয়টিতে আমাকে কি-নোট স্পিকার হিসেবে আমন্ত্রণ জানায়। আলোচনার বিষয় ছিল 'Generation Tune with Fight Back Strategy.' এ ওয়েবিনার সম্পর্কে আয়োজকরা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে প্রচারণা চালান (প্রচারণার ব্যানারের ছবির জন্য দেখুন পরিশিষ্ট- ১০:১১)। এ ওয়েবিনারে আমি তরুণ প্রজন্ম কিভাবে করোনার সঙ্কটকালীন গৃহবন্দি সময়কে ইতিবাচকভাবে ব্যবহার করতে পারে তার ওপরে পরামর্শ দিয়েছি। বলেছি ক্যারিয়ার প্লানিং এবং লাইফ ডিজাইনিংসহ কিভাবে মাদক এবং হতাশামুক্ত থেকে তরুণ শিক্ষার্থীরা করোনাকালীন সময়টাকে ইতিবাচকভাবে ব্যবহার করতে পারে, সে সম্পর্কে। আরও বলেছি পরিবর্তিত ক্যাম্পাস সংস্কৃতি, ছাত্র-শিক্ষকদের দলীয় রাজনীতির লেজুড়বৃত্তি কিভাবে আমাদের শিক্ষার মান কমিয়ে দিচ্ছে সে সম্পর্কে সজাগ থাকতে। সজাগ থাকতে আমাদের ভাষা ও স্বাধীনতা আন্দোলন সম্পর্কে। পরে প্রশ্ন-উত্তর সেশনে অংশগ্রহণকারীদের প্রশ্নের জবাব দিয়েছি।

নভেম্বরের ১১ তারিখে আরটিভির রাতের টক'শো 'গণতন্ত্রের সংলাপ'-এ অংশগ্রহণ করি। শ্যামল দত্তের উপস্থাপনায় এ টকশো'র আলোচনার বিষয় ছিল: 'রাজনীতি: নূর হোসেন, গণতন্ত্র ও সহিষ্ণুতা'।[৯৭] এ আলোচনায় আমি চলমান

৯৭. এ টক'শোতে আমার সঙ্গে আর যাঁরা অংশগ্রহণ করেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন সরকারদলীয় এমপি শামীম ওসমান, বিএনপি চেয়ারপার্সনের উপদেষ্টা আবদুস সালাম, বিপ্লবী ওয়ার্কার্স পার্টির সাধারণ সম্পাদক সাইফুল হক এবং জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ড. মীজানুর রহমান।

রাজনৈতিক সঙ্কট উত্তরণে মুক্তিযুদ্ধের চেতনার ওপর দেশকে প্রতিষ্ঠিত করার কথা বলি। স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র এবং মুক্তিযুদ্ধের মূল স্পিরিট ছিল যেহেতু গণতন্ত্র, আর গণতন্ত্রের প্রাণভোমরা যেহেতু নির্বাচন; সে জন্য আমি গ্রহণযোগ্য ভোট ব্যবস্থার মাধ্যমে নির্বাচন অনুষ্ঠানের ওপর গুরুত্ব দিয়ে কথা বলি। আরও বলি, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, মন্ত্রী-এমপিগণ নিজ নিজ ক্ষমতায় থেকে, সংসদ না ভেঙ্গে দলীয়করণকৃত প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের সংশ্লিষ্টতায় দুর্বল ইসির অধীনে অনুষ্ঠিত নির্বাচন সুষ্ঠু হতে পারে না। সাংবিধানিক সুযোগ থাকা সত্ত্বেও ক্ষমতার স্বাদ গ্রহণকারী তিনটি দলের নির্বাচন কমিশন গঠনের জন্য আইন তৈরি না করার দুরভিসন্ধিমূলক কাজকে সমালোচনা করি। আমি আরও বলি, আমরা ফ্লাইওভার, সেতু বা মেট্রোরেলের জন্য মুক্তিযুদ্ধ করি নাই। আমরা সংখ্যাগরিষ্ঠ পাকিস্তানবাসীর ভোটের অমর্যাদা করে বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক অধিকার কেড়ে নেবার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে যুদ্ধ করে পাকিস্তানীদের পরাজিত করেছিলাম। দেশে ভোটের ভূলুণ্ঠিত মর্যাদা পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য নির্বাচনী ব্যবস্থায় পরিবর্তন এনে গণতন্ত্রকে কার্যকরী করতে আহ্বান জানাই। দর্শকশ্রোতাগণ আমার এ বক্তব্য ইতিবাচকভাবে গ্রহণ করেন।

একই মাসের ১৮ তারিখে বাংলাদেশ তরুণ কলাম লেখক ফোরাম (বিটিসিএলএফ) চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় শাখার নবীণ বরণ অনুষ্ঠানে আমাকে প্রধান অতিথি করলে ওই ভার্চুয়াল অনুষ্ঠানে যোগদান করে শিক্ষার্থীদের লেখালেখির কাজে উৎসাহিত করি। কোভিড-১৯ এর গৃহবন্দি সময়টাকে লেখালেখির কাজে ব্যবহার করতে ফোরাম সদস্যদেরকে নানা রকম পরামর্শ দেই। পরামর্শ দেই কিভাবে একটি পত্রিকার জন্য মানসম্পন্ন কলাম লিখতে হয় সে সম্পর্কে (অনুষ্ঠানের ছবির জন্য দেখুন পরিশিষ্ট- ১০:১২)। পরবর্তীতে আমাকে এবং লেখক ও সাংবাদিক চট্টগ্রাম রিপোর্টার্স ফোরামের সাধারণ সম্পাদক জনাব আলীউর রহমানকে ফোরামের উপদেষ্টা মনোনীত করা হয়। মাত্র কয়েক মাসের মধ্যে ফোরামটি চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের মধ্যে লেখালেখির জনপ্রিয় প্লাটফরম হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং এর সদস্যসংখ্যা হাজার ছাড়িয়ে যায়। পরে দুজন উপদেষ্টাকে নিয়ে আবারও ফোরাম সদস্যরা ২০২১ সালের ১৮ জুন 'লেখালেখির সামাজিক প্রভাব ও তরুণ লেখকের গুরুত্ব' শীর্ষক ওয়েবিনারের আয়োজন করে (এ ওয়েবিনারের প্রচারপত্রের জন্য দেখুন পরিশিষ্ট-১০:১৩)। শিক্ষার্থীদেরকে লেখালেখিতে উদ্বুদ্ধ করতে আমার বিটিসিএলএফ এর চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় শাখায় প্রদত্ত দুটি বক্তৃতা শিক্ষার্থীদের মধ্যে গ্রহণযোগ্যতা ও প্রশংসা পায়। এর মধ্যে ১৭টি বিশ্ববিদ্যালয়ে বিটিসিএলএফ-এর শাখা গঠিত হয়। তবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নতুন কমিটি গঠন উপলক্ষে বিটিসিএলএফ-এর অনুষ্ঠানে অন্য কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনো শিক্ষককে দাওয়াত না দিলেও আমাকে অতিথি হিসেবে কেন যে আমন্ত্রণ জানানো হয় জানি না। এই অনুষ্ঠানের প্রচারপত্রে আনিসুল হককে প্রধান অতিথি এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কতিপয়

শিক্ষকের অতিথি হিসেবে নাম ছিল। আমাকে অতিথি হিসেবে আমন্ত্রণ জানিয়ে প্রচারপত্রে আমার নাম উল্লেখ না করার বিষয়টি আমার চোখে পড়ে। কিন্তু শিক্ষার্থীদের স্বার্থের কথা চিন্তা করে আমি এ প্রসঙ্গে তেমন কিছু না বলে সংক্ষিপ্ত বক্তৃতা করি। পরে বিটিসিএলএফ-এর চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় শাখারও নতুন কমিটি গঠিত হয়। এসব কাজ ছাড়াও সময় কাটাবার জন্য একটি রাজনৈতিক প্রবন্ধ সংকলনের পাণ্ডুলিপি তৈরির কাজ শুরু করলেও মনোসংযোগ করতে পারিনি। করোনার কারণে চারিদিকের পরিবেশ অসুস্থ হয়ে পড়লে চেষ্টা করেও সৃষ্টিশীল কাজে মন বসানো যায় না।

পত্রিকা ও লেখার স্বরূপে পরিবর্তন

লক ডাউন শুরু হবার পর থেকে পত্রিকাগুলোর স্বরূপে পরিবর্তন আসে। *যুগান্তর* পত্রিকায় বুধবার বাদে প্রতিদিন দুই পাতায় কলাম ছাপা হত। কিন্তু লক ডাউনের মধ্যে এপ্রিল ও মে মাস থেকে এক পাতায় কলাম ছাপা হয়। ফলে কলামিস্টদের লেখার সংখ্যা ও গতি যথাক্রমে স্বল্প ও ধীর হয়ে আসে। আবার এ সময় সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহারে গতি বাড়ে। গৃহবন্দি মানুষের মধ্যে যাঁরা ফেসবুক ব্যবহারকারী, তাঁরা ফেসবুকে সময় কাটান। ফলে আমাদের মতো অনেক নিয়মিত লেখকরাও ফেসবুকে পত্রিকার লেখা ছাড়া সমসাময়িক ইস্যুর ওপর ছোট ছোট লেখা পোস্ট করি। এমন লেখাসমৃদ্ধ পোস্ট দিয়ে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে অন্য সময়ের চেয়ে অনেক বেশি সাড়া পাওয়া যায়। সে কারণে ফেসবুক ব্যবহারকারীদের মধ্যে করোনাসংবলিত অডিও ও ভিডিও ক্লিপ বিনিময় হতে থাকে। আমি নিজেও বেশ কয়েকটি অনুগল্প ও সমসাময়িক ইস্যুর ওপর পোস্ট দিয়ে উল্লেখযোগ্য সাড়া পাই এবং পত্রিকার বড় লেখার পাশাপাশি এমন ছোট লেখা লিখেও সময় কাটাই। পত্রিকার মতো জীবনযাত্রায়ও পরিবর্তন আসে। দীর্ঘদিন গৃহবন্দি থাকায় জীবন অতিষ্ঠ হয়ে ওঠে। জরুরি প্রয়োজনে ১০-১৫ দিন পর বাসার বাইরে গেলে শরীর ক্লান্ত হয়ে পড়ে। করোনাবন্দি অবস্থায় জীবন হয়ে ওঠে অনেকটা খাঁচাবন্দি পাখীর একঘেয়ে জীবনের মতো।

ডিজিটাল সিকিউরিটি অ্যাক্ট-২০১৮ পাস হবার পর থেকে পত্রিকাগুলো চাপে থেকে সাংবাদিকতা করে। আমি ২৫ বছর ধরে পত্রিকায় লিখলেও কোনো সময় হিসেব করে লিখিনি। দেশের মঙ্গলের জন্য যা ভালো মনে করেছি, তাই লিখতে চেষ্টা করেছি এবং লিখতে পেরেছি। এতে সরকারের সমালোচনা করার প্রয়োজন হলে একাডেমিকভাবে করেছি। ঘটনার সত্যতা ও বিশ্লেষণে যৌক্তিকতা থাকায় পত্রিকাগুলোও তা ছাপতে পেরেছে। সরকার বদলের সঙ্গে আমার লেখার ধরন বদলায়নি। কিন্তু করোনাকালীন সময়ে করোনার ত্রাণচুরির ওপর, জনগণের দুর্দিনে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের দায়িত্বহীনতার ওপর, রাষ্ট্রীয় পদক প্রদানে বিশৃঙ্খলার ওপর, বড় বড় এনজিওদের দৃশ্যমানভাবে জনগণের সহায়তায় এগিয়ে না আসার ওপর কয়েকটি প্রবন্ধ ছাপা হলে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে কেউ কেউ আমাকে

সাবধানে লিখতে পরামর্শ দেন। কিন্তু আমি আমার কলামে যা যৌক্তিক মনে হয়েছে, তাই লিখেছি। সামাজিক দায়বদ্ধতা পালনের জায়গায় আপোষ করিনি। গৃহবন্দি অবস্থায় যে কয়েকটি ছোটগল্প লিখেছি সেখানেও তুলে ধরেছি সামাজিক অসঙ্গতি। করোনাকালীন সময় *প্রথম আলো* পত্রিকা পাঠকদের কাছ থেকে এ বিষয়ক অনুগল্প আহ্বান করে এবং তা প্রতিদিন ছাপতে থাকে। আমি আমার লেখা দুটি অনুগল্প এ পত্রিকায় জমা দিলে তা প্রকাশ করা হয়নি। কিন্তু লেখক হিসেবে আমি চেয়েছি আমার লেখা গল্পগুলো প্রকাশ করতে। এ সময় অনেক দৈনিক পত্রিকা সংক্ষিপ্ত আকারে প্রকাশিত হতে থাকে। যুগান্তরসহ অনেক পত্রিকা সাময়িকভাবে সাপ্তাহিক সাহিত্যের পাতা বন্ধ করে দেয়। ফলে আমাকেও কৌশলী হতে হয়। আমি আমার লেখা ১২০ শব্দের একটি অনুগল্প নিজের লেখা প্রবন্ধের মধ্যে প্রাসঙ্গিকতা সৃষ্টি করে স্থান দিয়ে সে প্রবন্ধ জমা দিলে প্রবন্ধটি যুগান্তর পত্রিকার মে মাসের ২২ তারিখ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়[৯৮] (এ প্রবন্ধে অন্তর্ভুক্ত অনুগল্পটির জন্য দেখুন পরিশিষ্ট- ১০:১৪)। পরে এ অনুগল্পটির ইংরেজি অনুবাদ এবং অন্য গল্পটি বাংলায় ডেইলি সিএন বাংলায় প্রকাশিত হয়।[৯৯] পরবর্তীতে ২০২০ সালের কোরবানির ঈদের পর সময় কাটাবার জন্য ঈদ নাটকগুলো দেখে আমার মন খারাপ হয়ে যায়। কয়েকটি নাটক বাদ দিলে প্রায় শতকরা ৮৫ ভাগ নাটকের না আছে কোনো থিম, বা মেসেজ। প্রায় সবই 'লাভ স্টোরি' আর 'কমেডি'। একেবারেই বোরিং। অনেকে আমাকে বলেন, সেলিম আল দিন এবং হুমায়ুন আহমেদ মারা যাবার পর ভালো চিত্রনাট্য নির্মাতার অভাব সৃষ্টি হয়েছে। তাঁরা আমাকে নাটকের স্ক্রিপ্ট লিখতে অনুরোধ করেন। আমি এ লাইনে নতুন। অভিজ্ঞতা কম। তবু আমি চেষ্টা করে ২ মাসের মধ্যে থিম এবং মেসেজ সংবলিত তিনটি নাটকের স্ক্রিপ্ট লিখি। নাট্যজগতে সক্রিয় আমার কয়েকজন ছাত্রকে প্রথমে দুটি নাটক পাঠাই।[১০০] দেখা যাক তাঁরা এগুলো চিত্রায়নের ব্যবস্থা করতে পারেন কিনা। বাকি নাটকটি হাতে রেখে দেই। এ নাটকটি চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় সচল ও স্বাভাবিক না হলে চিত্রায়িত করা সম্ভব হবে না। কারণ, নাটকটি শিক্ষামূলক

---

৯৮. দেখুন, মুহাম্মদ ইয়াহ্ইয়া আখতার, 'মানব মনস্তত্ত্ব ও করোনার শিক্ষা', *যুগান্তর*, ২২ মে ২০২০।

৯৯. দেখুন, Muhammad Yeahia Akhter, 'He was upset', *Daily CN Bangla*, 11 October, 2020; 'ভাঙ্গন', *Daily CN Bangla*, ১৮ অক্টোবর, ২০২০।

১০০. যেসব ছাত্র ও বন্ধুদের কাছ থেকে আমি নাটক লিখতে উৎসাহ পাই তাদের মধ্যে ছিলেন: মঞ্চনাট্য সমালোচক পাভেল আল মামুন, অভিনেতা ও চিত্রনাট্যনির্মাতা সুজাত শিমুল, কবি ও নাট্য প্রশিক্ষক অপু মেহেদি এবং চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের নাট্যকলা বিভাগের শিক্ষক ও সভাপতি শামীম হাসান, ব্যবসায়ী ও কবি চৌধুরী ফরিদ আহমেদ, ব্যাংকার ও খুলনা ইউনেস্কো ক্লাবের সভাপতি নুরুল ইমাম খান মিটু, নাট্য অভিনেতা শ. ম. আবদুর রাজ্জাক এবং অবসরপ্রাপ্ত ব্যাংকার বন্ধুবর মনজুরুল আলম।

থিমের ওপর চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়কেন্দ্রিক বিষয়বস্তু নিয়ে এ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতি ভালোবাসার দায়বদ্ধতার জায়গা থেকে রচনা করেছি। সবকিছু মিলিয়ে করোনাকালের জীবনযাত্রা ও শিক্ষাঙ্গণ স্থবির হয়ে পড়ে। তবে এর মধ্যে আগস্ট সেপ্টেম্বরের দিকে মানুষের মধ্যে করোনাভীতি কমে যায়। সরকারও সেপ্টেম্বর মাস থেকে নিয়ন্ত্রণ শিথিল করে। ট্রেনের সব সিটের টিকিট বিক্রি শুরু হয়। শুরু হয় পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে অনলাইনে ক্লাস নেয়ার আলোচনা। পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর বেশ কিছু বিভাগে কিছুসংখ্যক তরুণ শিক্ষক অনলাইন ক্লাস নেন। তবে বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসের পরিবেশ হয়ে পড়ে শিক্ষার্থীদের কোলাহলমুক্ত। সবুজ ঘাস বড় হয় আর পাখীর কলকাকলীমূখর ক্যাম্পাসের পরিবেশ হয়ে ওঠে একেবারেই অন্য রকম।

বিবেকানন্দের বাণীর প্রভাব

দেখতে দেখতে ২০২০ সালের ডিসেম্বর মাস চলে আসে। আমার ছুটি প্রায় শেষ। পৈত্রিক জমিতে অনেক খেজুরের গাছ থাকলেও কয়েক বছর 'গাছি'র অভাবে সেগুলি কাটা যায়নি। 'গাছি' খুঁজে না পেয়ে খেজুরের রসের পিঠা-পায়েশ খাওয়ার ইচ্ছা ব্যর্থ হয়। এমন সময় বন্ধু রাজ্জাক একেবারে ইলেভেনথ আওয়ারে সাহেব আলী নামের ৭০ বছর বয়স্ক একজন খেজুর গাছ কাটার পেশাদার লোক খুঁজে নিয়ে আসে। সাহেব আলী অন্যত্র গাছ কেটেছেন। আমার বিনয়ী অনুরোধে তিনি বলেন, 'বাবাজি আমার বয়স হইছে। এখন আর বেশি গাছ কাটতে পারিনে।' পরে গাছপ্রতি ৫০ টাকা অগ্রিম, গাছের সব পাতা নিবেন এবং রসের ভাগ আধাআধি শর্তে তিনি ৩৫টি গাছের মাত্র ১৩টি গাছ কাটেন। অনেক অনুরোধ করেও তাকে দিয়ে বাকি গাছগুলো কাটাতে পারিনি। প্রথম যেদিন রস পাই, ভাগে মাত্র ৪ লিটারের মতো হয়। সে রসের পায়েশ ছিল খুবই সুস্বাদু। এরপর কাকে কাকে রস দেব তার এক তালিকা তৈরি করি। তালিকায় ঠাঁই পান ভাইবোন, কতিপয় ঘনিষ্ঠ বন্ধু, একজন ছাত্র, দু'তিনজন আত্মীয় এবং আমাদের খণ্ডকালীন কাজের মহিলা। তালিকাটি বেশ বড়। আমরা দু'দিন খেয়েছি। তবে ইতিমধ্যে প্রায় ১০জনকে দিতে পেরেছি। নিজে খাওয়ার চেয়ে অন্যকে রস বিতরণে আনন্দ বেশি।

চলতি বাজার দরে এক ঠিলে রসের দাম ২০০ টাকা। কিন্তু তা একজনকে সাত সকালে বাসায় দিয়ে আসলে তিনি যতটা খুশি হন তার দাম আমার হিসেবে ২ হাজার টাকা। সে জন্য ২শ' টাকার বদলে ২ হাজার টাকার দিকে ঝুঁকে পড়ি। আমার স্ত্রী আমার চেয়ে এক ডিগ্রি ওপরে। রস বিতরণে আমি হাজী মহসিন হলে উনি হাতেম তাই। একদিন ফোন করে বলি, আজকের রসের রঙ খুব ভালো। কড়া মিস্টি হবে। আমাদের জন্য আনব। উনি বললেন না, তালিকা অনুযায়ী দিয়ে এসো। আমরা পরে খাব। আমি এম. ফিল ছাত্রের মৌখিক পরীক্ষা নিতে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে গেলে সাহেব আলী ২০২১ সালের জানুয়ারির ৫ তারিখে আমার

নির্দেশনা মোতাবেক রস বাসায় পৌঁছে দেন। স্ত্রী ফোন করে জানতে চাইলেন রস জ্বাল দিবেন কিনা। আমি বললাম, তোমার মেসেঞ্জারে বন্ধু মঞ্জুরুল আলমের বাসার ঠিকানা পাঠিয়েছি। তুমি রিক্সা নিয়ে রস দিয়ে আসো। বাসা খুঁজে না পেলে দোকানে জিজ্ঞেস করবে। ওরা দোতলায় থাকে। সে ঠিকই নির্দেশনা মোতাবেক রস দিয়ে আসে এবং অনেক আনন্দ পায়। পরে আমাকে জানায়, ভাবি রসের পিঠা বানিয়ে তাকে সে ছবি মেসেঞ্জারে পাঠিয়েছে।

সাহেব আলী সহজ-সরল, অমায়িক এবং সৎ ব্যক্তিত্ব। তিনি একদিন দুই ঠিলের চেয়ে একটু বেশি রস ভাগে পেলে দুই ঠিলে নিয়ে বাকিটা আমাকে দিয়ে দেন। আমিও তার প্রতি দরদী না হয়ে পারি না। রস পাড়ার সময় আমি তাকে সাহায্য করি। আরেকদিন ভাগে পৌনে দুই ঠিলে করে রস হলে আমি বলি, আপনার তো না ভরা রসের ঠিলে বিক্রয় করতে অসুবিধা হবে। ক্রেতারা আপনাকে আধঠিলে রসের দাম দিতে চাইবেন। আপনি আমার ভাগের রস থেকে কিছুটা নিয়ে আপনার ঠিলেটা ভরে নিন। তিনি তার ঘোলা চোখে বিস্ময়ের দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকান। পরে আমার অনুরোধমতো কিছুটা রস আমার ভাগ থেকে নিয়ে নিজের ঠিলে ভরে নেন।

সাহেব আলীর সরলতা ও সততা আমাকে মুগ্ধ করে। আমি তাকে এবং খেজুর গাছ এবং গাছকাটিয়েদের নিয়ে পত্রিকায় সংস্কৃতিবিষয়ক একটি প্রবন্ধ লিখি। এ প্রবন্ধে বলি, যারা খেজুর গাছ কাটেন তাদেরকে গাছি বলা ঠিক নয়। এরা হলেন শিল্পী। এরা একেকজন জয়নুল আবেদিন। এস এম সুলতান। এদের ধারালো দায়ে আছে শিল্পের ছোয়া। আর এ সম্পর্কে এদের রয়েছে বিশেষজ্ঞ জ্ঞান। কতদিন পর পর গাছ কাটতে হবে। কিভাবে কাটলে গাছের ক্ষতি হবে না। কিভাবে নল লাগাতে হবে। কতদিন পরপর কিভাবে রসের ঠিলে পাততে হবে। কিভাবে গাছ বাঁচিয়ে রেখে তার বুক কেটে রস বের করে আনতে হবে। কখন মিষ্টি রস বের হবে। কখন টক রস (এদের ভাষায় 'ঝরা') বের হবে; এসব বিষয়ে এরা বিশেষজ্ঞ। এ এক ভিন্ন শিল্পকর্ম। এভাবেই আমি এ প্রবন্ধে এদেরকে শিল্পীর মর্যাদা দেই। সাহেব আলীর ছবিসহ প্রবন্ধটি *যুগান্তর* পত্রিকার ২৯ জানুয়ারি সংখ্যায় প্রকাশিত হলে আমি ওই পত্রিকার একটি কপি সাহেব আলীকে দিয়ে আসি। তিনি লেখাপড়া জানেন না। কিন্তু পত্রিকার পাতায় নিজের ছবি দেখে খুশি হন (পত্রিকায় প্রকাশিত সাহেব আলীর ছবির জন্য দেখুন পরিশিষ্ট: ১০:১৫)।[১০১]

নিজে না খেয়ে অন্যকে খাঁটি রস বিতরণে যে আনন্দ বেশি সে ধারণাটি আমার মধ্যে কেমন করে এল? বিষয়টি আমি অনেক ভেবে বের করি। আমার ধারণা এ বিশ্বাসটি আমার মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হয় কলেজজীবনে উপহার পাওয়া

১০১. মুহাম্মদ ইয়াহ্ইয়া আখতার, 'হারিয়ে যাচ্ছে আবহমান বাংলার অনেক কিছুই', *যুগান্তর*, ২৯ জানুয়ারি, ২০২১।

একটি ডায়েরি থেকে। ডায়েরিটি আমাকে কে উপহার দিয়েছিলেন মনে নেই। তবে ওই ডায়েরির প্রতি পাতার নীচে ইংরেজি ভাষায় একজন খ্যাতিমান ব্যক্তিত্বের একটি করে বাণী লেখা ছিল। এক পাতায় স্বামী বিবেকানন্দের লেখা একটি বাণী আমাকে প্রভাবিত করেছিল: 'Happiness depends on what you can give, not what you can get.' তরুণ বয়সে আমাকে প্রভাবিত করা বিবেকানন্দের ওই বাণীর প্রভাব অবচেতন মনে এখনও আমার মধ্যে সক্রিয়। কারণ, তরুণ বয়সের বিশ্বাস ও প্রভাব ইচ্ছে করলেও নিজের মধ্য থেকে মুছে ফেলা যায় না।

ছুটি শেষে কাজে যোগদান

স্যাবাটিক্যাল ছুটি শেষে আমি কাজে যোগদান করি। তখন থেকে আমার এলপিআরে যাওয়া পর্যন্ত এক বছর দশমাসের মতো সময় থাকবে। এ কারণে আমি এ সময়কালের জন্য শহরের পরিবর্তে বিশ্ববিদ্যালয় সাউথ ক্যাম্পাসে পাহাড়িকা হাউজিং সোসাইটিতে একটি টু-বেডরুম এপার্টমেন্ট ভাড়া করি। খুলনায় এসে কিছুদিন থেকে আবার ২০২১ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে একা কর্মস্থলে গিয়ে নতুন বাসায় উঠি। খুলনা থেকে যে বইদুটো প্রকাশ করতে ব্যর্থ হয়েছিলাম, এবার তা চট্টগ্রাম থেকে প্রকাশে উদ্যোগ গ্রহণ করি। এ লক্ষ্যে পূর্বা প্রেসের মালিক জনাব মইনুল আলমের সহযোগিতায় আমার বইদুটো দৃষ্টিনন্দন স্বরূপ ও বক্তব্যধর্মী প্রচ্ছদসহকারে প্রকাশিত হয়। এ বইদুটোতে আমি দুটি নতুন এক্সপেরিমেন্ট করি। ইতিপূর্বে বইমেলার সময় প্রথিতযশা কতিপয় কলামিস্টের প্রবন্ধের বই প্রকাশিত হতে দেখেছি। এমন গ্রন্থে তাদের অনেকের সমকালীন সময়ে প্রকাশিত প্রবন্ধ সংকলিত হয়েছে। তবে এমন গ্রন্থসমূহে সন্নিবেশিত প্রবন্ধগুলোর মধ্যে বিষয়বস্তুগত ঐক্য ছিল না। তা ছাড়া একটি প্রবন্ধ যদি শেষ পাতায় মাত্র চার পাঁচ লাইন পর শেষ হয়, তাহলে ওই পাতাটির বাকি অংশ ফাঁকা রেখে পরের পৃষ্ঠা থেকে অন্য প্রবন্ধ শুরু করা হয়। আমার বইয়ে এ ক্ষেত্রে পরিবর্তন আনি। আমার বইদুটোতে একই বিষয়বস্তুর ওপর প্রবন্ধ সন্নিবেশিত করি। আর কোনো প্রবন্ধ একটি পাতায় মাত্র ৫-৭ লাইন পর শেষ হয়ে গেলে ওই পাতার ফাঁকা জায়গায় ওই প্রবন্ধের বিষয়বস্তুর সঙ্গে সম্পর্কিত ছবি ব্যবহার করি।[১০২] বইটির প্রুফ দেখি এবং প্রচ্ছদ তৈরিতে পরামর্শ প্রদান করি। এ ব্যাপারে প্রিয় ছাত্র বিএএফ শাহীন কলেজের শিক্ষক জাওয়াদ উল আলম চৌধুরী আমাকে বিশেষভাবে সহায়তা করেন।

কাজে যোগদানের পর আমি বেশ কয়েকটি একাডেমিক কমিটির তাৎক্ষণিক ও সাধারণ সভা, একটি পরিকল্পনা কমিটির সভা এবং একটি অনুষদ সভায়

১০২. মুহাম্মদ ইয়াহইয়া আখতার, *প্রসঙ্গ নির্বাচন কমিশন* (খুলনা: অধ্যয়ন পরিষদ, ২০২১); *বাংলাদেশি রাজনীতি, সঙ্কট ও গতিপ্রকৃতি* (খুলনা: অধ্যয়ন পরিষদ, ২০২১)।

অংশগ্রহণ করি। এসব সভায় আমি বিভাগ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য যা ভালো মনে করেছি, তাই অকপটে বলেছি। এখানে কেবলমাত্র ৩ মার্চ ২০২১ তারিখে অনুষ্ঠিত বিভাগীয় পরিকল্পনা কমিটির ৩১৮তম সভা সম্পর্কে সংক্ষেপে বলব। কারণ, এ সভাটিতে বিভাগীয় শিক্ষক ও কর্মচারী নিয়োগের এজেন্ডা ছিল। এ ব্যাপারে আমি সুস্পষ্ট ও সংক্ষিপ্ত মতামত প্রদান করি। আমি বলি, বিশ্ববিদ্যালয় সচল হলে কর্মচারী সঙ্কটের কারণে আমাদের বিভাগ অচল হয়ে পড়বে। কাজেই কর্মচারী নিয়োগের জন্য আমার পূর্ণ সমর্থন আছে। কিন্তু শিক্ষক নিয়োগের ব্যাপারে সভাপতি মহোদয় উপস্থাপিত আটটি পদ বিজ্ঞাপনের বিষয়ে আমার সুস্পষ্ট দ্বিমত আছে। বিভাগের বর্তমান লোকবল এবং ওয়ার্কলোড বিবেচনায় নিয়ে আমি এ মুহূর্তে শিক্ষক নিয়োগে রাজি নই। আমার মনে হয় না এখন আমাদের কোনো শিক্ষক ২-৩টার বেশি কোর্স পড়ান। সে ক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়মানুযায়ী আমাদের এ মুহূর্তে শিক্ষকের প্রয়োজন নেই। তবে আমাদের জুনিয়র শিক্ষকগণ ভবিষ্যতে একযোগে কয়েকজন উচ্চশিক্ষার জন্য বিদেশে গেলে আমরা এ বিষয়ে ভেবে দেখব। আপাতত আমি এ বিষয়ে সভাপতিকে আমার দ্বিমত রেকর্ড করতে বলি। সভার কতিপয় সদস্য কমসংখ্যক পদে বিজ্ঞাপন দেবার অনুরোধ করলেও আমি আমার মতে অটল থাকি। আমি মনে করি, এর আগে ২০১৫ সালে বিভাগে চারজন প্রভাষক পদের জন্য বিজ্ঞাপন দিয়ে ৭ জনকে নিয়োগ দেয়া হয়েছিল। আবার যদি বর্তমান অবস্থায় শিক্ষকের প্রয়োজন না থাকা সত্ত্বেও ৮ জনের জন্য বিজ্ঞাপন দিয়ে শিক্ষক নেয়া হয়; আমি সে সিদ্ধান্তের অংশ হতে চাইনি।

এ কথা সত্য, আমাদের বিভাগে বিভিন্ন মিটিংয়ে সর্বসম্মত সিদ্ধান্তই হয় বেশি। তবে কম হলেও দ্বিমত পোষণ করার নমুনা রয়েছে। আমি কোনো সিদ্ধান্তকে ন্যায়সঙ্গত মনে না করলে তার সাথে আমার দ্বিমত পোষণ করার অধিকার আছে। পরবর্তীতে এ সভার কার্যবিবরণীতে আমার 'নোট অব ডিসেন্ট'কে হালকা করে দেখাবার চেষ্টা করা হয়। মার্চ মাসের ৩ তারিখের পরিকল্পনা সভার কার্যবিবরণী সভাপতি মহোদয় ১৮ তারিখে স্বাক্ষর করেন যা আমি ২১ তারিখে ইমেইলে পাই। লক্ষ্য করি, যে দুই নম্বর এজেন্ডায় আমি 'নোট অব ডিসেন্ট' দিয়েছিলাম, সে সিদ্ধান্তের সঙ্গে আমার দ্বিমত সন্নিবেশিত না করে সকল সিদ্ধান্তের পরে এবং বিবিধ বিষয়ক সিদ্ধান্তের আগে সন্নিবেশিত করা হয়েছে। আমি লিখিতভাবে আপত্তি জানিয়ে ওই দিনই চিঠি লিখে আমার নোট অব ডিসেন্টকে দুই নম্বর সিদ্ধান্তের সঙ্গে নিয়ম ও রেওয়াজ অনুযায়ী সন্নিবেশিত করতে চেয়ারম্যান মহোদয়কে অনুরোধ করি। পরবর্তীতে ২৯-০৩-২০২১ তারিখে স্বাক্ষরিত একই সভার সংশোধিত কার্যবিবরণীর ২ নম্বর সিদ্ধান্তের ওপর আমি ৩১-০৩-২০২১ তারিখে আবারও আপত্তি জানালে ১১-০৪-২০২১ তারিখে সভাপতি মহোদয়ের এক নোটে আমার আপত্তি বিবেচনায় না নেয়ার সিদ্ধান্ত জানতে পেরে ১২-০৪-২০২১ তারিখে ওই সিদ্ধান্তের ওপরও আপত্তি জানাই।

এ ছাড়া কাজে যোগদানের পর আমি বিভাগ থেকে যথাযথ আচরণ পাইনি। আমি জানুয়ারি মাসের ১ তারিখে কাজে যোগদান করা সত্ত্বেও আমাকে বসিয়ে রাখা হয়। অথচ, সে সময় অন্য শিক্ষকগণের অনেকেই অনলাইনে ক্লাস নিচ্ছিলেন। এর মধ্যে কিছুসংখ্যক বিভাগীয় একাডেমিক কমিটির সভা হলেও আমাকে ক্লাস দেয়া হয়নি। আমাকে ক্লাস দেয়া হয় মে মাসের ২৭ তারিখে। অথচ জানুয়ারি মাসে আমাকে ক্লাস দেয়া হলে এই পাঁচ মাস শিক্ষার্থীরা আমার ক্লাস পেতো। এ ছাড়া বিভাগে বরিষ্ঠতার দিক থেকে আমি দ্বিতীয়। এম এস এস শ্রেণিতে প্রায় ৬-৭ বছর পড়াবার অভিজ্ঞতা থাকলেও আমাকে ওই বর্ষে ক্লাস দেয়া হয়নি। আমি প্রফেসর ড. মো. আবদুল হাকিম ডেপুটেশনে ৪ বছর ইউজিসিতে সদস্য হিসেবে থাকাকালীন 'বাংলাদেশ পলিটিক্স: প্রবেলমস অ্যান্ড ইস্যুজ' শীর্ষক কোর্সটি পড়িয়েছিলাম। যেহেতু আমি সমসাময়িক বাংলাদেশি রাজনীতির ওপর লেখলেখি করি, ওই কোর্সটি পড়াবার আমার আগ্রহ ছিল। কিন্তু জানা সত্ত্বেও এবং আমি উল্লেখ করা সত্ত্বেও এ ব্যাপারে বিভাগীয় সভাপতি বা অন্য কেউ কথা বলেননি। আমাকে চতুর্থ বর্ষে 'দুর্নীতি ও রাজনীতি' শীর্ষক একটি কোর্স এবং তৃতীয় বর্ষে বাংলাদেশের লোক প্রশাসন শীর্ষক একটি কের্সের অর্ধেক পড়াতে বলা হয়।

সভাপতি মহোদয় বিভাগীয় সিনিয়র শিক্ষকদের সঙ্গে আলাপ আলোচনা না করে সব সময় নিজের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করতে চাইতেন। আমাকে বাদ দিয়ে তিনি ক্লাস রিভিউ কমিটি করেন। আবার যে সব শিক্ষার্থীর এম ফিল ডিগ্রি আছে তাদের পিএইচডি ডিগ্রি করার ক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয় অর্ডিন্যান্সের তোয়াক্কা না করে, বা আমাদের কারও সঙ্গে আলোচনা না করে ডিগ্রি অর্জনের সর্বনিম্ন সময় ৩ বছর থেকে ২ বছরে নামিয়ে আনতে ডিনকে চিঠি লিখেন। অনুষদ সভায় তার এ প্রস্তাব গৃহীত হয়নি। এরপর প্রতি বর্ষে দুটি কোর্স তিনি ইংরেজিতে পড়াবার প্রস্তাব করেন। তিনি এও বলেন, শিক্ষকগণ চাইলে বাংলায়ও লেকচার দিতে পারবেন। আমি বিভাগীয় একাডেমিক কমিটিতে এ প্রস্তাব 'হাস্যকর শোনাবে' বলে মন্তব্য করি। আমি এও বলি, বিরাজিত বিধি অনুযায়ী কোনো শিক্ষার্থীর যেখানে ইংরেজিতে পরীক্ষা দেবার সুযোগ আছে সেখানে এমন নীতি গ্রহণ সমালোচিত হবে। আপনি পারলে সব কোর্স ইংরেজিতে পড়ান। সভাপতির মধ্যে রাতারাতি অনেক নতুন পরিবর্তন আনার একটি তাড়াহুড়া লক্ষ করি, যদিও অধিকাংশক্ষেত্রেই সে পরিবর্তন যৌক্তিক কিনা তা যাচাই না করেই তিনি পদক্ষেপ নেন। মধ্য আগস্ট ২০২১-এ তার সভাপতির মেয়াদকাল শেষ হলে ক্ষমতা রদবদল অনুষ্ঠানে সবাইকে আমন্ত্রণ জানালেও আমার আমন্ত্রণে কোনো জুম আইডি সরবরাহ করেননি। অথচ, এর আগে সব মিটিং-এ আমাকে জুম আইডি সরবরাহ করা হয়েছে। তিনি হয়তো চাননি যে, আমি ওই অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে আলোচনায় অংশগ্রহণ করে তাদেরকে অভিনন্দন জানাই। পরে নতুন সভাপতি আমাকে ওইদিন বিকালে ফোন করে তাঁর সভাপতি হিসেবে তার দায়িত্ব গ্রহণের সংবাদ জানালে আমি তাকে অভিনন্দন জানাই এবং বলি আপনারা চাইলে তো আমাকে অনুষ্ঠানে যোগ দেবার সুযোগ দিতে পারতেন। তিনি তার কোনো জবাব দেননি।

ভার্চুয়াল ক্লাস ও টিউটোরিয়াল

আমি স্যাবাটিক্যাল ছুটি শেষে ২০২১ সালের জানুয়ারি মাসে কাজে যোগ দিলেও চেয়ারপার্সন আমার জন্য ক্লাস বরাদ্দ করেন মে মাসের শেষ সপ্তাহে। অথচ এ পাঁচ মাস সময়ে একাধিক এসি মিটিং হয়। আমি ছাড়া অন্য সব সহকর্মীরা কমবেশি অনলাইনে ক্লাস নিচ্ছিলেন। পাঁচ মাস পর আমাকে তৃতীয় ও চতুর্থ বর্ষ সম্মান শ্রেণিতে ক্লাস বরাদ্দ করা হয়। এর মধ্যে আবার তৃতীয় বর্ষের ক্লাসটি দু'জন শিক্ষক মিলে পড়ান। যা হোক, আমি তরুণ শিক্ষকদের মতো অনলাইনে ক্লাস নিতে পারদর্শী না হলেও সেসব শিখে জুন মাসের প্রথম সপ্তাহ থেকে ক্লাস শুরু করি। তৃতীয় বর্ষের শিক্ষার্থীদের কাছে জানতি পারি যে, তাদের এ কোর্সের প্রথমাংশ যে শিক্ষক পড়াতেন তিনি ক্লাস শেষ করেছেন। কিন্তু দ্বিতীয়াংশ যার পড়াবার কথা তিনি একটি ক্লাস নিয়েছেন। আমি বিষয়টি শুনে একটু অবাক হলাম। কারণ, এদের ক্লাস শুরু হয়েছে এক বছর দু'তিন মাস আগে। মাসে একটি-দুটি ক্লাস নিলেও কোর্সের অর্ধেকটা শেষ হওয়ার কথা। যাহোক, আমি দেড় থেকে দু'ঘন্টা করে একেকটি ক্লাস নিয়ে দু'মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট অংশটি পড়িয়ে শেষ করি। তবে ভার্চুয়াল ক্লাস নিতে আমার কিছুটা অসুবিধা হয়। এমনিতে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের অধিকাংশ মধ্যবিত্ত এবং নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবার থেকে আগত। আর্থিকভাবে অস্বচ্ছল হওয়ায় এদের অনেকের ল্যাপটপ বা অ্যানড্রয়েড ফোন নেই। অনেকের ফোন থাকলেও তার এলাকায় নেট দুর্বল। আবার কারও এলাকায় বিদ্যুৎ থাকে না। কে কখন ক্লাসে ঢুকলো বা কে কখন বের হয়ে গেল সে দিকে খেয়াল রাখা যায় না। তার চেয়ে বড় অসুবিধা ছিল ক্লাসকে অংশগ্রহণমূলক করতে পারছিলাম না। আমি একতরফাভাবে বক্তৃতা দিয়েছি আর শিক্ষার্থীরা শুনেছে। ছাত্রছাত্রীদের শারীরিক ভাষা দেখতে পারিনি। তারা বুঝতে পারছে কি না তাও জানতে পারিনি। এমনিতে সাধারণ সময়েই ক্লাসে আমাদের ছাত্রছাত্রীরা কম প্রশ্ন করে। আর ভার্চুয়াল ক্লাসে তারা অনেকটাই নীরব থেকেছে। আমি প্রশ্ন করলে সে প্রশ্ন শুনে তাদের জবাব দিতে দেরি হয়েছে। অনেক সময় জিজ্ঞাসার জবাব পাওয়া যায়নি। ফলে সময় নষ্ট হয়েছে। চ্যাটবক্সেও কেউ প্রশ্ন লেখেনি। শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন জেলা থেকে অংশগ্রহণ করায় হয়তো এমন হয়েছে। প্রশ্ন শুনে কেউ হয়তো ভেবেছে অন্য কেউ জবাব দিবে। এভাবে একটি প্রশ্নের জবাব পেতে অনেক সময় লাগে।

জুন মাসের প্রথম সপ্তাহে তৃতীয় বর্ষে প্রশাসনিক দুর্নীতি বিষয়ে দুই ঘন্টাব্যাপী ক্লাস নেই। শিক্ষার্থীরা শুনে গেল, কিছুই বলল না। এক পর্যায়ে বলি, আজকের ক্লাসটা এখানেই শেষ করতে চাই। তবে তার আগে তোমাদের প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন করার জন্য ৩ মিনিট সময় দিচ্ছি। আধ মিনিট পার হলেও আওয়াজ না পেয়ে ভাবি দীর্ঘক্ষণ ক্লাস করে এরা ক্লান্ত। একটু হাস্যরস করা দরকার। এমন সময় একটি মেয়ের কণ্ঠ শুনলাম। নেট কানেকশন দুর্বল থাকায় তার কথা কেটে কেটে আসায় বুঝতে পারিনি। দেরি না করে বললাম, তোমার প্রশ্নটি বুঝতে পারিনি।

তুমি প্রশ্নটি আগামী ক্লাসে করতে পারবে। তবে আমি তোমাকে একটি প্রশ্ন করব। আর এ প্রশ্নের উত্তর শুনে ক্লাস শেষ করব। 'জ্বি স্যার'— এবার আমি মেয়েটির কণ্ঠ শুনতে পাই। বললাম, মনে করো আজ থেকে সাত-আট বছর পরে তোমার প্রথম বিবাহ বার্ষিকীতে যদি তোমার স্বামী হীরা মনি-মানিক্যখচিত দামি একসেট জড়োয়া গহনা তোমাকে উপহার দেন তাহলে তুমি কি করবে? জামাই বাবাজির কাছে কি এ উপহারের দাম জানতে চাইবে? জিজ্ঞেস করবে, যে টাকা দিয়ে এ উপহার কেনা হয়েছে সে অর্থের বর্ণ সাদা নাকি কালো? মেয়েটি বুদ্ধিমতি। সে এক কথায় উত্তর না দিয়ে ঘুরিয়ে বলেঃ স্যার, আমি পুঁথির মালা পছন্দ করি। জড়োয়া গহনা ভালো লাগে না। উল্লিখিত সীমাবদ্ধতার মধ্য দিয়ে অনলাইন ক্লাস নিয়েছি। এতে শিক্ষার্থীদের একটি অংশ কিছুটা হলেও লেখাপড়ায় সংশ্লিষ্ট থেকেছে।

এর মধ্যে টিউটোরিয়াল গ্রুপের তালিকা পেয়ে চিন্তিত হয়ে পড়ি। স্বাভাবিক সময়ের মতো তো আর এখন শিক্ষার্থীদের টিউটোরয়াল কাজ করাতে পারবো না। কারণ শিক্ষার্থীরা দেশব্যাপী ছড়ানো। স্বাভাবিক সময়ে টিউটোরিয়াল ছাত্রছাত্রীদের দিয়ে অনেক কাজ করাতাম। আর এর মধ্য দিয়ে নিজেও তাদের কাছ থেকে শিখতাম। এখন সব অনলাইনে হওয়ায় অন্য পরিকল্পনা উদ্ভাবন করতে হবে। দেরি করে টিউটোরিয়াল গ্রুপ করায় হাতে সময়ও কম।

আমার গ্রুপের প্রথম বর্ষের ২০১৯-২০২০ সেশনের ১৭ জন টিউটোরিয়াল শিক্ষার্থীদের সঙ্গে আমি কয়েকটি ক্লাস নিলাম। এরা প্রত্যেকে ক্লাসে উপস্থিত হওয়ায় আমি খুশি হই। এদের একজনকেও আমি চিনি না। কারণ, এরা ভর্তি হওয়ার সময় আমি ছুটিতে ছিলাম। এদের সঙ্গে পরিচিত হয়ে এবং কথা বলে আমার ভালো লাগে। আমি এদের লেখাপড়ার খোঁজ নিলে এরা বলে তাদের ক্লাস প্রায় শেষ হয়ে গেছে। তবে একটি-দুটি কোর্সে তাদের একটু ক্লাস কম হয়েছে। এরা আমাকে ক্লাস নিতে অনুরোধ করলে আমি রাজি হইনি। পরিবর্তে বলি, আমি তোমাদের সাথে পরিচিত হব। তোমাদের কথা শুনবো। তোমাদের সঙ্গে গল্পগুজব করবো। তবে সেসব গল্প অবশ্যই তোমাদের পাঠ্যক্রমের বাইরের বিষয় নিয়ে হবে না। পরীক্ষা সন্নিকটে হওয়ায় কয়েকটি ক্লাস নিয়েই আমি এদের অ্যাসাইনমেন্টে দিতে মনস্থ করি।

এ ব্যাপারে শিক্ষার্থীদের পরামর্শ চাইলে তারা বলে, স্যার আমাদের টিউটোরিয়াল করার অভিজ্ঞতা নেই। আপনি যে কাজ দিবেন আমরা তাই করব। আমি জানতে চাইলাম, তোমাদের সবাইকে একটি কাজ দেব, নাকি কয়েকটি গ্রুপ করে প্রতি গ্রুপকে একটি কাজ দেব, না প্রত্যেককে পৃথকভাবে একটি কাজ দেব। শিক্ষার্থীরা শেষ প্রস্তাবটি পছন্দ করে। যেহেতু তারা একেকজন একেক জায়গায়, সেজন্য তারা গ্রুপে কাজ নেয়নি। ফলে আমার পরিশ্রম বাড়ে। আমি তাদেরকে ঐদিনই সবাইকে আমার ফেসবুক মেসেঞ্জারে নক দিতে বলি। প্রত্যেকের মেসেঞ্জারে একটি করে প্রবন্ধের লিংক দিয়ে বলি, এ লেকাটি মনোযোগ দিয়ে পড়ে

৩০০ শব্দের মধ্যে এর একটি রিভিউ লিখে ৯ জুলাই রাত ১২টার মধ্যে মেসেঞ্জারে পোস্ট করতে বলি। একজন বাদে সবাই নির্দিষ্ট সময়ে লেখা জমা দেয়। অন্য ছাত্রটি তার অসুবিধার কথা বলে একটু সময় চাইলে বলি, বাবা তুমি কোনো চাপ নিও না। দরকার হয় তুমি আরও দু'দিন বা তারও বেশি সময় নাও। কিন্তু সে পরদিনই লেখা জমা দেয়। শিক্ষার্থীরা ভেবেছিল ওদের কাজ শেষ। আমি ওদের লেখা পড়ে নম্বর দিয়ে দেব।

আমি ১৭টি লেখা মনোযোগ দিয়ে পড়ি। প্রায় ৮ ঘন্টা পরিশ্রম করে লেখাগুলোয় দৃশ্যমান ভুলত্রুটি, বানান, বাক্য গঠন, যতিচিহ্নের ব্যবহার, ভাব সংযোগ প্রক্রিয়া, লিখনভঙ্গিমা, ইত্যাদি যতদুর পারি সংশোধন করি। পেশাদার রংমিস্ত্রির মতো সম্পাদনা কাজে লাল, নীল, সবুজ, ফিরোজা, বেগুনি প্রভৃতি রং ব্যবহার করি। নির্দেশনা দেই, মন্তব্য লিখি। বিভিন্ন বর্ণ ব্যবহার করে সম্পাদনার করায় তাদের একেকটি ছোট্ট লেখা শিশু শিল্পির আঁকা রঙীন ছবির মতো মনে হয়। লেখাগুলো পড়ে আমার ভাল লাগে। তবে 'রিভিউ', 'সামারি' এবং 'অ্যাবস্ট্রাক্ট' যে এক বিষয় নয় সে বিষয়টি অনেকেই বুঝেনি। প্রায় সবাই মূল লেখাটি পড়ে তার সংক্ষিপ্তসার লিখেছে। তবে লেখাগুলো যে অন্য কাউকে দিয়ে না লিখিয়ে তারা নিজেই লিখেছে তা বুঝা যায়। প্রথম বর্ষের শিক্ষার্থী হিসেবে তারা ভালই লিখেছে। চর্চা অব্যাহত রাখলে যে এরা পরে আরো ভালো লিখতে পারবে সে বিষয়ে আমার সন্দেহ নেই।

পরদিন সন্ধ্যায় শিক্ষার্থীদের ফিডব্যাক দিতে গিয়ে প্রথমজনের মেসেঞ্জারে সংশোধিত লেখাটি পোস্ট করে দেখি সব বর্ণ কালো হয়ে গেছে। কম্পিউটার আনাড়ি হওয়ায় আমি ভয়ে ঘেমে উঠি। ভাবি, সব পরিশ্রম হয়তো বৃথা গেল। পরে পিডিএফ ফাইল হিসেবে সেভ করে মেসেঞ্জারে দেবার পর খুলে রং ঠিক আছে দেখে আমার ভয় কেটে যায়। দ্রুত ১৭ জনের প্রত্যেকের মেসেঞ্জারে একটি করে পিডিএফ ফাইল পোস্ট করে দিয়ে তাদেরকে আমার ফিডব্যাক দেখতে বলি। কোনো প্রশ্ন থাকলে, বা আমার সংশোধনী বা নির্দেশনা না বুঝলে আমাকে মেসেঞ্জারে কল করতে অনুরোধ করি। মাত্র একজন ছাত্র আমাকে ফোন দেয়। আমি তার জিজ্ঞাসা সুন্দরভাবে বুঝিয়ে দেই। পিডিএফ ফাইল সবাই খুলতে এবং পড়তে কোনো অসুবিধা হয়েছে কি না জানতে আমি অনেককে ফোন দেই। জানতে পারি যে পিডিএফ ফাইল খুলতে তাদের অসুবিধা হয়নি।[১০৩] তখন বাকিদের আর ফোন করিনি। কেবল প্রিয়া নামের একজন ছাত্রীর নেট দুর্বল থাকার কারণে ফাইল খুলতে অসুবিধা হয়। পরে সে তার ভাইয়ের সহায়তা নিয়ে

১০৩. যাদেরকে ফোন করেছিলাম সবার নাম মনে না থাকলেও মাহিমা ইসলাম, তৌহিদুল ইসলাম ভুঁইয়া, মারিয়া মুন নিসা, আমিনুল হক আদনান, মহুয়া জামান মিম, মো. শাওন ধনেক, মাফরুহা আমরিন এবং প্রিয়া চক্রবর্তীর নাম মনে আছে।

খুলতে পারে। আমার সম্পাদনা ও সংশোধনী দেখে প্রত্যেকে খুশি হয়। তারা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে বলে যে তারা তাদের ভুলগুলো বুঝতে পেরেছে। একজন শিক্ষার্থী বলে স্যার, আপনার নির্দেশনা মেতাবেক লেখাটি সংশোধন করে আবার আপনাকে পাঠাবো? আমি বলি, তার দরকার নেই। তুমি বুঝলেই হবে। মহুয়া জামান মিম নামের আরেক শিক্ষার্থী বলে, অনেক কষ্ট করে আমাদের লেখা দেখে দিয়েছেন স্যার। আপনি আমাদের বাড়িতে বেড়িয়ে গেলে খুশি হব। আমি দুষ্টুমি করে বলি, করোনার কারণে বলছো। স্বাভাবিক সময় হলে বলতে না। সে বলে, না স্যার বিশ্বাস করুন, আপনি আসলে ভাইয়া খুশি হবেন। তিনি আপনার লেখার ভক্ত। আমিও ভদ্রতার প্রত্যুত্তরে বলি, তুমি ভাইয়ার সঙ্গে করোনা কমলে যদি কখনো খুলনায় আসো তাহলে স্যারকে দেখে যেও। সব কিছু মিলিয়ে ছাত্রছাত্রীদের অনলাইনে ক্লাস নিয়ে ও টিউটোরিয়াল কাজ করিয়ে আমার নতুন রকমের মিশ্র অভিজ্ঞতা হয়। পরের অধ্যায়ে এই একাডেমিক আত্মজীবনীর স্বরূপ, শিক্ষাঙ্গন ও শিক্ষকদের কর্মকাণ্ড ও মনস্তত্ত্ব সংক্ষিপ্তভাবে উপস্থাপন করা হবে।

এগারো
শিক্ষকতা পেশা ব্যতিক্রমী নেশা

শিক্ষকতা পেশা মানব সমাজে আদিকাল থেকে চলমান। এ পেশাটি অন্য কোনো পেশার সঙ্গে তুলনীয় নয়। অন্যান্য পেশাকে চাকুরি হিসেবে গণ্য করা হলেও শিক্ষকতাকে চাকুরি বিবেচনা করা যায় না। অনেকে শিক্ষকদের বলেন, 'মানুষ গড়ার কারিগর'। শিক্ষকরা মানুষ তৈরি করেন। তারা শিক্ষার্থীদের মধ্যে আলো ছড়িয়ে দেন। সে আলো জ্ঞানের আলো। এ আলোয় কুসংস্কারের অন্ধকার দূর হয়। শিক্ষকগণ শিক্ষার্থীদের লেখাপড়া করান বলে সবাই তাদের সম্মান করেন। কিন্তু তাঁরা ভাবতে ভুলে যান, শিক্ষকরা দেশ গড়েন। শিল্পপতিরা কল কারখানায় দ্রব্যাদি উৎপাদন করে দেশ গড়ার কাজে নিয়োজিত। একইভাবে শিক্ষকরাও নিয়োজিত উৎপাদনে জড়িত হয়ে দেশ গড়ার কাজে। তবে দ্রব্যাদির পরিবর্তে শিক্ষকগণ উৎপাদন করেন স্বপ্ন। উৎপাদনের আগে এ স্বপ্ন তারা প্রথমে নিজেরা দেখেন। পরবর্তীতে স্বপ্নগুলো বাস্তবায়নের জন্য শিক্ষার্থীদের দেখান। তাদের বুকে ছড়িয়ে দেন। একজন কৃষক মাঠে কাজ করে খাদ্যশস্য উৎপাদন করেন। দেশের খাদ্য চাহিদা মেটান। একজন শ্রমিক কল কারখানায় কাজ করেন। তারা নাগরিকদের জন্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রী উৎপাদন করেন। একইভাবে শিক্ষকগণ যুগপৎ শ্রমিক ও চাষী। আবার তারা স্বাপ্নিকও। তবে শিক্ষক কৃষকের মতো মাঠে যান না। শ্রমিকের মতো কল-কারখানা, বা ফ্যাক্টরিতে যান না। শিক্ষকের ফ্যাক্টরি ও মাঠ হলো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। তারা চাষবাস করেন শ্রেণিকক্ষে। জ্ঞান ও মেধার লাঙ্গল চালান। স্বপ্নের বীজ বোনেন। আর উৎপাদিত স্বপ্নগুলো বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে দায়িত্ব অর্পণ করেন শিক্ষার্থী ও রাষ্ট্রীয় নীতি নির্ধারকদের ওপর।

আত্মজীবনীর গুরুত্ব ও রকমফের

আত্মজীবনী গ্রন্থের বিশেষ উপকারিতা আছে। সমাজে সফল ব্যক্তিত্বদের কেউ কেউ আত্মজীবনী লিখেন। সেসব গ্রন্থে তাঁদের সফলতা অর্জনের বর্ণনা থাকে। বিবরণ থাকে প্রতিকুল অবস্থার সঙ্গে তাদের সংগ্রামের। থাকে উজানে নাও বেয়ে গন্তব্যে পৌছার কৌশল ও তথ্য। নিজ এলাকায় খ্যাতিমান হবার সংগ্রাম ও সাফল্য বিধৃত হয় তাদের আত্মজীবনীতে। সে সঙ্গে থাকে তাদের ব্যক্তি ও

পারিবারিক জীবনের জানা-অজানা ঘটনাবলী। এ জন্য অভিভাবকগণ তাদের সন্তানদের, শিক্ষকগণ তাদের ছাত্রছাত্রীদের, খ্যাতিমান ব্যক্তিত্বদের আত্মজীবনী পড়তে বলেন। কারণ তারা মনে করেন, সফল ব্যক্তিত্বদের আত্মজীবনী পড়লে শিক্ষার্থীগণও তাদের মতো পরিশ্রম করে প্রতিষ্ঠিত হতে উদ্বুদ্ধ হবে। আত্মজীবনীকারদের সংগ্রাম ও অধ্যবসায় থেকে শিক্ষাগ্রহণ করে জীবন গড়ার পরিকল্পনা করবে। উৎসাহ পাবে লেখাপড়ার মাধ্যমে ডিগ্রি অর্জন করে জীবনকে সফলতার পথে এগিয়ে নিতে। লেখাপড়ায় ভালো না করেও সমাজে সফল ও প্রতিষ্ঠিত হবার প্রেরণা পাবে অনেক খ্যাতিমান ব্যক্তিত্বের আত্মজীবনী গ্রন্থ থেকে। সমাজের অনেক সফল ব্যবসায়ী, পেশাজীবী বা খ্যাতিমান ব্যক্তিত্ব দারিদ্র্যের সঙ্গে সংগ্রাম করে কিভাবে জীবন সংগ্রামে জয়ী হয়েছেন, তা তারা নিজ আত্মজীবনীতে লিখে রেখে গেছেন। তাঁদের আত্মজীবনী পাঠের মধ্য দিয়ে পাঠকগণও পরিশ্রম করে জীবনে প্রতিষ্ঠিত হবার স্বপ্ন দেখেন।

আত্মজীবনী গ্রন্থকে পাঠক সাধারণভাবে মনে করেন বয়স্ক ব্যক্তিত্বের রচনা। কথাটা ঠিক নয়। আমেরিকান লেখক তারা ওয়েস্টওভার-এর ৩৩ বছর বয়সে রচিত ২০১৮ সালে প্রকাশিত আত্মজীবনী *এডুকেটেড: এ মেমোইর* ২০২০ সালে বেস্ট সেলার হয়।[১০৪] বারাক ওবামা ও স্টিভ জবস গ্রন্থটি পড়তে বলেন। তবে সব আত্মজীবনীর স্বরূপ কিন্তু এক রকম হয় না। ব্যবসায়ীর আত্মজীবনীর সঙ্গে রাজনীতিবিদের আত্মজীবনীর পার্থক্য থাকে। শিক্ষাবিদরা আত্মজীবনী লেখেন ভিন্ন ভঙ্গিমায়। এভাবে বিভিন্ন পেশার ব্যক্তিত্বদের লেখা আত্মজীবনীর মধ্যে পার্থক্য দৃশ্যমান। আবার একই পেশার বিভিন্ন ডিসিপ্লিনের ব্যক্তিত্বদের আত্মজীবনী হয় ভিন্ন চরিত্রের। শিক্ষাবিদের উদাহরণ দিয়ে বলা যায়, একজন অর্থনীতিবিদের আত্মজীবনীর সঙ্গে একজন ইতিহাসবিদের আত্মজীবনীর ঘটনা নির্বাচন এবং লিখন ভঙ্গিমায় পার্থক্য থাকে। আবার কবি-সাহিত্যিকদের লেখা আত্মজীবনীর স্বাদ ভিন্ন রকম। ইতিহাসবিদ আবদুল করিমের দুই খণ্ডে লেখা আত্মজীবনীর সঙ্গে অর্থনীতিবিদ রেহমান সোবহানের লেখা আত্মজীবনীর রচনাশৈলীতে পার্থক্য রয়েছে।[১০৫] কবি আল মাহমুদ বা সাহিত্যের অধ্যাপক আবদুল্লাহ আবু সায়ীদের লেখা আত্মজীবনীর সঙ্গে নোবেলজয়ী প্রফেসর ড. মুহাম্মদ ইউনূস বা ভারতীয় বিজ্ঞানী ও প্রেসিডেন্ট এ পি জে আবদুল কালামের

---

১০৪. Tara Westover, *Educated: A Memoir* (New York: Random House, 2018).

১০৫. দেখুন, আবদুল করিম, *সমাজ ও জীবন* [প্রথম ও দ্বিতীয় খন্ড] (ঢাকা: জাতীয় সাহিত্য প্রকাশ, ২০০৮); Rehman Sobhan, *Untranquil Recollections* (New Delhi: Sage Publications, 2016).

আত্মজীবনীর রচনাশৈলীতে একরূপত্ব থাকবে না।[১০৬] সে দৃষ্টিকোণ থেকে পাঠক এ গ্রন্থকে আত্মজীবনী বলতে চাইলে বলতে পারেন। তবে সে ক্ষেত্রে গ্রন্থটিকে বিবেচনা করতে হবে বাংলাদেশি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন দলীয় বর্ণ-পরিচয়হীন শিক্ষকের একাডেমিক জীবনের অভিজ্ঞতার বয়ান হিসেবে। এ গ্রন্থটির বিশেষ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, এখানে আমি আমার বক্তব্যের স্বপক্ষে পরিশিষ্টে অনেক ছবি ও তথ্যাদি ব্যবহার করেছি, যা অন্যান্য আত্মজীবনীতে এমন ভঙ্গিমায় কদাচিৎ দৃশ্যমান হয়। এ ছাড়া রাজনীতিবিজ্ঞানের শিক্ষক হওয়ায় আমি আমার লেখনীর ভাষা, বর্ণনা ও বিশ্লেষণে সাহিত্যের ঢঙ্গের সঙ্গে সমাজবিজ্ঞান গবেষণায় ব্যবহৃত বর্ণনা, ভঙ্গিমা ও ভাষার মেলবন্ধন রচনার চেষ্টা করেছি।

একাডেমিক অটোবায়োগ্রাফি

এ গ্রন্থ লেখা শুরু করার আগে আমি একটি একাডেমিক অটোবায়োগ্রাফি রচনার কথা ভেবেছিলাম। সে রচনায় আমার একাডেমিক জীবনের সূচনা, গতিপ্রকৃতি ও সাফল্য-ব্যর্থতা তুলে ধরার পরিকল্পনা ছিল। ব্যক্তি ও পারিবারিক জীবনের বিষয়াবলি উপস্থাপনের আগ্রহ ছিল না। পরে ওই পরিকল্পনায় সামান্য পরিবর্তন আনি। ভাবি, একজন বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক তো সমাজেরই মানুষ। তারও তো পরিবার আছে। মা-বাবা, ভাইবোন আছেন। সংসার আছে। বৌ ছেলেমেয়ে আছে। তিনি তো পারিবারিক পরিবেশ থেকে দীর্ঘ প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে ক্রমান্বয়ে শিক্ষক হয়ে ওঠেন। এ প্রক্রিয়ায় সফল হতে তার পারিবারিক সদস্যদের সমর্থন লাগে। পারিবারিক পরিবেশ প্রতিকুল হলে শিক্ষক হবার স্বপ্ন কঠিন হয়ে পড়ে। কোনো মানুষ তো জন্ম নিয়েই হঠাৎ করে শিক্ষক হন না। এ কারণে একজন শিক্ষকের শিক্ষক হয়ে ওঠার গতিপ্রকৃতি ও ধারাবাহিকতার কিছুটা অংশ আমি পাঠকের সামনে আনা প্রাসঙ্গিক বিবেচনা করি। কারণ, একজন ব্যক্তির শিক্ষক হয়ে ওঠার ইতিহাস জানা প্রয়োজন। সেজন্য পূর্বের পরিকল্পনা পরিবর্তন করে ভাবি, ব্যক্তিগত ও পারিবারিক জীবনের সামান্য ছোঁয়া না থাকলে পাঠকদের কাছে গ্রন্থটি কম লবনযুক্ত তরকারির মতো মনে হতে পারে। সে কারণে আমি মাত্র দু'একটি অধ্যায়ে প্রাসঙ্গিকতা বজায় রেখে আমার পারিবারিক ও ব্যক্তিজীবনের অল্প কিছু তথ্য উপস্থাপন করেছি। তবে সেসব আলোচনায়ও শিক্ষাসংক্রান্ত বিষয় প্রাধান্য পেয়েছে। এসব দিক বিবেচনা করে এ গ্রন্থটিকে সনাতনি প্রকৃতির আত্মজীবনী না বলে শিক্ষামূলক আত্মজীবনী বা একাডেমিক অটোবয়োগ্রাফি বলা সঙ্গত হবে। সারা জীবন শিক্ষকতা করায় এ একাডেমিক আত্মজীবনীতে বর্ণিত

---

১০৬. দেখুন, আল মাহমুদ, *যেভাবে বেড়ে উঠি* (ঢাকা: অনন্যা, ১৯৯৭); আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ, *নিষ্ফলা মাঠের কৃষক* (ঢাকা: বিশ্ব সাহিত্য কেন্দ্র, ২০২০); মুহাম্মদ ইউনূস, *গ্রামীণ ব্যাংক ও আমার জীবন* (ঢাকা: মাওলা ব্রাদার্স, ২০০৪); A P J Abdul Kalam, & Arun Tiwari, *Wings of Fire* (Hyderabad: Universities Press, 1999).

আলোচনা, তথ্য ও বিশ্লেষণের সবই আমার একাডেমিক জীবন থেকে আহরিত। একাডেমিক জীবনের বাইরের অভিজ্ঞতা আমার জীবনে অপ্রতুল বিধায় তেমন আলোচনা এ গ্রন্থে কমই স্থান পেয়েছে।

শিক্ষক কি শিক্ষাবিদ?

একজন বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সারা বিশ্ব নিয়ে চিন্তা করেন। বিশ্বের জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার শাখা প্রশাখা সম্পর্কে তার সমঝ থাকে। তার চিন্তা-ভাবনা কেবল নিজ দেশের মধ্যে, বা নিজের একাডেমিক ডিসিপ্লিনের মধ্যে সীমায়িত থাকে না। তার দৃষ্টিভঙ্গি বিশ্বকে ছাড়িয়ে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকেও পর্যবেক্ষণের আওতাভুক্ত করে। অথচ, আমরা অধিকাংশই বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক হয়ে সারা বিশ্ব থেকে দৃষ্টি সরিয়ে নিজ দেশের মধ্যে সীমায়িত হয়ে পড়ি। জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় বিচরণ না করে কৃপণের মতো নিজ ডিসিপ্লিনের দু'চারটি বই পড়ার অহমিকা নিয়ে নিজেকে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক বলে পরিচয় দেই। এর চেয়ে লজ্জার আর কি হতে পারে! দু'চারটে বই পড়ে সিলেবাস অনুযায়ী শিক্ষার্থীদের পড়িয়ে নিজেকে ভাবি একজন দায়িত্বপরায়ন শিক্ষক। পেশার প্রতি সাধনা ও ভালোবাসার নেশা সৃষ্টি না করে কিছু অর্পিত রুটিন দায়িত্ব পালন করে নিজেকে সফল শিক্ষক ভাবি। শ্রেণিকক্ষে পড়াবার জন্য নিজ ডিসিপ্লিনের কতিপয় টেক্সট বই পড়ে নিজেকে জ্ঞানী ও বিদ্বান ভাবি। নিজের মধ্যে জ্ঞান পিপাসার নেশা সৃষ্টি না করে নিজেকে বোকার মতো পণ্ডিত বা বুদ্ধিজীবী মনে করি। গণমাধ্যম আমাকে পরিচয় করিয়ে দেয় 'শিক্ষাবিদ' হিসেবে। শিক্ষাবিদ হওয়া কি এতইই সহজ? শিক্ষাক্ষেত্রে একজন শিক্ষকের অবদান না জেনেই তাকে শিক্ষাবিদ বলা হয়। কাজটি একেবারেই আহাম্মকি। বাংলাদেশে হাজার হাজার বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক আছেন। কিন্তু শিক্ষাবিদ গুনতে গেলে হাতের আঙ্গুলের করগুলোই গুণে শেষ করা কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। কেবল শিক্ষকতা আর গবেষণা করে শিক্ষাবিদ হওয়া যায় না। শিক্ষাবিদকে একদিকে যেমন নতুন জ্ঞান সৃজনে অবদান রাখতে হয়, অন্যদিকে, ভালোবাসা ও জ্ঞান বিতরণের মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীর হৃদয়ে জায়গা করে নিতে হয়।

একাডেমিক কর্মকাণ্ড বাড়াতে হবে

শিক্ষক হলে সারাদিন লেখাপড়া করতে হবে এ ধারণা ঠিক নয়। শেখাকে যদি কেউ নেশা হিসেবে নেন, তিনি তো বই না পড়ে, বা কম পড়েও শিখতে পারেন। শেখার জন্য, জানার জন্য তো বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকের দিনরাত বই পড়া লাগে না। ডিজিটাল যুগে গণমাধ্যম থেকে অনেক কিছু শেখা যায়। বুদ্ধিমান হলে ইন্টারনেট থেকে শেখা যায়। আর বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসের আড্ডা থেকেও শেখা যায় বিস্তর। আন্তর্জাতিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করে একটি বড় বিশ্ববিদ্যালয়কে তুলনা করা যায় একটি ছোট পৃথিবীর সঙ্গে। এখানে থাকেন শত শত দেশের শিক্ষার্থী। অনেক দেশের শিক্ষক। একেকজন একেক ধর্ম, বর্ণ ও ভাষাভাষী

ব্যক্তিত্ব। একেকজন একেক রকম চিন্তা-ভাবনার লালনকারী। প্রত্যেকে ভিন্ন ভিন্ন পরিবেশ ও সংস্কৃতি থেকে আগত। বিভিন্ন ডিসিপ্লিনের গবেষক ও বিশেষজ্ঞ। শেখার নেশা নিয়ে এদের সঙ্গে গল্প আর আড্ডাবাজি করেই তো নিজেকে সমৃদ্ধ করা যায় অনেক বিষয়ে। তবে নিজ আগ্রহের এলাকায় কিছু লেখাপড়া করা থাকলে এ ভঙ্গিমায় শেখার চেষ্টা ফলদায়ক হয়। তবে এ ব্যাখ্যা সারা পৃথিবীর বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর জন্য প্রযোজ্য হলেও বাংলাদেশি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর জন্য প্রযোজ্য নয়। কারণ, বাংলাদেশি বিশ্ববিদ্যালয়গুলো, বিশেষ করে সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলো দলীয় রাজনীতির দুষ্টচক্রে পড়ে এর একাডেমিক ভাবমূর্তি ম্লান করে ফেলেছে। এসব বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক পরিচিতির চেয়ে রাজনৈতিক ভাবমূর্তি অনেক প্রকট। এসব বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষকদের আড্ডায় একাডেমিক বিষয়বস্তুর চেয়ে রাজনৈতিক বিষয়বস্তু প্রাধান্য পায়। এ বিশ্ববিদ্যালয়গুলোয় বিরল ব্যতিক্রম ছাড়া ভিসি নিয়োগ থেকে শুরু করে সকল সিদ্ধান্ত হয় রাজনৈতিক দলীয় বিবেচনায়। এ সম্পর্কে এ গ্রন্থে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয় একটি একাডেমিক প্রতিষ্ঠান। এজন্য এ প্রতিষ্ঠানগুলোয় রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড কমিয়ে একাডেমিক কর্মতৎপরতা বাড়ানো প্রয়োজন।

মান বৃদ্ধি ও দুর্নীতি নিয়ন্ত্রণ

লেখাপড়া এবং শিক্ষক-শিক্ষার্থীর মান কমে যাওয়ায় বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোয় বিদেশি শিক্ষার্থীর সংখ্যা আশংকাজনকভাবে হ্রাস পেয়েছে। এক সময় মালয়েশিয়া থেকে শিক্ষার্থীরা এ দেশে লেখাপড়া করতে আসতো। আসতো প্রতিবেশি দেশ নেপাল ও ভুটান থেকেও। এখন আর মালয়েশিয়া থেকে শিক্ষার্থীরা বাংলাদেশে লেখাপড়া করতে আসে না। বরং বাংলাদেশ থেকে অনেক শিক্ষার্থী মালয়েশিয়ায় লেখাপড়া করতে যায়। কারণ, মালয়েশিয়া শিক্ষার মান উন্নত করতে পেরেছে। আর বাংলাদেশে ক্রমান্বয়ে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা বাড়লেও মান বাড়েনি। শিক্ষা নিয়ে ব্যবসা বেড়েছে। শিক্ষাবাণিজ্যে এখন ব্যবসায়ী থেকে শুরু করে কূটনৈতিক মিশনগুলো পর্যন্ত জড়িত। ঢাকাস্থ অধিকাংশ কূটনৈতিক মিশনের স্কুল রয়েছে। তুরস্কের দূতাবাস ঢাকার পর তাদের টার্কিশ হোপ স্কুল চট্টগ্রামেও প্রতিষ্ঠা করেছে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বৃদ্ধির কারণে শিক্ষার্থী ও শিক্ষকের সংখ্যা বেড়েছে। তবে শিক্ষার মানের অবনমন রোধ সম্ভব হয়নি। শেখ হাসিনা সরকার জেলায় জেলায় বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের ঘোষণা দিয়েছে। তবে ওইসব বিশ্ববিদ্যালয়ে সুযোগ্য শিক্ষক সরবরাহ করা সম্ভব হবে কিনা সে সম্পর্কে ভাবা হয়নি। উদ্যোগ নেয়া হয়নি শিক্ষাঙ্গণে চলমান দুর্নীতি নিয়ন্ত্রণের। প্রশ্নবিদ্ধ একাদশ সংসদ নির্বাচনের পর সরকার দুর্নীতির বিরুদ্ধে 'জিরো টলারেন্স' নীতি ঘোষণা করলেও শিক্ষাঙ্গণের দুর্নীতি নিয়ন্ত্রণে বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করেনি। সার্বিকভাবে দেশে দুর্নীতি কমাতে চাইলে সবার আগে শিক্ষাঙ্গনের দুর্নীতি কমাবার চেষ্টা করা উচিত। কারণ, শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে সকল সরকারি ও বেসরকারি

কর্মকর্তাগণ লেখাপড়া শিখে ডিগ্রি নিয়ে তারপর কর্মজীবনে প্রবেশ করেন। কাজেই দুর্নীতি নিয়ন্ত্রণে 'জিরো টলারেন্স' নীতি কার্যকরী করতে চাইলে সবার আগে শিক্ষাঙ্গণের দুর্নীতি নিয়ন্ত্রণের ওপর গুরুত্বারোপ করা উচিত। নাগরিক সমাজ, এনজিও ও শিক্ষাবিদদের পক্ষ থেকে বারংবার পরামর্শ দেয়া হলেও সরকার শিক্ষাঙ্গণের, বিশেষ করে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর দুর্নীতি নিয়ন্ত্রণে বাড়তি গুরুত্বারোপ করেনি।[১০৭] বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর ভাইস চ্যান্সেলরগণের সপ্রমাণ দুর্নীতি ধরা পড়লেও তাদের শাস্তি না দিয়ে পদ থেকে সরিয়ে দেয়া হয়। এর ফলে নবাগত ভাইস চ্যান্সেলরদের মধ্যে দুর্নীতি করার প্রবণতা বাড়ে।[১০৮] ছাত্র ও শিক্ষক রাজনীতির মিশ্রণ বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস সংস্কৃতিকে কলুষিত করে। ফলে অনেকক্ষেত্রেই ভূলুণ্ঠিত হয় শিক্ষকের নিরপেক্ষতার অহঙ্কার। বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর মান বাড়াতে হলে এর একাডেমিক, প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক দুর্নীতি নিয়ন্ত্রণে বাড়তি গুরুত্ব আরোপ করা দরকার।

শিক্ষককে গবেষক হতে হয়

বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষককে কেবল পড়লে হয় না। জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চা করে জ্ঞানী হলেই হয় না। অর্জিত জ্ঞান বিতরণের যোগ্যতা অর্জন করতে হয়। কঠিন বিষয় সহজ করে শিক্ষার্থীদের বুঝিয়ে দেবার যোগ্যতা অর্জন করতে হয়। এজন্য সফল শিক্ষককে হতে হয় আকর্ষণীয় গল্পবলিয়ে (স্টোরি টেলার)। আবার, জ্ঞান অর্জন ও বিতরণের সঙ্গে শিক্ষককে নতুন জ্ঞান সৃষ্টি করতে হয়। এ জন্য পাশ্চাত্যে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকদের কেন্দ্র করে 'পাবলিশ অর পেরিশ', অর্থাৎ, 'হয় প্রকাশনা কর, নয় ধ্বংস হও' প্রবচনটির জন্ম হয়েছে। এ কারণে ইউরোপ-আমেরিকার খ্যাতিমান বিশ্ববিদ্যালয়গুলোয় যোগদানকারী অনেক শিক্ষক এ পেশায় বেশিদিন টিকতে পারেন না। শিক্ষার্থীদের মূল্যায়ন নেতিবাচক হলে, বা গবেষণা প্রকাশনার

---

১০৭. প্রাসঙ্গিক তথ্যের জন্য দেখুন, মুহাম্মদ ইয়াহ্ইয়া আখতার, 'উচ্চশিক্ষায় নিম্ন ব্যবস্থাপনা', *যুগান্তর*, ২৪ আগস্ট, ২০১৭; 'শিক্ষক নিয়োগে রাজনৈতিক বিবেচনা ও দুর্নীতি বন্ধ হোক', *যুগান্তর*, ০৫ এপ্রিল, ২০১৭; 'প্রথমে দমন করুন শিক্ষাঙ্গণের দুর্নীতি', *যুগান্তর*, ১১ মে, ২০১৬; 'শিক্ষাঙ্গণের দুর্নীতি প্রতিরোধ অগ্রাধিকার পাচ্ছে না কেন?', *যুগান্তর*, ০১ এপ্রিল, ২০১৪; 'পরীক্ষায় নতুন দুর্নীতির বিকেন্দ্রীকরণ', *যুগান্তর*, ২২ ডিসেম্বর, ২০১৪; 'ছাত্র রাজনীতি বন্ধ নিয়ে রাজনীতি', *যুগান্তর*, ২০ এপ্রিল, ২০১৪; 'শিক্ষকদের কি এই নৈতিক স্খলন সাজে?', *যুগান্তর*, ১৮ মে, ২০১৬; মো. রেযাউল করিম, দিপু রায় ও মো. মোস্তফা কামাল, 'সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রভাষক নিয়োগঃ সুশাসনের চ্যালেঞ্জ ও উত্তরণের উপায়', ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি) গবেষণা প্রতিবেদন, ২০১৬।

১০৮. প্রাসঙ্গিক তথ্যের জন্য দেখুন, মুহাম্মদ ইয়াহ্ইয়া আখতার, 'উপাচার্যরা কেন দুর্নীতি করেন', *যুগান্তর*, ১৮ ফেব্রুয়ারি, ২০২১।

নির্ধারিত শর্ত পূরণ করতে না পেরে অনেককে শিক্ষকতা পেশা ত্যাগ করতে হয়। তবে শিক্ষকতাকে নেশা হিসেবে গ্রহণকারী শিক্ষকগণ জ্ঞান চর্চা ও জ্ঞান সৃষ্টির মধ্য দিয়ে এ পেশায় ভালো করেন। জ্ঞান সৃষ্টির জায়গায় কাজ করা মানে অধিকসংখ্যক প্রকাশনা করা নয়। কেউ যদি একটিমাত্র গবেষণা কাজ করতে পারেন, যা নতুনত্ব যোগ করে তার একাডেমিক ডিসিপ্লিনকে সমৃদ্ধ করতে পারে, তাহলে তেমন একটি বা দু'টি মৌলিক কাজই শিক্ষককে আন্তর্জাতিক পরিচিতি দিয়ে তাকে মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত করে। এ জন্য কেবল প্রকাশনার সংখ্যা বিচার করে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকের অবদান মূল্যায়ন করা হয় না। তাঁর প্রকাশনার গুরুত্ব ও মৌলিকত্ব বিচার করা হয়। জ্ঞানের শাখায় যদি কোনো প্রকাশনা নতুন কিছু যোগ করতে না পারে, তাহলে সে প্রকাশনা গুরুত্ব পায় না। এ জন্য অনেকসংখ্যক সাদামাটা প্রকাশনা না করে কমসংখ্যক অবদানমূলক গবেষণা প্রকাশনা শিক্ষককে নিজ পেশায় স্থায়িত্ব প্রদান ও খ্যাতিমান করে।

শিক্ষকতার মূল্যায়ন প্রয়োজন

এসব আলোচনা ও বিশ্লেষণের পর বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক হিসেবে নিজেকে মূল্যায়ন করে হতাশ হই। নিজের পারফরম্যান্সে সন্তুষ্ট হতে পারি না। তবে বেশি পড়তে না পারলেও আমি সব সময় লেখলেখিতে জড়িত থেকেছি। গবেষণামূলক মৌলিক লেখার পাশাপশি সাধারণ মানের লেখাও লিখেছি। আবার অতি সাধারণ পাঠকদের জন্য সমসাময়িক রাজনীতি ও অন্যান্য বিষয়ের ওপর জাতীয় দৈনিক, সাপ্তাহিক, পাক্ষিক ও মাসিক পত্রিকা/ম্যাগাজিনেও অবিরতভাবে লিখেছি। নিজ একাডেমিক ডিসিপ্লিনের বাইরেও অল্পবিস্তর লেখার চেষ্টা করেছি। ডিজিটাল যুগে ইলেকট্রনিক গণমাধ্যমেও লেখালেখি করেছি। পত্র-পত্রিকায় সাক্ষাৎকার দিয়েছি। টিভি চ্যানেলগুলোর টকশো'তে অংশগ্রহণ করেছি। তবে এ সত্য স্বীকার্য যে প্রকাশনা ও গবেষণায় এমন অবদান নিয়ে বিদেশি খ্যাতিমান বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতায় টিকে থাকা সম্ভব হত না (লেখকের প্রকাশনা তালিকার জন্য দেখুন পরিশিষ্ট- ১১:১)। বাংলাদেশি সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করার কারণে চাকুরিতে অবসরগ্রহণ পর্যন্ত টিকে থাকতে অসুবিধা হয়নি। কারণ, এ দেশে সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণা ও প্রকাশনা না করেও ৬৫ বছর বয়স পর্যন্ত শিক্ষকতা করা যায়। যে ১৯৭৩-এর সরকারি বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাদেশ অনুযায়ী বড় সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলো পরিচালিত হয়, রাজনৈতিক কারণে সে অধ্যাদেশ প্রায়শই লঙ্ঘিত হয়। এ অধ্যাদেশ শিক্ষকদের স্বাধীনতা দিলেও তাদের দায়িত্বশীলতা সুনিশ্চিত করতে পারেনি। শিক্ষকের সফলতা পরিমাপের প্রকৃত বিচারক হলেন শিক্ষার্থীগণ। এ কারণে বিশ্বের সকল দেশের খ্যাতিমান বিশ্ববিদ্যালয়গুলোয় শিক্ষার্থীগণ কর্তৃক শিক্ষকের কার্যদক্ষতা মূল্যায়নের ব্যবস্থা আছে। আর বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এ মূল্যায়ন যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করে। ফলে শ্রেণিকক্ষে পাঠদানের কাজটি ভালোভাবে করতে না পারলে কোনো শিক্ষক

শিক্ষকতায় টিকে থাকাতে পারেন না। অথচ, বাংলাদেশে বড় সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোয় শিক্ষার্থী কর্তৃক শিক্ষকের কার্যদক্ষতা মূল্যায়নের ব্যবস্থা নেই। শিক্ষকের পদোন্নতির সময় তার শ্রেণিকক্ষের পারফরম্যান্স বিবেচনায় নেয়া হয় না। ফলে একাডেমিকভাবে দুর্বল হয়েও অনেকে রাজনৈতিক প্রভাব খাঁটিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতায় যোগ দিতে, পদোন্নতি পেতে ও অবসরগ্রহণ পর্যন্ত চাকুরি করতে পারেন।

বিচিত্র অভিজ্ঞতা

আমেরিকা, কানাডা ও অস্ট্রেলিয়ার কতিপয় লব্ধপ্রতিষ্ঠ বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যক্রম আমি সরাসরি দেখেছি। এসব বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চশিক্ষা গ্রহণের জন্য লেখাপড়া করে ও সময় কাটিয়ে আমার কিছু অভিজ্ঞতা হয়েছে। এসব অভিজ্ঞতার অংশবিশেষ এ গ্রন্থে উপস্থাপন করা হয়েছে। কানাডার ওয়াটারলু ও অস্ট্রেলিয়ার সিডনি বিশ্ববিদ্যালয়ে দীর্ঘ সময় কাটিয়েছি। উপস্থাপন করেছি ওইসব বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অর্জিত অভিজ্ঞতা। উপস্থাপন করেছি আমেরিকার এমআইটি মিডিয়া ল্যাব এবং হার্ভার্ড বিজনেস স্কুলের একাডেমিক পেশাদারিত্বের শ্রেষ্ঠত্ব। আরও উপস্থাপন করেছি বিদেশি শিক্ষার্থীদের খণ্ডকালীন কর্মজীবনের বাস্তব অভিজ্ঞতা। যদি বিদেশি ভালো বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর একাডেমিক চরিত্র, মেধাভিত্তিক শিক্ষক নিয়োগ, ছাত্র ভর্তি প্রক্রিয়া, শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা, প্রভৃতি দেখার সুযোগ না পেতাম, তাহলে হয়তো বাংলাদেশি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর কর্মকাণ্ডের সমালোচনা করতাম না। উন্নত দেশগুলো এদের শিক্ষাঙ্গণে সুশাসন প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছে। অন্যদিকে, বর্ণের আবরণে জাতীয় দলীয় রাজনীতির লেজুড়বৃত্তির তীব্রতা বাংলাদেশে সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে কিভাবে ধ্বংসের কার্নিশে নিয়ে এসেছে তা নিজ চোখে দেখেছি এবং এখনো দেখছি। শিক্ষক ও কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়োগ প্রক্রিয়ায় এসব বিশ্ববিদ্যালয়ে রাজনৈতিক প্রভাব ও বিভিন্ন রকম লেনদেনের কাছে কিভাবে মেধার অবমূল্যায়ন হচ্ছে তা অনেকটাই ওপেন সিক্রেট। ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি) ২০১৫ সালে গবেষণা করে সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোয় প্রভাষক নিয়োগ প্রক্রিয়ায় সংঘটিত অনিয়ম ও আর্থিক দুর্নীতি তুলে ধরেছে।[১০৯] টিআইবি প্রভাষক নিয়োগে ৩ থেকে ২০ লক্ষ টাকা অবৈধ আর্থিক লেনদেনের তথ্য উপস্থাপন করেছে।[১১০] সমাজ, রাজনীতি ও প্রশাসনের দুর্নীতি নিয়ন্ত্রণ করতে হলে যে শিক্ষাঙ্গণে সুশাসন প্রতিষ্ঠা জরুরি সে বোধ রাজনৈতিক নেতৃত্ব এখনও

১০৯. দেখুন, মো. রেযাউল করিম, দিপু রায় ও মো. মোস্তফা কামাল, *প্রাগুক্ত*।
১১০. মো. রেযাউল করিম, দিপু রায় ও মো. মোস্তফা কামাল, *প্রাগুক্ত*. পৃষ্ঠা-২৫।

হৃদয়ঙ্গম করতে পারেনি। এ গ্রন্থের নবম অধ্যায়ে সে প্রসঙ্গ বিশ্লেষণ করেছি। আলোচনা করেছি উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের একাডেমিক, রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক দুর্নীতিবৃদ্ধি প্রসঙ্গে। আরও উপস্থাপন করেছি ছাত্র-শিক্ষকদের মধ্যকার একাডেমিক দুর্বৃত্তায়ন ও বিশ্ববিদ্যালয়ে সংঘটিত যৌন দুর্নীতি বৃদ্ধি প্রসঙ্গে।

শিক্ষক ছাত্রকে কাজ শিখাবেন

এ গ্রন্থে উপস্থাপিত তথ্যসমূহের প্রায় সবই আমার শিক্ষা জীবন থেকে আহরিত। এসব আমি ছাত্র হিসেবে শিখেছি। শিক্ষক হিসেবে দেখেছি। নিজ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে জেনেছি। বিদেশে লেখাপড়া করতে যেয়ে সেখান থেকেও শিখেছি। বিদেশি বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে ভিন্ন সাংস্কৃতিক পরিবেশে নিজ দেশের প্রতিনিধিত্ব করার ভঙ্গিমা তুলে ধরেছি। সহপাঠীদের কাছ থেকে শিখেছি। সহকর্মীদের কাছ থেকে শিখেছি। বন্ধুদের কাছ থেকে শিখেছি। শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে শিখেছি। দুঃখের সাথে দেখেছি, চোখের সামনে কিভাবে আমার ছাত্র রাজনীতির বলি হয়ে নিহত হয়েছে। কিভাবে হলের দখলদারিত্ব নিয়ে ছাত্র রাজনীতিজড়িত নেতা-কর্মীদের মধ্যে সংঘর্ষ হয়। কিভাবে পুলিশ শিক্ষার্থীদেরকে মারধর করে। কিভাবে হল রেইড করে পুলিশ রাম দা, কিরিচ, লাঠিসোটা ও অস্ত্র উদ্ধার করে। শিক্ষাঙ্গণ একাডেমিক প্রতিষ্ঠান হওয়া সত্ত্বেও বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে কেন জলকামান থাকে। কিভাবে শিক্ষার্থীরা একটি ক্লাস না করেও পরীক্ষা দিয়ে পাস করে। শুনেছি কিভাবে একজন শিক্ষকের থিসিস বা গবেষণা প্রবন্ধ অন্য শিক্ষক লিখে দেন। কিভাবে কো-অথরের অনুমতি না নিয়ে একজন লেখক নিজনামে প্রবন্ধ বা গ্রন্থ প্রকাশ করেন। কিভাবে প্রভাবশালী শিক্ষকদের কেউ কেউ বিশেষ বিশেষ শিক্ষার্থীর প্রতি আনুকূল্য প্রদর্শন করেন। এসব দেখেশুনে মনে হয়েছে, সব শিক্ষকই শিক্ষার্থীদের ভালোবাসতে পারেন। তবে সব শিক্ষার্থীদের প্রতি সমান আচরণকারী শিক্ষকের সংখ্যা বেশ কম।

শিক্ষক হিসেবে কতটা সফল হতে পেরেছি জানি না। সে মূল্যায়ন করবে আমার প্রিয় শিক্ষার্থীগণ। তারাই এ বিষয়ে শ্রেষ্ঠ বিচারক। কতটা ভালো পড়াতে পেরেছি বলতে পারব না। তবে প্রচেষ্টায় গাফিলতি ছিল না। ক্লাস নেয়া, পরীক্ষা নেয়া, খাতা দেখা, পরীক্ষার ফলাফল দেয়া, বিভাগীয় সভাপতিত্বের দায়িত্ব পালন করা, লেখালেখি ও গবেষণা প্রকাশনা করাসহ শিক্ষক জীবনের প্রতিটি দায়িত্ব পালনে যত্নবান হতে সচেষ্ট ছিলাম। শিক্ষার্থীদের সুবিধা-অসুবিধা ও বিপদাপদে খোঁজ খবর নেয়ায়ও অমনোযোগী ছিলাম না। তবে শিক্ষার্থীদের যতটা পড়াতে পেরেছি, তার চেয়ে ভালোবাসতে এবং তাদের কল্যাণ কামনা করতে পেরেছি বেশি। এর কারণ সোজা। শ্রেণিকক্ষে পড়ানোর কাজটা কঠিন। ভালোবাসা ও কল্যাণ কামনার কাজটি সোজা। পড়াবার জন্য পড়তে হয়। প্রস্তুতি নিতে হয়। ভালোবাসা আর কল্যাণ কামনার জন্য পরিশ্রম করা লাগে না। প্রায় চার দশক

শিক্ষকতা করার অভিজ্ঞতা থেকে বুঝেছি, শিক্ষক যদি শিক্ষার্থীদের আন্তরিকভাবে ভালোবাসেন, তবে শিক্ষার্থীরা শিক্ষককে ভালো না বেসে পারে না। এ সত্য উপলব্ধির নমুনাও এ গ্রন্থে উপস্থাপিত হয়েছে। নতুন শিক্ষকদের যেটা বিশেষভাবে মনে রাখা দরকার তা হলো, তাদের ভালোবাসা যেন সকল শিক্ষার্থীর প্রতি সমান হয়। আরও মনে রাখতে হবে, শিক্ষার্থীকে ভালোবাসা মানে তাকে পরীক্ষার সাজেশন দেয়া নয়। কোনো শিক্ষার্থীকে বিশেষভাবে বিবেচনা করা নয়। শিক্ষার্থী জুনিয়র কলিগকে ভালোবাসা মানে তার পদোন্নতির জন্য প্রবন্ধ লিখে দিয়ে তাকে ক্লায়েন্ট বানানো নয়। দ্রুত পদোন্নাতির জন্য তার থিসিস লিখে দেয়া নয়। তাকে শিখিয়ে পড়িয়ে পরিশ্রম করিয়ে তার একাডেমিক উন্নয়ন ঘটানো। একাডেমিক গবেষণার কাজ শিখিয়ে তাকে পরিশ্রম করে থিসিস লিখতে সহায়তা করা। তাকে একাডেমিক যোগ্যতা অর্জনে সহায়তা করা। আমার এমফিল ছাত্রদের থিসিসের একেকটি অধ্যায় আমি প্রয়োজনে তিন চারবার দেখে দিয়েছি। প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দিয়ে তাকে দিয়ে কয়েকবার লিখিয়েছি। কখনো নিজে তার অধ্যায় বা তার থিসিস লিখে দেবার চিন্তা মাথায় আসেনি। এতে আমার পরিশ্রম হয়েছে। ছাত্র সাময়িকভাবে আমার ওপর বিরক্ত হয়েছে। তবে পরে এক পর্যায়ে স্বীকার করে বলেছে, স্যার আপনার সাথে কাজ করে কষ্ট হলেও গবেষণার অনেক খুঁটিনাটি বিষয় শিখতে পেরেছি। এ সব জায়গাগুলোতে শিক্ষককে সতর্কতা ও নিষ্ঠার সঙ্গে দায়িত্ব পালন করতে হয়। অন্যথা, শিক্ষকের ভূমিকা প্রশ্নবিদ্ধ হয়ে পড়ে।

পারিবারিক জীবন গুরুত্বপূর্ণ

বাংলাদেশি সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতা পেশায় অন্য চাকুরি থেকে বেশি ছুটি পাওয়া যায়। ধর্মীয় উৎসবের ছুটি এবং সরকারি ছুটি বাদেও রাজনৈতিক কারণে মাঝেমধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ে অনির্ধারিত ছুটি পাওয়া যায়। যেমন প্রতিপক্ষ ছাত্র সংগঠনগুলোর মধ্যে রাজনৈতিক কারণে দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষ বা তীব্র উত্তেজনা সৃষ্টি হলে অনেক সময় বিশ্ববিদ্যালয় অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ করে দেয়া হয়। অনেকে ভাবতে পারেন, যে কোনো বন্ধ হলেই শিক্ষক বই নিয়ে পড়তে বসবেন, বা গবেষণা কাজ শুরু করবেন। এটা ঠিক নয়। শিক্ষকগণও মানুষ। তাদেরও পরিবার আছে। সামাজিকতা আছে, ছেলেমেয়ে আছে। তিনি অবশ্যই বেড়াতে যাবেন। শপিংয়ে যাবেন। বেশি গবেষণা করতে যেয়ে পরিবারকে অবহেলা করলে তার গবেষণা ক্ষতিগ্রস্ত হবে। তাকে পারিবারিক শান্তি বজায় রেখে সবকিছু করতে হবে। আমি নিজে এ ব্যাপারে যতদূর পারি সচেষ্ট থেকেছি। কিন্তু অনেক বড় বড় গবেষককে একাডেমিক জীবনে পেশার প্রতি অত্যাধিক নিষ্ঠাবান হতে গিয়ে পারিবারিক অশান্তির শিকার হতে দেখেছি। আমার পরিচিত জনৈক লব্ধপ্রতিষ্ঠ গবেষক বাংলাদেশের পাঁচটি বিশ্ববিদ্যালয়সহ বিশ্বের আরও গোটা পাঁচেক দেশের

ছয়-সাতটি বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতা ও গবেষণা করেছেন। তার একাডেমিক ডিসিপ্লিনে তিনি খ্যাতিমান গবেষক। তার প্রকাশনা তালিকাও আকর্ষণীয়। কিন্তু নিবেদিতপ্রাণভাবে গবেষণায় সময় দিতে গিয়ে তিনি পারিবারিক শান্তি হারিয়েছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ে নবাগত শিক্ষকদের এ ব্যাপারে সতর্ক থাকা জরুরি। আমি নিজেও এ ব্যাপারে প্রথমদিকে উদাসীন ছিলাম। তবে পরে সতর্কতা বৃদ্ধি করে পারিবারিক শান্তি ধরে রাখতে সচেষ্ট থেকেছি।

নেশাগ্রস্ত শিক্ষক প্রয়োজন

প্রায় চার দশক সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করে আমি একটা বিষয় বুঝতে পেরেছি। শিক্ষকতাকে যাঁরা পেশা হিসেবে দেখেন, তাঁরা এ পেশায় ভালো করতে পারেন না। চাকুরি করার জন্য যাঁরা শিক্ষকতায় আসেন, তাঁরা শিক্ষার্থী পড়িয়ে স্বচ্ছলভাবে জীবন নির্বাহ করতে পারেন; আদর্শ, অনুকরণীয় এবং জনপ্রিয় শিক্ষক হতে পারেন না। তবে শিক্ষকতাকে পেশার পরিবর্তে নেশা হিসেবে গ্রহণ করে যাঁরা এ পদে আসেন, তাঁরাই হতে পারেন আদর্শ, অনুকরণীয় ও জনপ্রিয় শিক্ষক। নেশা কখনো কমে না। নেশার ধর্মই হচ্ছে বৃদ্ধি পাওয়া। একজন আদর্শ শিক্ষকের মধ্যেও অব্যাহতভাবে জানার আগ্রহের ক্রমান্বয় বৃদ্ধি ঘটে। শিক্ষককে গবেষণা করে নতুন জ্ঞান সৃষ্টির আনন্দের নেশা সৃষ্টি করতে হয়। এ নেশাকে ক্রমবর্দ্ধমানভাবে বাড়িয়ে তুলতে হয়। দুই দিক দিয়ে শিক্ষক এমন নেশায় মশগুল হতে পারেন। প্রথমত, গবেষণার মধ্য দিয়ে নিজের মধ্যে নতুন জ্ঞান সৃষ্টির উন্মাদনা সৃষ্টি ও বৃদ্ধি ক'রে। দ্বিতীয়ত, সৃষ্ট জ্ঞান একাডেমিক জগতে প্রকাশ করে এবং প্রিয় শিক্ষার্থীদের মধ্যে তা বিতরণ করে। যারা নিজের মধ্যে এমন নেশা সৃষ্টি করতে পারেন, তারাই শিক্ষকতা পেশায় সফল হতে পারেন। তারাই শিক্ষার্থীদের হৃদয়ে স্থায়ী হতে পারেন। সম্প্রতি এমন শিক্ষকের সংখ্যা আশংকাজনকভাবে হ্রাস পাচ্ছে। এর কারণ অনেক। তবে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে সৃষ্টিশীল শিক্ষকের সংখ্যা হ্রাস পাওয়ার একটি অন্যতম কারণ হলো শিক্ষকদের মধ্যে জাতীয় দলীয় রাজনীতির চর্চা। দলীয় রাজনীতির লেজুড়বৃত্তি বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকদের মধ্যে গবেষণা ও সৃষ্টিশীলতার প্রতিকূল পরিবেশ সৃষ্টি করেছে। সব নেশাই খারাপ না। সরকারের উচিত কিশোর যুবকদের মধ্যে মাদকের নেশা প্রতিহত করা। তবে একাডেমিক জগতে, বিশেষ করে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকদের মধ্যে জ্ঞান অর্জন ও গবেষণার নেশা, শিক্ষার্থীদের ভালোবাসা ও তাদের কল্যাণে কাজ করার নেশাকে উৎসাহিত করা। বাংলাদেশে উচ্চশিক্ষার উন্নয়ন সুনিশ্চিত করতে নেশাগ্রস্থ শিক্ষকের প্রয়োজন। দুঃখের বিষয়, জ্ঞানপ্রেমিক ও গবেষণায় নেশাগ্রস্ত শিক্ষক তৈরির প্রক্রিয়ায় সরকারি ভূমিকা দ্বিমুখী। কারণ, সরকার মুখে বলে, বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকদের দলীয় রাজনীতি করা উচিত নয়। তাদের লেখাপড়া ও গবেষণা করা উচিত। কিন্তু বড় পদে ডেপুটেশনে কোনো অধ্যাপককে নিয়োগ

করাকালীন জ্ঞান-গবেষণার অবদান বিবেচনা না করে তার বর্ণদলীয় পরিচিতিকে অগ্রাধিকার দিয়ে সরকার স্ববিরোধী ভূমিকা পালন করে। এসব দেখে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকগণ অধিক হারে রাজনীতিমুখী হন। আর এ কারণে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে সৃষ্টি হয় শিক্ষার্থীবান্ধব এবং লেখাপড়া ও গবেষণায় নেশাগ্রস্ত শিক্ষকের সঙ্কট। শিক্ষকতার মতো মহান পেশায় নিয়োজিত থেকেও অনেকে জ্ঞান-গবেষণায় নেশাগ্রস্ত না হওয়ায় এ পেশার ব্যতিক্রমী আনন্দ উপভোগ করতে পারেন না। *শিক্ষকতা পেশা ব্যতিক্রমী নেশা* গ্রন্থটির প্রচার ও মনোযোগী পাঠ শিক্ষাঙ্গণে জ্ঞান-গবেষণায় নেশাগ্রস্ত নিবেদিতপ্রাণ শিক্ষক তৈরির প্রক্রিয়ায় অবদান রাখতে পারলে এ গ্রন্থ লেখা সার্থক হবে।

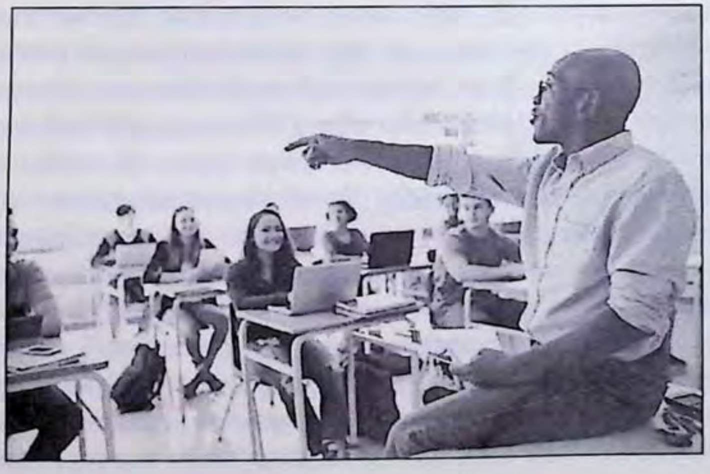

পরিশিষ্ট

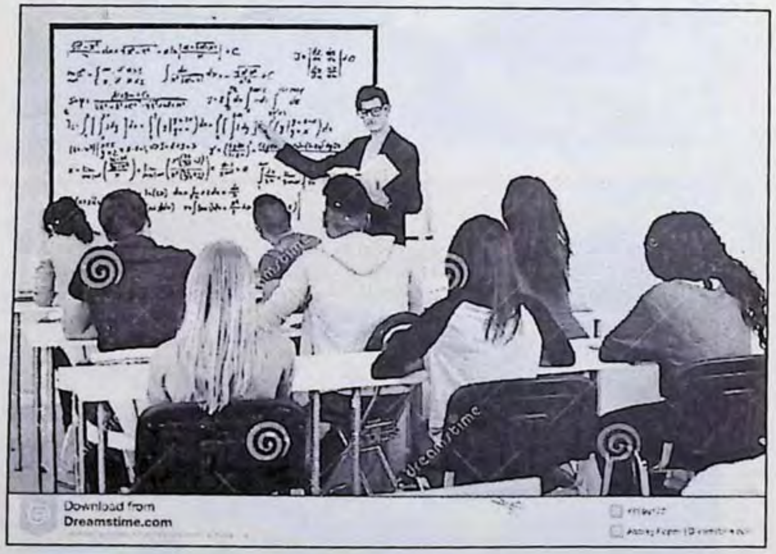

পরিশিষ্ট-২:১

কানাডার ওয়াটারলু বিশ্ববিদ্যালয়ের ডানা পর্টার লাইব্রেরি।

পরিশিষ্ট-২:২

নায়েগ্রায় সি গালকে ফ্রেঞ্চ ফ্রাই খাওয়ান লেখক ও তার বন্ধু নইম সুলতান।

পরিশিষ্ট-৩:১

১৯৯১-'৯২ সালের ইউপি নির্বাচনের ভোটকেন্দ্রের সামনের একটি ছবি।
সূত্র: ইবেন নাথান, কোপেনহেগেন, ডেনমার্ক।

পরিশিষ্ট-৩:২

রিক্সা পেইন্টিংয়ের দুটি নমুনা

পরিশিষ্ট-৩:৩

কোপেনহেগেন বিশ্ববিদ্যালয়ের সহযোগী অধ্যাপক ইবেন নাথান। সূত্র: ইন্টারনেট।

ধন্যবাদ পত্র

& her son are sentenced for life term jail. The People have been seeing Sir, you are a Patriot one. We are grateful & thankful to you for your boldness & anxious for your life. Kindly go with carefulness. May Allah bless you with excellent life. [illegible] -Allah Hafez. The government hooligans kidna-ping opp. leaders.

Yours
AKMd. Noman
a Petty Person
Sen. Barua

D/Sir, Congratulation letter

Assalamualaikum.

Your Comment (write up) as Upazilla election in our Country being held is just accurate. To-day in Bangladesh right thinking persons are not honoured rather humiliated from the top level of ruling authority. We have the Chance often to go through the Comment written by you. Hence you are thanked for your reasonable writing of current affairs. The public those who are out of Politics are always Cheated, oppressed & exhausted due to high price of Commodities. In the name of politics the public money is being looted, consumed make themselves wealthy, moneyholders overnight. Having anyhow a Chance of becoming MP & others turns himself a millionaire. Our old leaders like

অভিনন্দন পত্র

শ্রদ্ধেয় স্যার,

আপনাকে আন্তরিক ধন্যবাদ।

পত্রিকার কলাম পড়ে পাঠকের লেখা পোস্ট কার্ডের নমুনা।

শ্যামল দত্তের উপস্থাপনায় 'আওয়ার ডেমোক্রাসি' শীর্ষক টকশো'তে অন্যান্যের সঙ্গে লেখক (নীচের লাইনে সর্বডানে)।

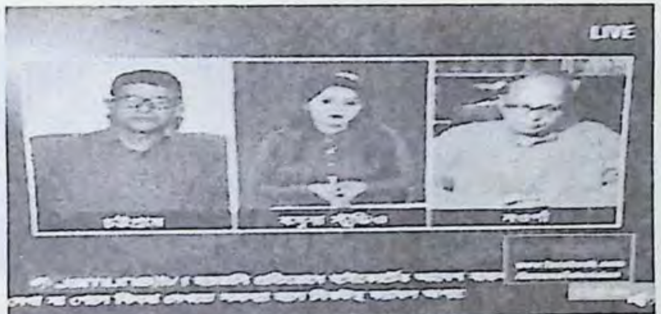

শাওন দত্তের উপস্থাপনায় যমুনা টিভির টকশোতে লেখক বামে।

মহিউদ্দিন খালেদ উপস্থাপিত ইন্ডিপেন্ডেন্ট টিভির টকশোতে।

শ্যামল দত্ত উপস্থাপিত 'গণতন্ত্রের সংলাপ' শীর্ষক রাতের
টকশোতে অন্যদের সঙ্গে লেখক (প্রথম সারির সর্বডানে)

পরিশিষ্ট-৪:১

সিডনী বিশ্ববিদ্যালয়ের ফিশার লাইব্রেরির বাহির ও ভেতরের ছবি।

পরিশিষ্ট-৪:২

জাপানি স্কুল শিক্ষক এমি মিয়াহারার সঙ্গে কন্যাসহ লেখক।

পরিশিষ্ট-৪:৩

থিসিস সুপারভাইজার ও অ্যাসোসিয়েট সুপারভাইজার
যথাক্রমে ড. রস কারনাউ ও ড. হাবীব জাফরুল্লাহ।

পরিশিষ্ট-৪:৪

পেস্টগ্রাড স্টুডেন্টস অফিসে লেখকের জন্মদিন পালন করেন সহপাঠী বন্ধুরা।

পরিশিষ্ট-৪:৫

শাড়ি পরিহিত ইন্দোনেশিয়ান সহপাঠী খুশনুল মারিয়াহ।

পরিশিষ্ট-৪:৬

জিলবুব পোশাক পরিহিত ফ্যাশনকারী নারী। সূত্র: ইন্টারনেট।

Dulwich Hill Public School

Kintore Street, Dulwich Hill 2203 Phone: 559 2699 Facsimile 559 5676

TO WHOM IT MAY CONCERN

Re: Deeni Fatiha

Deeni Fatiha commenced her formal education at this school on the 1st February, 1996. In the 5 months Deeni has been at school she has made excellent progress in all areas of learning, and has become a very popular member of the class.

Deeni is intelligent interested and highly motivated to learn. She participates enthusiastically in all learning activities, and sets herself high standards. Deeni shows self control and self discipline in all school environments. She can work quite independently and shows good concentration. She has excellent family support with her learning.

Deeni has progressed very well in all three strands of English (Speaking, Reading and Writing). She participates in class discussions, follows instructions and has quickly learned to express herself in English. She has also learned to write legibly, with correctly formed and well spaced letters. Deeni can spell many commonly used words and is able to write recounts of events with minimal assistance.

In reading, Deeni has progressed very rapidly, having a large sight vocabulary and developing very good word attack skills. Deeni reads with expression and fluency and should become an independent reader within the next few weeks. She shows good comprehension and corrects most mistakes herself.

In Mathematics, Deeni has good number concepts to beyond twenty and can count to at least 100. She knows all of the Kindergarten shapes and colours, shows excellent reasoning skills and thinks logically.

Deeni has been a pleasure to teach. I wish her well in her new school and know that she will be an asset to any class.

Susan Doran,
Principal.
27.6.96.

Penny Papps,
Class Teacher.

১৯৯৬ সালে স্কুলের ক্লাস টিচার ও প্রিন্সিপ্যাল স্বাক্ষরিত চিঠি।

To Whom It May Concern,

Deeni Fatiha has been a student at Dulwich Hill Public School for several years. In that time she has shown herself to be an exemplary student in all academic areas.
She is highly motivated and has a mature and enthusiastic approach to all aspects of learning.
She is an independent thinker and worker, capable of setting and achieving high standards in her own learning goals.
She is resourceful, well organised, reliable and responsible. She is recognised as a leader as well as being an effective team member.
Deeni is highly skilled in all facets of written, oral and technological communication.
She is a critical thinker and has developed a range of strategies to make her a skilled problem solver.
In her dealings with others, she is tolerant, respectful, empathetic and socially responsible in every way.
She has all the qualities of an exemplary student and role model. Her contributions to our school culture is valued by students, teachers and parents.
We believe that Deeni is capable of successfully meeting any challenge.
We can highly recommend her to any educational institution her parents choose for her.

yours faithfully

(Relieving Principal)

Dulwich Hill Public School. Kintore St, Dulwich Hill. NSW 2203 Phone (02) 9559 2699 Facsimile (02) 9559 5676

১৯৯৯ সালে দেশে আসার সময় দ্বীনি ফাতিহাকে প্রিন্সিপাল প্রদত্ত চিঠি।

পরিশিষ্ট-৪:৯

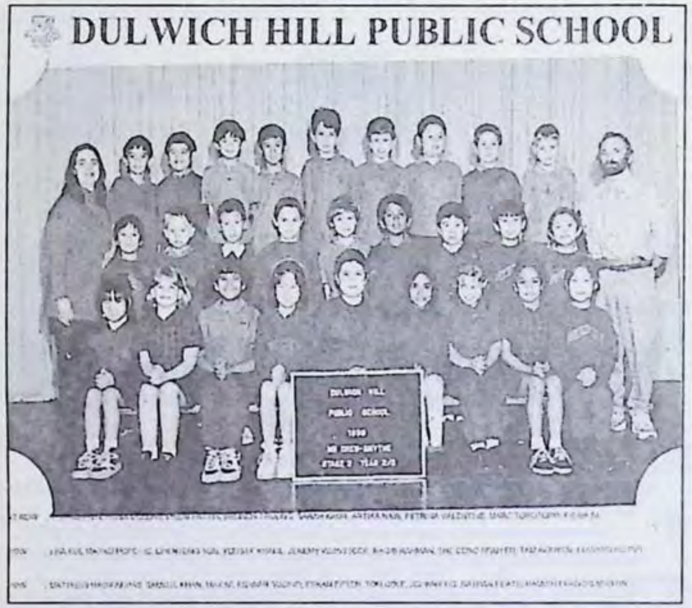

১৯৯৮ ও ১৯৯৯ সালের দ্বীনি ও কারিশমার স্কুল ফটো।
দ্বীনি ফাতিহা (প্রথম লাইনে বা থেকে তৃতীয়)।

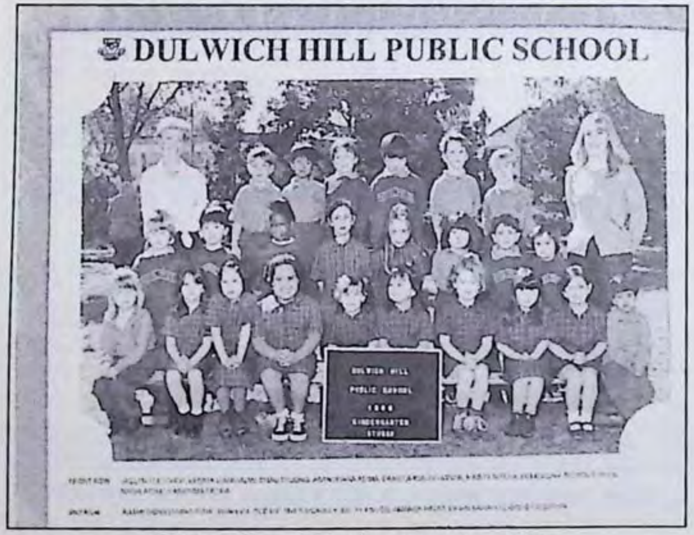

কারিশমা ফাতিহা প্রথম লাইনে ডান থেকে প্রথম।

পরিশিষ্ট-৪:১০

সিডনি বিশ্ববিদ্যালয়ের সেন্ট্রাল রেকর্ডস অফিস স্টাফদের সঙ্গে লেখক।

পরিশিষ্ট-৫:১

আমেরিকান হোয়াইট হাউস পরির্দশনে আইভিপি টিম

পরিশিষ্ট-৫:২

সূত্র: অ্যান ওয়েনিন এলমন্ডস-এর ফেসবুক টাইমলাইন থেকে সংগৃহীত।

পরিশিষ্ট-৫:৩

দ্বীনি ফাতিহার এমআইটির কনভোকেশনের ছবি।

পরিশিষ্ট-৫:৪

দ্বীনি ও সাকিবের আকদ অনুষ্ঠানের ছবি।

পরিশিষ্ট-৫:৫

নিউইয়র্কের জ্যাকসন হাইটস-এ ২০১৭ সালে।

পরিশিষ্ট-৫:৬

নিউইয়র্কের বাঙালি রেস্টুরেন্টের বিচিত্র ইনটেরিয়র ডেকোরেশন।

পরিশিষ্ট-৫:৭

নিউইয়র্কে নদী ভ্রমণ।

পরিশিষ্ট-৫:৮

এমআইটি ও হার্ভার্ড ক্যাম্পাসের দুটি ছবি।

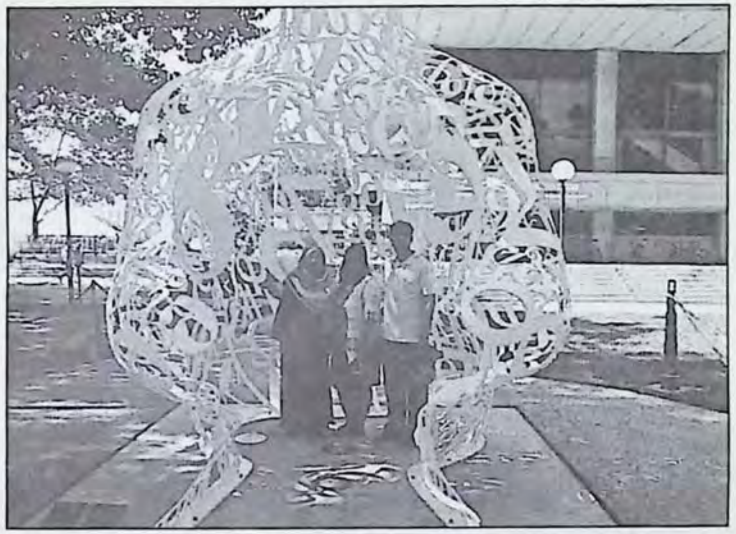

এমআইটি মেইন ক্যাম্পাসে ২০১৭ সালে স্ত্রী ও কন্যাসহ লেখক।

হার্ভার্ড বিজনেস স্কুল ক্যাম্পাসে ২০১৭ সালে লেখক।

পরিশিষ্ট-৫:৯

এমআইটি মিডিয়া ল্যাবে একজন অধ্যাপকের বসার কক্ষের চিত্র।

পরিশিষ্ট-৫:১০

বাচ্চাদের জন্য ছোট মাইক্রোচিপসযুক্ত সেনসর লাগানো জুতা।

পরিশিষ্ট-৫:১১

২০১৭ সালে ডিসওবিডিয়েন্স অ্যাওয়ার্ড বিজয়ী মার্কিন বিজ্ঞানী ড. মোনা হান্না-অতীসা ও প্রফেসর মার্ক এডওয়ার্ডস।

পরিশিষ্ট-৫:১২

বস্টন এসপ্লানেডের ফুলফোটা গাছ ও চার্লস নদী।

পরিশিষ্ট-৫:১৩

অধ্যাপক ড. আহমেদ শফিকুল হক-এর সঙ্গে আড্ডা ও স্মৃতিচারণ।

পরিশিষ্ট-৫:১৪

নায়েগ্রা দেখে আধভেজা হয়ে ফেরার পথে মেরী ভাবি ও সস্ত্রীক লেখক।

পরিশিষ্ট-৫:১৫

আমেরিকার অংশে নায়েগ্রার আশেপাশে ফুলের গাছ।

পরিশিষ্ট-৫:১৬

হার্ভার্ড কমেন্সমেন্ট স্পিকার-২০১৮ জন লুইস ও কমেন্সমেন্টে বক্তৃতার ছবি।

হার্ভার্ড কমেন্সমেন্ট স্পিকার-২০১৮ জন লুইস ও কমেন্সমেন্টে শ্রোতাদের ছবি।

পরিশিষ্ট-৫:১৭

কনভোকেশনের পরদিন অভিভাবকের সঙ্গে হার্ভার্ড গ্রাজুয়েট দ্বীনি ফাতিহা।
ক্যামেরা: ড. হাসনাইন হাফিজ

পরিশিষ্ট-৫:১৮

বস্টনের ক্যাসেল আইল্যান্ড।

পরিশিষ্ট-৫:১৯

বস্টনের ইথিওপিয়ান রেস্টুরেন্টের খাবারের স্বাদগ্রহণ।

পরিশিষ্ট-৫:২০

বস্টনের দু'টি চাইনিজ রেস্টুরেন্টে দু'রকমের খাবার।

পরিশিষ্ট-৫:২১

রাতের বস্টনে রাস্তায় বিদ্যুৎবাতি সুশোভিত গাছ।

পরিশিষ্ট-৬:১

দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশিত প্রশ্নের ভুল সম্পর্কিত দুটি রিপোর্ট।

সমকালের রিপোর্ট

চবিতে পরীক্ষার প্রশ্নে ১৩ বানান ভুল

প্রকাশ: ১৬ এপ্রিল ২০১৯। আপডেট: ১৬ এপ্রিল ২০১৯

চবি প্রতিনিধি

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের পরিবর্তে লিখা হয়েছে ' বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান'। মাওলানা ভাসানী নামের নানানেও রয়েছে ভুল। এমনকি ভুল রয়েছে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের নামেও। 'চট্টগ্রামের' পরিবর্তে লিখা হয়েছে 'চট্রগ্রাম'। এমন একটি-দুটি নয়, ১৩টি ভুল বানানের প্রশ্নে অনুষ্ঠিত হলো চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের (চবি) রাজনীতি বিজ্ঞান বিভাগের ৪০৫ নম্বর কোর্সের পরীক্ষা। সোমবার এ পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। তবে এ বিষয়ে কোন মন্তব্য করতে রাজী হননি বিভাগের সভাপতি ড. আনোয়ারা বেগম।

প্রশ্নপত্রটিতে দেখা যায়, 'তিন নম্বর প্রশ্নে 'বিশ্লেষন' বানান লিখা হয়েছে 'ন' দিয়ে, যার শুদ্ধ বানান হবে 'বিশ্লেষণ'। পাঁচ নম্বর প্রশ্নে 'সংষ্কারক' শব্দে 'ষ' ব্যবহার করা হয়েছে, যার শুদ্ধ বানান হবে 'সংস্কারক'। ছয় নম্বর প্রশ্নে 'Muzaffar Ahmed' এর পরিবর্তে লেখা হয়েছে 'Mozaffar Ahmed'। অন্যদিকে সাত নম্বর প্রশ্নে হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী 'Huseyn' এর পরিবর্তে লেখা হয়েছে 'Hossain'। আট নম্বর প্রশ্নে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের বানানও ভুল লেখা হয়েছে। 'বঙ্গবন্ধু'র পরিবর্তে লেখা হযেছে বঙ্গঁবন্ধু' এবং 'মুজিবুর' এর পরিবর্তে লেখা হয়েছে 'মুজিবর'। ইংরেজিতেও ভুল লেখা হয়েছে 'বঙ্গবন্ধু' শব্দটির বানান। 'Bangabandhu' এর পরিবর্তে লেখা হয়েছে 'Bangbandhu'। অন্যদিকে বাংলায় মাওলানা ভাসানীর নামের বানান ঠিক থাকলেও ইংরেজিতে ভুল লেখা হয়েছে। 'Maulana' শব্দের পরিবর্তে লেখা হয়েছে 'Moulana'। পাশাপাশি ইংরেজিতে 'Bhashani' এর পরিবর্তে লেখা হয়েছে 'Bhasani'। এ কে ফজলুল হকের ইংরেজি নামের বানানেও আছে ভুল। ইংরেজিতে 'Huq' এর পরিবর্তে লেখা হয়েছে 'Huque'। এ রকম মোট ১৩টি বানান ভুল পাওয়া গেছে। এ বিষয়ে জানতে চাইলে রাজনীতি বিজ্ঞান বিভাগের চতুর্থ বর্ষের পরীক্ষা কমিটির চেয়ারম্যান ভূঁইয়া মো. মনোয়ার কবীরও মন্তব্য করতে রাজি হননি।

যুগান্তর-এর রিপোর্ট

চবির রাজনীতি বিজ্ঞান ভিভাগের প্রশ্নপত্র ১০ বানান ভুল

চট্টগ্রাম ১৬ এপ্রিল ২০১৯, ১৫:৪৬। অনলাইন সংস্করণ

চবির রাজনীতি বিজ্ঞান বিভাগের প্রশ্নপত্রে ১০ বানান ভুল। ছবি-সংগৃহীত

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের রাজনীতি বিজ্ঞান বিভাগের চতুর্থ বর্ষ বিএসএস (সম্মান) পরীক্ষায় প্রশ্নপত্রে গুরুত্বপূর্ণ ১০টি বানান ভুল পাওয়া গেছে। সোমবার বিভাগটির চতুর্থ বর্ষের ৪০৫ নম্বর পরীক্ষায় হাতের লেখা তৈরি প্রশ্নপত্রে এসব বানানের ভুল ধরা পড়ে। প্রশ্নপত্রের শুরুতে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় বানানে চট্টগ্রামের বানানে ভুল লেখা হয়েছে। তিন নম্বর প্রশ্নে লেখা হয়েছে– 'ব্যক্তিত্ব ও হতাশার মধ্যকার সম্পর্ক বিশ্লেষণ কর'। শুদ্ধ বানান হবে বিশ্লেষণ। চার নম্বর প্রশ্নে লেখা হয়েছে, 'নবাব স্যার সলিমুল্লাহর ব্যক্তিত্ব গঠনে তার সমসাময়িক আর্থসামাজিক ও ধর্মীয় রাজনৈতিক পরিস্থিতি কি ভূমিকা পালন করেছিলো?' এখানে ব্যবহার করা হয়েছে 'কি', হবে 'কী'। পাঁচ নম্বর প্রশ্নে- 'রাজা রামমোহন রায়ের ব্যক্তিত্বের বৈশিষ্ট্যসমূহ চিহ্নিত কর। এই বৈশিষ্ট্যসমূহ কিভাবে সংষ্কারক হিসেবে তার ভূমিকাকে প্রভাবিত করেছিলো? আলোচনা কর।' এখানে 'সংস্কারক'-এ 'ষ' ব্যবহার করা হয়েছে। শুদ্ধ বানান হবে- 'স' দিয়ে অর্থাৎ 'সংস্কারক'। ছয় নম্বর প্রশ্নে -'উপমহাদেশের 'কমিউনিস্ঠ' আন্দোলনে কমরেড মুজফ্ফর আহমদ-এর ভূমিকা আলোচনা কর।' এখানে 'কমিউনিস্ঠ'- এ 'ঠ' ব্যবহার করা হয়েছে। শুদ্ধ বানান হবে 'স্ট' দিয়ে অর্থাৎ 'কমিউনিস্ট'। এ ছাড়া সাত নম্বর প্রশ্নে– হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর 'হোসেন বানানটি বাংলায় শুদ্ধ থাকলেও ইংরেজিতে লেখা হয়েছে 'Hossain'। হবে 'Huseyn'। এমনকি আট নম্বর প্রশ্নে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের বানানও ভুল লেখা হয়েছে। প্রশ্নে লেখা আছে 'মুজিবর', হবে 'মুজিবুর'। এ ছাড়া ইংরেজিতে 'বঙ্গবন্ধু' শব্দটির বানানও ভুল লেখা হয়েছে। প্রশ্নে লেখা আছে 'Bangbandhu', হবে 'Bangabandhu'। নয় নম্বর প্রশ্নে- 'কর্মকাণ্ড' লেখা আছে, হবে 'কর্মকাণ্ড'। প্রমিত বাংলা বানান অনুসারে ণ+ড হবে। এ ছাড়া টীকা প্রশ্নে বাংলায় মওলানা ভাসানী বানান ঠিক থাকলেও ইংরেজিতে ভুল লেখা হয়েছে। ইংরেজিতে লেখা হয়েছে 'Moulana'। শুদ্ধ বানান হবে 'Mawlana' বা 'Maulana'।

জানতে চাইলে পরীক্ষা কমিটির চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. ভূঁইয়া মো. মনোয়ার কবির এ বিষয়ে কোনো কথা বলতে রাজি হননি। পরে পরীক্ষা কমিটির সদস্য সহকারী অধ্যাপক আককাস আহমদের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি বিভাগের সভাপতির সঙ্গে যোগাযোগ করতে বলেন। বিভাগের সভাপতি ড. মুহাম্মদ ইয়াহ্ইয়া আখতার জানান, তিনি এ বিষয়ে কিছু জানেন না। বানান ভুলের বিষয়টি খবর নেবেন বলে জানান। *যুগান্তর* অনলাইন 219 Shares

বি. দ্রঃ প্রতিবেদক ড. মুহাম্মদ ইয়াহ্ইয়া আখতার-এর সঙ্গে কোনো যোগাযোগ করেননি এবং ভুলবশত তাঁর নাম বিভাগীয় সভাপতি হিসেবে ছেপেছেন। এ সময় বিভাগীয় সভাপতি ছিলেন অধ্যাপক ড. আনোয়ারা বেগম। প্রতিবেদক সম্ভবত ২০১৮ সালের পুরানো ডায়েরি দেখে বিভাগীয় সভাপতির নাম সংগ্রহ করে থাকবেন। কারণ, ড. আখতারের বিভাগীয় সভাপতির মেয়াদ ২০১৮ সালের ১৮ আগস্ট শেষ হয়।

পরিশিষ্ট-৬:২

চতুর্থ বর্ষ বিএসএস সম্মান শ্রেণির ৪০৬ নম্বর কোর্সে ক্লাস উপস্থিতি
ক্লাস শুরুর সময় সকাল ৯:০০ টা। ক্লাসে উপস্থিত ১ জন, মোট শিক্ষার্থী: ১৪৬ জন।

ক্লাস শেষের সময় সকাল ১০:৪০। ক্লাসে উপস্থিত ২৭ জন, মোট শিক্ষার্থী: ১৪৬ জন।

পরিশিষ্ট-৬:৩

বিতর্ক সভা শেষে সংশ্লিষ্ট ১৩ জনের সঙ্গে পর্যবেক্ষক হিসেবে শিক্ষক।

পরিশিষ্ট-৬:৪

রাজনীতি বিজ্ঞান বিভাগ
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়
চট্টগ্রাম, বাংলাদেশ

DEPARTMENT OF POLITICAL SCIENCE
UNIVERSITY OF CHITTAGONG
CHITTAGONG, BANGLADESH

মনোযোগ আকর্ষণ

সম্মানিত পরীক্ষক,

আপনি জেনে আনন্দিত হবেন যে, বিভাগের সকল সম্মানিত শিক্ষকের আন্তরিক সহযোগিতায় চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের রাজনীতি বিজ্ঞান বিভাগ সেশনজটমুক্ত হবার প্রচেষ্টায় উল্লেখযোগ্য উন্নতি করেছে। ২০১৭ সালের প্রথম বর্ষ বিএসএস সম্মান শ্রেণির পরীক্ষা একই বছর নভেম্বর মাসের ১ তারিখে শুরু হওয়া তারই প্রমাণ। আপনি যদি পরীক্ষার খাতাগুলো অত্যন্ত যৌক্তিক সময়ের মধ্যে দেখে দিতে পারেন, তাহলে সে কাজটি রাজনীতি বিজ্ঞান বিভাগকে সেশনজটমুক্ত করার প্রচেষ্টায় অবদানমূলক পদক্ষেপ হিসেবে বিবেচিত হবে। আপনাদের সকলের সহযোগিতায় এ প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখতে পারলে রাজনীতি বিজ্ঞান বিভাগ খুব শীঘ্রই সম্পূর্ণ সেশনজটমুক্ত বিভাগ হতে পারবে। প্রথম বর্ষ বিএসএস সম্মান ২০১৭ পরীক্ষা কমিটি এ বিষয়ে সবিনয়ে আপনার সহযোগিতা কামনা করছে।

ধন্যবাদান্তে,

০১।১১।২০১৭
মুহাম্মদ ইয়াহ্ইয়া আখতার
অধ্যাপক ও সভাপতি, প্রথম বর্ষ বিএসএস সম্মান ২০১৭ পরীক্ষা কমিটি
রাজনীতি বিজ্ঞান বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়।

Phone : [illegible], Extension off:4282, Fax [illegible], Email: [illegible]

পরীক্ষকদের খাতার সঙ্গে পরীক্ষা কমিটির সভাপতি প্রদত্ত চিঠি।

পরিশিষ্ট-৬:৫

এমফিল মৌখিক পরীক্ষা-২০১৭ শেষে পরীক্ষা কমিটির সঙ্গে পরীক্ষার্থীবৃন্দ।

পরিশিষ্ট-৬:৬

বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন
আগারগাঁও, ঢাকা-১২০৭, বাংলাদেশ
ফোন নং ৮৮০-২-৮১১২৬২৯, ৮১২৪১৩৩, বাসা : ৮৮০-২-৮৬১১০৫৪
ফ্যাক্স : ৮৮০-২-৮১২২৯৪৮, ই-মেইল: chairman@ugc.org

প্রফেসর ডঃ এম. আসাদুজ্জামান
চেয়ারম্যান

<u>যাহার জন্য প্রযোজ্য</u>

আমি জেনে আনন্দিত হয়েছি যে, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের রাজনীতি বিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ডঃ মুহাম্মদ ইয়াহইয়া আখতার টিআইবি সিনিয়র রিসার্চ ফেলোশীপের অধীনে বাংলাদেশে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের সুশাসন ও সমস্যাবলী নিয়ে গবেষণা করছেন। এ ব্যাপারে তিনি বিভিন্ন পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় পরিদর্শন করে তথ্য সংগ্রহ করবেন। আমি তার এ গবেষণা কাজের সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

আমার বিশ্বাস পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের কর্তৃপক্ষ ডঃ আখতারকে প্রয়োজনীয় তথ্য-উপাত্ত দিয়ে উল্লিখিত গবেষণা কাজে সহায়তা করবেন।

ধন্যবাদান্তে,

মোহাম্মদ আসাদুজ্জামান ২১-১-০৬
প্রফেসর ডঃ মুহাম্মদ আসাদুজ্জামান
চেয়ারম্যান
বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন

পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে ইউজিসি চেয়ারম্যানের চিঠি।

পরিশিষ্ট-৬:৭

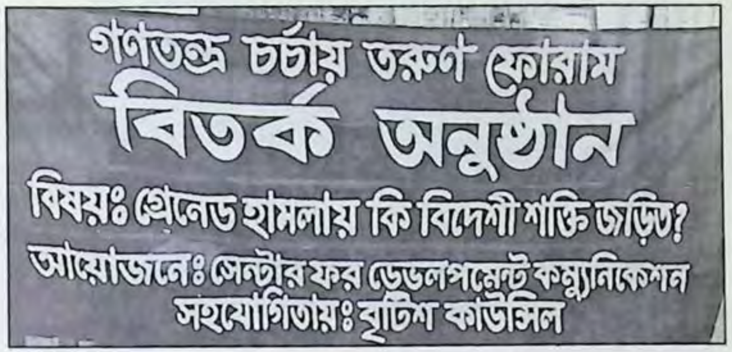

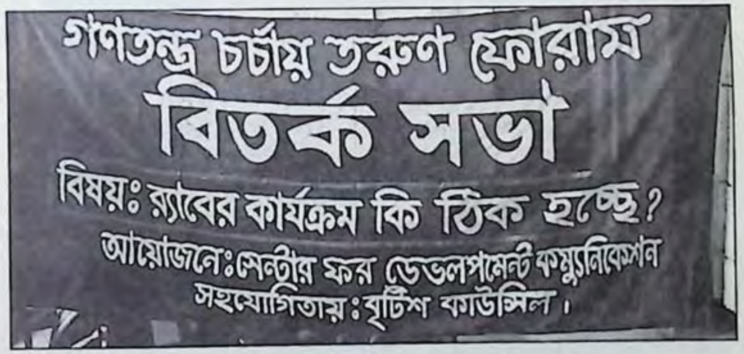

ইয়ুথ ফোরাম ফর ডেমোক্রেসির কয়েকটি অনুষ্ঠানের ব্যানার।

পরিশিষ্ট-৭:১

নিজ অফিসে কর্মরত সিনিয়র ডেপুটি রেজিস্ট্রার নুরুল হক চৌধুরী

পরিশিষ্ট-৭:২

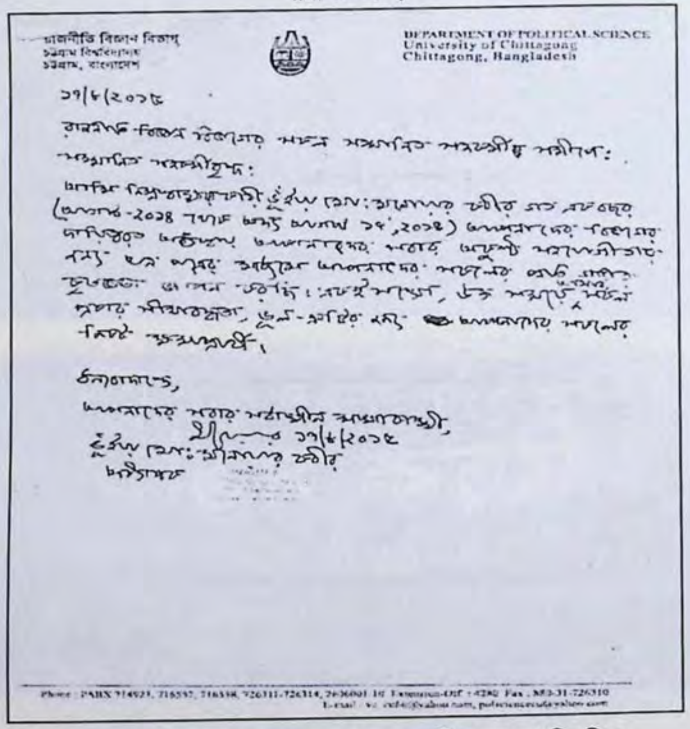

রাজনীতি বিজ্ঞান বিভাগ
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়
চট্টগ্রাম, বাংলাদেশ

DEPARTMENT OF POLITICAL SCIENCE
University of Chittagong
Chittagong, Bangladesh

১৭/৮/২০১৫

রাজনীতি বিজ্ঞান বিভাগের সকল সম্মানিত সহকর্মীবৃন্দ সমীপেষু:

সম্মানিত সহকর্মীবৃন্দ:

[illegible]

ধন্যবাদান্তে,

আপনাদের সবার সর্বাঙ্গীন মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী,

১৭/৮/২০১৫

ভূঁইয়া মো: মনোয়ার কবীর

সভাপতি

সভাপতির পদ থেকে পদত্যাগের পর সহকর্মীদের মাঝে বিতরিত
ড. ভুঁইয়া মো. মনোয়ার কবীরের ব্যক্তিগত চিঠি।

পরিশিষ্ট-৭:৩

১২ অক্টোবর, ২০১৫ তারিখে অনুষ্ঠিত একাডেমিক কমিটির
২৮৭তম সাধারণ সভার কার্যবিবরণীর ১ (খ) নম্বর সিদ্ধান্ত।

তারিখ: ১২-১০-২০১৫

গত ০৮-১০-২০১৫ তারিখে বিভাগীয় একাডেমিক কমিটির ২৮৭তম সাধারণ সভা বিভাগীয় সভাপতির কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় সভাপতিত্ব করেন বিভাগীয় সভাপতি প্রফেসর ড. মুহাম্মদ ইয়াহ্ইয়া আখতার। সভায় সর্বসম্মতিক্রমে নিম্নলিখিত সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয়।

০১। (খ) ২১ সেপ্টেম্বর ২০১৫ তারিখে *কালের কণ্ঠ* পত্রিকায় প্রকাশিত 'বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণার নামে আবর্জনা কেন' শীর্ষক উপসম্পাদকীয় কলামে প্রকাশিত গবেষক ও বিশ্লেষক পরিচয়ে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের মাননীয় চেয়ারম্যান অধ্যাপক আবদুল মান্নানের লেখাটি রাজনীতি বিজ্ঞান বিভাগের একাডেমিক কমিটির দৃষ্টিগোচর হয়। এ লেখার যে অংশটি ১১ আগস্ট, ২০১৫ তারিখে অনুষ্ঠিত একাডেমিক কমিটির ২৮৫তম সভার কতিপয় সিদ্ধান্তের সঙ্গে সম্পর্কিত, সে বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনার পর কমিটিতে সর্বসম্মতিক্রমে নিম্নোক্ত সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয়।

(১) ১১-০৮-২০১৫ তারিখে অনুষ্ঠিত একাডেমিক কমিটির সভায় একজন গবেষক অধ্যাপক 'বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশ' শীর্ষক সেমিনার দিতে চান বলে উল্লিখিত লেখায় যে তথ্য প্রদান করা হয়েছে তা সঠিক নয়। ওই কমিটির কার্যবিবরণীতেও এমন উল্লেখ নেই।

(২) যেহেতু উল্লিখিত সভায় সেমিনার সংক্রান্ত কোন প্রস্তাব উত্থাপিত হয়নি, কাজেই লেখাটিতে উল্লেখিত বিনা বাধায় ওই প্রস্তাব পাস হওয়ার বিষয়টি নিতান্তই অবান্তর।

(৩) বিভাগীয় কোন সহকর্মী ওই দিন বা পরবর্তীতে 'গোলাম আযম ও ইসলাম' বা 'জিয়া ও গণতন্ত্র' বিষয়ে সেমিনার দিতে তৎকালীন বিভাগীয় সভাপতিকে কোন প্রস্তাব বা লেখকের ভাষায় 'ফন্দিসর্বস্ব চাপ' দেননি।

(৪) বিভাগীয় সহকর্মীদের কেউই সেমিনার অনুষ্ঠানের ব্যাপারে আপত্তি করেননি। ১৮-০৮-২০১৫ তারিখে দায়িত্ব গ্রহণকারী নতুন সভাপতি ২৫-০৮-২০১৫ তারিখে অনুষ্ঠিত ২৮৬তম একাডেমিক কমিটির সভায় বিষয়টি উপস্থাপন করেন। ওই একাডেমিক কমিটিতে আলোচনার পর প্রস্তাবিত সেমিনার অনুষ্ঠানের লক্ষ্যে সর্বসম্মতিক্রমে একটি কমিটি গঠিত হয় (২৮৬তম একাডেমিক কমিটির বিবিধ-এর ১ নম্বর সিদ্ধান্ত)। পরবর্তীতে ৩১ আগস্ট, ২০১৫ তারিখে বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মানিত উপাচার্যকে প্রধান অতিথি করে প্রস্তাবিত সেমিনারটি অনুষ্ঠিত হয়।

(৫) আলোচ্য লেখাটি সম্পর্কিত আলোচনার পর প্রকৃত তথ্য জানাবার জন্য এতদ্‌সম্পর্কিত বিভাগীয় একাডেমিক কমিটির কার্যবিবরণীসমূহের একপ্রস্থ অনুলিপি লেখক ও মাননীয় ইউজিসি চেয়ারম্যানকে প্রেরণের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

(৬) রাজনীতি বিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষকদের মধ্যে বিভিন্ন মত থাকলেও তাঁদের মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয় ও বিভাগের স্বার্থ, ঐতিহ্য ও সুনাম রক্ষার ব্যাপারে সম্মিলিতভাবে কাজ করার মনোভাব সব সময় ছিলো এবং এখনও সক্রিয় রয়েছে।

সূত্র: একাডেমিক কমিটির ২৮৭তম সাধারণ সভার কার্যবিবরণী থেকে সংগৃহীত।

পরিশিষ্ট-৭:৪

ইডব্লিউজি এবং চবি রাজনীতিবিজ্ঞান বিভাগ আয়োজিত ইলেকশন, ইন্সিটিটিউশন বিল্ডিং অ্যান্ড ডেমোক্রেসি শীর্ষক সেমিনারের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান।

পরিশিষ্ট-৭:৫

আর আই চৌধুরী স্মারক বক্তা প্রফেসর ড. রওনক জাহানকে বিমান বন্দরে স্বাগত জানান প্রফেসর ড. আ ন ম মুনীর আহমদ।

পরিশিষ্ট-৭:৬

আর আই চৌধুরী স্মারক বক্তৃতা-২০১৬ অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর প্রফেসর ড. ইফতেখার উদ্দিন চৌধুরী।

পরিশিষ্ট-৭:৭

এসএসি কমিটির কার্যক্রম পরিদর্শনে আগত পিয়ার রিভিউ কমিটি সদস্যদের বিভাগীয় শিক্ষার্থীদের সঙ্গে মত বিনিময়।

পরিশিষ্ট-৭:৮

এসএ কার্যক্রম সম্পর্কে ২৫ জন শিক্ষার্থীদের নিয়ে বিভাগীয় ওয়ার্কশপ শেষে এসএ কমিটির সঙ্গে শিক্ষার্থীদের ফটোসেশন।

পরিশিষ্ট-৭:৯

চীনের নর্থ ওয়েস্ট এ অ্যান্ড এফ ইউনিভার্সিটি থেকে ২০১৯ সালে সালেহ শাহরিয়ারের পিএইচডি ডিগ্রি অর্জন।

পরিশিষ্ট-৭:১০

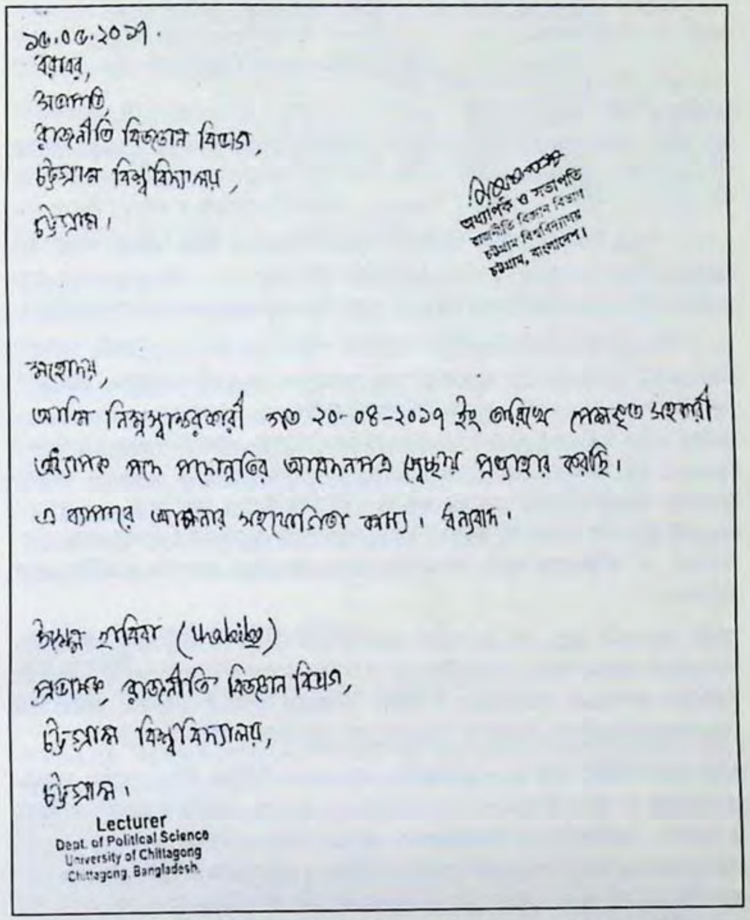

১৬.০৬.২০১৭.
বরাবর,
সভাপতি,
রাজনীতি বিজ্ঞান বিভাগ,
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়,
চট্টগ্রাম।

অধ্যাপক ও সভাপতি
রাজনীতি বিজ্ঞান বিভাগ
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়
চট্টগ্রাম, বাংলাদেশ।

মহোদয়,
আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী গত ২০-০৪-২০১৭ ইং তারিখে পেশকৃত সহকারী অধ্যাপক পদে পদোন্নতির আবেদনপত্র স্বেচ্ছায় প্রত্যাহার করছি।
এ ব্যাপারে আপনার সহযোগিতা কাম্য। ধন্যবাদ।

উম্মে হাবিবা (Uhabiba)
প্রভাষক, রাজনীতি বিজ্ঞান বিভাগ,
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়,
চট্টগ্রাম।
Lecturer
Dept. of Political Science
University of Chittagong
Chittagong, Bangladesh.

সহকারী অধ্যাপক পদে পদোন্নতির জন্য ২০ এপ্রিল ২০১৭ তারিখে জমা দেয়া জনাব উম্মে হাবিবার অবেদনপত্র স্বেচ্ছায় প্রত্যাহারের জন্য প্রদত্ত চিঠি।

পরিশিষ্ট-৭:১১

‘পদোন্নতি পেতে চবি শিক্ষিকার জালিয়াতি’ এবং ‘প্রকাশিত সংবাদে চবি শিক্ষিকার প্রতিবাদ’ শীর্ষক দুটি প্রতিবেদন।

পদোন্নতি পেতে চবি শিক্ষিকার জালিয়াতি

আবদল্লাহ্ রাকীব, চবি প্রতিনিধি

প্রকাশিত: ০৮:৪৫ পিএম, ১৮ মে ২০১৭, বৃহস্পতিবার । আপডেট: ০৯:৫৩ পিএম, ১৮ মে ২০১৭, বৃহস্পতিবার

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের (চবি) রাজনীতি বিজ্ঞান বিভাগের উম্মে হাবিবা নামে এক শিক্ষিকার বিরুদ্ধে স্বামীর এমফিল গবেষণার অভিসন্দর্ভ এর অধিকাংশ নকল করে প্রভাষক পদ থেকে সহকারী অধ্যাপক পদে পদোন্নতির আবেদন করার অভিযোগ উঠেছে।

যা চলতি বছরের এপ্রিলে বাংলাদেশ ইতিহাস পরিষদ থেকে ‘বাংলাদেশের সংসদীয় নির্বাচনের ইতিহাস ও নারীর অংশগ্রহণ’ নামে প্রবন্ধ আকারে প্রকাশিত হয়েছে। অথচ ওই প্রবন্ধটির সঙ্গে তাঁর স্বামী নজরুল ইসলামের অভিসন্দর্ভ ‘গণমাধ্যম ও বাংলাদেশের জাতীয় সংসদ নির্বাচন (১৯৯১-২০০৮)’ হুবহু মিল রয়েছে। পাশাপাশি রাজনীতি বিজ্ঞান বিভাগের এই শিক্ষিকার জমা দেয়া ভারতের শিলংয়ের (*Man & Society*) জার্নালে প্রকাশিত আরেকটি ইংরেজি প্রবন্ধের মান ও সেটি তাঁর নিজের লেখা কিনা এ ব্যাপারেও প্রশ্ন উঠেছে। এদিকে এমফিল গবেষক স্বামীর অভিসন্দর্ভ থেকে ওই শিক্ষিকা প্রবন্ধ নকল করলেও, সে অভিসন্দর্ভে নানা ধরনের ভুল রয়েছে বলে জানা যায়। ফলে এটির মানও প্রশ্নবিদ্ধ।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, গত ২০ এপ্রিল প্রভাষক উম্মে হাবিবা সহকারী অধ্যাপক হিসেবে পদোন্নতির আবেদন করেন। পরবর্তীতে ৩ মে বিভাগের সভাপতি অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ ইয়াহইয়া আখতারের সভাপতিত্বে বিভাগীয় পরিকল্পনা কমিটির ২৭৮তম সভায় তাঁর আবেদনপত্রে উল্লেখিত প্রকাশনা ও জার্নালসমূহের মান বিষয়ে অভিযোগ ওঠে।

অভিযোগের ভিত্তিতে গত ১৫ মে বিভাগীয় পরিকল্পনা কমিটিতে তাঁর আবেদন যাচাই-বাছাই করে ইসলামী ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের এমফিল গবেষক নজরুল ইসলামের উপস্থাপিত ‘গণমাধ্যম ও বাংলাদেশের জাতীয় সংসদ নির্বাচন (১৯৯১-২০০৮)’ অভিসন্দর্ভের ভূমিকা, দশম জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও উপসংহার ব্যতীত পুরো অংশের হুবহু মিল থাকার প্রমাণ মেলে। এছাড়া সভায় ইংরেজি প্রবন্ধটি যথার্থ ও মানসম্মত নয় বলে কমিটির অধিকাংশ সদস্য মত দেন ও বিস্ময় প্রকাশ করেন। তবে সভায় বিভাগের শিক্ষক প্রফেসর ড. ভূঁইয়া মো. মনোয়ার কবীর ওই শিক্ষিকার পক্ষে অবস্থান নেন। সভা চলাকালীন অন্যান্য সদস্যদের হয়ে এই যাত্রায় ওই শিক্ষিকাকে ক্ষমা করে দেয়ার অনুরোধ করেন। তবে এ বিষয়ে জানতে তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি *জাগো নিউজকে* বলেন, যারা এ ধরনের অভিযোগ করেছে তাদের কাছে জিজ্ঞাসা করেন। আমি কিছু বলতে চাই না। দুটো সভার একটিতে ছিলাম আমি। সিদ্ধান্ত প্ল্যানিং কমিটির। সভার সভাপতি ভালো বলতে পারবেন কে কার পক্ষে কি অবস্থান নিয়েছিলো। এখানে পাল্টাপাল্টির কিছু নেই উল্লেখ করে তিনি আরও বলেন, সভায় সর্বসম্মতিক্রমেই সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। সে সিদ্ধান্তের পক্ষেই আমার অবস্থান।

এ সময় বিভাগের শিক্ষকদের উদ্দেশ্যে এই শিক্ষিকা বলেন, আয়নায় আমিসহ সবার নিজের চেহারা দেখা উচিত। কে কী মানের গবেষণা করে তা যাচাই করারও অনুরোধ করেন তিনি। খোঁজ নিয়ে জানা যায়, সমাজ বিজ্ঞান অনুষদে ২-৩ বছর আগে নৃ-বিজ্ঞান বিভাগের এক শিক্ষক পদোন্নতি পাওয়ার জন্য ভারতের শিলংয়ের *Man & Society* জার্নালে প্রকাশিত প্রবন্ধ উপস্থাপন করে। পরবর্তীতে বিভাগের পরিকল্পনা কমিটি তা বাতিল ঘোষণা করে।

বিশ্ববিদ্যালয় সূত্রে জানা গেছে, সাবেক উপাচার্য প্রফেসর ড. আনোয়ারুল আজিম আরিফের আমলে ২০১৫ সালে উম্মে হাবিবা রাজনীতি বিজ্ঞান বিভাগে প্রভাষক পদে নিয়োগ পান। তবে এই শিক্ষিকার নিয়োগে এক ছাত্রনেতার প্রত্যক্ষ প্রভাব খাটানোর অভিযোগ রয়েছে। সাবেক চবি ছাত্রলীগ নেতা ও বর্তমানে ফিজিক্যাল এডুকেশন বিভাগে খণ্ডকালীন শিক্ষক নজরুলকে বিয়ের মৌখিক শর্তে দলীয় প্রভাব খাটিয়ে উম্মে হাবিবা প্রভাষক পদে নিয়োগ পান।

এদিকে, অভিযোগের বিষয়ে উম্মে হাবিবা বলেন, নারী হিসেবে বিভাগে সব সময় বৈষম্যমূলক আচরণ এবং কুমিল্লা অঞ্চলের বাসিন্দা হওয়ায় আঞ্চলিক প্রতিহিংসার শিকার আমি। সিনিয়র শিক্ষকদের আগে মাত্র দুই বছরে আমার প্রকাশনা বের হওয়ায় তারা এটি মেনে নিতে পারেননি।

তিনি আরও বলেন, বিভাগের একটি পক্ষের রাজনৈতিক ষড়যন্ত্রের শিকার আমি। তবে বিভাগের সম্মানের স্বার্থে আবেদনপত্রটি প্রত্যাহার করে নেবো। বিভাগীয় পরিকল্পনা কমিটির সভাপতি ও বিভাগীয় চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইয়াহইয়া আখতার বলেন, পরিকল্পনা কমিটির সভার আলোচনাগুলো আমরা বাইরে প্রকাশ করি না। সভায় যে সিদ্ধান্তগুলো হয়েছে এ বিষয়ে সিনিয়র শিক্ষকদেরও পরামর্শ নেয়া হচ্ছে। এক প্রশ্নের জবাবে তিনি জানান, গত দুই দিন আমি ছুটিতে থাকায় ওই শিক্ষিকা বিভাগীয় সিদ্ধান্তের বিষয়ে কি উত্তর দিয়েছেন তা জানতে পারিনি।

প্রকাশিত সংবাদে চবি শিক্ষিকার প্রতিবাদ

চবি প্রতিনিধি

প্রকাশিত: ০৬:৪৫ পিএম, ২০ মে ২০১৭, শনিবার

গত ১৮ মে ‘পদোন্নতি পেতে চবি শিক্ষিকার জালিয়াতি’ শিরোনামে জাগোনিউজ২৪.কম-এ একটি প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়। ওই প্রতিবেদনের কিছু অংশ নিয়ে শিক্ষিকা উম্মে হাবিবা আপত্তি জানিয়েছেন। তিনি প্রতিবেদনে প্রকাশিত তাঁর নিয়োগ, পদোন্নতি ও ব্যক্তিগত কিছু ইস্যু নিয়ে সংবাদ প্রচার করায় ক্ষুব্ধ হওয়ার পাশাপাশি প্রতিবাদ জানিয়েছেন।

শিক্ষিকা উম্মে হাবিবা বলেছেন, প্রকাশিত সংবাদের শিরোনাম ও আমার ছবি প্রকাশের বিরুদ্ধে আমি তীব্র আপত্তি জানাচ্ছি। কারণ, পদোন্নতি নিয়ে রাজনীতি বিজ্ঞান বিভাগে লিখিত কোনো অভিযোগ উত্থাপিত হয়নি। উল্লেখ্য যে, আমার স্বামীর এমফিল থিসিসটি গণমাধ্যম ও বালাদেশের জাতীয় সংসদ নির্বাচন (১৯৯১-২০০৮) বাংলাদেশ ইতিহাস পরিষদের সেমিনারে আমার প্রবন্ধ উপস্থাপন ও জমার (১ মে, ২০১৬) পূর্বে প্রকাশ কিংবা একাডমিক কাউন্সিল/সিন্ডিকেটে পাস হয়নি। তিনি উল্লেখ করেন, তাঁর এমফিল থিসিসটি বিগত ২৮ ফেব্রুয়ারি, ২০১৬ তারিখ চবি পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক কার্যালয়ে জমা দেয়ার প্রায় সাত মাস পর সিন্ডিকেট কর্তৃক চূড়ান্ত অনুমোদন লাভ করে। এ অবস্থায় উক্ত থিসিসকে তথ্য নির্দেশ করা সম্পূর্ণ গবেষণানীতিবিরোধী ও অযৌক্তিক।

শিক্ষিকা উম্মে হাবিবার দাবি, আমাদের দুই গবেষণার কিছু অংশ নির্বাচন কমিশন ও নির্বাচন সম্পর্কিত প্রকাশিত বিভিন্ন রিপোর্ট থেকে সংগ্রহ ও সংযোজন করা। যা আমার প্রবন্ধের তথ্য

নির্দেশনায় উল্লেখ রয়েছে। এমতাবস্থায় আমার গবেষণা প্রবন্ধটির (বাংলাদেশের সংসদীয় নির্বাচনের ইতিহাস ও নারীর অংশগ্রহণ) সঙ্গে আমার স্বামীর এমফিল গবেষণাসহ বাংলাদেশের বিভিন্ন নির্বাচনমূলক গবেষণার কিছু তথ্য-উপাত্ত ও ডাটা মিল থাকা স্বাভাবিক। তিনি দাবি করে আরও বলেন, আমার এ প্রবন্ধের বিরুদ্ধে রাজনীতি বিজ্ঞান বিভাগের ভিন্নমতাবলম্বী রাজনৈতিক দলের কয়েকজন শিক্ষক প্রতিহিংসা ও উদ্দেশ্যমূলকভাবে এ অপপ্রচারে অংশ নেন বলে আমি মনে করি। প্রকাশিত সংবাদটি আমার কয়েকজন বিভাগীয় সহকর্মীর নোংরা প্ররোচনায় প্রতিবেদক প্রকাশ করেন বলেও দাবি করেন শিক্ষিকা উম্মে হাবিবা।

উৎস: ১৮ ও ২০ মে, জাগো নিউজ ২৪. কম, ২০১৭।

পরিশিষ্ট-৭:১২

রাজনীতি বিজ্ঞান বিভাগ
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়
চট্টগ্রাম, বাংলাদেশ

DEPARTMENT OF POLITICAL SCIENCE
UNIVERSITY OF CHITTAGONG
CHITTAGONG, BANGLADESH

তদন্ত কমিটির রিপোর্ট

জনাব উম্মে হাবিবা, প্রভাষক রাজনীতি বিজ্ঞান বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, কর্তৃক 'বাংলাদেশ ইতিহাস পরিষদ' এর 'ইতিহাস' শীর্ষক জার্নালে প্রকাশিত "বাংলাদেশের সংসদীয় নির্বাচনের ইতিহাস ও নারীর অংশ গ্রহণ" প্রবন্ধের নামকরণ বা বিষয়বস্তু সম্পর্কে কমিটির কোন আপত্তি নেই। প্রবন্ধ নিরীক্ষণে দেখা যায়, এম.ফিল. থিসিস "গণমাধ্যম ও বাংলাদেশের জাতীয় সংসদ নির্বাচন (১৯৯১-২০০৮)" এর সাথে উল্লেখিত প্রবন্ধের কোন কোন ক্ষেত্রে মিল রয়েছে। তবে, উম্মে হাবিবা গবেষক হিসেবে নতুন হওয়ায় উল্লেখিত সমস্যা হয়েছে বলে কমিটি মনে করে। জনাব উম্মে হাবিবা তার প্রবন্ধে পরিলক্ষিত সমস্যা বা সীমাবদ্ধতা সংশোধনপূর্বক প্রবন্ধটি পুনঃ প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করতে পারে।

অধ্যাপক ড. মুহিউদ্দিন শামসুদ্দিন
আহ্বায়ক
গঠিত তদন্ত কমিটি

অধ্যাপক ড. হাসান মোহাম্মদ
সদস্য
গঠিত তদন্ত কমিটি

অধ্যাপক ড. রশিদা খানম
সদস্য
গঠিত তদন্ত কমিটি

প্রভাষক উম্মে হাবিবার পদোন্নতির আবেদনপত্রে সংযুক্ত প্রকাশনার বিরুদ্ধে আনীত নকলের অভিযোগ খতিয়ে দেখে পরিকল্পনা কমিটি গঠিত তদন্ত কমিটি প্রদত্ত রিপোর্ট।

পরিশিষ্ট-৭:১৩

DEPARTMENT OF POLITICAL SCIENCE
UNIVERSITY OF CHITTAGONG
CHITTAGONG, BANGLADESH

তারিখ : ১৬-১১-২০১৭

সভাপতি
রাজনীতি বিজ্ঞান বিভাগ
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়।

প্রিয় মহোদয়,

জনাব উম্মে হাবিবা, প্রভাষক এর সহকারী অধ্যাপক পদে পদোন্নতির আবেদনপত্রে উল্লেখিত বাংলাদেশ ইতিহাস পরিষদ কর্তৃক প্রকাশিত ইতিহাস শীর্ষক জার্নালে প্রকাশিত বাংলা প্রবন্ধ (বাংলাদেশের সংসদীয় নির্বাচনের ইতিহাস ও নারীর অংশ গ্রহণ)টির বিরুদ্ধে জনাব মোঃ সেলিমুল হক, প্রভাষক কর্তৃক আনীত নকলের অভিযোগ খতিয়ে দেখার জন্য গঠিত তদন্ত কমিটি কর্তৃক পেশকৃত রিপোর্টটি পুনরায় পর্যালোচনা করে এ বিষয়ে সুপারিশ প্রদানের জন্য গত ১৪-০৯-২০১৭ তারিখে অনুষ্ঠিত বিভাগীয় পরিকল্পনা কমিটির সাধারণ সভায় (২৮৫তম) গৃহীত বিবিধ ০১ নং সিদ্ধান্তে গঠিত কমিটি (প্রফেসর ড. সিদ্দিক আহমেদ চৌধুরী, আহ্বায়ক, প্রফেসর ড. আনোয়ারা বেগম, সদস্য ও প্রফেসর ড. মুস্তাফিজুর রহমান ছিদ্দিকী, সদস্য) কোন প্রকার সমঝোতায় পৌঁছাতে পারেনি বলে আমরা আন্তরিকভাবে দুঃখ প্রকাশ করছি।

বিষয়টি আপনার অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য জানানো হলো।

ধন্যবাদসহ,

আপনার অকৃত্রিম,

(প্রফেসর ড. সিদ্দিক আহমেদ চৌধুরী)

(প্রফেসর ড. আনোয়ারা বেগম)

(প্রফেসর ড. মুস্তাফিজুর রহমান ছিদ্দিকী)

Phone : PABX 726311-14, 2606001-10, 2606015-27, Extension off :4280, Fax:88-031-2606014, Email : vc_cu66@yahoo.com, polsciencecu@yahoo.com

সিনিয়র তিনজন অধ্যাপক সমন্বয়ে গঠিত তদন্ত কমিটির রিপোর্ট পর্যালোচনা করে তুলনামূলকভাবে জুনিয়র তিনজন অধ্যাপক সমন্বয়ে গঠিত কমিটির সুপারিশ।

পরিশিষ্ট-৭:১৪

২০১৮ সালের ৩ জানুয়ারি তারিখে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর অধ্যাপক ড. শিরীন আখতারকে বিভাগীয় ব্রোসার উপহার।
এই ছবিটি 'চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়: রাজনীতিবিজ্ঞান বিভাগের ব্রোশার' শিরোনামের সংবাদের সঙ্গে *প্রথম আলো* পত্রিকার ২২ জানুয়ারি সংখ্যায় প্রকাশিত হয়।

পরিশিষ্ট-৭:১৫

পুলিশ দুর্নীতি ও বিসিএস পরীক্ষায় ভালো করার কৌশলের ওপর পুলিশের এসপি জনাব মুহাম্মদ আইউব এবং কর প্রশাসন ও কর দুর্নীতির ওপর চট্টগ্রামের যুগ্ম কর কমিশনার জনাব ইকবাল হোসেনের বিভাগ পরিদর্শন ও বক্তব্য প্রদান।

পরিশিষ্ট-৭:১৬

নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ের ২২তম কনভোকেশনে
ছোটো মেয়ে কারিশমা ফাতিহার সঙ্গে সস্ত্রীক লেখক।

পরিশিষ্ট-৮:১

এম এস এস ২০১৭ এর পরীক্ষার্থী প্রিয়াংকা মজুমদার।

পরিশিষ্ট-৮:২

লন্ডনে বসবাসকারী রাজনীতিবিজ্ঞান পরিবারের সদস্যগণ কর্তৃক মন্টেরফোর সেন্টারে অধ্যাপক মুনিরকে সম্মাননা প্রদান।

পরিশিষ্ট-৮:৩

চট্টগ্রামের আনোয়ারায় অধ্যাপক মুনিরের দাফনের পর বিভাগের পক্ষ থেকে শেষ সম্মাননা প্রদান।

পরিশিষ্ট-৮:৪

অধ্যাপক মুনিরের মৃত্যুর পর বিভাগের পক্ষ থেকে ২৬ আগস্ট ২০১৬ তারিখে আয়োজিত শোকসভা।

পরিশিষ্ট-৮:৫

পলিটিক্যাল সায়েন্স প্রিমিয়ার লিগ-২০১৮ এর পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান।

পরিশিষ্ট-৮:৬

রাজনীতিবিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষার্থীদের পিকনিকের দুটি ছবি

২০১৩-২০১৪ সেশনের তৃতীয় বর্ষের শিক্ষার্থীরা ২০১৭ সালে রাঙ্গামাটি পিকনিকে রওনা হবার আগে।

২০১৫-২০১৬ সেশনের ২য় বর্ষের বান্দরবান পিকনিকে স্বর্ণমন্দিরে বৌদ্ধ ছাত্রী পাপিয়া চাকমার সঙ্গে বিভাগীয় সভাপতি।

পরিশিষ্ট-৮:৭

ভালোবাসার চাদর ভালোবাসার চাদর ভালোবাসার চাদর ভালোবাসার চাদর ভালোবাসার চাদর ভালোবাসার

ভালোবাসার চাদর

মুহাম্মদ ইয়াহ্ইয়া আখতার

শীতকালে শীত না করার একটা কারণ আছে
কনকনে শীত পরাজিত ভালোবাসার কাছে।
আমার ছাত্রীদের শ্রদ্ধা আর ছাত্রদের আদরে
উষ্ণ হয়ে থাকি শীতে ভালোবাসার চাদরে।
বিদায় নিয়ে শিক্ষার্থীরা যেথায় থাকুক নাকো
হে পরোয়ার ওদের তুমি দুধে-ভাতে রাখো।

ব্যাখ্যা : এম এস এস ২০১৪-২০১৫ শিক্ষাবর্ষের শিক্ষার্থীরা সেন্ট মার্টিন থেকে শিক্ষা সফর শেষ করে এসে সভাপতিকে একটি চাদর উপহার দিয়ে বিভাগীয় সকল শিক্ষককে সম্মানিত করায় তাদেরকে আন্তরিক ধন্যবাদ।

ভালোবাসার চাদর ভালোবাসার চাদর ভালোবাসার চাদর ভালোবাসার চাদর ভালোবাসার চাদর

২০১৪-১৫ শিক্ষাবর্ষের বিদায়ী শিক্ষার্থীদের সভাপতির ব্যক্তিগত উপহার

পরিশিষ্ট-৮:৮

শিক্ষকের অসুস্থতা নিরাময়ের জন্য প্রথম বর্ষ-২০১৯ এর এক ছাত্রের খুলনা থেকে এনে দেওয়া অর্জুন গাছের ছাল।

পরিশিষ্ট-৮:৯

বিভাগীয় সহকর্মীদের বিয়ের কতিপয় ছবি। প্রভাষক শারমিলা কবীর সীমার বিয়ে।

সহকারী অধ্যাপক জনাব মোহাম্মদ ইসহাক-এর বিয়ে।

সহযোগী অধ্যাপক জনাব মোহাম্মদ আলম চোধুরীর বিয়ে।

পরিশিষ্ট-৮:১০

বিভাগীয় শিক্ষার্থীদের বিয়ের কতিপয় ছবি

৫-১-২০১৮ তারিখে মাস্টার্স ২০০৭-'০৮ ব্যাচের তানিমুল হক-এর বিয়ে।

২০১৮ সালে অনুষ্ঠিত ছাত্রী লাভলী পাল এর বিয়েতে সভাপতির ফুলেল শুভেচ্ছা।

২০১৯-এ অনুষ্ঠিত ২০১৬-'১৭ মাস্টার্স ছাত্রী জান্নাতুন নাইমের বিয়েতে বিভাগীয় সভাপতি।

পরিশিষ্ট-৮:১১

১৯১৭-১৯১৮ সেশনে সমাজ বিজ্ঞান অনুষদের ঐক্যবদ্ধ ওরিয়েন্টেশন ও সাংস্কৃতিক উৎসবে বক্তব্যরত রাজনীতিবিজ্ঞান বিভাগের সভাপতি।

পরিশিষ্ট-৮:১২

রাজনীতিবিজ্ঞান ৪৭তম ব্যাচ এমএসএস ২০১৫-২০১৬ একাডেমিক সেশনের র‍্যাগ ডে ১৯-২-২০১৮ তারিখে বিভাগীয় সভাপতি কেক কেটে উদ্বোধন করেন।

পরিশিষ্ট-৮:১৩

রাজনীতিবিজ্ঞান বিভাগ ৪৯তম ব্যাচ এমএসএস ২০১৭-'১৮ একাডেমিক সেশনের র‍্যাগ ডে-র বিদায়ী আবেগ

পরিশিষ্ট-৮:১৪

রাজনীতিবিজ্ঞান বিভাগের কতিপয় বিদায় সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের ছবি।

পরিশিষ্ট-৮:১৫

১২-০২-২০১৭ তারিখে এমএসএস ২০১৫ শিক্ষার্থীদের বিদায় সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে ছাত্রী জান্নাতুল ইসলাম মাওয়া শিক্ষা পরিবেশিত একক নৃত্য।

পরিশিষ্ট-৮:১৬

বিদায়ী অধ্যাপকদের বিদায় অনুষ্ঠানে সম্মাননা ও উপহার প্রদানের ছবি
প্রত্যেক বিদায়ী অধ্যাপককে শিক্ষার্থী কর্তৃক পুষ্পস্তবক অর্পণ।

প্রত্যেক বিদায়ী অধ্যাপককে শিক্ষকগণ কর্তৃক মানপত্র প্রদান।

প্রত্যেক বিদায়ী অধ্যাপককে শিক্ষকগণ কর্তৃক উপহার সামগ্রী প্রদান।

প্রত্যেক বিদায়ী শিক্ষককে দেয়া হয় এমন তিন প্যাকেট করে উপহার সামগ্রী

ভিসি মহোদয়ের হাত থেকে প্রত্যেক বিদায়ী অধ্যাপকের ক্রেস্ট গ্রহণ।

পরিশিষ্ট-৮:১৭

শেষ কর্মদিবসে বিভাগীয় শিক্ষকদের ফুলেল অভিনন্দন।

শেষ কর্মদিবসে বিভাগীয় অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ শামসুদ্দিন।

শেষ কর্মদিবসে বিভাগীয় অধ্যাপক ড. রাশিদা খানম।

পরিশিষ্ট-৮:১৮

১৯-১১-২০১৬ তারিখে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় সুবর্ণ জয়ন্তী অনুষ্ঠান উদ্বোধন করেন জাতীয় সংসদের মাননীয় স্পিকার ড. শিরীণ শারমিন চৌধুরী।

পরিশিষ্ট-৮:১৯

সুবর্ণ জয়ন্তী উপলক্ষে রাজনীতিবিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষার্থীদের ডিসপ্লে।

পরিশিষ্ট-৮:২০

কেক কেটে ও ক্যাম্পাসে র‍্যালি করে রাজনীতিবিজ্ঞান বিভাগের সুবর্ণ জয়ন্তী অনুষ্ঠানের উদ্বোধন।

সমাজ বিজ্ঞান অনুষদ মিলনায়তনে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে
বক্তব্যরত সহ-উপাচার্য অধ্যাপক ড. শিরীন আখতার

পরিশিষ্ট-৮:২১

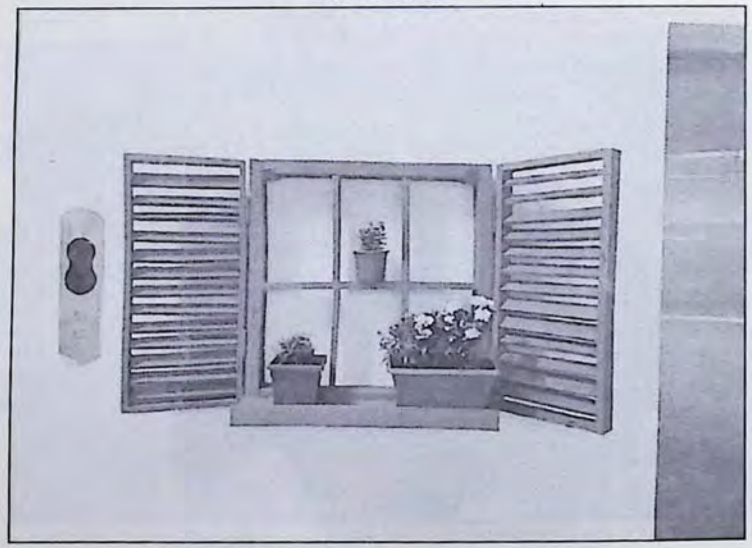

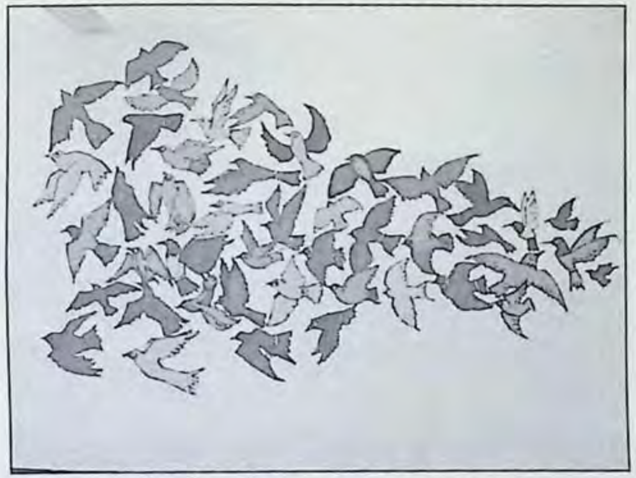

সুবর্ণ জয়ন্তী অনুষ্ঠানে দেয়াল ও অনুষদ ভবনের সজ্জা

পরিশিষ্ট-৮:২২

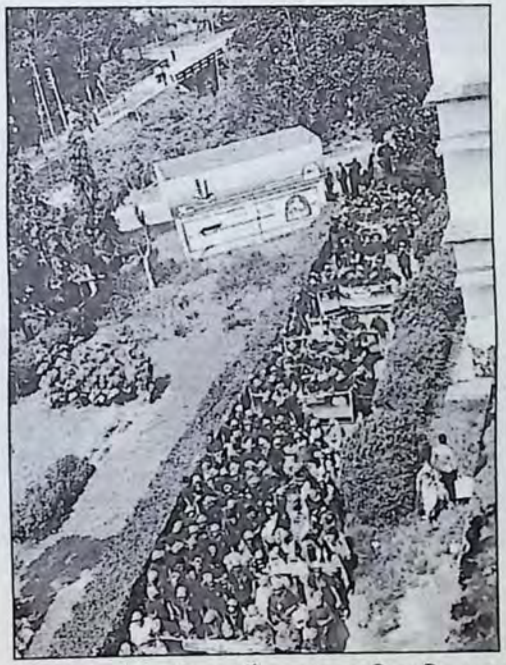

সুবর্ণ জয়ন্তী অনুষ্ঠানের দিন অনুষ্ঠিত বর্ণাঢ্য র‍্যালির ছবির একাংশ।

পরিশিষ্ট-৮:২৩

সাবেক ছাত্রী আইরিন জাহান ও তার স্বামী জনাব আবদুল মান্নান

পরিশিষ্ট-৮:২৪

সুবর্ণ জয়ন্তী অনুষ্ঠানের প্রথম দিনের অনুষ্ঠানের প্যান্ডেল

পরিশিষ্ট-৮:২৫

অনুষদ ভবনের মনোরম আলোকসজ্জার রাতের ছবি

বিভাগীয় শিক্ষার্থীদের অভিনীত যাত্রাপালার বিজ্ঞাপন চিত্র

সভাপতি থাকাকালে সামাজিক অনুষ্টানে যোগদানের দুটি নমুনা।

চট্টগ্রামে ২১ এপ্রিল, ২০১৮ তারিখে টিআইবির মতবিনিময় সভায় সংস্থাটির নির্বাহী পরিচালক ড. ইফতেখারুজ্জামান, মাধব চন্দ্র দাস এবং বেগম মুশতারি শফির সঙ্গে

চট্টগ্রাম প্রেস ক্লাবে ২৪-০৮-২০১৯ তারিখে সুজন আয়োজিত রাজনৈতিক সংস্কার বিষয়ক গোলটেবিল আলোচনায় অংশগ্রহণের পর সুজন সমন্বয়ক ড. বদিউল আলম মজুমদারের সঙ্গে।

পরিশিষ্ট-৮:২৮

সভাপতি হিসেবে শেষ কর্মদিবসে দায়িত্ব হস্তান্তরের পর লেখককে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন বিভাগের বরিষ্ঠতম অধ্যাপক ড. হাসান মোহাম্মদ।

পরিশিষ্ট-৮:২৯

সভাপতির মেয়াদ শেষে তাকে ২০১২-২০১৩, ২০১৩-২০১৪ ও ২০১৬-২০১৭ সেশনের শিক্ষার্থীদের পৃথক পৃথক দিনে প্রদত্ত ফুলেল শুভেচ্ছা।

পরিশিষ্ট-৮:৩০

বিলম্বিত বিদায়-বরণ অনুষ্ঠানে ক্রেস্ট গ্রহণকারী নবাগত ও বিদায়ী সভাপতি।

পরিশিষ্ট-৯:১

শাটলভিত্তিক ব্যান্ডগ্রুপ 'বগিবাজ' এর অনুষ্ঠান

পরিশিষ্ট-৯:২

রাজনীতিবিজ্ঞান বিভাগের ২১তম ব্যাচের কতিপয় শিক্ষার্থীর সঙ্গে ২০১৯ সালের ১৯ অক্টোবর চট্টগ্রামের লালখান বাজারে পিটস্টপ রেস্টুরেন্টে ।

পরিশিষ্ট- ৯:৩

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে ঝুপড়ির আড্ডার একটি ছবি।

পরিশিষ্ট-৯:৪

ঢাকার চারুকলা আয়োজিত মঙ্গল শোভাযাত্রার ছবি।

পরিশিষ্ট-৯:৫

বসন্ত উৎসব ও হোলি খেলা

যুগান্তর

হলি উৎসবে ঢাবির চারুকলায় একে অপরকে রাঙিয়ে দিচ্ছেন দুই তরুণী। বৃহস্পতিবারের ছবি (২৯-০৩-২০১৬)

বসন্ত উৎসব ও হোলি খেলা

পরিশিষ্ট-৯:৬

পুঁজিবাদী প্রেমের বিরুদ্ধে ডিইউএসএস আয়োজিত বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ

পরিশিষ্ট-৯:৭

ভালোবাসা দিবসে ইউনিলিভারের সৌজন্যে ভালোবাসার
জুটিদের জন্য ফ্রি ভ্রমণের জন্য প্রদত্ত রিক্সার নমুনা

পরিশিষ্ট-১০:১

খুলনার বটিয়াঘাটার খুলশিবুনিয়া জিপিবি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের
শিক্ষার্থীদের হাতে নতুন বই ও সুভাসি বৃত্তির অর্থ প্রদান।

পরিশিষ্ট-১০:২

সততার দৃষ্টান্ত স্থাপনকারী ছাত্রী মমো মল্লিকের সঙ্গে লেখক ও সোনামুখ
পরিবার-এর প্রতিষ্ঠাতা জনাব কামরুল ইসলাম

পরিশিষ্ট-১০:৩

খুলনা ইসলামিয়া ক্যাডেট স্কুলের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা-২০২০ এর পতাকা উত্তোলন, প্রধান অতিথির বক্তব্য প্রদান ও প্রতিযোগিতার শুভ উদ্বোধন ঘোষণা।

পরিশিষ্ট-১০:৪

খুলনা রাইটার্স ক্লাবের সাহিত্য আসরে যোগ দিলে ২০২০ সালের ৭ ফেব্রুয়ারি বই উপহার দিয়ে স্বাগত জানানো হয় লেখককে।

পরিশিষ্ট-১০:৫

খুলনা সাহিত্য মজলিসের সাহিত্য আসরে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ও বিশিষ্ট কবি আবু বকর সিদ্দিক ও লেখককে প্রদত্ত ফুলেল সংবর্ধনা

পরিশিষ্ট-১০:৬

বিশ্ব বাংলা সাহিত্য পরিষদের উদ্যোগে ড. গাজী আবদুল্লাহেল বাকী লিখিত সং অফারিঙস্: *রবীন্দ্রনাথের নোবেল বিজয়* গ্রন্থের মোড়ক উন্মোচন।

পরিশিষ্ট-১০:৭

সুবর্ণ জয়ন্তী অনুষ্ঠানের ফাঁকে পিএইচডি ছাত্রীর সঙ্গে একাডেমিক বৈঠক

পরিশিষ্ট-১০:৮

মনিরামপুরের এসি ল্যান্ড সাইয়েমা হাসান অবরোধ পরিস্থিতির তদারকিতে গিয়ে মুখে মাস্ক না পরিধান করায় বৃদ্ধ ভ্যানচালকদের কান ধরে ওঠবস করান।
উৎস: *নয়া দিগন্ত* ২৯ মার্চ, ২০২০।

পরিশিষ্ট-১০:৯

করোনার কিছু ত্রাণ বিতরণকারীর আত্মসাৎ করা চাউল ও তেলের নমুনা।
উৎস: *যুগান্তর* ১৩ এপ্রিল, ২০২০।

করোনার কিছু ত্রাণ বিতরণকারীর আত্মসাৎ করা চাউল ও তেলের নমুনা।
উৎস: *বাংলাদেশ প্রতিদিন* ১৬ এপ্রিল, ২০২০।

পরিশিষ্ট-১০:১০

স্কুলবন্ধুদের হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে অনুষ্ঠিত জুম কনফারেন্স আড্ডা

পরিশিষ্ট-১০:১১

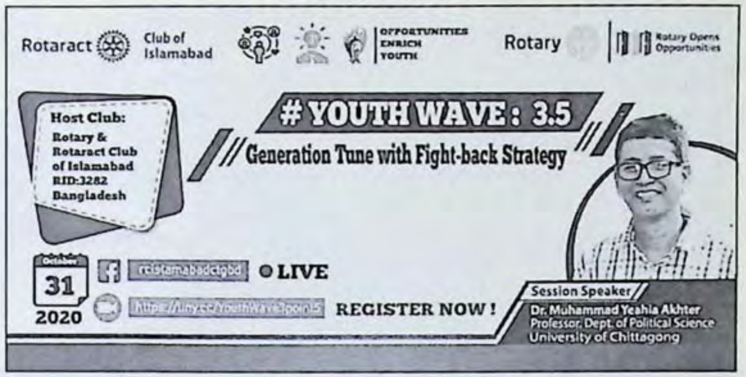

রোট্যারাক্ট ক্লাব অব ইসলামাবাদ এর ওয়েবিনারের প্রচারণার ব্যানার

পরিশিষ্ট-১০:১২

বাংলাদেশ তরুণ কলাম লেখক ফোরাম চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় শাখার ভার্চুয়াল
নবীন বরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্য প্রদানরত লেখক।

পরিশিষ্ট-১০:১৩

বাংলাদেশ তরুণ কলাম লেখক ফোরাম চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়
শাখা কর্তৃক আয়োজিত ওয়েবিনারের প্রচারপত্র

পরিশিষ্ট-১০:১৪

করোনা সময়ে লেখা অনুগল্প

মন খারাপ

মুহাম্মদ ইয়াহ্ইয়া আখতার

জনপ্রতিনিধি হবার চলমান প্রক্রিয়ায় জব্বার সাহেব ইউপি চেয়ারম্যান হন। ভোটারদের সমর্থন লাগেনি। এলাকার দাপুটে কর্মীরাই তাঁকে চেয়ারম্যান বানিয়েছে। করোনার আবির্ভাবের পর স্বভাব বদলে তিনি জনসেবায় ব্যকুল। বাড়িবাড়ি গিয়ে খোঁজ নেন। সবাইকে দেন সুপরামর্শ। চেয়ারম্যানের এমন জনদরদী রূপ অভূতপূর্ব। করোনা পরীক্ষার জন্য তাঁর এলাকার ২৫ জনের নমুনা সংগৃহীত হয়েছে। দু'চারটি রিপোর্ট পজিটিভ হলে এলাকা 'লক ডাউন' হবে। আসবে গরিবের ত্রাণ। এ চিন্তায় জব্বার চেয়ারম্যানের ঘুম হয় না। ত্রাণ বিতরণের পূর্ব-প্রস্তুতিতে তিনি মহাব্যস্ত। ত্রাণসামগ্রী রাখার জায়গা থাকা সত্ত্বেও নিজ বাগানবাড়ির গোপন গোডাউন খালি করিয়েছেন। তিনটে বক্সখাটের পেট থেকে বালিশ আর লেপ সরিয়ে ফেলেছেন। ত্রাণ বিতরণের প্রস্তুতি সুসম্পন্ন হবার পরদিন রিপোর্ট এলো। সবগুলো নেগেটিভ। এলাকা নিরাপদ। কেবল স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলার নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। এমন সুখবরে সবাই খুশি হলেও জব্বার চেয়ারম্যান বিমর্ষ হয়ে পড়লেন।

উৎস: দেখুন, মুহাম্মদ ইয়াহইয়া আখতার, 'মানব মনস্তত্ত্ব ও করোনার শিক্ষা', *যুগান্তর*, ২২ মে, ২০২০।

পরিশিষ্ট-১০:১৫

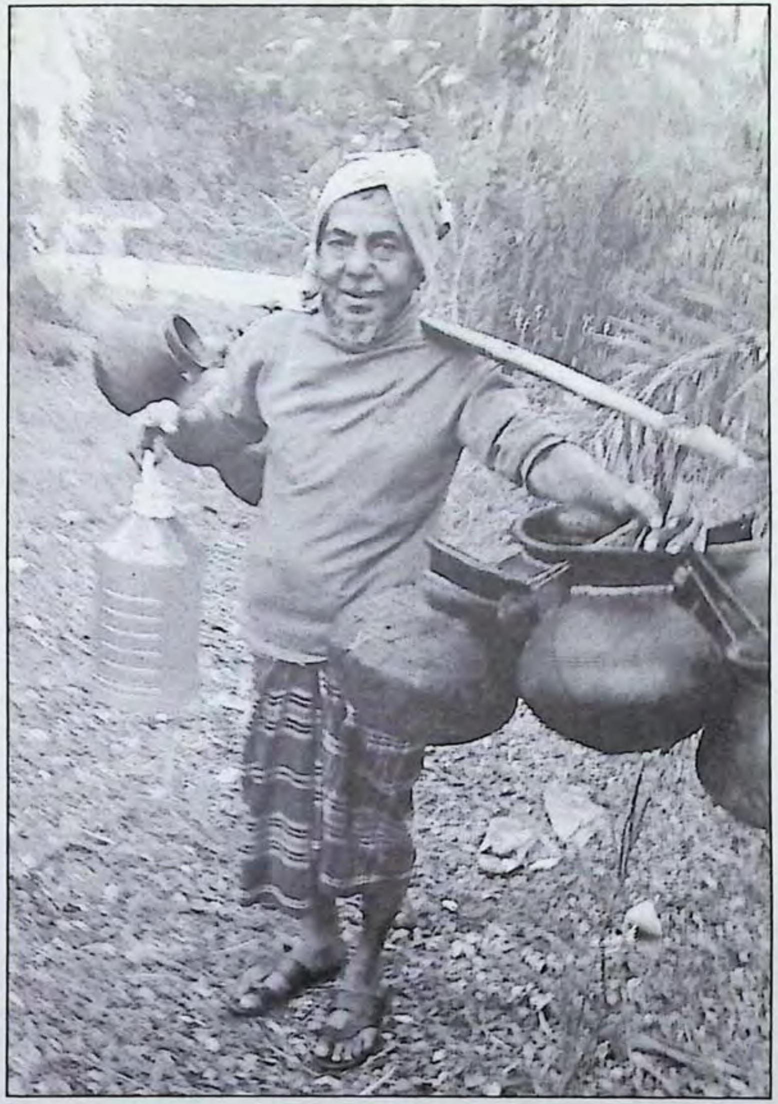

খেজুর গাছ কাটা শিল্পী সাহেব আলী

পরিশিষ্ট-১১:১

লেখকের সংক্ষিপ্ত প্রকাশনা তালিকা

থিসিস

1. Elections and Electoral Corruption in Bangladesh: Civilian, Military & Non-Partisan Regimes in Perspective, PhD thesis, The University of Sydney, 1999.
2. Socio-political Impact of Administrative Decentralization: The Case of Bangladesh, M. A. thesis, The University of Waterloo, Canada, 1989.

প্রকাশিত গ্রন্থ

১. *প্রসঙ্গ নির্বাচন কমিশন* (খুলনা: অধ্যয়ন পরিষদ, ২০২১)।
২. *বাংলাদেশি নির্বাচন, সঙ্কট ও গতিপ্রকৃতি* (খুলনা: অধ্যয়ন পরিষদ, ২০২১)।
৩. *রাজনৈতিক সংস্কৃতি ও সামাজিকীকরণ: প্রসঙ্গ বাংলাদেশ* (ঢাকা: নভেল পাবলিশিং হাউস, ২০২০)।
৪. *শিক্ষা ও সংস্কৃতি ভাবনা* (চট্টগ্রাম: খড়িমাটি, ২০১৯)।
৫. *বাংলাদেশে নির্বাচনী দুর্নীতি: স্বরূপ ও প্রবণতা (১৯৭৩-২০১৫)* (ঢাকা: অসডার পাবলিকেশন্স, ২০১৬)।
৬. *অভিনব নির্বাচন অসহিষ্ণু সরকার, দশম সংসদ নির্বাচনের পূর্বাপর* (ঢাকা: অসডার পাবলিকেশন্স, ২০১৫)।
৭. *বিডিআর বিদ্রোহ, প্রাথমিক বিশ্লেষণ* (ঢাকা: অসডার পাবলিকেশন্স, ২০১৫)।
৮. *মহাজোট সরকারের বিকাল বেলা* (ঢাকা: অসডার পাবলিকেশন্স, ২০১৩)।
৯. *তত্ত্বাবধায়ক সরকারের ময়নাতদন্ত* (ঢাকা: অসডার পাবলিকেশন্স, ২০১২)।
১০. *নির্বাচন কমিশনের আমলনামা* (ঢাকা: অসডার পাবলিকেশন্স, ২০১১)।
১১. *মহাজোট সরকারের দুই বছর* (ঢাকা: অসডার পাবলিকেশন্স, ২০১১)।
১২. *সন্ত্রাস দুর্নীতি আগ্রাসন* (ঢাকা: অসডার পাবলিকেশন্স, ২০১১)।
১৩. *অভিনব সরকার ব্যতিক্রমি নির্বাচন* (ঢাকা: এ এইচ ডেভেলপমেন্ট পাবলিশিং হাউস, ২০০৯)।
১৪. *সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে দুর্নীতি, স্বরূপ ও প্রতিকার* (ঢাকা: ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ ও এ এইচ ডেভেলপমেন্ট পাবলিশিং হাউস, ২০০৮)।
১৫. *জোট শাসনামল, রাজনীতির চালচিত্র* (ঢাকা: অসডার পাবলিকেশন্স, ২০০৬)।
১৬. *তাবলীগ জামায়াত, ঈমানী আন্দোলনের সমাজতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ* (ঢাকা: অ্যাডর্ন পাবলিকেশন, ২০০৬, ২০১১)।
১৭. *চারদলীয় জোট সরকারের দেশ শাসন* (ঢাকা: অসডার পাবলিকেশন্স, ২০০৩)।
১৮. *দুর্নীতি, নির্বাচন ও রাজনীতি, স্বরূপ বিশ্লেষণ ও সঙ্কট উত্তরণ* (ঢাকা: পরমা, ২০০৩)।
১৯. *Electoral Corruption in Bangladesh* (Aldershot, England: Ashgate Publishing Limited, 2001). Reprinted by Routledge, UK, 2018.
২০. *দুর্নীতির স্বরূপ অন্বেষণ: বাংলাদেশ* (ঢাকা: নিবেদন পাবলিকেশন্স, ১৯৯১)।

মনোগ্রাফ

১. 'দুর্নীতি রোধে সংবাদপত্রের ভূমিকা' (ঢাকা: ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি), টিআইবি রিসার্চ মনোগ্রাফ-১, ২০০০)।

অধ্যায়

১. 'নির্বাচনী স্বচ্ছতা প্রতিষ্ঠায় নির্বাচন পর্যবেক্ষণ', আল মাসুদ হাসানউজ্জামান সম্পাদিত, *বাংলাদেশে নির্বাচন* (ঢাকা: প্রথমা প্রকাশন, ২০১৮), পৃষ্ঠা-৯৫-১০৯।
২. 'Transparency in Tertiary Education: Politics, Administration and Recruitment', in Imtiaz Admed and Iftekhar Iqbal (eds.), *University of Dhaka: Making Unmaking Remaking* (Dhaka: Prothoma Prokashan, 2016), pp. 273-297.
৩. 'গণতন্ত্রের জনপ্রিয়তা কি হুমকির মুখে?' মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর সম্পাদিত, *গণতন্ত্র* (ঢাকা: মাওলা ব্রাদার্স, ২০০৬), পৃষ্ঠা- ২১১-২১৪।
৪. 'তাবলীগী আন্দোলনে নারীদের ভূমিকা', রাশিদা খানম সম্পাদিত, *সমাজ ও নারী* (ঢাকা: এ এইচ ডেভেলপমেন্ট পাবলিশিং হাউস, ২০১০), পৃষ্ঠা- ১৮৯-২০২।

বিদেশি গবেষণা জার্নালে প্রকাশনা

1. 'Electoral Politics and Corruption under Civilian Rule in Post-1971 Pakistan', *South Asian Survey*, Vol. 11, No. 1, 2004, pp. 75-93.
2. 'Military Rule, Civilianisation and Electoral Corruption: Pakistan and Bangladesh in Perspective', *Asian Studies Review*, Vol. 25, No. 1, 2001, pp. 73-93. Jointly written with: Habib Zafarullah.
3. 'Caretaker Administrations and Democratic Elections in Bangladesh', *Government and Opposition*, Vol. 35, No. 3, Summer, 2000, pp. 345-69. Jointly written with: Habib Zafarullah.
4. 'The Politics of Decentralization in Bangladesh', *Indian Journal of Politics*, Vol. XXV, No. 2-3, 1991, pp. 119-31.
5. 'Decentralization for Development: Experiments in Bangladesh', *Philippine Journal of Public Administration*, Vol. XXXIV, No. 1, 1990, pp. 27-42.
6. 'Socio-Political Impact of Administrative Decentralization in Bangladesh', *Asian Profile*, Vol. 18, No. 3, 1990, pp. 265-77.
7. 'Patron-Client Relations in Bangladeshi Organization', *Administrative Change*, Vol. XVII, No. 1, 1989, pp. 28-41.
8. 'Militarisation and Opposition in Bangladesh: Parliamentary Approval and Public Reaction', *Commonwealth and Comparative Politics*, Vol. XI, No 2, 1989, pp. 172-84. Jointly written with: Ahmed Shafiqul Huque.

9. 'The Ubiquity of Islam: Religion and Society in Bangladesh', *Pacific Affairs*, Vol. 60, No. 2, 1987, p. 200-25. Jointly written with: Ahmed Shafiqul Huque.

স্বদেশি গবেষণা জার্নালে প্রকাশনার তালিকা

১. 'ঘুষের লেনদেন : ভঙ্গিমা ও পরিভাষা', *বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন পত্রিকা*, খণ্ড ১৪, ডিসেম্বর ২০১৪, পৃষ্ঠা ২৯-৪২।

২. 'বিডিআর বিদ্রোহের প্রাথমিক বিশ্লেষণ', *চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি পত্রিকা*, পঞ্চম খণ্ড, ২০১০, পৃষ্ঠা- ৩৮-৬৯।

৩. 'দুর্নীতি দমন: সামাজিক দুর্নীতির উৎস ও প্রতিকার', *নিরীক্ষা*, ১৬৬তম সংখ্যা, জানুয়ারি ২০০৮, পৃষ্ঠা- ২২-৩৮।

৪. 'বাংলাদেশে সংসদীয় কমিটি ও সুশীল সমাজের মধ্যকার সম্পর্ক', *চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় স্টাডিজ*, খণ্ড ২৬, সংখ্যা ১, ২০০৬, পৃষ্ঠা- ১৮৭-২০৮।

৫. 'বাংলাদেশের রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে রাজনৈতিক প্রবচন ও রাজনৈতিক উপাধির ভূমিকা', *চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি জার্নাল*', ২০০৩, পৃষ্ঠা- ৪৪-৬৪।

৬. 'রাজনীতি ও সঙ্গীত: প্রসঙ্গ বাংলাদেশের স্থানীয় সরকার নির্বাচন', *বাংলাদেশ পলিটিকাল স্টাডিজ*, খণ্ড ১৬, ১৯৯৪, পৃষ্ঠা- ৭৯-৯৫।

৭. 'প্রশাসনিক দুর্নীতি দমন', *প্রশাসন সমীক্ষা*, খণ্ড ৪, সংখ্যা ১, ১৯৯১, পৃষ্ঠা- ৫৬-৮৬।

৮. 'বাংলাদেশে রাজনৈতিক দুর্নীতি: প্রসঙ্গ রাজনৈতিক হত্যা', *বাংলাদেশ পলিটিক্যাল স্টাডিজ*, খণ্ড ১৪, ১৯৯০, পৃষ্ঠা- ৯১-১০৬।

৯. 'দুর্নীতি ও উন্নয়ন: বাংলাদেশ প্রসঙ্গ', *প্রশাসন সমীক্ষা*, খণ্ড ৩, সংখ্যা ২, ১৯৯০, পৃষ্ঠা- ৪৯-৬২।

১০. 'Decentralization Efforts since the British Colonial Rule: The Bangladeshi Experiences', *Journal for Human Development*, Vol. 2, No. 3, 1990, pp. 43-53.

১১. 'Land Politics During Election: The Case of Rural Bangladesh', *The Journal of Local Government*, Vol. 17, No. 1, 1988, pp. 68-74.

১২. 'Change in Political Culture: Influence of Administrative Decentralization in Bangladesh', *Chittagong University Studies* (Arts), Vol. 3, 1987, pp. 95-101.

১৩. 'Some Neglected Agents of Political Socialization: A Study of Women in Rural Bangladesh', *The Journal of Local Government*, Vol. 16, No. 2, 1987, pp. 67-81.

১৪. 'Reflections on Political Socialization: Rural Institutions in Bangladesh' *Chittagong University Studies* (Social Science), Vol. X, No. 1, 1987, pp. 194-208.

১৫. 'বাংলাদেশের নির্বাচকালীন রাজনীতি: একটি গ্রামভিত্তিক নিরীক্ষণ', *চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় স্টাডিজ*, খণ্ড ৮, সংখ্যা ১, ১৯৮৫, পৃষ্ঠা- ২০৯-২৩৪।

রিসার্চ নোট

1. 'Styles of Administrative Corruption: The Case of a Bangladeshi Organization', *Politics, Administration and Change*, Vol. XII, No. 1, 1987, pp. 61-76.

রিসার্চ রিপোর্ট

1. 'Adolescent and Politics in Bangladesh: Urban Rural Hiatus in Socilization', *Politics, Administration and Change*, No. 17, 1991, pp. 39-53. Jointly written with: Ahmed Shafiqul Huque.

অন্যান্য প্রকাশনা

আমি একজন কলামিস্ট। দেশের প্রথম সারির বাংলা পত্রিকায় আমার অনেক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। এর মধ্যে *যুগান্তর* পত্রিকায় 'দেশপ্রেমের চশমা' লোগো নিয়ে আমি ২৯৮টি (ফেব্রুয়ারি, ২০২১ পর্যন্ত), *প্রথম আলো* পত্রিকায় 'বিশ্লেষণী দৃষ্টিপাত' লোগো নিয়ে ৫৭টি, *ইত্তেফাক*-এ ৮৫টি, *আমার দেশ*-এ ১৩টি *জনকণ্ঠ*-এ ১১টি, *আযাদী*-তে ১৮টি, *পূর্বকোণ*-এ ৭টি, *ইনকিলাব*-এ ৬টি, *নয়া দিগন্ত*-এ ৫টি, *মানবজমিন*-এ ২টি এবং *কালের কণ্ঠ*, *ভোরের কাগজ*, *বার্তা টুয়েন্টিফোর*, *পূর্বদেশ* পত্রিকাগুলোয় ১টি করে প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। এছাড়া সাপ্তাহিক পত্রিকার মধ্যে *যায়যায়দিন*-এ ৪টি, *রোববার*-এ ৩টি *সাপ্তাহিক দেশকাল*-এ ২টি এবং *ঢাকা কুরিয়ার* ও *স্বদেশ বার্তা* (সিডনি থেকে প্রকাশিত)-য় ১ টি করে প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। পাক্ষিক *দেশকণ্ঠ* (সিডনি থেকে প্রকাশিত) পত্রিকায় ১টি; মাসিক পত্রিকার মধ্যে *একুশে পত্রিকা*-য় ৩টি, *ক্যাম্পাস বার্তা*-য় ২টি, *বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস*-এ ১টি, *টিআইবি নিউজলেটার*-এ ১টি, *ধূপছায়া*-য় ১টি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। বাৎসরিক পত্রিকার মধ্যে *র‍্যাব স্যুভেনির*-এ ১টি এবং *প্রকৃতি*-তে একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। এ ছাড়া যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য থেকে প্রকাশিত বাংলা ভাষায় প্রকাশিত কিছুসংখ্যক বাংলা পত্রিকা এবং বাংলাদেশের উল্লেখযোগ্যসংখ্যক অনলাইন পত্রিকা আমার লেখা অনেক প্রবন্ধ পুনঃপ্রকাশ করেছে।

জনপ্রিয় টিভি অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ [আংশিক]

আমি চ্যানেল আই, একুশে টেলিভিশন, বিটিভি, ইন্ডিপেন্ডেন্ট টেলিভিশন, বাংলাভিশন, চ্যানেল টুয়েন্টিফোর, মাছরাঙ্গা টিভি, যমুনা টিভি, আর টিভির বিভিন্ন প্রোগ্রাম ও টকশোতে অংশগ্রহণ করি। এ সকল অনুষ্ঠানে যাদের সঙ্গে আমি অংশগ্রহণ করি তাদের মধ্যে ছিলেন: ব্যারিস্টার রোকনউদ্দিন মাহমুদ, ড. ইমতিয়াজ আহমেদ, প্রফেসর সলিমুল্লাহ খান, রাশেদ খান মেনন, আবদুস সালাম, সাইফুল হক, অধ্যাপক দিলারা চৌধুরী, ড. হারুন অর রশীদ, অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি গোলাম রব্বানী, ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অব:) এম সাখাওয়াত হোসেন, ড. এটিএম শামসুল হুদা, শামীম ওসমান, অধ্যাপক মলয় ভৌমিক, অধ্যাপক গিয়াসউদ্দীন মোল্লা, ড. শান্তনু মজুমদার, জয়নাল আবদিন ফারুক, অ্যাডভোকেট কামরুল ইসলাম, ড. মীজানুর রহমান, নাজমা আখতার, মেজর (অব:) আখতারুজ্জামান, ড. চঞ্চল খান, দিলীপ বড়ুয়া, গোলাম আকবর খন্দকার, রেহানা আকতার রানু, মুজাহিদুল ইসলাম সেলিম, ড. বদিউল আলম মজুমদার, নাইমুল ইসলাম খান, প্রফেসর ড. মো. আনোয়ার হোসেন, আবু আলম শহীদ খান, বদিউর রহমান, একে শহীদুল হক, অ্যাডভোকেট ডিএম আবদুল বারী এবং আরও কতিপয় বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব।

তথ্যপঞ্জী

গ্রন্থ

আখতার, মুহাম্মদ ইয়াহ্ইয়া, *প্রসঙ্গ নির্বাচন কমিশন* (খুলনা: অধ্যয়ন পরিষদ, ২০২১)।

আখতার, মুহাম্মদ ইয়াহ্ইয়া , *বাংলাদেশি নির্বাচন* (খুলনা: অধ্যয়ন পরিষদ, ২০২১)।

আখতার, মুহাম্মদ ইয়াহ্ইয়া, *'রাজনৈতিক সংস্কৃতি ও সামাজিকীকরণ: প্রসঙ্গ বাংলাদেশ'* (ঢাকা: নভেল পাবলিশিং হাউস, ২০২০)।

আখতার, মুহাম্মদ ইয়াহ্ইয়া, *শিক্ষা ও সংস্কৃতি ভাবনা* (চট্টগ্রাম: খড়িমাটি, ২০১৯)।

আখতার, মুহাম্মদ ইয়াহ্ইয়া, *মহাজোট সরকারের বিকাল বেলা* (ঢাকা: অসডার পাবলিকেশন্স, ২০১৩)।

আখতার, মুহাম্মদ ইয়াহ্ইয়া, *মহাজোট সরকারের দুই বছর* (ঢাকা: অসডার পাবলিকেশন্স, ২০১১)।

আখতার, মুহাম্মদ ইয়াহ্ইয়া, *সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে দুর্নীতি: স্বরূপ ও প্রতিকার* (ঢাকা: টিআইবি ও এএইচডিপিএইচ, ২০০৮)।

আহমদ, আবুল মনসুর, *আত্মকথা* (ঢাকা: আহমদ পাবলিশিং হাউস, ১৯৯৯)।

আহমেদ, জেনারেল মইন ইউ, *শান্তির স্বপ্নে: সময়ের স্মৃতিচারণ* (ঢাকা: এশিয়া পাবলিকেশন্স, ২০০৯)।

আহমেদ, হুমায়ুন, *আমার ছেলেবেলা* (ঢাকা: কাকলি প্রকাশনী, ১৯৯১)।

ইউনূস, মুহাম্মদ, *গ্রামীণ ব্যাংক ও আমার জীবন* (ঢাকা: মাওলা ব্রাদার্স, ২০০৪)।

এরশাদ, হুসেইন মুহাম্মদ, *আমার কর্ম আমার জীবন* (ঢাকা: আকাশ প্রকাশনী, ২০১৬)।

করিম, আবদুল, *সমাজ ও জীবন* [প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড] (ঢাকা: জাতীয় সাহিত্য প্রকাশ, ২০০৮)।

কালাম, এ পি জে আবদুল, *টার্নিং পয়েন্টস* (ঢাকা: অন্যধারা, ২০১৩)।

কালাম, মোহাম্মদ আবুল, *জীবন স্মৃতি* (ঢাকা: শ্রাবণ প্রকাশনী, ২০১৮)।

খান, মিসবাহউদ্দিন, *আত্মস্মৃতি* (ঢাকা: রেহানা হক, ২০০৯)।

খান, মে. জে. মনজুর রশীদ (অব.), *আমার সৈনিক জীবন* (ঢাকা: প্রথমা প্রকাশন, ২০১২)।

ছফা, আহমদ, *যদ্যপি আমার গুরু* (ঢাকা: মাওলা ব্রাদার্স, ১৯৯৮)।

চট্টোপাধ্যায়, নগেন্দ্রনাথ, *মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের জীবনচরিত* (কলকাতা: দেজ পাবলিকেশন্স, ২০২০)।

চাওলা, নবীন, *মাদার টেরিজা* (কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স, ২০১৫)।

চৌধুরী, তপন রায়, *বাঙ্গালনামা* (কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স, ২০০৭)।

চৌধুরী, প্রমথ, *আত্মকথা* (ঢাকা: মনফকিরা, ১৯৪৬)।

নেহরু, জওহরলাল [শ্রী সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার অনূদিত], *আত্মচরিত* (কোলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স, ১৯৯১)।

বসু, বুদ্ধদেব, *আত্মজৈবনিক* (চট্টগ্রাম: বাতিঘর, ২০১৮)।

বসু, যোগীন্দ্রনাথ, *মাইকেল মধুসূধন দত্তের জীবনচরিত* (কলকাতা: দেজ পাবলিকেশন্স, ২০১১)।

বাকী, ড. গাজী আবদুল্লাহেল, *সং অফারিঙস্: রবীন্দ্রনাথের নোবেল বিজয়* (খুলনা: লেখক কর্তৃক প্রকাশিত, ২০২০)।

মজুমদার, রমেশচন্দ্র, *জীবনের স্মৃতিদ্বীপে* (ঢাকা: সূচীপত্র, ২০১৭)।

মণ্ডল, রণজিত কুমার, *আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়* (ঢাকা: পুথিনিলয়, ২০১৬)।

মাহমুদ, আল, *যেভাবে বেড়ে উঠি* (ঢাকা: অনন্যা, ১৯৯৭)।

মাহমুদুল্লাহ, *মহাজীবন মহাত্মা গান্ধী* (ঢাকা: সাহিত্যমালা, ২০১৬)।

রহমান, আবদুর, *যতটুকু মনে পড়ে* (চট্টগ্রাম: রহমান্স পাবলিকেশন্স, ১৯৭২)।

রহমান, শেখ মুজিবুর, *অসমাপ্ত আত্মজীবনী* (ঢাকা: ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ২০১২)।

রিমি, সিমিন হোসেন, *তাজউদ্দীন আহমদ* (ঢাকা: প্রতিভাস, ২০০০)।

স্যাম্পসন, এনথনি, *ম্যান্ডেলা* (ঢাকা: ইত্যাদি গ্রন্থ প্রকাশ, ২০০৮)।

সেন, সুকুমার, *দিনের পর দিন যে গেল* (কলিকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১৩৯৩)।

গবেষণা প্রবন্ধ/প্রতিবেদন

আখতার, মুহাম্মদ ইয়াহ্ইয়া 'বাংলাদেশে সংসদীয় কমিটি ও সুশীল সমাজের মধ্যকার সম্পর্ক', *চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় স্টাডিজ*, খণ্ড ২৬, সংখ্যা ১, ২০০৬, পৃষ্ঠা- ১৮৭-২০৮।

আখতার, মুহাম্মদ ইয়াহ্ইয়া, 'রাজনীতি ও সঙ্গীত: প্রসঙ্গ বাংলাদেশের স্থানীয় সরকার নির্বাচন', *বাংলাদেশ পলিটিক্যাল স্টাডিজ*, খণ্ড ১৬, ১৯৯৪, পৃষ্ঠা-৭৯-৯৫)।

আখতার, মুহাম্মদ ইয়াহ্ইয়া, 'বাংলাদেশের নির্বাচকালীন রাজনীতি: একটি গ্রামভিত্তিক নিরীক্ষণ', *চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় স্টাডিজ*, খণ্ড ৮, সংখ্যা ১, ১৯৮৫, পৃষ্ঠা- ২০৯-২৩৪।

আখতার, মুহাম্মদ ইয়াহ্ইয়া, 'দুর্নীতি দমন: সামাজিক দুর্নীতির উৎস ও প্রতিকার', *নিরীক্ষা*, ১৬৬তম সংখ্যা, জানুয়ারি ২০০৮, পৃষ্ঠা- ২২-৩৮।

করিম, মো. রেযাউল, রায়, দিপু ও কামাল, মো. মোস্তফা, 'সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রভাষক নিয়োগ: সুশাসনের চ্যালেঞ্জ ও উত্তরণের উপায়', ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি) গবেষণা প্রতিবেদন, ২০১৬।

অন্যান্য প্রবন্ধ

আখতার, মুহাম্মদ ইয়াহ্ইয়া, 'উপাচার্যরা কেন দুর্নীতি করেন', *যুগান্তর*, ১৮ ফেব্রুয়ারি, ২০২১।

আখতার, মুহাম্মদ ইয়াহ্ইয়া, 'যুগান্তরে লিখে সম্মানিত হয়েছি', *যুগান্তর*, ১ ফেব্রুয়ারি, ২০২১।

আখতার, মুহাম্মদ ইয়াহ্ইয়া, 'হারিয়ে যাচ্ছে আবহমান বাংলার অনেক কিছুই', *যুগান্তর*, ২৯ জানুয়ারি, ২০২১।

আখতার, মুহাম্মদ ইয়াহ্ইয়া, 'ইভিএম কি এতই জরুরি?', *যুগান্তর*, ৪ জানুয়ারি, ২০২১।

আখতার, মুহাম্মদ ইয়াহ্ইয়া, 'চুনোপুঁটি হাজতে, রাঘববোয়ালরা কোথায়?', *যুগান্তর*, ২৫ জুলাই, ২০২০।

আখতার, মুহাম্মদ ইয়াহ্ইয়া, 'করোনার ত্রাণ চুরি সমাচার', *যুগান্তর*, ১৮ এপ্রিল, ২০২০।

আখতার, মুহাম্মদ ইয়াহ্ইয়া, 'রাষ্ট্রীয় পদক প্রদানে বিশৃঙ্খলা কাম্য নয়', *যুগান্তর*, ১৩ এপ্রিল, ২০২০।

আখতার, মুহাম্মদ ইয়াহ্ইয়া, 'আয়নায় বিকৃত চেহারা', *যুগান্তর*, ২১ মার্চ, ২০২০।

আখতার, মুহাম্মদ ইয়াহ্ইয়া, 'ইভিএম ইসির জন্য শাঁখের করাত', *যুগান্তর*, ৩ ফেব্রুয়ারি, ২০২০।

আখতার, মুহাম্মদ ইয়াহ্ইয়া, 'ভাষায় দূষণ এবং ভালোবাসায় সংকোচন', *যুগান্তর*, ১৪ ফেব্রুয়ারি, ২০২০।

আখতার, মুহাম্মদ ইয়াহ্ইয়া, 'সিটি নির্বাচনের পোস্টমর্টেম', *যুগান্তর*, ১০ ফেব্রুয়ারি, ২০২০।

আখতার, মুহাম্মদ ইয়াহ্ইয়া, 'বইমেলা লেখকবান্ধব নয় প্রকাশকবান্ধব', *যুগান্তর*, ০৭ ফেব্রুয়ারি, ২০১৯।

আখতার, মুহাম্মদ ইয়াহ্ইয়া, 'অবহেলিত কাক ও নির্বাচন', *প্রকৃতি*, ডিসেম্বর, ২০১৯, পৃষ্ঠা- ৫৭-৫৮।

আখতার, মুহাম্মদ ইয়াহ্ইয়া, 'শিক্ষক রাজনীতি হল যত নষ্টের গোড়া', *যুগান্তর*, ১০ নভেম্বর, ২০১৯।

আখতার, মুহাম্মদ ইয়াহ্ইয়া, 'আত্মঘাতী ছাত্র রাজনীতি কি বন্ধ হচ্ছে?' *যুগান্তর*, ১৩ অক্টোবর, ২০১৯।

আখতার, মুহাম্মদ ইয়াহ্ইয়া, 'ক্যাসিনোর গডফাদাররা কোথায়?'. *যুগান্তর*, ২৩ সেপ্টেম্বর, ২০১৯।

আখতার, মুহাম্মদ ইয়াহ্ইয়া, 'আগামী নির্বাচনগুলোয় কি তবে নিঃশব্দে দুর্নীতি হবে?', *যুগান্তর*, ৯ মে, ২০১৯।

আখতার, মুহাম্মদ ইয়াহ্ইয়া, 'ইভিএমে কেন এত আগ্রহ?', *যুগান্তর*, ১৮ এপ্রিল, ২০১৯।

আখতার, মুহাম্মদ ইয়াহ্ইয়া, 'রাজনৈতিক অঙ্গনে ভালোবাসার খরা', *যুগান্তর*, ১৪ ফেব্রয়ারি, ২০১৯।

আখতার, মুহাম্মদ ইয়াহ্ইয়া, 'সরকার কি ইভিএমে আশ্রয় খুঁজছে?', *যুগান্তর*, ৩০ আগস্ট, ২০১৮।

আখতার, মুহাম্মদ ইয়াহ্ইয়া, 'ইভিএম মেলা, নাকি ছলচাতুরির খেলা?', *যুগান্তর*,২৩ জুলাই, ২০১৮।

আখতার, মুহাম্মদ ইয়াহ্ইয়া, 'ইভিএমে এত মধু কী এমন আছে যাদু?', *যুগান্তর*, ৭ মে, ২০১৮।

আখতার, মুহাম্মদ ইয়াহ্ইয়া, 'ইসির ঘাড় থেকে ইভিএমের ভূত নামেনি', *যুগান্তর*, ২৯ মার্চ ২০১৮।

আখতার, মুহাম্মদ ইয়াহ্ইয়া, 'শিক্ষক শিক্ষার্থীর ভালবাসার রসায়ন', *যুগান্তর*, ১৪ ফেব্রুয়ারি, ২০১৮।

আখতার, মুহাম্মদ ইয়াহ্ইয়া, 'একাডেমিক দুর্বৃত্তায়ন রুখতে হবে', *যুগান্তর*, ১৩ অক্টোবর, ২০১৭।

আখতার, মুহাম্মদ ইয়াহ্ইয়া, 'অনুকরণযোগ্য এক মহত উদ্যোগ', *যুগান্তর*, ২৫ সেপ্টেম্বর, ২০১৭।

আখতার, মুহাম্মদ ইয়াহ্ইয়া, 'দুই বাণিজ্য শিক্ষার পার্থক্যটা স্পষ্ট', *যুগান্তর*, ১১ সেপ্টেম্বর, ২০১৭।

আখতার, মুহাম্মদ ইয়াহ্ইয়া, 'নতুন পদ্ধতি শিক্ষার প্রতি শিশুর আগ্রহ বাড়াবে', *যুগান্তর*, ৩১ আগস্ট, ২০১৭।

আখতার, মুহাম্মদ ইয়াহ্ইয়া, 'উচ্চশিক্ষায় নিম্ন ব্যবস্থাপনা', *যুগান্তর*, ২৪ আগস্ট, ২০১৭।

আখতার, মুহাম্মদ ইয়াহ্ইয়া, 'শিক্ষক নিয়োগে রাজনৈতিক বিবেচনা ও দুর্নীতি বন্ধ হোক', *যুগান্তর*, ০৫ এপ্রিল, ২০১৭।

আখতার, মুহাম্মদ ইয়াহ্ইয়া, 'ভালোবাসার অভিনব প্রতিদান', *যুগান্তর*, ১৪ ফেব্রুয়ারি, ২০১৭।

আখতার, মুহাম্মদ ইয়াহ্ইয়া, 'নতুন পাঠ্যবই এবং ওড়না সমাচার', *যুগান্তর*, ৯ জানুয়ারি, ২০১৭।

আখতার, মুহাম্মদ ইয়াহ্ইয়া 'শিক্ষকদের কি এ নৈতিক স্খলন সাজে?', *যুগান্তর*, ১৮ মে, ২০১৬।

আখতার, মুহাম্মদ ইয়াহ্ইয়া, 'প্রথমে দমন করুন শিক্ষাঙ্গণের দুর্নীতি', *যুগান্তর*, ১১ মে, ২০১৬।

আখতার, মুহাম্মদ ইয়াহ্ইয়া, 'ভালোবাসার পবিত্রতাকে কলুষিত করবেন না', *যুগান্তর*, ১৪ ফেব্রুয়ারি, ২০১৬।

আখতার, মুহাম্মদ ইয়াহ্ইয়া, 'বইমেলা কবে লেখকবান্ধব হবে?', ৭ ফেব্রুয়ারি, *যুগান্তর*, ২০১৬।

আখতার, মুহাম্মদ ইয়াহ্ইয়া, 'ইভিএমে লুকানো দুরভিসন্ধি', *যুগান্তর*, ১৯ মে, ২০১৫।

আখতার, মুহাম্মদ ইয়াহ্ইয়া, 'আবার ইভিএম? ইসির মতলবটা কি?, *যুগান্তর*, ২২ জুলাই, ২০১৪।

আখতার, মুহাম্মদ ইয়াহ্ইয়া, 'শিক্ষাঙ্গণের দুর্নীতি প্রতিরোধ অগ্রাধিকার পাচ্ছে না কেন?', *যুগান্তর*, ০১ এপ্রিল, ২০১৪।

আখতার, মুহাম্মদ ইয়াহ্ইয়া, 'বই মেলাকে লেখকবান্ধব করতে হবে', *যুগান্তর*, ২০ ফেব্রুয়ারি, ২০১৩।

আখতার, মুহাম্মদ ইয়াহ্ইয়া, 'কার স্বার্থে ইভিএমে নির্বাচন করতে আগ্রহী কমিশন', *যুগান্তর*, ৩ মার্চ ২০১২।

আখতার, মুহাম্মদ ইয়াহ্ইয়া, 'ইভিএম: দলের চেয়ে ইসির আগ্রহ বেশি', *আমার দেশ*, ২৩ জুলাই, ২০১১।

আখতার, মুহাম্মদ ইয়াহ্ইয়া, 'ভালোবাসা সীমিতকরণ অপরাধের শাস্তি', *আমার দেশ*, ১৪ ফেব্রুয়ারি, ২০১০।

আখতার, মুহাম্মদ ইয়াহ্ইয়া, 'কমিশনের অভিনবত্ব ও সিইসি'র পক্ষপাতিত্ব', *নয়া দিগন্ত*, ১২ নভেম্বর, ২০০৮।

আখতার, মুহাম্মদ ইয়াহ্ইয়া, 'শিক্ষা ব্যবস্থা সংস্কারে পরামর্শ', *দৈনিক জনকণ্ঠ*, ১৮ অক্টোবর, ১৯৯৩।

আল-আমিন, 'শাহেদের ২৫ সদস্যের গ্যাং', *মানবজমিন*, ১৩ জুলাই, ২০২০।

আল-আমিন ও দেব, শুভ্র, '৪ সুন্দরীর ফাঁদ শাহেদের, সাবরিনা ফের রিমান্ডে', *মানবজমিন*, ১৮ জুলাই, ২০২০।

ইকবাল, মুহাম্মদ জাফর, 'শিক্ষক এবং শিক্ষকতা', *বিডিনিউজ২৪.কম*, ২০ অক্টোবর, ২০১৭।

উদ্দিন, লে. কর্নেল কাজী শরীফ, 'শিক্ষকতা পেশা নয় ব্রত', *দৈনিক শিক্ষা*, ২৩ আগস্ট, ২০১৭।

চৌধুরী, মোহাম্মদ আলম, 'আমাদের বিশ্বস্ত চতুষ্পদ বন্ধু কুকুর', *প্রকৃতি*, জুলাই ২০১৮, পৃষ্ঠা-৩০-৪৬।

নোমান, মোহাম্মদ আবু, 'শিক্ষকতা একটি চ্যালেঞ্জিং পেশা', *ইনকিলাব*, ২০ জানুয়ারি, ২০১৬।

দেব, শুভ্র, 'রিমান্ডে যা বললেন সাবরিনা', *মানবজমিন*, ১৩ জুলাই, ২০২০।

বাবু, ড. কুদরাত-ই-খুদা, 'শিক্ষাঙ্গণে খুনের রাজনীতি বন্ধ হবে কবে?', *যুগান্তর*, ২১ অক্টোবর, ২০১৯।

মিজান, রুদ্র, 'শাহেদকে ছাড়াতে তদবির করেছিল যারা', *মানবজমিন*, ১৮ জুলাই, ২০২০।

মিয়া, মো. মহসিন, 'ছাত্র জীবনে কেন কেউ সন্তুষ্টের সহিত বলছে না আমি ভবিষ্যতে শিক্ষক হতে চাই', *শিক্ষক বাতায়ন*, ১৭ শ্রাবণ, ১৪২৬।

মুক্তি, শরীফুল্লাহ, 'শিক্ষক: মূল্যবোধ সৃষ্টির মূল কারিগর', *দৈনিক শিক্ষা*, ১ অক্টোবর, ২০১৭।

শারমিন, জিনাত, 'শিক্ষক হতে চাই', *প্রথম আলো*, ১৩ জানুয়ারি, ২০১৯।

সায়ীদ, আবদুল্লাহ আবু, *নিষ্ফলা মাঠের কৃষক* (ঢাকা: বিশ্ব সাহিত্য কেন্দ্র, ২০২০)।

হোসেন, আকমল, 'পেশা যখন শিক্ষকতা', *সাপ্তাহিক একতা*, ২৮ জুলাই, ২০১৯।

হোসেন, শওকত 'করোনায় দুর্নীতির অভিনবত্বে এগিয়ে বাংলাদেশ', *প্রথম আলো*, ২০ জুলাই, ২০২০।

Books

Ahmed, Imtiaz and Iqbal, Iftekhar (eds.), *University of Dhaka: Making Unmaking Remaking* (Dhaka: Prothoma Prokashan, 2016).

Bastedo, Michael N., Altback, Philip G. & Gumport, Patricia J. (eds.), *American Higher Education in the Twenty-First Century: Social, Political and Economic Challenges* (Baltimore, Maryland: John Hopkins University Press, 2016).

Callaghy, Thomas M. 'State-subject Communication in Zaire: Domination and the Concept of Domain Consensus', *Journal of Modern African Studies*, September 1990.

Christensen, Clayton M. and Eyring Henry J., *The Innovative University-Changing the DNA of Higher Education From the Inside Out* (San Francisco: Jossey-Bass, 2011).

Christie, Agatha, *An Autobiography* (New York: Harper Collins Publishers, 1977).

Clarence Ng, Chi-hung, Fox, Robert and Nakano, Michiko (eds.), *Reforming Learning and Teaching in Asia-Pacific Universities* (Singapore: Springer, 2016).

Crow, Michael M. and Dabars, William B., *The New American University* (Baltimore: John Hopkins University Press, 2015).

Gandhi, Mohandas Karamchand, *Autobiography: The Story of My Experiments with Truth* (Boston MA: Beacon Press, 1993).

Isaacson, Walter, *Steve Jobs* (Cammeray NSW: Simon & Schuster, 2011).

Kalam, A P J Abdul & Tiwari, Arun, *Wings of Fire* (Hyderabad: Universities Press, 1999).

Keller, Helen, *The Story of My Life* (Boston: Bantam Classics, 1990).

King, Maxwell, *The Good Neighbor: The Life and Work of Fred Rogers* (New York: Abrams Press, 2019).

Mandela, Nelson, *Long Walk to Freedom* (Philadelphia: Little Brown, 1994).

Obama, Barack, *Dreams from My Father* (New York: Crown Publishing Group, 2004).

Sobhan, Rehman, *Untranquil Recollections* (New Delhi: Sage Publications, 2016).

Tanaka, S., 2001. 'Corruption in education sector development: a suggestion for anticipatory strategy', *The International Journal of Educational Management*, vol. 15, no. 4, pp. 158-166.

Taylor, Mark C., *Crisis on Campus: A Bold Plan for Reforming Our Colleges and Universities* (Toronto: Random House of Canada Limited, 2010).

Tendulkar, Sachin, *Playing It My Way* (London: Hodder & Stoughton, 1914).

Vlinton, Bill, *My Life* (New York: Random House, 2004).

Westover, Tara, *Educated* (New York: Random House, 2018).

Yogananda, Paramhansa, *Autobiography of a Yogi* (New York: The Philosophical Library, 2041).

Yousafzai, Malala, *I am Malala: The Story of the Girl Who Stood Up for Education and Was Shot by the Taliban* (Boston MA: Little Brown, 2013).

Research articles

Akhter, M. Y., 'Reflections on Political Socialization: Rural Institutions in Bangladesh' *Chittagong University Studies* (Social Science), Vol. X, No. 1, 1987, pp. 194-208.

Heyreman, S. P., Anderson, Kathryn H. & Nuraaliyeva, Nazym, 'The Cost of Corruption in Higher Education', *Comparative Education Review*, vol. 52, no. 1, 2008, pp. 1-25.

Heyneman, S. P., 2004. 'Education and corruption', *International Journal of Education and Development*, vol. 24, no. 6, 2004, pp.637-648.

Mashreque, Md. Shairul, 'Higher education in Bangladesh: A study of contemporary development and paradoxes', *Journal of Public Administration*, vol. 19, 2001, pp. 55-63.

Rumyantseva, N.L., 'Taxonomy of corruption in higher education', *Peabody Journal of Education*, vol. 80, no. 1, 2005. Pp.81-92.

নির্ঘণ্ট

অসমাপ্ত আত্মজীবনী ১২
অ্যাডভোকেট মো. কুদরত-ই-খুদা ৩৩৬
অ্যান ওয়েনেন এডমন্ডস ১৩৬
অ্যাম্বেসেডর সিরাজুল ইসলাম ২৩২
অ্যালিস শিফলেট ১৩১
অধ্যয়ন পরিষদ ৩৩৪
অধ্যাপক আবদুল মান্নান ২২৪, ২২৫, ৩৩৯
অধ্যাপক আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ ৩৭০
অধ্যাপক আবুল কাশেম ২১২
অধ্যাপক আমিরুল ইসলাম ৮২
অধ্যাপক ইনসান আলী গাজী ২৫
অধ্যাপক ইশতিয়াক আহমেদ ২৯
অধ্যাপক এজাহারুল ইসলাম ২৫
অধ্যাপক কে এম হাসান ২৫
অধ্যাপক খান সরোয়ার মোরশেদ ২১৬
অধ্যাপক জাফর ইমাম ২৫
অধ্যাপক জিয়াউন নাহার খান ২৮০
অধ্যাপক ড. আহমেদ শফিকুল হক ৪২
অধ্যাপক ড. মো. আবদুর রশীদ ২৩৩
অধ্যাপক ড. আনোয়ারা বেগম ২৫৩, ২৯৮
অধ্যাপক ড. এম. আসাদুজ্জামান
অধ্যাপক ড. মাখদুম-ই-মুলক মাশরাফী ২৮০
অধ্যাপক ড. মুস্তাফিজুর রহমান ছিদ্দিকী ২৫১, ২৫৩
অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ শামসুদ্দিন ২৫৩
অধ্যাপক ড. মো. আবদুর রশীদ ২২৯
অধ্যাপক ড. মোঃ এনায়েত উল্যা পাটওয়ারী ২৯৭
অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ আবদুল হাকিম ২৮০
অধ্যাপক ড. রাশিদা খানম ২৫৩
অধ্যাপক ড. সিদ্দিক আহমেদ চৌধুরী ২৫৩
অধ্যাপক ড. হাসান মোহাম্মদ ২৫৩, ২৯৮
অধ্যাপক লুৎফুর রহমান ২৫
অধ্যাপক মাহফুজুল হক চৌধুরী ২৩২
অধ্যাপক মোজাফফর আহমদ
অধ্যাপক শেখ জহির আহমেদ ২৮০
অধ্যাপক সাখাওয়াত হোসেন ২৫
অরহুস বিশ্ববিদ্যালয় ৭৩
'অস্থানে তুলসী অপাত্রে রূপসী' ২৮৭

আইবিএস ৩১, ৩৯
আইসিইডিসিআর ৩৫২
আওলাদ হোসেন দেওয়ান ২৩৬
আকবর আলী খান ৩৪৩
আকরাম হোসেন ২৬
আক্কাস আহমদ ২০১, ২৫২
আজিজ ২১৮
আতিয়ার রহমান ২৬
আনোয়ারুল কাদির খোকন ১৮
আবদুল করিম ৩৭০
আবদুল্লাহ ৮৫
আবু বকর ৩১২
আবু বকর সিদ্দিক ৩৩৫
আবু হান্নান ৪৩
আবদুল্লাহ আল নোমান ২৯৬
আবদুল্লাহ আল মাহমুদ ২৬
আবদুল্লাহ আল হাসান সোহেল ৩১২
আবদুল্লাহ রাকীব ২৫১
আবদুশ শাকুর ৩৪৩
আবরার ফাহাদ ৩১১
আবাহনী ১৮
আবুল কালাম আজাদ ৪৩
আবুল কাশেম মজুমদার ৪২
আবুল বাশার ২১২, ৩৩৪
আবুল হাসান ২৬
আল মাহমুদ ৩৭০
আমিনুর রহমান ২৪
আমিনুল হক আদনান ৩৬৭
আমির হোসেন ৩৩৭
আমেরিকান ইউনিভার্সিটি ১৩২
আমেরিকান সুপ্রিম কোর্ট ১৩০
আমেরিকান সেন্টার ১২৮
আরিফ আহমেদ ২৪
আরিফ চৌধুরী ৩৫০
আলী আকবর ২৭
আলী আকবর টিপু ৩৩৩
আসফউদ্দৌলা ৩৪৩
আসাদুজ্জামান ৩১২
আসাদুজ্জামান খান ১০৬
আহসানউল্লাহ ইউনিভার্সিটি ৩৩২
আহমেদ সামিউল হাসান ৪৮

ইউজিসি ৩০১, ৩০৭. ৩০৮
ইউনিভার্সিটি অব টেকনোলজি ১০৩
ইউনিভার্সিটি অব নিউ ইংল্যান্ড ১২৩
ইউনিভার্সিটি অব ব্রিটিশ কলাম্বিয়া ৭৯

ইউনিভার্সিটি অব সাউথ ক্যারোলিনা ১৩৪
ইউল্যাব ৩৫৬
ইকবাল হোসেন ২৫৬
ইডব্লিউজি ২২০, ২৩০, ৩৪৪
ইদ্রিস ৬২
ইনটারন্যাশনাল ভিজিটরস প্রোগ্রাম (আইভি) ১২৮
ইন্টারন্যাশনাল স্টুডেন্টস হোস্টেল ৮০
ইবেন নাথান ৬৮
ইভিএম ৩৩৮
ইমদাদুল হক ১৭৭
ইমাম হোসেন সাইদ ২১৮
ইসলামী ছাত্র শিবির ৩১২
ইসমাইল ১০৯
ইসলামিয়া কলেজ ৪৪

ঈসা মসিহ ৬৭

উপাধ্যক্ষ আবদুস শহীদ ৩৫৪
উম্মে হাবিবা ২০০, ৩৪৯
উরুন ১০৩, ১০৫

এ এফ রহমান হল ২৬৮
এ এল এম মিসবাহুল মুনির লুবাব ২৬৪
'একুশে পদক' ৩৪২
এ জি এম নিয়াজ উদ্দীন ২২৩, ২৩৩, ২৩৭, ২৮৬, ২৯৭
এনডিআই ১৩৩
এ পি জে আবদুল কালাম ৩৭০
এমআইটি ১২, ১২৫, ১২৭
এমআইটি মিডিয়া ল্যাব ৩৭৬
এম ইমদাদুল হক ৪২
এম. হাসান মজুমদার ২৩১
এমি মিয়াহারা ৮৯
এলডর এডমন্ডস ১৩৬
এলিজাবেথ কনর ১২১
এলিজাবেথ স্মিথ ইসী ৩২
এস এম ওয়ালিউল্লাহ ২৬
এস এম বজলুর রশিদ ২৪, ২৬, ২৭
এস এম মিজানুর রহমান ২৪, ২৬, ২৭
এস এম রইজ উদ্দিন আহম্মদ ১৫৫, ৩৪২
এস এম সুলতান ৩৬১
এশিয়া ফাউন্ডেশন ২৩০

ওবায়দুল কাদের ৩১০
ওসমান গনি মিঠু ২৬৮
ওয়াইল্ডফ্লাওয়ার ফাউন্ডেশন ১৪৯
ওয়াকার ইন্সিটিটিউট অব ইন্টারন্যাশনাল স্টাডিজ ১৩৫
ওয়াটারলু ১২,
ওয়াটারলু ইউনিভার্সিটি ৪৬
ওয়াশিংটন মনুমেন্ট ১৩০
ওয়াশিংটন মিউজিয়াম ১৩০
ওয়াহিদুজ্জামান সোহাগ ৩৩৭

কফিল উদ্দিন আহমেদ ২৬, ২৮, ৩০, ৩৩
কম্যুনিস্ট পার্টি ৩৩৬
ক্যাসিনো সম্রাট ২৯৪
কাজী জেবেল ৩৩৮
কামরুল ইসলাম ৩৩৪
কামাল উদ্দিন ১৪১
কারিশমা ফাতিহা ১১৪, ১২৭
কালিপদ দাস ১৫৫, ৩৪৩
কিচেনার-ওয়াটারলু হাসপাতাল ৫৪
কেডিএ ৩৩২
কোড়েরপার আদর্শ কলেজ ৩৪৯
কোরি ৫৬
ক্রিস্টোফার ওয়াই ১৩৩

খলিলুর রহমান কলেজ ৪৩-৪৪
খান এ সবুর ১৮,
খায়রুল কবীর ৩১৩
খ্রিস্টান মেমোরিয়াল হাসপাতাল ৬৬
খুলনা ইউনেস্কো ক্লাব ৩৩৫
খুলনা ইসলামিয়া ক্যাডেট স্কুল ৩৩৫
খুলনা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (কেডিএ) ৪৩
খুলনা জেলা স্কুল ৩৩৪
খুলনা পাবলিক লাইব্রেরি ৩৩৯
খুলনা পেইন্ট হাউস ৩৩৭
খুলনা বিশ্ববিদ্যালয় ১০৬
খুলনা মজিদ মেমোরিয়াল সিটি কলেজ ৪৪
খুলনা রাইটার্স ক্লাব ৩৩৫
খুলনা সিটি কর্পোরেশন ৪৩
খুশনুল মারিয়া ১০৩
খুলশিবুনিয়া জিপিবি মাধ্যমিক বিদ্যালয় ৩৩৪

'গণতন্ত্রের সংলাপ' ৩৫৬
গনি মিয়া ৩১
গাঙচিল প্রকাশনা ৩৪২
গোলাম মোস্তফা সিন্দাইনি ৩৩৯
গোলাম রব্বানী ৩৩৭
গোলাম রাব্বানী ৩০৯

চট্টগ্রাম ইন্ডিপেন্ডেন্ট ইউনিভার্সিটি ২৩০, ৩৫৯
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ২৮২, ৩০৯
চালন্দা গিরিপথ ৩২১
'চিরকুট' ২৮৭
চৌধুরী ফরিদ আহমেদ ৩৩৭

ছাত্রদল ৩১২
ছাত্রলীগ ৩১১

জন জেওয়াস্কী ৫১
জন লুইস ১৭০
জহিরুল কইয়ুম ২৪৮
জহুরুল ইসলাম ২৬
জয়নুল আবেদিন ৩৬১
জয়বাংলা ভাস্কর্য ৩২১
জাওয়াদ উল আলম চৌধুরী ৩৬২

জাফরুল্লাহ ২৮
জামান ১০৯, ১১০
জামাল উদ্দিন ২৯৯
জালাল আজমেদ ২৬
জাসদ ৩৩৬
জাহাঙ্গীর ৪৪
জাহাঙ্গীর বক্স ২৪
জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় ৪৮
জিওফ সমারভিল ১১৫
জি কে শামিম ২৯৪
জি ডব্লিউ চৌধুরী ১০১
জুলিয়া সুরিয়াকুসুমা ১০৪
জে ওয়েল্যান্ড ১৩৮
জেফরি ওয়েনবার্গ ১৩৩
জেফরি জোনস ১৬০
জেবা ১০৭
জেমস পারমেলে ১৩২
জিকেজি ৩৫০
জোয়ান ভয়সন ৫০

টড হোলস্ট্রম ১৩২
টমাস হিনটন ১৩৩
টিআইবি ৩০৬, ৩০৮, ৩২৬, ৩২৮, ৩৭৬
টিএসসি ২৬৭
টেড এগেন ১৩৮
ট্যামি ম্যারিনাক ১৩০

ড. আ. ন. ম. শামসুল হক ৪০
ড. আনোয়ার হোসেন মিঝি ২০১, ২৫২
ড. আনোয়ারা বেগম ২৮৬
ড. আফতাব আহমাদ ৪১
ড. আহমেদ শফিকুল হক ৪১, ২৮৯
ড. ইফতেখারউজ্জামান ২১৪
ড. ইফতেখার উদ্দিন চৌধুরী ২২২
ড. ক্লারেন্স মেলোনি ৩১
ড. ডেভিড লুবিন ১৩২
ড. নূহ আলম লেনিন ১৫৫
ড. নিজাম আহমেদ ৪১
ড. ফ্রাংক জে. ডুলি ৩৫৬
ড. মইনুল ইসলাম ২১৩
ড. মাহফুজুল হক চৌধুরী ২১৭
ড. মাহবুবুল হক ২১২, ২১৩
ড. মুস্তাফিজুর রহমান ছিদ্দিকী ২০১
ড. মুহাম্মদ ইউনূস ৩৪২
ড. মো. আবদুল আলিম ৩৪৩, ৩৪৪
ড. মো. আবদুল আলীম ২৩১, ৩৪৩, ৩৪৪
ড. মোঃ এনায়েত উল্যা পাটওয়ারী ২৫২
ড. মোনা হান্না-অতীসা ১৫৪
ড. মোহাম্মদ আনিসুজ্জামন ৪১
ড. মোহাম্মদ আবদুল হাকিম ৪১
ড. রস কারনাউ ৯৯
ড. হাবিব জাফরুল্লাহ ৪২, ১০১. ১২৩, ২৮৯
ড. শামসাদ মর্তুজা ৩৫৬
ড. শিরীন আখতার ২৫৬
ড. শিরিণ শারমিন চৌধুরী ২৮২
ডা. এল. ডি. গোলেন ৬৫, ৬৭
ডা. জনসন ৫৭, ৫৮
ডা. সাবরিনা চৌধুরী ৩৫০
ডানা পর্টার লাইব্রেরি ৫০
ডিইউএসএস ৩২৪
ডি. কে. মন্ডল ৩৩৫
ডিজিটাল সিকিউরিটি অ্যাক্ট-২০১৮ ৩৫৮
ডেনিশ ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট এজেন্সি ৬৯
ডেবোরা লিটল চাইল্ড কেয়ার সেন্টার ১১২
ডেভিড বি. ইওফী ১৬০
ডেমোক্রেসি ইন্টান্যাশনাল ৩৪৩

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ২৪৭

তামারা ফ্লেমিংটন ৫২
তারা ওয়েস্টওভার ৩৭০
তাসনীম হাসান ২৬০
তৌহিদুল ইসলাম ভুঁইয়া ৩৬৭

দ্য নিউ মেক্সিকান ১৩৫
দ্য নিউইয়র্ক টাইমস ৩৫০
দ্বীনি ফাতিহা ১১৪, ১৪২
দিদারুল আলম ৩৩৪
দীপঙ্কর ঘোষ ৩১৩
দীপা দাস ২১০
দীপাঞ্জলী বড়ুয়া পিংকী ২০০, ২৪৮, ২৬৫
দিয়াজ ইরফান চৌধুরী ৩১৩
দেবাশীষ জানা ৫১

নইম সুলতান ৪২, ৪৮
নওমা আফরিন ২৬৫
নওশাদুল হক ১০৬
নজরুল ইসলাম ২৮০
নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয় ১২৭
নভেল পাবলিশিং হাউস ৭২
নসরুল্লা নাসিম ৩১২
নাজমুন নাহার ২০১, ৩৪৫
নাজমুন নেসা পিয়ারী ১৫৫, ৩৪৩
নাজমুস সাকিব ১৪৬, ১৪৭, ১৫০, ১৫২
নাজমুল মাশরেক ৩১
নিজাম ১০৯
নিয়াজ আহমেদ খান ১৪৪
নুরুল ইমাম খান মিটু ৩৩৫, ৩৩৬
নুরুল ইসলাম ৪২
নুরুল হক চৌধুরী ২২১, ২৯৯
নুয়েলা ১১৬
নেলসন ৮২

'পদ্মভূষণ' ৩৪২
'পদ্মশ্রী' ৩৪২
পল সুয়াজো ১৩৫
পল্লীমঙ্গল হাই স্কুল ১৯, ৪৪

পারডিউ ইউনিভার্সিটি গ্লোবাল ৩৫৬
পাহাড়িকা হাউজিং সোসাইটি ৩৬২
পিআইবি ২০৫
প্রিয়া চক্রবর্তী ৩৬৭
পূর্বা প্রেস ৩৬২
প্রতিভা নন্দি ২৬
প্রফেসর অশোক কাপুর ৫৯
প্রফেসর আবদুল মান্নান ১৭৮, ৩০২
প্রফেসর আর আই চৌধুরী ২৩২
প্রফেসর আহমেদ শফিকুল হক ১৬৪
প্রফেসর কাজী শহীদুল্লাহ ৩০২
প্রফেসর কায়কোবাদ ২৫
প্রফেসর গণি ২৫
প্রফেসর গ্যাবরিয়েল এ. আলমন্ড ৪১
প্রফেসর গোলাম মুরশীদ ২৮
প্রফেসর জামাল নজরুল ইসলাম ১৮৫
প্রফেসর জিল্লুর রহমান ২৫
প্রফেসর জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী ২৮-২৯
প্রফেসর নাজমুল করিম ২৩৩
প্রফেসর নিতিন নরিয়া ১৭০
প্রফেসর নুরুদ্দীন চৌধুরী ২১১
প্রফেসর ফেলিক্স অবারহোলজার-গী ১৭০
প্রফেসর বিদ্যুত চক্রবর্তী
প্রফেসর মার্ক এডওয়ার্ডস ১৫৪
প্রফেসর মাহফুজুল হক চৌধুরী ২৩৩
প্রফেসর মোজাফফর আহমেদ ২১৪, ২১৬, ২৩৩
প্রফেসর মুজিবুর রহমান ২৫
প্রফেসর মুহাম্মদ আয়েশ উদ্দিন ২৮
প্রফেসর রেহমান সোবহান ২৮৯
প্রফেসর হারুনুর রশিদ ২৫
প্রফেসর ড. আ ন ম মুনীর আহমদ ২২৫, ২৩৩, ২৬৩
প্রফেসর ড. আনোয়ারা বেগম ২২৮, ২২৯, ২৩০
প্রফেসর ড. আনোয়ারুল আজিম আরিফ ২৯৬
প্রফেসর ড. আ. ন. ম. শামসুল হক ২৮
প্রফেসর ড. আবদুল আউয়াল বিশ্বাস ২৪১
প্রফেসর ড. আবদুল মান্নান চৌধুরী ২৯৫
প্রফেসর ড. আবুল ফজল হক ২৮
প্রফেসর ড. আর আই চৌধুরী ৪১, ১৭৭
প্রফেসর ড. ইফতেখার উদ্দিন চৌধুরী ২৩১
প্রফেসর ড. ইমতিয়াজ আহমেদ ৩০৭, ৩০৮
প্রফেসর ড. ইমদাদুল হক ২৮০
প্রফেসর ড. এনায়েত উল্যা পাটওয়ারী ২০০, ২৮৪, ২৮৯
প্রফেসর ড. এম বদিউল আলম ২০৫
প্রফেসর ড. গাজী আবদুল্লাহেল বাকী ৩৩২, ৩৩৩, ৩৩৪
প্রফেসর ড. জাহাঙ্গীর আলম ২৩৮
প্রফেসর ড. জোহরা খানম ২৮০
প্রফেসর ড. নইম সুলতান ২৪১
প্রফেসর ড. নাসির উদ্দিন ২০০
প্রফেসর ড. বদরুদ্দীন আহমেদ ২৮
প্রফেসর ড. বিদ্যুত চক্রবর্তী ২৪১, ২৪২
প্রফেসর ড. বেনু প্রসাদ বড়ুয়া ৪০, ৪১
প্রফেসর ড. বিভুতি রায় ৩৩৪
প্রফেসর ড. ভুঁইয়া মোঃ মনোয়ার কবীর ২০৩, ২১৯, ২৩২
প্রফেসর ড. মইনুদ্দিন আহমদ খান ২৯৬
প্রফেসর ড. মাহফুজুল হক চৌধুরী ২২২, ২২৩, ২২৬, ২২৮
প্রফেসর ড. মো. আবদুর রশীদ ১৭৮
প্রফেসর ড. মুস্তাফিজুর রহমান সিদ্দিকী ২০৩, ২২৬, ২২৮
প্রফেসর ড. মুহাম্মদ ইউনূস ৩৭০
প্রফেসর ড. মুহাম্মদ শামসুদ্দীন ২১৯
প্রফেসর ড. মোহাম্মদ আনিসুজ্জামান ২৯
প্রফেসর ড. মোহাম্মদ আবদুল হাকিম ২১৯
প্রফেসর ড. মোহাম্মদ আসাদুজ্জামান ২১৫, ২১৬
প্রফেসর ড. রওনক জাহান ২৩২, ২৩৪, ২৮৯
প্রফেসর ড. শামসুল আলম সেলিম ২০৩
প্রফেসর ড. শব্বির আহমদ ২৯৩
প্রফেসর ড. সিদ্দিক আহমেদ চৌধুরী ২০১, ২৬৫, ২৮৪
প্রফেসর ড. হাসান মোহাম্মদ ২০০, ২৮৪
প্রিয়াংকা মজুমদার ২৫৯, ২৬০

ফারহানা শাহরীয়ার ২১০
ফারুক ৮৬
ফিশার লাইব্রেরি ৮১
ফ্রেন্ডস প্রিন্টার্স ৩৩৬

বই পড়ি ৩৩৫
বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ২২২
বনলতা সাহিত্য পরিষদ ৩৩৪
বাতিঘর ২৯২
বান্দা খলীল ৩৩৫
বাবলু ২০
বারাক ওবামা ৩৭০
বারবারা লেই ১০২
বাংলা একাডেমি ৩৪১
'বাংলা একাডেমি পুরস্কার' ৩৪২
বাংলাদেশ ইতিহাস পরিষদ ২৫০
বাংলাদেশ ইমাম সমিতি ১৪৬
বাংলাদেশ মিলিটারি একাডেমি (বিএমএ) ৪৪, ৪৫
বিজয় সরণী কলেজ ২৫৪
বিএনপি ৩৩৬
বিধান চন্দ্র দাস ২১২
ব্রি. জে. মোঃ আব্দুল মুকিম সরকার ৩৩২
ব্রি. জে. শাহাদাত হোসেন চৌধুরী ৩৩৮-৩৩৯
বুদ্দিজীবী চত্বর ৩২১
বেগম মন্নুজান সুফিয়ান ৩০৫
বেলায়েত হোসেন ৩০, ৩১
বটিয়াঘাটা উপজেলা ৩৩৪
বদিউল আলম ৩০
'বাংলা একাডেমি পুরস্কার' ৩৪২

ভ্যাম্পায়ার মিউজিক স্টুডিও ৩৩১
ভার্ন ফেয়ারওয়েল ৪৮
ভিকারুন্নিছা স্কুল ৪৪
ভিক্কি ক্রাটজ ১৩৩
ভিয়েতনাম মেমোরিয়াল ১৩০

মইনুল আলম ৩৬২
মর্তুজা বশীর ৭৯
মঞ্জুরুল আলম ২৪, ৩৬১
মঞ্জুরুল হক ৮২
মনসুর উদ্দিন আহমদ ২১৫
মনিরা আখতার ৪৩, ১৪৪
মন্টু দাস ৬৩, ৬৪
মন্টেরফোর সেন্টার ২৬৪
মমো মল্লিক ৩৩৪
মহুয়া জামান মিম ৩৬৭
মহিউদ্দিন চৌধুরী ২৯৬
মহিউদ্দিন মাসুম ৩১১, ৩১২
ম্যাকমাস্টার ইউনিভার্সিটি ১৬৪
ম্যাগাসাইসাই ৩৪২
ম্যারিয়ট কনভেনশন সেন্টার ২৬৫
মাইকেল ৮২
মাইকেল ফ্রাঙ্ক ১৩৩
মাওলানা আবু হোরায়রা ১৪৬
মাওলানা নজরুল ইসলাম ২৯৫
মাওলানা নজিবুল বাশার মাইজভান্ডারী ২৯৬
মাছুম বিল্লাহ ৩৩৩
মাজাহার ইমাম ২৭
মাজাহারুল ইসলাম আবু ২৬
মার্টিন লুথার কিং ১৭০
মানা ২৮
মাফরুহা আমরিন ৩৬৭
মামুন রেজা ৩৩৫
মাসুদ বিন হাবিব ৩১৩
মাসুম ২২
মারিয়া মুন নিসা ৩৬৭
মালিহা তাবাসসুম হুমা ২৬৫
মার্শা ওসিমা ১৩১
মাহিমা ইসলাম ৩৬৭
মিজানুর রহমান, এমপি ২৫
মির্জা সবুর কিরণ ২৪
মিতালি সিনহা ৫১
মিনু মমতাজ ৩৩৪
মিলন ৬৪
মুক্তমঞ্চ ৩২১
মুক্তাশ্রী চাকমা ২১০
মুজাহিদুল ইসলাম ৩১৩
মুজিবুল হক চৌধুরী ৩৪৬
মুশফিক হোসাইন ২৯২
মুসলীম লীগ ১৮,
মুহাম্মদ ইয়াহ্ইয়া আখতার, ২, ১২
মুহাম্মদ আইউব ২৫৬
মুহাম্মদ ইসহাক ২৩৩
মুহাম্মদ জাহাঙ্গীর ২১৮
মুন্নী ২৮
মেরি ২৮, ১১৬
মো. ফারুক হোহেন ২০১
মোঃ বখতেয়ার উদ্দিন ২২৩, ২৩০, ২৩৭, ২৮৬, ২৯৭
মোঃ রবিউল হুসেইন ২৩৫
মো. রেযাউল করিম ৩২৭, ৩২৮
.মো. শাওন ধনেক ৩৬৭
মোঃ সেলিমুল হক ২৮৬, ২৯৭
মোনা মারজান ৪৪
মোল্লাহাট গার্লস স্কুল ৪৪
মোল্লাহাট থানা ১৮
মোস্তফা কামাল ১৯, ৪৩, ৩২৮
মোশতাক ২১০
মোসাদ্দেক আলী বাচ্চু ২৪
মোহাম্মদ আবদুল হাকিম ৪২
মোহাম্মদ আলম চৌধুরী ২০১, ২২৩, ২৮৪, ২৯১
মোহাম্মদ ইসমাইল ২৩৫
মোহাম্মদ ইসহাক ২০০
মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম ২০৫-২০৬
মোহাম্মদ বাহার উদ্দিন ১০৭
মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ ২৪
মোহাম্মদ শিহাব উদ্দিন ১৪৪
মোহাম্মদ সেলিম ৮৫
মোহাম্মদ সেলিমুল হক ২০০
মোহাম্মদ শাহেদ আলম ভূঁইয়া ৩৪৫
মোহামেডান ১৮

রওশন আরা ২২
রডনি টিফেন ১০১
রফিকুল ইসলাম দুলাল ৪০, ৪৩
রবিউল ২৮
রহমতউল্লাহ ২০৩
রাঙ্গামাটিয়া দরবার শরিফ ২৯২
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় ৪১, ৪৩
রাষ্ট্রচিন্তা ৩৩৪
রাশিদা খানম ৪২
রিচার্ডসন অ্যান্ড রিচার্ডসন ৮২
রিজেন্ট হাসপাতাল ৩৫০
রুহুল আমিন ৪২
রুহুল আমিন সিদ্দিকী ৩৩৬
রেইড হফম্যান ১৫৩
রেজাউল আলম ২৬, ২৭
রেজাউল করিম ২৬
রেজওয়ানুল হক চৌধুরী শোভন ৩০৯
রেভারেন্ড ফাদার অরল্যান্ডো ২২
রেহমান সোবহান ৩৭০
রোট্যারাক্ট ক্লাব অব ইসলামাবাদ ৩৫৬

লরি ফেনার ১৩৩
ল্যাব এইড ২৬৫
লাইব্রেরি অব কংগ্রেস ১৩০

লাবনী বড়ুয়ার ২১০, ২১১
লিঙ্কডইন ১৫৩
লিন্ডা ৫৪
লিবার্টি স্ট্রিট ৮২
লেন ইভান্স ১৩২
লেসলি রিচার্ডস ৩৪৪

শঙ্কর মল্লিক ৩৩৪
শ ম আবদুর রাজ্জাক ৩৩৫
শরিফ উল আলম ৪৫
শরীফ হোসেন ৪৮
শরীফুজ্জামান নোমানী ৩১২
শহীদ মিনার ৩২১
শাজাহান ৬১, ৬২
শামসুজ্জামান খান ১৫৫
শামসুদ্দীন আহমেদ ৪২
শামীম আহমেদ খান ২৪, ২৬, ২৭
শামিম জিহাদ ৩৩২
শারমিলা কবীর সীমা ২৫৪
শাহজালাল আওলিয়া ১০৭
শাহজাহান শাহ ২৯৫
শাহনাজ বেগম ৪২
শাহপুর মধুগ্রাম কলেজ ৪৩
শাহাদাত হোসেন ২৪, ২৬
শাহানারা বেগম ২৬
শাহেদ আলম ভূঁইয়া ২০১
শাহেদ করিম ৩৫০
শায়রুল মাশরেক ৩০, ৩১
শিরীতাজ বেগম ২৬
শেখ আজিজুল ইসলাম সাচ্চু ২০
শেখ আফজালুর রহমান ১৯, ৪৪
শেখ আবু আহমেদ ১৮
শেখ আলী আহমেদ ১৮
শেখ দবিরুল ইসলাম ১৯
শেখ মুজিবর রহমান ১২
শেখ মোহাম্মদ আসলাম ১৮
শেখ রাজ্জাক আলী ১৯
শেখ হাতেম আলী ১৮
শেখ হাসিনা ১৩০
শেফালি ১৪৪
শ্রাবনী সেন শাওন ২১০, ২১২

সন্তোষ ৬৪, ৬৬
স্বপন ২৮
স্বরস্বতী বিশ্বাস ২৬
স্যুয়ে ওয়াং ১০৩
স্মরণ ভাস্কর্য ৩২১
সুমসা ৮৮, ৮৯
সাইদ ২১০
সাউথপয়েন্ট স্কুল অ্যান্ড কলেজ ২৬৩
স্বাধীনতা স্মৃতি ম্যুরাল ৩২১
'স্বাধীনতা পদক' ৩৪২
সাব্বির নেওয়াজ ৩০৭
সালেহ শাহরিয়ার ২৪৮
সাবেকুন নাহার সনি ৩১২
সামছুন্নাহার ২২
সাহেব আলী ৩৬০
সাহিত্য মজলিস ৩৩৫
সিইউডিএস ২১২, ২১৩
সিডনি ১২
সিডনি বিশ্ববিদ্যালয় ৭৯
সিডিসি ২১৮
সিদ্দিক আহমেদ চৌধুরী ৩০
সিদ্দিকী নাজমুল আলম ৩১০
সিরাজুল ইসলাম ২৪
সিলভী হারুন ৩৩৫
সিলভিয়া সিরিঙ্গার ১১৫
সিলেট বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় ৩১৩
স্টিভ জবস ৩৭০
সুজান মরিস নভিক ১৭০
সুনামি গার্ডেন ৩২১
সুজিত দাস ১০৬
সেকেন্ডারি ট্রান্সফার স্টেশন (এসটিএস) ৩৩২
সেন্ট্রাল রেকর্ডস অফিস ১১৫, ১১৯
সেন্ট মার্টিন দ্বীপপুঞ্জ ২৭০
সেন্ট যোসেফস হাই স্কুল ২২, ২৩
সেলিম আল দিন ৩৫৯
সেলিমুল হক ২৫২, ২৫৩
সৈয়দ আলী হাকিম ৩৩৪
সৈয়দ হাবিবুর রহমান ২৬
সোনামুখ পরিবার ৩৩৪
সোস্যাল মেশিন ১৪৯
সোহেল রানা ৩১৮

হযরত মাওলানা আহমেদ শফী ২৯৫
হযরত মাওলানা শফিকুল ইসলাম ২৯২
হযরত শাহজালাল বিমান বন্দর ৩৪৬
হাজী ইসমাইল ১৮, ১৯
হাফিজুর রহমান ২৯২
হাবিবোল্লাহ সিরাজি ৯৩
হার্ভার্ড ১২
হার্ভার্ড অ্যালামনি অ্যাসোসিয়েশন ১৭০
হার্ভার্ড বিজনেস স্কুল ৩৭৬
হারুন অর রশিদ কায়সার ৩১২
হাসনাত আবদুল হাই ৩৪৩
হাসিনা আফরুজ শান্তা ২৪৮
হাসিনা বানু শিরিন ৪৩
হুগলী মাদ্রাসা ১৮
হুমায়ুন আহমেদ ৩৫৯
হোয়াইট হাউস ১৩০

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

33019

মুহাম্মদ ইয়াহ্ইয়া আখতার চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে রাজনীতিবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক। তিনি অস্ট্রেলিয়ার ইউনিভার্সিটি অব সিডনি, কানাডার ইউনিভার্সিটি অব ওয়াটারলু এবং বাংলাদেশের রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে লেখাপড়া ও ডিগ্রি অর্জন করেন। রাজনীতি, নির্বাচন, দুর্নীতি, রাজনৈতিক সংস্কৃতি, ধর্ম, উচ্চশিক্ষা, প্রভৃতি বিষয়ের ওপর ড. আখতারের লেখা বই প্রকাশিত হয়েছে। প্রকাশিত কাজের মধ্যে আরও রয়েছে মনোগ্রাফ, বুক চ্যাপ্টার, দেশি-বিদেশি জার্নালে প্রকাশিত গবেষণা প্রবন্ধ, রিসার্চ নোট, রিসার্চ রিপোর্ট প্রভৃতি। যুক্তরাজ্য থেকে প্রকাশিত Electoral Corruption in Bangladesh (Ashgate: 2001, Routledge: 2018) শীর্ষক বইটি ড. আখতারের লেখা সর্বাধিক প্রচারিত গ্রন্থ। অন্য ২০টি গ্রন্থের মধ্যে রয়েছে: *প্রসঙ্গ নির্বাচন কমিশন* (২০২১); *বাংলাদেশি নির্বাচন* (২০২১); *রাজনৈতিক সংস্কৃতি ও সামাজিকীকরণ: প্রসঙ্গ বাংলাদেশ* (২০২০); *শিক্ষা ও সংস্কৃতি ভাবনা* (২০১৯); *বাংলাদেশের নির্বাচনী দুর্নীতি: স্বরূপ ও প্রবণতা* (২০১৬); *অভিনব নির্বাচন অসহিষ্ণু সরকার, দশম সংসদ নির্বাচনের পূর্বাপর* (২০১৫); *মহাজোট সরকারের বিকাল বেলা* (২০১৩); *তত্ত্বাবধায়ক সরকারের ময়নাতদন্ত* (২০১২); *নির্বাচন কমিশনের আমলনামা* (২০১২); *মহাজোট সরকারের দুই বছর* (২০১১); *অভিনব সরকার ব্যতিক্রমি নির্বাচন* (২০০৯) প্রমুখ। টিআইবির সাবেক রিসার্চ ফেলো হিসেবে লেখা সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে দুর্নীতি: স্বরূপ ও প্রতিকার শীর্ষক ড. আখতারের গবেষণা কাজটি টিআইবি এবং এএইচডি-পিএইচ যৌথভাবে গ্রন্থাকারে প্রকাশ করেছে। এছাড়া তিনি গল্পকার, চিত্রনাট্যকার, গীতিকার ও কলামনিস্ট। যুগান্তর-এ লেখা তাঁর নিয়মিত কলাম 'দেশপ্রেমের চশমা' পত্রিকা পাঠকদের কাছে সুপরিচিত।